ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৮ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩।০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৮ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র সূচী

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৮ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৸০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৮ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র সূচী



দ্বৈপায়ন হ্রদে অর্দ্ধজলমগ্ন দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৮ [সপ্তম সংখ্যা

মীনু

১

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েচে। ছেলেবেলায় ইঁদারার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়র-ক্ষেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড় হয়ে জৌনপুরে ওর বিয়ে হয়। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, আর পরে ডাক্তার বল্‌লে, "এও বাঁচে কিনা সন্দেহ।"

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মত ওর কাঁচা প্রাণ শক্ত করে পৃথিবীর বোঁটা আঁক্‌ড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব তার পরেই ওর বড় টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারি বেড়ার পরে যে ঝুম্‌কো লতা লাগিয়েছিল এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেচে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সব-চেয়ে যেটিকে সে ভালবাসত তার নাক ছিল খাঁদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীনু রঙীন পুঁথির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বল্‌লে, "বৌ-দিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।"

মীনুর স্বামী বল্‌লে, "বড় হাঙ্গাম, কাজ নেই।"

২

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীনু শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানী দাই কাছে বসে কত কি বকে; সে খানিক শোনে, খানিক শোনেনা।

একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখ্‌তে পেলে তার জান্‌লার নীচেকার গোলক-চাঁপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেচে। তার একটু মৃদু গন্ধ মীনুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ?"

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে কেমন-করে' এসে পড়ে' যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠ্‌ত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখ্‌ত সেদিনের মত আর ত তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, "আহা দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস্!"

এই গাছে কেন যে ক'দিন ফুল দেখা যায় নি একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধ-ফোটা পদ্মের মত সবে জাগচে এমন সময় সাজি-হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌ল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বর্গির পেয়াদা।

মীনু দাইকে বল্‌লে, "শীঘ্র, ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন্।"

ব্রাহ্মণ আস্‌তেই মীনু তাকে প্রণাম করে বল্লে, "ঠাকুর, ফুল নিচ্চ কার জন্যে?"

ব্রাহ্মণ বল্‌লে, "দেবতার জন্যে।"

মীনু বল্‌লে, "দেবতা ত ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েচেন।"

"তোমাকে ?"

"হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েচেন সে ত ফিরিয়ে নেবেন বলে দেন নি।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ-নাড়া দিতে সুরু কর্‌লে তখন মীনু তার দাইকে বল্‌লে, "ও দাই, এ ত আমি আমি চোখে দেখ্‌তে পারিনে। পাশের ঘরের জান্‌লার কাছে আমার বিছানা করে দে!"

৩

পাশের ঘরের জান্‌লার সাম্‌নে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীনু তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বল্‌লে, "ঐ দেখ, দেখ, ওদের কি সুন্দর ছেলেটি! ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও না!"

স্বামী বল্‌লে, "গরীবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন ?"

মীনু বললে, "শোন একবার! ছোট ছেলের বেলায় কি ধনী-গরীবের ভেদ আছে ? সবার কোলেই ওদের রাজ-সিংহাসন।"

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, "দরোয়ান বল্‌লে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

পরের দিন বিকেলে মীনু দাইকে ডেকে বল্‌লে, "ঐ চেয়ে দেখ্, বাগানে একলা বসে খেলচে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়!"

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বল্‌লে, "ওরা রাগ করেছে।"

"কেন, কি হয়েচে ?"

"ওরা বলেচে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় ত পুলিসে ধরিয়ে দেবে।"

এক মুহূর্ত্তে মীনুর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বল্‌লে "আমি দেখেচি দেখেচি! ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মার্‌লে! এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্লাশে একটি ছেলের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল। ছেলেটির নাম জলদ-কান্তি। নামের সহিত তাহার চেহারার কোন সামঞ্জস্যই ছিল না। ছিপ্‌ছিপে একহারা গঠনের স্নিগ্ধ গৌর-কান্ত নাতি-দীর্ঘ ছেলেটিকে দেখিলে ঘনঘোর বর্ষা-মেঘের পরিবর্ত্তে সকাল বেলার কৌতুক-হাস্যোজ্জ্বল নর্ত্তনশীল রৌদ্র-রেখাটিকেই যেন বেশী করিয়া মনে পড়ে। ছেলেটি গায়ে পড়িয়া সাধিয়া আপনি আলাপ করিয়াছিল। অরুণ যে মেসে বাসা লইয়াছিল, সে তাহার খান তিন-চার বাড়ীর পরে থাকিত। ক্লাশে অনেকের সঙ্গেই তাহার আলাপ ছিল। আলাপ করিবার শক্তি তাহার যেমন অসাধারণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতাও তেমনি তাহার অনায়াস-লভ্য। তাহার ঠাট্টা-বিদ্রূপে ছেলেদের কাছে সে এমনি সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল যে এখন আর সে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কেহই আর রাগ করিতে পারে না, করেও না। এই নূতন বন্ধুটিকে অরুণের বড় ভাল লাগিয়াছিল। তবু নিজের সঙ্কোচপূর্ণ স্বভাবের জন্য অল্পদিনের বন্ধুত্বে সে সম্পূর্ণ-রূপে নিজেকে বন্ধুর হাতে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে নাই। তাহার মনের অভাব যত বড়ই হউক, বাহিরের অভাবও যে কতখানি সে কথাও সে লজ্জায় কাহাকেও জানাইতে পারিতেছিল না। অথচ কোন একটা উপায় না করিলেও নয়। বিছানায় পড়িয়া সে এই নূতন বন্ধুটির কথাই তখন ভাবিতেছিল। মনে হইল, জলদকে সে তাহার অভাবের কথা জানাইয়া কোন একটা ছেলে পড়ানোর কাজ যদি জোগাড় করিয়া লইতে পারে, তবেই সুবিধা হয়। সঙ্কোচ কিন্তু মাথা নাড়িয়া বাধা দিল, না, কাজ নাই। কি জানি, বন্ধু যদি মনে করেন, বন্ধুত্বের ভাণ কেবল স্বার্থলাভের পন্থা! সেই বা তাহাকে কতটুকু চিনিয়াছে? আরও একটি ছেলের সহিত অরুণের আলাপ হইয়াছিল,—এ ছেলেটির নাম প্রফুল্ল। ক্লাশে খুব ভাল ছেলে বলিয়া ইহার সুনাম ছিল। হিন্দুস্কুলে ফার্ষ্ট হইয়া কম্পিটিশন স্কলারশীপ লইয়া সে গত বৎসর পাশ করিয়াছে। প্রফুল্লর বন্ধুত্ব অনেকেই কামনা করিত। কিন্তু সে নিজে স্বেচ্ছায় কাহারও সহিত মিশিতে চাহিত না। তাহার তরুণ মুখে গাম্ভীর্য্যের ছাপ পড়িয়াছিল। কথাও সে সাধারণতঃ খুব অল্পই কহিত। যেখানে 'হাঁ, বা 'না' বলিলে চলিত, সেখানে সে দ্বিতীয় কথা ব্যবহার করিত না। সর্ব্বদা যে লেখাপড়া লইয়াই সে থাকিত, এমন নয়। তবু সকলের সহিত একত্র থাকিয়াও সে যেন সকলের কাছে হইতে দূরে থাকিত। ছেলেরা তাহাকে ভাল বাসিত, ভয়ও করিত। পড়া-শুনার জন্য কেহ তাহার সাহায্য চাহিলে সে খুসী হইয়াই তাহাকে পড়া বলিয়া দিত। ব্যস! তারপর আর কোন সংস্রব সে রাখিত

না। প্রফুল্লকে শিক্ষকেরাও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই পরচ্ছিদ্রান্বেষী দুষ্ট বালকেরা ইচ্ছা থাকিলেও তাহার সহিত শত্রুতা করিতে পারিত না। তবু এই ছেলেটিকে উপলক্ষ্য করিয়া দুইটি দল হইয়াছিল। এক দল তাহার স্বপক্ষে—অন্য দলটি বিপক্ষে। যাহাকে লইয়া দল,—সে কিন্তু কোন দলেই যৌগ দিত না; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজের কার্য্য করিত, অল্প সল্প সকলের সহিতই মিশিত। নিজের চারিধারে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের গণ্ডী রচনা করিয়া সে বাস করিত, যেখানে তাহার মনের নাগাল কেহই পাইত না। অরুণের সে এক ক্লাশ উপরে পড়ে, বয়সেও কিছু বড়।

এই ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই অরুণের বড় ভাল লাগিয়াছিল। সে তাই সকলের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বার বার ইহারই পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। দু-এক বার দুইজনের দৃষ্টি-বিনিময়ও হইল। অরুণ নিজের দৈন্য স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আলাপ করিতে সাহসী হইল না, চোখ নামাইয়া লইল। কিন্তু সুযোগ আপনা হইতেই সুলভ হইয়া দেখা দিল।

সেদিন কি-একটা ব্যাপার উপলক্ষে ছেলের দল ক্লাশের বাহির হইয়াছিল। কেহ বেড়াইতেছিল, কেহ গল্প করিতেছিল। আবার ফার্ষ্ট ইয়ারের কতকগুলি গুণ্ডা ছেলে পরস্পরের সহিত কলহ বাধাইয়া তামাসা দেখিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। নবাগত অরুণ এ সমস্ত দলের কোনটিতেই যোগ না দিয়া বাহিরে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া নিজ পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া পড়িতেছিল। তাহার হাত কয়েক দূরে কতকগুলি আমোদ-প্রয়াসী ছেলে একটি নূতন ছেলেকে লইয়া তখন গম্ভীর ভাবে রহস্য চালাইতেছিল। নূতন ছেলেটির বাড়ী বীরভূম। তাহার ভাষায় যথেষ্ট জড়তা ছিল, ইহাই তাহার অপরাধ। প্রথমটা সহপাঠিদের দুষ্ট মতলব সেও বুঝিতে পারে নাই, তাই সরলভাবে তাহাদের কথার উত্তর দিতেছিল; এবং ছেলের দল তাহার কথার সুরের উপর জোর দিয়া তাহাকে সমর্থন করার ভঙ্গীতে পরস্পরের পানে চাহিয়া হাসিয়া কৌতুকের ইঙ্গিত করিতেছিল। যেন এমন বেকুব তাহারা জন্মে আর কখনো দেখে নাই! বড়ই একটা মজার জানোয়ার! ছেলেটির নাম জগন্নাথ, পদবী নন্দন। এ তত্ত্ব তাহার পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়া রসিক কমলা লেবুর খোসা ছাড়াইতে গিয়া তাহাকে শুনাইয়া অথচ তাহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া কহিল, "হ্যাঁ হে ধীরু, জগন্নাথের নন্দনটি কে, বল্ দেখি ভাই? পুরাণ টুরাণে ত কই এঁর কোন খোঁজ-পাত্তা পাওয়া যায়নি! হঠাৎ ভুঁইফোড় রূপে এঁর আবির্ভাব দেখি যে!"

ধীরু ওরফে ধীরেন্দ্র নামোচিত ধীরতা রক্ষা করিয়া মিহি সুরে জবাব দিল, "মা—যা-ছিলেন, মা যা-হয়েচেন—মা-যা-হবেন। নন্দনটি এখনো জন্মান নি, মনে হচ্চে।" সতীশ পরমভক্তির অভিনয়ে মাথা নোয়াইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "বাবা জগড়নাথ চড়নে গড় হইচি।"

ছেলের দলে একটা হো হো হাসির কলরব উঠিল। সত্যব্রত জমীদারের ছেলে। মনে তাহার ধন-গর্ব্বও বিলক্ষণ ছিল। সে সাধারণ দলে না মিশিয়া একটু তফাতে

থাকিত। শান্তিপুরে ধুতির উপর ঢাকাই মসলিনের চুড়িদার পাঞ্জাবী ঝুলাইয়া সর্ব্বদাই ফিটফাট হইয়া আসিত। মাথায় সিঁথি, বাঁ হাতে সোনা-বাঁধান রিষ্ট ওয়াচ। চোখে সোনার চশমা। চেহারাটিও সুশ্রী। রোগাটে লম্বা গড়ন, ফর্‌শা! চুলগুলি পাতলা ও ধুসর রঙের হইলেও নরম—ঢেউ খেলানো থাকায় মুখখানি মানাইত বেশ। সে এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া আড় চোখে চাহিয়া বেচারী নন্দনের দুরবস্থা দেখিতেছিল ও মনে মনে হাসিতেছিল। এই ছেলেটির গর্ব্বিত ভাব ও গম্ভীর মুখ সহপাঠি-দলের চক্ষুশূল হইলেও এই পরম ধৈর্য্যশালী মানুষটিকে কেহ কখন রাগাইত বা তাহার গাম্ভীর্য্যের একচুল বাহিরে আনিতে পারিত না। আজ এমন একটা সরস আন্দোলনে যোগ না দিয়া সে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করায় রসিক মনে মনে ভারি চটিয়া গেল। নন্দনকে কাঁদ-কাঁদ দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া সত্যব্রতর প্রতি মনোযোগী হইল, কহিল, "ও মশাই, এদিকে আসুন।" ডাক শুনিয়া সত্যব্রত গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে দলের কাছে আগাইয়া আসিল। সত্যব্রত রসিকের মেসের ত্রিতলের বাসিন্দা। মেসের সব কিছু লইয়া রাতদিন খুঁত খুঁত করা তাহার স্বভাব, রসিক তাহা জানিত। সে কহিল, "আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনার এ কলেজের মেসটা অত্যন্ত সাদা সিদে!" কণ্ঠস্বরে তাহাকে অনুকরণ করিয়া তেমনিই অলস ভঙ্গীতে সতীশ কহিল, "ভারী সাদাসিদে আর নোংরার এক শেষ।" সত্যব্রত পরিহাস না বুঝিয়া কহিল,"ছেলেদের জন্য একটা আলাদা বস্‌বার ঘর, লাইব্রেরী ক্লাব এমন সভ্য জায়গাতে অন্ততঃ এগুলো সকল মেসেই আশা করা গেছল।"

ধীরেন্দ্র কহিল,"হচ্চে, হচ্চে, এত ঘাব্‌ড়াবে না মশাই! একটা কেন,প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা একটা করে ড্রয়িং রুম তৈরী হচ্চে যে। তার সাজ-গোজও সব এসে পড়েচে, লাল ভেল ভেট-মোড়া স্প্রীংয়ের কৌচ, কেদারা ইলেক্‌ট্রিক্ আলো পাখা—চমৎকার চমৎকার সব ছবি—"সত্যব্রত উদাস ভঙ্গীতে গড়ানো সুরে কহিল, "ওঃ, ঠাট্টা কচ্চেন বুঝি।"

"না,না। সে কি কথা! ঠাট্টা কর্‌তে পারি! আপনার কাছে একটু ঠাট্টা শুন্‌তে চাইছিলুম মাত্র। ঠিক্ এম্‌নিটি হলেই বোধ হয় আপনি খুসী হতেন,—না? আপনার অভ্যাস ছিল বোধ হয় এই রকমই সব!"

সত্যব্রত তেমনি ভাবেই উত্তর দিল, "না, এর চেয়ে অনেক বেশীই!" বিনয় বিনয়ে ভূমিতে নতপ্রায় হইয়া কহিল, "তাহলে দয়া করে আপ্‌নার পরিচয়টি দিয়ে এই সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে কৃতার্থ করবেন!"

সত্যব্রত গম্ভীর মুখে কহিল, "আমার বাবা চন্দনার জমিদার।"

"তাই না কি—" বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসিয়া রসিক কহিল, "আপনি ত তাহলে আমাদের জাতির আমাদের দেশের গৌরব, আমাদের কলেজেরও গৌরবের সামগ্রী। বাই জোভ, আপনার বাবা যে শীঘ্রই রাজা উপাধি পাচ্চেন,—রাজভক্তির চোটে আপনাকে দলে পেয়ে আমরা শুধু গৌরবান্বিতই হইনি, একেবারে ধন্য হয়ে গেছি!"

সত্যব্রত খুসী হইবে কিনা ভাবিয়া সন্দিগ্ধ

হইয়া কহিল,"আমার কাকা হচ্চেন সিভিলিয়ান, সি, সি, রায়।"

ধীরেন্দ্র বলিল, "তিনি আবার ঐ না কি যিনি কালা আদমী দেখলে ক্ষেপে ওঠেন। ওঃ, আপনারা ত তাহলে সব স্বনাম-ধন্য পুরুষ, —অদৃষ্ট-ফেরে এমন জায়গায় এসে পড়ে আপনার যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, পড়েচে তার সন্দেহ কি!" "বড়ই দুঃখের বিষয় সত্যব্রত বাবু। আপনার মত মানুষকে এমন সব জায়গায় থাকতে হয়—" বলিয়া ধীরেন্দ্র দুঃখিত ভাবে মুখ মলিন করিয়া রহিল। সত্যব্রত কহিল, "শীঘ্রই আমি বাসা নেব। রামঃ, এখানে কি বাস করা যায়?" এ সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও তাহার আত্মম্ভরিতায় আঘাত দিতে না পারিয়া আনন্দ-লোভী ছেলের দল তাহাকে ছাড়িয়া অন্যদিকে মনোযোগ দিতে গিয়া সহসা অরুণকে দেখিতে পাইয়া খুসী হইয়া উঠিল। এই ছেলেটিকে তাহারা কয়দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তবু ইহার বিশেষ পরিচয় কিছু লওয়া হয় নাই। আধ-ময়লা দেশী মিলের মোটা ধুতি ও টুইল সার্ট পরা ছেলেটিতে মনোযোগের মত অন্য কিছু না থাকিলেও এমন কিছু ছিল যাহাতে অনেক ছেলের মধ্য হইতেও বিশেষ করিয়া তাহার দিকেই আগে চোখ পড়ে। সুন্দর তরুণ মুখ—তাহাতে বিষাদের একটি করুণ ছায়া মাখানো—দৃষ্টিমাত্রই মনকে আকৃষ্ট করে।

রসিক কহিল, "আপনাকে নূতন দেখচি না?"

অরুণ নম্রভাবে কহিল, "আমি অল্পদিনই ভর্ত্তি হয়েছি।" ইহাকে কিভাবে আক্রমণ করা হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ পথটিই সে বাছিয়া লইল, কহিল, "আপনার এখানটা কেমন লাগ্‌চে, বলুন দেখি! বিশেষ আমাদের হতভাগা নোংরার একশেষ এই মেশটা?" কথাটা তামাসার হিসাবে বলিয়া বলা তাহাতে মিথ্যার ভাগ অল্পই ছিল। অরুণ কিন্তু নিজ বিশ্বাস-মত মৃদু হাসিয়া কহিল, "বেশ ত! কলেজের পড়ানোও খুব ভাল।"

ধীরেন্দ্র কহিল, "ওঃ পড়ার কথা যদি বল্লেন মশাই, তাহলে বলি, পড়ানো যদি বল্‌তে হয় ত এ কি আবার পড়ানো, না পড়া। এ একটা আড্ডা-বাড়ী বৈ ত নয়।"

বিনয় সবিনয়ে কহিল, "ওঃ আপ্‌নি বুঝি একজন ভাল ছেলে।" কথাতে হাসিবার কি ছিল বোঝা গেল না, ছেলেরা কিন্তু পরস্পরের মুখ চাহিয়া হাসিতে লাগিল। লজ্জা ও অপ্রতিভ হওয়ায় অরুণের মুখখানা সকালবেলাকার অরুণের মতই লাল হইয়া উঠিল। ছেলেরা যে তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে ইহা বুঝিয়া সে ব্যথিতও হইল। মনে হইল, গরীব বলিয়াই তাহাদের তাহার প্রতি এ আক্রমণ। সত্যব্রতর ক্ষণপূর্ব্বেকার দুরবস্থা সে লক্ষ্যও করে নাই, করিলে এ ভ্রম তাহার জন্মিত না।

এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার কয়েকখানি এক্‌সার্‌সাইজ বুক। সে বোধ হয় খাতা কিনিতেই বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় সপ্তরথী-বেষ্টিত বিপন্ন বিব্রত অভিমন্যুর অবস্থাপন্ন অরুণকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপার বুঝিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

এক একটা মানুষের মধ্যে কেমন এক প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য থাকে, যাহাতে অনিচ্ছাতেও লোকে তাহাকে ভয় করে। প্রফুল্ল ছেলেটিকে সহপাঠিদলে মনে মনে একটুখানি যে ভয় করিত—সে কথা আগেই বলিয়াছি। তাহার আবির্ভাবে ছেলের দল নিমেষে ভাল মানুষের মত যে যাহার কাজে ব্যস্ত হওয়ায়—অরুণ কৃতজ্ঞ চোখে পরিত্রাতার পানে চাহিয়া দেখিল। তাহার ভয় হইতেছিল। এখনি যদি উহারা তাহার বংশাবলীর বিবরণ শুনিতে চায়। আত্ম-পরিচয় দেওয়াই যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ।

প্রথম আলাপেই প্রফুল্ল এমন সহজ ও সঙ্কোচহীন ভাবে তাহাকে কহিল, "আসুন, ক্লাশে গিয়েই একটু গল্প-সল্প করা যাক্—" যে অরুণ এতটুকু দ্বিধা না করিয়া খুসী মনেই তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

সেদিন ক্লাশের ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই প্রফুল্লর সহিত পড়াশোনা সম্বন্ধেই অরুণের অনেক কথা হইয়া গেল। অরুণ দেখিল, প্রফুল্লর পাণ্ডিত্য, তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, বহিঃ-সংসারের জ্ঞান তাহার চেয়ে অনেক বেশী। সে বিস্তর বই পড়িয়াছে। সম্প্রতি সে জার্ম্মান্ শিখিতেছে। ফ্রেঞ্চ লাটিন প্রভৃতি আরও কিছু কিছু শিখিবার তাহার ইচ্ছা আছে। এ সব তত্ত্ব অবশ্য একদিনেই অরুণের আয়ত্ত হয় নাই, ক্রমে হইয়াছিল। তবে সেইদিনই প্রফুল্ল অরুণকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্লাশে ধীরেন্দ্রকে একটা ধাক্কা দিয়া রসিক হাসিয়া কহিল, "বেড়া নীচু দেখ্‌লেই মানুষের ডিঙ্গুতে সাধ যায়। প্রভুত্বের নেশা এমনি!" বলিয়া যে পর পর প্রফুল্ল অরুণের পানে চাহিয়া রসিকতার ভাবে মুচ্‌কিয়া হাসিল। তাহাদের দলের মধ্যেও একটা চাপা হাসির হিল্লোল অর্দ্ধব্যক্তরূপে বহিয়া গেল। প্রফুল্ল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও অরুণের চোখে তাহা এড়াইয়া গেল না। লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহার মুখ আবার রাঙা হইয়া উঠিল।

কিশোরী বিনয়ের পানে চাহিয়া অরুণকে শুনাইয়া মৃদু কণ্ঠে সুর করিয়া আবৃত্তি করিল,

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচভরে, একধারে সরে আছে
ছুঁয়োনা উহারে কেহ, রাখ মোর কথা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সাহিত্যের প্রাণ

(১)

প্রকৃতির গুপ্ত সম্পদ্ কোনো প্রচ্ছন্ন পরিত্যক্ত স্থানে নাই, আছে মানবের হৃদয়ে। এই যে সৌন্দর্য্য যাহার পিপাসায় মানুষ এত কাতর, তাহাও তাহার অন্তরে। মন আপনার ভিতরের রসের আবেশে সকল দৃশ্য সুন্দর করিয়া তুলে ও দেখে; বাহিরের নিসর্গ চিত্রাবলী চিত্তের মূলে আঘাত করিয়া তাহাকে সজীব, সজাগ ও উন্মুখ করে মাত্র; অর্থাৎ মন যাহা দেখে, তাহা আপনার ভিতর

হইতে দেখে, পরন্তু, দেখিবার যে চেষ্টা, তাহাকে প্রকৃতি কেবল বাড়াইয়া তোলে,—মন দর্শক, প্রকৃতি প্রণোদক। মানস-তটিনীর উৎস কোথায় কেহ তাহা জানে না, কিন্তু তার আবেগ-উচ্ছ্বাস সকলের কাছে ধরা পড়ে। এই সব আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূলে তৃষ্ণা; এই তৃষ্ণা নানাভাবে আসিয়া মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, মিলন-লাভের তৃষ্ণায় প্রণয়, সত্যলাভের তৃষ্ণায় জ্ঞান; সৃষ্টি করণের তৃষ্ণায় শিল্প, আরও কত প্রকারের তৃষ্ণা আছে, তার ইয়ত্তা নাই। যে অনন্য প্রেরণায় সাহিত্য-শিল্প জীবন লাভ করিয়াছে, তাহাও হৃদয়ের এক উদ্দাম পিপাসা—সেটি শুধু আত্মপ্রকাশ করিবার প্রবল বাসনা, মানুষের ভাবনা-বেদনা, জল্পনা-, কল্পনা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাহা কিছু তার নিজস্ব, তাহা সে অন্যকে জানাইতে চায়! এই যে অন্যকে জানাইবার চেষ্টা, শুধু অন্যকে জানিবার ও অন্যের সহানুভূতি পাইবার ইচ্ছায়, অর্থাৎ জানান শুধু জানিবার জন্য, প্রদান শুধু আদানের লোভে, বিশ্বাস-স্থাপন শুধু অন্তরঙ্গতার বিনিময়ে। মানুষ স্বভাবতঃই সঙ্গপ্রিয়; আত্ম-গোপন করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ; আত্মজ্ঞাপন করা তার স্বভাবসিদ্ধ, একমত বা একচিত্ত হওয়া তার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। সমাজ এই মিলন-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান-ভূমি, সাহিত্য ইহার ইতিহাস। স্বাভিব্যক্তির যে চেষ্টা, তাহা নানাভাবে, নানা পন্থায়, নানামূর্ত্তিতে মানুষের সমাজে, শিল্পে, বিশেষতঃ সাহিত্যে দেখা দিয়াছে ও দিতেছে। আত্মপ্রকাশের গতিবেগ বিচিত্র, ধারা বিচিত্র, ভঙ্গী ও পদ্ধতি বিচিত্র, তাই সাহিত্যের রূপ বিচিত্র, রীতি বিচিত্র, আদর্শ বিচিত্র। কাব্য, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিবিধ রূপ বা অঙ্গ মানুষের বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার প্রবাহিকা বা পথ মাত্র। হৃদয়গত ভাব ও অনুভব এবং তাহাদের প্রকাশের চেষ্টা যতই গভীর ও সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, কাব্য, নাটক প্রভৃতি প্রণালী-সমূহ ততই উন্মুক্ত ও প্রশান্ত হইয়া পড়ে।

সাহিত্য জীবন-ব্যাপারের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনা মাত্র, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইহার ভিত্তিভূমি। মানুষ যাহা তার নিজের জীবনে দেখিয়াছে, ভাবিয়াছে, ভোগ করিয়াছে, তাহারই জীবন্ত ইতিহাস—সাহিত্য। এক কথায়, মানুষকে জানাই সাহিত্যের বিষয় ও লক্ষ্য; কিন্তু মানুষ যাহা করিয়াছে, শুধু তাহা দিয়া তাহাকে জানা যায় না; কারণ মানব-জীবন কতকগুলি কাজের সমাবেশ মাত্র নহে। একদিকে মানুষ যেমন কাজ করে, অন্যদিকে সে তেমনি কত বড় বড় আদর্শ মনে-মনে ভাঙ্গে-গড়ে; যাহা আছে তাহা ধরিয়া বসিয়া থাকে না, যাহা নাই তাহাও চায়, তারও সন্ধানে ফিরে, বাহিরে তার কর্ম্ম, অন্তরে তার সুখ-স্বপ্ন। কিন্তু কর্ম্ম অপেক্ষা তার স্বপ্ন বেশী, শক্তি অপেক্ষা তার আশা বেশী; তার কর্ম্মের সীমা আছে, কিন্তু স্বপ্নের সীমা নাই। সে বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতের দিকে, বাস্তব ছাড়িয়া আদর্শের দিকে সততই ধাবমান্। এখন মানুষকে বুঝিতে হইলে, তার কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে যে প্রাণ-শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহারই সন্ধান লইতে হয়; সেই প্রাণ-শক্তি আর কিছুই নহে, কেবল তার মহতী আশা, উচ্চ আদর্শ। মানুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ত্তব্য, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সভ্যতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি যাহা-কিছু তার প্রাণের জিনিস ও

তার কাছে খুব বড় জিনিস, তাহা সবই এক একটি আদর্শ হইতে প্রসূত ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য এই আদর্শগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে। এ জগতে সব জিনিস চলিয়া যায়, কিন্তু আদর্শ রহিয়া যায়; এমন কি, মানুষ মরিয়া যায়, আদর্শ বাঁচিয়া থাকে। সাহিত্য চিরস্থায়ী আদর্শকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া সর্ব্ব-গত, সর্ব্বপ্রিয় ও নিত্য, ইহা অলীক কল্পনার ক্রিয়া নহে, অক্ষয় আদর্শের আশ্রয় বা নিদর্শন। কোন্ প্রাচীন যুগে মানুষ সত্য ও সৌন্দর্য্যের সুন্দর উজ্জ্বল ছবি স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এবং স্বপ্নের ঘোরে সেই ছবিকে নশ্বর প্রস্তরে, চিত্রে ও সাহিত্যে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনও সেই চেষ্টা মানুষকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। যে জাতি এই দুইটি মহান আদর্শের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, যে জাতি ওই স্বপ্নের দ্বারাই গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, রামায়ণ ও মহাভারতের "মানুষ" যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেই স্বপ্নেই ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে। সে স্বপ্ন এক অমর অলৌকিক স্বপ্ন। সেই স্বপ্নে ভারত জানিতে পারিয়াছিল যে, মানুষ তার পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ লইয়া দেবতা হইবে, এ যেন ঘন মেঘমালার মধ্যে নির্ম্মল আলোকের ন্যায়, চিন্তাতপ্ত প্রাণে শ্রান্ত হৃদয়ে উজ্জ্বল আশার স্বপ্ন। মানুষ যুগে যুগে আদর্শকে কল্পনা করে, আদর্শ আবার মানুষকে বা তার জাতীয়তাকে গঠন করে। এই আদর্শ,—যাহা সমাজ-তরুকে উন্নত করে,জীবন-বৃন্তকে পুষ্পিত করে,—ইহাই সাহিত্যের জীবনী-শক্তি। অতি কঠিন বাস্তব-জীবন ইহার দেহ—ভাবময়ী ছন্দময়ী ভাষা ইহার পরিচ্ছদ, সুখ-দুঃখ-খচিত দৈনন্দিন জীবনে ও তার সুগভীর জ্ঞানে ইহার মূল, উচ্চ ভাব বা আদর্শের সংরক্ষণে ইহার পরিণতি, ভাষার সৌন্দর্য্যে ও অবাধ গতিতে, ছন্দের লীলা তরঙ্গে ও বৈচিত্র্যে রূপ ও আভরণ। সাহিত্য জাতীয় আদর্শের সাক্ষ্য দেয়, জীবন ও তার স্বপ্নের কাহিনী গায়। ইহা যতই রহস্যময় বিপুল মানব-জীবনের উপরের আবরণ খুলিয়া তার সুগভীর গহনে নামিয়া তার সুখ-দুঃখ, সত্য-অসত্য ও মনুষ্যত্বের স্পর্শলাভ করিতে ও প্রকাশ করিতে পারে, ততই ইহা প্রাণান্বিত হইয়া ওঠে। এই জীবন্ত সাহিত্য অনুজ্জ্বল, নীরস, সাধারণ জীবনের ক্ষীণ ও সঙ্কীর্ণ বাস্তবতা ও অসমতা পশ্চাতে ফেলিয়া বিস্তৃত উদার চরিত্রের অভিমুখে মানুষকে লইয়া যাইতে পারে;—ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তিকে মহতের সম্মুখে পৌছাইয়া দিতে পারে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার।

অভিভাষণ*

য়ুরোপে আমি সমাদর পেয়েছি এবং য়ুরোপকে আমি সমাদর করেছি, কিন্তু হৃদয় আমার উৎকণ্ঠিত ছিল ভারতের জন্যে। শিশুকাল থেকে ভারতের আকাশ দুই চক্ষু ভরিয়ে আমার মনকে যে-আলোক পান করিয়েচে তার তৃষ্ণা আমার মনে নিয়ত জেগে ছিল; আর যারা আমার আপন দেশের লোক, তাদের কাছ থেকে প্রীতি পাবার যে-আকাঙ্ক্ষা সে কি আমার মিটেচে, কিম্বা কোনোকালে মিটবে? তাই অনেক-দিন পরে দেশে ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ করলেম এ আমার কাছে উপাদেয়।

আমার বয়স যেদিন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছিল সেদিন আমার যা-কিছু সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি সে ত এই বাংলা দেশের সীমানা পার হয় নি। কিন্তু সেদিন এই বাংলা-সাহিত্যপরিষদই আমার সম্বর্দ্ধনা করে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সে কথা আমি ভুলব না। কেননা সেদিন আমার একমাত্র পরিচয় বাংলা ভাষার মধ্যে বাঙালীর কাছে, অর্থাৎ সে ছিল আত্মীয়ের পরিচয় আত্মীয়ের কাছে। এই অতি-নিকটের পরিচয়ে সকল সময়ে সুবিচারের আশা থাকে না; যে বরমাল্য পাওয়া যায় তাতে কারো-কারো ভাগ্যে ফুলের চেয়ে কাঁটার অংশই বেশি থাকে; এবং যেহেতু তা আত্মীয়ের হাতের দান এইজন্যে তার মধ্যে যে পীড়া থাকে তার বেদনা দুঃসহ। তাই সেদিন সাহিত্যপরিষৎ আমাকে উপলক্ষ্য করে যে কবি-প্রশস্তি-সভা ডেকেছিলেন সে আমার পক্ষে যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের বিষয় হয়েছিল। সেদিন এই পরিষদের কাণ্ডারী ছিলেন আমার পরমবন্ধু স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর বুদ্ধির গভীরতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য দুইই ছিল অসামান্য; সেদিন তিনিই বাঙালীর প্রতিনিধি-রূপে এই বরণ-সভা আহ্বান করেছিলেন, এই আনন্দ এবং গৌরব সকলের চেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। জনসভার অনেক অংশই আনুষ্ঠানিক, প্রায় তা কাঠ-খড়েই তৈরি, একদিন তার সমারোহ, পরদিন তা বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দেবার যোগ্য। কিন্তু সেই আমার বন্ধুর নির্ম্মল হাস্যে এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সেদিনকার সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ বাণীর মধ্যে আমার পক্ষে এই আশ্বাস ছিল যে এই প্রীতি বর্ত্তমানের সমস্ত বিরোধ-বিদ্বেষ, সমস্ত কলহ-কলুষের উপরকার জিনিষ, এই প্রীতি সেই ভবিষ্যতের যা বাহির থেকে নিকটের মানুষকে দূরে নিয়ে গিয়ে অন্তরের দিকে তাকে নিকটতর সত্যতর করে। আজ তিনি স্বয়ং শাশ্বতলোকে গমন করেচেন, সেখান হতে তাঁর প্রসন্ন হাস্যের অভিনন্দন আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত

দশ বৎসর হয়ে গেল। এখন আমি ষাট উত্তীর্ণ হয়েচি। সাহিত্য-পরিষদে আজ আপনাদের এই অভিভাষণ কিসের উপলক্ষ্যে? আজ এখানে কেবল স্বাদেশিক আত্মীয়-সভার মঙ্গলাচরণ নয়। ভৌগোলিক ভাগ-বিভাগের দ্বারা মানুষের যে আত্মীয়তা খণ্ডিত আজ সেই আত্মীয়তার চতুঃসীমানার মধ্যে এই সভার অধিবেশন বসেনি। যে আত্মীয়তায় আত্মপরের বিচ্ছেদ, দূর-নিকটের ভেদ-ব্যবধান দূর হয়ে যায় আজ সেই আত্মীয়তার মাল্য আপনারা আহরণ করেচেন এই কথাই আমি মনে অনুভব করতে চাই।

আপনারা হয়ত মনে ভাবেন যে, দেশের সাহিত্যকে আমি বিদেশে যশস্বী করে এসেচি, দেশের লোকের কাছে আজ সেই দাবীতেই আমার বিশেষ সম্মান। কিন্তু এই যশকে আপনারা খুব বেশি বড় করে দেখ্‌বেন না। আমি নিজে, সকলের চেয়ে যেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি, সে এই সাহিত্যের যশ নয়। য়ুরোপে আমার কাছে যারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেচে তাদের অনেকেই সাহিত্যরস-ব্যবসায়ীদলের কেউ নয়। তারা কেবলমাত্র সাহিত্যের বাজার যাচাই করে আমাকে যশের মূল্য চুকিয়ে দেয় নি, তারা আমাকে প্রীতি দিয়েচে যা সকল মূল্যের বেশি। অর্থাৎ তারা ওস্তাদ বলে আমাকে শিরোপা দিয়ে বিদায় করেনি, তারা আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেচে। সেই আত্মীয়তা নিয়ে আত্মশ্লাঘা করা চলে না, তাকে নিয়ে নম্র মনে আনন্দ করাই যায়।

দ্বিজত্ব লাভ করবার একটি তত্ত্ব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাতে এই কথা বলে, যে, মানুষের প্রথম জন্ম নিজের অহঙ্কারের ক্ষেত্রে। সেই "আমি"র ক্ষুদ্র সীমার আবরণ ও বন্ধন ভেদ করে মানুষ যখন অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে অসীমের মধ্যে জন্মলাভ করে তখনই হয় তার দ্বিতীয় জন্ম। যেমন অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে তেমনি সংসারের মধ্যেও মানুষের দুটি জন্ম। একটি হচ্চে নিজের দেশের মধ্যে, আরেকটি সকল দেশে। এই দুটি জন্মের সামঞ্জস্যেই মানুষের সার্থকতা। নিজের হৃদয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বের মিলন সাধন করাতে পারলে তবেই হৃদয়ের মুক্তি।

পঞ্চাশোর্দ্ধে, সংহিতাকার যখন বনব্রজনের ব্যবস্থা করেচেন, সেই সময়ে আমি পশ্চিম-মহাদেশে গিয়ে পৌঁছলেম। দেখ্‌লেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখ্‌লেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্ব্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, কর্ম্মগত কোনো দায় নেই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায় তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্ব্বাদ লাভ করেচি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেচি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ববাণীর প্রসন্নতা লাভ করেচি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষ-ভাবে আনন্দ করচেন।

ভেবে দেখ্‌বেন, এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপনটুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট তখন সে বিশ্বের অগোচরে থাকে। এই বিশ্বের

অগোচরতা একটি মস্ত কারাপ্রাচীর। সঙ্কীর্ণ-বাসের অভ্যাসে একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলেই থাকি। হঠাৎ যখন একটা বন্ধ দরজা কোনো একটা হাওয়ায় খুলে যায় তখন মন খুসি হয়ে ওঠে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যে-আবিষ্কার নিয়ে প্রথম বিশ্বসভার আহ্বান পেলেন, তাঁর সে আবিষ্কার যে কি তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এখনো স্পষ্ট করে বোঝেনি—কিন্তু দেশের মন হঠাৎ খুসি হয়ে উঠ্‌ল। তার কারণ এই যে,একদিকের দরজা খুলে গেল। সহসা অনুভব করলেম যে, আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই ; আমাদের প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের হাওয়ার, মনের সঙ্গে বিশ্বের আলোর সুগভীর যোগ আছে। স্বাদেশিক প্রাচীরের বন্ধ জান্‌লা খোলবামাত্র হঠাৎ সামনে দেখতে পাই সর্ব্বজন-বিধাতার রূপটি। এই রূপটি দেখবার জন্যেই আমাদের মানব-জন্ম।

সাহিত্যের কলা-কৌশল বিচার করে আমার লেখার কি মূল্য সে কথা দূরে রেখে আজ আমাকে এই গৌরবটুকু ভোগ করতে দিন যে, আমার গানে বা অন্য রচনায় সর্ব্বজন-দেবতার রূপ হয়ত কিছু প্রকাশিত হয়েচে, সেইজন্যেই অন্য দেশের লোকে আমাকে আপন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই নিখিলদেবের সাধন-মন্ত্র ভারতের কবির কানে পৌচেছিল কোথা থেকে? ভারতবর্ষেরই তপস্বীদের কাছ থেকে। তাঁরাই একদিন বলেছিলেন, "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা-মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বজনের হৃদয়-বাসী সেই দেবতাই মহাত্মা ; এবং তিনি বিশ্বকর্ম্মা অর্থাৎ তাঁর সকল কর্ম্মই বিশ্বের কর্ম্ম, ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়।

আজ আপনাদের যে-আতিথ্য লাভ করচি এ আমি একলা নিতে পারবনা। কেন-না একলা আমি কোনো আতিথ্য কোনো সমাদরের যোগ্য নই। আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না ; বল্‌বেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ। যখন পশ্চিমে ছিলেম তখন গৌরব করে সকলকে বলেচি, আমি আমার মাতৃ-ভূমির নিমন্ত্রণপত্রের ভার নিয়ে এসেচি। বলেচি, যেখানে মাতার অমৃত অন্নের পরিবেষণ হয় সেইখানে এস। এসেছিলে একদিন আমাদের কয়লার খনিতে, আমাদের পণ্যের হাটে। যা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছ তাই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঈর্ষার আগুন জ্বলচে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহে তোমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র কাঁটাবনের জঙ্গল হয়ে উঠেচে। আজ এস সেই ভাণ্ডারে, যেখানে অন্ন ভাগ করলে তার ক্ষয় হয় না।

য়ুরোপে শুনে এলেম কত জ্ঞানী গুণী সাধক বল্‌চে তাদের আত্মা ক্ষুধিত। তারা খুঁজচে শোকের সান্ত্বনা, ক্ষতবেদনার শুশ্রূষা। এই সন্ধানে যদি তারা পূর্ব্বমহাদেশে যাত্রা করে তবে যেন দেখ্‌তে পায় আমাদের দ্বার খোলা আছে। আমরা যেন না বলি, "আমরা নিজের ভাবনায় মরচি, পর আমাদের কাছে আজ অত্যন্ত পর, হৃদয় আমাদের বিমুখ।" এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়ে ছিলেম ভিক্ষা করবার জন্যে, তাতে

লজ্জার পর লজ্জা পেয়েছি, অভাব পূরণ হয়নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা করব না, সে ত ভাল কথা। কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য করবনা, তবে আরো বেশি লজ্জা। ভিক্ষায় যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে দীনতা তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভিক্ষায় যে আত্মাবমাননার অপরাধ তারও অভিশাপ আছে, আর অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা তারও অভিশাপ কঠিন। আমাদের পিতৃঋণ শোধ হবে কি করে? পিতৃগণের কাছ থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েছি সে কি কেবল আমাদের নিজেরই জন্য? সে কি আমাদের ন্যস্ত ধন নয়? আমরা যদি বিশ্বের কাছে তার পূর্ণ ব্যবহার না করি তবে তাতে করে আমাদের পিতামহদের অগৌরব।

শকুন্তলা ছিলেন তপোবনের কন্যা। সেই তপোবনের কুটীর-দ্বারে বসে তিনি আপনজনের কথাই ভাবছিলেন, বিশ্বজনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ভোলবার কারণ ছিল, কেননা কঠিন দুঃখে তাঁর মন ছিল অভিভূত। এমন সময় অতিথি এল তাঁর দ্বারে, বল্‌লে, "অয়মহং ভোঃ।" সে ডাক কানে পৌঁছলনা। তখন তাঁকে বাইরের শাপ লাগল, অসম্মানিত অতিথির শাপ। সে শাপ এই যে, যে-আপনজনের ভাবনায় তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে সেই আপন-জনকেই হারাবে। বিশ্ব যদি আজ আমাদের দ্বারে এসে বলে "অয়মহং ভোঃ" তবে কি আমরা বল্‌তে পারি যে, "আজ নিজের ভাবনা কঠিন হয়ে উঠেচে, অন্যমনস্ক আছি?" এ জবাব খাটবেনা। নিজের দুঃখধন্দার তাড়ায় বিশ্বকে যে ফিরিয়েচে বিশ্বের শাপ তাকে লাগবেই—তার আপনটুকু কেবলি ক্ষীণ হবে, আচ্ছন্ন হবে, নষ্ট হবে। যে-সব জাত বিশ্বের অগোচরে নিজের মধ্যে বদ্ধ তারা নিজেকে হারিয়ে বসে আছে, অথচ এত বড় ক্ষতি অনুভব করবার শক্তি পর্য্যন্ত তার লুপ্ত হয়েচে।

যখন সাহিত্য-রচনায় আমি নিবিষ্ট ছিলেম তখন বাহিরের কোনো সহায় আমার দরকার ছিলনা। কবির আসন নির্জ্জনে। সেখানে অনাদরে ক্ষতি করে না, বরঞ্চ জনাদর অনেক সময় মত্ত হস্তীর মত সরস্বতীর পদ্মবনের পঙ্ক উন্মথিত করে' তোলে। কিন্তু যজ্ঞ ত একলা হয় না। তাতে সর্ব্বলোকের শ্রদ্ধা ও সহায়তা চাই। ঘরে যখন উৎসব তখন বিশ্ব হন অতিথি। এইজন্যে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই এই কাজকে আপনার কাজ বলেই গ্রহণ করেন। কর্ম্মকর্ত্তা দরিদ্র হলেও সেদিন দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলেন, "এস, এস!" কিসের জোরে বলেন? সকলের জোরে। দেশের হয়ে আমিও আজ একটি যজ্ঞের ভার নিয়েচি। সত্যের সাধনায় আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবার জন্যে। সেই জন্যেই আজ আপনাদের কাছ থেকে আমি যে-অভ্যর্থনা পাচ্চি এ'কে আমি কবির অভ্যর্থনা বলে একলা গ্রহণ করতে পারবনা। এই অভ্যর্থনাকে ভারতের নবযুগে অতিথি-সমাগমের প্রথম মঙ্গলাচরণরূপে আমি সকল আগন্তুকের হয়ে গ্রহণ করচি—আপনাদের সকলের সহযোগে মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে বিশ্বচিত্তের একটি মিলনাসন প্রতিষ্ঠিত হোক্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভীম-জননী

[ভীম-জননী কুন্তী যখন পঞ্চপুত্রসহ একচক্রাপুরে অজ্ঞাত-বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে একচক্রার রাজচক্রবর্ত্তী বক-রাক্ষসের নিয়মে প্রজাদের ভিতর হইতে প্রতিদিন এক-এক জনকে রাজার আহার্য্য হইতে হইত। কুন্তী যে গৃহে ছিলেন একদিন সেই গৃহের সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারেন যে, সেদিন ঐ পরিবারের মধ্যে কোনো-একজনের রাক্ষসের মুখে যাইবার পালা। কুন্তী আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীকে অনেক বুঝাইয়া নিজ পুত্র ভীমকে বকের কাছে পাঠান।]

গায়ের রোয়াঁ যায় না ছাখা, সন্ধ্যা হলো, রাত্রি আসে ;
কুয়াসা কি জমাট ছাখো, একটি তারাও নেই আকাশে !
পাখীর ডাকা ঘুমিয়ে গেল, ঝিঁঝির ডাকা ঝিমিয়ে জাগে ;
ডাল্-পালাতে অন্ধকারের অন্ধ হাওয়ার উছট্ লাগে।
শব্দ কি ও ? ভীম কি এলো ?···কেউনা, বুঝি নেকড়ে তবে—
সাঁঝ না হ'তেই গাঁয়ের পথে শুক্‌নো পাতায় ফিরচে, হবে।
ব্রাহ্মণেদের বাস্ত এ গ্রাম বাণের শঙ্কা নাইক মোটে,
তাই শীকারের অন্বেষণে জনপদেও আপদ জোটে।
নাই সাহস একচক্রাপুরে ধরতে ধনুক কেউ না জানে,
নইলে কি বক-রাক্ষসে রাজচক্রবর্ত্তী মান্‌ষে মানে ?
পালা ক'রে গাঁয়ের লোকে রাক্ষসে স্বায় মানুষ খেতে,
শকট ভ'রে অন্ন জোগায় প্রত্যুষে হায়, প্রত্যেকেতে।
পালা এল এই ঘরে আজ কান্নারোলের মধ্যিখানে—
ঠাঁই দিলে যে নিরাশ্রয়ে রাক্ষসে আজ তাদের টানে।
মাথা গুঁজে যাদের ভিটায় নির্ব্বাসনের ক্লেশ ভুলেছি,
তাদের মুখে কী শুনি আজ ?···চম্‌কে গেছি, চম্‌কে গেছি !
রাজায় প্রজায় খাদ্য-খাদক ! কেমন রাজা ! কেমন প্রজা !
এ অনাচার সয়না প্রাণে স্পষ্ট ব'লে দিলাম সোজা।
কাঁচা মাথা খাজ্‌না নেবে ? এই কি, ছি ছি, রাজার রীতি,
নইলে পরে শাস্তি দেবে জ্বালিয়ে ভিটা জাগিয়ে ভীতি !
চম্‌কে গেলাম ব্যাপার শুনে, অনার্য্য এ, অনার্য্য এ ;
অব্রহ্মণ্য ব্রহ্মাবর্ত্তে ! ব্রাহ্মণেরে বুঝিয়ে ক'য়ে—
উপরোধে পথ রুধে তার,—অনুরোধের আঁচল গলে,—
বন্ধ ক'রে দিলাম যাওয়া ; পাঠিয়ে দিলাম তার বদলে

ভয়-বিজয়ী ভীমকে আমার আশীর্ব্বাদের কবচ দিয়ে,
ধনুর্ব্বাণে সাজিয়ে নিজে বীর যে এ মোর পীযূষ পিয়ে।
বনবাসের দুর্গ যে মোর, মত্ত হাতীর বল যে ধরে,
বুকের প্রতিমল্ল যে বীর, পাঠিয়েছি সেই বৃকোদরে।
জয়ী হবে পুত্র আমার মুখ তুলে চান্ দেব্‌তা যদি,
হবে সে একচক্রাপুরের চক্রবর্ত্তী দৈত্যে বধি'।

ঠাকুর! ঠাকুর।...চ্যাঁচায় প্যাঁচা!...বুকের ভিতর মুচ্‌ড়ে ওঠে,
গায় কাঁটা ছায়...ভীমকে আজি পাঠিয়েছি রাক্ষসের কোটে।
বালাই!...বালাই!...কি ছাই ভাবি...ডেকেছে কর্ত্তব্য তাকে,
নিত্য ভয়ে ছায় যে অভয় বিপদে তায় দেব্‌তা রাখে।
তাজা বুকের রক্ত যে চায় খাজনারূপে প্রজার কাছে,
কাঁচা মাথার মজ্জা যে খায়, নিত্য নরমাংস যাচে,
তার দাবীতে সই দিয়ে লোক বেঁচে মরে রয় কি ক'রে
কেমন ক'রে বাঁচে মানুষ কাঁটার শেযে সাপ-শিয়রে!
শুনেছি ক্রূর রক্ষা করে এ গ্রাম পর-চক্র হ'তে
গলাতে কেউ নারে মাথা হেথায় নাকি কোনোই মতে;
পারে না কেউ দাঁত বসাতে এম্‌নি নাকি জলুস্ দাঁতে,
প্রজার মাথা খরচ শুনি দাঁতের জলুস রক্ষা-খাতে!
শাসন কড়া, শাস্তি চরম, যেমন শাস্তি যমের ঘরে,
রাক্ষসের এই রাখালীতে জীয়ন্তে লোক রয় রে ম'রে।
পরের চক্র ব্যর্থ করার বেতন বড় নিচ্ছে বেশী,
তপস্বীদের খাচ্ছে মাংস পশুর মতই এ রাজ-বেশী।
পালা ক'রে প্রাণ দিতে যায় অজগরের-দৃষ্টি-জরা,
বরাদ্দ রোজ একটি মানুষ!—রাক্ষসের কী রক্ষা করা!
বাঁধা-বিধান নিত্য-সেবার আজ ছেলে যায় কাল্‌কে পিতা,
নইলে ঘটায় অনর্থ হায়, ঘরে ঘরে শোকের চিতা।
নাই মানুষ একচক্রাপুরে, এমন নিদেশ নইলে মানে?
খাজ্‌না নেবে ছেলের মাথা মানুষ হয়ে সইবে প্রাণে!

ভীম গিয়েছে...তার কাছে আজ...আপ্‌নি দিতে গ্রামের দেয়;
আমার ছেলে,...বীর সে...ছুঁতে পারবে না কেশাগ্র কেহ।

মূর্ত্ত পাতক মানুষ-খাদক নষ্ট হবেই ; দেবতা আছে ;
ধর্ম্ম্য ক্রোধের দীপ্ত পাবক পারবেনাকো ভীমের কাছে।
জয়ী হ'য়ে ফিরবে ছেলে, দিব্য চোখে দেখ্ছি আমি,
শুন্ছি কানে জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি আস্‌ছে নামি।
সংশয়ে মন স্থায়না আমল্, স্থায়নাক ঠাঁই আশঙ্কারে,
ব্যথাই পেলাম, পেলাম না ভয় যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে।
যতই আমায় দুষ্‌ছে লোকে, বল্‌ছে যতই দুঃসাহসী,
টল্‌ছে না মন আজ সে যেমন অত্যাচারের মৃত্যু-অসি।
আজ সে যেন বিধির বজ্র, স্বয়ং জোগান্ বল বিধাতা,
আজ দেখেছি ছেলের দেহে অভয়-ব্রতী অভয়-দাতা!
তাই পেরেছি পাঠিয়ে দিতে মূর্ত্তিমন্ত মৃত্যু-মুখে,
অন্যায়ে যার প্রতিষ্ঠা তার করতে পরথ দুর্গে ঢুকে।
পাঠিয়েছি আজ কিশোর পুত্রে ক্রূরের ঘরে কৃপাণ-পাণি,
প্রাত্যহিকী হত্যালীলা দেখ্‌তে নারি ক্ষত্রিয়াণী।
সর্ত্তে বেঁধে শুষ্‌বে রক্ত!...রাজস্বে প্রাণ করবে দাবী!
আতঙ্কে লোক সঙ্কুচিত নরলোকে নরক ভাবি'!
অনার্য্য এ রাক্ষসী রীত্...এর সাথে নয় কোনোই রফা,—
অজগরের গরাস হ'য়ে পাংশু-মুখে ইষ্ট জপা।
হ'ক না সে একচক্রাপুরে দৈত্য একছত্র প্রভু,
পরের চক্রে বাঁচায় ব'লেই কুক্রিয় নয় মান্য কভু!
মানুষ যে খায় মান্‌বনা তায় অন্যায়ে সে কায়েম করে,
নিত্য পাপে সিক্ত সে নীচ বিধির বজ্র তার উপরে ;
সে বজ্র আজ পুত্র আমার—ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র সে নয়,
রাক্ষসেদের সেই প্রতিযোধ আজ বিধাতার নিশান সে বয়।
নিশ্বাসে তার ছিন্ন হবে অন্যায়েরি কুজ্ঝটিকা,
নৃশংস বক-রাক্ষসেরি লুপ্ত হবে রাজার টীকা ;
ভয়ের গুমোট্ কাট্‌বে, আবার প্রসাদ-বাতাস বইবে ফিরে,
এ বিশ্বাসেই পাঠিয়েছি তায়, সাজিয়ে তারে ধনুক-তীরে।
দেবতা যদি মুখ তুলে চান্, ফিরবে সে মোর সগৌরবে,
রুদ্র যদি রোদন পাঠান সইতে হব, সইতে হবে।
হৃদয় যারে বল্‌ছে শ্রেয় তাই বরেছি সরল মনে,
অসময়ে ঠাঁই যে দেছে করেছি রোধ তার মরণে।

সাপের মুখে পাঠিয়ে ছেলে দিয়েছি আজ অভয় চিতে,
নগর-জোড়া অভিশাপের আওতারি ঘোর ঘুচিয়ে দিতে।
জয়-পরাজয় হাত কারো নয়, যুঝ্‌তে হবে শ্রেয়ের লাগি;
অজগরের দাঁড়িয়ে ঘরে লড়াই, বিধির আশিস্ মাগি।
আশীবিষের বিষ দাঁতে হাত···বীবন্ধে হবে,...সেই লাগাবে,
ওপ্‌ড়াতে দাঁত পারুক্ হারুক্, ম'লেও জগৎ কীর্ত্তি গাবে।
এই তো জানি ক্ষত্র-রীতি, ক্ষত্রিয়াণীর এই সে বাণী,
জয় না হ'লেও মানব না ভয়, আসুক বিপদ্, আসুক হানি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মিলিতোনা

৪

নিদ্রাকালেও মিলিতোনার মধুর মূর্ত্তিখানি আন্দ্রের চিত্তাকাশে দুই একবার দেখা দিয়াছিল। জাগিয়া উঠিয়া আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল: কপোতীর নীড়টির সন্ধান পাইলেই যথেষ্ট হইবে না—তাহার নিকট উপনীত হওয়া চাই। কি করিয়া সেখানে যাওয়া যায়? এক উপায় আছে,—যদি আমি তার বাড়ীর সম্মুখে একজায়গায় আড্ডা গেড়ে বসে' তার আটঘাট অন্ধিসন্ধি ভাল করে নজর করে দেখি। কিন্তু আমি যদি, এখন যে কাপড় পড়ে আছি সেই কাপড়েই যাই, অর্থাৎ প্যারিসের হাল-ফ্যাশানের কাপড় পরে যাই—তাহা হইলে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে, আমার অনুসন্ধানে ব্যাঘাত হবে। একটা কোন বিশেষ সময়ে, মিলিতোনা নিশ্চয়ই বাড়ী থেকে বেরু হবে কিংবা বাড়ীতে প্রবেশ করবে। কেননা, একেবারে ৬ মাসের মতন তাঁর ভাড়ার ঘরটিতে মেওয়া-মোরব্বা যে সঞ্চিত আছে তা আমার বিশ্বাস হয় না। যখন সে বাড়ী থেকে বেরুবে, কিংবা বাড়ীতে ঢুকবে, সেই সময়েই আমি লগ্নমাফিক একটা সুরচিত রসালো বাক্যে তাকে অভিনন্দন করব। তাহলে দেখ্‌তে পাব, বৃষযুদ্ধের রঙ্গালয়ে মিলিতোনা যেরূপ আমার সহিত বাক্যালাপে কঠোর ভাব ধারণ করেছিলেন, এখনও সেইরূপ করেন কি না। আচ্ছা তাহলে পুরোনো কাপড়ের দোকানে যাওয়া যাক, সেখানে গিয়ে শ্রম-শিল্পী শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে কাপড়ের "ফ্যাশান" বর্ত্তমানে প্রচলিত সেই কাপড়ের ছদ্মবেশ পরা যাক। তাহলে কারও সন্দেহ উদ্রেক হবে না। অনায়াসেই আমার প্রিয়তমার সম্বন্ধে সমস্ত খবর জান্‌তে পারব।"

মনে মনে এই মৎলব আঁটিয়া আন্দ্রে

উঠিয়া পড়িল এবং এক পেয়ালা জল-চকোলেট্ পান করিয়া সেই পুরানো কাপড়ের দোকানের অভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়—কিন্তু সব পুরাতন।

নানাপ্রকার ফন্দি ভাবিতে ভাবিতে আন্দ্রে একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানকার কাপড়গুলা পুরাতন হইলেও ভদ্রলোকের অব্যবহার্য্য নহে। উহারই মধ্য হইতে ম্যানোলা-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত টুপি কোর্ত্তা পায়জামা—প্রভৃতি সৌখীন পরিচ্ছদ আন্দ্রে বাছিয়া লইল। দোকানে একটা বড় আয়না ছিল, সেই আয়নায় আন্দ্রে দেখিল পোষাকটা বেশ মানিয়াছে। কাপড়ের মূল্য দিয়া এবং কাপড়গুলা রাখিয়া, আন্দ্রে দোকানদারকে বলিল, সন্ধ্যার সময় দোকানে আসিয়া এই পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। এই ছদ্মবেশ পরিয়া নিজ গৃহ হইতে বাহির হইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

যে রাস্তায় মিলিতোনা থাকে, আন্দ্রে গৃহে ফিরিবার সময় সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে একটা জানলা দেখিতে পাইল, তার চারিধারে চুনকাম করা; এবং পেরিকো যেরূপ বলিয়াছিল—একটা জলের কুঁজো ঝোলানো রহিয়াছে। কিন্তু এমন কিছুই দেখিতে পাইল না, যাহাতে জানিতে পারা যায়, ঘরের মধ্যে কোন লোক আছে। বাহির দিক হইতে, একটা মস্‌লিনের পর্দ্দা দিয়া জানলাটা ঢাকা—ভিতরের কিছুই দেখা যায় না।

"বোধ হয় মিলিতোনা কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছে, সন্ধ্যার আগে ফিরিবে না। হয়ত সে সেলাইয়ের কাজ করে, চুরোট বিক্রী করে, মোজা-বুননের কাজ করে কিংবা ঐ রকম আর-কিছু।"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আন্দ্রে চলিতে লাগিল।

মিলিতোনা বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। একটা টেবিলের উপর, একটা জামার বিভিন্ন অংশ বিছানো রহিয়াছে; মিলিতোনা সেই টেবিলের ধারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কাজ করিতেছে। পাছে জুয়াঙ্কো আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় মিলিতোনা ঘরে খিল দিয়াছে। তাতে আবার বৃদ্ধা এখন গৃহে নাই, এই সময়ে জুয়াঙ্কো আসিলে আরও বিপদ।

শেলাই করিতে করিতে মিলিতোনা সেই যুবা পুরুষের কথা ভাবিতেছিল,—যে গত কল্য সার্কাসে, এমন জ্বলন্ত অথচ মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে তাকাইয়াছিল এবং কতকগুলি কথা এমন মধুরস্বরে বলিয়াছিল যে যাহা এখনো যেন তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"আমার সঙ্গে আবার দেখা করবার জন্ত আমার খোঁজ না করে ত ভাল হয়—যদিও খোঁজ করলে আমি খুসী হই। কিন্তু জুয়াঙ্কো নিশ্চয়ই তার সঙ্গে একটা ভয়ানক ঝগ্‌ড়া আরম্ভ করে দেবে; হয়ত তাকে খুন করবে, কিংবা ভয়ানক জখম্ করবে—পূর্ব্বে যে কেহ আমার মন পাবার চেষ্টা করেছে, তারই উপর সে এই রকম অত্যাচার করেছে। জুয়াঙ্কো এক নগর হতে নগরান্তরে আমার অনুসরণ করেছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়েছে—পাছে যে হৃদয় জুয়াঙ্কোকে দিতে অস্বীকার করেছিলুম, সেই হৃদয় অন্যকে আমি দিয়ে

ফেলি। সেই যুবাপুরুষ আমার শ্রেণীস্থ নয়। তার চাল-চলন দেখ্‌লেই বুঝা যায় সে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক ও ধনবান; আমার উপর তার যদি কিছু ভালবাসা পড়ে' থাকে সে একটা ক্ষণিক খেয়াল বৈ আর কিছুই না; এরই মধ্যে সে আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে।"

এইখানে আমরা সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতেছি, এই সময়ে এই তরুণীর ললাটের উপর দিয়া একখণ্ড লঘু মেঘ চলিয়া গেল, এবং তাহার একটা নিঃশ্বাস দীর্ঘ নিশ্বাসের মত বোধ হইল।

"নিশ্চয়ই তাঁর কোন প্রেয়সী আছে, বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নী আছে—যে তরুণী, যে সুন্দরী, রূপলাবণ্যবতী, যার ভাল ভাল টুপি আছে, বড় বড় শাল আছে। রঙ্গিন রেশমের ফিতা দেওয়া রূপালী বোতাম দেওয়া ফতুয়ায় কেমন তাঁকে মানাবে। রেশমের একটি সুন্দর কোমরবন্ধে কোমর বাঁধ্‌লে, তাঁর শরীরের গড়নটি আরও কত সুন্দর দেখ্‌তে হবে।"—মিলিতোনা আপন মনে এইরূপ বলিয়া যাইতেছিল এবং মুগ্ধ হৃদয়ের মায়া-জাল বুনিয়া, আন্দ্রেকে নিজ শ্রেণীসুলভ পোষাক পরাইতেছিল। মিলিতোনা এইরূপ সুখস্বপ্নে যখন বিভোর,—বৃদ্ধা আসিয়া তাহার কামরার দরজায় ঘা দিল। এবং মিলিতোনাকে বলিল ঃ—

"তুই কি জানিস্‌নে? সেই ক্রোধান্ধ জুয়াঙ্কো তার হাতের ক্ষতস্থানে পটি না বেঁধে, তোর জানলার সম্মুখে সমস্ত রাত্তির ঘুরে বেড়িয়েছে,—নিশ্চয় এই মনে ক'রে,—যদি সেই সার্কাসের যুবকটিকে ওখানে দেখ্‌তে পায়। তুই সেই যুবককে মিলনের সংকেত স্থান নিশ্চয় বলে দিয়েছিস—এই কথাটা জুয়াঙ্কোর মাথায় গজ্‌গজ্‌ করছিল। আচ্ছা জুয়াঙ্কো বেচারাকে তুই ভাল বাসিস্‌নে কেন বল দিকি? তুই যে তাহলে একটু শান্তি পেতিস্‌।"

—"ও সব কথা থাক্‌; যে ভালবাসা আমি কোন রকমে একটুও উস্‌কে দিই নি, সে ভালবাসার জন্য আমি দায়ী হতে পারিনে।" বৃদ্ধা আবার বলিল ঃ—"সার্কাসের সেই যুবকটি সুন্দর নয়, কিংবা সে নারীর সম্মান রাখ্‌তে জানে না—একথা আমি বল্‌ছিনে। খুব মিঠে ধরণে, আমাদের নারী-জাতের উপর খুব সম্মান দেখিয়ে, সে আমাকে এক বাক্‌সো লজিঞ্জিস্‌ দিয়েছিল; কিন্তু আমার মনের টান জুয়াঙ্কোর উপর। তাকে আমি বাঘের মত ডরাই। সে আমাকে কতকটা তোর অভিভাবক বলে' মনে করে। তুই যদি আর একজনকে বেশী পছন্দ করিস্‌, তাহলে সে তার জন্য আমাকে দায়ী করতে পারে। সে এত কাছে থেকে তোর উপর নজর রাখে যে, তার কাছ থেকে খুব সামান্য কথাও লুকোনো ভারী শক্ত।" লজ্জায় মিলিতোনার মুখ একটু লাল হইল। সে উত্তর করিল ঃ—

—"তোমার কথা শুন্‌লে মনে হয়, সেই ভদ্রলোকটি যার চেহারাও আমার মনে নেই,—তার সঙ্গে যেন আমার একটা রীতিমত কারবার চল্‌চে।"—"তুই যদি তাকে ভুলে গিয়ে থাকিস্‌, সে তোকে ভোলে নি, আমি বেশ বল্‌তে পারি। স্মৃতির সাহায্যে সে তোর চেহারা আঁক্‌তে পারে। সেই

ষাঁড়ের লড়ায়ের সময় সে তোকে ক্রমাগত দেখ্‌ছিল ; মনে হল যেন মেরী মাতার কোন মূর্ত্তির সাম্‌নে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে।”

আন্দ্রের ভালবাসা এই বৃদ্ধার সাক্ষ্যে আরও দৃঢ়ীভূত হইল। মিলিতোনা ঝুঁকিয়া আবার সেলাই করিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

জুয়াঙ্কোর হৃদয় এই সব কোমল ভাব হইতে বহুদূরে। জুয়াঙ্কোর হস্তে নিহত বৃষের মুণ্ডগুলা জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে উপহার দিতে গিয়াছিল, কিন্তু মিলিতোনা তাহা গ্রহণ করে নাই। কাজেই সে এখন অসি ও বৃষমুণ্ডে ভূষিত তাহার কামরায় বদ্ধ থাকিয়া এই সব জিনিসের মধ্যে কোন প্রকারে হতভাগ্য হতাশ প্রেমিকের ন্যায় সময় কাটাইতেছিল। সে বুঝিতেই পারে না মিলিতোনা কেন তাকে ভাল বাসে না। তাহার প্রতি মিলিতোনার এই বিরাগ তাহার নিকট একটা অসাধ্য সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছিল ; সে কিছুতেই তাহার সমাধান করিতে পারিতেছিল না। “আমি কি তরুণ-বয়স্ক নহি, সুশ্রী নহি, বলিষ্ঠ নহি, উৎসাহ ও সাহসে আমার হৃদয় কি পূর্ণ নহে ? স্পেনের শত শত শুভ্র চারু হস্তের করতালি নাদে আমার প্রশংসা কি হাজার হাজার বার প্রতিধ্বনিত হয় নাই ? অন্যান্য নির্ভীক বৃষ-মল্লের মত আমারও পরিচ্ছদ কি সোনার জরিতে বিভূষিত ছিলনা ? আর্টের বড় বড় ওস্তাদদিগের ন্যায়, রুমালে ও ওড়নায় আমার ছবি কি মুদ্রিত হয় নাই ? আমি যে-রকম জোরে ছোরার আঘাত করতে পারি, আমি যত শীঘ্র বৃষকে ধরাশায়ী করতে পারি, সে রকম আর কে করতে পারে ?

কেহই না। বৃষ-বধের মূল্য স্বরূপ, রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তগত হয়েছে। আমার তবে কিসের অভাব ?” জুয়াঙ্কো আপনার দোষ ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন দোষ ত্রুটিই দেখিতে পাইল না। তার প্রতি মিলিতোনার এই উদাসীনতা,—এই বিরাগের তবে কি-কারণ হইতে পারে ? সে হয়ত আর কোন ব্যক্তিকে ভাল বাসে, এ ছাড়া ত আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই মনে করিয়া জুয়াঙ্কো “সেই ব্যক্তিকে” সর্ব্বত্র অনুসরণ করিতেছে ঃ একটা সামান্য কারণেই তাহার ঈর্ষা ও ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, তাহার প্রতি এই তরুণীর অবিচলিত ঔদাস্য তাহাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে খুন করিয়া তাহার মোহিনী শক্তিকে নষ্ট করিবে—এই কথা জুয়াঙ্কোর মাথায় অনেক-বার আসিয়াছিল। এক বৎসরেরও অধিক—অর্থাৎ যে অবধি মিলিতোনাকে সে দেখিয়াছিল—তাহার এই উন্মত্ততা সমানভাবে ছিল। কারণ তাহার প্রেম—অন্যান্য উদ্দাম অবেগেরই মতো শীঘ্রই চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

আন্দ্রেকে পাকড়াইতে হইলে, এখানকার প্রধান প্রধান নাট্যশালায়, সৌখিন কাফির আড্ডায় এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্র সম্মিলিত হয়—তাহার খোঁজ করা আবশ্যক। যদিও সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে সব বস্ত্র পরিধান করে তাহার প্রতি জুয়াঙ্কোর বিষম বিদ্বেষ ছিল, তথাপি তাহার মধ্যের

হাসির্দ্দ করিবার জন্য সে ঐসব কাপড় কিনিবার জন্য একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে গেল। আন্দ্রে যে সময়ে পুরাতন কাপড়ের দোকানে গিয়াছিল, জুয়াঙ্কোও ঠিক সেই সময়েই গিয়াছিল। একজন বৈর সাধনের উদ্দেশে, আর একজন প্রেমের উদ্দেশে।

আজকাল আন্দ্রে অপরাধী প্রেমিকের মতো, ফেলিসিয়ানার ওখানে গিয়া ঠিক্ সময়েই হাজির হইয়া থাকে—তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

আন্দ্রে মার্কিসের গানের মজলিসে ভয়ানক বেসুরো গাহিয়াছিল, এবং ক্রমাগত অন্যমনস্ক হইতেছিল—এই সমস্তের উল্লেখ করিয়া ফেলিসিয়ানা আন্দ্রেকে ভর্ৎসনা করিল। "সেই যুগলবন্ধ গান ও বাজনা কত যত্ন করে, কত কষ্ট করে', কতদিন ধরে' অভ্যাস করা গেল আর আসল দিনে কিনা সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।"

আন্দ্রে আপনাকে সাফাই করিবার জন্য যথাসাধ্য তাহার ভ্রমভ্রান্তির কারণ দেখাইল। কিন্তু আন্দ্রের বাজনার ত্রুটি সত্ত্বেও, সেদিন ফেলিসিয়ানার গানে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। এমন কি তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া থিয়েটারে প্রসিদ্ধ গায়িকাদিগেরও ঈর্ষা হইয়াছিল। সেই জন্য ফেলিসিয়ানাকে সান্ত্বনা করিতে আন্দ্রের বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। প্রেমিকযুগল চিরন্তন বন্ধুর ন্যায় সদ্ভাবে প্রসন্ন মনে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

সায়াহ্নকাল সমাগত। জুয়াঙ্কো হাল-ফ্যাশানের পরিচ্ছদ পরিধান করায়, জুয়াঙ্কোকে এখন চেনা দুষ্কর। যে রাস্তায় মিলিতোনা বাস করে, জুয়াঙ্কো সেই রাস্তা দিয়া, জ্বর-রোগীর ন্যায়, অসমান পদক্ষেপে চলিতে চলিতে প্রত্যেক পথ-চল্‌তি লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকল থিয়েটারেই প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে থিয়েটারের সঙ্গীত স্থান, "ষ্টেজ্-বক্‌স্" এবং দর্শকদিগের "বক্‌স্" সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। জুয়াঙ্কো কাফির আড্ডায় গিয়া সব রকমের কুল্পিই গলাধঃকরণ করিল, সকলদলের রাজনৈতিকদিগের সহিত কবিদিগের সহিত মিশিতে লাগিল; কিন্তু যে অতি মধুরস্বরে মিলিতোনার সহিত সেদিন সার্কাসে কথা কহিয়াছিল, তাহার মত কাহাকেই দেখিতে পাইল না। দেখিতে না পাওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল।

আন্দ্রে সেই পুরাতন কাপড়ের দোকানে, তাহার খরিদ করা সেই ছদ্মবেশের পোষাকটা পরিতে গিয়াছিল; সেখান থেকে ফিরিয়া মিলিতোনার বাস-গৃহের সম্মুখস্থ একটা সর্ব্বতের দোকানে আড্ডা করিয়া বেশ ধীরে-সুস্থে এক গেলাস বরফে-জমানো লেমনেড্ পান করিতেছিল এবং পেরিকোর সাহায্যে চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাছাড়া জুয়াঙ্কো আন্দ্রের সম্মুখ দিয়া গেলেও আন্দ্রে তাহার নজরে পড়িত না। আন্দ্রে শ্রম-শিল্পী শ্রেণীর পোষাক পরিবে এ কথা জুয়াঙ্কোর মাথায় কখনও আসিত না। মিলিতোনা আপন জানলার কোণটিতে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রবঞ্চিত হয় নাই। বিদ্বেষের চাইতে প্রেমের দিব্য দৃষ্টি বেশী। মিলিতোনার চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই

উৎকণ্ঠিত ছিল; সে আল্রেকে সম্মুখস্থ দোকানে বসিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, নাজানি কি মৎলবে আন্দ্রে ওখানে আড্ডা গাড়িয়াছে; আন্দ্রের সহিত জুয়াস্কোর সাক্ষাৎ হইলে নিশ্চয়ই একটা ভীষণ কাণ্ড হইবে।

আন্দ্রে টেবিলের উপর কুনুই রাখিয়া পুলিসের টিক্‌টিকির মতো খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল কে-কে মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করে। প্রথমে, অনেকগুলি স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, সকল বয়সেরই লোক গৃহে প্রবেশ করিল। (কেননা, ঐ বাড়ীতে অনেকগুলি পরিবার বাস করে); তাহার পর মাঝে মাঝে, একটু বিলম্বে বিলম্বে, লোক প্রবেশ করিতে লাগিল; ক্রমে রাত্রি আসিয়া পড়িল; তখন, কোনও কাজে যাহাদের বিলম্ব হইয়া গেছে, এইরূপ দুই একটি লোক প্রবেশ করিল। মিলিতোনার দেখা নাই।

আন্দ্রের দূত আন্দ্রেকে মিলিতোনার যে ঠিকানা দিয়াছিল, হয়ত তাহা ভুল—এইরূপ আন্দ্রে মনে মনে ভাবিতেছিল—এমন সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জান্‌লাটা আলোকিত হইয়া উঠিল; এবং দেখা গেল, কামরায় লোক আছে।

মিলিতোনা যে তাহার কাম্‌রায় আছে, এ বিষয়ে আন্দ্রের কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহাতে ত কোন কাজ আগাইবে না; আন্দ্রে পেন্‌সিল দিয়ে এক টুক্‌রা কাগজের উপর দুই চারিটা কথা লিখিয়া পেরিকোকে ডাকিল; পেরিকো তখন সন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আন্দ্রে মিলিতোনার নিকট ঐ চিঠিখানা লইয়া যাইতে বলিল।

পেরিকো ঐ বাড়ীর একজন ভাড়াটের মত সুড়্‌সুড়্ করিয়া গৃহে ঢুকিল; ঢুকিয়া একটা কালো সিঁড়িতে আসিয়া পড়িল; তাহার পর দেয়াল হাতড়াইতে হাতড়াইতে শেষে উপরকার সিঁড়ির মাথায় আসিয়া পৌঁছিল; দেয়ালের তক্তার ফাঁক দিয়া যে একটু-আধটু আলো আসিতেছিল, সেই আলোয় মিলিতোনার কাম্‌রার দরজাটা দেখিতে পাওয়া গেল; পেরিকো খুব সতর্কভাবে দরজায় দুইবার করাঘাত করিল। তরুণী খড়খড়ি খুলিয়া চিঠিখানা লইল; তাহার পর আবার খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

আন্দ্রে লেমনেডটা শেষ করিয়া, এবং দোকানদারকে উহার মূল্য চুকাইয়া দিয়া মনে মনে ভাবিল, "যদি সে পড়িতে জানে, তবেই ত।"

আন্দ্রে উঠিয়া, আস্তে আস্তে সেই জান্‌লার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। চিঠিতে এই কথা লেখা ছিল :—

"একজন তোমাকে ভুলতে পারে না, ভুলতে ইচ্ছাও করে না, সে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চায়; কিন্তু তুমি সার্কাসে তাকে যে দুই একটা কথা বলেছিলে সেই কথা শুনে অবধি (আর তোমার জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হয় তাও সে জানে না)—সেই কথা শুনে অবধি তার ভয় হয় পাছে আমার এই চেষ্টায় তোমার কোন বিপর্য্যয় ঘটে। তার নিজের যতই বিপদ হোক্ না কেন, কোন বিপদই তাকে আটকাতে পারবে না। তোমার প্রদীপটা নিবিয়ে দিও, আর জান্‌লা থেকে উত্তরটা তার কাছে ফেলে দিও।"

কয়েক মিনিটের পর, প্রদীপটা অন্তর্হিত হইল, জান্‌লাটা খুলিয়া গেল, এবং মিলিতোনা তার কুজোটা হাতে লইয়া, একটা টিনের 'মগ্' নীচে নিক্ষেপ করিল; মগ্‌টা দীপ্তিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া আন্দ্রের কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পতিত হইল।

ফুট-পাথের উপর যে শ্যামল মৃত্তিকা প্রসারিত ছিল, সেই মৃত্তিকার মধ্যে কি-একটা সাদা জিনিস্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আন্দ্রে দেখিল।

সেই সময়, বল্লমের ডগায় একটা লণ্ঠন ঝুলাইয়া, একজন নৈশ-প্রহরী সেইখান দিয়া যাইতেছিল, আন্দ্রে তাহাকে ডাকিল এবং তাহার লণ্ঠনটা একটু নীচু করিয়া ধরিতে বলিল। ঐ লণ্ঠনের আলোয় আন্দ্রে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি পাঠ করিল। লেখাটা কম্পিত হস্তে বড় বড় অক্ষরে বিশৃঙ্খলভাবে লিখিত ঃ—

"ওখান থেকে চলে যাও……আর বেশী লেখবার আমার সময় নেই। কাল দশটার সময় আমি "ইঁসিড়োর" গির্জ্জায় থাক্‌ব। কিন্তু আমার কথা শোনো, এখনি প্রস্থান কর; এখানে থাক্‌লে প্রাণ যাবে।"

আন্দ্রে প্রহরীর হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, "সেপ্নাই সাহেব, বড়ই উপকৃত হলাম, এখন তোমার কাজে যেতে পার।"

রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য। আন্দ্রে ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিতেছে এমন সময় একটা লোকের মূর্ত্তি তাহার নেত্রগোচর হইল। মূর্ত্তিটা একটা প্রাবরণ-বস্ত্রে আচ্ছাদিত, বস্ত্রের নীচে তীক্ষ্ণ কোণ-বিশিষ্ট একটা গিতার-যন্ত্র রহিয়াছে। আন্দ্রের কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। আন্দ্রে একটা অন্ধকার কোণে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল।

লোকটা স্বীয় বস্ত্রাবরণের আঁচলগুলা কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া, গিতার-যন্ত্রটা সাম্‌নে আনিল, এবং গিতারের তার টানিয়া তালে তালে একটা গুঞ্জনধ্বনি বাহির করিতে লাগিল। প্রণয়িনীর প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য প্রণয়িনীর গৃহগবাক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া এইরূপ সঙ্গৎ-সহযোগে 'সেরিনেড্' গান গাওয়া হইয়া থাকে।

স্পষ্ট বুঝা গেল, গানটার প্রথম অংশের উদ্দেশ্য কোন সুন্দরীকে জাগাইয়া তোলা। কিন্তু যখন মিলিতোনার জান্‌লা আর খুলিল না, তখন লোকটা অদৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশে গাহিয়াই সন্তুষ্ট রহিল; যদিও একটা স্পেন্-দেশীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন রমণী যতই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হোক্ না, গিতার-ধ্বনি শুনিলে জান্‌লা দিয়া মুখ না বাড়াইয়া থাকিতে পারে না। লোকটা প্রথমে গলা সাফ করিয়া লইবার জন্য খুব গম্ভীর স্বরে "হুম্ হুম্" করিয়া একটা কণ্ঠ ধ্বনি করিল, তারপর খুব ঝোঁক দিয়া-দিয়া একটা প্রণয়-গীতি গাহিতে লাগিল ঃ—

ওগো বালা,—

রাণীর গৌরব মুখে, একি অনাসৃষ্টি।
কপোতী তোমার কেন শ্যেন-সম দৃষ্টি?
যদি হেথা দেয় কেহ বীণার ঝঙ্কার
তখনি করিব তার পরাণ সংহার।
এ রাস্তায় আর কারো নাহি অধিকার
হেথা-যে বসতি করে প্রেয়সী আমার।

আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল ঃ—

"ছোঃ, কি ভীষণ হিংস্র ধরণের কবিতা!

না আছে এতে রস-কষ, না আছে কোনও কবিত্ব। নিশ্চয়ই মিলিতোনার উদ্দেশে প্রণয়-সঙ্গীতের নামে এই নৈশ কোলাহল সুরু করে দিয়েছে, দেখা যাক এই গানে মিলিতোনার মন গলে কি না। খুব সম্ভব এই ভীষণ প্রেমিকের অত্যাচারেই সে এত ভয় পেয়েছে। ভয় পাবারই কথা।"

আন্দ্রে গাছের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিল,—গাছের ছায়া হইতে যেই একটু মুখ বাড়াইয়াছে অমনি একটা চন্দ্র-রশ্মি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল; জুয়াঙ্কোর সজাগ দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল:—

"যাক্, আমি ধরা পড়িয়াছি,—এখন আমার মনের ভাব মুখে প্রকাশ হতে দেব না।"

জুয়াঙ্কো গিতারটা মাটিতে ফেলিয়া দিল; বাঁধানো ফুটপাতের উপর পড়িয়া গিতারটা বিষাদগম্ভীর রবে অনুরণিত হইল।

জুয়াঙ্কো আন্দ্রের অভিমুখে ছুটিয়া গেল—এবং চন্দ্রালোকে আলোকিত আন্দ্রের মুখ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। রোষ-কম্পিত-স্বরে জুয়াঙ্কো বলিল:—

—এ সময়ে তুমি এখানে কি করতে এসেছ?

—আমি তোমার সঙ্গীত শুন্‌চি; শুনে মৃদু মধুর একটা আনন্দ অনুভব করচি।

—যদি তুমি ভাল করে শুনে থাক, তাহলে ত জান্‌তেই পেরেছ,—আমি যখন গান করি সে সময় এ রাস্তায় আসা সকলেরই নিষেধ।

আন্দ্রে নির্বিকারচিত্তে শান্ত ভাবে উত্তর করিল;—

—স্বভাবতঃ আমি বড়ই অবাধ্য।

—আজই তোমার স্বভাব বদ্‌লে যাবে।

—কোন প্রকারেই না; আমার স্বভাব আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

জুয়াঙ্কো তাহার ছোরা বাহির করিয়া এবং হাতাহীন আলখাল্লাটা বাহুতে গুটাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল:—

—"আচ্ছা বেশ, আপনাকে হয় রক্ষা কর, নয় কুকুরের মত মর্।"

আন্দ্রেও ক্ষিপ্রতার সহিত সতর্ক হইল, এবং আত্মরক্ষার্থ এমন একটা উত্তম প্রণালী অবলম্বন করিল যাহা দেখিয়া বৃষভমল্ল বিস্মিত হইল। কারণ আন্দ্রে ইতিপূর্ব্বে বড় বড় ওস্তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অসি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। জুয়াঙ্কো বাঁ হাতটা বাড়াইয়া এবং সজোরে ছোরা মারিবার জন্য পিছন দিকে ডান হাতটা রাখিয়া আন্দ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাঁ হাতটা মোটা কাপড়ে আচ্ছাদিত ছিল; কতকটা ঢালের কাজ করিতেছিল।

জুয়াঙ্কো একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে; একবার অতিকায়ের মত লম্বা হইতেছে, একবার বামনের মত খাটো হইতেছে; কিন্তু যতবার ছোরা মারিতেছে, ততবারই ছোরার মুখ আন্দ্রের গোটানো হাতা-হীন আলখাল্লায় ঠেকিতেছে।

জুয়াঙ্কো একবার চট করিয়া পিছু হটিতেছে, আবার সবেগে ও সজোরে আক্রমণ করিতেছে; একবার ডাইনে লাফাইতেছে, একবার বাঁয়ে লাফাইতেছে; এবং বল্লমের মত ছোরাটা বাগাইয়া ধরিয়া খোঁচা মারিবার ভাবে ওঁচাইয়া রহিয়াছে।

আন্দ্রে এই আক্রমণের উত্তরস্বরূপ অনেকবার প্রতিপক্ষের আঘাত সাম্‌লাইয়া এমন তাক্‌-মাফিক ছোরা চালাইতে লাগিল যে জুয়াঙ্কো ছাড়া আর কেহ হইলে, তাহা সাম্‌লাইতে পারিত না। যেরূপ ভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা পণ্ডিত দর্শকদিগের দেখিবার যোগ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহের সকল জান্‌লাই বন্ধ, রাস্তা একেবারে জনশূন্য।

দুজনেই খুব বলিষ্ঠ হইলেও, যুদ্ধশ্রমে দুজনেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কপাল বহিয়া ঘাম টস্‌টস্‌ করিয়া পড়িতেছে, কামারের জাঁতা হাপোসের মত তাদের বক্ষদেশ উঠিতেছে পড়িতেছে, তাদের পা মাটিতে আর লঘুভাবে পড়িতেছে না, তাদের লম্ফে আর সে স্থিতি-স্থাপকতা নাই।

জুয়াঙ্কো অনুভব করিল, আন্দ্রের ছোরার মুখ তার জামার হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে;—তাহার রোষ বৃদ্ধি হইল। খুব একটা চেষ্টা করিয়া, প্রাণসঙ্কট স্বীকার করিয়াও শত্রুর উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আন্দ্রে চীৎপাত হইয়া ধরাশায়ী হইল; এই সময় মিলিতোনা-গৃহের অদৃঢ়-বদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। ঐ গৃহের সম্মুখেই এই যুদ্ধ চলিতেছিল। জুয়াঙ্কো ধীরপদক্ষেপে প্রস্থান করিল। ঐ রাস্তার কোণ দিয়া যে নৈশ প্রহরী যাইতেছিল সে হাঁকিয়া উঠিল:—

"নূতন আর কিছুই ঘটে নাই; রাত্রি সাড়ে এগারোটা; আকাশে তারা জ্বলিতেছে; কোন উপদ্রব নাই, সব শান্ত।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলো-আঁধারে

(গল্প)

১

যে-কালের কথা বলছি, সেকালের সঙ্গে আজকের এই তফাৎটা নজরে পড়ছে:—এ চৌরাস্তাটার ঐ-কোণে সমাজ-বাড়িটা তখন আশপাশের চেয়ে আয়তনে বিষম ফেঁপে উঠে আমার এই ছোট ঘরটার মধ্যেকার অন্ধকার দূর করবার পথটুকু একেবারে বন্ধ করেনি; রাস্তার দুসারি বাসা-বাড়িগুলোর সঙ্গে সে-সময়ে লম্বাই চওড়াই রং-ঢং কোনো দিক দিয়েই ঐ সমাজ-বাড়িটা ভিন্ন ছিলনা; আর ওর ভিতরকার মতভেদটাও তখন এতটা সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি—ওই বাজ-পড়া শিক-বসানো চুড়োটার মতো! ডাইনে বাঁয়ে বিলিতি-মাটীর সরু দাওয়া, তার মাঝে খুব নীচু গেরিমাটির রং-লেপা সদর-দরজাটি, তারই মাঝ দিয়ে তখন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা, আচার্য্য-উপাচার্য্য, এমন-কি হিন্দু-আমরাও আনাগোনা করতেম; আর কখনো-কখনো খুব গরমের দিনে সদর-দরজার উপরের সরু একটা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো যুবক-যুবতী

এক-সঙ্গে চায়ের পেয়ালা হাতে, কালেজের অব্রাহ্ম ছাত্র ও পাড়ার হিন্দু প্রতিবেশীদের কাছে উন্নতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার সজীব দৃষ্টান্ত প্রচার করতেম। ঠিক ঐ সমাজ-বাড়িটার সামনেই সাবেকী যে মস্ত বাড়িটা দেখা যায়, সেটা ভেঙে পড়ছে; কিন্তু আজও হুজুগের মুখে লাখ-দুলাখ টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছেনা। সেইখানে থাকতো : যে-মেয়েটির কথা বলবো—সে আর ঐ চৌমাথার মোড়েই যে-বাড়িটার চিহ্নও দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা সেইখানে থাকতো শ্যামাচরণ। এ ছাড়া পাড়ায় অনেক আইবুড়ো মেয়ে, বিয়ের যোগ্য ছেলেরও অভাব ছিলনা, যারা ঐ ব্রাহ্ম-সমাজের ঘরে-বাইরে ছুটির দিনে উন্নতদলের আচার্য্য-উপাচার্য্যদের ওখানে চা-পার্টিতে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন-সভায় এসে যোগ না দিত। এ বিষয়ে শ্যামাচরণও বাদ যায়নি। উপাচার্য্যের মেয়ে মিনির সঙ্গে শ্যামাচরণের আলাপ-পরিচয় বেশ জমে উঠেছিল—যদিও শ্যামাচরণ নামে যেমন, আসলেও তেমনি ঘোরতর শাক্ত এক বাঙাল-জমীদারের একটিমাত্র ছেলে। অবশ্য নব-ধর্ম্মে দীক্ষা না নিলে মিনিকে পাওয়া শ্যামাচরণের পক্ষেও শক্ত, যদিও সে সবদিক দিয়ে মিনির যোগ্য। কাজেই শ্যামাচরণ শীঘ্র দীক্ষা নেবেই—এইটে আমরা আশা করছিলেম।

সেই সময়ে একদিন, মনে নেই পূব-অঞ্চলের কোন্ গ্রাম থেকে শ্রীমতী মালতীলতা এসে ঐ মস্ত বাড়িটায় দেখা দিলেন। আর তার কিছু দিন পরেই শ্যামাচরণের মুখেই শুনলেম, তাঁরা হিন্দু; কিন্তু চাল-চলন আশ্চর্য্য-রকম স্বাধীন-উন্নত-ধরণের। একদিন চোখেও তাঁকে দেখলেম;—পাড়ার নত, উন্নত সুন্দরী ও সুরূপা যতগুলি ছিল, কেউ লাগলোনা মালতীর কাছে! আর ঠিক তারই জোড়া দেখলেম আমাদের শ্যামাচরণ! কেবল একটি বিষয়ে শ্যামাচরণের সঙ্গে মালতীর মিল হ'ল না। মালতী এসেই ব্রাহ্মসমাজের সব-ক'টা উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করলে, আর আমার বন্ধু তখন থেকে ঠিক তার উল্টো সুর ধোরে, ছিপ, বন্দুক, কুস্তি, যাত্রা—ফুটবল তখন ছিলনা—এমনি সব অত্যন্ত অনিত্য জিনিষ নিয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

মালতীর বাড়িতে নিত্য উপাসনার সঙ্গে উপাচার্য্য আচার্য্য ভাই-ভগিনীদের যাতায়াত ক্রমেই বাড়ছে; প্রায়ই নিমন্ত্রণ হয়; আমিও বাদ যাইনে, শ্যামাচরণও নয়; আমি যাই, কিন্তু শ্যামাচরণ যায় দরজা পর্য্যন্ত, তার পর নয়। অথচ অন্য দিন দেখেছি, শ্যামাচরণ কলেজে যাবার সময় মস্ত বাড়িটায় ঢুকলো, একটা বন্ধ-গাড়ি চড়ে মালতীর সঙ্গে কালিঘাটের দিকে চলে গেল; কালেজ থেকে ফিরে এসে দেখি তখনো বন্ধু বাসায় ফেরেনি। এটা যে আমিই লক্ষ্য করেছিলুম তা নয়। তখনকার দিনের সেই ছোটখাটো ব্রাহ্মসমাজের উন্নত দলটিও, খুব উপর থেকে বাজ-পাখীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এই পিতৃ-মাতৃ-হীনা স্বাধীনা জমীদার-কন্যা ও শাক্তবংশীয় তার একান্ত অনুগত ভক্তটিকে বেশ-ক'রে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। মালতী ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত করছে; স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে হিঁদুয়ানির আগড়টা সে বেশ সহজে খুলে বেরিয়ে এসেছে—অন্দর পেরিয়ে অনেকখানি;

বেশ বোঝা যাচ্ছে তার চোখ একটা যেন নতুন আলোর মুখে মুগ্ধভাবে চেয়ে রয়েছে—দিন রাত; যেন কি-একটা পাবার জন্যে তার মধ্যে ব্যাকুলতার অন্ত নেই। বাইরেটা যেমন, তেমনি অন্তরটাও তার যেন মুক্তির মাঝে ফুটে-ওঠার চেষ্টায় ছোট পাখীর সবে-ওঠা ডানাদুটির মতো আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে; অথচ এও দেখছি নবধর্ম্মে দীক্ষা না নিয়ে উন্নতসমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে কালিঘাটে যাওয়া-আসা করছে মালতী—তাও আবার ঐ ভিতরে-বাইরে সম্পূর্ণ হিঁদু কিন্তু সম্পূর্ণ উদার এবং মিনির বিষয়ে উদাসীন না হ'লেও ব্রাহ্ম এবং তাদের সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ে সহসা একেবারেই বিমুখ শ্যামাচরণের সঙ্গে! এটা উন্নতসমাজের আচার্য্য উপাচার্য্য থেকে আরম্ভ ক'রে মিনির পর্য্যন্ত ভাবনার বিষয় হয়ে উঠলো।

এখানে যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময় একদিন, সমাজের প্রধান-প্রচারক,বুড়্‌লী-গ্রামে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও সেই সঙ্গে বুড়্‌লী থেকে একশো ক্রোশের মধ্যে যে যেখানে ছিল সবাইকে—স্ত্রী-পুরুষ ছোট-বড়নির্ব্বিশেষে—মায় বুড়্‌লীর জমীদারের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটিকে পর্য্যন্ত নবধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে, সদর সমাজে এসে দর্শন দিলেন। বলা বাহুল্য, মালতীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হ'ল। প্রথম দিনেই প্রচারক বুঝলেন, যে-মহাবাণী তিনি প্রচার করতে চান্, সেটি সমস্ত হৃদয় দিয়ে যদি কেউ ধারণ করতে পারে তো সে মালতী। এবং উন্নতসমাজের দল-বলেরাও বুঝলে মালতীকে পূর্ণ জ্ঞানালোকে যদি কেউ আনতে পারে তো সে তাদেরই প্রচারকমহাশয়।

সেদিন রবিবারে প্রধান-প্রচারকের বক্তৃতার জন্য একটা বিশেষ-নিমন্ত্রণ নিয়ে উপাচার্য্য মালতীর ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমি আর শ্যামাচরণ তখন সেখানে বসে চা খাচ্ছি। উপাচার্য্য নিমন্ত্রণ দিতেই মালতী খুব উৎসাহের সঙ্গে বল্লে—"যাবো নিশ্চয়ই, যতবার তাঁর বক্তৃতা হবে আমাকে বলতে ভুলবেন না। এঁদেরও বোলে যান্, ওঁরাও যাবেন।"

শ্যামাচরণ আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু মালতী বাধা দিয়ে বল্লে—"না, না, যেতেই হবে, আমার বিশেষ অনুরোধ।"

বন্ধু বিনা-আপত্তিতে নিমন্ত্রণ নিলেন। উপাচার্য্য আমাকেও ঐ সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানিয়ে চলে-যেতে-যেতে হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে মালতীকে কাছে ডেকে বল্লেন—"সেদিন প্রচারকমশায় অনেককে দীক্ষা দেবেন, সেই সঙ্গে মা তোমারো দীক্ষাটা—"

"সে পরে হবে। আমি অত লোকের মাঝে দীক্ষা নিতে পারবো না। আমি যখন দরকার বুঝবো, দীক্ষা নেবো।"

"করুণাময় পিতার চরণতলে তোমাকে যেন শীঘ্র দেখতে পাই!"—ব'লে উপাচার্য্য বিদায় হতেই শ্যামাচরণ হোহো-ক'রে খুব খানিকটা হেসে উঠলো। আমি দেখলেম লজ্জায় মালতীর কানদুটো রাঙা হয়ে উঠেছে, সে আস্তে-আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে—"উনিতো যাবেন না, আপনাকে আজ সন্ধ্যার সময় আমাকে নিয়ে সমাজে যেতে হবে।"

শ্যামাচরণ হঠাৎ চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমি তো বলিনি যাবোনা! যাবো। তুমি ঠিক-সময়ে প্রস্তুত থেকো।"

ডাগর চোখদুটিতে অনেকখানি বিস্ময়

নিয়ে মালতী একবার বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখলে। কৌতুক কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা তিন মিলে একটা যেন বিদ্যুৎ ঘরের মধ্যে খেলে গেল। আমি চায়ের পেয়ালায় শেষ-চুমুক দিয়ে বিদায় হলেম।

২

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি মালতীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলেম মিনিও এসেছে—মালতীকে নিতে। কিন্তু শ্যামাচরণ অন্যদিনের মতো সেদিনও ফাঁকি দিলে। সে যে এতটা অভদ্রতা করতে পারে তা আমার বিশ্বাস ছিল না। আমার ভারি রাগ হ'ল কিন্তু মালতী দেখলেম বেশ সহজে শ্যামাচরণের না-আসার একটা কারণ আবিষ্কার ক'রে নিয়ে মিনিকে ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ-বাড়িটায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং প্রচারকের বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনে বাড়ি ফিরে এলো।

প্রায় একমাস ধ'রে সমাজ-বাড়িতে প্রচারকের প্রচার চলেছে। দিনের পর দিন প্রতিসন্ধ্যায় মালতীকে দেখতেম বেদীর ডান-পাশে তার বাঁধা-জায়গাটিতে বসে উপদেশ শুনছে। প্রায় সবাইকে দেখতেম মাটির দিকে চোখ নামিয়ে রয়েছে, কেবল মালতী—সে যেন তার ডাগর চোখের সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে প্রচারকের বুকের ভিতরে যে-ভাব গুমরে উঠছে তা পর্য্যন্ত ধরতে চাচ্ছে। এক-একবার মনে হতো তার দৃষ্টি এই সমাজ-বাড়ির দেওয়াল পর্য্যন্ত ভেদ ক'রে এক স্বর্গলোকের সন্ধান ক'রে-ক'রে দূর সুদূরে চলে গেছে। প্রচারকের বক্তৃতায় সহর তখন টলমল! আমি যে আমি—আমিও একদিন দীক্ষা নিয়ে নিলেম। কাজেই কালিঘাট ছিপ ও বন্দুক-ভক্ত শ্যামাচরণের কাছ থেকে তার মালতীকে যে এরা একদিন সরিয়ে নিয়ে সমাজের মধ্যে টেনে নেবে তাতে আমার একটুও সন্দেহ রইলনা। উল্টে বরং মনে হতো ধর্ম্ম-বিশ্বাসে দুজনের যখন কিছুতেই মিল হবেনা তখন দুজন দুজনের কাছ থেকে সরাই ভালো। কিন্তু একজায়গায় আমায় গোলমাল ঠেকতো। ঐ মিনি, সেও তো ব্রাহ্মমেয়ে, শ্যামাচরণের সঙ্গে তারও তো ধর্ম্মগত তফাৎ অনেকখানি, তবু কেমন ক'রে এই কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা চলছিল—সব জেনেশুনে? বাস্তবিক বলছি, আমার বন্ধুর উপর একটা অশ্রদ্ধা তখন মনের এককোণে আমি পুষ্‌ছিলেম; এবং প্রার্থনা করছিলেম মালতী যেন ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকটার হাতে না পড়ে! পরমপিতার কাছে নিজের জন্যে করুণা-ভিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে মালতী যে শ্যামাচরণেরও জন্যে একটুখানি প্রার্থনা জানাতে পারে—বেদীর পাশে তার নিজের আসনটিতে ব'সে, সেটা আমার জ্ঞান ছিলনা। কিন্তু হয়তো শ্যামাচরণ সেটা কোনো অদ্ভুত শক্তিতে জেনেছিল, কাজেই সে মালতীর ভালোবাসার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে আনন্দে বাস করছিল—একেবারে নির্ভয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রধানপ্রচারক, তিনিও হয়তো সে-রহস্যটা ধরেছিলেন; আর সেইজন্যে তাঁর সমস্ত শক্তি ও একটা প্রকাণ্ড আহ্বান নিয়ে তিনি এই দিনের পর দিন এসে দাঁড়াতে লাগলেন!—একমাত্র যেন মালতীর জন্যেই সেই ব্রহ্মমন্দিরে তাঁর প্রচার চলেছে—এইটেই আমার বোধ হতো।

জানিনে এই আহ্বান মালতীর মনে গিয়ে পৌঁছবে কিনা, কিন্তু যেদিন পৌঁছবে সেদিন—শ্যামাচরণের পাংশুস মুখটাই আমার চোখের উপরে ভেসে উঠতো। আর আমি যেন শুনতেম সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ—ছেলেবুড়ো-মেয়ে ঐ এতটুকু মালতী-লতাকে উদ্দেশ ক'রে বলছে—"এসো অন্ধকার থেকে আলোয়। পিতা কোল পেতে দাঁড়িয়ে আছেন, একটি পা এগোও, ঝাঁপিয়ে পড় কৃপাময়ের চরণ-তলে! আসবেনা? ফিরবেনা সেদিকে, যেদিক থেকে আলো আনছে তাঁর সংবাদ, বাতাস বইছে তাঁর বাণী? যাত্রী চলবেনা সেই অনন্তধামের দিকে? পাপী ফিরবেনা সেই পাপহারী পবিত্র আশ্রমে? দেখছনা পিতা চেয়ে রয়েছেন!"

সে এক রবিবার, এমনি একটা বক্তৃতা, উৎসাহ আর উন্মাদনার মুখে আমি দেখলেম মালতী ভেসে গেল। একটা অদ্ভুত আকর্ষণে সে উঠে গিয়ে বেদীর উপরে প্রচারকের পায়ের তলায় গিয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল। এটা আমি চক্ষে দেখলেম। আর খুব স্পষ্ট ক'রে শুনলেম যা, তা বলি। প্রচারক মন্দিরের ছাতের দিকে দুই হাত তুলে বল্লেন—"ধন্য জগদীশ তুমি! ধন্য তোমার করুণা! অসীম তোমার শক্তি! শান্তিঃ শান্তিঃ!"

দু-তিন জন ধরাধরি ক'রে মালতীকে বাইরে নিয়ে গেল। মহা-উৎসাহে ধর্ম্মসঙ্গীত চল্লো। ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই—যার সুর আছে সেও, যার সুর নাই সেও, গানে যোগ দিলে। বেসুরো বেতালা হ'লেও সেদিন আমার মনে সবটা খুব গম্ভীর শোনালো। প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, হৃদয়নাথ, বন্ধু, প্রাণনাথ, সখা—এমনি সব কথাগুলোকে খুব খানিক টেনে-টেনে কখনো কান্না, কখনো মিনতি—এমনি নানাভাবের জালের মধ্যে বুনে-বুনে টানা একটা লম্বা বক্তৃতায় হ'ল যা, তা বলবার নয়। আর্গিন-যন্ত্রের প্যাঁচ কসে দিলে যেমন আপনি তা থেকে নানারকম সুর-সার বার হতে থাকে, তেমনি কেউ করতে থাকল অনুতাপ, কেউ চাইতে লাগলো পরিত্রাণ। এ বলে—"উদ্ধার কর!" ও বলে—"শান্তি, শান্তি!" হঠাৎ কোনো ভক্ত দাঁড়িয়ে উঠে আকাশের দিকে চোখ তুলে কাতরস্বরে ডাক দিতে থাকলো—"প্রভু, প্রভু, আমি সন্দিহান! আমার সংশয় দূর কর, আমাকে পথ দেখাও, আলো দাও প্রভু আলো দাও।" কেউ বা দশা-পেয়ে গুমরে-গুমরে কাঁদতে থাকলো। "প্রভু, প্রভু, চরণে স্থান দাও!"—ব'লে আমারি পানে একজন বুড়ো ঝুঁকে পড়ে কেবলি মাটি হাতড়াচ্ছে দেখলেম। প্রধান-আচার্য্য এতক্ষণ কি একটা যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একেবারে সপ্তমে সুরু করলেন ধর্ম্ম-সঙ্গীত—

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু,
তুমি ধাতা,—
আমাদের পার কর হে—
তোমার ধর্ম্ম-তরী ভরি ভরি
পাপীদের পার করহে—
ধর্ম্মতরী-ই-ই
আমাদের ধর্ম্মতরী ভরি ভরি
ধর্ম্মতর ই-ই-ঈ

খুব টানা হ্রস্ব-ইকার থেকে আরম্ভ ক'রে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ-ঈকারে গিয়ে গান শেষ হ'ল। দেখলেম তাওয়ার উপরে কতকটা বালির

তাত পেয়ে খৈগুলো যেমন একটার পর একটা ক্রমাগত ফুটে উঠতে থাকে, তেমনি সঙ্গীত আর বক্তৃতার উত্তাপ পেয়ে একটির পর একটি এমন কত যে পাপী, তাপী, অনুতাপী আমার চারিদিকে সেদিন ফুটে উঠলো তার সংখ্যা নেই। আমার এক-একবার মনে হ'তে লাগলো, বুঝি আমিই একমাত্র জগতের মধ্যে একটি সাধু বেঁচে আছি!

সভা-ভঙ্গের পরে প্রচারক স্বয়ং এবং আরো দুচার জন কাঁচা-বয়সের ব্রাহ্ম-ভ্রাতা-ভগিনী মালতীকে ঘিরে রাস্তার ওপারের মস্ত বাড়িটায় পৌঁছে দিলেন। আমি আর সেদিন আমোল পেলেম না। আর শ্যামাচরণ, সে যখন আমার মুখে শুনলে আজকের সমাজের কাণ্ডটা, তখন হো-হো-ক'রে খানিকটা হেসে বললে—"গেলে তো হতো আমারো!" আমি রেগে বল্লেম—"মালতীকে আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তুই যে কি, তা আমি আজও ঠিক করতে পারলাম না। তুই বেরো!" শ্যামাচরণ হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার পরদিন ভোরে মালতীর বুড়ো চাকর এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বল্লে—"আপনাকে আর শ্যামবাবুকে একবার ওখানে যেতে হবে। দিদিমণির শরীর ভালো নেই।" আমি তাড়াতাড়ি শ্যামাচরণকে ডাক দিতে ছুটলেম। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর শ্যামাচরণের বাসার ঝিটা ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে-মুছতে এসে বল্লে—"বাবু তো কাল রাতের গাড়িতেই চলে গেছে!" কোথায় যে গেছে শ্যামাচরণ, তা কেউ জানে না। মালতীর বাড়িতে ঢুকছি, দেখলেম প্রচারক বেরিয়ে আসছেন। আমার কেমন ভয় হ'ল, শুধোলেম—"মালতীর খবর ভালো তো?" প্রচারক সোনার চশমা-জোড়াটা সিল্কের চাদরে মুছতে-মুছতে গম্ভীরভাবে বললেন—"শরীর মন্দ নেই কিন্তু মনটা এখনো সম্পূর্ণ ওলট-পালট অবস্থায় রয়েছে। মিনির সঙ্গে ওঁকে আমি কিছুদিন কার্সিয়াং পাহাড়ে আমাদের ব্রহ্মাবাসে কাটিয়ে আসতে উপদেশ দিয়েছি। ওঁরও ইচ্ছা দেখলেম সেইখানেই গিয়ে দীক্ষা নেওয়া। আপনার সঙ্গে শ্যামবাবু নেই যে?" লোকটার চোখ-মুখের মোড়লি-আনা ভঙ্গী এবং শ্যামাচরণের সম্বন্ধে প্রশ্নের ধরণটা আমার মোটেই ভালো লাগলো না। আমি কোনো জবাব না দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলাম। মালতীর কাছে মিনি বসে ছিল, আমি যেতেই দুজনে ব'লে উঠলো—"আপনাকে আর শ্যামবাবুকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

আমি হেসে বল্লেম—"কার্সিয়াং পাহাড়ের চূড়ো পর্য্যন্ত যেতে পারি, তার উপর নয়।" "আর শ্যামবাবু?"—ব'লেই মিনি আমার দিকে একবার কটাক্ষ করলে।

শ্যামাচরণ রাত থেকে অদৃশ্য শুনে মিনি একটু মন-মরা হ'ল, কিন্তু মালতী দেখলেম বেশ সহজ সুরে বল্লে—"আপনি তো আমাদের সঙ্গে আসবেন, তা হ'লেই হ'ল।"

কি জানি হঠাৎ কি কারণে মিনি তার মত বদলালে। ষ্টেশনে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে তার ছোট ভাই এসে বলে গেল—"মিনির কলেজের পড়ার ব্যাঘাত হবে, তাই সে এখন পাহাড়ে যেতে পারবেনা।" কাজেই একা মালতীর সঙ্গে আমি রওনা হলেম। যাবার পূর্ব্বে শ্যামাচরণের বাসায় আর-

একবার খোঁজ নিয়ে জান্‌লেম, তখনো সে ফেরেনি, বোধ হয় ফিরবেনা শীঘ্র, কেননা কাপড়-চোপড় নিয়ে গেছে।

(৩)

পাহাড়-অঞ্চলে আমরা দুজনেই প্রথম যাত্রী, কাজেই বিছানা-পত্র প্যাঁটরা-বাক্স ইত্যাদি ছাড়া আর-কোনো-কিছু পদ্মার ওপার পর্য্যন্ত আমার মাথায় একেবারেই ঢুকতে পারেনি। জিনিষ-পত্রগুলো একবার জাহাজে তোলা, গাড়িতে ওঠানো, আবার সেখান থেকে অন্য গাড়িতে চালান দেওয়া এবং নিজেকে ও মালতীকে সাম্‌লে চলা—এম্‌নি নানা গোল-যোগের মধ্যে দিয়ে চ'লে আমার মনটা এমন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল যে, মেঘের উপরে অনেক হাজার ফুট কেমন ক'রে যে উঠে এলেম তা দেখবার অবকাশ মোটেই পাইনি। হঠাৎ একসময় মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে টিনের ছাত আর কাঁচ আর ভিজে-ভিজে কালো তক্তা-মোড়া একটা বাজারের ধারে অত্যন্ত স্যাঁৎসেতে ও অত্যন্ত ছোট অন্ধকার একটা জায়গায় নেমে দেখলেম, বড়-বড় অক্ষরে লেখা কর্সিয়াং—অর্থাৎ সেকালের কার্সিয়াং! এই মেঘ আর অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মাবাসটা খুঁজে নিতে হবে ভাবছি, মালতী একখানা লাল শাল মুড়ি দিয়ে একটা বাক্সের উপরে বসে মস্ত একটা ধোঁয়া আর কুয়াশার দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় একখানা ট্রলি আর তার উপরে দু-চারটে বন্দুকধারী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ ষ্টেশনে এসে ঢুকল। তার পরেই শ্যামাচরণের গলা পেলুম—"এ কুলি চ'লাও জল্‌দী!" "শাম যে!"—ব'লেই আমি মালতীকে জিনিষগুলো একটু আগলে থাকতে ব'লে যেখানে ট্রলিটা লেগেছিল সেদিকে দৌড়লেম। ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে একটা ওয়াটার-প্রুফ মুড়ি দিয়ে দু-তিন জন কুলি আর শিকারীর সাহায্যে মস্ত একটা মরা বাঘ গাড়িটা থেকে নামাচ্ছে—আমাদের শ্যামাচরণ। "কিহে!"—ব'লে তার পিঠে একটা থাবড়া বসাতেই শ্যামাচরণ কট্‌মট্‌ ক'রে আমার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—"একি! তুমি এখানে একা না কি?" আমি দুটো আঙুল তার নাকের সাম্‌নে উঠিয়ে বল্লেম—"দুজন! কিন্তু জিনিষ-পত্র অনেক, তাই মালতী সেগুলো ওখানে বসে আগলাচ্ছে!" শ্যামচরণ ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—"আমাকে তো আগে খবর দিলেই হতো! হঠাৎ এরকম ক'রে অচেনা জায়গায় আসাটা তো ভালো হয়নি! বাসা ঠিক হয়েছে তো? চল, চল, দেখি!" ব'লেই মরা বাঘটা কুলীদের জিম্মায় রেখে শ্যামাচরণ আমাকে টানতে-টানতে মালতী যেখানে একটি লাল পুঁটুলির মতো নানা রঙের সতরঞ্চ-জড়ানো বিছানা-পত্রের মধ্যে বসে আছে একেবারে সেখানে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"আসুন, ওয়েটিং রুমে কিছু খেয়ে নেবেন।" কুলীর সর্দ্দার এসে আমাদের জিনিষ-পত্র খালাস করবার, চালান করবার ডাণ্ডি ডেকে আমাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেবার সব ভার নিজের কাঁধে নিয়ে শ্যামাচরণের দিকে মস্ত একটা সেলাম দিয়ে দাঁড়ালো। আমি হাঁপ্‌ ছেড়ে একটা চুরুট ধরাতে সময় পেলেম। আর ঠিক সেইসময় কুয়াশাও কেটে সাম্‌নের পাহাড়ে

আলো এসে পড়লো—জলে-ধোয়া চমৎকার দিনের পরিস্কার আলো!

মালতী ব'লে উঠলো—"আঃ, আলো পেয়ে বাঁচা গেল!"

আমরা কজন ওয়েটিং রুমে ঢুকছি এমন সময় চশমা-চোখে কালো বনাতের কোট-পরা এক ভদ্রলোক কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া দাড়ির মধ্যে থেকে খানিকটা উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—"মশায়রা কি কলকতা হইতে আইছেন? ওনার নাম কি মালতী?"

শ্যামাচরণ খানিক ভুরু কুঁচকে বল্লে—"আপনি?"

লোকটা একটা ময়লা রুমালে মুখ মুছে বল্লে—"আমি এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি, শ্রীমতী মালতীকে লইতে আইলাম।"

শ্যামাচরণ একবার মালতীর দিকে চাইলে। মালতী অমনি এগিয়ে এসে সে লোকটাকে বল্লে—"আমার নাম মালতী, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাড়িতে থাকতে আমার ইচ্ছা নেই, এখানে অন্য বাড়ি কি পাওয়া যাবে?"

"বাড়ি তো পাওয়া মুস্কিল!" ব'লে লোকটা আর-একবার ময়লা রুমালটা মুখে ঘসতে লাগলো। আমি শ্যামাচরণের দিকে ফিরে বল্লেম—"উপায় কি?" খানিক ভেবে শ্যামাচরণ বল্লে—"আমাদের এখানে একটা ছোট-খাটো বাড়ি আছে, একটু দূরে, প্রায় বনের মধ্যে, বড়ই নির্জ্জন! সেটায় যদি সুবিধে হয় তো থাকতে পারো, আমি তো আজই নেমে চল্লেম।"

বলা বাহুল্য আমরা শ্যামাচরণের পরিস্কার ছোটখাটো বাংলাটাতে গিয়েই উঠলেম। শ্যামাচরণের শিকার-করা বাঘটা কল্‌কাতায় নেমে গেল; কিন্তু শ্যামাচরণ নিজে আর তার পকেটের মস্ত-একটা বাঘের-নখওলা চেনে-লটকানো ঘড়িটা ঠিক নিয়মিত সময়ে আমাদের খাওয়া বেড়ানো যাতে হয় সেই জন্যে রয়ে গেল কার্সিয়ং পাহাড়ে—আলোয়-অন্ধকারে দিনে-রাতে শীতে-গরমে! তারপর আষাঢ় মাসে পাঁজিতে ছাপানো শুভ-বিবাহের এক প্রশস্ত দিনে সানাইয়ের সুরে-ভরা রোশনাই-করা গোধূলিতে আমি তাদের দুজনকে নামিয়ে আনলেম। আর মিনি? সে—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবন-রহস্য

(গল্প)

একদিন আষাঢ়ের চড়্-চড়ে রোদে কাল-চক্রের কোন-একটা জায়গা বিগড়ে গিয়ে দুপুরবেলাটা অসাড় হোয়ে সহরের বুকের উপর পড়ে ছিল—চলৎশক্তিহীন, স্থির!

রাস্তায় লোকজন গাড়ী-ঘোড়া কিছু নেই, কোথাও কোন বাড়ীর ছাতের আলসের নীচে দুই-একটা কাক বসে ঝিমোচ্ছে, আর মধ্যে মধ্যে ধরা-গলায় বিকৃত স্বরে এক-একবার ডাকছে।

রোদের ঝাঁজে ঘরে কিংবা বাইরে কোথাও তিষ্ঠুতে পারা যাচ্ছে না। এমনি সময়ে কলকাতা সহরের একটা মেসের তেতলার ঘরে খাটের ওপর বসে বসে রতিকান্ত ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়—!

খাটের ওপর বিছানা-চাদর কিছুই নেই, অনেকদিন হোল সেগুলো সব পুরোন-বাজারে আশ্রয় নিয়েছে। খাটখানাও যে সেখানে যায় সে সম্বন্ধে সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি, তবে পুরোন-বাজারের লোকেরাও সেটাকে পুরোন বলে প্রশংসাপত্র দেওয়ায় সেটার আশা সে ছেড়ে দিয়েছিল।

হাঁটু-দুটোকে থুতনীতে ঠেকিয়ে রতিকান্ত দুলে দুলে ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়!

প্রায় বছরখানেক থেকে সে কর্ম্মহীন বেকার অবস্থায় বসে আছে। বাক্স, বই, জুতো, জামা, বিছানা ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি তার যা-কিছু ছিল, তাই বিক্রি কোরে এতদিন সে মেসের দেনা চুকিয়ে এসেছে, স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এই কেওড়া কাঠের তক্তাপোষটা শুধু পড়ে আছে।

আজ তিন মাস হোল, সে মেসে একটি পয়সাও দিতে পারে নি। মেসওয়ালারা আর কতদিন সহ্য করবে? আজ দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তারা তাকে অন্যত্র জোগাড় দেখতে বলে দিয়েছে।

রতিকান্ত ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়!—সমস্ত জীবনটা কি তবে এমনি কোরেই কাটবে? সেই কবে ছেলেবেলায় সে সহায়-সম্পদহীন হোয়ে এই সংসার-সমুদ্রে ভেসেছিল, তার ওপর দিয়ে ঝড়ের পর ঝড় চলে গিয়েছে, এখনও কি কূল পাবার সময় হয় নি? ছেলেবেলা এর-তার বাড়ীতে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে, চার আনা আট আনা মাসিক চাঁদা ভিক্ষে নিয়ে নিয়ে সে পড়ার খরচ চালাত; ভিক্ষে করতে করতে বিরক্ত হোয়ে একদিন সে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছিল। সে একদিন, আবার আজ একদিন—!

মেসে যে আর একদিনও থাকা চলবে না সেটা মেসওয়ালারা সেদিন তাকে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। বেলা পড়তেই সে দেওয়ালের পেরেক থেকে ঘেমো কোটটা খুলে গায়ে দিল, তারপর খাটের তলা থেকে জুতোজোড়া টেনে এনে পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

রাজপথের দুকূল ছাপিয়ে তখন জনস্রোত বয়ে চলেছে। কেউ আস্তে, কেউ দৌড়ে, কেউ-বা ঘোড়ার গাড়ীতে, কেউ-বা মোটরে, কাজে অকাজে সবাই চলেছে। কারো কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই!

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে রতিকান্ত গোলদীঘিতে ঢুকে পড়ল। গোলদীঘির চৌকো পুকুরের চারিদিকে লোকের মেলা। স্থানে স্থানে এক-এক-দল লোক গোল হয়ে বসে মজলিস জমাচ্ছে। এক-এক মজলিসে এক-এক রকমের আলোচনা চলেছে। কথা বলতে বলতে কেউ বা তৃণাসন ছেড়ে তড়াক্ কোরে দাঁড়িয়ে উঠে তারস্বরে খানিকটা চেঁচিয়ে আবার বসে পড়ছে, কেউবা হাসতে হাস্‌তে তৃণশয্যায় ঢলে পড়ছে, যেন দম্ দেওয়া পুতুল!

বায়োস্কোপের ছবির মতন এই দৃশ্যগুলো তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে মজলিসগুলো থেকে এক-আধটা কথা ঠিকরে রতিকান্তর কানে এসে বাজ্‌ছিল, কোথাও বা মোহনবাগান কোথাও বা মহাত্মা গান্ধি।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ভিড়ও পাৎলা হতে লাগ্‌ল। রতিকান্ত তখনও ঘুরছিল। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে তার ক্লান্তি এসেছিল, একটা ঝোপের পাশে নিরিবিলি একখানা বেঞ্চি পাতা রয়েছে দেখে সে সেখানে গিয়ে বস্‌ল।

ক্রমে বাগান একবারে ফাঁক হোয়ে গেল। রতিকান্ত সেইখানে বসে বসে ভাবতে লাগল—এতক্ষণ বোধ হয় মেসের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর দরজা বন্ধ হোক্ বা না হোক্, তাতে তার কি? আজ ত তারা চরম জবাব দিয়ে দিয়েছে! তবুও ত ঐ মেসেই সে আট-দশ বছর কাটিয়েছে—

এতক্ষণ বোধ হয় ছাতের ওপর সবাই গুলজার হয়ে বসে গল্প করছে। তার কথা হচ্ছে কি? না, না,—আর কিসের জন্য তার কথা হবে? তবুও ত তারা প্রায় তিনমাস তাকে খাইয়েছে! তারা সংসারী লোক, আর কতদিন খাওয়াবে? কাল যদি চাকরিটা পাওয়া যায় তবে আবার গিয়ে—

—বাবু, উঠিপড়—

হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। সে শুনলে, বাগানের উড়ে মালী তাড়া দিচ্ছে—বাবু, উঠি যাও, মু দুয়ার বন্ করিবি—

অবহেলার ভরে সে মালীকে জিজ্ঞাসা কল্লে—কটা বেজেছে রে?

—এগারোটা বাজি গলা—

বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়ে আস্তে আস্তে রতিকান্ত বাগানের বাইরে চলে এল। রাস্তায় তখন লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। কোথাও ফুটপাথের ধারে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে একটা পাগলা পড়ে আছে, কোথাও বা তিন-চারটে মুটে সার-বন্দীভাবে পাশাপাশি রাস্তায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। থেকে থেকে এক একটা মোটর গাড়ী রাস্তার কুকুরগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে ভীষণ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে—রতিকান্তর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তার পা-দুটো তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দিকেই সে চলেছে, ধীর মন্থর গতিতে!

ঘুরতে ঘুরতে সে গঙ্গার ধারে নিমতলার ঘাটের কাছে এসে পৌঁছল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল, সে শব-বাহকদের বিশ্রাম করবার ঘরখানার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরের কোণে একখানা বেঞ্চি খালি রয়েছে দেখে সে তাড়াতাড়ি সেখানা দখল করে সটান শুয়ে পড়ল।

ঘরের মেঝেয় আট-দশজন লোক পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল। তাদের মধ্যে জন দুয়েক গাঁজা টিপছে আর মন্ত্র আওড়াচ্ছে—

—নয় টিপ তিন কাটে
পটাপট্ কল্‌কে ফাটে—

রতিকান্ত শুয়ে শুয়ে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগ্‌ল। মিনিট-কয়েক সেই ভাবে পড়ে থেকে সবার অলক্ষ্যে জুতোজোড়া কোটে মুড়ে মাথার বালিশ করে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে তার একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় মেঝে থেকে দু-তিন জন লোক উঠে এসে তাকে ধাক্কা দিতে লাগল—মশাই, ও মশাই—শুনছেন?

নাড়া পেয়ে রতিকান্ত ধড়্‌মড় কোরে উঠে বসল

—এক টান হোক্—

রতিকান্ত হাত জোড় কোরে কাতরস্বরে তাদের বল্লে—আমাকে রেহাই দিন মশায়—

—খাবেন না কি রকম? শ্মশানে এসে বাবার জিনিষে অভক্তি—

মেঝেতে যারা বসেছিল তারা কথাটা শুনে তড়াক্ কোরে ভূমি-শয্যা ছেড়ে রতিকান্তর সামনে এসে দাঁড়াল। সকলের মুখেই এক কথা—বাবার অপমান করতে নেই!

রতিকান্ত জন্মে কখনো এমন ফ্যাসাদে পড়ে নি। সে দেখ্‌লে, দশ-বারোজন লোক রক্তনেত্রে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, আর একজন গাঁজার কল্‌কেটা তার নাকের কাছে ধরে—সে বেচারা জীবনে কখনো এ-সব জিনিষের স্বাদ জানেনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি উদরান্নের সংস্থান করতেই তার কেটে গিয়েছে, নেশা করবার সময় কোথা! রতিকান্ত ভয়ে ভয়ে তাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

তাদের মধ্যে থেকে একজন লোক ধম্‌কে বল্লে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? কল্‌কেটা হাতে দে না।

রতিকান্ত মন্ত্র-চালিতের মত কল্‌কেটা হাতে নিয়ে তাতে কোন রকমে একটা টান দিয়ে কাশ্‌তে কাশ্‌তে সেটা ফিরিয়ে দিতে গেল।

—সে কি কথা—?

তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল—সে হবে না দাদা, রাজা হতে হবে—রাজদ্বারে শ্মশানে চ—একটানে কি হবে?

—এক টানেতে যেমন-তেমন
দু-টানেতে মজা!
তিন টানেতে মদনমোহন
চার টানেতে রাজা—

তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কোন রকমে সে চারটে টান মেরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কল্‌কেটা ফিরিয়ে দিয়ে আবার বেঞ্চিতে গা ঢেলে দিলে; শুয়ে শুয়ে তার মনে হতে লাগল, সমস্ত ঘরখানা যেন নাগর-দোলার মত দুল্‌তে সুরু করেছে। ক্রমে তার ভাবনা-চিন্তাগুলো সব এলিয়ে পড়তে লাগ্‌ল। তুরিতানন্দের কৃপায় ত্বরায় সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়্‌ল।

ঘরের মধ্যে কিসের একটা ভয়ানক গোলমালে তার ঘুমটা চট্ করে ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বেঞ্চির ওপর উঠে বসে ভাবতে লাগল এ আবার কোথায় এলুম! তার মনে হচ্ছিল যে, সে মেসের ঘরেই শুয়ে আছে। ঘরের এক কোণে চারটে মাতাল হাল্লা কোরে মদ খাচ্ছিল, রতিকান্ত তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল, এত লোক তার ঘরের মধ্যে ঢুকল কোথা থেকে!

কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে রতিকান্তর মনে পড়ে গেল, মেসের ঘরে সে নেই, এটা নিমতলার ঘাট, এই সেই জানলা, ঐ সেই ঝিলমিলি।

—দাদা একটু কারণ করবে না?

একটা মাতাল দল ছেড়ে উঠে এসে রতিকান্তকে জিজ্ঞাসা করলে—দাদা একটু কারণ করবে না?

বিরক্তির সঙ্গে একবার—না, না—বলে

সে আবার বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। রতিকান্তর বিরক্তি দেখে মাতালটার মনে বোধ হয় দুঃখ হলো। সে তার হেঁড়ে গলাটাকে যতদূর সম্ভব করুণ করে তান ধরলে—

গঙ্গা যদি মদ হোত মা-আ-আ
মদ বোলে মা সবাই খেত—
আর হাতী যদি হতো পাঁটা
মদের মুখে লাগ্‌তো ভাল—

মাতালদের গোলমাল আর সহ্য করতে না পেরে রতিকান্ত কোটে জড়ানো জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাটে গিয়ে বস্‌ল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ঘাটে দু'-একজন করে লোক স্নান করতে আস্‌ছে। রতিকান্তর মাথাটা ভয়ানক ভারী বোধ হচ্ছিল, সে ঘাটের এক কোণে জুতো আর জামাটা রেখে নদীতে গোটাকয়েক ডুব দিয়ে এল।

সেদিন এক অফিসের বড়বাবুর সঙ্গে তার দেখা করবার কথা ছিল। চাকরি হবার ভরসা তিনি কিছু দেন নি, তবে একবার দেখা করতে বলেছিলেন। সকালবেলাটা খানিক ঘাটে বসে খানিক রাস্তায় পায়চারি করে বেলা এগারোটার সময় সে বড় বাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

বড়বাবু তাকে অপেক্ষা করতে বলে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। রতিকান্ত বাবুদের জলখাবারের ঘরে গিয়ে বসল।

চব্বিশ ঘণ্টার ওপর তার পেটে কিছু পড়ে নি। অনাহারে দু' একদিন কাটিয়ে দেওয়া তার অভ্যাস ছিল, তাই তেমন কষ্ট হচ্ছিল না, কিন্তু বসে থেকে থেকে তার শরীরটা ঝিমিয়ে আসতে লাগ্‌ল। হেলান দিতে দিতে ক্রমে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

কি একটা স্বপ্ন দেখে রতিকান্তর ঘুমটা [illegible]র ভেঙে গেল। তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। অফিস থেকে দু' একজন করে লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জল দিয়ে কোঁচার খুঁটে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে আবার বড়বাবুর কাছে গিয়ে হাজির হলো।

বড়বাবু তখনও ব্যস্ত। রতিকান্তর কথা শুনে তিনি খাতা থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলেন—না বাপু, তোমার জন্যে কিছু করতে পারলুম না। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।

আশাহত রতিকান্ত একবার বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে—অন্য কোথাও খালি আছে, জানেন কি?

বড়বাবু হিসাবের খাতাটা দেখতে দেখতে বল্লেন—তাত জানিনে বাপু—

অবসন্নভাবে টল্‌তে টল্‌তে সে আপিস থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

বিকেলবেলা গড়ের মাঠে লোকের ভিড়। জলস্রোতের মত জনস্রোত চলেছে, হেলে দুলে ঢেউ খেতে খেতে—খেলার ময়দানের দিকে। রতিকান্তরও দিনকয়েক এই খেলা দেখার বাতিক হয়েছিল কিন্তু পয়সার টানাটানিতে সে বাতিক আপনিই থেমে গিয়েছিল।

একটা বড় বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার থাম ধরে রতিকান্ত বাইরের জগৎটার দিকে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগ্‌ল। সে ভাবছিল

তার চারদিকে এই যে আনন্দের উৎসব, এই যে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চলেছে, সে কি তারই দীনতাটা মনের মধ্যে ভাল করে ফুটিয়ে তোলবার জন্য? এই যে রাজপথ বেয়ে লোক ছুটেছে—হাস্‌তে হাস্‌তে, গল্প গলি করে, এই আনন্দের মধ্যে তার এক কোন অংশ নাই? এদের সঙ্গে তার কি কোনও সংশ্রব নেই, কোথাও কি কোন মিল নেই? তবে কি সে একটা সৃষ্টিছাড়া জীব!

থামটা ছেড়ে সেও সেই ভিড়ের মধ্যে গা ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কেরাণীর কিচিমিচি, মোটর গাড়ীর ভোঁ ভোঁ আর রাস্তার ধূলোয় সন্ধ্যের বাতাস ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছিল। রতিকান্তর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগ্‌ল। অল্পক্ষণ হাঁটার পরই সে রাস্তা ছেড়ে মাঠের বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

বাগানের মধ্যে একখানা বেঞ্চিও খালি নেই দেখে রতিকান্ত ঘাসের ওপরে গিয়ে বস্‌ল। ঘাসের ওপরে এখানে সেখানে আরও অনেক লোক বসেছিল। প্রফুল্ল শতদলের মতন ছোট ছোট ইংরেজের ছেলে-মেয়ে ঘাসের ওপর ছুটে ছুটে খেলা করছে, —যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি, আনন্দের তুব্‌ড়ি। একটা ছেলেকে ধরে আদর করবার জন্য রতিকান্তর বুকের মধ্যে একটা নূতন অনুভূতি জেগে উঠ্‌তে লাগল। এ-রকম অনুভূতি আগে তার কখনো হয় নি। ঐ ছোট নরম গালে তুটো চুমু—একবার মাত্র বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরা—একটি ছেলে কাছে আসতেই সে হাতটা বাড়িয়ে তাকে ধর্‌তে গেল। ছেলেটি তার ভঙ্গি দেখে ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রতিকান্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ধ্যে হবার আগেই চারদিকে আলো জ্বলে উঠল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর একটা অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হোয়ে পড়্‌ছিল, ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে সে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ কিসের একটা আঘাতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখে, একজন পাহারাওয়ালা রুলের গুঁতো দিয়ে তাকে মধুরভাবে সম্ভাষণ করছে আর বাগান থেকে উঠে যেতে বল্‌ছে। পাহারাওয়ালাকে দেখেই তার ইচ্ছে হলো, একটি ঘুসি মেরে তার নাকটা থেঁতো কোরে দেয়, কিন্তু কোন রকমে সে ইচ্ছাকে দমন করে সে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

ঘুমের ঘোরে সে দাঁড়াতে পাচ্ছিল না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, রাস্তার মাঝখানেই শুয়ে পড়ে, কিন্তু চারিদিকে পাহারাওয়ালা গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সে অবশ চরণে টলতে টলতে গঙ্গার ধারের রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলতে লাগল।

নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোবার চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হবামাত্র কাল্‌কের কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবলে, আর যেখানেই হোক্‌, সেখানে আর যাওয়া নয়। এমনি করে চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়বো, ব্যস্‌, তার পর যা হবার হবে।

রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে তার মনটা সমস্ত জগতের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে

লাগ্‌ল। কেন, বড়বাবু কি ইচ্ছে করলে তাকে একটা চাকরি দিতে পারতো না? নিশ্চয় পারতো—অত্যাচার! অবিচার! শক্তির অপব্যবহার! এই যে লক্ষ্যহীন হয়ে রাত্তিদুপুরে সে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেন? কিসের জন্য? বাগানে শুয়ে থাকলে কার কি ক্ষতি হত?

ভাবতে ভাবতে তার মনে হোতে লাগল, সেই বা দুর্ব্বল কিসে? তার মধ্যে যে শক্তি আছে, তাতে সে পৃথিবীটাকে ওলট্‌ পালট্‌ করে দিতে পারে। চল্‌তে চল্‌তে রাস্তার দু-পাশের বাড়ী, ঘর, দোকান মাল-গুদাম, যা কিছু চোখে পড়ছিল তার মনে হচ্ছিল সেগুলোকে ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে সেই ভগ্নস্তূপের ওপর ধেই ধেই করে খানিকক্ষণ নেচে বেড়ালে বোধহয় সে একটু শান্তি পায়! নিষ্ফল আক্রোশে হাত দুটোকে মুঠো কোরে সে বাতাসে ঘুসি ছুঁড়তে লাগল।

অবসন্ন পা-দুটোকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তার মনে হতে লাগল এ নিরুদ্দেশ যাত্রার কখন্‌ শেষ হবে, কবে শেষ হবে, কোথায় কেমন করে শেষ হবে? দিব্যি ত বাগানে শুয়েছিলুম—যে পাহারওয়ালাটা তাকে সেখান থেকে তুলে দিয়েছিল, তার ওপর তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল। মূর্খ, দশ টাকা মাইনের চাকর, দুনিয়া দৃক্‌পাত নেই! সেইখানেই তাকে উচিত শিক্ষা দিলেই হোত। তার অন্তর থেকে কে যেন বলতে লাগল—সে জানে না যে, সে কার সঙ্গে লেগেছিল। তাকে কিছু না বলে আসাটা ভাল হয় নি; হয়ত তার মতন আবার কে তার হাতে লাঞ্ছিত হবে। ভবিষ্যতে যাতে সাবধানে চলে সেইভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। রতিকান্ত সেখান থেকে আবার বাগানের দিকে ফির্‌ল।

হাত দুটোকে জোরে দুলিয়ে খট্‌ খট্‌ করে পায়ের আওয়াজ করতে করতে আবার সে মাঠের দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

পথের পাশে এক জায়গায় কুণ্ডলী হয়ে একটা কুকুর পড়ে ঘুমোচ্ছিল, রতিকান্তর পায়ের খট্‌ খট্‌ আওয়াজ শুনে সেটা জেগে উঠে শুয়ে শুয়েই ধমকের সুরে একবার ভেক্‌ করে চেঁচিয়ে উঠল, যেন সে বলতে চায়—আঃ, জ্বালালে দেখ্‌চি!

রতিকান্ত কুকুরটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, ঐ রকম ডাক শুনে সে আবার ফিরে এসে তার পেটে সজোরে দুই লাথি কষিয়ে দিলে।

রাত্রের নিস্তব্ধতা চৌচির করে চিরে দিয়ে চীৎকার করতে করতে কুকুরটা সেখান থেকে উঠে দৌড় দিলে। তার সেই আর্ত্তনাদ রতিকান্তর কানের মধ্যে ঢুকে তার সমস্ত শরীরে যেন বরফ-গলা জল ঢেলে দিলে। তার মনে হল—আহা, বেচারী!

সহানুভূতিতে তার হৃদয়টা গলে যেতে লাগল।

বাগান পর্য্যন্ত আর যাওয়া হলো না। সেইখান থেকে আবার সে আগের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে লাগল।

আবার তার মাথার মধ্যে চিন্তা-চক্রের সেই একঘেয়ে ঘুর্ণিপাক সুরু হোল। আজকের রাতটা কোথায় কাটাই? আর ত চলতে পারি না। পৃথিবীতে তার কেউ নেই! বন্ধু-বান্ধব,

আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ—কেউ নেই! এতদিন যে ছাতের তলায় সে মাথা গুঁজে পড়েছিল, মাথার ওপর থেকে তাও আজ সরে গিয়েছে। সে একবার ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইলে। তার মনে হতে লাগল—ঐ কালো অন্ধকার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যত কিছু অভিশম্পাত সবই তার মাথার ওপর ঝরে পড়ছে। এ' থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই, সে যে গৃহ-হীন;—তার মাথার মধ্যে কে যেন তালে তালে হাতুড়ি পিটে বলতে লাগল—গৃহ-হীন—গৃহহীন—

রতিকান্ত দুই হাতে দুই কান চেপে ধরে রাস্তার ধারের একটা রোয়াকের ওপর বসে পড়ল।

সেইখানে বসে বসে সে তার সমস্ত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করতে আরম্ভ করলে। বহুদিন আগে আর একবার তাকে গৃহ-হীন হতে হয়েছিল। তখন তারা মায়ে-পোয়ে এই সহরেরই একটা পল্লীতে একখানা খোলার ঘর ভাড়া করে থাকত। বিধবা মা ভিক্ষে-সিক্ষে করে যা পেতেন, তাই দিয়ে কোন রকমে তাদের দিন গুজরান হোত। একবার বাড়ীওয়ালার ভাড়া বাকী পড়াতে তারা বাড়ী থেকে তাদের বের করে দিয়েছিল। সেদিনকার সেই ছবিটা তার মনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

সেদিনের সেই সকালবেলায় তারা যখন তাকে আর তার মাকে রাস্তায় বের করে দিলে—তখন সে কতটুকু! মার একখানা হাত ধরে সে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে গাড়ী ঘোড়া দেখছিল; সেইখানে সেইরকম ভাবে দাঁড়িয়ে সহস্র রকম অর্থহীন প্রশ্নে সে মাকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলছিল, কোন উত্তর না পেয়ে সে বার বার মার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। থান-কাপড়-পরা গলা-অবধি-ঘোমটা-দেওয়া রাস্তায়-দাঁড়ান সেদিন যে মূর্ত্তিখানা সে দেখেছিল বিস্মৃতির বুক ফুঁড়ে সজীব হয়ে আজ সেই মূর্ত্তি তার মনের সামনে এসে দাঁড়াল। উঃ—মার জীবনে সেদিন কি সাংঘাতিক পরীক্ষাই এসেছিল!

অনেকক্ষণ ভাবনার পর সে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল—যাক্ মা আজ এ পৃথিবীতে নেই।

রোয়াকের উপর আর বেশীক্ষণ চুপ কোরে বসে থাকা চল্‌ল না। রতিকান্ত সেখান থেকে উঠে পড়ে আবার এগিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করল। চল্‌তে চল্‌তে তার ভাবনাগুলো মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে পড়ছিল। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একেই শরীর শ্রান্ত, তার ওপরে ক্ষিদেয় তার পেটের মধ্যে একটা বিশ্রী যন্ত্রণা হতে লাগল। যন্ত্রণাটা ভুলে যাবার জন্য সে ফুটপাথ থেকে রাস্তার মধ্যিখানে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগ্‌ল।

—হেইও—আভি গিয়াথা, শুনতা নেই—ভোঁ ভোঁ শব্দ করে একখানা মোটরগাড়ী রাস্তায় একটা ছোটখাট আঁধিয়া তুলে চলে গেল। রতিকান্ত এক মনে ভাবতে ভাবতে চলেছিল, পেছন দিকে যে মোটরগাড়ী এসে পড়েছে তা সে টের পায়নি। হঠাৎ কানের কাছে গোলমাল হওয়াতে সে লাফিয়ে এক দিকে সরে গেল। মোটরগাড়ীখানা চলে যেতেই তার মনে হল—উঃ একটুর জন্য

বড্ড বেঁচে গিয়েছ, তা না হলে রক্তাক্ত দেহে এতক্ষণ ঐখানটায় মরে পড়ে থাকতে হোত। মৃত্যুর কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। সে সন্তর্পণে ফুট্‌পাথের এক ধার ঘেঁসে চলতে লাগল।

চলেছে ত চলেইছে,—রাত্রিরও শেষ নেই, চলারও বিরাম নেই। সে ভাবছিল, এ সহরে তার মত আর ক'টি অভাগা এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার মত কত অভাগা যে এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে রাস্তায় পড়ে মরে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই। কত অভাগার পাঁজরা গুঁড়ো করে দিয়ে ধনীর মোটর গাড়ী চলে গিয়েছে—এই যে রাস্তার ধুলো যা মাড়িয়ে সে চলে যাচ্ছে, তাদের দেহ এই ধুলোয় মিশে রয়েছে! কত অভাগার শোণিতে এই পথ কতবার কর্দ্দমাক্ত হয়েছে, কে জানে! এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় তাদের অতৃপ্ত আত্মা যত কিছু অভিশম্পাৎ দিয়ে গিয়েছিল, এই ধূলোর প্রত্যেক কণায় কণায় তা মিশিয়ে রয়েছে। ধনীর অত্যাচার, শক্তির অত্যাচার আর কতদিন কত কাল ধরে এই পৃথিবীর বুকে বসে রাজত্ব করবে? এর কি শেষ নেই?

ভাবতে ভাবতে তার ভাবনার সূত্রে জোট পাকিয়ে যেতে লাগল;—মাথাটা যেন তার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা থেকে চন্‌চন্ করে রক্ত টেনে নিয়ে নিজের খোলের মধ্যে জমা করতে সুরু করেছে। মাথার মধ্যে তার উন্মাদ ঘূর্ণন আরম্ভ হোল।

পাগলের মত সে ফুটপাথ থেকে লাফিয়ে রাস্তার ওপর এসে পড়ল, পা থেকে জুতো-জোড়া খুলে ছুড়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে, তারপর রাস্তা থেকে মুঠো মুঠো করে ধুলো তুলে নিয়ে মাথায়, বুকে, সর্ব্বাঙ্গে মাখতে লাগল।

একটা পেঁচার তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানের মধ্যে যেতেই তার চমক ভেঙে গেল। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজের দেহের দিকে তাকিয়েই ভাবলে—এ কি! আমি এ কি করেছি! তবে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না কি? পাগল হওয়ার কথা মনে হতেই তার সমস্ত অন্তরটা চীৎকার করে বলে উঠল,—না, না, আমি পাগল হব না, আমি পাগল হতে চাই না। হে প্রভু, হে দীনশরণ, তোমার এই আনন্দময় ধরার মাঝে আমি বাঁচতে চাই, সুখে বাঁচতে চাই, আমায় পাগল করো না প্রভু, আমায় বাঁচতে দাও। আমার চতুর্দ্দিকে এই যে আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে, এ কি আমার জন্য নয়? যুগ-যুগ ধরে লোকে এই আনন্দের আস্বাদ পেয়ে আসছে—সেই প্রথম যেদিন তরুণ-অরুণ হাসতে হাসতে উদয়-অচলের শিখরে এসে দাঁড়িয়েছিল, বালসূর্য্যের প্রথম কিরণ-সম্পাতে যেদিন এই মৃত ধরণীর বুকে প্রাণ-স্পন্দন আরম্ভ হয়েছিল, যেদিন এই ধরার কঠিন কঙ্করময় বুক ফুঁড়ে ফুল ফুটেছিল, পাষাণ ভেদ করে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হয়েছিল—সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্তরে-বাহিরে এই আনন্দ পুঞ্জে পুঞ্জে বেড়েই উঠেছে—এই আনন্দের মধ্যে আমিও বাঁচতে চাই প্রভু—আমায় বাঁচতে দাও। কিংবা তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে পৃথিবীর বুক থেকে আমার অস্তিত্ব মুছে ফেলে দাও—আমায় পাগল করে দিও না—

রতিকান্ত সেইখানে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ দূরে পাহারাওয়ালার বোঁদের আওয়াজ শুনে সে দৌড় দিলে। কাছেই একটা চাতাল-দেওয়া ঘাট ছিল, সেখানে গিয়ে সে পাণ্ডাদের একটা বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকে সে হাঁফাতে লাগল।

সকালবেলা ঘাটের লোকজনদের ঠেলা মালে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে যে ভীষণ বেদনায় সে পাশ ফিরতে পারছিলে না, জোর করে মাথাটাকে বার-কয়েক ঝেঁকে নিয়ে সে উঠে পড়ল। তারপর আবার এ-গলি সে-গলি—

ক্ষিদেয় তার পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছিল! রাস্তাটা একবার একটু নিরিবিলি হতেই সে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। দোকানদার মহা চিন্তিত-ভাবে খাতায় মুখ জুবড়ে বসে হিসাব করছে—

রতিকান্ত আস্তে আস্তে বল্লে,—মশায় কিছু ভিক্ষা দিন—তিনদিন আমার খাওয়া হয়-নি—

—এসেছ বাবা? সকাল বেলা জ্বালাতে এসেছ, সরে পড়।

রতিকান্তর ইচ্ছা হচ্ছিল যে, লোকটার গলা টিপে মেরে ফেলে বাক্সের মধ্যে যা কিছু আছে নিয়ে দৌড় দেয়। সে একটু জোর করে বল্লে—দিন না মশায়, একটা পয়সা—

—ওঃ ব্যাটার জমিদারী আছে এখানে—বেরো,—নইলে ঝুঁতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেবো বল্‌ছি।

প্রহৃত কুকুরের মত শুড়-শুড় করে দোকান থেকে নেমে সে আবার চলতে আরম্ভ করলে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে ক্ষিদের যন্ত্রণা বেড়ে উঠতে লাগল। পথের দু-ধারের দোকানে থরে-থরে থালায় করে খাবার সাজানো রয়েছে। সেগুলোর দিকে দেখে-দেখে তার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, লাফিয়ে একটা থালার ওপর পড়ে যত খুসী খাবার খেয়ে ফেলে! কি হবে তাতে? না হয় জেল হবে। ফাঁসি ত আর হবে না। হোক্‌গে জেল! আগে প্রাণ, তারপর মান—

দু-তিনবার মনে মনে সংকল্প করেও সে একবারও একটা দোকানে ঢুকতে পারলে না। তার ভিতর থেকে কে যেন প্রতিপদে তাকে বাধা দিতে লাগল। চিরন্তন সংস্কার-বশে এই বাধাটাকে সে এতদিন সুমতির ব্যবস্থা বলে মেনে এসেছিল, আজ সে দেখ্‌লে, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এই সুমতিই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, আর কুমতি বলে, মরবে কেন? সামনে খাবার, খেয়ে ফেলো।

সহরে এক ধনীর প্রাসাদে নিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হোত। এজন্য দেশময় এদের খুব নাম-ডাক ছিল। চল্‌তে চল্‌তে রতিকান্ত ভাবতে লাগ্‌ল—তবে কি আমায় সেইখানে যেতে হবে? তাতেই বা ক্ষতি কি! দিন-ভিখিরীর চেয়ে আমি কিসে উঁচু? বংশের মর্য্যাদা কি জাতের গৌরব কাউকে খেতে দেয় না ত!

পাছে আবার কোন রকম চিন্তা এসে তাকে বাধা দেয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি সেই প্রাসাদের দিকে ছুটল। সেদিকে যেতে যেতে হঠাৎ টেলিগ্রাফের থামের ওপর একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়ল—বিজ্ঞাপনের

ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"কর্ম্মখালি"।

বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তেই মন বলে উঠল—ভগবান তুমি আছ! কে বলে, তুমি নেই?

সমস্ত প্রাণটা কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে দিয়ে ছুটে এসে সে বিজ্ঞাপনটা পড়তে লাগল—

কর্ম্মখালি

পাল কোম্পানির পারদ-বিহীন দাদের মলম, কাপড়ে দাগ লাগে না।

রতিকান্ত আর পড়তে পারলে না। লেখাগুলো যেন মাকড়সার বাচ্ছার মতন কাগজখানার ওপর কিল্‌বিল্‌ কোরে নড়ে-চড়ে বেড়াতে আরম্ভ করে দিলে। সে নখ দিয়ে কাগজখানাকে থাম থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চল্‌ল।

তখনও দরিদ্রদের খেতে দেওয়া হয়-নি। প্রাসাদের সামনে প্রকাণ্ড ময়দানে সহরের যত ভিখিরী এসে জড়ো হয়েছে। সুস্থ, অসুস্থ, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠি, পাগল—কেউ বা বসে, কেউ বা শুয়ে, কেউ বা দাঁড়িয়ে—হাঁ করে সব তাকিয়ে আছে—কখন্‌ অন্ন দেওয়া হবে—কখন্‌ খাবার ডাক পড়বে!

রতিকান্ত জীবনে এ দৃশ্য কখনো দেখে-নি। সহরে এত দরিদ্রও আছে!

নারায়ণের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তার বুকের মধ্যে কিসের একটা কাঁপুনি ধরল। তার মনে হলো, যেন মূর্ত্তিমন্ত দারিদ্র্য তার কঙ্কালসার গলিত দেহখানা নিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে, দেহের ক্ষত থেকে অবিরল পুঁজ-রক্ত ঝরে পড়ছে আর তারি গন্ধে সেখানকার বাতাসটা বিষিয়ে উঠেছে!

রতিকান্ত নাকে কাপড় দিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে রাস্তা করে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে পায়ের তলায় কি একটা নরম জিনিস ঠেকতেই সে ফিরে দেখে, সে একজনের পা মাড়িয়ে দিয়েছে, লোকটার নাকের গোড়া থেকে চিবুক পর্য্যন্ত নেই—খসে গিয়েছে—একটা বিশ্বগ্রাসী হাঁ নিয়ে সে পলক-বিহীন নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ক্ষয়ে-যাওয়া মুখের সমস্ত দুঃখ তার চোখের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে! লোকটার দিকে চোখ পড়তেই তার ভিতর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলে উঠল—ওর মুখই গিয়েছে, অন্তরটা এখনও ঠিক আছে—কিন্তু তুমি এখানে কেন? পালাও, পালাও—বাঁচতে যদি চাও, তবে এখান থেকে পালাও!

চিন্তাকে আর মুহূর্ত্তমাত্র অবসর না দিয়ে সে সেখান থেকে ছুট দিলে।

দৌড়…দৌড়…দৌড়! রতিকান্তর দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তবু সে থামতে পারছিল না। থামলেই যেন সেই বীভৎস মূর্ত্তিটা এসে তাকে চেপে ধরবে! দৌড়তে দৌড়তে একেবারে বেদম হয়ে সে এক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

* * * *

অবশ রতিকান্ত রাত্রিবেলা পাণ্ডাদের কাঠের বাক্সের ওপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়?

আজ পাঁচদিন অনাহারে কেটে গেল। কালকে বিকেলে বাজারের ধার দিয়ে আসবার সময় সে রাস্তায় একটা আম কুড়িয়ে পেয়েছিল, কিন্তু আমটা খাওয়ামাত্রই বমি

হয়ে উঠে গেল। নিজের বমি দেখে সে শিউরে উঠেছিল। আজকে একটা পানের দোকানের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেকেই সে চিনতে পারে-নি।

এবার মৃত্যু নিশ্চিত! কালই হোক কি দুদিন পরেই হোক এই সহরের কোন এক রাস্তার ওপর সে মুখ থুবড়ে পড়বে। দেখতে দেখতে তার চারিদিকে হাজার হাজার লোক জমা হয়ে যাবে। হয়ত এই চোখ দুটোতে তখন আর দৃষ্টি থাকবে না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হয়ত এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি নিমেষের কাহিনীগুলো অন্তর-লোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিংবা এই চোখের দৃষ্টি যদি একেবারে অন্ধ হয়ে না যায় তবে সেই ভিড়ের মধ্যে একটা পরিচিত মুখ দেখবার জন্য তার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠবে। হয়ত বা দু'-একটা পরিচিত মুখ চোখে পড়তেও পারে—কেউ হয়ত বলবে—আহা! কেউ হয়ত দয়া করে তার তৃষাতুর শুষ্ক কণ্ঠে এক গণ্ডুষ জল ঢেলে দেবে। তারপর ধীরে ধীরে এই চোখ থেকে পৃথিবীর আলো নিভে যাবে!

সেদিন রতিকান্ত কাগজে একটা চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখেছিল। সে ভাবতে লাগল—কাল যদি সেখানে চাকরীটা পাওয়া যায়! তবে বোধ হয় এ যাত্রা আর মরতে হয় না! কিন্তু সে কাজ সেই বা পাবে কেন? কতদিন ধরে তারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, কে জানে? তার আগে কত লোক সেখানে গিয়ে দরখাস্ত করেছে। চাকরী! চাকরী!—দুর্লভ দুরাশা! আজ এক বছর ধরে সে তাকে কত আশার গানই শুনিয়েছে! আশা করবার সাহসও যে তার ফুরিয়ে গিয়েছে। তবু—তবু—

সকালবেলা ঘুম ভেঙে যেতেই রতিকান্ত দেখলে যে তার হাত-পা সব অসাড় হয়ে গিয়েছে। দু' একবার চেষ্টা করেও সে উঠতে পারলে না। তার মনে হলো, এইবার বুঝি হয় মৃত্যু হবে। মৃত্যুর কথা মনে হতেই তার বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হতে লাগল। তারপর শরীরের সঙ্গে মনের যুদ্ধ! তার বিদ্রোহী মনটা শরীরকে প্রাণপণে ঠেলা দিয়ে বলতে লাগল, আর যাই হোক, এখানে মরা হবে না। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সে উঠে দাঁড়াল।

সকালটা অনেকখানি এগিয়ে পড়েছিল। পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেই তার মনে হোল, আজকে সেই চাকরীটার সন্ধানে যেতে হবে। কাগজে যে ঠিকানাটা দেওয়া ছিল, দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলে যে, সে জায়গাটা সহর থেকে অনেক দূরে—বেলা এগারোটার মধ্যে সেখানে গিয়ে দেখা করবার কথা—রতিকান্ত চলতে আরম্ভ করলে।

প্রায় বারোটার সময় সে তার লক্ষ্য স্থলে এসে পৌঁছল। সহরতলীর প্রান্ত সীমায় একখানা প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে সে জানলে যে বাবু এখন খেয়ে-দেয়ে আরাম করছেন, বেলা তিনটের আগে দেখা হবেনা। তিনটে অবধি অপেক্ষা করে একেবারে বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্য সে দরোয়ানের ঘরে বসে রইল।

বসে বসে সে ভাবতে লাগল—সহর

থেকে বাড়ীটা বড় দূরে। এখানে যদি চাকরীটা হয়ে যায় তবে অনেকটা পথ রোজ হাঁটতে হবে। বড়লোকের বাড়ী— হয়ত বাড়ীতেই থাকবার যায়গা দেবে!

ভাবতে ভাবতে বেলা পড়ে গেল। রতিকান্ত আবার দরোয়ানকে তোষামোদ করে খোঁজ নিতে পাঠালে। আধঘণ্টা পরে দরোয়ানজী এসে বল্লে—বাবু—হুঁ, তান দিয়েছে।

প্রকাণ্ড বাড়ী, তারপর লম্বা বাগান। বাগানের পেছন দিকে ছবির মত ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ী। এইটেই বাবুর বৈঠকখানা। দরোয়ান রতিকান্তকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আগে ঘরের ভিতরে ঢুকল, তারপর বেরিয়ে এসে তাকে নিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তার চমক লেগে গেল। এমন সাজান ঘর সে কখনো দেখেনি। ঘরের চারিদিকে বড় বড় আলমারিতে থাকে-থাকে ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বই সাজানো রয়েছে, দেওয়ালের গায়ে বড় বড় ছবি টাঙান, এখানে সেখানে ছোট বড় নানা রকমের পাথরের মূর্ত্তি। সে বেশ বুঝতে পারলে যে, তার জামা কাপড়ের সঙ্গে এ স্থানটা মোটেই খাপ খাচ্ছে না।

বাবুটির প্রকাণ্ড চেহারা। পূর্ণিমার চাঁদের মত নিটোল গোল মুখের আধখানা প্রকাণ্ড একখানা বইয়ের আড়ালে ঢাকা। তিনি একমনে কি পড়ছিলেন, ঘরের মধ্যে যে একজন লোক এসেছে, সে জ্ঞানই তাঁর নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রতিকান্ত ভাবতে লাগল—পালাই এখান থেকে—পা পা করে সে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বাবুটি মুখ তুলে চাইলেন।

রতিকান্ত কোন রকমে একটা নমস্কার সেরে নিয়ে বল্লে—আপনি একজন লোকের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

নাক-টেপা চশমা খুলে নিয়ে বাবুটি বল্লেন—ও তুমি সেইজন্য এসেছ? বসো।

রতিকান্তর বুকের মধ্যে আবার আশার নৃত্য সুরু হোল। কোন রকমে ধুতিখানার ছেঁড়া জায়গাগুলো ঢেকে সে গদীর এক কোণে গিয়ে বস্‌ল।

বাবুটি বল্‌তে লাগলেন—দেখ, আমি একখানা উপন্যাস লিখছি, মস্ত বড় উপন্যাস; সর্ব্বসমেত বোধ হয় চৌষট্টিখণ্ডে সেখানা শেষ হবে। আমি বলে যাব আর তোমায় লিখে যেতে হবে। তোমার হাতের লেখা কেমন?

সামনেই দোয়াত-কলম ছিল, রতিকান্ত তার দুর্ব্বল উৎকণ্ঠিত হাতে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে এক লাইন লিখে দেখালে।

লেখা পড়ে তিনি বল্লেন—এই লেখাতেই হবে, তবে আরও একটু সাবধানে লিখলেই চলবে।

কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসে গেল। সে কোন রকমে ঢোক গিলতে গিলতে বল্লে—আপনি—আপনি আমায় বাঁচালেন। চাকরী-হীন হয়ে বড় কষ্টে পড়েছি—

—যাক, যাক, ও-সব কথা যাক। তোমায় কি করতে হবে, শোন। চৌষট্টিখণ্ডের মধ্যে দেড় বছরে আমার আটখণ্ড লেখা হয়েছে। বাকী আছে ছাপ্পান্ন খণ্ড—

রতিকান্ত দুই-একখানা উপন্যাস পড়ে ছিল। সে বল্লে—একখানা উপন্যাস এত-বড়?

বাবুটি একটু জোর দিয়ে বল্লেন—হ্যাঁ—একখানা—একটু আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে। জগতে এত-বড় উপন্যাস আর কখনও লেখা হয়নি। আমার এই বই বেরুলে পৃথিবীতে উপন্যাস লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। রোঁমা রোঁলার জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাস চারখণ্ডে শেষ হয়েছে, কিন্তু চারখণ্ডে কি মানুষের সমস্ত অবস্থা আর চরিত্র বর্ণনা করে শেষ করা যায়! আমি অনুমান করছি যে আমার এই "জীবন-রহস্য" চৌষট্টিখণ্ডে শেষ হবে। হয়ত দুই এক খণ্ড বেশীও হতে পারে।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে আমায় কখন আসতে হবে ?

লোকটা আবার নাকে চশমা লাগিয়ে বল্লে—এই সকাল সাতটার সময় আসবে, এগারোটা অবধি লিখ্‌বে। তারপর বাড়ী গিয়ে খেয়ে-দেয়ে বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার সময় আসবে। সকালবেলা যা লিখে যাবে, এই সময় তা দেখবে, কোথাও বানান-টানান ভুল গিয়েছে কিনা। দুপুর বেলা এই কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। সে সময়টা আমি মস্তিষ্ককে একটু বিশ্রাম দিই। তারপর বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি আবার লিখতে হবে। তারপর বাড়ী গিয়ে চা-টা খেয়ে এসে আমায় একটু পড়িয়ে শোনাতে হবে। দশটা এগারোটা অবধি পড়ে বাড়ী চলে যেও, তার বেশী আর তোমায় আটকে রাখবো না।

রতিকান্ত হিসাব করে দেখলে যে, ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি বারোটা অবধি চাকরী। এর মধ্যে যেটুকু ছুটি তা ত বাড়ীতে যেতে আসতেই কেটে যাবে। তার উৎসাহটা ক্রমে নিভে আসতে লাগল—কিন্তু বাঁচতেও ত হবে।

সে জিজ্ঞাসা কল্লে—আমাকে কত দেবেন ?

ট বল্লে—দেখ আমি যখন প্রথম ত ঢুকি তখন আমার আট টাকা মা হয়েছিল। আজকে আমার যা কিছু অর্থ-সামর্থ্য দেখছো সব আমার নিজের চেষ্টায় হয়েছে। সেই আট টাকায় জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে আজ আমার মাসিক আটাশ হাজার টাকা আয়। তবে এখনকার চেয়ে তখন জিনিষ-পত্তর ঢের সস্তা ছিল। সেদিকে আমায় অবিবেচক মনে করো না। আমি তোমায় বারো টাকা মাইনে দেবো—মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু। একটা কথা ভুলে যেও না, এই "জীবন-রহস্যের" সঙ্গে চিরকাল তোমার নাম পৃথিবীতে থেকে যাবে। সেটা একটা মস্ত লাভ।

রতিকান্ত এতক্ষণ ধরে মনে মনে যে আশার তাজমহল গেঁথে তুলছিল নিমেষের মধ্যে তা ভূমিসাৎ হয়ে গেল। বারো টাকা! বারো টাকায় যে দুবেলা খেতেই কুলোবে না! এবার তবে মৃত্যু নিশ্চিত। তার বুকের মধ্যে রক্তটা টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করলে। মরতেই ত হবে, কিন্তু মরবার আগে এই লোকগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলবার ইচ্ছায় সে হাঁটু গেড়ে তার চারপাশের খাতাপত্রগুলো

উল্টে ফেলে কি যেন খুঁজতে আরম্ভ করলে।

হঠাৎ তাকে ঐ রকম করে জিনিষ-পত্র নাড়া-চাড়া করতে দেখে লোকটা একটু বিরক্তির সঙ্গে বল্লে—কি হচ্ছে? বড় অস্থির লোক ত তুমি!

দাঁতে দাঁত চেপে সে উত্তর দিলে—হুঁ, এইবার সব স্থির করে দিচ্ছি! শয়তান! চালাকি পেয়েছো আমার সঙ্গে!

হাতের কাছে কিছু না পেয়ে রতিকান্ত দুই হাত দুই পকেটের মধ্যে পুরে দিলে। কোটের পকেটে পুরোণ কাঠের বাঁটওয়ালা একখানা ছুরি পড়েছিল, রতিকান্ত তাড়াতাড়ি সেটাকে বার করে তার ফলাটা টেনে খুলতে লাগল।

ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের সম্মুখে খাবার পড়লে তার মুখের ভাবটা যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে, রতিকান্তর মুখের চেহারাটা ঠিক সেই রকম হয়ে উঠল। তার রক্তবর্ণ কোটরাগত চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলে।

তার ঐ রকম মূর্ত্তি আর ছুরি খোলা দেখে লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—কি—কি খুন করবি নাকি? এই কোন্—

খবর্দ্দার!—রতিকান্ত ছুরিটাকে খুলে একেবারে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—খবর্দ্দার, একটু টুঁ শব্দ করেছ কি তোমার বুকে এই ছুরি বসিয়ে দিয়েছি! ওখান থেকে এক পাও নড়তে চেষ্টা করো না—কোথায় তোমার "জীবন-রহস্য"?

একটা তাকের ওপর খানকয়েক মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতা ছিল, লোকটা আঙুল তুলে সেইদিকে দেখিয়ে দিলে।

রতিকান্ত সেখান থেকে খাতাগুলো নামিয়ে এনে পড়্‌পড়্ করে সেগুলো ছিঁড়তে লাগল।

লোকটা নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

খাতা ছেঁড়া শেষ হয়ে গেলে সে বল্লে—তোমার জীবন রহস্যও আজকে শেষ করে দিয়ে যেতুম, তবে সেটা আর করব না, অন্য কেউ এসে একদিন তা শেষ করে দিয়ে যাবে,—ভয় নেই!

ছুরিটাকে মুড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীল সাগরের বেলাভূমিতে তখন কাগের খেলা সুরু হয়েছে। রতিকান্ত বাগবাজারের গঙ্গার ধারে রেল-পুলের ওপরে বসে বসে ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়!

করবার আর কিছুই নেই! আশার বাতি নিভে গিয়েছে, আবার তাকে জ্বালিয়ে তোলবার ধৈর্য্য নেই, সাহসও নেই।

সর্ব্বনাশ! আজ ত নরহত্যা করে বসেছিলুম!

রতিকান্ত কোটের হাতাটা তুলে নিজের শির-বের-করা হাতখানার দিকে দেখতে লাগ্‌ল! তারপর পকেট থেকে ছুরিখানা নিয়ে ছুড়ে নদীতে ফেলে দিলে।

গঙ্গার ধারে তখন অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলা করছিল। রতিকান্ত বসে বসে আপন-মনে তাদের খেলা দেখতে লাগল। একটি ছোট্ট মেয়ের গলায় একখানা

সরু সোনার হার চিক্‌চিক্ করছিল। মেয়েটির দিকে দেখতে দেখতে তার মনে হতে লাগল, ঐ হারখানা পেলে বোধ হয় তার ছ-মাসের খরচ চলে যায়। হারখানা ওর গলা থেকে ছিনিয়ে নিলে কেউ দেখতেও পাবে না—রাস্তা ত ফাঁকা! যন্ত্র-চালিতের মত সে টপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার বসে পড়ল।

লাল সূর্য্য তখন অস্ত-অচলের গা গড়িয়ে ওপারে নেমে গিয়েছে, কিন্তু দিনান্তের উৎসবের চিহ্ন তখনও আকাশের গায়ে মিলিয়ে যায় নি। পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অবসাদে তার অঙ্গ ভেরে আসতে লাগল। দু-হাতে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠে একবার অলস চোখে তার চারিদিকটা দেখে নিলে, তারপর চোখ বুজিয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

দুটি ছোট্ট ঢেউ পোলের নীচে শান-বাঁধানো দেওয়ালে ছপ্ ছপ্ করে লেগে ফিরে গেল।

নিশার অন্ধকার তখন পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে… … …

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্কন্দ-ধাত্রী

[সপ্তর্ষির পত্নীদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী বাদে বাকী ছয়জনের পত্নীর নাম, যথাক্রমে বর্ষয়ন্তী, অভ্রয়ন্তী, অম্বা, দুলা, নিতত্নী ও চুপুনীকা। এঁরাই শরবনে পরিত্যক্ত ইন্দ্রের শত্রু তারকাসুরের ভাবী-দমন-কর্ত্তা রুদ্রের পুত্র স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়দেবের ধাত্রী। এঁদের অন্য নাম কৃত্তিকামণ্ডলী।]

*

কই রে কোথা বর্ষয়ন্তী? অভ্রয়ন্তী কই?
—নাম ধ'রে আজ আকাশ-বাণী ডাক দিয়েছে ওই!
শূন্য নভে বুলাস্ নে আর ব্যথার অনিমেষ,
দৈব হ'ল সদয়, বুঝি হবে ব্যথার শেষ।
প্রাণে পুষিস্ স্নেহের ক্ষুধা হৃদয় উপোষী,
শুনিস্ নে কি শিশুর কান্না কাঁদায় ক্রন্দসী?
গর্ভে ছেলে ধরি নি তাই শূন্য রবে কোল?
শুকিয়ে যাবে সব মমতা? শুন্‌ব না মা-বোল্?
এমন কঠোর ন'ন্ বিধাতা আকাশ-বাণী তাই,
ডাক দিয়েছে সফল হ'তে, চল্ ছ'বোনে যাই।

খুঁজে দেখি তিন ভুবনে কোথায় সে কুমার,
রুদ্র-তেজে জন্মে যে কোল পায়নিক উমার।
এই দিকে আয়, এই দিকে আয়, এই দিকে আয়, বোন্
কচি ছেলের পাস্ কি আওয়াজ ? কান পেতে ভাই শোন্।
সন্দেহে সৌভাগ্য-হারা আমরা অভাগী
একটি শিশুর একটু পরশ ছয় বোনে মাগি।

* *

এই দিকে আয়!···ওই ছাখা যায়! আহা চমৎকার!
চোখের পলক কেড়ে-নেওয়া মুখ ছাখো বাছার!
সাগর-সেঁচা মাণিক এযে সাতটি রাজার ধন,
দৈব-বাণী ভুল বলে নি, ভুল বলে নি, বোন্!
এ যেন রে নিখিল-নারীর মাতৃ-হিয়ার সাধ,
স্বপ্নে-গড়া মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত আহ্লাদ!
এ যেন রে দিব্যছটা মৃত্তিকা 'পরে
ভানুর ভ্রূণ ভোরাই মেঘের সূতিকা-ঘরে!
জন্মেছে এই ফুল্‌কিটুকুন্ নেহাৎ অসহায়,
দৃষ্টিবিষা বিষধরে ঘেরা বনের ছায়।
নাইক গেহ মায়ের স্নেহ নাইক বাছার নীড়,
খাগ্‌ড়া-শরের খাঁড়ার মতন পাতার খালি ভিড়।
ভিড় ক'রে কি করিস্ তোরা ? সর্ তো দেখি, দে,
দেখিস্ নে কি দুধের বাছার পেয়েছে ক্ষিদে ?

* * *

ছয় মা দেবে পীযূষ, ছেলের একটি সবে মুখ ;
কোন্ মাকে দুধ্ দিবি, ছেলে ? কার ভরাবি বুক ?
ছয় মায়েরি পীযূষ-ব্যথা, সোয়াস্তি নেই আর!
হঠাৎ একি! ছাখ্ দিদি ছাখ্! এ কি চমৎকার!
সত্যি এ ? কি স্বপন দেখি ? একি রে বিস্ময়!
দেখ্‌তে-দেখ্‌তে নতুন মুখ আর নতুন অধর হয়!
এক আকাশে উদয় যেন হ'ল রে ছয় চাঁদ,
এক লহমায় মিটিয়ে দিতে ছয় জননীর সাধ!
আর কেন বোন্ বর্ষয়ন্তী আর কেন বিমন ?—
ছয় মায়েরি ক্ষোভ মিটাতে কুমার ষড়ানন।

* * * *

ছয় জননী স্তন্য পিয়াই চাঁদ-ঝোলানো দোলাতে,
ছয় বোনে হিম্‌শিম্‌ খেয়ে যাই একটি ছেলে ভোলাতে।
কচি-কচি ঠোঁট রয়েছে হৃদয়-সুধার সন্ধানে,
চোখ দেখে ওর হয় গো মনে ও আমাদের মন জানে!
সবার কাছেই নিচ্ছে ও যে নিচ্ছে পরম আগ্রহে,
জীবন্ত মৌচাক ও যেন চিত্ত-মধুর সংগ্রহে!
উঠ্‌ছে বেড়ে পীযূষ কেড়ে মধুর ভারে টুপ্‌টুপে,
খুশীতে মন তুষ্ট ক'রে নেবার যা সব ন্যায় চুপে।
পিয়াই ওরে আট-পহরে আনন্দেরি ছন্দ গান;
ওর দে'-আলার দীপ্ত আলোয় চন্দ্রতপন স্পন্দমান!
পিয়াই স্মৃতি, পিয়াই আশা, স্বপ্ন পিয়াই স্তন্য সাথ,
তরুণ আঁখির তারায় হেরি অরুণ আলোর সুপ্রভাত।
সেরা-সেরা তারায় ঘেরা হিন্দোলা ওর প্রশস্ত,
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় ধ্রুব, রূপার কাঠি অগস্ত্য!
নিদ্-মহলে সিঁদ কাটে ও স্বপ্নে চীয়ায় সুপ্তকে!
পরম লোভী হাত বাড়িয়ে ধরতে ও চায় 'লুব্ধকে'!
ত্রিপুর-বধের বিপুল ধনু হ'য়েছে ওর খেল্‌না সে,
কৃপাণ-পাণি কাল-পুরুষের খড়্গ দেখে খুব হাসে।
হাস কুমার! খেল কুমার! অপ্রসূতির আঁতুড়-ঘরে,
দুর্ভাগাদের আঁচল-আড়ে, বঞ্চিতাদের ধন্য ক'রে।
ছয়-ধারাতে স্তন্য পিয়াই শক্তি চীয়াই ছয় ধারাতে,—
—রক্ত হিয়ার ক্ষীর মমতায়,—সঞ্চারি বল স্তন্য সাথে,—
শক্তি যাতে রয় নিহিত—সেই শুভ—সেই স্বতঃস্ফূর্ত্তি—
আত্মাহীনে আত্মা যে ছায়—পুণ্যেরি যে ভিন্নমূর্ত্তি।
মূর্ত্তিমন্ত সান্ত্বনা মোর শক্তিতে হও ওতঃপ্রোত;
স্তন্য পিয়াই আত্মপ্রদ, পীযূষ পিয়াই বলপ্রদ।

* * * * *

পীযূষ সনে কে পিয়ালি প্রাণের জ্বালা রে,
ছয় বোনেরি গলায় মোদের জ্বালার মালা রে,
অকারণে নির্ব্বাসিত স্বামীর সন্দেহে,
অন্যায়েরি দহন দহে মোদের মন দেহে।

স্পষ্ট ক'রে ভাব্‌তে না চাই, ভাব্‌লে হারাই জ্ঞান,
অভিশাপের তাপে পাছে হয় রে অকল্যাণ!
অগ্নিকে হায় তুষ্‌লে স্বাহা মোদের রূপ ধ'রে,
ঋষির মনে লাগ্‌ল ধোঁকা, দিলেন দূর ক'রে,
সন্দেহে মন বিষিয়ে গেল স্বামী হ'লেন পর,
ঋষি স্বামীর পুরুষ-রিষে বিষম আথান্তর।
ঘর হারালাম বর হারালাম আমরা ছ'জনা,
পণ্ড হ'ল নারী-হিয়ার শিশুর কামনা!
প্রাণের যে সাধ,—আচম্বিতে পঙ্গু নেহারি,
আকাশে নিশ্বাসের জ্বালা বিকল বিথারি।
ক্ষুব্ধ শরীর ক্ষুব্ধ শোণিত ক্ষোভের পীযূষ পান
করছে কুমার, অন্যায়ে সে করবে অবসান।
বাছা ওরে কার্ত্তিকেয়! দুলাল কৃত্তিকার,
সুরাসুরের করবে তুমি অন্যায়ে সংহার।

* *   * *   * *

রুদ্র তেজে জন্মেছে যে আভ্যুদয়িক তার,
সময় ব'য়ে যায় যে, হাথা নাইক পুরোধার;
কই পুরোহিত? কই পুরোহিত? অন্বেষি মহী,
ঐ যে ঋষি বিশ্বামিত্র বিশ্ববিদ্রোহী!
উনিই হবেন যাজক মোদের সকল ক্রিয়াতে,
পারেন উনি আপন গুণে শক্তি চীয়াতে;
দৈব-জয়ী ঐ যে মুনি, ঐ যে তপোধন,—
ছয় বোনে চল্ প্রণাম করি, জানাই নিবেদন।

* *   * * *   * *

আভ্যুদয়িক না হ'তে শেষ কাণ্ড এ কি, হায়,
দিগ্‌গজেদের পাক্‌ড়াতে শুঁড় দামাল ছেলে ধায়!
পাঁচোট পূজার দিন বাছনি আছড়ালে হাতী,
আচোট আকাশ উঠ্‌ল কেঁপে চাঁদতারার পাঁতি!
কাঁপল সাগর আর ধরাধর বাসুকী চঞ্চল,
স্বস্তি না পায় অস্থিরতায় ত্রস্ত অসুর দল।
রুদ্র-শিশুর শক্তি-দাপে—কাঁপে অসুর-রাজ;
তারক হেরে মারক-গ্রহ শিশুর দেহে আজ।

বালক-বীরের অলীক ভয়ে ইন্দ্র ব্যাকুল মন,
হাজার আঁখি মেলে কেবল ছাখে অলক্ষণ !
তারক-নিপাত রইল মাথায়, রক্ত-নয়নে—
বজ্র নিয়ে ইন্দ্র এলেন শিশুর দমনে !
অসুরে যে রাজ্য নেছে, নাই সে খেয়াল হায় ;
রোষের ভরে শিশুর 'পরে বজ্র নিয়ে ধায়।
বাছার গায়ে বাজ হানে রে !···বুজ্‌তে গেলাম চোখ,
মুদ্‌ল না নক্ষত্র-নয়ন—পড়ল না পলক !
দেখ্‌তে হ'ল বাধ্য হ'য়ে···কিন্তু কী দেখি !···
বিস্ময়ে বাক্ রুদ্ধ,—অবাক—কুমার করে কী !
বজ্র লুফে ধর্‌ল হাতে—আঙুল চিরে তার
পড়ল যত বিন্দু তত রুদ্র-অবতার।
হুঙ্কারে দিক কাঁপিয়ে দাঁড়ায় কুমারকে ঘিরে
রুষ্ট চোখে ওষ্ঠে চেপে উদ্ধত শিরে
স্কন্দে বলে, "ইন্দ্র হ'য়ে ত্রিলোক তুমিই নাও,
ঈশ্বরতার ঈর্ষ্যাজরা ইন্দ্রকে তাড়াও।"
রুদ্র-সেনায় ইন্দ্র-সেনায় যুদ্ধ আসন্ন,
এমন সময় কে আসে ওই মরাল-নিসন্ন।
মাঝে এসে বলেন তিনি, "সম্বরো দেবরাজ,
কী বিপরীত বুদ্ধি, মরি, দেখি তোমার আজ।
শত্রু তোমার মার্‌বে যে হায় শত্রু ভেবে তায়
যুদ্ধ কর ? বজ্র হানো রুদ্র-শিশুর গায় ?
অসুর-কুলের অভিযানের অন্যায়ে-জর্জ্জর
অন্যায়ে চাও জয়ী হ'তে অন্য জনের পর !
রুদ্র-রোষে স্বর্গ-মর্ত্ত্য হবে যে ছারখার,
অস্ত্র রাখো ; এই বালকে দিয়ে সেনার ভার
রথ ঘুরিয়ে একলা তুমি যাও ফিরে দুর্গে,
এই শিশু কাল বধ্‌বে জেনো তারক-অসুরকে।"

* * * * * * * *

রুদ্র-সেনার জয়-রবে কে ফির্‌ল হরষে—
জন্ম যাহার রুদ্র তেজে বহ্নি-উরসে !

ঘুমে আলা দুলাল আমার লড়াই খেলিয়ে,
ময়ূর জাগে তারায়-ঘেরা পেখম মেলিয়ে।
লক্ষ তারা শিশুর সমর স্বাধার প্রত্যাশে
চোখ চেয়ে সব ঘুমিয়ে গেছে আকাশ-ফরাশে।
হিন্দোলাতে স্কন্দ ঘুমায়, চন্দ্র জেগে থাক্!
ব্রাহ্মী-নিশার প্রহর গণি ছয় বোনে নির্ব্বাক!
চতুর্ম্মুখের বাক্য স্মরি' আশায় আশঙ্কায়
আন্দোলিত চিত্ত মুহু, মন কত কি গায়।
ব্রহ্মবাণী মিথ্যা হবার নয়কো, তবে কি—
অত্যাচারের অন্তকারী বালক হবে কি?—
বজ্রকাটা আঙুলে যার জ্যোৎস্না জড়িয়ে
পাড়িয়েছি ঘুম ঘুম-পাড়ানি মন্ত্র পড়িয়ে,
সে মোর হবে দৈত্যজয়ী?···পূরবে মনের সাধ?···
অন্যায়েরি বন্যাজলে পারবে দিতে বাঁধ?···
অন্যায়ে কেউ বালক-বধের ফন্দী আঁটে, হায়,
শিশুর দেহেও শত্রু দেখে খামোকা চমকায়!
অন্যায়ে কেউ হত্যা করে নারীর নারীত্ব,
পুরুষ-রিষের বিষে-জরা জীবন ও চিত্ত।
অন্যায়ে কেউ ইন্দ্রলোকের কর্ত্তা হ'তে চায়।
অন্যায়েরি বন্যাধারায় জগৎ ভেসে যায়।
অন্যায়েরি অভিযানে স্বর্গ সে ত্রস্ত ;—
অন্যায়ে হায় অস্তপ্রায় আজ পুণ্য সমস্ত!
অন্যায়ের এই সৈন্য ঘটায় একলা এ বালক—
করবে ছিন্ন? তিন-লোকে ফের জ্বাল্‌বে সত্যালোক?
আন্‌বে শ্রেয় কার্ত্তিকেয়?···কখন্ হবে ভোর?···
পথ চেয়ে রই সূর্য্য-রথের, ভাবনাতে বিভোর।
কোন্ হোরা ওই ঘুম-চোখে যায়? সুধাই আয়, সখী!
অন্ধকারের আঁচল ভিজে উঠল আলোয় কি?

* * *   * * *   * * *

আকাশ ফিঁকে হ'তে-হ'তেই আঁধার! একি হায়!
ঘুরিয়ে ঘোড়া উল্টো দিকে অরুণ ফিরে যায়!

সূর্য্যে প্রবেশ করলে শশী ! সকল আলো লোপ !
অকাল-রাহু-অসুর আসে মূর্ত্তিমন্ত কোপ !
আঁধার নভ পাপের ভিড়ে, বিশ্বে জাগে ত্রাস,
বাঘের রথে গ্রসন্ আসে করতে জগৎ গ্রাস !
ত্রসন্ আসে পিশাচ-রথে, জম্ভ-কুজম্ভ,
নিশানে কাক কালনেমি সে জীবন্ত দম্ভ !
ভ্রূকুটিতে ভুবন ভ'রে তারক সে দুর্ম্মদ
যোজনজোড়া হাজার ঘোড়ার ছোটায় বিপুল রথ !
অমাতিথির অতিথি ওই প্রচণ্ড ধূর্ত্ত
রোদনে দিক ভরিয়ে চলে রৌদ্র মুহূর্ত্ত !
রথের ধূলায় ছায় নভতল, রাত্রি অকালে,
ঊর্দ্ধে ধ্রুব নিম্নে তপন সবায় ঠকালে।
ছুঁচ গলে না এম্‌নি জমাট ভরাট অন্ধকার,
গ্রাসের ত্রাসের আসন্নতায় বিশ্বে হাহাকার !
পলক-ভোলা তারার আঁখি তাও সে অন্ধপ্রায়
কোলের মানুষ যায় না ত্থাখা, এম্‌নি আঁধার, হায় !
কোথায় গেলি অভ্রয়ন্তী !…বাজ পড়ে মাথে,
সাতটি দিনের বাছা মোদের নাইরে দোলাতে !
ঘুমন্তে কে কর্‌লে চুরি !…ঘট্‌ল অনিষ্ট,…
হায় লো মেঘয়ন্ত্রী ! মোদের মেঘ্‌লা অদৃষ্ট !

** ** ** ** **

অন্ধকারের বুক চিরে ও কাদের সিংহনাদ
ভয়ের আঁধার ছিন্ন-করা জাগ্‌ল কি !…আহ্লাদ !
বিদ্যুতেরি হাজার-নরী দুলিয়ে তমসায়
সংশয়েরি তমস্বিনীর করলে কেরে সায় !
কে আসে নিঃশঙ্ক মনে ময়ুর-বাহনে
অসুর-ছায়া-পিণ্ডী-কৃত-তিমির-দহনে !
ইন্দ্রদেবের মুকুট-বোঝা তারণ ক'রে যে,
তারক নামে আপ্‌নাকে হায় জাহির ক'রেছে,
তাগ ক'রে তায় বাণ হানে কে শৌর্য্য-অবতার ?
গ্রসন-ত্রসন-জম্ভ-মহিষ আরম্ভে চীৎকার !
ছয় মায়েরি দুলাল ও যে বালক ষড়ানন !

অসুর সাথে শিশুর লড়াই! অপূর্ব্ব এই রণ!
পল্টনে কার হানে কুমার শক্তি শতঘ্নী—
লক্ষ নাগের জিহ্বা যেন উগারে অগ্নি!
বধির ক'রে হাজার বজ্র গর্জ্জে যুগপৎ,…
টুটল বুঝি তিমির কায়া…দৈত্য হ'ল বধ!…
কুড়িয়ে-পাওয়া কুমার মোদের অসুর-জয়ী ভাই,
জয়ধ্বনি ক'রতে তোরা কাঁদিস্ কেন, ছাই!
ছোঁয়াচে এই সুখের কান্না…কাঁদতে…জেগেছি…
অম্বা! দুলা! নিতত্নী! বোন্ স্বপ্ন দেখেছি।
তোলাপাড়া ক'রতে মনে পদ্মযোনির বাণী
কখন যে হায় ঘুমিয়ে গেছি কিছুই নাহি জানি।
ভোরের আলো, ত্থাখ্ সুমেরুর গায় কি লেগেছে?
ছয় জননীর স্নেহের নীড়ে কুমার জেগেছে?
ঊষার হাসি মলিন!…মেঘে সূর্য্যে ডুবে যায়—
এযে আমার স্বপ্নে ত্থাখা, স্বপ্নে ত্থাখা হায়!
স্বপন আমার ফল্‌তে সুরু হয়েছে মন কয়,
ভোরের স্বপন সফল হবে হবে রে নিশ্চয়।
ক্লেশের এবার শেষ হবেরে শঙ্কা ফুরাবে।
ছয় জননীর ভাগের ছেলে ভাগ্য ফিরাবে।
অপরাজের রাজমহিমায় ছাই দেবে এই ঠিক—
আনন্দ ছয় কৃত্তিকার এই অনিন্দ্য কার্ত্তিক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চয়ন

অভিব্যক্তির নূতন মত

সাধারণ লোককে যদি সুধানো যায়, "মানুষের পূর্ব্বপুরুষ কে?" তবে জবাব পাওয়া যাবে, "বানর।" কিন্তু সংপ্রতি ভিয়েনার এক নামজাদা পণ্ডিত প্রফেসর Linckewicz এই মতের এক নূতন আলোচনা করেছেন।



ওরাং-উটাং—"বোর্ণিওর বনমানুষ" নামে বিখ্যাত। মানুষের নকলে ওস্তাদ। দৈর্ঘ্যে ৪॥০ ফুট।

তিনি বলেন, "মানুষ যে কেবলমাত্র বানরের বংশ-ধর তা নয়; পরন্তু, মানুষই বানরের পূর্ব্বপুরুষ!

ঐতিহাসিক কালের আগে একজাতীয় মানুষ অতি-সভ্যতার মহিমায় ক্রমেই অধিকতর অসভ্য হয়ে পড়ে; তারপর অসভ্যতা থেকে



শিম্পাঞ্জি। হাতের মাপে ও দাঁতের সংখ্যায় মানুষের কাছাকাছি। লম্বায় ৫ ফুট।

একেবারে বর্ব্বরতার মধ্যে ডুবে, শেষটা আবার বানরে পরিণত হয়ে যায়!

পৃথিবী এখন ক্রমাভিব্যক্তির দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে। মিথ্যা শিক্ষা ভুলে, ধ্বংসের দিক থেকে আমরা যদি এখন আবার সহজ স্বাভাবিকতার দিকে ফির্‌তে চেষ্টা না করি, তবে আর দু' হাজার বৎসরের মধ্যে বানররাই ফের পৃথিবীর বাসিন্দা হবে।



দক্ষিণ এসিয়ার গিবন। দাঁড়ালে মাটিতে হাত ঠেকে। ছিপ্‌ছিপে গড়ন।

চীন, মিশর, রুসিয়া, ইতালী ও অন্যান্য দেশে নব নব আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য যখন সমুদ্রের তলায় মগ্ন, তখন পৃথিবীতে এমন এক সভ্যতা ছিল, বয়সে যে আটলান্টিক মহাসাগরের চেয়েও বেশী প্রাচীন।

তখন পৃথিবীতে যে মনুষ্য জাতি বাস করত, আদিম বানর থেকে পঞ্চাশ শতাব্দী-ব্যাপী ক্রমাভিব্যক্তির ফলে তাদের উৎপত্তি।



মধ্য-আফ্রিকার গরিলা। মস্ত-বড় দেহ, ভয়ানক জোর। লম্বায় ছয়ফুট।

আধুনিক সভ্য মানুষদের চেয়ে তারা (ভিন্ন ভাবে হ'লেও) অধিকতর সভ্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তখন 'টেলিফোন' না থাকলেও, মানুষরা মানসিক বার্ত্তাবহ বা 'টেলিপাথি'র দ্বারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কথা, বা ভাবের আদান-প্রদান করতে পারত। বর্ত্তমান যুগে কেবল ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সেই প্রাচীন শক্তির শেষ-বিকাশ দেখা যায়।

অতি-সভ্যতার ফলে সে-যুগের মানুষ যখন মহা-মানব হয়ে উঠ্‌ল, তাদের মস্তিষ্কের শক্তি যখন সীমাকেও ছাড়িয়ে গেল, তখন আচম্বিতে তারা বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ল। তারপর কামুকতা, পশুত্ব, ও মারামারি-কাটাকাটির ফলে তারা আবার যা ছিল তাই—অর্থাৎ বানর—হয়ে দাঁড়াল।

আমার মতের সত্যতা সপ্রমাণ করা শক্ত নয়। একটি নবজাত শিশুকে কেবলমাত্র বানরদের সংসর্গে রেখে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত লালন-পালন করুন। তারপর পরীক্ষা কর্‌লে দেখবেন, বানরদের সমস্ত অভ্যাস সে গ্রহণ করেছে। বানরদের মত কিচির-মিচির শব্দ করা ছাড়া সে আর কোন কথাবার্ত্তা কইতেও পারবে না। তখন কোন বানরের (ape) সঙ্গে তার সংসর্গ ঘট্‌লে, তার সন্তানরাও পূরোদস্তুর বানর হয়েই দাঁড়াবে।

অতএব বানর-মাত্রকেই বলা যায়, নির্ব্বোধ মানুষ—বহুশতাব্দীর পাগলামিতে যারা অবনত হয়ে পড়েছে।"

সংপ্রতি নিউ গিনির অজ্ঞাত বন্য প্রদেশে একজাতীয় বিচিত্র মানুষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের দেখ্‌লে প্রফেসর Linckewiczএর মত দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। জলাভূমিতে বাস করে ব'লে তাদের পায়ের ব্যবহার হয় না। কেবল হাত ব্যবহার ক'রে ক'রে তাদের পা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। সোজা হয়ে তারা দাঁড়াতেও পারে না,—চলে-ফেরে ঠিক মস্ত-বড় বন-মানুষের মত, হেলে-দুলে, কষ্টে-সৃষ্টে। এই অদ্ভুত বানর-মানুষরা গাছের উপরে কুঁড়ে-ঘর বেঁধে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

এগারোতালা সহর

প্রাচীনকালে প্যালেষ্টাইনে বেথ-স্যান নামে এক সহর ছিল, এখন তা খোঁড়া হচ্ছে। খুব-সম্ভব, এর চেয়ে পুরাণো সহর পৃথিবীতে আর নেই, এবং এক-জায়গায় এত যুদ্ধও বোধ হয় আর-কোথাও হয়-নি।

খালি বেথ্-স্যান্ নয়, এক হাঁড়ীর উপরে রাখা আর এক হাঁড়ীর মতন, এখানে মাটির ভিতরে উপর-উপরি অন্তত এগারোটি প্রাচীন বিখ্যাত সহরের সমাধি আছে। সেকালে পরে পরে যত বিজেতা এখানে এসেছেন, তিনিই তাঁর অগ্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত সহর ভেঙে-চুরে সেই স্থানে নূতন নগর স্থাপন করেছেন।

বিশেষ ক'রে এই জায়গাটির উপরেই প্রত্যেকের লোভ হোলো কেন? কারণ, এ জায়গাটির অবস্থান সুন্দর। এখান থেকে এসিয়া মাইনর ও মিশর-প্রদেশে যাতায়তের বিশেষ সুবিধা ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঐ এগারোটি সহরকে আবার খুঁড়ে বার করতে চান। আমরা পরে পরে নগর-গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলুম,—পাঠকরা এ-থেকে চিন্তার খোরাক যথেষ্টই পাবেন, আশা করি।



উপর-উপরি এগারোটি সহর

১। সব-চেয়ে নীচে, মান্ধাতার আমোলের সহর—যাযাবররা নানাদেশ থেকে এসে এখানে আড্ডা গেড়ে বসে। খুব-সম্ভব, এইটিই মানব-সভ্যতায় প্রথম স্থায়ী সহর। কুগঠিত পাথুরে তীরের ফলা ও কুড়ুল প্রভৃতি এবং বড় বড় সেকেলে জীবজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সম্ভবত, সহরের আরো নীচে অধিকতর প্রাচীন জীবজন্তুর কঙ্কালাবশেষ পাওয়া যেতে পারে।

২। আমোরাইট সহর—চার হাজার বছর আগে। বাসিন্দারা তখন লোহার রথ তৈরি করতে পারত। এই সময়েই যুদ্ধে প্রথম ঘোড়ার ব্যবহার সুরু হয়।

৩। মিশরীয় সহর—৩,২০০ বছর আগে। মিশরের রামেসিস্ দি গ্রেট এখানে বিজেতা-রূপে এসে নূতন নগর স্থাপন করেন। মিশরীয় আদর্শের প্রাসাদ, মন্দির, চিত্র ও ভাস্কর্য্য। লেখার কাগজের ও দাড়ী-পাল্লার উদ্ভাবনা।

৪। ইজ্‌রেলাইট বা ইহুদী সহর—২,৯১০ বছর আগে। নিষ্ঠুর ও পৌত্তলিক আমোরাইট্ এবং ফিলিস্‌টাইনরা রাজা সলোমনের যুগে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় ও বাধ্যতা স্বীকার করে। পৌত্তলিকের দেবালয়ের স্থানে ইহুদীদের উপাসনালয়ের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানী মোসেসের প্রণীত আইনের চলন।

৫। আসীরীয় সহর—২,৬৪৩ বছর আগে। বিখ্যাত যোদ্ধা Sennacheribএর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সচল দুর্গ, দুর্গপ্রাচীর-ধ্বংসের ঢেঁকি-কল প্রভৃতির উদ্ভাবনা। লোহার তরোয়ালের প্রথম চলন।

৬। বাবিলনীয় সহর—২,৪০৭ বছর আগে। নেবুচাঁদনেজ্জারের দ্বারা স্থাপিত। ইহুদীদের বন্দী ক'রে তিনি বাবিলনে নিয়ে যান। ইটের উপরে বই ছাপা হোতো। ঝুলন্ত বাগান। প্রাসাদাদি নরসিংহের মূর্ত্তিতে শোভিত হোতো। দূরবীন।

৭। গ্রীসীয় সহর—২,২৪০ বছর আগে। আলেকজান্দার দি গ্রেটের সময়ে। জল-ঘড়ীর উদ্ভাবনা। সহরের কাছে দৌড়ের ময়দান। জল-প্রণালীর দ্বারা প্রত্যেক বাড়ীতে জল সরবরাহ।

৮। রোমীয় সহর—১,৯৮০ বছর আগে। জুলিয়াস সীজারের সময়ে। আম্পিথিয়েটার, রঙ্গভূমি, গ্লাডিয়েটরদের প্রতিযোগিতা, নাটকীয় দৃশ্য ও রথ-দৌড় প্রভৃতি। বাড়ীতে বাড়ীতে প্রথম স্থায়ী-স্নানাগারের প্রতিষ্ঠা।

৯। আরবীয় সহর—১,৯৮০ বছর আগে। কালিফ হারুণ-অল-রসিদের সময়ে। সুদৃশ্য মস্‌জিদ, স্তম্ভ ও হারেম। বীজগণিত, উচ্চতর গণিত ও অঙ্কবোধকের উদ্ভাবনা।

১০। ক্রুসেডারদের সহর—৮২১ বছর আগে। খৃষ্টান যোদ্ধাদের দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ ও গীর্জ্জাদির প্রতিষ্ঠা। সম্মিলিত যন্ত্র-সঙ্গীত ও গোথিক স্থাপত্যের উদ্ভাবনা।

১১। তুর্কী সহর—৬৪১ বছর আগে। পূর্ব্বতন সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শনের দ্বারা উচ্চ মসজিদ ও হারেম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা।



ধ্বংসাবশেষের গুটিকয়েক নমুনা

হুণ অ্যাটিলার (৪০৬—৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) কবলে প'ড়ে রোম যখন আর্ত্তনাদ কর্‌ছিল, উত্তর আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধরণের এক সভ্যতা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের অসভ্য ব'লে এখন তুচ্ছ করা হয়। কিন্তু আজকাল মাটির ভিতর থেকে হরেক-রকমের প্রমাণ বের ক'রে প্রত্নতাত্ত্বিকরা দেখাচ্ছেন যে, রেড-ইণ্ডিয়ানরা বরাবরই এমন অসভ্য ছিল না। নিউ মেক্সিকোর পিকোস নদীর তটে মান্ধাতার আমোলেও যে সভ্যতার পূরন্ত বিকাশ ছিল, এ-বিষয়ে এখন আর কোনই সন্দেহ নেই।

বৈজ্ঞানিকরা এখানে তিনশোরও বেশী গোর খুঁজে প্রায় এক হাজার কঙ্কাল পরখ করেছেন। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপরে পিকোসের ইণ্ডিয়ানরা নতুন নতুন ঘর বানিয়ে এতদিন বাস কর্‌ছিল। কিন্তু কবরের মড়ার সংখ্যা ক্রমেই এমন বেড়ে ওঠে যে, পানীয় জল পর্য্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে। কাজেই আশীবৎসর আগে বাসিন্দারা মড়কের ভয়ে তাদের হাজার বছরের পুরাণো সহর ছেড়ে অন্য যায়গায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়।

পুরাকালে অনেকেই পাহাড়ে বাস কর্‌ত। পাহাড়ের উপরে এখনো হাজারটি ঘর আছে। সেই-সব ঘরে সেকালের মৃৎশিল্প ও তৈজস-পত্রের সুন্দর সুন্দর নমুনা পাওয়া গেছে। মধ্য-আমেরিকায় প্রাচীন মায়া-সভ্যতার অপূর্ব্ব বিবরণ বৎসর দুই-তিন আগে "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার আবিষ্কৃত কোন কোন বিষয়েও পণ্ডিতরা মায়া-সভ্যতার প্রভাব অনুভব করেছেন। পিকোসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শাঁখ ও শুক্তির অনেক রকমের গয়না, মস্ত-বড় তামাকের নল, হাড়ের বাঁশী ও কাঠের তাজ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। যে-সব পাথরের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের দেখ্‌লেই মনে হয়, এগুলি যেন প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীর হাতে গড়া—কারণ গঠনাদর্শ প্রায় অভিন্ন। তাদের কাহিনীরও সঙ্গে মিশরীয় পৌরাণিক কাহিনীরও যথেষ্ট মিল আছে।

Dr. Carl E Guthe,—মায়া-সভ্যতা নিয়ে এতদিন যিনি লিপ্ত ছিলেন-- এখানে যে-সকল প্রমাণ যোগাড় করেছেন, তাতে দুই হাজার বৎসর আগে নগর-প্রতিষ্ঠা থেকে সুরু ক'রে বাসিন্দাদের দেশত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের কথা জান্‌তে পারা যায়।

আমেরিকার চারিদিকে বিকীর্ণ প্রাচীন সভ্যতার যে-সকল ভগ্নাংশ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা দেখে এটা অনুমান করা কিছুমাত্র শক্ত নয় যে, প্রাচীন মিশর, বাবিলন, আসীরীয়া, ভারতবর্ষ, চীন ও গ্রীস্‌ প্রভৃতি দেশের মত এখানেও এক বিপুল ও পরাক্রান্ত সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল এবং সেকালের অন্যান্য সভ্যদেশের সঙ্গে যে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল, এ-কথাও মনে করা খুবই স্বাভাবিক।

সাহিত্যসেবীর খেয়াল

অধিকাংশ শক্তিধর সাহিত্যসেবীর নামের মত, তাঁদের খেয়াল বা পছন্দ-অপছন্দের কথাও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

আমেরিকার বিখ্যাত লেখক ব্রেট্‌ হার্ট যখন কিছু লেখ্‌বার জন্যে মেতে উঠ্‌তেন, তখন যতক্ষণ না কালি-কলম নিয়ে বস্‌বার ঝোঁক হোতো, ততক্ষণ রাত্রির অন্ধকারে একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে পথে পথে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতেন।

জোর্নসন্‌ দুই পকেট ভ'রে গাছ-গাছড়ার বীচি নিয়ে রোজ সকালে বেড়াতে বেরুতেন এবং দুইহাতে বীচি ছড়াতে ছড়াতে পথ চল্‌তেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'লেও তাঁদের দলে টান্‌বার জন্যে বল্‌তেন, "ওহে, তোমরাও বীচি ছড়াচ্ছ না কেন?"

রবার্ট ব্রাউনিং স্থির হয়ে ঘরের ভিতরে বসে থাক্‌তে পারতেন না। অনবরত আনাগোনা করার দরুণ তাঁর ঘরের কার্পেট ছেঁদায় ছেঁদায় ভ'রে উঠ্‌ত। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলা কিছুতেই রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না।

কাউন্ট টলষ্টয় মাথায় টুপী পর্‌তেন না। তিনি ফরাসী সুগন্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। লেখ্‌বার সময়ে তাঁর টেবিলের উপরে একটি-না-একটি ফুল থাক্‌তই। নিজে ধনী হলেও তিনি খুব কম-দামী জামা-কাপড় পর্‌তেন।

আলেক্‌জান্ড্রি ডুমা (ছোট) একখানি নতুন বই প্রকাশিত হ'লেই একখানি ক'রে নতুন ছবি কিন্‌তেন। এড্‌গার আলেন পো বিড়াল না কোলে ক'রে ঘুমোতেন না। ডিস্‌রেলি কর্সেট পর্‌তেন। বুড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছোক্‌রা সাজ্‌বার সাধও বেজায় বেড়ে উঠেছিল। লেখবার সময়ে তিনি দুই কানে দুটি কলম গুঁজে বস্‌তেন। ডিকেন্স জাঁকালো জড়োয়ার অলঙ্কার পর্‌তে ভালো বাস্‌তেন। হথোর্ণ প্রত্যেকবার স্ত্রীর পত্র পড়্‌বার আগেই জল দিয়ে হাত ধুতেন।

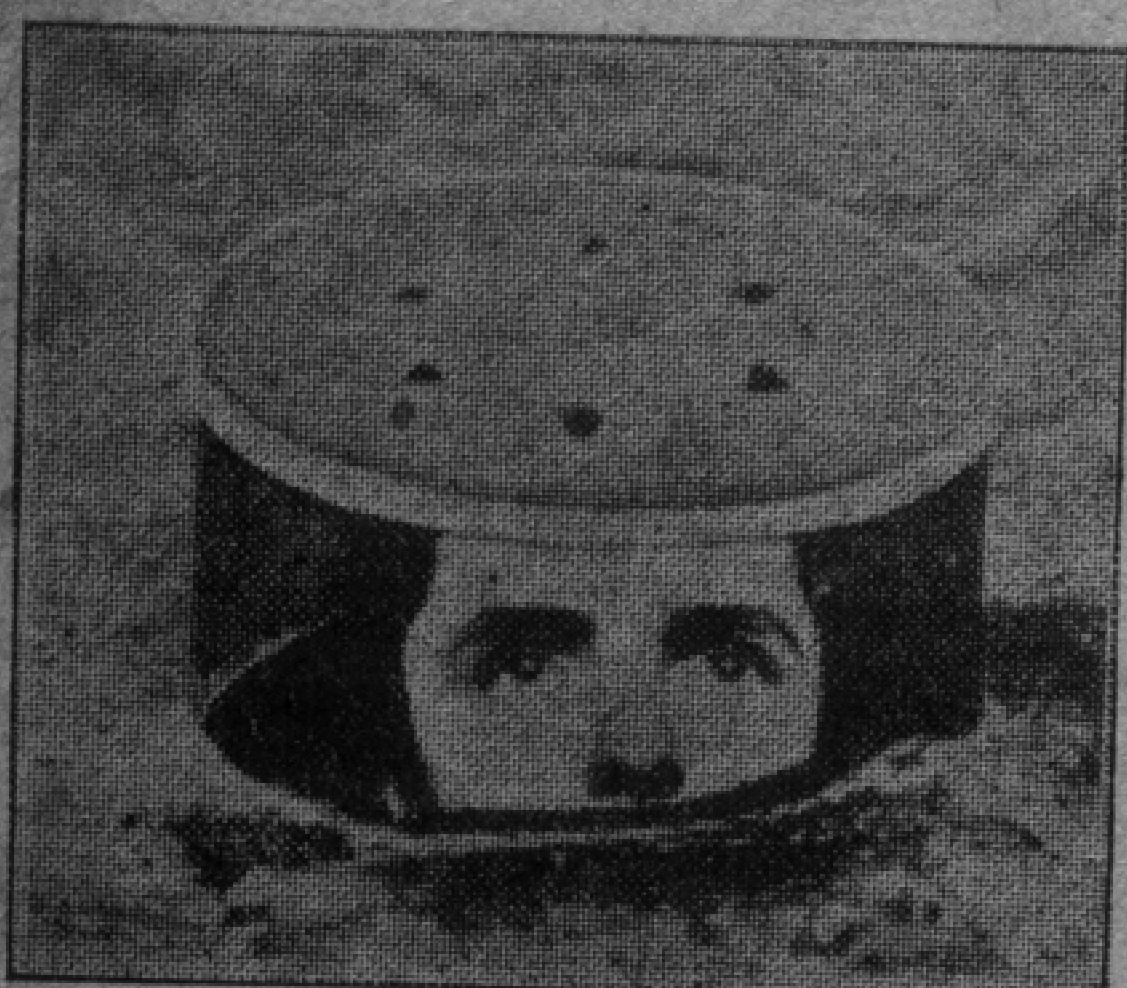
যে বাসায় ব'সে "ভ্যানিটি ফেয়ার" নামে বিখ্যাত উপন্যাসখানি লিখেছিলেন, তার সুমুখ দিয়ে থ্যাকারে যখনি যেতেন, তখনি সসম্মানে মাথার টুপী খুলে ফেল্‌তেন। ডারুইন বইকে বই ব'লে বড় যত্ন করতেন না। পড়্‌বার

সুবিধে হবে ব'লে নতুন বইকে তিনি ছিঁড়ে দুভাগ ও ছোট ক'রে নিতেন।

ওয়াসিংটন আর্ভিং তাঁর বাগ্দত্তা বধূর মৃত্যুর পরে আর-কখনো তাঁর নাম মুখে আনেন-নি। অন্য কেউ যদি তাঁর সাম্নে সে নাম উচ্চারণ কর্তেন, তবে তিনি তখনি সেখান থেকে চলে যেতেন। ভিক্টর হুগো কথা কইতেন খুব কম। কথা কইবার সময়ে বেশীর ভাগ জিজ্ঞাসাসূচক কথাই বল্তেন।

কীট্স কড়া-ক'রে-ভাজা পাঁউরুটির টুক্রোর উপরে লাল-মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে খেতে ভালোবাস্তেন। লংফেলো সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময়ে নিয়ম ক'রে বেড়িয়ে আস্তেন। তিনি বল্তেন, এই দুই সময়েই তাঁর মনে উচ্চ ভাবের উদয় হোতো। রবার্ট লুইস্ ষ্টিভেনসন অবসর-কালে ব'সে ব'সে বাঁশী বাজাতেন—সুরের মিলে মনের ভাবের সাড়া পাওয়ার জন্যে। এফ, মেরিয়ন ক্রফোর্ড যেখানেই যেতেন—নিজের বিশেষ কাগজ, কালি ও কলম সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখ্তেন। তিনি উপন্যাস লিখেছেন অগুন্তি—কিন্তু জীবনে এক কলম ছাড়া দ্বিতীয় কলম ব্যবহার করেন-নি।

মাথা ভাসানো গলাবন্ধ



মাথা-ভাসানো গলাবন্ধ

প্রথম সাঁতার শেখ্বার সময়ে শিক্ষার্থীদের মাথা জলের তলায় ডুবে যায় ব'লে বড়ই মুস্কিল হয়। সেই অসুবিধা দূর কর্বার জন্যে একরকম সাঁতারের গলাবন্ধ উদ্ভাবিত হয়েছে। এই গলাবন্ধ খুব হাল্কা এবং এটি প'রে জলে নাম্লে মানুষের মাথা জলের তলায় ডুবে যেতে পারে না।

প্রসাদ রায়।

সামুদ্রিক জন্তুর চামড়া

অনেকদিন থেকে উভচর কুমীরের চামড়া অনেক কাজে ব্যবহার হয়ে এসেছে। গত যুদ্ধের সময় স্থলচরের চামড়াঁর অপ্রতুলতার জন্যে জলচরের চামড়ার উপর মানুষের দৃষ্টি পড়েছে। তখন থেকে দেখা গিয়েছে যে, কয়েক রকম মাছ আর হাঙরের চামড়া বেশ কাজের উপযুক্ত। ভ্যাঙ্কুবার, ইষ্ট ইণ্ডিজ ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই জন্যে এরি মধ্যে সামুদ্রিক জন্তুর চামড়ার ব্যবসা সুরু হয়েছে।

সামুদ্রিক ভীষণ জন্তুদের মধ্যে ডেভিল

ফিসের চাম্‌ড়া বেশ কার্য্যোপযোগী। এরা ওজনে প্রায় পনের মণ পর্য্যন্ত হয়। এদের তিমি-মাছ-ধরা শড়কি গেঁথে ধরা হয়। হাঙরের চামড়ার জন্যে তারের জাল দিয়ে হাঙর ধরা হয়। ডেভিলফিস্‌ বা হাঙরের প্রায় কোন অংশই নষ্ট হয় না। এদের চামড়া ট্যানারীতে যায়। মাংস খাওয়া হয়। রক্ত থেকে শিরিষ পাওয়া যায়। নাড়ীগুলো বাদ্যযন্ত্র, টেনিস, র‍্যাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত কর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। আর অন্য যে সব অংশ আর কোন কাজে লাগে না, সেগুলো জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। হাঙরের দাঁতেও কাজ মেলে। একটা ৫।৬ মণ ওজনের হাঙরের গা থেকে প্রায় ১০ স্কোয়ার ফিট চামড়া মেলে।

তিমি মাছ থেকেও চামড়া আজকাল নেওয়া হচ্ছে। উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে তিমিরা সংখ্যায় বেশী এবং তাদের ধরা সহজ। তিমিদের চামড়া খুব পুরু, একখানা চামড়া থেকে পাঁচ-ছ' পর্দা ব্যবহারোপযোগী চামড়া বেরোয়।

পাকস্থলী-হীনা নারী

প্যারী সহরের অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ভিক্টর সম্প্রতি একটি মেয়ের কথা বলেছেন, যার পাকস্থলী নেই। মেয়েটি অনেকদিন তার পাকস্থলীতে নালী-ঘা নিয়ে ভুগছিলেন। তাই তাঁর পাকস্থলী একেবারে বাদ দিয়ে কণ্ঠনালীর সঙ্গে অন্ত্রের যোগ করে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মানুষ যা খায়, তা কণ্ঠনালী দিয়ে পাকস্থলীতে আসে, তারপর ছোট এবং বড় অন্ত্রের পাক ঘুরে মল হ'য়ে বেরিয়ে যায়। এঁর কিন্তু খাবার কণ্ঠনালী দিয়ে একেবারেই অন্ত্রে এসে পড়ে। অস্ত্র হবার প্রথম সপ্তাহটা তাঁকে কিছু খেতে দেওয়া হয় নি। তারপর তিনি স্বাভাবিক খাওয়াই খাচ্ছেন এবং ওজনে দু'বছরের মধ্যে প্রায় এগারো সের বেড়েছেন।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

ধারা-শ্রাবণ

ক

মানিনা, মানিনা—ভগবানকে আমি মানিনা!... ...তর্ক করতে চাও? শাস্ত্রের বচন তুলতে চাও? আমার আপত্তি নেই। হয়ত ভগবান ব'লে কেউ আছেন। কিন্তু তাঁকে আমি মানিনা!

কেন মান্‌ব? মান্‌বার যদি কোন সঙ্গত কারণ থাকে, তবে আমার পক্ষে তাঁকে না-মান্‌বারও কি যথেষ্ট কারণ নেই? মানুষ কি অকারণে বিদ্রোহী হয়? যে একথা বলে মানুষকে সে চেনে না।

ভগবানের চেয়ে অনেক মানুষকে আমি বরং শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য! জীবের মঙ্গলের জন্যে এঁরা

যত কেঁদেচেন, এঁরা যত ভেবেচেন, এঁরা যত স্বার্থত্যাগ করেচেন, ভগবানের মধ্যে তেমন করুণা কোনদিনই আমার চোখে পড়ে নি।... ...এঁদের নিজস্ব মহত্ব আর বিশ্বপ্রেমকে দেখিয়ে তোমরা ঈশ্বরকেই বড় ক'রে তুলতে চাও। তাতেও আমার আপত্তি আছে—বিশেষ আপত্তি! কারণ ভগবান আর যা-হোন তা-হোন, করুণাময় কখনো নন।

ঠগীর চেয়ে তিনি বেশী নিষ্ঠুর। ঠগী তো দম বন্ধ ক'রে দু-এক মুহূর্ত্তে নরহত্যা করে, কিন্তু ভগবান আমাদের হত্যা করেন দিনে দিনে, র'য়ে-ব'সে, আজীবন ধ'রে। অবোধ বালকও ভাঙ্‌বার জন্যে পুতুল গড়ে না। এখানে সেও ভগবানকে উঁচিয়ে গেছে। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে ভগবানের পূজো করচ। কিন্তু এ পূজো এখনি থামিয়ে দাও। কারণ তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লেই তো তাঁর নির্ম্মমতা বেশী দারুণ হয়ে বুকে এসে বাজে। এ দুনিয়ায় মৃত্যুই সব-চেয়ে নিশ্চিত। তবু ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন কেন, তা ভেবে দেখেচ? আবার সকলকে ধ্বংস কর্‌বার জন্যে। তিনি পিতা? তাহ'লে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হত-পুত্রের বুকের রক্তে তাঁর হস্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌চে—কিন্তু তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি আবার নতুন সৃষ্টি কর্‌চেন, আবার নতুন হত্যার আনন্দ উপভোগ কর্‌বার জন্যে। ভগবান মানুষের বিচারক? কিন্তু তাঁর বিচারক কে?

খ

ধনীর সন্তান আমি, যে-নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে বাস কর্‌লে মানুষ ঈশ্বর-ভক্ত হ'তে বাধ্য, ছেলেবেলায় আমার অদৃষ্টে তার কিছুরই অভাব হয়-নি।

সে-দিন আজ থাক্‌লে আমিও ভগবানকে হয়ত না-মেনে পার্‌তুম না!... ... কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারেই আমাদের সংসারের উপরে সর্ব্বশক্তিমানের নির্দ্দয় হস্তের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে এল। সে ছায়া এখনো সরে-নি, বরং দিন-কে-দিন বেশী ঘনীভূত হয়ে নিরেট অন্ধকারে পরিণত হ'তে চলেছে।

এই ভেবেই আমি আশ্চর্য্য হই যে, কেবল কি আমাদের সংসারের উপরেই ঈশ্বরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এমন স্থিরভাবে প্রসারিত হয়ে আছে? দুর্ভাগ্যের এমন বৈচিত্র্য থাক্‌তে পারে, তা আমি কখনো ভেবে দেখি-নি। এ বৈচিত্র্যের অতলে এখনো থই পাচ্ছি না। আরো কত কি দেখ্‌ব তা কে জানে?

আমার দুর্ভাগ্যের গোটাকতক প্রধান ঘটনা তোমরা শোনো। হয়ত তোমরা শুনেও সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না,—তবু শোনো।

'স্পেকুলেসনে' বাবার সর্ব্বস্ব গেল। আমাদের হাল-চাল অনেকটা পথের ভিখারীর মত হ'য়ে পড়্‌ল—সে দৃশ্য বাবা বেশীদিন প্রাণ ধ'রে দেখ্‌তে পার্‌লেন না—তাই এপারের মায়া একেবারে কাটিয়ে চ'লে গেলেন পরপারে, পরলোকে। তারপর গেলেন দাদা—যাঁর রোজগারে তখনো যেমন-তেমন ক'রে আমাদের সংসার চল্‌ছিল।

আগেই বলেছি,—প্রথম জীবনে দুঃখের স্বোয়াদ আমি কোনদিনই পাই-নি। যাকে বলে আদুরে ছেলে, সংসারের মধ্যে আমি ছিলুম ঠিক তাই।

সর্ব্বদাই বাবার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরতুম। নিজের কাজে বাবা দু'বার বিলাতে গিয়েছিলেন। পাছে আমার জন্য মনে-কেমন করে, সেই ভয়ে আমাকেও তিনি ফেলে যেতে পারেন-নি। আঁতুড়-ঘরেই আমি মা-মরা ছেলে -মানুষ হয়েছি বাবারই কোলে-পিঠে। বোধ করি, বাবা আমাকে সেইজন্যেই এতটা ভালোবাস্তেন।

বাবা ছিলেন ইংরেজী-মেজাজের লোক, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে থেকে আমারও প্রথম জীবনটা বিলাতী আব্হাওয়ার ভিতরেই কেটে গিয়েছিল। ষোল বছর বয়সের মধ্যেই দু-দুবার বিলাতে গিয়ে এবং কল্কাতাতেও সাহেবী স্কুলে প'ড়ে আমার একটি শক্তি হয়েছিল এই যে, আমি অনেক ইংরেজের চেয়েও ভালো ইংরেজী লিখ্তে পার্তুম। বাল্যকাল থেকেই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী যশ অর্জ্জন কর্ব।

দাদা যখন মারা গেলেন, তখন এই যশটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। ভারতের ও বিলাতের অনেক ইংরেজী সাময়িক পত্রে আমি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখ্তুম। আমার চার-পাঁচখানা উপন্যাস বিলাতেও মন্দ আদর পায়-নি। সে-সব লেখায় আমি ভারতীয় জীবনের ছবিই দিতে চেষ্টা করেছি। হয়ত সে ছবির নূতনত্ব সমুদ্রের ওপারেও কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু এই ইংরেজী সাহিত্যই যে কখনো আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হ'তে পারে, এ-কথা কোনদিনই ভাবি-নি। দাদার মৃত্যুর পর দিন যখন চলে না, তখন একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ পেয়ে ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিলুম; সে কথা আজও আমি ভুলি-নি। কিন্তু তখন জান্তুম না যে, ধন্যবাদে ভগবান ভোলেন না! মনুষ্য-মৃগয়ায় কোনদিন তিনি ক্ষান্ত দেন না।

বেশ মোটা মাইনে পেতুম। তারই উপরে নির্ভর ক'রে বিবাহও কর্লুম। কিছু-কাল নূতন প্রেমের কল্পলোকে আনন্দের যে আভাস পেয়েছিলুম, এখানে কবির ভাষায় তা প্রকাশ ক'রে লাভ নেই। কারণ আমি সুললিত প্রণয়-কাহিনী লিখ্তে বসি-নি, তা লেখ্বার মতন মনের হালও আমার নয়।

বিবাহের পর চারবছর কেটে গেল—ভাবলুম, নিয়তির কোপ-দৃষ্টি থেকে এতদিনে বুঝি খালাস পেলুম।

ভুল—ভুল! কলেরা এসে আমার ভ্রম আবার ভেঙে দিলে। আমাকে ভুলোবার জন্যে ভগবান আনন্দের যে মায়ামৃগকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিলেন, ফাঁকি দিয়ে আবার তাকে কেড়ে নিলেন। বিপত্নীক আমি, —প্রাণপণ আলিঙ্গনের মধ্যে শূন্যতাকে আঁক্ড়ে ধ'রে ধূলি-শয্যায় প'ড়ে হাহাকার কর্তে লাগ্লুম।... ... ...

কেঁদে কেঁদে কেঁদে কিনা জানিনা, কিন্তু এটা বুঝ্তে পারলুম—আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আস্ছে। বড় বড় ডাক্তার দেখালুম—সবাই এককথাই বললেন, "তোমার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে—আর কোন উপায় নেই!"

উঃ, সে কি কষ্ট! জন্মান্ধ যে, তার

দুঃখ আমার তুলনায় কত তুচ্ছ! পৃথিবীর পরতে পরতে এই রঙের খেলা, রূপের মেলা যে কখনো স্বচক্ষে দেখে নি, সে কেমন ক'রে বুঝ্‌বে যে, এথেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কি?… …আমার চোখের সাম্‌নে অন্ধকারের পর্দ্দা ক্রমেই বেশী পুরু হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দিনে দিনে দেখ্‌তে লাগলুম, প্রকৃতির মধুর রূপের ছবি, বিচিত্র রঙের ঢেউ, ছন্দিত গতির লীলা আমার সাম্‌নে থেকে জলের আঁকের মত মুছে, মুছে, মুছে মিলিয়ে যাচ্ছে! ঊষার সিঁদুর-লেখা, ভোরের শিশু রবি, গোধূলির মায়া-কিরণ, ভাঙা-মেঘে চাঁদের আলো, বাদলের ব্যাকুল মেঘ, শীতের সোনালী রোদ, বসন্তের পুষ্পিত উপবন, শরতের অম্লান প্রভাত,—বিদায়, বিদায়, তোমাদের কাছে চির-বিদায়,—হে বন্ধু, চির-বিদায়!

গ

অন্ধ! অন্ধতার এই অন্ধকূপে দশবৎসর মগ্ন হয়ে আছি।

প্রিয়তমার ছোট্ট স্মৃতি—আমার এই ছায়া। বিবাহের একবৎসর পরেই তাকে পেয়েছিলুম—এখন তার বয়স তেরো বৎসর। ভাগ্যে ছায়া ছিল, তখনো তাই ভগবানকে ভুলি নি।

তেরো বছরের মেয়ে ছায়া—আমার এই ভগ্নচক্র জীবন-যানকে সেইই তার ছোট ছোট দুখানি দরদভরা স্নেহকোমল বাহু দিয়ে কোনরকমে কায়ক্লেশে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছে! বাছা আমার কোনদিন বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে পুতুল-খেলাও কর্‌তে পায়-নি, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত সে পাকা গিন্নি, এই কাণা অথর্ব্ব বুড়ো ছেলেটির সেবায় তার কচি কচি হাত-দুটি সর্ব্বদাই জোড়া থাক্‌ত।

সম্পাদকী অনেকদিন ঘুচে গেছে। তবে আমার জন্যে দয়াপরবশ হয়ে কাগজের সত্বাধিকারী গোটাকতক টাকার মাসিক ভাতার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার আগে-লেখা ইংরেজী উপন্যাস ক'খানার কিছু কিছু বিক্রী এখনো আছে। কোনরকমে সংসার চ'লে যাচ্ছে।

বর্ত্তমানই আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। আর কিছু ভাব্‌তে পারি না—ভাব্‌তে ভয় হয়। অতীতের দিকে চাইলেই দেখি, নিজের হাতে সাজানো সারি সারি চিতা দাউ দাউ জ্বল্‌ছে,—কত বন্ধু, কত স্বজনের হারা-মুখ সেখানে শ্মশানের ধোঁয়ায় কলঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছে! ওঃ—চোখ নেই, কিন্তু এই অন্তর্দৃষ্টিও সেইসঙ্গে মুছে গেল না কেন?

ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌তে গেলেই খালি একটি সত্যই মনে প'ড়ে যায়,—ছায়ার আমার বয়স হচ্ছে, তারও বিয়ে দিতে হবে, কে এক পরের ছেলে এসে এই অন্ধের নড়িকে কেড়ে নিয়ে যাবে! কী ক্রূর এই সমাজের বিধি! এই অসহায়তা, এই জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে আমি প'ড়ে আছি, আমাকেও মেয়ের বিয়ে দিতে হবে কেন?

ঘ

ভগবান এখনো আমাকে ভোলেন-নি!

ভেবেছিলুম, দুর্ভাগ্যের শেষ-ধাপে নেমে এসেছি, এর পরে আমার নিজের মরণ ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। ভগবান আবার আমার ভুল শুধ্‌রে দিলেন। নইলে বোধ হয়

এই একটুখানি ফাঁকের জন্যে তার এত-বড় বিশ্ব-সৃষ্টিটা দস্তুরমত ব্যর্থ হয়ে যেত!

আমার এই ধারাবাহিক দুঃখের কাহিনী নিশ্চয়ই কারুর ভালো লাগ্‌বে না। কেউ কেউ হয়ত ভাব্‌বেন, আমি অত্যুক্তি কর্‌ছি। কিন্তু তা নয়—আমার একটি কথাও মিথ্যে বা বাড়িয়ে লেখা নয়! ভগবানের উপরে অতি-ভক্তিতে মানুষ অন্ধ হয়ে আছে। চোখ থাক্‌লে সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেত, পৃথিবীতে ভগবানের অবিচারের আর অত্যাচারের ইতিহাস কী বিরাট! লক্ষ লক্ষ মহাভারতেও তা কুলায় না। কাণ পেতে শোনো, পৃথিবীর এই বাতাস আর তরুর অনন্ত মর্ম্মর, কোটি কোটি অত্যাচারিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর আর্ত্তস্বর দিয়ে গঠিত কিনা! যাদের মরা উচিত তাদের উপরে নয়, যাদের বাঁচা উচিত তাদের উপরেই ভগবানের সদা-সচেতন মৃত্যু-দণ্ড অতর্কিতে আচম্বিতে নেমে এসে পড়ে!

যাক্—দুঃখের কথা আর বাড়াব না, এবার যা বল্‌বার খুব সংক্ষেপেই তা সেরে নেব।

হঠাৎ একদিন ছায়া অসুখে পড়্‌ল। জ্বর। প্রথমে ধরা পড়ে-নি, তারপর জানা গেল, টাইফয়েড।

ঘরপোড়া গরু যখন সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পায়, তখন এত-বড় বিপদের কথা শুনে আমার মনের ভাব কি-রকম হোলো, এখানে তা খুলে না বল্‌লেও চল্‌বে।

একে আমার এই নাচার অবস্থা, তায় অর্থাভাব। আমার কপালে বিপদ সর্ব্বদাই চরমে উঠেছে, তাই ছায়ার আশা আগে থাক্‌তেই আমি ছেড়ে দিলুম—আমার এই আঁধার ঘরের মাণিকটিকে হাতে পেয়েও মরণ যে তাকে পিছনে ফেলে রেখে বিদেয় হবে, এমন দুরাশা আমি কিছুতেই কর্‌তে পার্‌লুম না।

তবু একবার শেষ চেষ্টা তো কর্‌তে হবে! ছায়াকে বাঁচাতে হ'লে ভালো ডাক্তার ডাকা দরকার। ভালো ডাক্তার ডাক্‌তে হ'লে যথেষ্ট অর্থের দরকার। কিন্তু কিন্তু অর্থ কোথায় পাব? শেষটা কি টাকার জন্যে চিকিৎসার অভাবে আমার এই শেষ-মায়ার পুতুলীটিকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হবে? এ-কথা মনে হ'লে বাপের বুক কেমন করে, তা কি তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ?

আমার অন্ধ চক্ষু অশ্রুজলে ভিজে উঠ্‌ল। ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগলুম। টাকা, টাকা, টাকা! টাকা পাব কোথায়, কে আমায় টাকা দেবে—যে-টাকায় আমার ছায়াকে আবার মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে আন্‌ব?

একটা কথা স্মরণ হোলো। মাসখানেক আগে একজন প্রকাশক (বোধ হয় তিনি আমার অবস্থার কথা জান্‌তেন না) আমার কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন যে, আমার কোন ইংরেজী উপন্যাস থাক্‌লে তিনি তা প্রকাশ কর্‌তে সম্মত আছেন।

অন্ধ হয়ে পর্য্যন্ত আমি আর উপন্যাস লিখ্‌তে পারি-নি। লেখ্‌বার শক্তিও ছিল না, লেখ্‌বার মত মনের অবস্থাও ছিল না। যদিও কাগজে-কলমে লেখ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই, তবু বিলাতী লেখকদের মত 'টাইপ-রাইটারে' রচনা করা তো আমার পক্ষে এখনো অসম্ভব নয়! 'টাইপ-রাইটার' ব্যবহারে আমি

বরাবরই নিপুণতার পরিচয় দিয়েছি। এখনো মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে থাকি।

আজ বিপদে প'ড়ে আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল। তখনি প্রকাশককে চিঠি লিখে জানালুম যে, দিন-দুয়েকের মধ্যে আমার লেখা একখানি ছোট উপন্যাস পেলে তিনি অন্তত দেড় হাজার টাকায় তার 'কপিরাইট' কিনে নিতে এবং হাতে হাতে টাকা চুকিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা ?... ... উত্তরে জান্‌লুম, আমার সর্ত্তে প্রকাশকের কোনই অমত নেই।

তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হোয়ো না যে, সেই সু-খবরে আমি ভগবানকে কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ দিলুম—একবার নয়, অনেকবার!

৬

বিকাল-বেলায় আমি আমার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলুম। চাকরের উপরে মানা রইল, আমি নিজে ঘর থেকে না বেরুলে কেউ যেন আমাকে বিরক্ত কর্‌তে না আসে।

বন্ধুর বাড়ী থেকে একটি ভালো 'টাইপ-রাইটার' চেয়ে আনিয়েছি। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের উপরেই আজ আমার ছায়ার প্রাণরক্ষার ভার! একে না পেলে আমাকে হয়ত আত্ম-হত্যা কর্‌তে হোতো!

আমি খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা ও রচনা কর্‌তে পারি। হিসাব ক'রে দেখ্‌লুম, যদি একটানা ষোলো-সতেরো ঘণ্টা পরিশ্রম করি, তবে কাল সকালে আটটা-নয়টার মধ্যে ছোটখাটো একখানি উপন্যাস লিখে ফেল্‌তে পার্‌ব।

'টাইপ-রাইটারে'র সাম্‌নে গিয়ে বস্‌লুম। লেখা সুরু কর্‌লুম নিজেরই দুঃখের কাহিনী ধ'রে। সেইসঙ্গে নানা কল্পিত ঘটনা মিশিয়ে আমার প্লটকে অবশ্য যথেষ্ট ঘোরালো, চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মস্পর্শী ক'রে তুল্‌তেও চেষ্টার ত্রুটি কর্‌লুম না। কারণ আমি জানি, আমার নিজের যে-কাহিনী আজ তোমাদের সকলের কাছে ব'লে বুকের বোঝা হাল্‌কা কর্‌বার চেষ্টা পাচ্ছি, তার মধ্যে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নেই—তা অত্যন্ত বাস্তব এবং নিত্য-শ্রুত। সংসারে এমন মানুষ লাখো-লাখো রয়েছে, যাদের ললাটের উপরে বিধাতা আমারই কাহিনীর পুনরুক্তি স্পষ্ট ক'রে লিখে রেখেছেন। সে কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখ্‌তে হ'লে আরো বেশী রং ফলিয়ে আমাকে খোদার উপরে খোদ্‌কারি কর্‌তে হবে। একঘেয়ে সাদাসিধে সত্যকথাও বারংবার সহ্য করা অসম্ভব।

লিখ্‌তে লাগ্‌লুম—প্রাণপণে। এমন ক'রে জীবনে আর-কখনো লিখি-নি,—লেখ্‌বার দরকারও হয়-নি। এ লেখার উপরে কেবল আমার সাহিত্যিক যশ নয়—আমার নিজের মরণ-বাঁচন, আমার অন্ধ প্রাণের হাসি-কান্না—এককথায়, আমার ইহলোকের ভালো-মন্দ সমস্ত নির্ভর কর্‌ছে। তাই লিখ্‌ছি, লিখ্‌ছি, আর লিখ্‌ছি—বিকেল গেল, সন্ধ্যে উৎরোলো, রাত হোলো, চারিদিক নিসাড় থম্‌থমে হয়ে এল, আমার কিন্তু সে-সব ভাব্‌বার এক মুহূর্ত্ত ছুটি নেই।

পাশের ঘর থেকে ছায়ার ও 'নার্সে'র সাড়া পেলুম। ছায়া চেঁচিয়ে প্রলাপ বক্‌ছে, 'নার্স' তাকে ঠাণ্ডা কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে একবার থাম্‌লুম।... ...ছায়া আপন মনেই বল্‌ছে, "ওকি বাবা, ওদিকে যেও না—ওদিকে যেও না, ওদিকে ছাতের

আল্‌সে,এখুনি প'ড়ে যাবে যে!··· ···হ্যাঁ বাবা, তুমি যে বড় এখনো জেগে বসে আছ, অসুখ হবে যে,—শোও-গে যাও, এখনো গেলে না? না বাবা, তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে বাবা!··· ··· হ্যাঁ বাবা, সত্যি ক'রে বল দেখি বাবা, তুমি আমাকে বেশী ভালোবাসো, না আমার মাকে?—আমাকে? ইস্—তোমার নিজের চেয়েও?··· ···ছাখো বাবা, তোমার জন্যে কেমন ফুলের মালা গেঁথেচি! সবে-ফোটা বেলফুল—গন্ধ পাচ্চো তো?··· ···বাবা, তুমি চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাকো, আমাকে চুমু খাবার জন্যে অত দুষ্টুমি কোরো না—রও, আগে তোমার চুলটা ভালো ক'রে আঁচ্‌ড়ে দি, মাথাটা ভারি নোংরা হয়ে রয়েচে যে, লোকে দেখ্‌লে নিন্দে কর্‌বে—অত-বড় ধাড়ী মেয়ে, বাপের যত্ন নেয় না"··· ··· ···

আমার ছায়া, আমার ছায়া! পিতৃময় জগতে সে একান্তে বাস করে—প্রলাপেও বাপের কথাই বল্‌ছে, অচেতনেও বাপের ভাব্‌নাই ভাব্‌ছে! এমন মেয়ে কার আছে?

সজল চোখে ফের লেখা সুরু কর্‌লুম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সঙ্গে হয়ত ছায়ার জীবন একটু-একটু ক'রে ক্ষয় হচ্ছে!··· ···বাতাসের শীতলতায় বুঝ্‌ছি, রাত ক্রমে ফুরিয়ে আস্‌ছে, বোধহয় এখন চাঁদ মুখ রাঙা ক'রে পশ্চিম আকাশের মৌন-রহস্যের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে! আমার লেখার কল কিন্তু সমান চল্‌ছে, চল্‌ছে আর চল্‌ছে! মাথা দপ্‌দপ্‌ কর্‌ছে, দেহ এলিয়ে পড়্‌ছে, দুহাত অসাড় হয়ে আস্‌ছে—তবু কিন্তু থাম্‌বার যো নেই! সারারাত্রের নিস্তব্ধতাকে ঠকাঠক্ শব্দে চঞ্চল ক'রে তুলে আমার অশ্রান্ত কল তাই চলেছে তো চলেছেই!

সকাল হোলো। তখনো লিখ্‌ছি। এক-একখানা পৃষ্ঠা 'টাইপ' হ'য়ে যাচ্ছে, আর আমি সেখানা পাশের চুব্‌ড়ীর ভিতরে ফেলে দিয়ে, কলের ভিতরে তাড়াতাড়ি আর-একখানা সাদা কাগজ পুরে দিচ্ছি,—এম্‌নি ক'রে অনেক পাতা লেখা হ'য়ে গেছে।··· ··· বেলা প্রায় ন'টার সময়ে গভীর একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমার লেখা শেষ করলুম!······সে যে কি বিপুল মুক্তির আনন্দ, তা আর বল্‌বার নয়! সেই আনন্দের স্বরূপ বর্ণনা কর্‌তে পার্‌লেও আর-একখানা চমৎকার উপন্যাস লেখা যায়! দেহের অবস্থা তখন শোচনীয়, কিন্তু সে-সব কষ্ট-গ্লানি আমার আনন্দের উচ্ছ্বাসকে একটুও দমাতে পার্‌লে না। আমার আর কিছু ভাব্‌বার নেই—উপন্যাস শেষ করেছি, ছায়ার চিকিৎসার উপায় হয়েছে, তাইই যথেষ্ট! আমার আর-একটি মস্ত তৃপ্তির কথা, আজ্‌কে যে উপন্যাস আমি একাসনে ব'সে সমাপ্ত কর্‌লুম, এর আকার ছোট হ'লেও এর চেয়ে ভালো বই নিশ্চয়ই আমি আর-কখনো লিখি-নি! এর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আমার প্রাণের কতখানি যে চোখের জলের সঙ্গে ঢেলে দিয়েছি, তা সুধু আমিই জানি—আমিই জানি! লেখক কি মন নিয়ে এ-লেখাটি লিখেছে তা কেউ জান্‌বে না বটে, কিন্তু বিলাতের পাঠক-সমাজে নিশ্চয়ই এর বিশেষ আদর হবে।

চ

ঘরের দর্‌জায় কে ধাক্কা মার্‌লে।

আমি উঠে দর্‌জা খুলে দিতেই, বন্ধু

নির্ম্মল এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "ওহে, ছায়াকে দেখ্‌তে এসেছিলুম। তার অসুখ যে আরো বেড়ে উঠেচে!"

আমি বল্‌লুম, "আজ্‌কেই কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের হাতে ছায়াকে স'পে দেব। আমার যা সাধ্য তা করব।"

নির্ম্মল আমার উপন্যাসের কথা জান্‌ত। সে বল্‌লে, "তবে কি তোমার লেখা শেষ হয়েচে?"

আমি বল্‌লুম, "হ্যাঁ। এখন লেখাটা তোমাকে একবার চেঁচিয়ে পড়্‌তে হবে—কিছু-কিছু সুধ্‌রে আজ্‌কেই প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌ব। লেখা কাগজগুলো চুব্‌ড়ীর ভেতরে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। তুমি ভাই ওগুলো তুলে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেল তো!"

নির্ম্মল খানিক পরে বল্‌লে, "ওহে, তোমার লেখা কাগজ কোথায়?"

—"কেন, ঐ বেতের চুব্‌ড়ীর ভেতরে!"

নির্ম্মল আরো-কিছুক্ষণ খুঁজে বল্‌লে, "চুব্‌ড়ীর ভেতরে অনেকগুলো কাগজ রয়েচে বটে, কিন্তু সব যে দু-পিঠ-সাদা!"

একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "কি বল্‌চ হে, ভালো ক'রে ছাখো, ভালো ক'রে ছাখো!"

নির্ম্মল বল্‌লে, "চুব্‌ড়ী আর দেখ্‌তে হবে না, কি হয়েচে আমি বুঝেচি!" ব'লেই সে কলটা একবার চালালে। তারপর বল্‌লে, "চমৎকার অদৃষ্ট তোমার! কলের ভেতরে কালির ফিতে নেই!"

কালির ফিতে নেই! দু-পিঠ-সাদা কাগজ! তবে কি বিকেল, রাত, সকাল ধ'রে একাসনে ব'সে আমি এই পণ্ডশ্রম—

পাশের ঘর থেকে ছায়া আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আমি মাথা ঘুরে মাটির উপরে আছ্‌ড়ে পড়্‌লুম!... ... ...

—তারপর? আমার জীবন-কাহিনী আর বল্‌তে চাই না, কি হবে তা শুনে? তা বিস্বাদ, তিক্ত, দুঃসহ! এইটুকু কেবল শুনে রাখো,—তারপর থেকে আমি ভগবানকে মানি না! এ-জীবনে আর কোনদিন মান্‌বও না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সঙ্কলন

পট

যে-সহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্ব্ব পরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যবসা।

সে মনে ভাবে, ধনী ছিলেম, ধন গিয়েচে, হয়েচে ভালো। দিন-রাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে?

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আন্‌লে। সেদিন তাই নিয়ে সহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চল্‌ল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই ত সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে' নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্ব্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে-ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুর ঘর; সেখানে গিয়ে হাতজোড় করে' বল্লে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম? এতদিনে বর দিলে কি এই অপমান?

২

এমন সময় রথের মেলা বস্‌ল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিন্‌তে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লস্কর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, "আমি কিনব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটি কে?"

সে বললে "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরো বেড়ে উঠ্‌ল। বাড়ীতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে, মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বললে, "এত বড় স্পর্দ্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগ্‌ল, ততই সে মনে মনে বল্‌লে, "এই আমার জিৎ।"

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্ট-দেবতার একখানি করে' ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোন পূজা সে জানে না।

একদিন দেখ্‌লে, ছবি তার মনের মত হয় না। কি যেন বদল হয়ে গেচে। কিছুতে তার ভাল লাগেনা। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। একদিন হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে "বুঝতে পেরেচি।"

আজ সে স্পষ্ট দেখ্‌লে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মত হয়ে উঠ্‌চে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "মন্ত্রীরই জিৎ হল।"

সেই দিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বল্‌লে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "কত দাম?"

অভিরাম বল্‌লে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পার্‌লে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র ভাদ্র, ১৩২৮।

আমাদের সঙ্গীত *

সঙ্গীত-সঙ্ঘ থেকে যখন আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব এসেছিল, তখন আমি অসঙ্কোচে সম্মত হয়েছিলেম; কেননা সঙ্গীত-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী নেত্রী এবং ছাত্রী সকলেই আমার কন্যাস্থানীয়া—তাঁদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হই নি। তারপরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম, এ সভায়

---

* সঙ্গীত-সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে উক্ত।

সর্ব্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সঙ্গীত,—তখন আমি মনে বুঝলেম এ আমার পক্ষে একটা সঙ্কট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সঙ্গীত-বিদ্যালয়েও আমার হাজিরা-বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম। এই ব্যাপারে আমার ব্যাকুলতা দেখে উদ্যোগ-কর্ত্তারা কেউ কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, তোমাকে বেশি বলতে হবে না, দু'চার কথায় বক্তৃতা সেরে দিয়ো। আমি তাঁদের এই পরামর্শে আশ্বস্ত হই নি। কেননা, যে-লোক খুব বেশি জানে, সেই মানুষই খুব অল্পকথায় কর্ত্তব্য সমাধা করতে পারে,—যে কম জানে তাকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলতে হয়। যাই হোক, এখন আমার আর ফেরবার পথ নেই, অতএব "যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" এই সদুপদেশ পালন করবার সময় চলে গেছে।

বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চ্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্ব্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অত্যন্ত যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি;—কিন্তু কালোয়াতি সঙ্গীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক; গীতরসের যে-সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন্ মুখে, তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি, তখন তার থেকে বুঝতে পারি সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কি। আজ সভায় আমি সেই কথাটির আলোচনা করব।

আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বোঝা গেল না।

আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সঙ্গীতেরও এইরকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্চে বিশুদ্ধ সঙ্গীত আকারে, আর হচ্চে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে. সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক্, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার "ছায়েবানুগতা।" ভজন সঙ্গীতের কথা যদি ছেড়ে দেই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সঙ্গীত যে-বাক্য আশ্রয় করে, তা অতি তুচ্ছ। সঙ্গীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।

বাংলা দেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—সে দেখতে পাচ্চি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালীর টান; এই জন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এই জন্যে বাংলা দেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রমাণ দেখ আমাদের কীর্ত্তনে। এই কীর্ত্তনের সঙ্গীত অপরূপ। কিন্তু সঙ্গীত যুগলভাবে গড়া—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা।

পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা; স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না।

সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই এবং, প্রাচীনকালেই হোক্ আর আধুনিক কালেই হোক, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন্। বীণ রবাব শরদ সেতার এস্রাজ সারেঙ্গি প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশী বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়। তা ছাড়া গড়ের বাদ্যের বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলা দেশে কন্সর্ট নামক যে-যন্ত্রসঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে, তাকে সহ্য করা আমাদের লজ্জা এবং তাতে আনন্দ পাওয়ায় আমাদের অপরাধ।

এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাংলা দেশে কাব্যের সহযোগে সঙ্গীতের যে বিকাশ হচ্চে, সে একটা অপরূপ জিনিষ হয়ে উঠবে। তাতে রাগ রাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্ত্তনে তা নেই; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেন না তাকে বাণীর দাবী মেনে চল্‌তে হবে। কিন্তু এননতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয়পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এই জন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক্, বাংলা দেশে এই একজাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্ততঃ আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গান রচনা, অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে-শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে; কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে—সে রীতি কোনো বড় কবি নিখুঁৎ ভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন না—অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন—কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলা-বিদ্যার স্থান নেই। এই জন্যে নিজের সৃজন শক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই, শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার হয়।

সঙ্গীত-সঙ্ঘ আমাদের দেশের সঙ্গীতকে দেশের মেয়েদের কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিয়েচেন। তাঁদের এই সাধনার গভীর সার্থকতা আছে। আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে, একটি প্রয়োজনের আরেকটির অপ্রয়োজনের,—একটি অন্ন, আরেকটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্ত্যলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকের দেবতাদের দলে। সঙ্গীত হচ্চে অমৃতের নানাধারার মধ্যে একটি। দেশকে অন্নের পরিবেষণ ত মেয়েদের হাতেই হয়, আর অমৃতের পরিবেষণও কি তাঁদের হাতেই নয়?

এ কথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। যে জাতি পেটুক, সে কেবল-মাত্র নিজের প্রতিদিনের গরজ মিটিয়ে চলেচে, মৃত্যু-তেই তার একান্ত মৃত্যু। গ্রীস্ যে আজও অমর হয়ে আছে, সে তারা ধনে-ধান্যে রাষ্ট্রীয়প্রতাপে নয়, আত্মার আনন্দরূপ যা-কিছু সে সৃষ্টি করেচে, তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে, সে মর্ত্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস্ সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করচে। সঙ্গীত মানবের সেই আনন্দরূপ—সে মানবের নিজের অভাব মোচনের অতীত বলেই সর্ব্বমানবের এবং সর্ব্বকালের;—রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন।

যে-সকল ঘোরতর প্রবীণ লোক ওজন-দরে জিনিষের মূল্য বিচার করেন, সারবান বলতে যাঁরা ভারবান বোঝেন, তাঁরা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে সৌখীনতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাঁরা জানেন না, যাদের বীর্য্য আছে সৌন্দর্য্য তাদেরই। যে শক্তি

আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে, সে হল পালোয়ানি কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্চে সৌন্দর্য্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরতা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে, আপিস আদালতে কলে কারখানায় নয়। উপনিষদ বলেচেন, জন্মেচে বলেই সকলে অমর হয় না, যারা অসীমকে উপলব্ধি করেচে অমৃতাস্তে ভবন্তি। অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ের কল, পাটের বস্তার কারখানা,—অসীমের উপলব্ধিতেই সঙ্গীত। অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা। যে-সৃষ্টিকর্ত্তা চন্দ্র-সূর্য্যের সিংহাসনে বসে দরবার করচেন, তিনি যে গুণী জাতিকে শিরোপা দিয়ে বলেন, "সাবাস, আমার সুরেরি সঙ্গে তোমার সুর মিলচে"—সেই ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃত সভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হয়ে থাকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র ভাদ্র, ১৩২৮।

আঁধি

২০

দশ-বারো দিন পরে ভুবনেশ্বরী চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে একবার বলাইদের সঙ্গে দেখা-শুনা করিয়া কাশী-হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে-তীর্থে ঘুরিয়া শেষে কাশীতে কি বৃন্দাবনে বাকী কয়টা দিন স্থায়ীভাবে কাটাইয়া দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

ভুবনেশ্বরী চলিয়া যাইবার পর অভয়াশঙ্করও নিখিল ও সুষমাকে লইয়া পশ্চিমে গেলেন। চুনার, মুঙ্গের, মিহিজাম প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া শিমুলতলায় আসিয়া আস্তানা পাতিলেন।

সুষমা ও নিখিল এখানে আসিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। গাড়ী-ঘোড়ার চিহ্ন নাই,—পরিষ্কার ঝরঝরে রাস্তা,—কোথাও দোতলার সমান চড়াই উঠিয়াছে, কোথাও বা একেবারে নীচু হইয়া সেই পাতালে গিয়া ঠেকিয়াছে,—দুইধারে গাছপালা, পুকুর, ঠিক যেন ছবির মত। পথে লোকের ভিড় নাই! সকালে-বৈকালে একটা ভৃত্য সঙ্গে লইয়া দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়া কতদূরে চলিয়া যায়—কোন ঝঞ্ঝাট নাই। ষ্টেশনের ধারে-ধারে ছোট-ছোট পাহাড়—সেই সব পাহাড়ে চড়িয়া দুইজনে বসিয়া থাকে। মাথার উপর স্বচ্ছ নির্ম্মল নীল আকাশ। সম্মুখে বহুদূর অবধি মুক্ত প্রান্তর তাহার অভিনব বৈচিত্র্য ফুটাইয়া পড়িয়া আছে—তাহারই বুকের উপর দিয়া খেলাঘরের ছোট্ট গাড়ীগুলির মতই ট্রেন আসিয়া দেখা দেয়—সেই ট্রেনই কত শত যাত্রী লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোথায় কত দূর-দেশে চলিয়া যায়!

সেদিন তাহারা বেড়াইতে বাহির হইলে ভৃত্য বংশী বলিল—মা, এখানে একটা নদী আছে, মহাজোড়—সেখানে বেশ একটি ঝরণাও আছে—দেখ্‌তে যাবেন মা?

ঝরণার নাম শুনিয়া নিখিল একেবারে

আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, চলো মা। ঝর্ণা দেখ্‌ব।

মহাজোড়ের রাস্তা ঠিক যেন ব্রাহ্মণের গায়ে সূক্ষ্ম পৈতাটির মত সহরের বুকের উপর দিয়া ঈষৎ বাঁকিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে। সুষমা ও নিখিল সেই পথে নদী দেখিতে চলিল। পথের দুইধার ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে—দুইধারেই গভীর খাদ। সম্মুখে বহুদূরে প্রকাণ্ড পাহাড়—যেন ওদিক্‌কার সমস্ত জগৎটাকেই সে ঢাকিয়া রাখিয়াছে! অনেকটা হাঁটিয়া এক জায়গায় বালুময় চরের মাঝখানে জলের একটা শীর্ণ রেখা কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া আগাছার অগভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছে। জলটুকু বরফের মতই শীতল।

সুষমা ও নিখিল গিয়া বালু খুঁড়িতে জলের ছোট ছোট কুণ্ড ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নিখিল মহা-খুসী হইয়া বলিল—মা, এইখানেই রোজ রোজ আমরা বেড়াতে আসব এবার থেকে, কেমন?

ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করিল। বংশী বলিল,—মা, আর দেরী কর্‌বেন না। এখানকার লোকে বলে, ঐ জঙ্গলে নাকি বাঘ বেরোয়!

হাসিয়া সুষমা বলিল—দূর, কি খেতে বাঘ বেরুবে রে? এখানে মানুষ কোথায়?

বংশী বলিল—কেন মা, এই যে রাস্তা,—এই রাস্তার ওধারে করো বলে গাঁ, আর এই রাস্তা দিয়ে সিধে গেলে বদ্দিনাথে পৌঁছুনো যায়। কত লোক চলে।

বাঘের নাম শুনিয়া নিখিলের কৌতূহল এমনি বাড়িয়া গেল যে সে হাতের ছোট কঞ্চিগাছা লইয়া ছোট জঙ্গলের গাছ-পালা ঠেঙ্গাইতে সুরু করিয়া দিল। ওদিকে করোগাঁয়ের দিক হইতে কয়েকটি সাঁওতাল রমণী আসিতেছিল—তাহাদের কাহারো কাঁথে ছোট কলসী, কাহারো মাথায় মাটি-লেপা ছোট ধামা। কলসী আর ধামায় ছিল ঘী কিম্বা তেল, আর ধামায় আনাজ-তরকারী। রমণীদের বিচিত্র বেশ আর হাস্যময় মুখ-চোখ দেখিয়া সুষমা একজনকে কাছে ডাকিল, বলিল,—হ্যাঁ রে, এধারে বাঘ আছে না কি?

সাঁওতাল রমণীরা সুষমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

বংশী বলিল—ইধার শের হায়?

রমণীদের মধ্যে বয়সে যেটি কিশোরী, সে অগ্রসর হইয়া ভাঙ্গা বাঙলাতে কথা কহিল, বলিল,—না মা, শের কুথা সে আসবে! এই হামরা রাত-বিরেতে সব এই পথে যাওয়া-আসা করি, শের তো দেখিনি। তবে লোকে বলে, হামরা চোখে দেখিনে। হেথা চোর আছে, মা, তুমি জেবর গায়ে দিয়ে এধারকে এসো না। তোমার বাড়ী কলকাত্তায়,—না মা?

—হ্যাঁ। বলিয়া সুষমা হঠাৎ পাশের দিকে ফিরিয়া দেখে, নিখিল কাছে নাই। কোথায় গেল? সুষমা শিহরিয়া উঠিল, ডাকিল—নিখিল, নিখিল—।

খানিকটা দূরে জঙ্গলের ওধার হইতে নিখিল সাড়া দিল,—যাই মা। আমি ঝরণা খুঁজচি।

সুষমা তখন রমণীদের জিজ্ঞাসা করিল,—

এধারে ঝরণা কোথায় আছে রে? ঝরণা শুনিয়া এমনি বিস্ময়ের দৃষ্টি লইয়া রমণীরা তাহার পানে চাহিল, যে সুষমা অবাক হইয়া গেল। সে ভাবিল, ঝরণা কথাটার অর্থ বোধ হয় ইহারা জানে না! তখন ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সুষমা বলিল,—ঝরণা বুঝ্‌চ না? পাহাড়ের গা থেকে পানি পড়ে না? তাকেই বলি, ঝরণা!

—ওঃ—হাঁ—হাঁ বলিয়া তাহারা জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল; পরে বলিল,—ঐ উরি ভিতর আছে। কিন্তু আজ দেরী করোনা, মা—এখানকার লোক ভারী গরীব আর শয়তান আছে! খেতে তো পায় না। দু' তিন পয়সার জন্য জান্ মেরে দেয়! ঘরকে যা মা—এই কথা বলিয়া তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া গাঁয়ের দিকে চলিয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া সুষমার একটু ভয় হইল। সে ডাকিল,—নিখিল—

ঠিক তাহার ডাকের প্রতিধ্বনি তুলিয়াই যেন জঙ্গলের মধ্য হইতে একটা শব্দ উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের ক্রন্দন-জড়িত চীৎকার ভাসিয়া আসিল—ওগো মা—গো!

ভয়ে ধড়মড়িয়া সুষমা বংশীর দিকে না চাহিয়াই চীৎকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া গেল। ছোট ছোট শিশু-গাছের ডাল-পাতা সরাইয়া এধারে চাহিয়া ওধারে ঝুঁকিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া সুষমা দেখে, পাথরের কয়েকটা উঁচু ঢিবির পাশে নিখিল হুমড়িয়া পড়িয়া আছে।

—ও বংশী, আয় রে—বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া সুষমা কাছে গিয়া দেখে, নিখিল…

কপালের কাছটা পাথরে ছেঁচিয়া গিয়াছে,—তাহার মুখে রক্ত, ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে, নিখিল কাঁদিতেছে। সুষমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাছে আসিয়া দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করে এ কাণ্ড হলো?

কাঁদিয়া নিখিল বলিল,—পড়ে গেছি।

বংশী আসিয়া সুষমার কাছ হইতে নিখিলকে তুলিয়া আপনার কোলে লইল। সুষমা বলিল—চ', জলের ধারে নিয়ে চ'। ছি বাবা, একলাটি চুপি-চুপি কেন চলে এলে, বল দেখি! না এলে ত আর এ অনর্থ ঘটত না। এখন কি যে করি—

নিখিলকে লইয়া বংশী বালির উপর বসিল, আর সুষমা কাপড়ের আঁচল জলে ভিজাইয়া সেই ভিজা আঁচল দিয়া তাহার কপালের ও নাকের-মুখের রক্ত ধুইয়া মুছাইয়া দিল। মুছাইয়া দেখে, উপরের-ঠোঁটের কোণটা ফুলিয়া মার্ব্বেলের মত হইয়াছে!

সুষমা বলিল,—এখন বাড়ী যাই, চল। এতটা পথ হেঁটে যেতে পারবে কি নিখিল, তাই আমি ভাব্‌চি। কেন যে মরতে এধারে এলুম!

সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে নিখিল বলিল—বাবা মার্‌বে। বাবাকে তুমি বলোনা মা।

সে স্বরে আশ্রয়-ভিক্ষার এমন করুণ মিনতি ঝরিয়া পড়িল যে সুষমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে মমতায় গলিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা বলিল—না, না, মারবেন কেন! আমি তাঁকে বলব'খন—নিজের দোষে ত

নিখিল বলিল—বাবা শুনবে না, মা।

হায়রে, সুষমাও এ কথা ভালো করিয়া জানে। তাই জোর গলায় ছেলেকে সে কোন ভরসাই দিতে পারিল না। সে কে—তাহার এমন কি জোর আছে যে নিখিলকে সে আশ্বাস দেয়! একটা কথা তাহার মনে হইল, এতদিন সময়টা এখানে বেশ এক-রকম কাটিয়া যাইতেছিল, কোন জ্বালা ছিল না। নিখিলকে একেবারে অন্তরে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়াছিল! শুধু আসিবার পর একদিন সেই যা-একটু গোল বাধিয়াছিল! ষ্টেশনের ওধারে নার্শারির কাছে সেই যে বাড়ীটা,—সেই বাড়ীর গৃহিণী তাহাদের ডাকিয়া সেদিন আলাপ করিতেছিল। তাই কথায় কথায় রাত্রি হইয়া যায়—নিখিলকে লইয়া সুষমা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। অভয়াশঙ্কর সেদিন একটিও তিরস্কার করেন নাই, গম্ভীর হইয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিবার পর শুধু একটি মাত্র বক্রোক্তি করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,—স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে না বলেই ত এদেশের মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করে না। বেড়াতে বেরুলো ত বাড়ী ফেরবার কথা আর মনেই থাকবে না—এ যে সর্ব্বনেশে বেড়ানো!

সুষমা এ মন্তব্যের অর্থ বুঝিয়া শুধু বলিয়াছিল,—একজনরা ডেকে আলাপ করলেন,—নিখিলকে তাঁদের গাইয়ের দুধ দুইয়ে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে না খাইয়ে কিছুতে ছাড়লেন না—!

অভয়াশঙ্কর অমনি ছোট একটা ঝঙ্কার তুলিয়া জবাব দিলেন,—বটে! বাড়ীতে ফিরতে রাত হলে সব রাগ করবে, এ কথা বললে কোন্ লোক ধরে রাখতে পারে!

সুষমা এ কথার আর কোন জবাব দেয় নাই! কি জবাবই বা দিবে? অভয়াশঙ্কর বুঝিবেন কি,—পরের কাছে এ কথা বলিতে মেয়েমানুষের কতখানি বাজে। নিজের ঘরে নিজের জনের উপর এটুকু শক্তিও তার নাই কি! সে এমনি হতভাগিনী! এ কথা পাঁচ জনের কাছে সে বলিয়া বেড়াইবে কোন্ মুখেই বা!

লোকে তাহার স্বামীকেই বা ভাবিবে কি! ভাবিবে, এমনি মেজাজ যে পাণ হইতে চূণটুকু খসিলেই সর্ব্বনাশ! সত্যই ত, এমন করিয়া কেহ কখনো সংসার-ধর্ম্ম পালন করে না। একটু প্রেম, একটু প্রীতি, একটু সহানুভূতির চোখে দেখিলে কি আর এটাকে ত্রুটি বলিয়া মনে হয়! অভয়াশঙ্কর নাই মানুন, তবু লোকের চোখে সে ত তাঁর স্ত্রী! স্ত্রী বলিয়া তাহার ত একটা দায়িত্ব-বোধ আছে! সত্যই সে কিছু জেলখানার কয়েদী নয় যে হাজিরায় ঘড়ি ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় মিলাইয়া দেওয়া চাই!

আজ নিখিলের এই অভয়-প্রার্থনায় সুরে সেদিনকার কথাটা সুষমার মনে পড়িয়া গেল। মুখে সে সান্ত্বনা দিয়া ছেলেকে বলিল বটে,—কোন ভয় নেই বাবা, আমি সব ঠিক করে দেব'খন! কিন্তু তাহার অন্তরাত্মাই বুঝিল, ঠিক করা তাহার পক্ষে সহজ নয়—বড় কপাল-জোর হইলেই রক্ষা, নহিলে আজ গৃহে গিয়া ইহার জন্য আর-একটা ছোট-খাটো তাল হয়তো তাহাকে সামলাইতে হইবে!

বংশী বলিল,—এসো বাবু, কোলে এসো। এত পথ হাঁটতে পারবে না! হেঁটে গেলে বহুৎ রাত হোয়ে যাবে।

নিখিল বলিল,—না, আমি হেঁটেই যাবো, মা। দেরী হবে না।

তিনজনে আসিয়া বাড়ীর কাছে পৌঁছিলে সুষমা ভাবিল, যদি কিছু ভর্ৎসনাই মেলে! চাকরের সাম্‌নে বলিয়া ত অভয়াশঙ্কর রেয়াৎ করিবেন না! রাগ করিয়া এমন সব কথা বলিয়া বসিবেন, যেগুলা তীরের মত তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিবে। সে কথার বাণ একান্তে সে অনেকগুলাই নিঃসঙ্কোচে বেশ গ্রহণ করিতে পারে, তবে চাকর-বাকরের কাছে এই সব! বড় লজ্জা করে সে! নিজে হইতে ত সে হেঁট হইয়াই আছে, তবে আর ইহাদের কাছে অতখানি খাটো করা কেন! তাই সুষমা বংশীকে বিপদের মুখ হইতে সরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—তুই যা ত বংশী, সেই গজেনবাবুর বাড়ী—সেই যে ষ্টেশনের কাছে বাঙলাখানা রে। তাঁরা আজ ভালো পাণ দেবেন বলেছিলেন। বাবু আবার শুক্‌নো পাণ খেতে পারেন না কি না—সেই পাণ নিয়ে আয়গে, বাবুর জন্যে।

২১

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বালা! অভয়াশঙ্কর আলোর সম্মুখে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। সুষমা নিখিলকে পাশের ঘরে দাঁড় করাইয়া নিজে শুধু অভয়াশঙ্করের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমাদের আজ ফির্‌তে একটু দেরী হয়েচে, না?

পড়েছিলুম। ও-ধারে কেমন একটা নদী আছে, দেখে এলুম। তুমি গেছ কোনদিন?

—ঐ করো গাঁয়ের দিকে ত?

—হ্যাঁ!

—ওকে বল, নদী! ও ত নর্দ্দামা! আমি দেখে এসেচি। তা সে ত অনেকটা দূরে। নিখিল অতদূর হাঁটতে পার্‌লে?

—বেশ হেঁটেচে। বংশী কোলে নিতে চাইলে, তা গেল না। হাঁটা ত ভালো। নয় কি?

খবরের কাগজটা মেঝেয় ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হাঁটা ভালো, তবে সামর্থ্য বুঝে হাঁটা চাই! তারপর কাল সকালে উঠে না বলে, পায়ে ব্যথা হয়েছে! তোমরা সীমা ঠিক রাখতে পারো না, এইটেই তোমাদের মস্তদোষ! এই জন্যেই তো তোমাদের বলি, অবুঝ!...যাক্‌, নিখিল গেল কোথায়?

—ও-ঘরে আছে। এইটুকু বলিয়াই সুষমা তাহার অত্যন্ত ভীত-কুণ্ঠিত মনটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া কোনমতে সবল করিয়া তুলিয়া একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণে মুখ নামাইয়া খুব মৃদু স্বরেই বলিল—আজ সে একটা অন্যায় করে ফেলেচে। তুমি বক্‌বে না? মাপ কর্‌বে, বল!

অভয়াশঙ্কর সোজা হইয়া বসিলেন; বসিয়া বলিলেন—কি, অন্যায়? তাঁহার গলার স্বর যেন একটু কঠিন, কিন্তু অকম্পিত! তিনি বলিলেন,—কিছু হারিয়ে এসেছে নাকি?

কুণ্ঠিতভাবে সুষমা বলিল,—না।

—তবে? অভয়াশঙ্কর শিকারীর মতই

তারপর বলিলেন,—কি ! নিখিল কোথাও পড়ে-টড়ে গেছে বুঝি ?

সুষমার সমস্ত প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল,—কোনমতে সে ভয়কে ঠেলিয়া সরাইয়া মৃদুস্বরে সে কহিল,—হ্যাঁ।

—কোথায় পড়ল ? ডাকো তাকে, দেখি !—নিখিল—

পিতার আহ্বানে নিখিল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল,—তাহার সজল দুই চোখ এমন করুণ, এমনি কাতর অনুনয়ে ভরা যে তাহা দেখিবামাত্র সুষমার সমস্ত অন্তর একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিখিলকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল,—এই যে ঠোঁট আর রগের কাছটা পড়ে কেটে গেছে। জল দিয়ে ধুইয়ে দিয়েচি—এখনি একটু আইডিন দিয়ে দিচ্ছি। পাথর ছিল কিনা, তাইতেই কেটে গেছে।

অভয়াশঙ্কর নিখিলকে কাছে আনিয়া ক্ষত স্থান দেখিলেন, পরে বলিলেন,—বংশী সঙ্গে রয়েচে, তুমি নিজে আছ,—তবু এমন পড়ল কি করে ?

কথার এই যে ভঙ্গীটুকু, তাহা সুষমার প্রাণে মুগুরের ঘা মারিল। এ ত ছেলের দোষে মাকে ভর্ৎসনা নয়, এ যে চাকরের সঙ্গে তাহাকে এক পৈঁঠায় দাঁড় করাইয়া বিচারকের কড়া কৈফিয়ৎ-তলব !

সুষমা বলিল—আমি একজনের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, ও ঝরণা দেখতে গিয়ে অমনি চিৎ হয়ে পড়ে গেছে। তারপর সংক্ষেপে ব্যাপারটা সে খুলিয়া বলিল।

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর হইয়া সমস্ত শুনিলেন, পরে আরো গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হুঁ ! তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—কাল থেকে ও আমার সঙ্গেই বেড়াতে যাবে। তুমি আলাদা যেয়ো—ও সঙ্গে থাক্‌লে তোমার গল্প-সল্প কর্‌বার ব্যাঘাত হয়, দেখ্‌চি। সেদিন রাত হয়েছিল, আর আজ এই কাণ্ড ! আমি এটা আগে বুঝিনি, তাই তোমাকে দিয়ে ওর চৌকিদারী করাচ্ছিলুম ! আজ শেষ—কাল থেকে তোমার ছুটি ! পরে নিখিলকে ডাকিয়া বলিলেন—নিখিল, কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে ! ওদের সঙ্গে গেলে তোমার বদমায়েসি বড় বাড়ে। দেখি, আমার সঙ্গে বেড়িয়ে শান্ত-শিষ্ট হতে পারো কি না। এখন যাও, ও-পোষাক ছেড়ে তোমার ঘরে বই নিয়ে বসো গে !

এই বয়স হইতেই নিখিল পিতার আদেশ শক্তিমান্ রাজার দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মতই মানিতে শিখিয়াছিল। আদেশ শুনিয়া সে সে-ঘর হইতে চলিয়া গেল। বাপের কাছে মার বা বকুনি খাইতে হইল না বলিয়া মনটা খুসী হইলেও মা যে এই অনর্থক এতটা তিরস্কার ভোগ করিল, আর সে শুধু তাহারই দোষে—এই অপ্রসন্নতা আগুনের হল্‌কার মতই তাহার মনটায় ছাঁকা দিয়া অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিল।

নিখিল চলিয়া গেলে অভয়াশঙ্কর কাগজখানা হাতে লইয়া তাহারই অক্ষরগুলার পানে আবার মনঃসংযোগ করিলেন, আর সুষমা পুতুলের মত নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে আসিয়া একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ে হাত বাঁধিয়া বলিল,—তুমি রাগ করেছ ? বল।

—না, রাগ কি! আর কেনই বা রাগ করব! বিশেষ তোমার উপর রাগ করতে পারি কখনো? তুমি আমার ছেলেকে অত-বড় সঙ্কট-পীড়া থেকে আরাম করে তুলেছ—!

—ছি, ও কি কথা বল্চ! ক্ষুব্ধ অভিমানে সুষমার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন—ও যদি তোমার পেটের ছেলে হতো, তাহলে কি আর ঐ জঙ্গলের ধারে তার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পার্তে তুমি!

সুষমার চোখের সম্মুখে কি কতকগুলা অস্পষ্ট ধোঁয়ার মূর্ত্তি কুণ্ডলী পাকাইয়া ছোট-বড় মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—কি করে তোমায় বোঝাব, বল—কি কর্লেই বা তুমি বুঝবে! কিন্তু বড় ভুল বুঝচ তুমি। এই ভুলের জন্যে নিজে কষ্ট পাও, আমায় কষ্ট দাও, ছেলেটা অবধি সে কষ্ট থেকে বাদ পড়ে না! কেন যে এ ভুল বোঝো তুমি, অত বিদ্বান হয়ে, বুদ্ধিমান হয়ে—!

সুষমার দুই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই অভয়াশঙ্কর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, বলিলেন—যাই, নিখিলের পড়াটা একটু দেখে দি—ওর মাষ্টার মশায় আরো পাঁচ-সাতদিন পরে আসবেন, লিখেচেন। এর মধ্যে আসা ঘট্বে না। ভালো কথা, নিখিল আজ আমার সঙ্গেই খেতে বসবে'খন—অর্থাৎ তোমার ঘাড়ের বোঝা যতটা হাল্কা করতে পারি! অনেক ঋণেই ত ঋণী আছি—আরো কেন ঋণের

সুষমার মনটা এই সব কথার খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া হু-হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, আর কোন কথায় থাকা নয়—দাসী-চাকরের মতই শুধ্ সে এ-সংসারে কর্ত্তব্য সারিয়া যাইবে! স্নেহের আব্দার তুলিয়া এমন করিয়া স্নেহ বস্তুটার অপমান ঘটিতে দিবে না! কিন্তু কি করিয়া তা হয়? হায়রে, সে উপায় যদি থাকিত!

তাই মনের ক্ষতের সে জ্বালা কোনমতে চাপা দিয়া কুণ্ঠিত স্বরে সুষমা বলিল,—লুচি খেতে কি ও পারবে?—ঠোঁট কেটে গেছে! ওর জন্যে গাইয়ের দুধ দুইয়ে আন্তে পাঠিয়েচি—সে এলে দুধ নিজে আমি জ্বাল দিয়ে দেব—

শুধু দুধ! বেশ—বলিয়া অভয়াশঙ্কর সে-ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, আর সুষমা একলা তেমনি করিয়াই পুতুলের মত নিঃশব্দে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

বংশী আসিয়া যখন তাহাকে বলিল,—দুধ ত এনেচি মা। আপনি রান্নাঘরে একবারও গেলেন না,—ঠাকুর জিগ্গেস করচে, একসঙ্গে ও দুধ জ্বাল হবে, না, আলাদা হবে?—তখন তাহার হুঁস হইল। চমকিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে দেখে, ন'টা বাজে! তাই ত, কতক্ষণ এমনি কাঠের মত সে দাঁড়াইয়া আছে! অপ্রতিভ হইয়া সুষমা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটিল।

২২

পরের দিন সকালে উঠিয়া পোষাক পরিয়া নিখিল আসিয়া যখন সুষমাকে ডাকিল,—মা, বেড়াতে যাবে না? বা রে, এখনো তুমি

মন এক অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। নিখিলের পানে চাহিয়া সে বলিল,—আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, বাবা। আজ আর বেড়াতে যাব না, মনে কর্‌চি!

নিখিল সুষমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি অসুখ করচে মা?

সুষমা দুই হাতে তাহার মুখের পরশ লইয়া সস্নেহে বলিল,—এমন কোন অসুখ নয় রে, পাগলা। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়-নি কি না, তাই বেড়াতে যেতে কেমন ইচ্ছে কর্‌ছে না!

—আমি তবে কার সঙ্গে যাব? বাবার সঙ্গে সত্যিই বুঝি যেতে হবে! না মা, বাবার সঙ্গে যেতে ভয় করে! আমিও যাবনা মা বেড়াতে।

সুষমা বিপদে পড়িল,—স্পষ্ট করিয়া তাহাকে যে বলিবে, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও, সে শক্তি তাহার নাই। সেই যে কাল রাত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, আজ হইতে নিখিল তাঁহার সঙ্গেই বেড়াইতে যাইবে—কি জানি, সে কথা যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন! তাহা হইলে আজ আবার এ কথা তুলিতে গেলে হয়তো নূতন একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেই হাঙ্গামায় আরো কত কথার হুল তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিবে! সে নিখিলকে বলিল—আজ বংশীর সঙ্গেই বেড়াতে যাও না হয়!

নিখিল বলিল,—না মা, থাক্ গে, বেড়াতে আর যাব না। তার চেয়ে আমি ওই বাড়ীর বাগানেই বেড়াইগে, কেমন প্রজাপতি ধরব'খন, সে বেশ হবে। তুমিও একটু পরে এসো।

—আচ্ছা।

নিখিল একটা বল লইয়া লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেল। সুষমা এক-দৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। নিখিল চোখের আড়ালে গেলে সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তোকে পেটে ধরি-নি, নিখিল, এ কি কম দুঃখ আমার! তোর উপরে কোন জোর, কোন অধিকার খাটে না রে! যদি তুই আমার এই পেটের হতিস্, তাহলে দেখতুম, কে তোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, এম্‌নি উল্টো হুকুমে মার প্রাণ কেমন বেঁধে রাখতে পারে!—আমি বেড়াতে যাব না, শুনে ঐ যে তুই বল্‌লি, তুইও যাবি না,—এত দুঃখেও এইটুকুই আমার মস্ত সান্ত্বনা—না হলে এত দিন আমি পাগল হয়ে যেতুম!

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বিছানায় বসিয়া খোলা জানলার মধ্য দিয়া বাহিরে পথের পানে চাহিয়া রহিল। সাম্‌নেই পরিচ্ছন্ন রাস্তা,—বাঁকিয়া কতদূরে সেই দুইটা উঁচু টিলার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ রৌদ্রে চারিধার ঝলমল করিতেছে! সেই পথে, মাঝে মাঝে ঐ কত লোক চলিয়াছে। জোয়ান সাঁওতালেরা গরু মহিষ তাড়াইয়া গৃহে-গৃহে দুধ জোগাইতে চলিয়াছে! আনাজ-তরকারীর ঝুড়ি মাথায় সাঁওতাল-রমণীরাও চলিয়াছে,—আবার ঐ যে একটি বাঙালী বাবু স্ত্রী-পুত্র লইয়া মৃদু মন্দ-গতিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নাচিয়া-ছুটিয়া সঙ্গে চলিয়াছে, আর বাবুটি স্ত্রীর হাত ধরিয়া পিছনে চলিয়াছেন। সুষমা একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল! বহুদূর হইতে ছেলেমেয়েদের চীৎকার আর

হাসির ঝাপ্‌টা ফুলের গন্ধের মতই ভাসিয়া আসিতেছিল। সুষমা ভাবিল, ইহাদের জীবনই সার্থক,—সংসার করাও কি আরামের! ছোট-বড় কোন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কোন পক্ষ হইতে কোন কৈফিয়ৎ-তলব নাই—সঙ্কোচ বা ভয় ঐ শুভ্র জীবন-পথে এতটুকু কালি ছিটাইতে পারে না! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবনার সাগরে ঝাঁপ দিল। এ ভাবনার কি আর তার শেষ আছে, না সীমা আছে!

নিখিল বাহিরে ওদিকে তখন বল লইয়া খেলা করিতেছিল। বাগানের বেড়ার ধারে করবী গাছের শ্রেণী। বড় বড় গাছগুলায় লালরঙের করবী ফুটিয়া চারিধার আলো করিয়া রাখিয়াছে। মালী ফুল তুলিতেছিল—বড় একটা করবীর গুচ্ছ তাহার কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া নিখিল মার কাছে ছুটিল। মা ফুল ভালবাসে, মাকে দিবে। এমন সময় কে ডাকিল—নিখিল।

পরিচিত স্বর। সে স্বরে চমকিয়া নিখিল চাহিয়া দেখে, সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া অভয়াশঙ্কর। অভয়াশঙ্কর বলিলেন—এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? বেড়াতে যাওনি যে!

নিখিল মৃদু কণ্ঠে কহিল,—না।

—কেন?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে কহিল—মার অসুখ করচে। মা আজ বেড়াতে যাবে না!

অভয়াশঙ্কর মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া রহিলেন, পরে শুধু ছোট-একটা জবাব দিয়া বলিলেন,—হুঁ।

ইহার পর কোন পক্ষেই আর কোন কথা অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অভয়া-শঙ্কর বলিলেন—চলো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। যাবে?

প্রবল রাজার আদেশ প্রজা যেমন বিনা-দ্বিধায় মাথায় তুলিয়া পালন করিতে ছোটে, তেমনি ভাবেই নিখিল বলিল,—যাব।

অভয়াশঙ্কর নিখিলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। খানিকদূর গিয়া নিখিল দেখিল, একটা বাগানের ফটকের সাম্‌নে ছোট হাত-গাড়ীতে ভারে ভারে ফুল বোঝাই হইতেছে। লাল, নীল, হরিদ্রা—নানা বর্ণের ফুল—যেন রাশি রাশি রামধনু ফুটিয়াছে! তাহার শিশু-চিত্ত তীব্র কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল,—এ ফুল উহারা গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে কেন? কি হইবে? কাহার ফুল? কিন্তু কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করে? মা সঙ্গে থাকিলে ছোট-বড় নানা প্রশ্নে মাকে সে কত অস্থির করিয়া তুলিত, মাও তাহার প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিত! এ ত মা আজ সঙ্গে নাই! পিতা যে-গম্ভীর মুখে পথ চলিয়াছেন—তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে ভয় করে! এখনই বকুনি খাইতে হইবে। সেদিনকার কথা এখনো তাহার মনে আছে ত! সেই যে যেদিন শিমুলতলায় আসা হয়, তার পরদিন সকালে বাবা মা দুই-জনের সঙ্গেই সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পথে গাড়ী-ঘোড়া নাই দেখিয়া সে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হ্যাঁ মা, একখানাও গাড়ী দেখতে পাচ্চি না কেন! কাল ষ্টেশন থেকে হেঁটে এলুম—কেন মা? তারপর রাস্তায় নানারকমের গাছপালা দেখিয়া, লোকজনের বিচিত্র বেশ দেখিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে-

দেখ মা, কি রকম ফল ঐ গাছটায়—ও কি ফল মা? হঠাৎ পিতা রুদ্রস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—বেড়াতে যাচ্ছ, বেড়াতে চল, তা না সাত সতেরো কথা! ও-সব জ্যাঠামি করলে কোনদিন বেড়াতে আস্‌তে পাবে না।—সে ভর্ৎসনা আজো সে ভোলে নাই। কাজেই কোন প্রশ্ন না তুলিয়া দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত নির্ব্বাক হইয়াই সে পিতার পিছনে-পিছনে পথ মাড়াইয়া বহুদূর অবধি বেড়াইয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া মার ঘরে গিয়া দেখে, মা সেখানে নাই। সুষমা রান্নাঘরে। সে রান্নাঘরে গিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—তুমি রান্নাঘরে কেন মা? তোমার অসুখ সেরে গেছে?

তাহার মুখে চুমু দিয়া সুষমা বলিল,—হ্যাঁ, বাবা, সেরে গেছে।

নিখিল আবার ডাকিল,—মা!

—কেন মাণিক?

নিখিল কোন জবাব দিল না। আজিকার সকালটা তাহার যে নিরানন্দময়তার মধ্যে কাটিয়াছে, তাহার বেদনায় মনটা তাহার তখনো টাটাইয়া ছিল।

সুষমা বলিল,—এইবার ও-পোষাক ছেড়ে ফেলে একটু বসে জিরোও। জিরুনো হলে আমি নাইয়ে দেব, কেমন? বাস্, তারপর ভাত খাবে।

নিখিল কোন কথা কহিল না; ম্লান চোখের ম্লান দৃষ্টি লইয়া সুষমার পানেই সে চাহিয়া রহিল। সুষমা তখন রান্নাঘরে দ্বারের কাছে বসিয়া নিখিলকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিল—কেমন বেড়ানো হল নিখিল? কোন্ দিকে গেছলি রে আজ?

নিখিল মার কাপড়ের আঁচলটা লইয়া আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমি মা, বাবার সঙ্গে আর বেড়াতে যাব না। একটা কথা কবার জো নেই! কেবলি ভয় করে!

—ছি বাবা, ও কথা বলতে আছে কি! বলিয়া সুষমা তাহার মুখে আবার চুমু দিলেন।

বাহির হইতে অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—নিখিল, এদিকে এসো···নাইবে এসো।

এ কথার উপর কথা কহিতে মা বা ছেলে, কাহারো সাধ্য ছিল না। নিখিল উঠিয়া স্নান করিতে গেল, আর সুষমা রান্নাঘরের দ্বারে হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল! হায়রে, এই যে ক'দিন আকাশটা ফরসা দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, বর্ষার মেঘ তবে এবারের মত কাটিয়া গেল! কিন্তু এ কি, আবার ঐ সগর্জ্জনে মহা-আড়ম্বরে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে যে! গগনে-পবনে এ কি আবার তার ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য দেখা দিল! এ মেঘ কি কখনো কাটিবে না? এ আঁধার ঘুচিয়া শরতের স্নিগ্ধ আলো কি কোনদিনই ফুটিবে না রে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রাঢ়ের দুর্গোৎসব

(চিত্র)

আর পূজার বেশী দেরী নাই। আজ তৃতীয়া। শম্ভু দত্ত কুটুম্ব আনিতে দিক্‌দিগন্তরে লোক পাঠাইতেছেন। কোথাও পাল্কী বেহারা যাইল, কোথাও ডুলি-বেহারা গেল, কোথাও গো-গাড়ী গেল, আবার কোথাও বা তেনা বাগ্দীর মা পত্র লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া হাজির হইল।

শম্ভু দত্তর তিন ভগ্নী সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছে। তাহারা না আসিলে কাজ-কর্ম্ম করিবে কে? জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবতারিণী, মধ্যমা জগত্তারিণী ও কনিষ্ঠা দিনতারিণী। তিন ভগ্নীতে পিত্রালয়ে আসিয়া কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়াছেন। অন্যান্য কুটুম্বদিগকে আনিতে পাল্কী-বেহারা গেল। বেহারাদের আজ আর বিরাম নাই, পাল্কী করিয়া লোক আনিতেছে, আবার অন্য গ্রামে ছুটিতেছে। এই সব বেহারাকে তেল, জল-খাবার সবই গৃহস্থকে দিতে হয়, কাজেই পূজা উপলক্ষে মুড়ি-মুড়কি খরচের জন্য বাড়ীর ভিতর চালায় মুড়ি-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। বারোটা উনানে মুড়ি ভাজা হইতেছে, ছয় জন স্ত্রীলোক মুড়ির চাল নাড়িতেছেন আর ছয় জন স্ত্রীলোক ছাঁকিতেছেন। উনানের বামদিকে দুগ্ধফেননিভ হৃদয়-শীতলকারী দন্তের জড়তা-হারী মুড়ির রাশি পড়িয়া রহিয়াছে। অপর দিকে বড় বড় কটাহে গুড় পাক হইতেছে, খর্জ্জুর পত্রের চাটার উপর চার জনে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, পাক ঠিক হইয়াছে কিনা। একজন বলিল, পাক ঠিক হইয়াছে। তখন গুড় শীতল করিয়া খইয়ের উপর ঢালা হইল, অম্‌নি তিন জনে তাড়ুর দ্বারা মাখিতে লাগিল, খইগুলি গুড় পাইয়া এলাইয়া পড়িতে লাগিল। যেখানে মুড়কি পাক হইতেছে, সেখানে বড় গোলযোগ নাই, কারণ ভিয়ান করিতেছেন কেবল পুরুষেরাই। পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের আড্ডা অপেক্ষা পুরুষের আড্ডায় দলাদলির ব্যাপার ছাড়া গোলযোগ কম হয়, কেবল গোটা চারি-পাঁচ হুঁকা যুটিয়া বড় গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছে! বহির্ব্বাটীতে নারিকেল সন্দেশ ভিয়ান হইতেছে, জন দশ-বারো পুরুষ-মানুষ নারিকেল কুরিতেছে। ইহাদের মধ্যে দত্তদিগের ভাগিনেয়, জামাতা ও শ্যালকপুত্র ইত্যাদি কুটুম্ব আছেন। জন-কতক ছোটলোক নারিকেল ছুলিতেছে, কতকগুলা লোক নারিকেল নিংড়াইয়া একটা পিত্তলের গাম্‌লায় নারিকেলের দুধ জমা করিতেছে, তথায় কতকগুলা বালক-বালিকা নারিকেলের মালা হাতে করিয়া নারিকেলের দুধ খাইবার জন্য গোলযোগ করিতেছে, আর মাঝে মাঝে এক-একটা তাড়া খাইয়া পিছাইয়া যাইতেছে, আবার সকলে দল বাঁধিয়া দুধের গামলা ঘিরিয়া চীৎকার করিতেছে।

মহেন্দ্র কহিল "নারিকেল কতগুলো কোথা

রাম কহিল, "হয়েছে অনেক। তুই গুড় নিয়ে আয়।"

মহেন্দ্র বাড়ীর মধ্যে গুড় আনিতে গেল।

সত্য কহিল, "কি রকম হিসাবে গুড় দেবে কত্তা-দাদা?"

বড় দাদা তারাপ্রসন্ন রায় ভিন্নান কলেজের প্রফেসার। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বিজ্ঞতার সহিত এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, "নারিকেল-পিছু তিন পা গুড় দিলেই ঠিক হবে।"

"সে কি ঠাকুরদা, গুড়ের নাড়ু হবে যে!"

"আরে ভাই, তা হোক, তা নইলে কি ভাল হয়?"

সত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "মুড়কিগুলো সাদাটে হলো কেন?"

"ওর নিয়মই তাই, মুড়্‌কিতে যত গুড় কম্‌ হবে আর নারিকেলে যত গুড় বেশী হ'বে, তত জিনিষ ভাল হবে।"

সত্য একটু হাসিয়া কহিল, "ও নিয়মটা তাহ'লে এই দেশেরই, অন্য দেশে ঠিক এর উল্টো নিয়মই শোনা যায়," বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহা হুলুস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। বড় গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "হেই মা, কি সব্বনাশ মা! মালাগুল সব নষ্ট হ'য়ে গেল? হ্যাঁরে মহেন্‌, তোরা সব কি কচ্ছিলি? তোদের কি হুঁস্‌ পবন নেই! ও মা কি হবে মা, যত পোড়া-কপালিরে সব হা করে থাকে!"

মহেন্দ্র বলিল, "আর বাবু দুটো মালার জন্যে কি ঝগড়া কত্তে যাব? তুমি গুড় বার করে দাও।"

সত্য বলিল, "দাদা, তুমি গুড় নিয়ে যাও, ওদিকে ঠাকুর-দাদা বকচেন।"

"আরে ভাই, বক্‌লে কি হবে, গুড় যে দিচ্চে না, দুটো ছ্যাঁদা ফুটা মালার জন্যে বড় মামি বকাবকি কচ্চেন।"

সত্য বলিল, "মালা নিগ্‌গে, কিন্তু দুধ নিয়ে ছড়াছড়ি করে ছেলেগুলো সব নষ্ট কচ্চে।"

গৃহিণী সক্রোধে কহিল, "হেইমা, কি হবে মা! তোরা থাক্‌তে সব দুধ্‌টা গেল গা! হায় হায়, আমি যাব নাকি? মিন্সে কোথা, কিছু বলছে না?"

সত্য। বটে! তুমি না হয় ক্ষেপেছ, মামা ত আর ক্ষেপেন নি। কোথায় কে একটা ছ্যাঁদা মালা নিলে কি একটু দুধ নিলে, তাই নিয়ে সব কাজ ফেলে রেখে ঝগড়া কত্তে যাবেন? সামান্য মালার ওপরে যদি এত মায়া, তবে দুর্গোৎসব কত্তে এসেছ কেন!"

গৃহিণী একটু থামিলে ভবতারিণী আসিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে গুড় বাহির করিয়া দিলেন।

যেখানে মুড়ি ভাজা হইতেছে, পাঠিকা, চল, সেইখানে যাই। ঐ দেখ, বারোজন রমণীর খোলায় যেমন হাত চলিতেছে, তেমনি মুখও চলিতেছে! মুড়ির চড় চড় শব্দ ও অনর্গল বকুনির শব্দ মিশিয়া বেশ এক অপরূপ শব্দ চালার ভিতর হইতে উত্থিত হইতেছে।

প্রসন্ন বলিতেছে, "আমার কথা লোকে ক'বে ক্যানে? আমি কি নবাবি কর্চি? আমি কষ্ট ক'ত্তে পাল্লাম না, লোকের বাবার কি?"

রাণী বলিল, "তা কর্ত্তে হয়!" দেওরের ঘরে থাকলে অনেক কষ্ট করে থাকতে হয়, নইলে ভাত হয় কি মাণিক্?"

প্র। আমি ত দেওরের ভাত খাই নাইক, ক্যানে, আমার কি বিষয় নাই?

রা। বিষয় থাকলেই বা, বিষয় থাকলেই কি আর ডোকলামো করে খেতে হয়?

প্র। ক্যানে খাবনা, ক্যানে? কার নেগে রেখে যাব, আমার কটা বেটি কাঁদবে? এবার হতে রেতে আলো জেলে গুড় দিয়ে মুরি খাব। খাবনা, অম্‌নি খাব না? ক্যানে খাবনা, ক্যানে?

যে কয়জন রমণী মুড়ি ভাজিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সকলেই বিধবা। পল্লীগ্রামে বিধবার সংখ্যা অধিক দেখিয়াছি। যেখানে যত স্ত্রীলোক সমবেত হয় তন্মধ্যে শতকরা আশী জন বিধবা। এই বিধবারা সকলেই নিষ্ঠাবতী, একাহারী, রাত্রে মুড়ি ভিন্ন তাঁহাদের জলযোগের আর কিছুই বড়-একটা জোটেনা। যে বড় ভাল খায় সে মুড়ির উপর গুড় খায় ও দুধ খায়। আর বড় লোকের কন্যা ব্যতীত প্রায় সকলেই অন্ধকারে জলযোগ করে, ইহাতে তাহারা অসুখী নহে। সেই জন্য প্রসন্ন নবাবির মাত্রা বাড়াইয়া বলিয়াছে, 'রাত্রে গুড় দিয়ে আলো জেলে মুরি খাব।' এই বিধবা শূদ্র-কন্যারা প্রায়ই কর্ম্মিষ্ঠা, সচ্চরিত্রা, কলহ-প্রিয়া, তেজস্বিনী ও কৃপণা হয়। যে সামান্য কথা লইয়া রাণী ও প্রসন্নতে কলহ করিতেছিল ও গালাগালি দিতেছিল, অত সামান্য কথায় শিক্ষিতদের মধ্যে ওরূপ কলহ হয় না। একজন রাগিলেও আবার একজন চুপ করিয়া যায়। কিন্তু রাণী ও প্রসন্নর মধ্যে কেহই চুপ করিল না, অপর যাহারা সেখানে ছিল তাহারা রগড় বাধাইবার জন্য একবার এ-পক্ষে, একবার বা ও-পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিল, ফলে তাহাদের বিবাদ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে এইরূপ রগড় বাধানোর প্রথাটা খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসন্ন কহিল, "তোর ঘরকে ত খেতে যাই নাই।"

রাণী। তোর ঘরকেও আমি যাই নাই।

প্র। তোর মাতায় ঝেঁটা মারি।

রা। তুওর মাতায় ঝেঁটা মারি; ক্ষেমারে গেলে তুওর ঠেং ভাঙ্গব।

প্র। আমি রা কাড়ি নাই, তুই আমাকে রাকাড়বি ক্যানেলা?

রা। আমি আত সামাই করে থাকি, তবু আমাকেই সব নাতা নেঙ্গোড়া কর্ব্বে, নেগোড়-খাকিরা (নেগোড় পিতৃবংশ)।

গোলযোগ শুনিয়া ভবতারিণী তথায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বলি কানে কানে, গোণ্ডোল কানে? হাঁই-গা তো-দিকের বেগোত্তা করি, আকটুকুন থাম্, আখুনি যত মরদেরা দোরে আসবে, কত মুক্ করবে, হাঁই-মা, থাম্।" ভবতারিণীর ব্যাকুলতায় অগত্যা উভয় ধৈর্য্যবতীকে নীরব হইতে হইল। তাহাদের চ্যাচানির চোটে সেখানে অনেক স্ত্রীলোক জমা হইয়াছিল। এখন তাহারা সকলেই স্ব-স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল।

ভবতারিণী একচোখে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর খোলা বন্ধ দিলে হতোনা,—বেলা হয়েচে।"

আর একজন রমণী একটা কেনেস্তারায় মুড়ি তুলিতে তুলিতে বলিল, "আর খোলা

চড়াতেও হ'বে না, ইতিই ঢের হ'বে, ২৫ সলি চেলে মুড়ি হ'য়েচে, আর কানে ?" (২৬ সলি ১২॥০ মণ)

বেল যখন ৩টা, সেই সময় মুড়ি-ভাজুনীরা মুড়ির আসবাব উঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

ভব বলিল, "গৌরী যে চাল-খোলাটা নাড়চে, ঐটে ভেজে আজ বন্ধ দাও।" এমন সময় গৌরী চাল নাড়িতে নাড়িতে "ওগো মাগো, কোথা এলেম গো" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, সকলে চমকিয়া বলিল, "কি হ'ল কি হ'ল ?" গৌরী সভয়ে বলিল, "আমাকে নিশিতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল !" সকলে হাসিয়া বলিল, "তুই যাচ্ছিলি কেন ? আর দুপুরবেলা নিশি কোথায় পেলি ? তুই কি ঘুমচ্ছিলি ?"

গৌরী। না বুন্, ঘুমাই নাই, চাল নাড়্তে নাড়্তে গ্যাটা ঢুল্‌ছিল, আর কে যেন আমাকে ডাক্‌লে, গৌরী বৈঁচি খাবি আয়।

মোহিনী হাসিয়া বলিল, "আ মর্, আশ্বিন মাসে বৈঁচি কোতা ?"

গৌরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি জানি বুন !"

যাই হোক, সে দিনকার মত বালিভাজা বোঁদের ভিয়ান বন্ধ রাখিয়া সকলে এক-একটা নারিকেলের মালাতে একটু একটু তেল লইয়া কালি-মাখা হাতে স্নান করিতে গেল।

এদিকে দত্তবাড়ীর বড় গিন্নি উহাদিগকে পৃথক পৃথক মালায় তেল লইতে দেখিয়া রাগে গরগর করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "যত মানুষ তত মালা, যত মানুষ তত মালা ! ঠাকুরঝির যেমন কাজ নাই, একটা মালায় কি আর-সবাইকে তেল দিলে হ'ত না", ইত্যাদি।

আজ পঞ্চমী। শম্ভু দত্তর বাড়ী অনেক কুটম্ব আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ভবতারিণী, জগত্তারিণী ও দিনতারিণী এই তিন ভগ্নী আসিয়াছেন এবং তাঁহারা গৃহিণীপনা করিতেছেন। জগত্তারিণী শঙ্করকে বকিতেছেন।

শঙ্কর। আমি কি কর্ব্বো, পরশু দিনে গাড়ী পাঠিয়েচি, আজও তাদের দেখা নাই।

জগত্তারিণী। তুই কোতা কোতা গাড়ী পাঠিয়েচিস্ ?

শ। বড় গিন্নীর বাপের বাড়ী, মেজগিন্নীর বাপের বাড়ী আর আমার শ্বশুর-বাড়ী, আর তোমাদের তিন বোনের বেঁহাই-বাড়ী,—আর কোথা পাঠাব ? আর সব জায়গার কুটুম্ব এসেছে।

দিনতারিণী বলিল, "দাদা, সব জায়গার কুটম্বতে ত কাজ হইবে না, তোমাদের শালিরে না এলে হেসেল চল্‌বে কি ?"

জগত্তারিণী বলিল, "ঐ গাড়ীর শব্দ হ'ল, কে আস্‌চে, দেখি !" সব বালক-বালিকা সদর দিকে ছুটিল, দিনতারিণী ও জগত্তারিণী পাছু পাছু যাইয়া সদর দিকে দাঁড়াইল।

দুইখানা চাটা-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়োয়ান "হা-হা" শব্দ করিয়া গাড়ী থামাইল ও নিজে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গরুর কাঁধ হইতে গাড়ীর যোয়াল খুলিয়া দিয়া মোড়টা মাটিতে নামাইয়া ফেলিল। অমনি গাড়ীর ভিতর হইতে "মা গো, বাবা গো, মাথা ঠুকে গেল, ঘাড়ে পুঁটুলি পড়ে গেল, দিদি তুই আমার উপর পড়্‌লি কেন ? দাদা সরে যা না" ইত্যাদি একটা মহা-কোলাহল উঠিল, পরে কিল বিল করিয়া ছেলে-মেয়ে সেই চাটাই-ঘেরার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে

লাগিল। তাহাদের রূপ-বর্ণনা আর কত করিব, সংক্ষেপে একটু পরিচয় দি। ছেলে-মেয়ে, সকলকারি কোরা কাপড় পরা। ছেলেগুলার গায়ে কোট ও কামিজ আছে, তাহার বোতাম নাই। কাহারও জামা পুঁটুলিরূপে কক্ষ মধ্যে, কাহারও জুতা হাতে, চাদর স্থূল উদরের উপর বেষ্টিত। বালিকাদের তেল-ধরা ফিতা ও চুলের দড়ি জড়ানো খোঁপা, তাহাতে রূপার পান, মাছ, গুঁজিকাঠি, লোহা ও তাম্রের কাঁটা কাহারও বা বড় বড় বাতাবি লেবুর ও সজারুর কাঁটায় মস্তক সজ্জিত হইয়া আছে। কানে ময়লা-ধরা কপিপাতা, মরা সোনার মাকড়ী, নাকে মাকড়ি আছে, নোলক নাই। কাহারও বা নোলক অধর পর্য্যন্ত লম্বিত, জ্যোতিহীন। বিবাহিতা বালিকাদের কণ্ঠে পাঁচনলি, অবিবাহিতা বালিকাদের পদক, মাদুলী, কাঁকালে রৌপ্যনির্ম্মিত বোরপাটী, পায়ে সকলকারই মল।

পরে কয়েকজন গৃহিণী নামিলেন। সধবাদের মধ্যে শাঁখা-হাতে দুই-চারিখানি অলঙ্কার যাহা আছে তাহা খুব পূর্ব্বকালের। চারিজন বিধবা নামিলেন, তাঁহাদের দেখিবামাত্র জগত্তারিণী ও দিনতারিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কুটুম্ব হয়ে এলেন্ ভোজ খেতে, তোয়ের করে কে? তিনদিন গাড়ী গেছে, আজ এলেন পূজা দেখ্‌তে—"

কুটুম্বিনীরা নানা মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন; ক্রমে সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সহর-অঞ্চলে কর্ম্ম-বাটীতে অগ্রে শ্যালক-শ্যালিকা তৎ পুত্র-কন্যা আসার পর কর্ম্মের নিমন্ত্রণ-পত্র যাইবার পথ রোধ করিয়া ভগ্নীর কাছে যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহা নহে। অগ্রে ভগ্নী-ভাগিনেয় আসার পর অন্য কুটুম্বরা আসেন।

এদিকে কুটুম্বেরা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলে পর একটা মহা হাউ-চাউ পড়িয়া গেল। বাড়ীর ছেলেরা ও পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়েরা কুটুম্বদের ঘেরিয়া গোলযোগ করিতে লাগিল। বড়-গিন্নী সকলকেই জলখাবার দিতে গেলেন, প্রত্যেকের অঞ্চলে মুড়ি-মুড়কি ও নারিকেল-নাড়ু দিলেন, ছেলেরা মহা আনন্দে ঠাকুর দেখিতে গেল, কারণ ঠাকুর সাজাইতেছে।

আজ ষষ্ঠী। দেশ-দেশান্তরে তত্ত্ব লইয়া কত-লোক যাতায়াত করিতেছে। কত গ্রাম হইতে দত্ত বাড়ীতে তত্ত্ব আসিল, বাতাসা, কদ্‌মা, ওলা। কত ইতর পুরুষ ও রমণী দত্ত-বাড়ীতে প্রবেশ করিল, শান্তিপুরে, ঢাকাই, বরাহ-নগরের, লালবাগানের কাপড় আসিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও মন উঠিল না। সকলেই বলিল "সুতার কাপড় দেওয়া কেন? উওকি আজকাল রেওজ আছে! এখন বোম্বাই, পার্শী, মান্দ্রাজি কাপড় উঠেছে।"

ভবতারিণী বলিল, "তখনকার কেরাপের কাপড় আর বেলোয়ারি চুড়ি, তার কাছে কেউ নয়!"

আর এক বৃদ্ধা বলিল "নীলাম্বরী কাপড়ের কাছে কোন কাপড় নয়!"

মধ্যম গৃহিণী রন্ধন-শালা হইতে কালী-হরিদ্রা-মাখা বস্ত্র পরিধান করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "না বাবু, কাপড় বেশ দিয়েছে,

দিয়ে মাথা-ঘষা দিত আর রেশমি চুড়ি না দিয়ে যদি শাঁখা দিত, তাহলে সোন্দর দেওয়া হ'ত।" যেমন বলা অম্‌নি যুবতী-মহলে হাস্য-ধ্বনি ও করতালি উঠিল। ইহা সাধারণের পক্ষে বিশেষ কিছু না হইলেও বৃদ্ধার পক্ষে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তাঁহার পক্ষসমর্থন করা দূরে থাক্ তাঁহার বহু কনিষ্ঠা কন্যাতুল্যারা ঠাট্টা করিতেছে দেখিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া রন্ধন-শালায় পলাইলেন।

এদিকে সদর-বাটীতে পূজার আয়োজন হইতেছে আজি ষষ্ঠ্যাদি। কল্প, আজ ছেলেরা জামাতারা সকলেই উপস্থিত। পূজা-মণ্ডপে দুইজন ভট্টাচার্য্য গুরু-গম্ভীর ভাবে গুড়ুক টানিতে টানিতে উদ্যোগীদিগকে ফরমাস্ করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে একটি একটি সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়িয়া কিসের স্থলে কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহার প্রমাণ দিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন।

পূজক বলিলেন, "দেখ মহেন, কা-কা-কা কাপড়—আন।"

মহেন্দ্র বলিল, "কাপড় নয় দাদাঠাকুর, গামছা, একখানা গামছার দর কত জান?"

পূজক। গা-গা-গা গামছা দিয়ে পূজো! আমরা কি বেগার দিতে এসেচি?

মহেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, তন্ত্রধারক বাধা দিয়া বলিল, "বাস্ত বরণের কাপড় চাই না? বরণের কাপড়!"

মহেন্দ্র বলিল, "বরণ কিসের ঠাকুর? তুমি ভারি পণ্ডিত আর আমরা মুরুক্ষু নাকি? আমি তিন বছর মামার বাড়াতে পূজার যোগাড় কচ্চি, আমি জানি না? আমাদের আজ বরণ

তন্ত্র-ধারক বলিলেন, "বরণ আজই হয়, তুমি জাননা।"

মহেন্দ্র চটিয়া গিয়া বলিল, "আমি আবার জানিনা কি? নারিকেল সন্দেশ মুড়কি ভিয়ান ক'রে ক'রে হাতে কড়া পড়ে গেল, আর তুমি—"

এমন সময় রামপদ আসিয়া পড়িয়া বলিল, "কিরে মহেন, গোল কচ্চিস্ কেন?"

"ঠাকুর-মশাই বলচে আজ 'বরণের কাপড় আন।' আজ বরণ কিসের?"

রাম বিনীতভাবে বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান্, বাবাকে ডাকি", বলিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণে শম্ভু ও শঙ্কর রামের সহিত পূজার দালানে আসিল।

তন্ত্রধারক বলিলেন, "দত্ত-মশাই, আজ কি তোমাদের বরণ হয় না?"

শম্ভু। ওটা কি জানেন ভট্‌চায্-মশাই, প্রথম যেবার পূজা হয় সেবার বরণের কাপড় কিন্‌তে ভুল হয়, সেইজন্যে পুরোহিত-মশাই আমাদের নিকট পান-সুপারি-পইতে ইত্যাদি নিয়ে ব্রতী হয়েছিলেন,পরে অষ্টমীর দিন কাপড় দেওয়া হয়েছিল, সেই অবধি প্রতি বৎসর অষ্টমীর দিন কাপড় দেওয়া হয়।

তন্ত্র। সেই বৎসরই না-হয় কাপড় উপস্থিত ছিল না, তার পর বৎসর থেকে কেন ষষ্ঠীর দিন কাপড় দিয়ে বরণের ব্যবস্থা করেন নি?

শ। সেটায় আমার দিদির বেশ মন ওঠে না। দিদি বলে যেটা প্রথম বৎসর হয় সেইটা প্রতি বৎসর কর্ত্তে হয়, দিদির মনটা বড় খুঁৎখুঁতে।

অভাব ছিল ব'লে যে প্রতি বৎসর সেই অভাবই রাখতে হবে, সেটা ঠিক নয়।"

শ। তা দেখুন, প্রথম বৎসর পূজার মাছ ধর্‌বার সময় পুষ্করিণী থেকে পোনা মাছের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মাগুর মাছ পড়েছিল সেই অবধি প্রতিবার পুকুরে মাগুর মাছ না উঠলেও যে-কোন উপায়ে যোগাড় কর্ত্তে হয়, দিদি বলে হঁদ (হঁদ পূর্ব্ব প্রথা) নড়াতে নেই।

তন্ত্র। দেখ, তোমার কথা শুনে আমাদের পাড়ার একটা ঘটনা মনে পড়ল, আমাদের পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছেন, তাঁদের বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম হ'লে তারা একটা বিড়ালের মাথায় ঘী মাখিয়ে ছেড়ে দেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, পূর্ব্বকালে তাদের একটা বিড়াল পোষা ছিল, কোন কাজ-কর্ম্ম হ'লে বিড়ালটা ভারি জ্বালাতন করত, সকল দ্রব্যে মুখ দিত। সেইজন্য বাড়ার কর্ত্তা একবার বিড়ালটাকে ধরে তার মাথায় ঘৃত মাখিয়ে বাটী হ'তে তাড়িয়ে দেন। বিড়ালটা সমস্ত দিন বাড়ীর বাইরে বসে মাথায় হাত বুলায়, আর হাত চাট্‌তে থাকে, যতক্ষণ ঘৃতের গন্ধ পায়, ততক্ষণ ঐরকম হাত চাট্‌তে থাকে। অনেক দিন হ'ল সে বিড়ালটা মরে গেছে, কিন্তু তারা পূর্ব্ব-প্রথা বজায় রাখ্‌বার জন্যে অন্য একটা বিড়াল এনে তাহার মাথাতেই পূর্ব্ব-প্রথা বজায় রাখে।

দত্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি করি বলুন, দিদির অমত, তা আজ পান, সুপারি-পৈতা দিয়ে বরণ হোক, সেইদিন কাপড়,

অগত্যা তাহাই হইল। শম্ভুদত্ত বরণ-কার্য্য শেষ করিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ্‌ মহেন, পূজার সমস্ত আয়োজনের ভার তোর উপর রইল, যেন পুরোহিত-মহাশয়দের কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হয়, আবশ্যক হ'লে আমাকে ডাকবি। আমি ওদিক দেখিগে।"

শম্ভু চলিয়া গেল, ঠাকুর-দালানে সত্য-কিঙ্কর ও মহেন পূজার উদ্যোগী রহিল। তন্ত্র-ধারক বলিলেন, "মহেন, ষষ্ঠী আর বেশীক্ষণ নাই, দশটার পর সপ্তমী পড়্‌বে, যোগাড় ক'রে দাও, ষষ্ঠ্যাদি কল্প হয়ে যাক্‌।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সেকি ঠাকুর-মশাই, এইত মোটে জল-খাবারের বেলা, এখনি কল্প কি-রকম!"

তন্ত্র। আর মহেন, তুমি কি পণ্ডিতই হ'য়েচ! পাঁজিতে লিখ্‌চে যে, ৯৷৷০ ঘটিকার সময় সপ্তমী পড়্‌বে, আর তোমার মতে দুপুর-বেলা, সকল বিষয়েই অত বাহাদুরি কর কেন?"

ম। অত পাঁজি-পুঁথি বুঝিনে মশাই, যেবার পূজা আসে সেবার কৃষেণ রাখাল বেল নিয়ে গেল, আর কল্প আরম্ভ হ'ল।

পূজক এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, সক্রোধে বলিলেন, "তো-তো-তো-তোমার এত বা-বা-বাক্‌চাতুরী কেন হে! যা-যা-যা বল্‌চি তাই শো—শোন!"

পূজকের তো-তো চেঁচামেচি শুনিয়া সেখানে কালীপদ ও শঙ্কর আসিল ও ব্যাপার বুঝিয়া মহেন্দ্রকে বলিল, "মহেন, তুই এখানে থাকলে ত চল্‌বে না! জেলে আসে নি! পুকুরটায় দু'খেপ জাল ফ্যাল্‌না।"

শব্দ পাইয়া কালীপদ ও আরও দুই-একজন ব্যক্তি তথায় গিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাপদ, হরিপদ, বামাপদ ও দুর্গাপদ এই কয় ভাই বর্দ্ধমানে থাকে। শ্যামাপদ ও দুর্গাপদ ইহারা চাকরি করে, বামাপদ ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, হরিপদ স্কুলে পড়ে। ইহারা আজ পূজায় উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিল, এক গাড়ীতে আপনারা আসিল ও অন্য গাড়ীতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিল। নূতন আলু, ফুলকপি, গাঁটুরি-গাঁটুরি কাপড়, ছোট জুতা, জামা, সীতা-ভোগ মিহিদানা খাজা, সবেদা বেসম ময়দা সুজি চিনি ঘৃত নানা দ্রব্য আনিয়াছে। নৈবেদ্যে দিবার জন্য বাদাম পেস্তা আঙুর আখরোট্ কিসমিস্ ইত্যাদিও আনিয়াছে। ভ্রাতারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে একটা গোলযোগ পড়িয়া গেল। কৃষাণেরা মোট বহিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। সকল রমণীই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা আজ এলে কানে? এত দেরী হ'ল কিসের লেগে? রাম আর কালি দুটি ভেয়ে সারা হ'য়ে গেল।"

শ্যাম। কেন মহেন-দাদা, সত্য, সুরেন, তিনকড়ি যেতে তারা আসে নি?

ভব। এয়েচে বইকি, তারা এই দুদিন এয়েচে।

দুর্গা। আসবো কি পিশিমা, আম আঙুর আর তরমুজ আনবো ব'লে মেজদাদা এত দেরি ক'রে এলেন! আগে থাক্‌তে এলে সেগুলো সব নষ্ট হ'বে সেইজন্যে আজ ষষ্ঠীর দিন এলাম।

ভব। হ্যাঁরে দুগ্‌গা! আঙুল কেমন, সে কি-রকম দেখাস্ দেখি?

হরি। আঙ্গুল নয় পিশিমা আঙুর—সে তুমি দেখ নি, দেখাব এখন।

ভবতারিণী বলিল, "ও জগৎ, ছেলে-দিকেন জল খেতে দে।"

বাড়ীর বউ-ঝী সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি মোট পুঁটুলি খুলিতে বসিল। বড়গিন্নি ও ছোটগিন্নি দুইজনে সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল।

যত কুটুম্ব আসিয়াছে তাহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মস্ত এক কাজ পাইয়াছে; গাড়ু-বাল্‌তি লইয়া ছাদের উপর ক্রমাগত জল তুলিতেছে আর ঢালিতেছে, নল দিয়া জল পড়িতেছে, সকলে অবাক হইয়া দেখিতেছে। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে যখন যাহার চোখে পড়িতেছে, সে এক-একবার তাড়া দিতেছে। বাড়ীময় মুড়ি-মুড়কি ছড়াছড়ি, বধূরা অনবরত ঝাঁটা দিয়া তাহা পরিষ্কার করিতেছে। বড় গিন্নি নিজ পুত্রদের ও দেবর-পুত্রদের বলিল, "হ্যাঁরে, অত ঘি-ময়দা বেসম-চিনি কানে? যত সব বাজে খরচ!"

শ্যা। মা, অন্য বৎসরে নারকেল-নাড়ুতে সব সারা হয়, আমরা সহরে থাকি আমাদের ইচ্ছা যে এবার ভালরকম ক'রে সকলকে খাওয়াব। অন্য বৎসর কেবল আমাদের জাত ও ছোটলোক খাওয়ান হয়, এবার আমাদের ইচ্ছা যে, ব্রাহ্মণদের মেয়ে ও পুরুষদিগকে লুচি ক'রে খাওয়াবো সেইজন্য ওই সব কিনে এনেচি।

গৃ। কানে, আত কানে? ও বাপ্‌রে, "পায় না সেয়ান খুড়ি সুচি-মোণ্ডা গড়াগড়ি!" আমি এবার মনে করেচি চিঁড়ে-দই ক'রে বামুন-দিকেন খাওয়াব—তাতে ও-সব কানে?

দুর্গা। কেন জ্যেঠা-মশাইকে বাবাকে বড়দাদাকে আমরা ত পত্র দিয়ে জেনেছি, তাঁরা ত কেউ অমত করেন-নি!

গৃ। তাদের কি বল, তারা ত টাকাগুলো সব বাজে ছড়াবে ওড়াবে।

শ্যাম। (বাধা দিয়া বলিল) তা বটে, বাবা ওড়াচ্চেন, আর যত রোজগার কচ্চেন মা। ঘরে বসে বসে যত উপায় মায়ের!

গৃহিণী সক্রোধে বলিলেন, "তা বল্‌বো না? অত থাজা গজা আন্‌লি কানে, উয়োগুলো বাজে-খরচ নয়?"

শ্যা। বাজে-খরচ কিসে মা? ওই সব জামাই এসেচে, এদিকে জল খেতে দিচ্চ কি? দেশে একে কিছু মেলেনা, ঐ-সব জিনিষ জামাইদের জল খেতে দিও।

গৃ। কানে, মুড়ি-মুড়্‌কি ভিজিয়ে দি, আবার কি খেতে হয়! ভারি ত বড়লোকের বেটা সব!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন

(৬)

কথাটা হচ্ছিল আধ্যাত্মিক শক্তির বলবত্তার বিষয়ে। গতবারে তিনটী প্রমাণের উল্লেখ করেছিলেম। (১) আধ্যাত্মিক শক্তির আবির্ভাব ও ক্রমশঃ অভিব্যক্তি। (২) মনুষ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব। (৩) বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রচার ও প্রভাব। প্রমাণগুলির একটু আলোচনা করা দরকার।

(১) আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ—কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্ শুভক্ষণে মানুষের জীবচেতনার কালো কঠিন নিকষের উপর স্বর্গীয় প্রেমের সোনার রেখা প্রথম ফুটে উঠেছিল তা জানিনে। বোধ হয়—জানার উপায়ও নেই। তবে লক্ষ যুগের শিক্ষা, সাধনা ও সংযমের পরও মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির যেমন প্রবলতা আজও দেখা যায়, তাতে এ-কথা নিশ্চয় যে, সে সময়ে মানুষ বন্য জন্তুর চেয়ে বিশেষ শ্রেষ্ঠ ছিল না। এই আদিম মানুষের চরিত্রটাকে ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য বলে বর্ণনা করলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে কোথা হতে এসে পড়ল—সরল সুন্দর শুভ্র এক স্বর্গীয় দেব-শিশু—এত সুকুমার, এত অসহায় যে দেখলে মনটা করুণায় আপনা হতেই ভরে উঠতে পারত। মনে হতো, আহা, এই সুকুমার দেহে বাঘ-ভালুকের খর নখদন্তের কথা দূরে থাক্, তাদের নিশ্বাসটুকুও যে সইবেনা। ঠিক যেন মেনকা-পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শকুন্তলা! কে কল্পনা করতে পারতো, এই অতি সুকোমল দুধের ফেনার মতো মেয়েটী সব-রকম বাধা-বিপদ কাটিয়ে একদিন ভারতবর্ষের সম্রাটের জননী হবে। ব্যাপারটা আরো সুন্দররূপে ফুটে

উঠবে—যদি তপস্যা-নিরত ধ্রুবের ছবিটী মনে করা যায়। এই যে সুন্দর সুকুমার শিশু প্রতি মুহূর্ত্তের সম্ভবপর মৃত্যুর ঠিক মুখের সামনে বসে তপস্যা করছে—ওঁরি জন্য রচিত হচ্ছে এমন এক দিব্য লোক, এই সাগরাম্বরা ধরণীর একটী ধূলিকণা অবশিষ্ট না থাকলেও যা সমান মহিমাতেই বিরাজ করবে।

এই যে ছবিটী দিলাম, এটী কেবল মানুষের অন্তরের প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের ছবি। বাইরের প্রতিকূলতাটা আবার তার চেয়েও প্রবল। এই দু' রকম প্রতিকূলতার দুর্জ্জয় বাধা কাটিয়ে যে আপনাকে বিকশিত করে তুলতে পেরেছে, তার বল যে ঐ প্রতিকূলতার শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, সে কথা লেখাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে একটা অবান্তর কথা মনে উঠছে। ধর্ম্মবোধের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলেই অনেকে অত্যন্ত কাজের লোকের মতো গুরু-গম্ভীর গলায় উপেক্ষাভরে বলে ওঠেন —"রেখে দেন মশায় ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারের কথা। ও-সব বাবুগিরি তাদেরি পোষায়, যাদের বালামের ভাবনা ভাবতে হয় না।" এই সব অতি-বিজ্ঞদের নিকট আমার এই মিনতি, তাঁরা আদিম মানুষের বালামের ভাবনা ও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার অবিশ্রান্ত দুরন্ত চেষ্টার কথাটা স্মরণ করে দেখবেন। অথচ সেই অবস্থার মধ্যে দিয়েই মানুষের ধর্ম্ম-বোধ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

২। আধ্যাত্মিক শক্তির বল যে অন্য সকল শক্তির চেয়ে ঢের বেশী, মানুষের মানুষ কবে যে কেমন করে সমাজ গড়া সুরু করলে, সে একটা দুর্ভেদ্য রহস্য। সে কোন অলঙ্ঘণীয় শক্তির প্রচণ্ড আত্মবিস্মৃত অন্ধ প্রেরণা যার বশে মানুষ আপনার দুর্দ্দমনীয় আদিম প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরিয়ে দশজনের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস না করে থাকতে পারলে না, তা ঠিক করে বলা কঠিন! প্রাচীনেরা এই মিলনের তত্ত্বের মধ্যে ঐশী শক্তির প্রেরণা দেখতেন। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মাণ্ড দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গস্বরূপ যে তাঁরা দেখতেন বা সেই সব অঙ্গ হতে উদ্ভূত বলে বর্ণনা করতেন—সে কেবল তাঁদের অভ্যস্ত রূপকের ভাষায়—এই তত্ত্বটীরই প্রকাশ। সোজা ভাষায় বলতে গেলে মানুষ যে মানুষের সঙ্গে মিশেছে, সে একটা গভীর গোপন প্রাণের টানে। নইলে তার একেবারেই চলতে পারে না। চলতে পারে না মানে যে তার কারবার কারখানা কাগজ বা ওকালতিটাই চলতে পারে না, শুধু তাই নয়; তার আসল কাজটাই অচল হয়ে পড়ে। তার আসল কাজটা যে ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে ছোটার ক্ষমতা লাভ বা হাজার লোকের কাজ দশজন লোকের দ্বারা সারা নয়, সে কথা বোধ হয় বলার দরকার নেই। সে আসল কাজ হচ্ছে সকলের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করে তোলা—আপনার পরম চরিতার্থতা লাভ করা। সুতরাং কেবল স্বার্থরক্ষার জন্য নয় পরমার্থ লাভের জনাই আরো বিশেষ করে সমাজ-রচনা অপরিহার্য্য।

Nothing in the World is single
All things by a law Divine
In one another's being mingle.

এইটেই হলো সমাজ-রচনার গোড়ার কথা।

কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া তাঁরা এক পাও চলেন না, এইটেই হলো নব্যদের সব-চেয়ে গর্ব্বের বিষয়। সেইজন্য পরমার্থ জিনিষটাকে তাঁরা একরূপ নিরর্থকই মনে করেন। অন্য পক্ষে স্বার্থ পদার্থটীর মানে একেবারে সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট। সে মানে কঠিন পাষাণের মতোই গায়ে বাজে। কাজেই স্বার্থের পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে যে এই বিরাট সমাজ-সৌধটী গেঁথে তোলা হয়েছে, এইটে প্রমাণ করার জন্য তাঁরা কোমর বেঁধে লেগে পড়েন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন প্রণালীর সঙ্গে নব্য প্রণালীর তুলনা করে দেখবার লোভটা ছাড়তে পারচিনে। প্রাচীনেরা কল্পনা বা অত্যুক্তির নিতান্ত কাঁচা বনেদের উপর গড়ে তুলতেন এমন-একটা চির সত্যের বিপুল পুরী, মানুষ যেখানে চিরদিনের জন্য অনায়াসে আশ্রয় লাভ করতে পারত। কিন্তু সাবধান! ভিত্তিটাকে যেন নাড়া দিওনা, তাহলেই বিপদ। আর নব্যেরা ভিতরটাকে এমন পোক্ত করে গড়েন যে হাজার গণ্ডা কামানের গোলাতেও তার চূর্ণটুকু খসাতে পারে না। কিন্তু পুরীটি যা গড়ে তোলেন তা নিছক মরীচিকা-পুরী। চিরদিনের আশ্রয়-যোগ্য হওয়া দূরে থাক্, তাতে পান্থশালার কাজটাও ভাল করে চলতে পারে না।

স্বার্থের পর সুবিধা-বোধের উপর সমাজের পত্তন, এ মতটা বহু পণ্ডিত বহুপ্রকারে প্রচার করেছেন। এইসব থিওরিগুলির মধ্যে যাদের সরলতার গুণটা আছে, তাদের দোষ-ত্রুটি-গুলিও সহজে চোখে পড়ায় তারা একরূপ বাতিল হয়ে গেছে। Hobbes এর Social Compact বা সামাজিক চুক্তির থিওরিটা আজকাল স্কুলের ছেলেদেরও হাস্য উদ্রেক করে। কিন্তু যেগুলির বর্ণনায় রকমারি ও পারিপাট্য আছে, তারা আজও এক রকম পশার রক্ষা করে চলছে। তাদের ছদ্মবেশটা এখনো তেমন ভাল রকম ধরা পড়েনি।

স্বার্থ-বোধের উপর সমাজের পত্তন এই মতটাকে ঠিক মতো মানতে হলে আদিম মানুষের মন যে পরার্থপতা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি ভাবের অতি ক্ষীণ রেখাপাতটুকু হতেও সম্পূর্ণ মুক্ত এই কথাই মানতে হবে; এক মন হতে আর এক মনে যাওয়ার ছোট খিড়কী দুয়ারটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করার যো নাই! সেখানে আছে কেবল আপনার স্বার্থ-বোধ ও কতকটা বুদ্ধি। এই দুটী উপাদানের হরেক রকম সংমিশ্রন ও ঘাত-প্রতি-ঘাত হতে গড়ে উঠেছে বিপুল জটিল মানব সমাজ ও মানুষের সামাজিক মন। এই গড়ে ওঠার পদ্ধতিটা এই রকম—সকলেই নিজের নিজের স্বার্থের তাড়নায় দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। এইরূপ দিশাহারা ছুটাছুটির ফল যে ঘন ঘন পরস্পরের মাথা ঠোকাঠুকি, সে কথা বুঝতেই পারছেনে। এই মাথা ঠোকা-ঠুকি ব্যাপারটী মোটেই আরামের নয়, কাজেই ছুটাছুটির পাল্লাটাকে চৌহদ্দী-বদ্ধ করে নিতে হলো। এই চৌহদ্দীটা হলো অপরের স্বার্থ। সম্ভবতঃ এরূপ League of Tribes বা

League of Clans বা League of Individuals বা ঐ রকম কোন একটী অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

সে যাই হোক এই চৌহদ্দীটা একটা প্রকাণ্ড নিষেধ একটা বিরাট না রূপে তার স্বার্থের চারিদিক আগলে রইল। না হতে কখনও হাঁ জন্মে না। লক্ষ বৎসরেও না। পরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের বাধা-বিঘ্নরূপে দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে তার উপর দরদ জন্মে গেল, একটা থিওরি প্রচারের উৎসাহ না থাকলে এ কথা কিছুতেই সহজে মনে হয় না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই দরদটাই সমাজকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছ। মহাপুরুষদের তো কথাই নাই—তাঁদের পরের স্বার্থের উপর দরদটা এত বেশী যে তার খাতিরে নিজের চূড়ান্ততম স্বার্থ অর্থাৎ প্রাণটাকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে থাকেন। সাধারণ লোকের মধ্যেও পরের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা সচরাচরই দেখা গিয়ে থাকে। এত সচরাচর যে যাদের মধ্যে দেখা যায় না তারা সমাজের চোখে হেয় হয়ে পড়ে। এই শ্রদ্ধা জিনিষটা একটী ভাবাত্মক পদার্থ। সুতরাং নিষেধ যত সনাতনই হোক না কেন, এ ভাবের জন্ম সে দিতে পারে না। আসল কথা রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে যাকে 'তত্ত্ব' বলেছেন, স্বার্থ-বোধ সেরূপ একটা 'তত্ত্ব' নয়। এর মধ্যে সৃষ্টির বীজ নাই—গড়ে তোলবার শক্তি নাই। ঠিক এই কারণেই League of Nations এর মতো অত বড় ব্যাপারটীও রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে

আশঙ্কা হয় এ প্রণালীর বিচারটা অনেকের মনঃপূত হবে না। তাঁরা একে ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাসের ভাবেই দেখবেন। ধরতে ছুঁতে পারা যায় এমনতরো মোটাসোটা গোছের প্রমাণ তাঁরা চান। সুতরাং একবার কঠিন মাটীতে নামা দরকার। একথা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না যে শিক্ষায় দীক্ষায় বিদ্যা-বুদ্ধি সংযমে এখনকার মানুষ সেই আদিম যুগের মানুষের চেয়ে অনেক উন্নতি লাভ করেছে! সুতরাং বুদ্ধির বলে, স্বার্থরক্ষার প্রেরণায় স্বার্থত্যাগ করে বিবাদ মেটানো যদি সম্ভবপর হতো তাহলে ও জিনিষটা ঘর-ঘর দেখতে পাওয়া যেতো। কিন্তু ব্যক্তিগতই হোক বা জাতি-গতই হোক প্রায় কোনও বিপদেরই প্রায় এরূপ ভদ্রজনোচিত মীমাংসা হতে দেখা যায় না। ন্যায়বাগীশ সার্ব্বভৌম Ph.D.LL D, ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মনি আমেরিকা এবং সাঁওতাল ভীল নাগা কুকি, এরূপ ক্ষেত্রে সকলের আচরণই হরেদরে একরকম। বরঞ্চ বিদ্যাবাগীশ মশায়দের আচরণটাই আরো অদ্ভুত মনে হয়; কারণ তাঁরা নিশ্চিত সর্ব্বনাশের চিত্রটী আরো দেদীপ্যমান রূপেই দেখতে পান। মকর্দ্দমায় কোনও পক্ষেরই লাভ হয় না, এ কথা বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষই বেশ জানেন; অথচ আদালতের বহর ও বাহার সকল সভ্য দেশেই উত্তরোত্তর বেড়েই চলেচে। এত বড় জলজীয়ন্ত ব্যাপারটা অনুক্ষণ চোখের সামনে জেগে থাকা সত্ত্বেও এই সব প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানাভিমানীরা—স্বার্থ-বোধের দ্বারা স্বার্থের সংকোচ

বৈজ্ঞানিক সত্য বলে চালান, সে কথা বুঝে ওঠা শক্ত।

কিন্তু সমাজ যখন আছে, তখন এ কথা একেবারে নিশ্চিত যে মানুষকে প্রতিপদেই আপনার স্বার্থকে সংযত করে চলতে হচ্ছে। বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ স্বার্থরক্ষার সুবিধা-বোধের দ্বারা সে কাজ যে হতে পারে না, পূর্ব্বেই তা দেখানো হয়েছে। সুতরাং সে কি শক্তি, যার দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছে—এই প্রশ্নের মীমাংসা দরকার। যে শক্তি মানুষের অনুভূতিকে আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই পাক খাইয়ে শুধু ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করে, সে শক্তির যে এ সাধ্য থাকতে পারেনা, সে কথা লেখাই বাহুল্য মাত্র। এ সেই শক্তি, যা মানুষকে আপনার মধ্য হতে টেনে বাইরে নিয়ে আসে—তার অনুভূতিকে সকলের অনুভূতির সঙ্গে যোগ করে দেয়, অপরের সুখ-দুঃখের তালে তার মনের ছন্দ বেঁধে দেয়। এই ছন্দই সমাজের গভীর প্রাণের ছন্দ। সংসারে হিংসা-দ্বেষ দম্ভ লোভ প্রভৃতি বিরোধী শক্তির অন্ত নাই—তা সত্ত্বেও সমাজ যে ছিন্ন-ডোর মালার মত খসে পড়েনি, এ হতে অকাট্যরূপে প্রমাণ হয় যে ঐ সব বেতালা গণ্ডগোলের চেয়ে সমাজের অন্তরের মিলনের ছন্দ অনেক বেশী শক্তিশালী। যখন খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচার করা যায়—ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপর নজর পড়ে, তখন "দোষ গণইতে নাহি গুণলেশ মিলব" এবং মনটা একেবারে নিরাশায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু অখণ্ডভাবে দেখলে তখনি বুঝতে পারা যায় যে ঐ সব দোষ-ত্রুটি অসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়েই ধর্ম্ম ও প্রেম ক্রমশঃ জয়ী হয়ে উঠেছে। এ এক অদ্ভুত রহস্য!

প্রেম ও আধ্যাত্মিক শক্তির বল যে কত বেশী কোনও সমাজের অরাজক অবস্থার ইতিহাস গভীর ভাবে আলোচনা করলে তা আরো স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। অনেক পণ্ডিত লোকের বিশ্বাস যে মানুষ শায়েস্তা থাকে কেবল পুলিশের ভয়ে আর পেনাল কোডই ধর্ম্মজ্ঞানের জন্মদাতা! কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। চূড়ান্ত অরাজকতার অবস্থায় পুলিশ থাকে না—পেনাল কোড তো নয়ই। কিন্তু তবুও সমাজ থাকে। সে অবস্থাতেও চোর ডাকাত বদমায়েসরা সমাজের বাহিরেই থাকে। যদিও সে সময় তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়, তবুও সমাজভুক্ত লোকের সংখ্যার তুলনায় সে সংখ্যা একরূপ নগণ্যেরই সামিল। সমাজের অন্তরে অন্তরে ধর্ম্মের শক্তি স্বার্থ লোভ প্রভৃতি বিরোধী শক্তির উপর জয়ী হয়ে কাজ না করলে এরূপ কখনই হতে পারত না।

ধর্ম্মই যে জয়ী হয়, মানুষ এ কথাটা এত গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে ধর্ম্মভাব না থাকলেও জয়ের লোভে সে তার ভাণ করতে বাধ্য হয়। এই জন্যই সমাজে এত কপটতা আর ভণ্ডামি। ওই ভণ্ডামি জিনিষটা যতই হেয় ও নিন্দিত হোক না কেন, ওটা আসলে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মের প্রতি পূজা-নিবেদন—ধর্ম্মের শক্তি যে বেশী সেইটেই স্বীকার করা। গত মহাযুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই প্রাণপণ আগ্রহে কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে ন্যায় ও ধর্ম্ম তাঁরই পক্ষে। League of Nations খুব ভাল রকমই জানেন যে তাঁর আসল বল নির্ভর করছে লোকের শ্রদ্ধার উপর। সেই জন্যই আসল উদ্দেশ্যটাকে

গোপন করে, বার-বার তাঁকে গলা বাহির করে ঘোষণা করতে হচ্ছে—তাঁর একমাত্র ব্রত জগতে চিরশান্তি-সংস্থাপন। ঠিক এই কারণেই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে মাঝে মাঝে রাজকীয় ঘোষণা পত্রের অবতারণা করে ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের অভিনয় করতে হয়, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ন্যায় বিচার হচ্ছে, এই কথাটা শোনাবার জন্য গলা সাধতে হয়, বাঁধনের মোটা সম্ভবতঃ অনাবশ্যক কাছি-গুলি কেটে দিয়ে, সূক্ষ্ম অদৃশ্য পাশগুলিকে আরও দৃঢ় করে বেঁধে মুক্তির মোহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়। এটা সে বিলক্ষণ জানে যে তার ধর্ম্মের ছদ্মবেশটা খসে পড়লে তার ভারত-শাসনের বলও অন্তর্হিত হবে।

(৩) আধ্যাত্মিক শক্তির বলাধিক্যের তৃতীয় প্রধান প্রমাণ জগতের বড় বড় ধর্ম্মগুলির প্রচার।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসটা ভাল করে আলোচনা করে দেখলে প্রমাণটা যে কত পাকা, তা বুঝতে বিলম্ব হবে না। ব্যাপারটা একদিক থেকে নিতান্তই সোজা। সেটা মোটামুটি এই। বেথেলহ্যামের এক নগণ্য পান্থশালার প্রান্তে এক অতি দীন ছুতার রমণীর কোলে এক আঁধার রাত্রে নিতান্ত অসহায় শিশুরূপে দিব্যধাম হতে এলেন এক অপূর্ব্ব অতিথি—জগতের মহা-পান্থশালার পথিকদের ঘরের পথ চেনাবার জন্য। অতি সহজভাবে সহজ কথায় তিনি বললেন—"তোমরা যে ভাই ভাই—তোমাদের যে পরস্পরকে ভাল বাসতে হবে"। কথাটা নূতনও নয়, অসাধারণও নয়! পণ্ডিতে এ নিয়ে অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছে—কবি কবিত্বের মাধুর্য্য বিস্তার করেছে—ধর্ম্মোপদেষ্টা গম্ভীর উপদেশ দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। কিন্তু সে কেবল পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও উপদেশ। সে তো ভালবাসা নয়। প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির যে পরম সহজত্ব তারই অভাবে কথাটা এতদিন কাণে গিয়েছে—প্রাণে পৌছয়নি। কথা ছিল; কিন্তু ছিল না সেই সুর, যাতে তাকে অর্থের সংকীর্ণ কারাগার থেকে উদ্ধার করে ভাব ও সঙ্গীতের সত্যলোকে বিপুল মুক্তিদান করতে পারে। সে সুর এসে থাকে কেবল এমন প্রাণ হতে, যে-প্রাণের কোথাও কোনও ব্যবধান নাই। এতদিন পরে তেমন একটী প্রাণের মধ্যে ঐ ঐ অতি-প্রাচীন কথাটী নূতন জন্ম লাভ করে নূতন শক্তিতে বিশ্ব-বিজয়ে যাত্রা করল। যারা সোজা লোক, তারা এই সোজা জিনিষ-টীকে সোজাভাবে গ্রহণ করে অমরত্বের পথে যাত্রা সুরু করেছিল। যারা বড়লোক, যাদের প্রাণটা ধন-মান পদ-গৌরব পাণ্ডিত্য কবিত্ব কাল্‌চারের শতেক আবরণে আবৃত—সেই সমস্ত আবরণের ভিতর দিয়ে এই সহজ উদার মধুর সুরটা তাঁদের কাণে বেজে উঠল প্রলয়ের বিষাণ ধ্বনির মতো। তাঁরা সহজ সংস্কার-বশে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করলেন, যদি এই ভালবাসার বাণীটা এখন সত্য সুরে বাজতে থাকে তাহলে এই যে বিপুল সভ্যতার সৌধ লক্ষ গুণী জ্ঞানী বীর আকাশ-স্পর্দ্ধী করে যা' গড়ে তুলেছেন—হাজার কবি শিল্পী চিত্রকর প্রাণপণ-যত্নে যাকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, তা যে একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। কারণ এর ভিত্তি যে লক্ষ কোটি দরিদ্রের ক্ষুধার উপরে—আর্ত্তের হাহাকারের

উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ ভিতের তলার নিদারুণ ছবিটা অনেক সময় চোখের বা মনের আড়ালে থাকে বলে, মানুষের আপনাকে ভুলিয়ে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা আছে বলে, মানুষের হৃদয় নিয়ে আরামে বসে ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখা, চিত্র-কলা রচনা করা সম্ভব হয় এবং বুদ্ধি ফলিয়ে দর্শনের তর্কও অনায়াসে চল্‌তে পারে। কিন্তু দৈবাৎ যদি মনের পর্দ্দাটা সরে গিয়ে ঐ ভিত্তির নীচেকার দুঃখ দারিদ্র্য যন্ত্রণার অনাবৃত ছবিটা একেবারে অব্যবহিতভাবে চেতনার ক্ষেত্রে জেগে ওঠে তাহলে কোথায় থাকে সুখ, সম্পদ, আরাম, অবসর—কোথায় থাকে দর্শন বিজ্ঞান কাব্য-কলা! তখন ঐ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা ভিন্ন মানুষের মন কিছুতেই শান্ত হতে পারে না। কাজেই ঐ পর্দ্দাটা সরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা মাত্র সভ্যতার পাণ্ডারা আত্মরক্ষার অন্ধ সংস্কার-বশে আতঙ্কে একেবারে শিউরে ওঠেন এবং ভয়-বিমূঢ়ভাবে নিষ্ঠুরতার পালা অভিনয় করতে সুরু করেন। এরা সকলেই যে মন্দপ্রকৃতির লোক এরূপ মনে করলে গুরুতর ভুল হবে। এঁদের মধ্যে উদার স্বভাব মহানুভব লোকও অনেক থাকেন। মার্কাস অরেলিয়সের (Marcus Auralius) মতো উদার ধীর প্রভৃতির লোক কেবল রাজকুলে নয়, সমস্ত মানব সমাজেরই গৌরব। অথচ তিনিও খ্রীষ্টধর্মের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য রুদ্র নীতি অবলম্বন [illegible] বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। সে যাই হোক্ সভ্যতার বাণীটার প্রচার বন্ধ করতেই হবে এবং যে কণ্ঠে ঐ বাণী এমন সুরে বেজে উঠেছে সে কণ্ঠকে চিরদিনের মতোই নীরব করে দিতে হবে। আয়োজনও সেরূপ করা হল। কিন্তু কণ্ঠ নীরব হলেই যে সুর থেমে যাবে—এটা জড় বুদ্ধির একটা অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। সে সত্যের প্রমাণ পেতেও তাঁদের বড় বেশী বিলম্ব হলো না।

মানুষের মধ্যে প্রেমের মহাসত্যকে চির দিনের মতো অমরত্ব দান করার পক্ষে কেবল একটীমাত্র অনুষ্ঠান বাকী ছিল—নিষ্পাপীর বিশুদ্ধ রক্তে তার অভিষেক। ক্যালভারীর Calvary পবিত্র পাহাড়ে সে অনুষ্ঠানও সমাধা হলো। এই রক্তের রাজটীকা লাভের পর দলে দলে ভক্ত নরনারী যখন এই সত্যের নিকট রাজ-কর দিতে সুরু করল, তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রোম সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তির সঙ্গে নিবিড় সংঘর্ষ সুরু হলো। ভ্রষ্টচরিত্র রোম সে সময়ে নিষ্ঠুরতাকেও একটা বিশাল কলায় পরিণত করে তুলেছিল। এক সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ ও জনসাধারণের আমোদ-বিধানের জন্য, লক্ষ লক্ষ দর্শকের সম্মুখে এই সব নিরীহ খৃষ্টানদের সাপ বাঘ সিংহ ভালুক মত্ত ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হলো। আগুন ও অস্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা নরদেহে যতদূর তীব্র যন্ত্রণা জন্মাতে পারা যায় তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হতে লাগল। প্রথম প্রথম দর্শকেরা আমোদও পেল যথেষ্ট।

কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলেছি মানুষ কোনও সময়েই একেবারে ভগবান-পরিত্যক্ত,

এক সময় এই সব নিষ্ঠুর পশুপ্রকৃতি দর্শকদের মনের এক কোণে এই প্রশ্ন উঁকি মারতে সুরু করল।—"না জানি, সে কি শক্তি যা এই সব নিরীহ গ্রাম্য চাষাদের চরিত্রেও সিপিয়ো কেটো ব্রুটসেরও অনধিগম্য বীরত্ব জাগিয়ে তুলেছে! সে কি আনন্দ যা যন্ত্রণা-ময় মৃত্যুকেও উৎসবের বেশে সাজিয়ে দিল!" এই দুর্নিবার প্রশ্ন মানুষের প্রসুপ্ত ধর্ম্মবোধকে ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে জাগিয়ে তুলে তার মুখ দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর আদায় করে নিল। বিপুল রোম-সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির জয়ধ্বনি ঘোষিত হতে আর বিলম্ব হলো না।

খ্রীষ্টধর্ম্মের আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট রোম সাম্রাজ্যের প্রকাণ্ড দলের পরাভবের বিষয়টা কিছু বিস্তৃত ভাবে লিখেছি। এটা হয়তো অনেকের চোখে একটু অসঙ্গত বলে ঠেকতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নয়। ব্যাপারটা অতীত ইতিহাসের এমন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় যা বাস্তব জগতে লোক-লীলা সংবরণ করে ইতিহাসের জীর্ণ পাতার কবরের মধ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করেছে! এই একই সংগ্রাম অবিশ্রাম চলছে—যুগযুগান্ত হতে। আজো শেষ হয়নি—কখনও শেষ হবে কিনা তাও জানিনে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যুদ্ধের চেহারাটা কেবল বদলাচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি। রোমসাম্রাজ্যের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের সেই সংগ্রামই আজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগীদের সংগ্রামের মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। সেই একদিকে সত্য ও প্রেম এবং আর একদিকে অসত্য দম্ভ ও সংকীর্ণতা। অস্ত্র-শস্ত্রের অবশ্য অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু সে এক পক্ষের। প্রথম পক্ষের নির্ভর এখনো সেই সব সনাতন অস্ত্র-শস্ত্রের উপর—সেই ধৈর্য্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সন্তোষ ও ত্যাগ। আর এই নির্ভর যতদূর সম্পূর্ণ হবে, জয়ের সম্ভাবনাও ততই বেশী হবে। দ্বিতীয় পক্ষের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বৈচিত্র্য ও ভীষণতায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেজন্য ভয়, নৈরাশ্য বা দ্বিধার কারণ বিন্দুমাত্র নাই। অনেক অল্প-বিশ্বাসী লোক মনে করেন যে সেকালে যাই হোক না কেন একালে উন্নত বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আধ্যাত্মিক শক্তি যে জয় লাভ করবে, এরূপ আশা করা মূঢ়তা! কিন্তু এটা তাঁদের বিষম মোহ। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তার পক্ষে ধনুর্ব্বাণও যেমন সাংঘাতিক, বন্দুক-কামানও ঠিক তেমনি। বিন্দুমাত্র তারতম্য নাই। যে লোক অমৃত-লাভের জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে—মৃত্যু যে মূর্ত্তিতেই আসুক না কেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র যায় আসে না। সুতরাং কোন লেবরেটরীতে কোন বিষাক্ত গ্যাসটা প্রস্তুত হলে সেটা জানার জন্য তার তিলমাত্র মাথা-ব্যথার কারণ নাই।

এর পর বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না, আমরা যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে বরণ করতে যাচ্ছি, সে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি বরেণ্য বলেই। যাঁরা অস্ত্র-শক্তির অভাব-বশতঃ নিরুপায়ভাবে আধ্যাত্মিক

শক্তিকে আশ্রয় করে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান্, তাঁদের নিকট আমার এই সানুনয় নিবেদন, তাঁরা যেন বুঝে দেখেন, এতে মোক্ষ বা স্বরাজ লাভতো হবেই না, কারণ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,' অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের তুষ্টি সাধন করলে যে অর্থ ও কাম লাভ হতে পারতো তা হতেও বঞ্চিত হবেন। তাঁরা যদি বাহু-বলকেই অধিক বলশালী বলে মনে করেন, তাহলে কি ভরসায় যে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছেন সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে। তাঁরা বোধ হয় "মধ্বভাবে গুড়ম্ দদ্যাৎ" এই শাস্ত্রবাক্যটীর অনুসরণ করতে চান! কিন্তু যেখানে মধুর বিশেষ গুণের উপরই ওষুধের সঞ্জীবনী শক্তিটা নির্ভর করছে, সেখানে এ বচনের অনুসরণ করা কেবল যে গুড়টাকে অনর্থক নষ্ট করা—শুধু তাই নয়, হয়তো বিষ-ক্রিয়া হওয়ারও আশঙ্কা আছে। আসল কথা, আধ্যাত্মিক শক্তি যে কাকে বলে, এবং তার প্রভাব যে কতদূর, সে সম্বন্ধে তাঁদের কিছুমাত্র ধারণা নাই। "ধিক বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্ম বলং বলং বলম্—"বিশ্বামিত্রের মুখ দিয়ে এই কথা যে বেরিয়েছিল, সে বহু দুঃখে, বহু অভিজ্ঞতার ফলে। সেদিনও ও কথা যেমন সত্য ছিল, আজও ঠিক তেমনি সত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন,—

"বাহু-বল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ!"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী।

পাশাপাশি

জমিদারের সাত-মহল বাড়ীর পাশে একটা খোড়ো ঘর। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে শিশিরের স্পর্শে, চালের খড়গুলো সব জীর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল এই দুর্ব্বলতা ভেদ করে একেবারে গিয়ে পড়ত ছিন্ন শুষ্ক শয্যায়—যেখানে এই দরিদ্র দম্পতী সুখে রাত্রি যাপন কর্‌বার আশা কর্‌ত। সারা রাত তাদের অনিদ্রায় কেটে যেতো।

সকাল বেলায় ঐ খোড়ো ঘরের মালিক এক মিস্ত্রী যখন কোনো রকমে নাকে-মুখে দুটী ভাত গুঁজে কাজের তাড়ায় বেরিয়ে যেত, জমিদার বাবুর বাড়ীতে তখন সকলে ঘুম থেকে উঠে চা খাবার ধূম বাধিয়ে দিত।

এম্‌নি ভাবে দুটো সংসারের জীবন-যাত্রার স্রোত পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছিল।

একদিন হঠাৎ মিস্ত্রী বেচারা জ্বরে পড়ল। রোজ্‌কারের রোজগার তার বন্ধ হয়ে গেল। তিন দিন তিন রাত ঐ দরিদ্র দম্পতী উপোস করে রইল।

পাশে জমিদারের বাড়ীতে ঐ তিনদিন অন্নপ্রাশন না কি-এক কাজ-উপলক্ষে খুব একটা হৈ-হৈ ধুম-ধাম ব্যাপার হয়ে গেল—পাঁচ-সাতশো লোক খেলে, দশ-বারোশো কাঙালী বিদায় হলো। চীনে না স্পেনে দুর্ভিক্ষের জন্য হাজার টাকা দান করা হলো, কিন্তু পাশের বাড়ীতে যে একটা দরিদ্র পরিবার অন্নাভাবে উপোস করে আছে, এক মুঠো খই দিয়েও ও-বাড়ীর কেউ তাদের খবর নিলে না।

ক্রমে সব জিনিষ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। মিস্ত্রী সুস্থ হয়ে

আবার আগের মত সকালে কাজে বার হত। জমিদারের বাড়ীতেও পূর্ব্বের মত সারাদিন ঐশ্বর্য্যের উৎসব চলত। সন্ধ্যায় কুটীরে যখন মৃৎ-প্রদীপ জ্বলে উঠত, শঙ্খ ধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত, জমিদারের প্রাসাদ তখন বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল্ করে উঠত, কক্ষ থেকে নানা রকমের শব্দ তরঙ্গিত হয়ে বাইরে প্রকাশ পেত।

মিস্ত্রী তার কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত দেহখানি নিয়ে ফেরবার পথে ঐ বাড়ীর গাড়ী, জুড়ি, আলো, গান, বাজনার দিকে চেয়ে বুকে যেন একটা কিসের ভার নিয়ে নিজের দোরে এসে ঘা দিত!

প্রতীক্ষা-কারিণী বধূ তার এসে দরজা খুলে দিত। সেই মুহূর্ত্তে তার বুকের বোঝা কোথায় যে উড়ে যেত! বুকে শান্তি আর মুখে হাসি নিয়ে সে ঘরে ঢুক্‌ত।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সে ফেরবার পথে ও-বাড়ীর দিকে চেয়ে ফির্‌ছে। বাড়ীর দিকে চাইতেই আজ হঠাৎ তার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল! প্রতিদিনকার সে ঐশ্বর্য্যের তীব্রতা আজ ত জ্বালাময়ী হয়ে তার চোখে আঘাত কর্‌ছে না! ঐ ত বাড়ীর দরজায় গাড়ী, মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ ত ঐশ্বর্য্যের সাজ! কিন্তু এ কি, বাড়ীতে যে আজ একটা ভীষণ নীরবতা! ও কে বাড়ী থেকে বার হয়ে গাড়ীতে উঠল? ডাক্তার, না? হ্যাঁ, ডাক্তারই ত বটে। ঐ যে হাতে সেই যন্তর্। কারো অসুখ করেছে, বোধ হয়! কার অসুখ? এই কথা জানবার জন্য তার মন অস্থির হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে প্রাণপাখীটা দারুণ অস্বস্তিতে যেন ঝট্‌পট্ কর্ত্তে লাগল। কাছেই একজন খানসামা দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গিয়ে অপরাধীর মত আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কার অসুখ?

খানসামা একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে উত্তর না দিয়ে চলে গেল। এমন সময় বেরিয়ে এল এক বুড়ো ঝী। তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেই সে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—অসুখ গো, বড্ড অসুখ, আমাদের খোকাবাবুর। বংশের শিবরাত্রের সল্‌তেটুকু,—তাও বুঝি আজ নিভে যায়!

ম্লান মুখে সে ঘরে ফিরে এল। নিজের দরজায় ঘা দিতে তার সাহস হল না, পাছে শব্দ হয়। ধীরে ধীরে জানলার ধারে গিয়ে আস্তে আস্তে খুব চাপা গলায় সে তার স্ত্রীকে ডাকলে,—ওগো—!

বদ্ধ কুটীরে সে বেচারীও স্থির থাকতে পারছিল না। কোন কাজে তার মন বসছিল না। ও বাড়ীর খবরটুকু পাবার জন্যে সেও অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছিল, স্বামীর সেই মৃদু আহ্বানেই এসে দরজা খুলে দিলে। বুকে তার বিষম ব্যাকুলতা। সেই আবেগে তখনি সে সংবাদটুকু পাবার ব্যগ্রতা চেপে রাখতে পারলে না!

বাড়ীর একমাত্র ছেলে—তারই অসুখ। তখনি তার মনে পড়ল—তার মৃত্যু-কবলিত প্রথম সন্তানের কথা। অমনি তার দু' চোখ জলে ভরে উঠল। অতীত দিনের শোকের জ্বালা মনে করে, মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতায় সে বলে উঠল—হে, ঠাকুর, বংশের ঐ একটীমাত্র প্রদীপকে নিভিয়ে দিয়ো না!

পাশের বাড়ীর মোটরখানা তখন শব্দ কর্‌তে কর্‌তে শব্দটাকে ডুবিয়ে চলে গেল।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

বিদেশীর বিপদ

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে, আমাদের যে কার্পাস-বস্ত্র রাজ-ভাণ্ডারে রত্ন-পর্য্যায়ে হীরা-জহরতের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা পাইত, রোমের অভিজাত-বর্গ যে কাপড় সোনার ওজনে কিনিয়া পরিতেন, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সৌখীন সমাজে সেই 'শব্-নম্' বা 'নিশির শিশির', 'আব্-রুয়াঁ' বা 'স্রোতের পানি' প্রভৃতি কাপড়ের খুব রেওয়াজ বা ফ্যাশান চলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের 'বিলাতী' অর্থাৎ সে-দেশের বিদেশী কাপড়ের আমদানী ইংলণ্ডে খুবই বাড়িয়া ওঠে। ফলে ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পের সসেমিরা অবস্থা দাঁড়ায় এবং ইংরেজ তাঁতিকুলের বৃত্তিলোপের সঙ্গে সঙ্গে 'ধরম ছুটিয়া' যাইবার উপক্রম হয়। দারিদ্র্যের তাড়নায় নিরীহ শিল্পজীবীর দল দায়ে পড়িয়া ক্রমশঃ চোর-ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। অবস্থা যে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতের তাঁতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। এই দেশব্যাপী শোচনীয় দুরবস্থার সংস্কার-কল্পে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত একজন ইংরেজ তাঁতি ফাঁশীর মঞ্চ হইতে তাহার স্বদেশবাসীকে যে কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আমাদের প্রত্যেকেরই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Gentleman's Mon- মাসিকপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"আজ চুরি অপরাধে মাইকেল কারমডি নামক এক ব্যক্তির ফাঁসি হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে, দেশের জনসাধারণের, বিদেশী (অর্থাৎ ভারতীয়) কার্পাস বস্ত্র ব্যবহারের শোচনীয় অভ্যাসের ফলে, যাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ঊর্ণা-বস্ত্র-শিল্পজীবী ব্রিটিশ তন্তুবায়-সম্প্রদায় সমবেত হইয়া অপরাধী, জল্লাদ ও ফাঁশীর মঞ্চ বিদেশী কার্পাস বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে। বিদেশী কাপড়ই যে দেশের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ করিয়া, নিরীহ তাঁতিদের দুর্দ্দশায় ফেলিয়া, ক্ষুধার তাড়নায় লঘু গুরু নানা অপরাধের মধ্য দিয়া ক্রমশ উহাদিগকে বধ-মঞ্চের দিকে জল্লাদের কবলে ঠেলিয়া দিতেছে, এই কথাটা সাধারণের চোখে স্পষ্ট করিয়া তোলাই, ফাঁসীর মঞ্চ বিদেশী কাপড়ে মুড়িবার তাৎপর্য্য। আর যাহারা বিদেশী কাপড় ব্যবহার করিতেছে তাহারাই যে পরোক্ষভাবে দেশের শিল্পীদের পক্ষে জল্লাদের তুল্য, জল্লাদকে বিদেশী কাপড় পরাইয়া ইহারা এই কথাটাই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছে।

তারপর অপরাধীকে বিদেশী কাপড়ে মণ্ডিত করার অর্থ বোধহয় এই যে, যে অজগর বেচারাকে জড়াইয়াছে তাহাকে আইনের জবানীতে 'অপরাধ' বলিতে পার, 'পাপ' বলিতে পার, কিন্তু আসলে তাহা বিদেশী কাপড়ের

ভারতের কাপড় না ব্যবহার করে, দেশের শিল্পীর মুখ চাহিয়া, দেশের কাপড়ই পরে, এ সমস্ত করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাই। বধ্যভূমিতে অপরাধী যে আশ্চর্য্য বক্তৃতা করে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, মিনিট কয়েকের মধ্যেই যাকে মর্‌তে হবে, মাথা পেতে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ কর্‌তে হবে, সেই হতভাগ্য অপরাধীর গোটাকয়েক কথা একটু মন দিয়ে আপনারা শুনুন্। আমি স্বীকার কর্‌ছি, অভাবে প'ড়ে অনেক রকমের অনেক গুরু অপরাধ আমি করেছি। আমি বেশ জানি, আমার অভাবই এর জন্যে ষোল আনা দায়ী। আমার অন্নাভাবের কারণ অর্থাভাব এবং অর্থাভাবের কারণ দেশে স্বদেশী কাপড়ের অনাদর।

"খৃষ্টানমণ্ডলী, একবার ভেবে দেখুন। বিদেশী তুলার কাপড় ব্যাভার ক'রে যদি আপনারা স্বদেশী বস্ত্র-শিল্পের প্রসার রোধ করেন, আমার বিশ্বাস তা' হ'লে আপনারাই আপনাদের স্বদেশকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত কর্‌বেন। ফলে আমার মতন অপরাধীর দলে দেশ ছেয়ে যাবে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাবধান হ'তে বল্‌ছি ; এর পরে আমার মতন প্রত্যেক অপরাধীর প্রাণদণ্ডের জন্যে ভগবানের কাছে আপনারাই দায়ী হবেন। যে মানুষ মরণের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে, দু' এক মিনিটের মধ্যেই যার সব ফুরিয়ে যাবে, আপনাদের কাছে তার প্রার্থনার যদি কোনো মূল্য থাকে, ত' আমি অনুরোধ করছি যে, যে তুলার কাপড়ে আমার মৃত্যুমঞ্চ আচ্ছাদিত, জল্লাদের কাছ থেকে তা' আর কিন্‌বেন না। কারণ, যা' আমাকে দুর্দ্দশা থেকে চৌর্য্যে এবং চৌর্য্য থেকে অকাল-মৃত্যুতে ঠেলে নিয়ে এসেছে, যদি আপনারা সেই বিদেশী কাপড়ই পর্‌তে থাকেন, তা হ'লে আমি কবরেও শান্তি পাব না। দেশের প্রতি ভদ্র-সম্প্রদায়ের মমতা নেই, জানি। তবুও তাঁদের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যে আমি মিনতি কর্‌ছি, তাঁদের ছেলেপুলে বা চাকর-বাকরদের আর যেন তাঁরা বিদেশী কাপড় ব্যবহার করতে না দ্যান। কারণ এর পর ও-কাপড় পর্‌বে কেবল ফোতো বাবুর দল, ফ্যাশানের চাকরাণী, পেশাকর-সম্প্রদায়, জেলখানার কয়েদী, বজ্জাত বদ্‌মায়েশ্ আর সরকারী জল্লাদ।"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

ছাত্রাবাসেতে এক হয়েছে চুরি,
ডাকাতির মত গোল ভবন জুড়ি!
চুরি গেছে সুন্দর ফ্লুট বাঁশী

ধরিতে চোরেরে চলে ফন্দী কত,
বন্দী সে হ'ল না'ত সাধুর মত।
'নলচালা' এলো তাই পোহালে নিশি,

বহু জল ছিটাইয়া, মন্ত্র পড়ি,
বাঁকারির নল ফেরে চোরকে ধরি।
ঘুরে ঘুরে অবশেষে উপর-তলে,
নবাগত বালকেরে ধরিল গলে।
গ্রাম থেকে আসিয়াছে দু'দিন মোটে,
সকলে করিল ঠিক্ সেই সে বটে!
করেনা সে প্রতিবাদ, চাহিয়া রহে,
ম্লান মুখ, লজ্জাতে কথা না কহে!
বাক্‌স পেট্‌রা তার উলটি দেখে,
নাই বাঁশী কোথা হায় এসেছে রেখে।
বাঁশী যার সে বলিল নিদয় হাসি,
চোর চেনা গেল, আর চাহিনে বাঁশী!
চোর যে সে হেসে গেল তাহারি সাথে,
গ্রামের বালক কাঁদে ফুঁপায়ে রাতে।
বিনা অপরাধে তার কি গুরু ব্যথা,
দুখেতে যে পড়ে তার লুটিয়া মাথা।

* * *

চলে গেছে বহুদিন, ভেঙেছে বাসা,
কে কোথা গিয়াছে লয়ে নবীন আশা।
সেদিন হয়েছে খুণ চল্‌তি ট্রেণে,
পুলিস আসামী দুটি এনেছে টেনে।
দারোগা কবুল নাহি করাতে পেরে,
আজি তাই আদালতে এনেছে ধরে।
হাকিম চাহিয়া কন্ তাদেরি পানে,
দোষী কিনা? এ খুনের কিছু কি জানে?
আসামীরা বলে মোরা জানিনে কিছু,
ফেলে শ্বাস, কাঁদে মাথা করিয়া নীচু।
হাকিম বলেন তবে পুলিসে ডাকি,
কি ফল এদেরে বৃথা আটকি রাখি।
আমারও এখন ঠিক হতেছে মনে,
এসেছি এঁদেরি সাথে সেই সে ট্রেণে।
প্রণমি আসামী বলে বুঝিনে কেন,
অকারণে পেনু মনে বেদনা হেন?
বেদনা দিলেই হয় পেতে যে ব্যথা
বুঝিনু তা ঠিক্ নয়, কথার কথা।
হাকিম বলেন তার প্রমাণও আমি,
বিনাদোষে কাঁদায়েছ কত যে যামি।
আসামীরা বিস্মিত; হাকিম হাসে,
সে 'নল-চালার' কথা মনে কি আসে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সমালোচনা

সরল হিন্দীশিক্ষা। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। কলিকাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা বণিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত। যাঁহারা হিন্দীভাষা শিক্ষা করিতে চান, হিন্দী ভাষায় প্রত্যয় বিভক্তি, ধাতু, বাক্যরচনা প্রভৃতি শিখিতে চান, তাঁহারা শিক্ষকের সাহায্য-ব্যতিরেকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অনায়াসে তাহা শিখিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি বেশ সহজ প্রণালীতে লেখা এবং এ গ্রন্থ-পাঠে অনায়াসেই প্রচুর ফল পাওয়া যাইবে।

পত্রিকামালা। পত্রিকা নং ১ ও ২। দিহবতায় সোসাইটি বোম্বাই। কলিকাতা মার্কাণ্টাইল প্রেসে মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দুটীতে শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী হইতে কয়েকটি ভগবৎ-বাণী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



গৌতমের আশ্রমে সত্যকাম

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা অঙ্কিত

ভারতী

৪৫শ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২৮　　[অষ্টম সংখ্যা

প্রত্যাবর্ত্তন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল মেসের দোতলার ঘরে থাকে। লোকের সহিত মেলা-মেশা তাহার খুব কম। অরুণের সঙ্গেও তাহার সর্ব্বদা দেখা হইত না। কলেজেও সে ভিন্ন ক্লাশের ছাত্র। তাই ইচ্ছা-সত্ত্বেও অরুণ তাহাকে বড় বেশী কাছে পাইত না; তবু যেটুকু সময় পাইত, সেই সময়টুকুর জন্যই উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিত। প্রফুল্লর গম্ভীর দূরত্ব-ভাব যাহা সাধারণের নিকট হইতে তাহাকে তফাতে রাখিত অরুণের কাছে তাহাই যেন সমধিক আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জলদকে সে যেমন সম্পূর্ণ কাছে পাইয়াছিল, প্রফুল্লকে তেমন পায় নাই। আবার পায় নাই বলিয়াই যেন তাহার আকর্ষণও তাহার কাছে এত অধিক মিষ্ট লাগিত। জলদকে সে ভালবাসিত; প্রফুল্লকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, আবার ভয়ও করিত। কোন কিছু অন্যায় কাজ করিতে লোকে অভিভাবককে যেমন ভয় করে, নিজের সামান্য কোন ত্রুটি বা পড়ার কোন ভুল প্রমাণ হইলে অরুণ প্রফুল্লর কাছে তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। অরুণ বুঝিতে পারিত, প্রফুল্লও তাহাকে ভাল বাসিতে সুরু করিয়াছে। তবু দুইজনের মাঝখানে কি-একটা ব্যবধানের দেওয়াল যেন সর্ব্বদাই মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! কেহ কাহারো মনের নাগাল সম্পূর্ণরূপে পাইত না।

অরুণ ইহাতে দুঃখ পাইত কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ও খুঁজিয়া পাইত না। সে মনে করিত, তাহার দুর্ভাগ্য জীবনই এ বৈষম্যের মূল। প্রফুল্ল আপনা হইতে কোনদিন তাহার বাড়ীর খবর কিছুই জানিতে চাহে নাই।

অরুণও কৌতূহল চাপিয়া রাখিয়া এ বিষয়ে বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিত। প্রফুল্লকে এখন সে 'দাদা' বলিতে সুরু করিয়াছে। দাদা বলিয়া ডাকিয়া সে তৃপ্তি পাইত। আগা-গোড়া সারা জীবনটাই যে তাহার 'পাতানো' সম্পর্ক লইয়াই গঠিত! তবে দাদা ডাকের ক্ষোভটুকুই বা থাকিয়া যায় কেন! প্রফুল্লও যে ইহাতে খুসী হইয়াছিল, সেটা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত। অরুণকে সে যথার্থই ভাইয়ের মত স্নেহ করিত। তাহার পাঠের উন্নতির জন্য যত্ন লইত; বাছিয়া নিজের দুই-একখানি ভাল বইও পড়িতে দিত। দুইটি অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়া অরুণের বর্ত্তমান জীবন বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে সে ভয় পাইয়াছিল, কেমন করিয়া নীরস কর্ম্মক্ষেত্রে দিন কাটাইবে —সেজন্য ভাবনাও হইয়াছিল। জলদ ও প্রফুল্লর বন্ধুত্বে তাহার উদাসীন চিত্ত ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। প্রফুল্ল বলিয়াছিল, সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন জ্ঞানানুশীলনেই কাটাইবে। সংসারী সাজিয়া সংসার-ধর্ম্ম করা তাহার আদর্শ নয়!

কথাগুলি অরুণের ভাল লাগিয়াছিল। সে যেন তাহার কুহেলিকাছন্ন জীবনের গতি খুঁজিয়া পাইল! সেও কেন এই আদর্শই গ্রহণ করুক না! সংসারের সহিত দেনা-পাওনা না রাখিয়া সন্ন্যাসীর কঠোরতা না সহিয়াও যদি আনন্দময় জীবন-যাত্রার পথ পাওয়া যায় ত তাহাতে ক্ষতি কি! এই ত ভাল। অরুণ মনে মনে সেই দিনই প্রফুল্লকে গুরু-পদে বরণ করিয়া লইল।

ঘরের দরজা আধখানা ভেজানো ছিল। বাকা অংশ দিয়া বাহিরের কতকটা দৃশ্য অরুণের চোখে আসিয়া পড়িতেছিল। সিঁড়ি দিয়া কত লোক উঠা-নামা করিতেছে; কেহ-বা তাহার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়াও যাইতেছিল। অরুণের ইচ্ছা হইতেছিল, উঠিয়া দোরটা ভেজাইয়া দেয়। কিন্তু আলিস্যবশতঃ তাহা আর ঘটিয়া উঠিতেছিল না।

ঘরখানির দেওয়াল হইতে ভাঙ্গা ডেক্‌সটি পর্য্যন্ত এ গৃহের পূর্ব্বাধিকারীর স্থপতি-বিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগের যতই পরিচায়ক হউক, পরিচ্ছন্নতার প্রতি যে তাহার তিলার্দ্ধ অনুরাগ ছিল না, তাহা ঘরের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইত। দেওয়ালের গায়ে পানের পিক্। চারিদিকে পেরেক পুঁতিয়া আবার তাহা তুলিয়া লওয়ায় বহুস্থলে গর্ত্ত হইয়াছে—টেবিলের উপর কালিঢালার চিহ্ন বিদ্যমান। উপস্থিত উত্তরাধিকার-সূত্রে অরুণ যে কব্জা-ভাঙ্গা বার্ণিশ-চটা কাঠের ডেক্‌সটি পাইয়াছে, তাহার ভিতর হইতেও আবর্জ্জনার রাশি সলজ্জে বাহিরে উঁকি দিয়া উহার সত্ত্বাধিকারীর অমনোযোগিতার প্রমাণ দিতেছিল। ডেক্‌সটির ভিতর এখনও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা কোন কলেজে-পড়া জেণ্টল্‌ম্যানের ডেক্‌সয় থাকা উচিত নয়। পূর্ব্বাধিকারী দেওয়ালে কত অসংখ্য কীট-পতঙ্গ সরীসৃপ লতা-পুষ্প দেব-দেবীর নাম, কবিতার অর্দ্ধ চরণ আরও কত কি যে আঁকিয়া ও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে —তাহার আর সংখ্যা নাই! টেবিলে ছুরি দিয়া খুঁদিয়া নিজের নাম-ঠিকানা অধিষ্ঠান ও তিরোধানের সাল-তারিখটি লেখা থাকায় দেওয়ালে চূণ ফিরাইলেও যে পরবর্ত্তী অধি-

বাসীকে তাহাকে স্মরণে রাখিতেই হইবে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল।

এই বিচিত্র গৃহসজ্জার পানে চাহিয়া অরুণ নিজের ভাগ্য চিন্তা করিতেছিল। দরজার বাহিরে জুতার শব্দের সহিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "অরুণ বাবু জেগে না ঘুমিয়ে? আস্‌তে পারি?"

স্বর শুনিয়াই অরুণ বুঝিল, আগন্তুক জলদ। "আসুন" বলিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। জলদ ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই গলির দিকের জানালাটি খুলিয়া দিল। অল্প-পরিসর স্থান, তবু কাঠের তক্তা-মারা ছোট জানালাটি খুলিয়া দিতেই ঘরের মধ্যে একটু আলো ও বাতাস প্রবেশ করিল। ইতস্তত চাহিয়া দেওয়ালের হুকে টাঙ্গানো তালপাতার ছোট পাখাখানি পাড়িয়া আনিয়া এইবার সে তক্তা-পোষের উপর অরুণের পাশেই কায়েমিভাবে স্থান গ্রহণ করিল। বার-কতক পাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইয়া জলদ কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল। আচ্ছা অরুণবাবু, এমন সময় জানলা এঁটে ঘরে শুয়ে আছেন যে! অসুখ-বিসুখ করেনি ত কিছু?"

অরুণ কহিল, "এইবার উঠ্‌ব-উঠ্‌ব ভাবছিলুম। জান্‌লাটা—ওটা বন্ধই ছিল কি না, আর খোলা হয়ে ওঠেনি—"

জলদ কহিল, "দেখুন, আপনার কাছে আমি একটা দরকারেই এসেচি। মনে করে-ছিলুম, আপনি হয়ত এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন, বাসায় এখন আপনাকে পাব না, আবার সন্ধ্যার পর আস্‌তে হবে, কিন্তু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এই দুর্জ্জয় গরমে বাইরে না গিয়ে বন্ধ ঘরে শুয়ে থেকে আমার পরিশ্রমটি বাঁচিয়ে দিয়েচেন!" বলিয়া সে মৃদু হাসিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে পুনরায় কহিল, "যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলি।" তাহার সঙ্কোচপূর্ণ ভাব দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইল। এমন কি কথা, যাহা বলিতে এতটা সঙ্কোচ আসে? জলদ তাহার কাছে টাকা ধার চায় না কি? অরুণের ত এই দুটি সঙ্কোচের হেতুই জানা আছে। এক, বংশের পরিচয় লওয়া, আর এক, অর্থ প্রার্থনা করা,—তবে অরুণের মত দুর্ভাগা কিছু জগতে অনেক নাই! টাকা ধার চাহিতে, প্রয়োজন হয়ত ভিক্ষা করিতেও অনেককেই হয়। কিন্তু পিতৃ-পরিচয় জানেনা এমন হতভাগার সংখ্যা অল্পই! মনের চিন্তা মনে চাপিয়া সে কহিল, "বলুন।"

জলদ কহিল, "কথা এমন কিছু নয়—পিশে মশাই আমায় ভারী মুস্কিলে ফেলেচেন। তাঁর ছোট দুটি নাতি-নাতনিকে পড়াবার জন্যে একজন মাষ্টার চাই। বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক জোগাড় করা তাঁর পছন্দ নয়। অথচ জানা-শোনা একটি ছেলে চাই। আমার উপর পড়েচে খুঁজে দেবার ভার। এক মাস ধরে ভাই, তাঁকে ত স্তোক দিয়ে রেখেচি, খুঁজচি-খুজ্‌চি করে—কিন্তু আজ একেবারে তিনি নাছোড়বন্দা, আর কোন কথাই শুন্‌বেন না। তাঁর নাতি-নাত্‌নি ভারী বে-শায়েস্তা হয়ে উঠ্‌চে। একে ত ঠাকুমার আদর তার উপর পড়া-শোনা মোটে নেই। একেবারে বনমানুষ হয়ে যাচ্চে। হাস্‌চ যে—তাঁর ব্যাখ্যা-মতই আমি বল্‌চি। আপনি যদি দিন-কতকের জন্যও অন্ততঃ তাদের গুরুগিরি করে দেখেন, তাহলে

সময় পেলে আমি খুঁজে পেতে তখন দেখতে পারি। বুনোহুটো আমায় যে একটুও মানে না, নৈলে আমিই না হয় কিছু দিন চালিয়ে নিতুম।—অসুবিধে হবে কি বেশী—?" বলিয়া জলদ উত্তরের আশায় অরুণের মুখের পানে চাহিল।

বন্ধুর এই অযাচিত অনুগ্রহে তাহার সহৃদয়-তারই প্রমাণ পাইয়া কৃতজ্ঞতায় অরুণের চোখে জল আসিল। আত্ম সম্বরণে অসমর্থ হইয়া মৃদুস্বরে সে কহিল, "মনে মনে কাজ ত আমি খুঁজছিলুমই। অসুবিধা বোধ কল্লে চল্‌বে কেন? বরং আপনার নিজে হতে—"

জলদ বাধা দিয়া কহিল, "শুভস্য শীঘ্রম্! উঠে পড়ুন তাহলে, আজই ও হাঙ্গামাটা মিটিয়ে দিয়ে আসা যাক্।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া অরুণের মনটি বেশ প্রফুল্ল হইয়া রহিল। কাল সন্ধ্যায় সে জলদের সহিত গিয়া নূতন কার্য্যে বাহাল হইয়া আসিয়াছে। কাজটি তাহার বেশ পছন্দও হইয়াছিল। বাড়ার কর্ত্তা প্রিয়নাথ বাবু মানুষটিকে ভাল লোক বলিয়াই অরুণের ধারণা হইয়াছিল। তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর হওয়াই সম্ভব। কাঁচা-পাকা চুল। গোঁফেও পাক ধরিয়াছে। দাড়ি কামানো। রংটি কাঁচা সোনার মত। গঠন দোহারা,—কোমলতা-ময়। মুখে গুড়গুড়ির নলের সহিত হাসিটি সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। মন খোলা, সদানন্দ পুরুষ—পূর্ব্বে ডেপুটি ছিলেন. বছর খানেক হইল পেন্‌সন লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিয়াছেন। গৃহে স্ত্রী ও দুটি পৌত্র-পৌত্রী! পুত্র পাবনার মুনসেফ্। তাঁহারা নাতি-নাতনীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াও বটে, তাছাড়া বাহিরে বাপের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইলে পড়া-শোনার ক্ষতি হয় এ কারণেও বড় ছেলে-মেয়ে দুটি পিতামহের কাছে ও ছোট দুটি বাপ্-মার কাছে থাকিত। অরুণ এই ছেলে-মেয়ে-দুটির গৃহ-শিক্ষকের অধিকার পাইল।

ছেলেটির বয়স নয় বৎসর; মেয়েটির বয়স আন্দাজ বারো হইবে। মেয়েটির নাম বরুণা। উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় অনুপমা সুন্দরী না হইলেও তাহাকে সুশ্রী বলা চলে। বসন্তের কচি পাতার মত কোমল শ্যামল লাবণ্য শ্রী মণ্ডিত। বালিকার সুগঠিত ক্ষীণ তনুখানি দেখিলে কালিদাস-বর্ণিত সঞ্চারিনী পল্লবিণী লতার কথাই মনে পড়ে। ইহাকে প্রথম দর্শনে অরুণ একটু কুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের আলাপেই বুঝিল, কুণ্ঠার কোন কারণই বর্ত্তমান নাই। মেয়েটি দেখিতে খুব ছোট-খাট না হইলেও আসলে একটি পাঁচ বছরের খুকির মতই মনটি তাহার সরলতায় ভরা। ছাত্র প্রদ্যুম্ন হৃষ্ট-পুষ্ট গৌরবর্ণ, সদা-চঞ্চল সদা-সহাস্য মুখ। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত প্রগাঢ় সখ্য করিয়া ফেলিল। দাদামহাশয়কে জানাইয়া আসিল, এবারকার মাষ্টার মহাশয় খুব ভাল। ইহার সহিত সে খুব শিষ্ট ব্যবহার করিবে; এবং পূজার পূর্ব্বে লেখাপড়ায় দিদিকে ছাড়াইয়া গিয়া বাবা আসিলে তাঁহাকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিবে।

মাষ্টারের বয়স এত অল্প দেখিয়া গৃহিণী মহাশ্বেতা দেবী কেবল একটু অপ্রসন্ন হইয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন। মেয়ে 'ডাগর'

হইতে চলিয়াছে—এখন কি আর এমন ছেলে ছোক্‌রা মাষ্টার রাখা ভাল? যদি মেয়েকে নিলেবতী করিবারই এত সখ, তবে দেখিয়া শুনিয়া একটি বুড়া সুড়া-গোছ পণ্ডিত রাখিলেই ত ভাল হইত। জলদের কাছে তাড়া খাইয়া শেষে তাঁহাকে চুপ করিতে হইল। প্রিয়নাথ বাবু গুড়গুড়ির নল হইতে মুখ সরাইয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "খুকীর জন্য ভাবচ! রামঃ! ও ত বাচ্ছা! আহা, ছেলেটিকে দেখেই কিন্তু কেমন মায়া হচ্চে—থাক্। জলদ বলছিল, ওর অভাব নাকি বড্ড।" ইহার পর গৃহিণীও আর কোন আপত্তি তুলিলেন না।

পরের সপ্তাহে জলদ পিশিমার মুখে শুনিল, মাষ্টারটি ভারী ভাল। মুখ দেখিলেই মায়া হয়।

জলদ দুষ্টামি করিয়া বুড়া পণ্ডিত মহাশয় আনিয়া দিতে চাহিলে গৃহিণী কহিলেন, "বাপ্‌রে, তা কি হয়! বিনি-অপরাধে এক জনের অন্নে হন্তারক হতে আছে কি? ও যদি নিজে থেকে যেতে না চায় ত আমার খোকা-খুকীদেরই সামিল হয়ে থাকবে।"

জলদ পিশিমাকে চিনিত। এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পল্লী সংস্কার-সমস্যা

দরিদ্রের পরম বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের মুখে শুনলুম, ফিজিদ্বীপ থেকে যারা স্বদেশে ফিরে এসেছিল, তারা আবার সেখানে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। অনেকে নিজেদের গ্রামে গিয়ে সেখানে টিঁকতে পারে নি; যারা বাপের ভিটের মায়া কাটাতে পারেনি, তারা গ্রামে বাস করবার আয়োজন করে তারপর সব ফেলে ফিজি যাবার জন্য আড়কাঠিদের অফিসে ভিড় করছে। ঘটনাটি আমাদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কিন্তু যারা পল্লী-জীবনকে সঞ্জীবিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে হাত দিয়েছেন বা দেবেন, ঘটনাটি তাঁদের ভাল করে'

প্রাচীন কালে সমৃদ্ধির দিনে আমরা সমুদ্র-পাড়ি দিলেও সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার আছে। শাস্ত্রে নাকি সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ, অতএব যারা এ ব্যবস্থা না মানে তাদের জাত যায়, সমাজ তাদের গ্রহণ করে না। কিন্তু নিষেধ ও শাসন-সত্ত্বেও আমাদের দেশ থেকে কুলি আমদানি করে ফিজিদ্বীপে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায়, মালয় রাজ্যে, ধনী বণিকেরা জমি চাষ করছে, খনি খুঁড়ছে, রবারের বাগান ফাঁদছে। তারা ভারতবর্ষীয় কুলি-মজুরদের নিয়ে চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য করছে দেখে আমরা রাগ করি; কুলি-মজুরদের পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল

তাদের সঙ্গে তুলনা করে ঐ-সকল দেশ-বাসীরা ভারতবাসীদের একটু হীন চোখে দেখে বলে' আমাদের অভিমান হয়। কিন্তু এ-কথা মনে হয় না, এরা মাতৃভূমি ছেড়ে গেল কেন? কেন এদের দু'মুঠো ভাত, দু'খানি কাপড় সুজলা সুফলা দেশে জুট্‌ল না? কিসের জন্য এরা ভিটে-মাটির মায়া কাটিয়ে বিদেশে কুলির লাঞ্ছনা সহ্য করে? মোটামুটি ধরতে গেলে আন্দাজ বিশ লক্ষ ভারতবাসী পেটের দায়ে দেশান্তরে বাস করছে; তাদের মধ্যে অধিকাংশই কুলি; কেউ দোকানদার—কেউ-বা একটু-আধটু বাণিজ্য করছে।

বিদেশে তারা কি অবস্থায় আছে ও সরকার-পক্ষ থেকে তাদের কল্যাণার্থ কি-চেষ্টা করা হয়েছে, তার বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তবে আগেকার চেয়ে তাদের অবস্থা এখন ঢের ভাল হ'য়েছে; কুলিদের দু'একটা দাবী কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শুনেছেন। এতকাল যে সর্ত্ত করে এদের আমদানি করা হতো সে-ব্যবস্থা এখন আর নেই। ভারতবর্ষীয় কুলিদের অবস্থা উন্নত করবার চেষ্টা করে গভর্ণমেণ্ট বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন; তা না হলে ফিজি, মরিসাস্, প্রভৃতি স্থানে আকের ক্ষেতে বা মালয়-রাজ্যে রবারের বাগিচায় খাটত কারা? চাষ-বাসের বৈজ্ঞানিক প্রণালী যতই প্রচলিত হোক্ না কেন, মানুষের হাত চাই-ই। আক, তুলা, চা, নীল, রবার, প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষি-জাত দ্রব্যের বড় কাটতি; কিন্তু ফসল উৎপন্ন করবার ব্যয়টা কম হওয়া চাই। তাই যাদের অল্প পয়সায় বেশী খাটানো যেতে পারে, তাদের না হলে আক, তুলা, চা, নীল, রবারের চাষে লাভ হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের প্রফে-সার মিঃ টড্ এইজন্যই এই সব ফসলের নামকরণ করেছেন "Blackman's crop" অর্থাৎ কালা আদ্‌মির পরিশ্রম-লব্ধ ফসল। যে কালা আদ্‌মি নিজের ভিটা-মাটি-ক্ষেত ছেড়ে গেছে, কৃষি-প্রধান দেশে জন্মেও নিজের ক্ষেতে ফসল তুলে যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারল না, সেই কালা আদ্‌মিই সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে পরের ক্ষেতে সোনা ফলিয়ে দিচ্চে। এমন কেন হয়,—আপনারা পল্লীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলুন দেখি। আমাদের দেশে কৃষি-মজুরেরা ভাল কাজ-কর্ম্ম করতে পারে না অনেকের মুখে এমন অভিযোগ শোনা যায়; অথচ এরাই দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে নেটাল উপনিবেশের উন্নতি-সাধনে সহায় হয়েছে! নেটালের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যার লীজ হুলেট এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বল্‌ছেন:—

"The condition of the colony before the importation of Indian labour was one of gloom, it was one that then and there threatened to extingnish the vitality of the country and it was only by the Government assisting the importation of labour that the country began at once to revive. The coast had been turned into one of the most prosperous parts of South Africa.

They could not find in the whole of the Cape and the Transval what could be found on the coast of Natal— 10,000 acres of land in one plot and in one crop—and that was entirely due to the importation of Indians. Durban was absolutely built up by the Indian population.

ভাবার্থ ঃ—ভারতবর্ষ থেকে শ্রমিক আমদানি করবার পূর্ব্বে উপনিবেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এমন সময় সরকার পক্ষ থেকে ভারতীয় শ্রমিক আন্‌বার উদ্যোগ হল বলেই উপনিবেশ যেন প্রাণ ফিরে পেল; আজ এদের পরিশ্রমেই নেটাল দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সব-চেয়ে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে; এক সঙ্গে ত্রিশহাজার বিঘে ভুঁইয়ে একই শস্য উৎপন্ন হচ্চে—এমন দৃষ্টান্ত সমস্ত দেশের কোথাও দেখা যায় না; এ-কাজ সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষীয় শ্রমিকদের পরিশ্রম-ফলে। ডারবান্ সহর এরাই গড়ে তুলেছে।

এই কারণেই ত বিচক্ষণ ধন-কুবেররা ভারতবর্ষ থেকে কৃষি-মজুর আমদানি করবার পাকা বন্দোবস্ত করতে এত উদ্‌গ্রীব! তারা লক্ষ্য করেছে যে আমাদের পল্লী-সমাজে ভাঙ্গন সুরু হয়েছে; ছোট ছোট জোতদারেরা দেন্'র দায়ে জমি হস্তান্তর করে দিয়ে এখন মজুর খাটে; গাঁয়ে এমন কোনো শিল্প নেই যার উপর নির্ভর করে একদল লোক খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে;

কিন্তু সে-সব মজুরদের কলের কাজ কিছু জানা দরকার। যারা ছেলে বেলা থেকে চাষ্‌বাস করছে, তাদের ও-কাজে মনও নেই। এমন অবস্থায় আড়কাঠিদের জালে এরা অনায়াসেই ধরা পড়ে। বিদেশে "রাম-রাজত্বে" বাস করবে, এমন সব মন-ভোলানো কথা শুনিয়ে উপনিবেশের বেতন-ভোগী আড়কাঠিরা তাদের কুলির দলে ভর্ত্তি করে নেয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আড়কাঠিদের আড়ৎ আছে। যে-যে প্রদেশে কৃষি ও কৃষিপল্লীর অবস্থা শোচনীয়, সেখান থেকেই বেশী লোক জোটে। ফিজি, মরিসাস্, বৃটিশ গুয়ানা প্রভৃতি দেশে প্রায় শতকরা ৭৪জন কুলি যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ থেকে,—সেইজন্যেই হয়ত সব-চেয়ে বড় আড়ৎ হচ্ছে কাশীধামে। মাদ্রাজ থেকে অধিকাংশ কুলি যায় বর্ম্মায় ও মালয় রাজ্যে; আর বোম্বাই থেকে যায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায়।

যখন কোনো দেশের জন-সংখ্যা এত বেড়ে ওঠে যে, দেশের মাটিতে বাস করে আর খোরাক জোটে না; অথবা যখন পল্লী-সমাজের ভিত্তি ভাঙতে থাকে তখন শ্রমিক জন-সংখ্যা দলে দলে স্বদেশ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালীতে আয়র্ল্যাণ্ডে, রুসিয়ায়, এমন কি ইংলণ্ডে এই উপসর্গ দেখা দিয়েছে; এ-সব দেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে যাত্রীরা আমেরিকায় যায়। কিন্তু তারা যায় স্বাধীন মানুষ স্বাধীন দেশে—কোনো বাধা-বাঁধন নেই, কোনো কঠিন আইন-কানুনের শাসন তাদের মানতে হয় না। আর ভারতবর্ষের

কিনারা থেকে যারা যায়, তারা যে বিধাতার অভিশপ্ত জাতি! তাই তাদের দাসখত দিতে হয়!

অনেকে মনে করেন, এরা দাসখত দিয়েও দেশের চেয়ে বিদেশে থাকে ভাল; এমন কি জীবিকা নির্ব্বাহ করে দু'পয়সা উদ্বৃত্ত রাখ্‌তে পারে। এর জবাব দিয়েছিলেন মহাত্মা গোখ্‌লে তাঁর সেই তেজস্বিনী ভাষাতে ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে দাঁড়িয়ে। তিনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন যে, যারা দেশে ফিরেছে, তাদের হাতে পাঁচ বছরের পুঁজি গড়ে দেড়শ' টাকার বেশী থাকে না; অর্থাৎ ত্রিশ টাকা বছরে; অথবা আড়াই টাকা মাসে!

যাই হোক্, উপনিবেশে ভারতীয় কুলিদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে বিদেশে গিয়ে তাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে না। প্রশ্ন এই, তবু কেন যায়? আর ফিরে এলেও তারা নিজের গাঁয়ে কেন থাকতে পারে না?

যে-সব কারণ আমাদের চোখে পড়ে তার গোটাকয়েক নাম করলেই এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী—এ-সব কারণ ত আছেই, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য আরো তলিয়ে আবিষ্কার করা দরকার। যারা রাজনীতি-বিশারদ অর্থাৎ যাদের বলি Statesmen, তারা এখনও ঠাওর করে উঠতে পারেননি যে কেমন করে গাঁয়ের লোকদের গাঁয়েই সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা যেতে পারে? সমস্যাটি যাদের চোখে পড়ে তারা কখন কখন হীনশ্রী পল্লীগুলো লক্ষ্য করে আক্ষেপ করেন; কখনও বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও য়ুনিয়নের পঞ্চায়ৎদের ডেকে উপদেশ দেন। সে উপদেশ অনেক স্থলেই বইয়ে-পড়া বাঁধি-বুলির আবৃত্তি মাত্র। পঞ্চায়েৎরা উপদেশের খুব তারিফ্ করলেও সরকার-পক্ষ থেকে বড় বেশী সায় পাওয়া যায় না; তার কারণ, এই-সব উপদেশের মধ্যে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্গত ব্যবস্থার উল্লেখ থাকে না। থাকবেই বা কেমন করে? আমাদের রাজনীতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-সমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার হিসাব ও খাঁটি খবর আমরা এখনও রাখিনে। যাঁরা একটু-আধটু রাখেন তাঁদের মধ্যে সমস্যার মীমাংসা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে; আর যারা ভুক্তভোগী তারা ত অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে যা হ'বার তাই হবে মনে করে বসে আছে!

এ-জন্য কাউকে দোষী করা যেতে পারে না। সব দেশেই পল্লী-সংস্কার-সমস্যাগুলো সবে-মাত্র দেখা দিয়েছে; পল্লীতে বসবাস করেও কোন্ ব্যবস্থার সাহায্যে বর্ত্তমান কালের সুযোগ ও সুবিধাগুলো পল্লীবাসীরা সম্ভোগ করতে পারে, এই নিয়ে বহু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। যে-জাতির চিন্তাশক্তি জাগ্রত, তারা কিন্তু বসে নেই! নগরার আকর্ষণ থেকে পল্লীকে রক্ষা করবার নানা উপায় তারা উদ্ভাবন করছে। মায়ের বুক থেকে ছেলেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে নগরের ইট-পাথরের আবেষ্টনে তাকে পিষে মারবার কল-কারখানা সৃষ্টি করেছে যে সভ্যতা, আজ তার গলদ চোখে পড়েছে। কবি তাই আক্ষেপ করে

বলেছেন, "There has been no fine civilization, no really well-organised system of rural society. Civilization has passed the farmer by."

ভাবার্থ এতকাল যে-সভ্যতা গড়ে উঠ্‌ল তাতে পল্লী-সমাজের বিশেষ স্থান নেই; তার সকল ব্যবস্থা সুচারুরূপে গঠিত হতে পারেনি। ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করে যারা অন্নের সংস্থান করে' দেয় তাদেরই এড়িয়ে চলা হয়েছে।

কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছে, তাদের না হলে সভ্যতার ভিদ্‌ পাকা হবে না। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এ-কথা যাঁরা বুঝেছিলেন, তাঁরা ভুল শোধরাবার নানা পথ নির্দ্দেশ করেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশেষ বদল করতে পারেননি,—ধনীদের প্রবল স্বার্থের প্রলোভন থেকে কৃষক ও শ্রমজীবিদেরও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাই ক্রমাগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, বিরোধের উত্তেজনা, পৃথিবী-জোড়া অশান্তি—তাই সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—তিনি বল্‌ছেন, "এবার ফিরাও মোরে।" ভোগ-ঐশ্বর্য্যের বিপুল পূজার আয়োজনেও তাঁর তৃপ্তি হলো না। যারা দেশের মাটি আশ্রয় করে জীবিকা অর্জ্জন করে, যারা সমস্ত দেশে অন্ন জোগায়, অন্নপূর্ণা দেবীর পাদ-পীঠ ত তাদেরি ঘরে; তার সঙ্গে সভ্যতার প্রকৃত মিলন না হলে কল্যাণ নেই! কেমন করে' এই মিলন সম্ভব, এই হচ্চে সব চেয়ে দুরূহ সমস্যা—পৃথিবীর সকল জাতিই আজ এই নিয়ে ভাব্‌ছে। আমাদেরও অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা মিটবে যদি আমরা পল্লী সমাজ এমন করে' গড়ে তুল্‌তে পারি যেখানে জীবন পুরোপুরি তার খোরাক্‌ পেতে পারবে, যেখানে মানুষের বিকাশ কোনোপ্রকারে বাধাগ্রস্ত হবে না!

বর্ত্তমান সভ্যতার জাঁক-জমকের আবেষ্টনে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত বিজ্ঞ বন্ধুরা বল্‌বেন, "কথাটা শুন্‌তে ভাল বটে, কিন্তু কৃষিপল্লীকে কি তেমন করে গড়া সম্ভব?" এর উত্তরে সুধু বল্‌তে হয়, "যদি তা সম্ভব না হয়, তবে দু-পাঁচটা আইনের ধারাতে কোনো বিশেষ ফল হবে না।" ঋণদান জমি-জমা ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত আইনের ত অভাব নেই—তাতে পল্লীর উন্নতি সাধন হচ্চে কই? কৃষকের দুর্গতি ঘুচ্‌ল কোথায়? জমির ফসলে তার সংসার চলেনা, গাঁয়ে এমন কোনো কাজ নেই যাতে তার আয়-বৃদ্ধির উপায় হতে পারে! তাই সহরের কল-কারখানার বাঁশী শুন্‌তে পেয়ে সে ছুটে যায়, চা-বাগিচার আড়কাঠির হাতে সে অনায়াসেই নিজেকে সঁপে দেয়, দাস-খত লিখে দিয়েও সে বিদেশে কুলির কাজ কর্‌তে রাজি হয়!

কেবলমাত্র আইন-কানুনের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা যে এই সমস্যার মীমাংসা হয় না, তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ও আয়র্ল্যাণ্ডে। বিশেষভাবে এই দু'টি দেশের খবর কিছু জানি বলেই তার কথা মনে পড়ল। সুধু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা কোনো দেশেরই পল্লী-সমস্যা যথাযথভাবে পূরণ হয়নি। কৃষিজীবিকে পশ্চিম দেশের রাষ্ট্রনীতি বহু প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তার কৃষি কর্ম্মে সাহায্যও করেছে কিন্তু তবু যুক্ত রাজ্যের নানাস্থানে দেখা যায়, কৃষিপল্লী কৃষকেরা ছেড়ে গেছে। আয়র্ল্যাণ্ডে প্রজাস্ব

সরকারীর আইন জাহির হল, জমিকে টুকরো টুকরো করে' ভাগ করা হল, তবু কৃষিপল্লীগুলো থেকে দলে দলে ছেলেমেয়ের পাল বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ত এখনও পল্লী-সংস্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়নি; অতএব আমাদের সমস্যা আরো জটিল। আশঙ্কা হয়, না জানি,কতকাল এই অবস্থায় কাটাতে হবে। আমরা নিঃশব্দে কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে এই নিয়ে আক্ষেপ করে বলে থাকি, সেকাল—সে কি ছিল! তখন চালের দর শস্তা ছিল, পল্লীর বাইরে কাউকে যেতে হতো না; সকলেই নিজের ভিটা বজায় রেখে দিন কাটাতে পারত! অতীতের অবস্থা কি ছিল বা কি ছিল না, তা নিয়ে আজ আমরা যতই আক্ষেপ করিনা কেন, সে অবস্থা ফিরে পাবার কোনই আশা নেই! আজ আমরা ইচ্ছা করলেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকতে পারবনা। বাইরের ধাক্কাতেই যদি পল্লীর ভিৎ ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে সে শক্তিকে শয়তানী শক্তি বলে' উপেক্ষা করলেই সব দুঃখ দূর হবে না। পৃথিবীর সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়ায় যদি আমাদের ক্ষতি হয়ে থাকে, সেজন্য দোষটা পৃথিবীর নয়; আমরা বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজেদের ঘর সাম্লাতে পারিনি বলেই এত দুঃখ!

প্রয়োজন হলেও সেকালে পল্লী ছেড়ে যাবার উপায় ছিল না। রাস্তা-ঘাট ছিল দুর্গম, আর পথ চলাতে আশঙ্কার কারণও ছিল প্রচুর। তারপর সম্ভবত দেশ-দেশান্তরে যাবার কিছু সুযোগ ঘটতেই শাস্ত্রের শাসন পথ রোধ করে বল্ল, "বিদেশে গেলে জাত যাবে।" এমনি করে পল্লী-সমাজ বাইরের টান ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল, আজও করছে, কিন্তু এ অসম্ভব। জল স্থল ও আকাশের পথ দিয়ে দিয়ে মানুষ ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করেছে, এখন চলাচল বন্ধ রাখা আর চলে না। পল্লী-সমাজের সীমার মধ্যে যখন পল্লীবাসীর জীবন স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাকে পথ দেখিয়ে সহরের মাঝখানে এনে কেল্‌বার আয়োজনের অভাব নেই, তাই আমাদের পল্লী ক্রমশঃ জনহীন হয়ে উঠ্‌চে।

সহরের কেন্দ্রে যে-সভ্যতা গড়ে উঠ্‌ল তার শক্তির মূল হচ্চে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজকরবার আয়োজন, ব্যূহ-বদ্ধতা—organisation. যারা এ-শক্তির সন্ধান পেলেনা বা পেয়েও ব্যবহার করলেনা তারাই পিছিয়ে পড়ল। পল্লীসমাজ un-organised, তার চাষ-বাস, কেনা-বেচা, শিল্প ইত্যাদি সকল ব্যবস্থাই এলো-মেলো; এই জন্যেই বাইরের ধাক্কা সাম্‌লানো গেলনা - যারা organised, তাদের হাতে একে-একে আমাদের পুঁজিটুকু পর্য্যন্ত তুলে দিতে হচ্চে।

এই সমস্যার মীমাংসা হতে পারে কেবলমাত্র orgainsation-এর দ্বারা। কেমন করে' এই কাজে হাত দিতে হবে, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাঢ়ের দুর্গোৎসব

২

আজ সপ্তমী পূজা—ব্রাহ্মণেরা পূজায় বসিলেন। মহেন্দ্র আজ ঠাকুর দালানে নাই। পাড়ার ছেলেরা, জামাতারা ও অন্যান্য কুটুম্বের ছেলেরা পূজার জায়গায় আছে। জন তিন-চার রমণী সপ্তমী পূজার নৈবেদ্য করিতেছেন। তাঁহারা প্রাতঃস্নান করিয়াছেন, পরিধানে পট্ট বস্ত্র, নাসিকায় তিলক, হরিনামের মালা গলায়। একখানা বড় গামলায় একজন কতকগুলা আতপ তণ্ডুল ধৌত করিতেছেন, দ্বিতীয়া একখানা বড় বঁটি লইয়া ফল কুচাইতেছেন। বাতাবি লেবু—খোসা ফেলিয়া যেমন আম ছাড়ানো হয়,—তদ্রূপ ফেলিয়া টুকরা করা হইল,—পেয়ারার খোসা ছাড়াইয়া শতেক কুচি করা হইল। খোসা-শুদ্ধ বড় পাকা শসা চক্রাকারে তিন ছে করা হইল। একখানা খুরিতে পাঁচ কলাই সাজানো হইল, আর একখানা খুরিতে একটু মিছরি, নারিকেল-কুঁচি, একটি মনেক্কাও একটু একটু ক্ষীর ছানা দেওয়া হইল। তৃতীয় রমণী বাদাম-আখরোট হাতে করিয়া বলিল, "এ আবার কি করে দেয়? যে শক্ত!"

প্রথমা চাল ধুইয়া বার্কোসে তুলিতে তুলিতে বলিল, "একটা ভেঙ্গে দেখ না, ভিতরে কি আছে?" তৃতীয়া একটা আখরোটে শাঁকের ঘা দিয়া বলিল, "ওলো হিমি, এ যে ভেঙ্গে গিয়ে খোলার ভেতর নেগে রইল—দূর, দূর—টেনে বেরুচ্চে না!"

দ্বিতীয়া বলিল, "কাজ কি বাপু! তুই অমনি দে, বল, মা দুগ্‌গা, ভেঙ্গে খেয়ো।"

কাজেও তাই হইল। একবার একটা আখরোট ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইল, আবার কে বাদাম ভাঙ্গিতে সাহস করে? সেই জন্য ও-সব অমনি দেওয়া হইল। বেদানার গোটা কতক দানা দেওয়া হইল, প্রত্যেক নৈবেদ্যে দুইটি করিয়া কলা দেওয়া হইল; একখানা বারকোসে তিনখানা করিয়া নৈবেদ্য হইল। দ্বিতীয়া বলিল, "মুগের ডাল ভিজুনো নেই।" তৃতীয়া বলিল, "না থাক্‌গে,—মুগের ডেলে বড় গন্ধ, উও আর দিতে হবে না—দে উওতে আকের ফালা দেয়, তা হইলেই হইব।" নৈবেদ্য প্রস্তুত হইল। নবাত মুণ্ডি তণ্ডুল স্তূপের উপর দিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধুর ছিটা দিল, পরে তিন জনে নৈবেদ্য বহিয়া দেবীর পার্শ্বে রক্ষা করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা! হেই মা দেখো মা, নিজগুণে খেয়ো মা, যেন অপরাধ নিয়োনা!"

আর এখানে কেন,—চল পাঠিকা, অন্দরে চল—রাঢ়ের ভোজ দেখিবে। তোমরা সহরে লোক, সহরে থাক, নিমন্ত্রণে যাও, লুচি-পোলাও খাও, রাঢ়ের ভোজ দেখ নাই, খাও নাই। খাও না খাও, একবার দেখিবে, চল।

দত্তদিগের বাটীর ভিতরে দুই দিকের রোয়াকে খান ১২।১৩ ঝুড়ি পড়িয়াছে—১২।১৩ জন রমণী তরকারী কুটিতেছে, আর পরস্পর গল্প করিতেছে। কতকগুলি লোকে গৃহীণের সুখ্যাতির ছলে তোষামোদ করিতেছে। আর কতকগুলা লোকে ঝগড়ার সূচনা তুলিতেছে—আর কেহ কেহ প্রাণ খুলিয়া পরনিন্দা করিতে

বসিয়াছে—কেহ বা নিজেরই বাহাদুরী করিতেছে—এমন সময় দিনতারিণী গোটা আষ্টেক ফুলকপি ও একটা নূতন ঝুড়ি করিয়া সের আড়াই নূতন আলু আনিয়া তথায় রাখিল। জগত্তারিণী এক ঝুড়ি কচু আনিয়া ঢালিয়া দিল। সেখানে কুমড়া, মোচা, গেঁড়ো, চাল্‌তা বিস্তর রহিয়াছে, আর উঠানের একপাশে বোঝা-বোঝা কচুর ডাঁটা আর গাড়ী-খানেক পুতিকা গাদা হইয়া রহিয়াছে। ত্রৈলোক্য তাড়াতাড়ি বঁটি লইয়া কপি কুটিতে গেল। হেমকুমারী বলিল, "কপি বানাতে জানো?"

ত্রৈলোক্য। কখনো কুটি নি—দেখি, পারি কি না।

—"ও বড্ড কুচি কুচি করে মোচার মত কুটতে হয়।"

ত্রৈলোক্য সভয়ে কহিল, "না বাপু, কাজ নাই—আবার খারাপ করে ফেলব। পার্ব্বো কি না পার্ব্বো, তার চেয়ে চাল্‌তা কুটিগে, যাই।"

ত্রৈলোক্য ফুলকপি রাখিয়া চাল্‌তা কুটিতে বসিলেন। পাঠিকা চল, একবার রন্ধন-শালায় যাই। কি রকম এদেশের রাঁধুনিরা রাঁধেন, তাহা একবার দেখিবে না? ঐ দেখ, জগত্তারিণী, মধ্যম গৃহিণী ও পাড়ার আট-দশজন রমণী রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত; এবং অনেকেই ভাবিতেছে, কপি রাঁধিবে কে?

জগ। জানিনা বাপু! শ্যাম ডুগ্‌গার যেমন কাণ্ড, বর্দ্ধমান হোতে কপি আনলি আর বর্দ্ধমান হোতে একজন বামুন আনলেই ত ভালো হত।

মোক্ষদা বলিল, "অত ভাবিস না,—আমি কপি রাঁধব।"

রাঁধুনীরা সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল বড় গিন্নি তথায় আসিয়া বলিল, "কি রান্না হলো, ঠাকুর্ঝি?"

জ। আখন ত কিছু সাঙ্গ হয় নাই, কতক কতক হচ্চে।

ব-গি। কি রান্না হবে?

জ। হবে? আঞ্চার ঝাল, ডিংলির ঝাল, পঁই চড়চড়ি, মোচার ঝাল, কপির ঝাল।

বড় গিন্নী বলিল, "কপির ঝাল ত হবে না,—ডুগ্‌গা যে বলছিল, কপি দে মাছ দে হবে। উও কি তোমরা রান্‌তে পারো? ডুগ্‌গার বন্ধু এয়েচে বর্দ্ধমান হতে, সেই রান্‌বে—তোমাদিকে কপি রান্‌তে হবে না।

যাই হোক, কপি রাঁধিতে হইবে না শুনিয়া রাঁধুনীরা নিশ্চিন্ত হইল ও সকলে একবাক্যে কহিল, "সেই ভাল।"

জগত্তারিণী বলিল, "কেন নিরিমিষ্যি দিকে এক কড়া হবেনা?"

বড় গৃহিণী বলিল, "তা হোক কেন্না, রাঁধুনীরা খাবে।"

মোক্ষদা বলিল, "না, না, আমরা কপি গিলতে নারি,—কেমন ধারা গন্ধ কয়।"

এমন সময় নিস্তারিণী আসিয়া বলিল, "জেঠিমা, দেগ্‌গা কুমড়োর খোলাগুলো মাছের আঁসগুলো সব লোকে নে গেল।"

বড় গিন্নী সক্রোধে বলিল, "তবে আর পঁই চড়চড়ি হবে কি দিয়ে? যে দিকে না যাব সেই দিকে সব যাবে!" বলিয়া চলিয়া গেল। চালায় যেখানে মুড়ি ভাজা হইয়াছিল, সেইখানে কতকগুলা পুরুষ মানুষে ভাত ও কলাইয়ের ডাল রাঁধিতেছে। খেজুর পাতার ও তাল পাতার চাটা পাতিয়া তাহার উপর ভাত

চালা হইয়াছে, তাহার সন্নিকটে বড় বড় মাটির গামলায় কলাইয়ের ডাল ঢালিয়াছে। উঠানে মণ দুই মাছ পড়িয়া রহিয়াছে; যে যুবকেরা ভাত-ডাল রাঁধিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে হাস্য-পরিহাস আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছে। দুইটি বাণ কাটা হইয়াছে, একটা বাণে ছয়টা করিয়া বড় বড় তোল হাঁড়ি চাপাইয়াছে,—বারোটা হাঁড়িতে ডাল ও ভাত হইতেছে—চারিজন বলবান পুরুষে কুড়ুল কাটারি লইয়া মাছ কুটিবার যোগাড় করিতেছে। বড়গিন্নী দ্রুত আসিয়া বলিল, "মাছ বানাচ্চে কে রে? আঁসগুলো সব লুটে নিয়ে গেল!"

শক্তি বলিল, "ছেলেরা মাছ ঘাঁটচে, তার কি বলব? তুমি বাড়ী যাও।"

বড় গিন্নী সগর্জ্জনে ফিরিলেন। কৃষাণেরা কচুগাছ বোঝা-বোঝা কাটিয়া আনিয়া জড় করিতে লাগিল। এদিকে পূজা শেষ হইয়া গেল—বাড়ীর বেটা ছেলেরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠিয়া গেলে বাড়ীর মেয়েরা ও কুটুম্বিনীরা যথাসাধ্য সাজ-পোষাকে শোভিত হইয়া মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল ও প্রত্যেকে দুই-এক পয়সা করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিল; পরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মুড়ি-মুড়কি ও নারিকেল নাড়ু লইয়া জল-যোগে বসিল।

বাড়ীর মধ্যে একটা ঘরে মুড়ির ভাণ্ডার ও অপর একটা ঘরে নারিকেল নাড়ু টানা মিঠাই ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আছে। এই সব ঘরে শঙ্করের স্ত্রী শ্যামের স্ত্রী ও দিনতারিণী ভাণ্ডারী আছেন। দিনতারিণী বড় কাজ-কর্ম্ম করেন না, ফাঁকি দিয়া এঘর ওঘর করিয়া বেড়ান। শম্ভু ও শঙ্করের শালী-শালাজ যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহবা রাঁধিতেছে, কেহবা উদ্‌যোগ করিয়া দিতেছে, কেহবা পরিবেষণ করিতেছে। সকলে মনে করিতেছে যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা হইয়া গেলেই ভাল,—যেন নিন্দা না হয়, যেন কিছু অপচয় না হয়! কর্ত্তীর শালি-শালাজ থাকিতে ভগ্নী আসিয়া গৃহিণীপনা করা আর সহরে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পল্লীগ্রামে এ প্রথা এখনও আছে। বাড়ীর ছেলে ও মেয়েদের শ্বশুরালয় হইতে যত কুটুম্বিনী আসিয়াছে, তাহারাও কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত আছে। সহরের কুটুম্বিনীদের কাজ-কর্ম্ম করিবার জন্য লোক ভাড়া করিয়া আনিতে হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে কুটুম্বিনী আসিলে আর কাজের লোকের ভাবনা থাকে না।

হরিপদ বলিল, "মা, আজ যে সব মাছ ধরা হয়েছে, ও-সব কি হবে?"

বড় গৃহিণী বলিল, "কপি দিয়ে কিছু হোক্ আর অম্বল হোক্।"

ভবতারিণী বলিল, "না, না, সবই অম্বলে হোক।"

হরিপদ হাসিয়া বলিল, "সে কি পিশিমা, সব অম্বল হবে কি? কাল যে চারমণ মাছের সব অম্বল হয়েছে! আজও দু'মণ মাছের সব অম্বল হবে? আবার ঐ গেঁড়ো চাল্‌তার বংশ নির্ব্বংশ হবে ত—কত টক্ চাই? তাই বর্দ্ধমান জেলার টক্ খাওয়ার চিরকেলে অখ্যাতি। হ্যাঁ পিসিমা, তাই কি তোমার বাবা আম কাঁঠালের গাছ কেটে লাগাও তেঁতুল বাগান করে গেছে?"

ভবতারিণী সক্রোধে বলিলেন, "হ্যা দেখ্ তুই টকের ব্যাখ্যি করিস্‌নে ত! টক্ আছে,

তাই পিথ্যিমির র্যাঁড়ে বেঁচে আছে। খাওয়ার সময় দেখিস্ আখুনি, আক্সের চেলের ভাত আর আক্ মালসা কলাইয়ের ডেলের ঝোল আবার আক সরা করে টক্—ইয়ে নইলে উওরা খায় কি দিয়ে ?"

বড়গিন্নি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন বলিলেন, "তাইত বটে—কপি সপি এনে আকটা যাচ্ছে-তাই যা হয় কর্‌গা বাপু।"

হরিপদ রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল। বড় গিন্নী বলিল, "আখনকার ছেলেদের কি রোখা মেজাজ হয়েছে, বাপু।"

মোক্ষদা মাথা নাড়িয়া বলিল, "উওর দোষ কি ? চাকরে কিনা—চাক্‌রি কল্লেই একটু মেজাজ গরম হবে—উও যে হতেই হবে।"

ভব। হা দেখ্ বউ, তুই রাগ করিস না—ছেলেরা হোতে কৈলিক্ পেথা সব উঠবে। পূজোয় কপি আমাদের কখন হয় নাই—তাই শুচ্ছের এনে হাজির কল্লে! তা হোক কেন্না বর্দ্ধমান হোতে উওদের বন্ধু এয়েচে কিনা, তাতেই কপি কচ্চে—তা করুক কেন্না! বামুনদিকেন বেশ চিঁড়ে খাওয়ানো হতো। এবার একটা বাব্ বাড়ালে, লুচি খাওয়াতে হবে—তা খাওয়া কেন্না মজা দেগ্‌গা—আমার কি!" ভব বকিয়া আপনিই থামিল।

সপ্তমীর পূজা হইয়া গেল। পুরোহিতেরা বলিলেন, "রামপদ, পাঁটা কই হে ?"

রামপদ বলিল, "তাইত, পাঁটাটা যে এইখানে বাঁধা ছিল—কোথা পালাল ?"

অভয় বলিল, "পাঁঠা কই ?"

এইরূপ সকলেই পাঁঠা কই পাঁঠা কই শব্দে মহা হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দিল। অনেকে পাঁঠা খুঁজিতে রাস্তায় বাহির হইল। নরেন্দ্র শম্ভু দত্তর তৃতীয় জামাতা,—মদ্য-পানে ভক্তিমান্ হইয়া একগাছা দড়ি লইয়া পাঁঠা খুঁজিতে বাহির হইল এবং পরক্ষণে একটা বড় কালো কুকুর বাঁধিয়া টানিতে টানিতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে পূজা-মণ্ডপে আসিয়া হাজির হইল।

মহা বিভ্রাট—শম্ভু ও শঙ্কর সভয়ে ছুটিয়া গিয়া পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সংবাদ দিল, "শিগ্গির যা—সর্ব্বনাশ হলো! নরেন মদ খেয়ে কি করছে, দেখ্।" যে যেখানে ছিল সকলে বহির্ব্বাটীতে গিয়া হাজির হইল। সকলেই একবাক্যে বলিতেছে, "নরেন, ছাড়ো, ছাড়ো—সব নষ্ট হলো! এখুনি সব ছুঁয়ে মাটী কর্ব্বে—ওটা পাঁঠা নয়, কুকুর—ছাড়ো।"

নরেন্দ্র মহাস্ফূর্ত্তিতে চীৎকার করিতেছে, কুকুরও ভয়ে কেঁউ কেঁউ করিয়া চীৎকার করিতেছে—লোক দেখিয়া আঁচড়াইতে কামড়াইতে যাইতেছে। কেহ ভয়ে কুকুরের নিকট যাইতে পারিতেছে না, পাছে কামড়াইয়া দেয়! নরেন কুকুরটাকে টানিয়া লইয়া প্রতিমার সম্মুখে গিয়া হাজির হইল। কুকুরটা যত লাফায় তত চীৎকার করে, আর নরেন জড়িত স্বরে বলে, "শালা,—ঘাস খেয়ে এত ভারী, ভাত খেলে আরও কত হতো! দেখিস্ বেটা, নৈবিদ্যি খাস্‌নে যেন!"

পুরোহিতেরা সভয়ে "গেল, গেল, ছুঁলে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কুকুরের চীৎকারে আরও পাড়ার গোটা দুই-তিন কুকুর জুটিয়া গেল ও চীৎকার আরম্ভ করিল। অধিকাংশ লোকেই হায়-হায় করিতে লাগিল।

পূজা-মণ্ডপে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। রামপদ বলিল, "নরেন, কর কি, কর-কি? ছেড়ে দাও। কুকুর নিয়ে সব নষ্ট কল্লে—আঁচড়ে-কামড়ে দেবে, নৈবিদ্যি ছড়াবে—ছেড়ে দাও।"

নরেন্দ্র। কুকুর কে বলে? যে বলে, সে নিজে কুকুর! পাঁঠা চিন্‌তে পার না? ও বেটা চালাক কত! ক্ষুর লুকিয়ে থাবা পরে বসে আছে,—তোমরা চিন্‌তে পারনি! আমি যেই চালাক ছেলে, তাই দেখেই ধরে ফেলেছি।

দুর্গা। ভাল মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে—কেড়ে নিতেও পাচ্চি না ত। ভয় করছে কাছে যেতেও। নরেন, শোনো, ও যে কেঁউ কেঁউ কচ্চে—কুকুর নয় ত কি ও?

নরেন্দ্র। আরে ভাই, কাবে পড়লে সব শালাই কেঁউ-কেঁউ করে, তা জানো?

দুর্গা। তুমি খুব বুদ্ধিমান, দাও, ছেড়ে দাও।

নরেন্দ্র। নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান, আমি পরের নাড়ী টিপে খাই—কুকুর সেজে আমায় এড়াবে? ঠিক ধরে ফেলেছি।

এদিকে কুকুর লাফালাফি করিতে করিতে দড়ি খুলিয়া পলাইল। নরেন কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই পা ছুটিয়া গিয়া হতাশ ভাবে কহিল, "যা বেটা, তোর মা যেই দুয়োর বন্ধ করেছিল, বেটা বড্ড বেঁচে গেছিস্।" ভয়ে কেহ কুকুরের কাছে যাইতে পারিতেছিল না—এইবার সকলে নরেনকে ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। নরেন্দ্র যাইবার সময় ভট্টাচার্য্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "হোলই না হয় কুকুর—ষষ্ঠীর দিন বচন ঝাড়ছিলে বাবা, মধু-অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—আজ পাঁঠা-অভাবে কুকুর দদ্যাৎ হয় না, বাবা? ওটাতে মালে বাড়তো কত—" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে সে বাড়ীর মধ্যে গেল।

নৈবেদ্য বিলি হইল। নাপিতেরা লইয়া ব্রাহ্মণ-বাড়ী দিতে গেল—ব্রাহ্মণেরা সকলেই আপত্তি করিয়া বলিলেন, "ও কুকুর-ছোঁয়া নৈবেদ্য, আমরা নেব না।"

অগত্যা নৈবেদ্য ফেরৎ আসিল। নৈবেদ্য ফেরৎ আসিল দেখিয়া কর্ত্তারা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ ত পরের কথা বরং অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, "সে কি কথা—নৈবিদ্যি ফিরিয়ে দিলে! বামুনদের এত-বড় আস্পর্দ্ধা করে হল? আমাদিকে তা হলে বামুনদের চাইনা? ধান্ বাড়ি (বাড়ি-ধার, ফর্দ্দ) কর্ত্তে আর আস্‌তে হবে না ত!"

গৃহিণীর তর্জ্জন-গর্জ্জন ক্রমশঃ প্রচার হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা যেই শুনিলেন যে ধান-বাড়ি পাওয়া যাইবে না, তখন তাঁহারা ভীত হইলেন; আর এক ভাবনায় চঞ্চল হইয়াও উঠিলেন—বোধ হয়, অষ্টমীর দিন লুচি ক'পাত পাওয়া যাইবে না—তখন সকল ব্রাহ্মণই গৃহিণীর প্রচণ্ড রোষানলের নিকট ভস্মীভূত হইবার ভয়ে কোন কথা উথাপন না করিয়া গোপনে হরিকে কেহ-বা দুর্গাকে ঘুষ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

এদিকে পাঁঠা না পাওয়া যাওয়ায় সকলে বিব্রত হইয়া পড়িল। অনেক খোঁজ করার পর জানা গেল যে বাগ্দী পাড়ায় যাহার বাটী হইতে পাঁঠা কেনা হইয়াছিল, পাঁঠাটি সুযোগ পাইয়া সেই মনিবের বাড়ীতেই পলাইয়াছিল।

যাই হোক, অপরাহ্নে বলি শেষ করিয়া পূজা সমাপন করা হইল এবং লোক-জন খাওয়াইবার জন্য সদর বাড়ীতে ভিতর বাড়ীতে থামারে ও যেখানে-সেখানে পাতা দেওয়া হইল—পাতার মধ্যে অধিকাংশ পদ্মপাতা, শালপাতা খুব কম। গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত স্বজাতি বিস্তর আসিল—জলপাত্র সকলেই নিজ নিজ বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে। এদেশে জল লইয়া প্রায়ই নিমন্ত্রণ খাইতে আসে। পাতা হইয়া গেলে সকলেই খাইতে বসিল। জন পনেরো লোক পরিবেষণ করিতে গেল—মাথায় বা কাঁকালে কেহ কেহ ভাতের ঝুড়ি লইয়া দুইটি সারের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল আর একজন সরা করিয়া ঝুড়ি হইতে ভাত দিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত ডাল ও তরকারি মাছ অম্ল প্রভৃতি পরিবেষণ হইল। রন্ধন ভাল হওয়ায় সকলেই তৃপ্তি পূর্ব্বক খাইতে লাগিল—পরে গুড় দেওয়া পরমান্ন আসিল। পরিবেষণ ও আহার চলিতে লাগিল। দুই শত ওঠে, একশত বসে—এরূপ করিয়া সেদিন দত্ত-বাড়ীতে প্রায় ছয়শত লোক খাইল। এই সকল ভোজে মিষ্টান্ন মোটেই নাই, কিন্তু সেজন্য কোন নিন্দাও নাই। খাইয়া সকলে বিশেষ পরিতোষ পাইয়া সানন্দ চিত্তে সুখ্যাতি করিতে করিতে তামাকের খোঁজ করিতে লাগিল; কেহই পাণের খোঁজ করিল না, পাণ হোক আর নাই হোক, তামাক পাইলেই হইল।

ভাই পাঠিকা, তুমি কি নিমন্ত্রণ খাওয়া দেখিয়া নিন্দা করিবে? আমি কিন্তু করিব না, কারণ কচু কুমড়ার ঘণ্ট ও কুমড়া-বড়ির টক্ আর কলাইয়ের ডালের ঝোল, মিষ্টান্নের মধ্যে পরমান্ন—ইহা লইয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় বলিয়া পল্লীগ্রামের লোকে সামান্যতেই ভোজ কাজ করিতে পারে। আর তোমাদের দেশের মত মিষ্টান্নের ও ব্যঞ্জনের প্রোগ্রাম ছাপাইতে হইলে গরিব বা সামান্য লোকে খাওয়ানো কথাটা ভুলিয়া গিয়া কেবল খাইতে ও নিন্দা করিতে শিখিবে—কারণ, যাহারা মধ্যে মধ্যে খাওয়ায়, তাহারা খাইয়া আসিয়া নিন্দা করে না, যাহারা কখনও খাওয়ায় না, জানে, কেবল খাইতেই হয়—তাহারাই নিন্দা করে, করিবেও চিরকাল। যাহার যেমন অবস্থা তাহার সেইরূপ আয়োজন করিয়া লোক খাওয়ানো উচিত। আর যাঁহারা বড়লোকের বাড়ী প্রোগ্রাম পড়িয়া খাইয়া আসেন, তাঁহাদের উচিত গরিবের বাড়ী শাক ডাল সুক্তো আহার করিয়া সমান সুখ্যাতি করা; নহিলে খাওয়ানো ব্যাপারটা ক্রমশ উঠিয়া যাইবে—নিন্দা হইবার ভয়ে সামান্য লোকে সাহস করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে না।

সপ্তমীর যজ্ঞ-আহারাদি শেষ হইতে সন্ধ্যা হইল। আবার আরতির সময় আসিল—রমণীরা সাজ-সজ্জা করিতে লাগিল, বাদ্যকরগণ নব-উৎসাহে স্বকার্য্য-সাধনে মন দিল। ধূপ ধুনাতে ঠাকুর দালান পুরিয়া উঠিল, রমণীগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া দালান নিরেট করিয়া ফেলিল। জগত্তারিণী ও ভবতারিণী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া চামর হস্তে দেবীর দুই পার্শ্বে দুই ভগিনী আসিয়া দাঁড়াইল—আরতি আরম্ভ হইল।

আজ অষ্টমী—বহির্ব্বাটীতে পূজার ও ভিতর বাটীতে লুচির আয়োজন হইতেছে।

কয়েকজন শূদ্রা স্নান করিয়া আসিয়া ময়দা মাখিতেছে। আজ বেশী লোক খাইবে না—কেবল একশত আন্দাজ পুরুষ মানুষ খাইবে, তাহাদেরই মত কুটনা বাটনা হইতেছে, চালায় দুইটা উনানে আগুন দেওয়া হইল। দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উনানে কটাহ বসাইয়া ঘৃত ঢালিয়া দিল। মহেন্দ্র লুচি বেলিতে লাগিল। একখানা কটাহে লুচি ভাজা হইতে লাগিল, আর-একখানায় লবণ-বিহীন কচু-কুমড়ার ঘণ্ট সিদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন লুচির গন্ধ বাহির হইল, অমনি গ্রামের ব্রাহ্মণ-পাড়ার ছেলে-মেয়ে তথায় আসিয়া আশ্রয় লইল। পাড়ায় আর ছেলে দেখিবার যো নাই! সব দত্ত বাড়ীর উনান-সালে হাজির, অথচ তাহাদের মাতা-পিতা বলিতে লাগিল, "আমার ছেলে তেমন নয়, লুচির কাছকে যাবে নাই।"

এদিকে লুচির গন্ধে আমোদিতা হরমণি ঠাকুরাণী তিনুমাসির নিকট সাবাস্ লইবার মানসে তিনু ঠাকুরাণীর নিকট গিয়া বলিল, "হাঁ তিনি মাসী, আজ মহা-অষ্টমী, মুড়ি ভিজিয়ে খেতে আছে কি? না রুটীই গড়ব?"

তিনু। ক্যানে? আজ দত্তবাড়ী বামুনদের মেয়ে-পুরুষদিকেন খেতে বলেচে যে।

হরমণি কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বটে! আমি ত জানিনা। কে জানে মা, আমি এ্যাত খোঁজ রাখি না, মরুক্‌গে লুচির লেগে কেবা কানচে!" বলিয়া মহা-আনন্দে বাটী ফিরিয়া বধূদিগকে এই শুভ সংবাদ দিল।

বেলা দুইপ্রহরের মধ্যে অষ্টমী পূজা শেষ হইল। ব্রাহ্মণদের ডাক পড়িল। পূজক ব্রাহ্মণ পূজা সারিয়া ব্রাহ্মণ ডাকিতে বাহির হইলেন। এদিকে পাতা প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণগণ তিন বৎসরের সাবালক পুত্র ও পঞ্চদশ বর্ষীয়া নাবালিকা কন্যা লইয়া আসিয়া পাতা জমকাইয়া বসিলেন। পরে সব পরিবেষণ হইতে লাগিল—লুচি, কুমড়ার ডালনা, আর নারিকেল নাড়ু—ইহাই ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হইল। ঐ উপকরণেই ব্রাহ্মণেরা তেরো-চৌদ্দ গণ্ডা লুচির গালে চড় মারিয়া উঠাইলেন।

ব্রাহ্মণদিগকে ভাল দ্রব্য কিছুই দেওয়া হয় নাই দেখিয়া হরিপদ পিশিমার নিকট যাইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ পিশিমা, এ কি ব্রাহ্মণ-খাওয়ানো গো! কৈ, ব্রাহ্মণদের মাছ, কপির তরকারি—কিছুই দেওয়া হয় নি! শুধু তো কুমড়োর ঘাঁট দেখছি।"

ভব। জানিনা, তোর মা কি কয়্‌তে দিয়েচে, দেখ্ গা।

হরিপদ তাহার মাতাকে ঐ কথা বলায় বড়গিন্নী বলিল, "হ্যাদে উতিই ভাণ্ডার উজোড় হ'ল—আবার মাছ? বকিস্ না।"

হরিপদ বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। সেদিন আর বড় কিছু হইল না।

নবমীর দিন সকাল করিয়া পূজা-হোম শেষ হইল। আজও তিনশতের বেশী লোক খাইবে। বেশ রান্না-বাটনা-কুটনা চলিতেছে। আজ বাড়ীর সকলেই বড় ব্যস্ত,—কারণ বাগ্দীরা ধরিয়াছে—আজ মশাইয়ের বাড়ী আমরা মনসার গান করব। গৃহিণীরা বারণ করিতেছেন যে মনসার গানে কাজ নাই; কিন্তু বাগ্দীরাও ছাড়িবেনা, আর বাড়ীর বউ ও মেয়েগুলাও ছাড়িবে না। যাই হোক, দিনটা

খাওয়া-দাওয়ার গোলমালে বেশ এক রকম কাটিয়া গেল। ভবতারিণী এখন হইতেই কান্না ধরিয়াছেন—মা কাল কইলুসে যাবেন! তাহার মনে সুখ নাই! আজ আরতির সময় যতক্ষণ চামর ব্যজন করিয়াছে, ততক্ষণই কাঁদিয়াছে, "আহা, মা আমার কইলুসে যাবেন!"

এদিকে যেমন আরতি শেষ হইল, অমনি উঠানে আসর পড়িল। শতরঞ্চের উপর ডুগি তবলা ও একখানা কাপড়ের পাড় জড়ান ভাঙ্গা বেহালা লইয়া কাল কাল ঝাঁকড়া চুল-ওয়ালা গোটাকতক লোক বেসুরা বেতালা বাজাইতে লাগাইল। পরে তাহার মধ্য হইতে দুইজন লোক উঠিয়া পাছা পেড়ে কাপড় পরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল ও গান ধরিল—

"বিপদ-বারণ
তুমি নারায়ণ,—
লোকে বলে ক্যানে করুণা-নিধান!"

শ্রোতারা "হো-হো" শব্দে হাসিয়া উঠিল। যাই হোক, নাচিয়েরা থেলো হইল না—খুব নৃত্য-গীত লাগাইয়া দিল। কতক লোক দেখিতে লাগিল, কতক বা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। নরেন্দ্র ছুটিয়া গিয়া যাহারা উঠিয়াছিল তাহাদের পথ আটকাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কে উঠে যাচ্চিস্ রে?"

পলাতকদের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "এঁজ্ঞে বাড়ী যাচ্চি মশাই—কদিন আত জেগে শড়ীলটা দাবা হয়েছে সড়দী কড়েছে, আর গান ভাল লাগচে না।"

নরেন্দ্র। হুঁ, এখন অনেক ব্যায়রাম হবে! কেন, তুই আমাদের বাড়ী খাসনি?

—"এজ্ঞে, পেসাদ পেয়েচি বই কি!"

নরেন্দ্র। তবে উঠে পালাচ্চিস্—চালাকি না কি? চল্, গান শুন্‌বি, চল্, খাবার সময় অর্থাৎ বোঝাই নেবার সময় শড়ীল দাবা (দাবা-ভারি) হয়নি? তখন বুঝি হালকা হয়েছিল,—এখন বসে বসে গান শুনে উপকার করবে, তাই ভারী হচ্চ!

নরেন লোকগুলাকে লইয়া মাতলামি আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে নাচের গান শেষ করিয়া একজন বেহালা রাখিয়া উঠিল এবং দর্শকদের দিকে চাহিয়া কহিল, "কোথায় হে লিগে!"

দোয়ারগণের মধ্যে একজন চীৎকার করিল, "এঁজ্ঞে হুজুর।"

বেহালা-বাদক। বেউলার কোন্দে চাপনা লায়ে।

দোয়ার। এঁজ্ঞে এই যে চল্লাম।—বলিয়া সে বসিয়া পড়িল। অমনি একখানা গান আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পাতালব্যাপী বড় বড় হাঁ করিয়া একের পর এক করিয়া দুই-এক জন লোক রাগ-রাগিণীটাও সারিয়া লইল এবং দলের সকল লোকে এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া হা-হা-হা-হা করিয়া গান শেষ করিল, পরে বেহালা-বাদক স্কন্ধের বেহালা নামাইয়া আবার হাঁকিল, "কোথায় হে কালিলাগ!"

দোয়ার। হাঁ, হাঁ।

বেহালা-বাদক। লকিন্দরকে ডংসে দিয়ে এসো গে।

দোয়ার। এঁজ্ঞে চল্লাম।

তখন একজন দৈবক সাজিয়া গান ধরিল, "এক মাস্ দুইমাস তিন মাস হইল, দৈবক চলিয়ে যায়।"

রামপদ বাধা দিয়া কহিল, "হ্যাঁরে ও গান যে নকিন্দরের জন্মাবার আগেকার।"

বে—বা। এঁজ্ঞে, তাই বটে। তবে কি ওটা আমড়া অগ্‌গেড়ে গীদ ধড়্‌তে ভুলে ছেনাম।

রামপদ কহিল, "যা, আর গান করতে হবে না—খুব গেয়েছিস্‌! রাত জেগে আর বসেও পারা যায় না,—তোরাও বাড়ী যা—আমরা একটু শুই।

বে—বা। এঁজ্ঞে, আমরা আর একটু খেলা দেখাব।

"খুব খেলেছিস্‌,—আর খেলেনা—যা" বলিয়া রামপদ বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেল। অগত্যা খেলা দেখাইবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া দলকে উঠিতে হইল। সকলে ঠাকুর প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

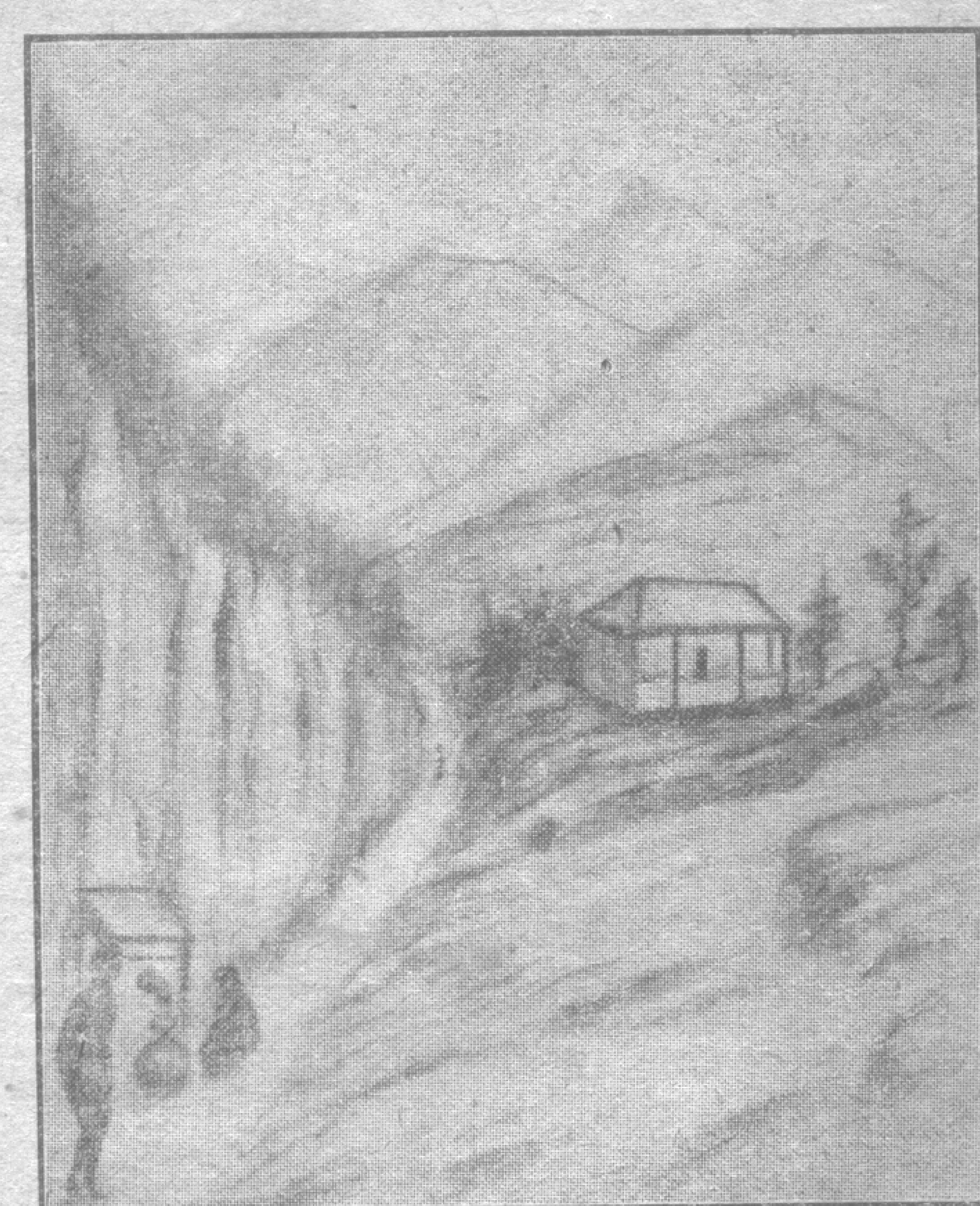
শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

লছমন ঝোলা

২

কতকদূর উঠিয়া একটি চটি দেখিলাম, সেখানে একটু দুধ পাওয়া গেল। অতি চমৎকার দুধ—যেন অমৃতের ধারা! হায়রে কলিকাতার সাদা জল! কোন রকমে রঙ রাখা, তবু তুই টাকায় দুই সের! দুধই বলুন আর অমৃতই বলুন, তাই পান করিয়া লুপ্তশক্তি ফিরিয়া পাইলাম। বসিয়া পড়িলে চলিবে না, পথ অনন্ত! আবার চড়াই ঠেলিতে লাগিলাম। সে তেমনই চড়াই; মাঝে মাঝে মোড় ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। একটি বাঁকের কাছাকাছি আসিলেই মনে হয়, আর চড়াই নাই, ইহার পর বরাবর সরল সমতল রাস্তা পাইব! কিন্তু এ কি! মোড় ফিরিয়া দেখি, দূরে অতি উচ্চে আকাশের কোলে গগন-লগ্ন পর্ব্বতের গায় একটি অতি সূক্ষ্ম রেখা—আমাদের গন্তব্য পথ। "জয় বদ্রীবিশাল-কি জয়!" দাও প্রভু, শক্তি দাও, নহিলে ত আর পারি না। প্রভুর কি দয়া—নবীন উৎসাহে প্রাণ ভরিয়া গেল। আবার চলিতে লাগিলাম।

এত ক্লান্তিতেও কি একটা সুখের আভাষ পাইয়াছি, এত কষ্টের মাঝেও কি এক মহিমা দেখিয়াছি! এই পর্ব্বত-মালার স্তরে স্তরে কার অনন্ত রূপরাশির মধুর লীলা-লহরে অবলোকন করিয়াছি! তাই সকল কষ্ট ভুলিয়া বিপুল রূপোচ্ছ্বাসের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছি। নতুবা এই কঠিন কর্কশ পর্ব্বত-গাত্রে বিচরণের উৎসাহ পাই কোথা হইতে! ক্লান্ত নিথর চরণে কে শক্তি আনিয়া দেয়? কে প্রাণ ভুলাইয়া দেয়? কে মন মজাইয়া দেয়? কি জানি, কি রূপের রাশি, কি মধুর হাসি আলোর তরঙ্গের মত দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে! চোখ ফিরাইব কি? চোখ যে ইহার অণুতে অণুতে লাগিয়া গিয়াছে! এই দিগ্‌দিগন্ত, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ছাওয়া বিপুল মাধুরীর মাঝখানে মানুষকে নিশ্চল পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়! এই



পি, ডবলুই, ডি'র ইন্‌স্পেক্‌সন বাঙ্গালা
বিনা খরচায় কলের জল ; ঝরণার মুখে লোহার নল লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লগ্ন মাধুরীর মাঝখানে আপনার যা-কিছু সবই হারাইয়া যায়!

এইরূপে চলিতে চলিতে একটি চটি পাইলাম, নাম বড় বিজলি। বোধ হয়, যে পাহাড়ের উপর চটিটি অবস্থিত, তার নাম "বিজলি পাহাড়", এই কারণে চটিরও নাম হইয়াছে বিজলি চটি। চটিটি মৌনা চটির তিন মাইল উপরে। যখন পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় আটটা কি সাড়ে আট্‌টা হইবে। চটিটিতে নানা রকমের জিনিষ আছে, দুই-এক রকমের মিষ্টান্নও দেখিলাম। একটি পাত্রে রাশীকৃত মটর ভাজাও রহিয়াছে। খুব একটা বড় কড়ায়ে দোকানের এক পাশে দুধ গরম হইতেছিল ; একটু একটু দুধ ও মিষ্টান্ন খাইলাম। চটিটি মন্দ নয়, যাত্রীদের অবস্থানের পক্ষে অনেকটা সুবিধা-জনক। গঙ্গার জল সেখানে পাওয়া যায় না, গঙ্গা অনেক নীচে। ঝরণার জলই

যাত্রীদের সম্বল। ঝরণার সঙ্গে যোগ করিয়া 'পাইপ' লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেই পাইপের মুখ দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে। সেখানে দুই-এক ঘর পাহাড়ী লোকের বাস আছে। তাহারা চাষ-বাস করিয়া থাকে।

আবার চলিতে লাগিলাম। চড়াই তেমনই আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। গঙ্গা আর দেখা যায় না বলিলেই হয়। চারিদিক ধোঁয়ার মত। সকল দিক যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার শিখর-বাহী পথ পর্য্যটন-কালে যে অভিনব সৌন্দর্য্যরাশি নয়ন-পথে পতিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত, শুধুই ভাবগম্য! যে কখনও দেখে নাই তাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব! দূরে অতি নিম্নে নীরব প্রবাহিনী ক্ষীণ সূত্রাকারে বহিয়া চলিয়াছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল, মহাকবির সেই ছন্দোময়ী বাণী—

"ক্বচিৎপথা সঞ্চরতাং ঘনানাং ক্বচিৎ খগানাম্।"

বার বার বিধাতার সৃষ্টি-কুশলতার তারিফ্ করিতে লাগিলাম।

চারিদিকেই দেখি, একটির পর একটি অনন্ত পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে দূরে অতি দূরে আকাশের গাঢ় নীলিমার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে আরও উঠিতে লাগিলাম; মনে হইতে লাগিল, বুঝি, স্বর্গের পথে চলিয়াছি! এই রকমে কিছুদূর গিয়া এমন একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়াইলাম যে খানে সমগ্র পর্ব্বত-মালা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ইহার পরই পশ্চাতের পর্ব্বতরাজি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মহা বিভাগ-স্থলে একটি ক্ষুদ্র কুটীর দেখিলাম। কালী কম্লীওয়ালার বিশ্ব-করুণার (humanity) বিমল নিশান শিরে ধরিয়া এই কুটীর দাঁড়াইয়া আছে। এই কুটীর-দ্বারে পিপাসাতুর পথশ্রান্ত পথিকের জন্য অজস্র অমৃত-বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। এই করুণাবারি মহাত্মার শুভ্র যশোরাশির ন্যায় চির-নির্ম্মল। সোনায় সোহাগা, এখানে একটু দুধও মিলিল।

এস্থলে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, সকল কথাই বলিতে বসিয়াছি, একটি মহত্ত্বের কথা, একটি আদর্শ হৃদয়ের কথা কেন না বলিব? জলদাতাকে দুই-একটি পয়সা দিতে গেলাম; সে লইতে চাহিল না, নমস্কার করিয়া বলিল, "মাপ করিবেন। বাবার কীর্ত্তি কলুষিত করিব না। ভাইকে জল দিতেছি, পয়সা লইব কি—?" ধন্য হৃদয়! অগণিত বাহিনীর অধিনায়ক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার জগৎকে ভীত ত্রস্ত করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়া ছিলেন; সিজার, অগষ্টাস্, জারেক্সেস্ প্রভৃতি মহাপুরুষের কীর্ত্তি-গাথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে! সে কীর্ত্তির ফল কি? অহঙ্কার, লোকক্ষয়! তাহাকে কি humanity বলিতে পারেন? এই জল-হীন অরণ্যপথে মানবের জন্য অশ্রুত্যাগ, সর্ব্বস্বত্যাগ, আড়ম্বর-বিহীন করুণা-কীর্ত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই, ইহা আর্ত্তজনের অন্তরে অন্তরে অমৃত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে!

ধীরে ধীরে কুটীরটি পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতে লাগিলাম।

চলিয়াছি, তেমনই চলিয়াছি, মন হারাইয়া, বিচার হারাইয়া, দর্প-অহঙ্কার সব চূর্ণ করিয়া দিয়া—তেমনই চলিয়াছি। চারিদিক নীলিমায়

আচ্ছন্ন, মেঘের কোলে মেঘ জমাট বাঁধিয়া নীচের পর্ব্বতের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত কোন্ দিগন্তের কোলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে। গঙ্গার দূর নীরব ক্ষীণ ধারাটি এক একবার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে।

বিজলি হইতে আরও তিন মাইল চড়াই উঠিয়া প্রায় দশটার সময় কুণ্ডা চটিতে পৌঁছিলাম। চটিটি রাস্তার একটু নীচে; একটি 'কুণ্ডার' জলই যাত্রীদের সম্বল। সামনেই রাস্তার উপর সাধুত্তম কালী কম্লী-ওয়ালার অমৃতময় করুণা-নিঝ'র পিপাসিতের পিপাসা দূর করিতেছে। ধন্য মহাপুরুষ! তুমি দেবতার হৃদয় লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলে! আজ তোমার করুণা উৎস শত শত যাত্রীর জীবন রক্ষা করিতেছে!

এই চটিতে আসিয়া শুনিলাম, ইহার পর বরাবর উতরাই। এই সংবাদে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, প্রাণের বোঝা অনেকটা নামিয়া গেল। ইচ্ছা ছিল, এই চটিতেই থাকি, কিন্তু চটিওয়ালার মধুর ব্যবহারে এত কষ্টেও তখনই সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। ইণ্ডো পোঁ আর অগ্রসর হইতে রাজি নয়। ভদ্র লোক ভয় পাইয়াছে। একে ত রাস্তার ঐ অবস্থা, তার উপর তাহার সঙ্গে একটি ছোট বাক্স; নিজেকে সামলাইতেই প্রাণের বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, তার উপর বাক্স বহা! তাহার কষ্ট দেখিয়া মাঝে মাঝে অনেক সময় তাহার হাতের বাক্সটি নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছি। ইণ্ডোপোঁ কিছুতেই আর যাইবে না,—আমাদেরও ইচ্ছা নয়, তাহাকে ছাড়িয়া যাই! কিন্তু কি করি? চটিওয়ালা যে মন চটাইয়া দিয়াছে। আমাদের দোষ অতি সামান্যই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ গো বাবু, রান্না-বাড়া হবে কি করে? জল কোথা?" চটিওয়ালা মহাপুরুষ অমনই গরম হইয়া উত্তর করিলেন—"দেখ্‌তা নেই, আঁখ কি নেহি হৈ?" মনে মনেই করিলাম, "ধন্য বাবা তোমার মধুর ভাষা, হাতে একটা লাঠি নিয়ে খাড়া থেকো, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে দু'-এক ঘা বসিয়ে দিও।" প্রকাশ্যে বলিলাম, বাপজান, বোধ হয় তোমার দোকানে চিনিও নাই। মিষ্টির সঙ্গে যে তোমার জন্মেও আলাপ নাই, তা তোমার মধুমাখা কথাতেই বুঝিয়াছি।"

অনুমান সত্য, চিনি জুটিল না—আর এক অঞ্জলি—বাবা কম্লীওয়ালার দান—অমৃত-বারি পান করিলাম। দেবলোকের অমৃত অপেক্ষাও মধুর আর একটা জিনিষও অদৃষ্টে জুটিয়া গেল। কাণ্ডীওয়ালারা তামাক খাইতেছিল, তাহারা আমাকেও এক কলিকা সাজিয়া দিল।

তিন মাইল নীচে বন্দর চটি। পা আর চলিতেছে না, বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছি। তবুও সে কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজি হইলাম, চটিওয়ালার কথাটা বড়ই প্রাণে লাগিয়াছিল। সমস্ত পথই উতরাই—নামিতে তত কষ্ট হইবে না। নামিবার সময় তত কষ্ট হয় না; নামিতে নামিতে মনে হয়, কে যেন পিছু হইতে ঠেলা দিতেছে, কে যেন সামনের দিক্ হইতে জোরে আকর্ষণ করিতেছে! এমনই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ! উঠিবার সময় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেই আত্মাপুরুষ কাঁপিয়া উঠে, নামিবার সময় নীচের

দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। বাঙ্গালার সমতল সুমার্জ্জিত পথগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বাঙ্গালার পথে ঘাটে তার শ্যামল শস্যে-ভরা মাঠে কি এক বৈচিত্র্য আছে, কি এক প্রাণ-স্পর্শী স্পন্দন আছে—অভাবের সময় তাহা বেশ বুঝিতে পারি! তার কোলে শুইয়া যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তার বুকের উপর যখন ছুটাছুটি করি, তখন সেই আনন্দ-স্পন্দনটুকু বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

দুইটির অবশ্য তুলনা করা যায় না, দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন ভাবের; আপন আপন ঐশ্বর্য্য লইয়া অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখিয়া মানুষের মন লইয়া অনাদিকাল হইতে টানাটানি করিতেছে। শৈলমালার এই সুন্দর বিশাল বিরাট নগ্ন মূর্ত্তিটি শীর্ষে তার বিজয়-উষ্ণীষ ধারণ করিয়া আধিপত্যের গরিমায় দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে! 'দিগন্তের' যাত্রী আজ স্বপ্নোত্থিতের মত শৈলরাজের চরণে বিস্ময়ে আনত!

ভুলিয়া যাইতেছি, 'কি বলিব' ভুলিয়া যাইতেছি। কত ঊর্দ্ধে বসিয়া আজ আমরা কয়টি প্রাণী,—পাগল হাওয়ায় সৌন্দর্য্যের লহর চারিদিকে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। ক্ষুধায় পিপাসায় মন চন্ চন্ করিতেছে, তবু যেন কোথাকার কি "মোহের স্বপন" আসিয়া অবাক মনটিকে ঘুম পাড়াইয়া দিতেছে, সমস্ত শরীর ছাইয়া কি এক সুখের ঢেউ ছুটাইয়া দিতেছে!

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালার দুইটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল, আবার আজ এখানেও দেখা হইল। আবার বাঙ্গালার স্নেহ, পাহাড়ের কোলে বসিয়া আবার বাঙ্গালার সেই মধুমাখা স্বর

"কি বাবা এসেছ? এই তোমাদের কথাই হচ্ছিল।"

বলিলাম, "হ্যাঁ মা এসেছি। আপনারা ভাল আছেন?"

—"হ্যাঁ বাবা! বাপ মা কেমন করে তোদের ছেড়ে দিলেরে? নিশ্চয়ই বাবা, তোমরা লুকিয়ে এসেছ। নইলে কি আর আসতে দিত? কোথায় বাবা বুড়ো বয়সে বাপ-মাকে তীর্থ করাবে, না, নিজেরাই এসেছ! কেন এমন করলে বাবা?"

—"না মা, তাঁদের মত নিয়েই এসেছি।"

—"না বাবা, কথাটা ভাল লাগছে না বল্লে কি আর ছেড়ে দিতোরে বাবা! মাকে না পাঠিয়ে নিজেরা এলি বাপ? না জানি, বুড়ো বাপ-মা কত ভাবছে।"

"আসি মা।" বলিয়া রওনা হইলাম। তবু সেই মধুর স্বর মাতৃস্নেহের মত সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল—"খুব সাবধানে যেও বাবা।"

একটু দাঁড়াইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মা।"

মনটা এক টলিয়া গেল। এই স্নেহটুকু আজ এখানে নিতান্ত দুর্লভ। তাই মন গলিয়া গেল। চলিয়াছি, তখনও তাঁদের কথা শুনিতে পাইলাম—তাঁহারা বলিতেছেন, "কিছুতেই না, লুকিয়ে চলে এসেছে।"

উতরাই সুরু হইল; নামিয়াই চলিয়াছি, নামিয়াই চলিয়াছি। পাহাড়ের পর পাহাড়, ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছি, বায়স্কোপের মত এক একটি ছবি চোখের সামনে আসিতেছে আবার সরিয়া যাইতেছে। ঐ আবার "ভুবন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো" আর একটি রূপ লইয়া চোখের



পর্ব্বত উপত্যকায় চটি

সামনে ভাসিয়া উঠিল ও সকল কষ্ট ভুলাইয়া দিল। এ কি সৃষ্টি! সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার! প্রত্যেকটি সুন্দর, প্রত্যেকটি নূতন! বিস্ময়ের কি আর সীমা থাকে!

বিহ্বল চিত্তে চলিয়াছি, আপনা ভুলিয়া চলিয়াছি। কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; দৃষ্টি নীচের দিকে। দূরে, অতি-দূরে গঙ্গার কূলে কূলে সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিতেছে! একটা কি "মোলায়েম" আবরণ প্রকৃতির অঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, একটা কি নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে! পথ তেমনই ঘুরিয়া ফিরিয়া নামিয়া গিয়াছে। আমরাও নামিতেছি। হু হু শব্দে নামিতেছি, সঙ্গীরা সব পিছনে পড়িয়াছে, তবুও আর পথ শেষ হইতে চায় না। নামিতে নামিতে একটি বাঁকের মাথায় আসিয়া পড়িলাম, সেখানে একটি কুটীর, কালী কম্লীওয়ালার জলসত্র। উদর পুরিয়া জল খাইলাম। গঙ্গা সেখান হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; চটিটিও দেখা যাইতেছে, ক্ষীণকায় গঙ্গা-তটে একটি নীরব চিত্রের মত!

জল-পানান্তে কুটীরের সামনে বসিয়া বসিয়া দেখিতে পাইলাম, কলসী মাথায় একটি লোক ধীরে ধীরে চড়াই ঠেলিয়া উঠিতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকটি এক মাইল পথ নীচে হইতে গঙ্গার জল লইয়া আসিতেছে। পথিকের পিপাসার জন্য এতটা কষ্ট বেচারা মাথা পাতিয়া লইয়াছে।

প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বন্দরঘাটে পৌঁছিলাম। চটিটি গঙ্গার উপরেই; অত্যধিক যাত্রীর সংখ্যা, পাঁচ-সাতখানি চালা ঘর, সবগুলিই যাত্রীতে ভরিয়া গিয়াছে। কেহ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেছে, কেহ-বা গাছের তলায় বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছে।

বহুকষ্টে একটু বিশ্রামের স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

বিশ্রাম করিব কি, পেটের ভিতর অগ্নিদেব জ্বলিয়া উঠিয়াছেন! খাইবার চেষ্টায় মন দিতে হইল। প্রথমেই সেই চটির চিনি আর সেই গঙ্গার জল (এ যেন গুরুচণ্ডালে যোগ) মিশাইয়া ঢালাঢালি করিয়া দুইজনে দুই ঘটি সরবৎ খাইলাম। স্বামীজির আশ্রমে একটা বেল গাছে প্রচুর বেল ধরিয়াছিল; আশ্রমে অবস্থিতি-কালে নিত্যই সেই বেলের অমৃতময় সরবত পান করিতাম, চটিওয়ালার ভেজাল চিনির নিঃস্বাদ সরবৎ পান করিতে করিতে স্বামীজির সেই বেলের সরবৎ মনে পড়িল, চোখের পাতাও অমনি একটু ভিজিয়া আসিল।

তারপর ঠাঁই করিয়া আহারের ব্যবস্থা। রাঁধিলাম খিচুড়ী, বড় চমৎকার! অন্নপূর্ণার নাম লইয়া রাঁধিতে বসিলে বোধ হয় নুনটাও কম হইত না! কোন রকমে ত খাইলাম। তারপর শয়ন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' দলে দলে মক্ষিকা-সেনা অনাবৃত স্থানসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিল, বহু চেষ্টাতেও ঘুমাইতে পারিলাম না। গুরুজী আপাদ-মস্তক রেশমি চাদরে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন; অবিলম্বেই তাঁর নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইলাম; গুরুজীর এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, স্নানান্তে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। মুখে ঢাকা দিয়া শোওয়া আমার কখনও অভ্যাস নাই, ঘুম হইল না; গঙ্গার গুরুগম্ভীর ঐক্যতানে মন মিলাইয়া দিয়া কোন্ সুদূর রাজ্যে চলিয়া গেলাম!

আর একদিনের একটা কথা বলিতেছি, একটা নেঙটা মানুষ শুইয়া আছে, তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরটা মাছিতে ঢাকা,—ঘাট চটি পার হইয়া একটা ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর লোকটাকে দেখিয়াছিলাম। সে যেন একটা মাছির মানুষ! অদ্ভুত তার ধৈর্য্য, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, নড়েও না চড়েও না, মড়ার মত চুপচাপ পড়িয়া আছে!

বেলা পাঁচটার সময় বন্দর চটি ছাড়িয়া রওনা হইলাম। এইখানে আর একটি নূতন কাণ্ডিওয়ালা জুটিল। মৌনা চটির ছোঁড়াটা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। এটিও ঠিক কাণ্ডিওয়ালা নয়, ইস্কুলের ছাত্রের মত একটি ফুটফুটে ছোক্‌রা; আমাদের সঙ্গে সেই তিনটি বাঙ্গালীবাবু। নানারূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে, গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়াছি। গঙ্গার কূলে কূলে রূপের হাট বসিয়া গিয়াছে। প্রবাহিনীর অনন্তরূপময়ী মনোহারিণী স্নিগ্ধ শ্রী প্রাণের ভিতর অবিরাম আনন্দ স্পন্দন আনিয়া দিতেছে; শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে। কথা বলিব, এমন শক্তিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; প্রাণের ভিতর বিদ্যুতের চমক ছুটিতেছে। আমার নেত্রযুগ অশ্রুসিক্ত হইল,—এই বিপুল উচ্ছ্বাসময় সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে কাহার যেন ভুবন-ভরা রূপের শান্ত আলোক জাগিয়া উঠিল। রাস্তার এক পার্শ্বে কর্কশ নিবৃন্তপাদপ এক মহাকায় পর্ব্বত—সেদিকে চাহিলেই প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত খাঁ খাঁ করিতে থাকে, বামে স্নিগ্ধ চারু তরুমণ্ডিত স্বচ্ছ তটময়ী গঙ্গা শিলা-সঙ্কুল গিরিমূল ধৌত করিয়া ছল-ছল কল-কল স্বরে বহিয়া চলিয়াছে,—দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? হৃদয়-তন্ত্রীগুলি ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া ছিঁড়িয়া পড়ে! চেতন-হারা দর্শক

আপনার সংচ্ছিন্ন অস্তিত্বটুকু প্রকৃতির মহা-ভাবময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে হারাইয়া ফেলে!

আবার চড়াই—উন্মুক্ত রৌদ্রের তাপে সমস্ত শরীর পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর চড়াই। গুরুজীকে লইয়াই বেশী বিপদ। সেদিন তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। সোজা পথে তিনি বেশ চলিতে পারেন, তখন তাঁহাকে পায় কে?

অনেকটা চড়াই,—ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কোন রকমে ত উঠিলাম। তখন পিপাসায় সকলেই কাতর হইয়া পড়িয়াছি। পথের ধারে একটা ঝরণাও ছিলনা যে সেই জল পান করিয়া পিপাসার শান্তি করি। চড়াইএর উপর একখানি গৃহ দেখিলাম। সেখানে একটু জল চাহিলাম, তখনই গৃহস্বামী অতি যত্নে আমাদের জল দিলেন; ইহা কালী কম্লীওয়ালার মৃত সঞ্জীবনী। রাস্তার ধারে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া আছি, এমন সময়ে বালকের কণ্ঠধ্বনি আমাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" "নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্" এই গান গাহিতে গাহিতে বালক আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটু পূর্ব্বে পিপাসায় কণ্ঠাগত-প্রাণ, কঠিন কর্কশ প্রস্তরময় জগৎ দেখিতেছিলাম, এখন সেই প্রস্তর ভেদ করিয়া যেন স্নিগ্ধ বারিধারা নির্গত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বালকণ্ঠের মধুমাখা সঙ্গীত-রব পর্ব্বতশ্রেণী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এইরূপ চড়াই উতরাই ঠেলিয়া পথ হাঁটা যেমন ক্লেশকর তেমনই বিস্ময়োদ্দীপক,—যেমন একদিকে অত্যন্ত কষ্ট, তেমনই অন্য দিকে কষ্টের অপনোদক দৃশ্য-মাধুর্য্যও অতি সুন্দর! সেই উন্নত হিমাদ্রি-বক্ষে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিলেই সব কষ্ট নিমেষেই কোথায় চলিয়া যায়! মনে হয়, এ কি এক অপূর্ব্ব মহিমাময় সুন্দর ভাবের রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

গরু

মানুষ তোমায় বেজায় খাটায়
টানায় তোমায় লাঙল, গাড়ী—
একটু যদি গোল করেছ
অম্‌নি পড়ে লাঠির বাড়ি!

আপন জিনিস বল্‌তে তোমার
নেইক কিছুই এ বিশ্বেতে
তোমার বাঁটের দুধটুকু তা'ও
বাছুর তোমার পায়না খেতে!

মানুষ তোমার মাংস খাবে,
অস্থি দেবে জমির সারে,
চামড়া দিয়ে পরবে জুতো,
বারণ কে তা'য় করতে পারে!

তোমার 'পরেই এ অত্যাচার
হে মরতের কল্পতরু,
কারণ, নহ সিংহ কি বাঘ,—
কারণ তুমি নেহাৎ গরু!

"বনফুল"

৫

আন্দ্রে মরিয়াছে, কি শুধু আহত হইয়াছে ইহা ঠিক্ নির্দ্ধারণ না করিয়া, নৈশ-প্রহরীর হাঁক্ শুনিয়াই জুয়াঙ্কো প্রস্থান করিল; সে মনে করিয়াছিল, তাহার অব্যর্থ আঘাতে আন্দ্রে নিশ্চয়ই নিহত হইয়াছে। এই যুদ্ধে কোন কাপট্য ছিল না, কোন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না, সুতরাং অনুতাপ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে তাহার পথ হইতে অপসারিত করিতে পারিয়াছে সর্ব্বোপরি এই সুখের কল্পনাটাই তাহার মনের উপর একাধিপত্য করিতেছিল। একটা গোলমালের শব্দ শুনিবামাত্র মিলিতোনা জানলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং যুদ্ধের সমস্তক্ষণ তাহার যেরূপ ভাবনা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। একবার মনে করিল, চীৎকার করিয়া উঠিবে কিন্তু তাহার জিহ্বা তালুতে আট্‌কাইয়া রহিল, ভীতি লৌহ-কঠিন হস্তে তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল; টলিতে টলিতে জ্ঞান-হারা হইয়া পাগলের মত এলোধাবাড়ি রকমে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, অথবা তাহার জড়বৎ দেহ যেন অজ্ঞাতসারে পিছলিয়া চলিল। যে সময় আন্দ্রে মাটিতে পড়িয়া যায় ঠিক সেই সময় মিলিতোনা আসিয়া দ্বারের কপাট খুলিয়াছিল।

সৌভাগ্যক্রমে তরুণী যেরূপ নৈরাশ্য ও ব্যগ্রতার সহিত ছুটিয়া আসিয়া আন্দ্রের শরীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা জুয়াঙ্কো দেখে নাই; তাহা হইলে একটা খুনের বদলে সে দুইটা খুন করিত।

মিলিতোনা আন্দ্রের হৃৎপিণ্ডের উপর হাত দিয়া দেখিল, হৃৎপিণ্ডটা অতি ক্ষীণভাবে স্পন্দিত হইতেছে। সেই সময় নৈশ-প্রহরী তাহার একঘেয়ে ধুয়া আওড়াইতে-আওড়াইতে সেইখান দিয়া যাইতেছিল। মিলিতোনা সাহায্যার্থ তাহাকে ডাকিল। প্রহরী ছুটিয়া আসিল এবং তাহার লণ্ঠনটা আহতের মুখের উপর ধরিয়া বলিল;—

"ওঃ—এ যে সেই লোকটি—যে একটা চিঠি পড়বার জন্য আমার কাছ থেকে লণ্ঠনটা নিয়েছিল।" এই কথা বলিয়া মরিয়াছে কি, এখনো বাঁচিয়া আছে দেখিবার জন্য, আন্দ্রের শরীরের উপর সে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

এই প্রহরীর মুখ দেখিতে কর্কশ হইলেও, লোকটা আসলে ভাল; এই তরুণী, যে মোমের মত সাদা এবং যাহার কালো ভুরু মুখের পাণ্ডুতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে; এই নির্জীব আহত ব্যক্তি, যাহার মস্তক তরুণীর কোলের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে—এই মূর্ত্তি-সমবায়টি দেখিলে "রাম্ব্রাং" চিত্রকরের তুলিকাও প্রলোভিত হইত সন্দেহ নাই। বিশেষত মিলিতোনাকে দেখিলে মনে হয় যেন শোকের প্রতিমা একটা কবরের সম্মুখে নতজানু হইয়া রহিয়াছে।

নৈশ-প্রহরী কয়েক মিনিট পরীক্ষা করিয়া বলিল;—"এখনো নিঃশ্বাস পড়িতেছে; এইবার ক্ষতস্থানটা দেখা যাক্।" তাহার পর মূর্চ্ছিত আন্দ্রের কাপড়গুলা একধারে সরাইয়া দিয়া একপ্রকার ভক্তি-বিস্ময়ের সহিত বলিয়া

উঠিল ;—"আঘাতের ঠিক্ নিয়মানুসারেই আঘাতটা নীচু হইতে উপর দিকে উঠেছে ; এ নিশ্চয়ই একজন ওস্তাদের হাতের কাজ। আমি ত অনেক আঘাত ইতিপূর্ব্বে দেখেছি—কিন্তু এমন সাফ্ হাত কারও দেখি-নি! কিন্তু এখন এই যুবকটিকে নিয়ে কি করা যায়? একে ত বয়ে' নিয়ে যাওয়া যাবে না ; কোথাই বা এ-কে নিয়ে যাওয়া যায়? ও-ত আমাদিগকে ওর ঠিকানাটা বল্‌তে পারবে না।"

মিলিতোনা বলিল,—"আমার বাড়ীতে উঠিয়ে আনা যাক্ ; যে হেতু ইহার সাহায্যের জন্য আমিই প্রথমে আসিয়াছি, অতএব··· ··· এই আহত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষার অধিকার একমাত্র আমারই।"

ঐ প্রহরী একটা হাঁক দিয়া ডাকিবামাত্র তাহার সাহায্যার্থে তাহার এক জুড়িদার আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দু'জনে মিলিয়া উহাকে ধরাধরি করিয়া মিলিতোনার গৃহের আবড়ো-খাবড়ো সিঁড়ি দিয়া উঠাইতে লাগিল। বেচারা আহত ব্যক্তির পাছে ঝাঁকানি লাগে, এই ভয়ে মিলিতোনা তাহার ছোট হাতটি দিয়া তাহাকে ধরিয়া, পিছনে পিছনে চলিল এবং বুটি-তোলা কাজ-করা মস্‌লিন-কাপড়ের পালঙ্ক-পোষবিশিষ্ট তাহার ক্ষুদ্র কুমারী-সুলভ নিষ্কলঙ্ক পালঙ্কের উপর অতি সন্তর্পণে তাহাকে শুয়াইয়া দিল।

দুইজনের মধ্যে একজন প্রহরী অস্ত্র-চিকিৎসককে আনিতে গেল, আর একজন আন্দ্রের পকেট হাত্‌ড়াইয়া দেখিতে লাগিল, যদি পকেটে কোন কার্ড কিংবা চিঠি পাওয়া যায় যাহার দ্বারা তাহার সনাক্ত হইতে পারে। কিছুই পাওয়া গেল না। ইত্যবসরে মিলিতোনা একটা কাপড় ছিঁড়িয়া কতকগুলা ক্ষত-বন্ধন ও মলম লাগাইবার পটি প্রস্তুত করিল। পূর্ব্বে মিলিতোনা আন্দ্রেকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একটু লিখিয়া যে কাগজের টুক্‌রা তাহার জান্‌লা হইতে আন্দ্রের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কাগজের টুক্‌রাটা জুয়াঙ্কোর সহিত ধস্তাধস্তি করিবার সময়, আন্দ্রের পকেট হইতে পড়িয়া যায়—এবং উহা বাতাসে উড়িয়া দূরে নীত হয়। তাই, যতক্ষণ না আহত ব্যক্তির চৈতন্য হইল, পুলিস আন্দ্রের ঠিকানার কোন নিদর্শনই পাইল না।

মিলিতোনা শুধু এই কথা বলিল যে, সে ঝগ্‌ড়ার একটা গোলমাল ও একজন লোকের পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে আর কিছুই বলিল না। যদিও মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে ভালবাসিত না, তথাপি যে অপরাধের অনিচ্ছাকৃত হেতু সে নিজে, সেই অপরাধের জন্য জুয়াঙ্কোকে দোষী করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

অবশেষে অস্ত্রচিকিৎসক আসিলেন এবং আহতের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাতটা খুব গুরুতর নহে, ভয়ের কোন কারণ নাই। ছোরার ফলাটা পাঁজরার একটা হাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সজোর-আঘাত ও ভূতলে পতনের দরুণ, বিশেষতঃ রক্ত ক্ষয় হওয়ায় আন্দ্রে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষত স্থানের ধারে ডাক্তারের শলাকা স্পর্শ হইবামাত্র আন্দ্রের জ্ঞান হইল। চোখ খুলিয়া আন্দ্রে প্রথমেই দেখিল, মিলিতোনা হাত বাড়াইয়া ডাক্তারকে একটা

ক্ষত-বন্ধনের কাপড় দিতেছে। আলদঞ্জা মাসী, শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল, তাকিয়ার আর এক পাশে দাঁড়াইয়া, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে দুই চারিটা সান্ত্বনার কথা বলিল।

ডাক্তার পটি বাঁধা শেষ করিয়া, কাল আবার আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

আন্দ্রের মাথাটা ক্রমশঃ খোলসা হইয়া আসিতেছিল; অস্পষ্ট দৃষ্টিতে সে তাহার চারিপাশ একবার দেখিয়া লইল। দেখিল— এই ধব্‌ধবে কাম্‌রায়, এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর, এক দেবী ও এক ডাইনীর মাঝখানে সে অবস্থিত। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায়, তাহার স্মৃতি-প্রবাহের মধ্যে এক জায়গায় একটু ফাক হইয়া পড়িয়াছিল। সে জুয়াঙ্কোর সহিত যুঝাযুঝি করিতেছিল ইহাই তাহার মনে ছিল। রাস্তা হইতে সে কেমন করিয়া ইতিমধ্যে মিলিতোনার অধ্যুষিত সুরম্য স্বর্গ-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

"আমি তোকে ত আগেই বলেছিলুম, জুয়াঙ্কো একটা কিছু অনিষ্ট করবেই। সে সময়ে সে আমাদের উপর কেমন থট্‌মট্‌ করে তাকিয়েছিল। তখনি মনে হল, একটা কিছু ও করবেই। আমরা বেশ একটা খিচুরী পাকিয়েছি! আর যখন সে জান্‌তে পারবে তুই ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এই ঘরের ভিতর এনেছিস্‌ ··· !" মিলিতোনা উত্তর করিল;—

"—আমিই যে তার দুর্দ্দশার কারণ, আমি কি তাকে আমার দরজার সাম্‌নে মর্‌তে দিতে পারি? তাছাড়া জুয়াঙ্কো কিছুই বল্‌বে না। সে তার উচিত শাস্তি এড়াবার জন্য খুবই চেষ্টা করবে।" বুড়ী বলিল;—

"এই যে, রোগীর আবার জ্ঞান হয়েছে দেখ্‌ছি; আঃ, ও চোখ্‌ খুলেছে; গালেও একটা রঙ ফিরে এসেছে।"······আন্দ্রে অস্ফুট-স্বরে দুই-চারিটা কথা কহিবার চেষ্টা করায় মিলিতোনা বলিল;—

"কথা কইবার চেষ্টা করবেন না, ডাক্তার নিষেধ করেছেন।" শুশ্রূষাকারীরা যেরূপ একটা কর্তৃত্বের ভাব ধারণ করে, সেই কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে মিলিতোনা যুবকের রক্তহীন ঠোঁটের উপর স্বীয় হস্ত স্থাপন করিল।

গায়ক বিহঙ্গকুলের আহ্বানে যখন উষার গোলাপ-রক্তিম আলোকচ্ছটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন যে-একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল তাহা দেখিলে জুয়াঙ্কো নিশ্চয়ই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিত; মিলিতোনা আহতের শয্যার শিয়রে বসিয়া ভোর পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল; রাত্রির শ্রমে ও মনের আবেগে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এবং ঘুমের ঘোরে অজ্ঞাতসারে তাহার মাথাটা আন্দ্রের তাকিয়ার কোণে ভর দিয়া ছিল। তাহার সুন্দর কৃষ্ণ কুন্তল আলুলায়িত হইয়া ঢেউ খেলাইয়া শুভ্র শয্যাস্তরণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আন্দ্রে জাগিয়াছিল; সে একটী কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ লইয়া তাহার আঙ্গুলে জড়াইতেছিল।

এ কথা সত্য, ইহার কোন খারাপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কারণ যুবকটী আহত এবং মাসীবুড়ী সম্মুখেই অবস্থিত।

যদি জুয়াঙ্কোর একটুও সন্দেহ হইত যে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা দূরে থাক্‌, মিলিতোনার গৃহে তাহার যাইবার একটা উপায় করিয়া দিয়াছে, মিলিতোনার শয্যায়

তাহাকে স্থাপন করিবার সাহায্য করিয়াছে; মিলিতোনার সেই ঘরটীতে আন্দ্রে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছে,—যে ঘরে সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে,—তাহা হইলে সে রাগে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, নিজের নখ দিয়া নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিত সন্দেহ নাই।

আন্দ্রে মিলিতোনার নিকটে যাইবার জন্য পূর্ব্বে কত চেষ্টা করিয়াছিল, কত ফিকির-ফন্দী করিয়াছিল, কিন্তু এই উপায়টা কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় নাই।

তরুণী জাগিয়া উঠিল; লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আবার কেশপাশ সুবিন্যস্ত করিয়া গ্রন্থিবদ্ধ করিল; তারপর রোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন বোধ করিতেছেন। আন্দ্রে, প্রেম ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে মিলিতোনার পানে চাহিয়া উত্তর করিল;—"ভাল।"

আন্দ্রে বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া আন্দ্রের ভৃত্যেরা মনে করিল, কোথাও সায়াহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়াছেন অথবা পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন; এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। নিত্য-নিয়মিত সময়ে ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,—কিন্তু আন্দ্রে আসিল না। ইহার জন্য পিয়ানো বেচারীকেই কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ঝাঁকানি সহকারে এলোমেলো ভাবে পিয়ানোর পর্দ্দার উপর হাত পড়িতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় বাগ্‌দত্তা "নব্যার" সহিত সাক্ষাৎ না করে, তাহা হইলে স্পেন দেশে ইহা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ফেলিসিয়ানা যে একেবারে উন্মত্তভাবে আন্দ্রের প্রেমে পড়িয়াছিল, তাহা নহে। ফেলিসিয়ানার প্রকৃতিতে আবেগ জিনিসটাই ছিল না; সে উহা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু আন্দ্রের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা তাহার অভ্যাসের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল; এবং ভাবী পত্নীত্বের অধিকার-সূত্রে আন্দ্রেকে সে নিজস্ব সম্পত্তির হিসাবে দেখিত। সে বিশবার পিয়ানো হইতে উঠিয়া জানলার ধারে গেল এবং ইংরাজী প্রথার বিরুদ্ধে জানলা হইতে মাথা বাড়াইয়া আন্দ্রে আসিতেছে কিনা দেখিতে লাগিল।

আপনাকে প্রবোধ দিবার ছলে ফেলি-সিয়ানা মনে মনে ভাবিল:—

"আজ সায়াহ্নে, "প্রাদো"তে নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পাব,আর খুব কসে' "লেক্‌চার" শুনিয়ে দেব।"

গ্রীষ্মকালে সায়াহ্ন সাতটার সময় "প্রাদো" সর্ব্বসাধারণের সুন্দর বেড়াইবার স্থান। ইহার মত শীতল সুচ্ছায় কিংবা চিত্রবৎ সুন্দর স্থান যে আর কোথাও নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু এরূপ জীবন-চাঞ্চল্যে সজীব ও আমোদ-উল্লাসময় জনতার স্থান আর কোথাও নাই। উপবন অপেক্ষা ইহাকে একটা সৌখীন লোকের বৈঠকখানা বলিলেই ঠিক হয়। খর্ব্ব স্থূলাকার সারি-সারি বৃক্ষ;—উহাদের ডাল ছাঁটিয়া শাখাপল্লবের বিস্তার জোর করিয়া বর্দ্ধিত করায়, উহারা প্রচুর ছায়াদানে ভ্রমণকারীর তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে।

পাথরে বাঁধানো একটা উচ্চ পথ যাহা

গাড়ী দাঁড়াইবার জন্য রক্ষিত সেই পথের ধার দিয়া সারি-সারি কেদারা ও শাখান্বিত দীপস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। এই বাঁধানো পথে নানা প্রকারের গাড়ী আসিয়া ভিড়িতেছে।

সৌখীন অশ্বারোহীরা ডুল্‌কি-চালের ইংরেজী ঘোড়ার উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, অথবা সুন্দর আন্তালুসীয় ঘোড়ার উপর চড়িয়া ঘোড়াকে নাচাইতেছে; এই সব ঘোড়ার ঘাড়ের চুল বিনুনী করা ও লাল রঙে রঞ্জিত; এবং উহাদের তরঙ্গায়িত গতিভঙ্গী আরব দেশীয় নর্ত্তকীদের নিতম্ব আন্দোলনের ন্যায়।

এই খোলা "বৈঠকখানায়" পিপীলিকার সারির ন্যায় দলে দলে লোক অবিশ্রান্ত আসিতেছে। জন-স্রোত নদীর স্রোতগুলার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে বহিয়া স্থানে স্থানে জনতার ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করিতেছে।

সাদা কিংবা কালো 'লেস্'-দেওয়া ম্যান্টিলা-ওড়নার লঘু ভাঁজে সুন্দরীদিগের মুখমণ্ডল পরিবেষ্টিত। এখানে কুৎসিত মুখ দৈব-দুর্ঘটনার মত অতীব বিরল। যাহাদিগকে সুন্দরী বলা চলে না তাহারাও সুশ্রী। সুন্দরীদিগের শোভন হাতপাখাগুলা সোঁ সোঁ শব্দে কখন খুলিতেছে, কখন বন্ধ হইতেছে; যাত্রা-পথে অভিবাদনের সঙ্গে সঙ্গে মৃদু-মন্দ মধুর হাসি ও ছোটখাটো হাতের ইসারা চলিতেছে। এই স্থানটা, কতকটা কার্নিভ্যালের সময়কার অপেরার সাজ-ঘরের মতো।

পক্ষান্তরে, যাহারা লোকের গোলমাল ভালবাসে না, সেই সব মানব-সঙ্গ-বিরাগী কতকগুলি ধূমপায়ী এখানকার সুচ্ছায় নির্জ্জন সংকীর্ণ পথে বিচরণ করিতেছে।

ফেলিসিয়ানার পিতা ডন্-জেরোনিমোর পার্শ্বে ফেলিসিয়ানা খোলা গাড়িতে বসিয়া বেড়াইতেছিলেন, যদি অশ্বারোহীদিগের মধ্যে তাঁহার ভাবী পতিকে দেখিতে পান এই অভিপ্রায়ে। কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। আন্দ্রে অন্যদিনের ন্যায় আজ তাঁর বাগ্‌দত্তার গাড়ীর পাশাপাশি থাকিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া আসে নাই। দর্শকেরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, শ্রীমতী ফেলিসিয়ানার গাড়ি, পাথর-বাঁধানো পথের চতুর্গুণ দীর্ঘ পথ যাতায়াত করিতেছে, অথচ তাঁহার নিত্যকার রক্ষক তাঁহার সঙ্গে নাই।

কিয়ৎকাল পরে ফেলিসিয়ানা অশ্বপৃষ্ঠে আন্দ্রেকে দেখিতে না পাইয়া, মনে করিল হয়ত আন্দ্রে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। তাই ফেলিসিয়ানা তার পিতাকে বলিল, সেও হাঁটিয়া বেড়াইবে। "বৈঠকখানা" ও তাহার অলি-গলিতে দুই-চার বার ঘোরা-ফেরা করিয়া, ফেলিসিয়ানার দৃঢ়বিশ্বাস হইল, আন্দ্রে আসে নাই।

কাহারও সুপারিসে ডন-জেরোনিমোর সহিত পরিচিত হওয়ায় এক ইংরেজ যুবক ডন-জেরোমিনোকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিল এবং কপ্‌চাইতে কপ্‌চাইতে, ঢোক্ গিলিতে গিলিতে, ইংরিজি টানে যে রকম ইংরেজেরাই ভাষা না জানিয়াও বিদেশীয় সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে সেইরূপ তাঁহার সহিত স্পেনীয় ভাষায় 'কষ্টে-সৃষ্টে কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিল। এই বিষয়ে ইংরেজের অধ্যবসায় অসাধারণ। ফেলিসিয়ানা—যে

Vicar of Wakefield পড়িয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিত—সে এই সময় এই বৈপিক যুবকের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া তাহার ভীষণ ঘ্যান্-ঘ্যানানির প্রতি অজস্র মৃদু মধুর হাসি বিতরণ করিতে লাগিল। তাহার পর নিকটস্থ থিয়েটারে গিয়া, 'ব্যালে' জিনিসটা কি তাহা ঐ যুবককে বুঝাইয়া দিল, এবং থিয়েটারের বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির নাম কি তাহাও বলিয়া দিল।······তখনও আন্দ্রের দেখা নাই।

বাড়ী গিয়া ফেলিসিয়ানা তাহার পিতাকে বলিল :—

"আজ আন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল না।"

জেরোনিমো বলিলেন :—

—"তাই ত; আমি তার বাড়ীতে খোঁজ করতে লোক পাঠাচ্চি। বোধ হয় পীড়িত হয়েছে।"

আধঘণ্টার মধ্যেই ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল :—

"আন্দ্রে-মহাশয় কাল থেকে বাড়ী আসেন নি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্ত্রীশিক্ষার কথা*

অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে দু-একটী কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত দু-একখানা পুস্তিকা পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ সকল পুস্তিকাতে যে আদর্শে চরিত্র চিত্র করার প্রয়াস দেখিয়াছিলাম, তাহা "সেকালের" ক্ষুদ্র অন্তঃপুরের আদর্শ বলিয়া মনে হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য ক্ষুদ্র অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা উপলক্ষে বৃহৎ মানব সমাজের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম এবং তাঁহার উদ্যমের সাফল্য কামনা করিয়াছিলাম। আজ তিনি প্রাচীনাদের পক্ষ লইয়া "নব্য-শিক্ষিতাদের" বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে বক্তৃতা-মঞ্চে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

"উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ইতিহাস ও ভূগোল" আলোচনা করিলে দেখা যায় রমণীর আসন কেবলমাত্র "ঘরের ভিতরে" অন্তঃপুরে আবদ্ধ নয়। কোন দেশেই প্রাচীনকালে নারীজাতি অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র সীমার আবদ্ধ ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য কোন স্থানেই স্ত্রীলোক আবদ্ধ নহে। যে কারণে ও যে সময়ে বঙ্গদেশে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য শিক্ষা থাকিলেই জানা যায়। সে লজ্জাস্কর ব্যাপারের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন সে

* এই প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য পাঠানো হইয়াছিল; 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক কিছুকাল রাখিয়া 'ছাপা হইবে না' বলিয়া প্রবন্ধটি ফেরত পাঠান্। লেখিকা।

প্রতিবাদ-সূত্রে লেখা হইলেও একালের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লেখিকা অনেক তর্ক ও প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সেইজন্য এ প্রবন্ধ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইল। ভাঃ সঃ।

সময় ও সে অবস্থা আর নাই এবং সে প্রকার অবরোধ-প্রথাও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। যে দেশ হইতে এ প্রথা আমদানী হইয়াছিল, সেখানেও এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। "গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও" কেহ কালের প্রবাহ রোধ করিতে বা সমস্ত নারী-জাতিকে কেহ ঘরের ভিতরে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। লেখিকা যে মাতাজীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যখন প্রকাশ্য বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিয়া নগ্ন মস্তকে অসংখ্য পুরুষ-শ্রোতার নিকট অবরোধ-প্রথার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন এবং নবম বর্ষে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বধূরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই গৃহস্থ-কন্যার কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিতেন, তখন ভাবিতাম, এই বিদুষী তপস্বিনী মারহাট্টা রমণী আজন্ম স্বাধীনতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া এবং অন্তঃপুরের অবরোধে কোন দিন মাথা না গলাইয়াও কি কারণে এই আদর্শ বঙ্গদেশে প্রচার করার জন্য অসাধারণ শক্তি, সামর্থ্য ও আজীবন তপস্যার অপব্যয় করিতেছেন! বঙ্গদেশের ধনীলোকদের 'বাহবা' পাইয়া ভ্রমে পতিত হন নাই ত? 'বাহবা' অনেক সময়ে লোকের মতিভ্রম ঘটায়!

লেখিকা নব্য-শিক্ষিতাদের উপর খড়্গহস্ত এবং সেকালের মেয়েদের পক্ষপাতিনী। কাল অনাদি অনন্ত, কালের বিভাগ করাও সম্ভবপর নয়। একজন প্রাচীন লোক একটী যুবককে পাঁওরুটী খাইতে দেখিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন যে, আজকাল ছেলেরা একেবারে অনাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "মশায় কি কলের জল খান, না গঙ্গোদক?" প্রাচীন বলিলেন, "কেন, কলের জলে দোষ কি?" যুবক বলিল, "না, দোষ কিছু নাই, কিন্তু প্রাচীনতর কোন ব্যক্তি শুনিলে আপনার মতই দুঃখপ্রকাশ করিতেন।" লেখিকা মেয়েদের শ্যাময় লেদার ও সিল্কের ষ্টকিং-এর প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন, বিদ্যাসাগর-জননী ও ভূদেব-জননী চটি জুতা, সেমিজ জ্যাকেট ও পরিষ্কার পোষাকী সাড়ী পছন্দ করিতেন কি না সন্দেহ! লেখিকা বি-এ, এম-এ,-দের প্রতি বিরূপ; প্রাচীনারা বর্ণশিক্ষারও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগর-জননী প্রবন্ধ রচনা পছন্দ করিতেন কিনা সন্দেহ। প্রাচীনে-নবীনে বিরোধ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল চলিবে, কিন্তু চিরকালই নবীনের জয়।

লেখিকা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, শিল্প-কলা ইতিহাস-ভুগোল, সাধারণভাবে কিছু গণিত ও রামায়ণ, শাস্ত্র, উত্তমরূপে "স্বাস্থ্য-তত্ত্ব" শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন। নূতন কলেজ না হইলে এ শিক্ষা কি প্রকারে দেওয়া যায়, তাহা চিন্তার বিষয়। দেশের যে অবস্থা তাহাতে স্কুল-কলেজে না পাঠাইলে মেয়েকে এই শিক্ষা দিতে কে পারে? এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে মেয়েকে স্কুল-কলেজে পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। বিশেষতঃ যাঁহারা এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করিবেন, সাধারণভাবে তাঁহাদের কোন বিষয় শিক্ষা করিলে চলিবে না; উত্তমরূপে শিক্ষা করা প্রয়োজন এবং বি-এ, এম্-এ, পাশ করা একান্ত আবশ্যক। এই সকল বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে পরীক্ষায় পাশ করা শক্ত হয় না। কোন বিষয় শিক্ষা না করিয়াও

যাঁহারা শিক্ষিতা বলিয়া অভিমান করিতে চাহেন, তাঁহাদের পরীক্ষা না দেওয়াই বিধেয়।

"পরীক্ষার ফাঁদে পড়িয়া মেয়েদের স্বাস্থ্য স্ফূর্ত্তি ও আয়ু কর্পূরের মত উবিয়া যাইতেছে" ও "সজীবতা জলের মত অপব্যয় হইতেছে" বলিয়া লেখিকা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় কি? মশারিতে কোন কারণে ছারপোকা হইলে মশারিটা চুল্লীতে নিক্ষেপ করা সুগৃহিণীর লক্ষণ নহে। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে যদি বাস্তবিক ঐ প্রকারের ক্ষতি হয়, তবে তাহার প্রতিকার না করিয়া স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা শুভ লক্ষণ নহে। যাঁহারা স্কুল-কলেজের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা কি স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি, আয়ু ও সজীবতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন? আমাদের দেশে কয়টী মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে? কয়টী মেয়ে শিক্ষিতা-শ্রেণী-পদ বাচ্য? রুগ্না স্ত্রী বা রুগ্ন ছেলে মেয়ে লইয়া বিব্রত হইতে হয় না, এমন সৌভাগ্যবান লোক কয় জন! স্কুল-কলেজের ছেলেদের স্বাস্থ্যহীন হওয়ায় সমাজ-হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বহু গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, শারীরিক পরিশ্রম না করা, মুক্ত বায়ু সেবন না করা প্রভৃতি কারণে এই প্রকার ক্ষতি হইতেছে। মেয়েদের সম্বন্ধেও কি এই কথা বলা যায় না? লেখিকা মেয়েদের জন্য গৃহের মধ্যে যে স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইটীই স্বাস্থ্যের প্রধান অন্তরায়। পিতা-মাতা যদি এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি দেন ও ভাল বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে পরীক্ষা পাশ করিয়াও স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি, আয়ু, সজীবতা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব নহে। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করেন, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব ও অর্থাভাবই এই সকল বিপদের মূল কারণ। লেখিকা সমস্ত দোষ স্কুল-কলেজ ও নব্য শিক্ষিতাদের উপর আরোপ করিলেও বিধাতা "প্রাচীনা" ও "সেকালের শিক্ষিতা অভিভাবিকাদিগকে" অব্যাহতি দিবেন না।

"স্কুল-কলেজে ধর্ম্ম-শিক্ষার বালাই নাই", পক্ষান্তরে "বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গিনীদের কল্যাণে দরিদ্র কন্যার সৌখীন রুচি হয় বলিয়া তাহার জীবন পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয় না" বলিয়া লেখিকা দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "নৈতিক চরিত্র নির্ভর করে কতকটা বংশ, পিতা-মাতা ইত্যাদির উপরে।" কন্যাদিগকে যদি ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে তাহা স্কুলের উপর অর্পণ না করিয়া "পিতা-মাতা ও বংশের" উপরই থাকা বাঞ্ছনীয়। শিবপূজা, ব্রত-উপবাসে সংযম শিক্ষা হয় বলিয়া যদি লোকের মনে বিশ্বাস থাকিত, তবে স্কুল-কলেজ থাকা সত্ত্বেও এ সকল উঠিয়া যাইত না। এই সকল সংযম ও সৌখীন রুচি শিক্ষা দেওয়ার ভার এখনও নব্য শিক্ষিতাদের উপর আসিয়া পড়ে নাই, এখনও সেকালের মেয়েদের হাতেই সংসার ও সমাজের ভার রহিয়াছে, এখনও তাঁহারাই গৃহের কর্ত্রী।

সঙ্গিনীর প্রভাব যদি পিতা-মাতা বংশ ও সমাজের প্রভাব অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, পিতা-মাতা মেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়া সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন মনে করেন। এই

প্রকার দায়িত্ব-বোধের অভাব কোনও শিক্ষিতা নারীর নিকট হইতে আশা করা যায় না।

নব্য শিক্ষিতাগণের বিলাসিতা ও ধনী কন্যাদের শ্যাময় লেদার সু, সিল্কের বিচিত্র ফিতা ও নিত্য নূতন ফ্যাসানের পেটী কোট আমদানী লেখিকাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। শুনিয়াছি, কোনও জেলায় একজন প্রধান উকীল এই প্রকার অভিযোগ করায় অন্য একজন মুখর উকীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,"আপনার যে নাত্‌নীটী প্রতিদিন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া বাহির হন্, তিনি ও তাঁহার মা কতদূর লেখাপড়া করিয়াছেন?" তদবধি নাকি তিনি আর এ বিষয়ে কোনও দিন কোনও কথা বলেন নাই। লেখিকা যে বৈঠকে এই বক্তৃতা পাঠ করেন, সেখানে ঐ-রকম ধনী-কন্যা কেহ ছিলেন কি না, জানি না। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই বিলাসিতার বিচার করা চলে না। যাঁহাদের লোক-সমাজে মিশিতে হয়, তাঁহাদের সুন্দর শোভন, পদ-মর্য্যাদা ও অবস্থার অনুরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ আবশ্যক আর যাঁহাদের ঘরের ভিতরেই স্থান, তাঁহাদের সোনার অলঙ্কার করিয়াই টাকা ফেলিয়া রাখাও একান্ত অসঙ্গত। বিলাসিতা আমাদের দেশে চিরকালই নিন্দনীয়, এবং নব্য-শিক্ষিতা বি-এ, এম্-এ-গণও তাহা জানেন। তাঁহাদের সংখ্যা এত কম, যে নখাগ্রে গণনা করা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান। লেখিকা ধনী-কন্যাদিগকে তাঁহাদের সহিত একত্র করিয়া যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উপর গভীর অবিচার করা হইয়াছে। বিলাসিতাকে নব্য-শিক্ষার ফল না বলিয়া কুশিক্ষা ও "অপশিক্ষার" ফল বলা যাইতে পারে। অনেক ধনী-কন্যাকে অবস্থানুসারে নানা বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইতে হয় এবং তাহা তাঁহাদের পক্ষে অনেক সময়ে প্রয়োজন। তাঁহাদের মধ্যেও গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, সুগৃহিণী, দয়াবতী, মনস্বিনী অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহাদের সহিত পরিচিতা হইলে লেখিকাও তাঁহাদের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নত করিবেন।

লেখিকা নব্যশিক্ষিতাদিগকে "অসরলা" ও "অহঙ্কৃতা" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব 'আহা'তেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। নব্য-শিক্ষিতারা যার-তার কাছে স্বামী-পুত্র ও অদৃষ্টের নিন্দা করা বা অনাবশ্যক গল্প-গুজব করা ভাল না মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কাহারও সহিত হৃদয় দিয়া মিশিতে পারেন না বা কোনও কাজে হৃদয়-মন ঢালিয়া দিতে পারেন না, এ কথা কি সত্য? শুনিয়াছি, একজন যুবক শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি দোষারোপ করিলে মহামতি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তুমি কয়জন শিক্ষিতা নারী দেখিয়াছ জানি না, আমি অনেক দেখিয়াছি এবং অনেককে জানি,—আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতার মত নয়। তোমার অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয়, তবে তোমার জন্য আমি দুঃখিত হইতেছি।" আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস, লেখিকাও যদি নব্য-শিক্ষিতাদের সঙ্গে সরলভাবে বন্ধুভাবে সমস্ত সঙ্কোচ

পরিত্যাগ করিয়া মিশিবার সুযোগ পান, তবে তাঁহারো এ ভ্রম দূর হইবে। আজকাল লোক-সেবা-ব্রতের যে বিপুল-আয়োজন হইতেছে, শিক্ষা-দান, চিকিৎসা ও ধাত্রীর কার্য্য, চিত্রাঙ্কন, বস্ত্র-বয়ন, ক্ষুধিতকে অন্নদান, বস্ত্রহীনের লজ্জা-নিবারণ, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি সাধু কার্য্যের যে সকল সূচনা হইয়াছে, তাহাতে নব্যশিক্ষিতা নারীগণ মনঃপ্রাণ শক্তি-সামর্থ্য ঢালিয়া দিয়া সখীত্বে সমপ্রাণ হইয়া ঐ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। সমস্ত দেশ আশা করিতেছে যে, সর্ব্বপ্রকার শুভ কার্য্যে ভারতের নারীরা প্রাণ প্রতিপণ করিয়া সকল কার্য্যকে শোভন, সুন্দর ও মঙ্গলপূর্ণ করিয়া তুলিবেন। গৃহ-মধ্যে কেবলমাত্র স্বামী-পুত্রের সেবা করিয়া তাঁহাদের নারী-হৃদয় তৃপ্ত হইবে না ; সাহিত্যে, শিল্প-চর্চ্চায়, রাজনীতি-ক্ষেত্রের ঘোরতর সংগ্রামে, ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষা কার্য্যে, সমাজ ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবারূপ মহাব্রতে, জগতের সকল প্রকার দুঃখ-শোক-মোচনে নারীগণ অগ্রসর হইয়া পুরুষের সকল ব্যর্থ চেষ্টায় সাফল্য প্রদান করিবেন—শোক-তাপ-ক্লিষ্ট নর-নারীর উষ্ণ কপালে তাঁহাদের শীতল হস্ত প্রদান করিবেন, সর্ব্ব-সন্তাপহারী জননী-মূর্ত্তি সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিবেন।

এই সকল কার্য্যে নব্যশিক্ষারই প্রয়োজন। প্রাচীনের প্রতি ভক্তি কল্যাণপ্রদ, কিন্তু অন্ধ আসক্তি জাতীয় জীবন নষ্ট করে। নব্য শিক্ষা অতি অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে। তাহার বিচারের সময় এখনও আসে নাই। লেখিকা অতীতের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত নিরাশ হইলেন কেন এবং এই নব্য শিক্ষা ও স্কুল-কলেজকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে বলিতে-ছেন কেন, জানি না। দেশের এই দুর্দ্দিনে, এই অজ্ঞান-তিমিরাবৃত দেশে যে সকল মহিলা জ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও হৃদয়ে পাইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের গলা-কাটাকাটি না করিয়া কি-ভাবে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী দোষ-শূন্য হইতে পারে সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রয়াসী হউন। এতখানি চিন্তা করার সময় বা অবকাশ যাঁহার না থাকে, তিনি অত্যল্প অবকাশটুকু শিক্ষার অকল্যাণ চিন্তা করিয়া নষ্ট করিবেন না। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আশা-উৎফুল্ল চিত্তে আমরা যেন অগ্রসর হই। নব্য-শিক্ষিতা কবির সহিত এক সুরে বলি—

"অতীতের কথা কহি বর্ত্তমান যদি যায়
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়।"

দূর অতীত যতই মনোরম হউক না কেন, সেদিকে ফিরিবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সকলে যেন সমস্বরে বলি—

"চাহিনা ফিরিতে আর
কৈশোরের লীলাগার—
তৃষিত হৃদয়-আগে
যে দিব্য আলোক জাগে—
তাহাকেই লক্ষ্য করি চলি অনিবার—
ধর ক্ষীণ-হস্ত তুমি হস্ত বিধাতার।"

"নব্য-শিক্ষানুরাগী।"

সুখের সাহারা

স্বর্গে সেদিন উৎসব-দিন আসন্ন ঘন সন্ধ্যা,
সহরের পথে ছোটে লাখো লোক,—ফুল্ল অলকনন্দা ;
ইন্দ্র-সভায় করিবে নৃত্য উর্ব্বশী চারু-অঙ্গী,
সোনার-নূপুর-ঝুমুর-ঝুমুর-চরণে ললিত ভঙ্গী ;
বিজলী-বরণী অপ্সরী নানা মন্দার-মালা বক্ষে,
মেনকা রম্ভা গান গাবে নীল মেঘের কাজল চক্ষে ;
মন্দাকিনীর কূলে এসে নামে তরণী-বোঝাই যাত্রী,
চিরবসন্ত বারমাস সেথা জ্যোছনা-প্লাবিত রাত্রি ।

প্রতি বনে বনে পারিজাত ফুল করে মন প্রাণ ফুল্ল,
ভিড়ে জনতায় সব রাস্তায় পুষ্প-পরাগ উড়্‌লো ;
ফুলে-মোড়া পথ ভেলভেটবৎ নাইক ধূলির চিহ্ন,
কল্পনাতীত অন্যের কারো স্বর্গের-বাসী ভিন্ন ;
চির-যৌবন বাঁধিয়া যাহারা রেখেছে আপন অঙ্গে,
ভুলেছে জন্ম-মৃত্যুর স্বাদ রোগ-শোক সেই সঙ্গে,
যাদের স্বচ্ছ নয়নে ঝলকে কী এক অতুল দীপ্তি,
বুক-ভরা খাঁটি সন্তোষ-মধু অন্তর-ভরা তৃপ্তি ।

তোরণে তোরণে উড়িল কেতন রচিত দিয়া সে স্বর্ণ ;
নহবৎ বাজে মধুর মধুর শ্রবণে জুড়ায় কর্ণ ;
নর-নারী যত ধায় অবিরত করিয়া রত্ন-সজ্জা,
যার কাছে হায় ম্লান হয়ে যায় কোহিনূর পায় লজ্জা,
এত উৎসব উল্লাস-মাঝে একাকী চিন্তামগ্না,
মন্দাকিনীর নির্জ্জন তীরে মণি-শিলা তট-লগ্না,
হরিণ-নয়নী কে ঐ তরুণী সজল আনত দৃষ্টি ?
—কান্ত-কোমল পারিজাত-সম অমৃত-সমান মিষ্টি !

সহচরী কয়—কম মেয়ে নয় ! এইখানে কিনা শেষটা ?
এ-পাড়া ও-পাড়া খুঁজে দিশেহারা হনু আমি সারা দেশটা !
কার পরে রোষে একলাটি বসে ? দেখে জ্বলে ওঠে অঙ্গ,
বাঁধিস্‌নি চুল পরিস্‌নি দুল্ কত না জানিস্ রঙ্গ,

বেলা বয়ে যায় ইন্দ্রসভায় নাচগান সুরু হয়তো,
যাবি যদি চল্ না যাবি ত বল্ একা আমি যাই নয়তো ;
কস্‌নেকো কথা কেন ওলো সখি ? কেনলো মেজাজ রুক্ষ ?
একি ! একি ! তোর চোখে কেন জল ? স্বর্গে কিসের দুঃখ ?

"স্বর্গে আবার দুঃখ কিসের ? সুখেরি ঘূর্ণাবর্ত্তে
পড়িয়া সখিলো সাধ যায় পুনঃ ফিরে যেতে সেই মর্ত্ত্যে !
—আলোর পিছনে ছায়া খেলে যেথা সুখের পিছনে দুঃখ ;
স্বর্গ-ভোগের বিষম শাস্তি চায় যে ভীষণ মূর্খ।
এ ত সুখ নয়, সুখের সাহারা—তপ্ত হাসির দীপ্তি !
অশ্রু-বিহীন মরু-প্রান্তর—সীমাহীন ধূ-ধূ তৃপ্তি !
এর চেয়ে ঢের ভাল সে আমার হাসি-অশ্রুর তৈরী—
অতীত প্রাচীন মর্ত্ত্য-জীবন—যে সুখে দেবতা বৈরী !

সখিলো, মোদের ঘরখানি ছিল কী সুখের যদি জান্‌তে !
হাটতলা ফেলে পশ্চিমে হেলে গাঁয়ের একটি প্রান্তে,
সাম্‌নেই এক মস্ত পুকুর—মুখ-দেখা যেন আরসী,
জল সর্‌তুম সেই পুকুরের—আটঘর পাড়া-পড়শী ;
কামিনী মালতী আমি তিনজন দেখে লোকজন অল্প,
জল তোলবার মিছে ছল ক'রে জুড়্‌তুম সেথা গল্প ;
ডাইনে একটু ছোট্টবাগান, পিছনে জামের বন লো,
ফাঁক্ ফাঁক্ মোরা পড়্‌শী ক'ঘর ছিনু এক-প্রাণ-মন লো।

সদর উঠানে আমলকি গাছ কত্‌বেল গাছ ঝাঁক্‌ড়া,
করবী ফুলের ঝোপটির পাশে ফোল্‌তো বিলেতী আম্‌ড়া ;
ভিতর-উঠানে ধানের মরাই নেবুগাছ—চিনে কাগ্‌জী,
ফোল্‌তো সেখানে লাউ ও কুম্‌ড়ো নানাবিধ শাক-সব্‌জী ;
গোয়ালঘরের একটু পাশেই ছিল তুলসীর মঞ্চ,—
মোর অতীতের প্রাচীন কাহিনী মন দিয়ে সখি শুন্‌চো ?
খিড়কির ধারে পুকুরটি ছিল ছোটখাট একরত্তি
চক্‌চকে যেন রূপোর দু' আনি মৌরলা মাছে ভর্ত্তি।

পাঠশালা আর পোষ্টো আপিস ছিল গ্রামটির মধ্যে,
ছেলেরা পড়্‌তে যেত পাঠশালে মোদের বাড়ীর পথ দে' ;

তাদেরি হাত দে' ফেল্‌তে দিতেম চিঠি-ভরা মোর কান্না—
বিধবা মায়ের প্রবাসী মেয়ের হাজারো রকম বায়না ;
কাছ-ছাড়া এই একটি মেয়ের বিরহ তাঁহারে বাজ্‌তো,
এত-বড় এই বুড়ো মেয়েটার আব্দার কিলো সাজ্‌তো ?
ফুলকপি আর কড়াই সুঁটি উঠ্‌তো প্রথম যাই লো,
লুভী মেয়েটার জন্যে তাঁহার পাঠিয়ে দেওয়া চাইই লো !

সুদূর প্রবাসে পল্লীজীবন কাহার প্রণয়স্পর্শে
হয়েছিল রাঙা এত মনোরম ? সখিলো আমার বর সে !
সখিলো সে মোর প্রিয় প্রিয়তম দেবতা আমার স্বর্গ—
হৃদয়-কানন-কুসুম চয়নে রচেছিনু তার অর্ঘ্য !
পূজারিণী মোর পূজা সারা শেষ হোলোনা হোলোনা জন্মে,
ব্যর্থতা শুধু বিঁধিয়া রহিল চিরতরে প্রাণে মর্ম্মে ;
বিদ্রোহী প্রাণ ছাড়া পেতে চায় ছিঁড়ে দে' সুখের শিক্‌লি,
ঢের ভাল ছিল সে মোর জীবন সুখে-দুখে পাঁচ মিশ্‌লি।

সখিলো, সে আজ কেঁদে কেঁদে পথে শিরে কর তার হান্‌চে,
আমি যে এখনো ভুলিনি তাহারে ভালবাসি সে কি জান্‌চে ?
সে ছিল কে জানে কেমন মানুষ কাঁদিয়ে আমায় হাস্‌তো !
ব'লে ছল ক'রে রূঢ় কথা মোরে মনে মনে ভালবাস্‌তো !
আমার গায়ের একটু আঁচড়ও সইত না তার বক্ষে,
সারারাত ধরে পাখা ক'রে ক'রে ঘুম নাই তার চক্ষে ;
ফরমাস্ তার মিনিট মিনিট একটা না হয় একটা—
—এই ছিল নেই পাণের ডিপেটা, এই কোথা মনি-ব্যাগটা ?

সখিলো, সে মোরে করেছিল দান দু'খানি হীরের টুক্‌রো—
এতটুকু কচি তিল একরাতি ফাউ-পাওয়া যেন খুচ্‌রো !
সমস্ত প্রাণ আলো ক'রে তারা ভরেছিল মোর চিত্ত,
হরেছিল মোর জীবনে যা-কিছু নীরস যা-কিছু তিক্ত ;
—মিটি মিটি হাসি কালো কালো চুল কোলে ছুটে আসা ঝাঁপিয়ে,
মা মা ক'রে সেই আদুরে কান্না ঠোঁটটি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে !
এখনো দেখিলো স্বপ্নে তাদের কোলে শুয়ে ঠিক তেমনি,
ল ক'রে যাই চুমু খেতে চাই জেগে উঠি ভাই অমনি !

ওথ্‌লানো দুধ উপ্‌চে উঠলো তোলপাল করে বক্ষে,
টন্‌ টন্‌ করে প্রত্যেক শির ;—অশ্রু বহে দু'চক্ষে ;
অভিশাপ দিই বিধাতার পর—এ কি নিষ্ঠুর শাস্তি !
সুখের খেলনা হাতে দিয়ে তুলে কাড়েন মুখের গ্রাসটি !
সখিলো তোরা ত দিব্যি আছিস্‌—নাইক দুঃখু ভাবনা,
আমারি এ পোড়া চক্ষে কেন লো জমে আছে যত কান্না ?
সঙ্গিনী মম, বন্দিনী সম কাটাই দিবস-রাত্রি,
হায় লো আমরা মাটির মানুষ অমৃত-লোকের যাত্রী !"

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

গল্পের আরম্ভ

স্বপ্নের মামলা করতে আমার সেদিনের মহকুমা-যাত্রাটার মাঝখানে যে এমন রসে-রঙে অপরূপ একটী গল্প জ'মে উঠ্‌তে পারে, টিকিট কিনে ট্রেনে ওঠ্‌বার সময় একবারও তা মনে হয়নি। ঘটনার রাজযোটকে মাণিক-যোড় ঠিক ঠিক মিলে গেল—ঈশ্বরদী ষ্টেশনে।

যুগলের দুটীতেই কিন্তু পুরুষ মানুষ। চোয়াড়ী চেহারা; কালো রঙ। একজনের বেশ ছোক্‌রা বয়স, আর একজনের পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছোক্‌রাটী বেঁটে, মোটা; হোঁদল-কুৎকুতের মত হাঁড়িপানা মুখ, ছোট ছোট চোখ, বুকের পাঞ্জা সত্যি করেই ডবল-বহর। কিউ ক্ল্যাসের এঞ্জিন তার উপর দিয়ে সিটী মেরে চলে গেলেও পাঁজরার হাড়ের একখানাও একটু দোমড়াবেও না! আর "অধিক-বয়স" বাবুটীর বুক, পিঠ, কোমর মাঝারি মাপের, ভুঁড়িটী কিছু যেন দম-ভারী, কারণ পরে খোঁজ নিয়ে তাঁর পরিচয় পেলাম—রাজশাহী, কি মালদা, মীরাট না—কি জালিয়ানওয়ালা বাগ—এম্‌নি কোন্‌খানকার যেন তিনি "আসিষ্টাণ্ট" সরকারী উকীল—পয়সাও কিছু আছে, কিন্তু মাথার তেলোয় তেল্‌ দেন না;—জল খান চানাচুর; মৃত-দার, সুতরাং সাড়ী, ব্লাউজ, গয়না, গন্ধ কেনার বালাই থেকেও ভগবান রক্ষা করেছেন! দেহখানা দোহারা, গৰ্দ্দানটী অতি-পুষ্ট—লংক্লথের সার্টের ব্যাণ্ড কলারের উপর দিয়ে ঘাড়ের থল্‌থলে মাংসের ঝুল্‌-মুলি কুঁচ্‌কে নেমেছে—অনেকটা দুম্বোর পেছনটার মত। ছোক্‌রাটী তাঁর "জুনিয়র" কি জামাই ঠিক বোঝা গেল না—তবে তিনি যে "his valet, his dog, his man Friday"—তা বেশ টের পেলুম। গাড়ী

আস্‌বার তখনও দেরী ছিল। উকীলবাবু তাই পায়ের টেরিটী-বাজারের মুখ-বন্ধ জুতো যোড়ায় কচ্‌মচ্‌ আওয়াজ তুলে "একসারসাইজ" অর্থাৎ ব্যায়াম করার ভঙ্গীতে "মেন্" প্ল্যাট-ফর্ম্মের উপর উত্তর দক্ষিণ ক'রে জোরে জোরে অনবরত চল্‌তে লাগলেন—আর ছোকরাটীর গলায় বগলসের সঙ্গে বাঁধা শিকলগাছা উকীল বাবুর হাতে ধরা না থাক্‌লেও তিনিও ঠিক ঐ একই রকম দমে-দাপটে তাঁর "বুল্ ডগ" মার্কা জুতো যোড়াটা শাণের উপর ঠক্‌ঠকিয়ে বরাবর হাঁটতে লাগ্‌লেন—একেবারে প্রভুর পায়ে-পায়ে।

আমি চায়ের দোকানে সেই উষ্ণ, তরল, বাদামী নেশা ভরপুর এক পেয়ালা চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করে তখনো চেয়ারখানার উপর বসে ছিলুম। খানিকটা এই প্রৌঢ়-তরুণ কাণ্ডের অদ্ভুত রস নিঃশব্দে উপভোগ করে আর ভাল লাগলো না। মধ্য-রাত্রির নিঃসঙ্গ জাগরণের মাঝখানে কল্পনার তুলি বুলিয়ে গোলাপ ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—এই চায়ের দোকানটা যদি সে-কালের ইরাণ দেশের একটা সরাবখানা হোত আর গুচ্ছে-বাঁধা চাঁপার কুঁড়ির মত আঙুল ক'টীতে সেই ফিকে সোনালি মিঠে সিরাজী দুখানি ঠোঁটের মিলন-তীর্থে তুলে ধরবার জন্য রূপসী কোনো তরুণী এখানে সাকী থাকুতো তো আমি শুধু মুগ্ধ দুটী চোখ তুলে লালস-রভসে সেই আঁখি-যুগলের পানে অনিমেষে তাকিয়ে থাক্‌তুম—দেখতুম, তার মুখের উপর-দিয়ে বুঝি একখানা গানের মূর্চ্ছনা সুরে সুরে শিউরে উঠে রূপের আলোর কোণে কোণে আবছায়া স্বপ্নের মত এলিয়ে পড়েছে! কুতুহলী পথিক কেউ আড়াল থেকে চুরি করে আমার ঠোঁটের উপর সরবতি সুরার রক্ত ছোপ্ মোটা দাগে ফুটে রয়েছে দেখে ভাব্‌তো, সাকী বুঝি এই মাত্র তার মেহেদী পাতার বুক-ছেঁচা খুনে লাল করা ঠোঁট দুখানি আল্‌গোছে ছুঁইয়ে আমার অধর-সঙ্গমে চুমো খেয়ে গিয়েছে! কি ভয়ানক মিথ্যে কথাটাই সে সত্যি বলে মনে কর্‌তো!

হঠাৎ আপিস ঘরের ভিতর থেকে—"হ্যাঁ;—প্রাইভেট নাম্বার?" কথাটায় আমার এমন হীরের কুচি চমকিয়ে-তোলা স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। আবার শুন্‌লুম:—"আমার তের—আপনার?"—আবার—"তের—থার্টিন—একের পিঠে তিন। "আপনার?" এমন সময় ছোক্‌রাটী সেই "জুনিয়র" বা জামাইটী আর কি—ঠিক আমার সোজাসুজি এসে একটু থম্‌কে দাঁড়ালেন—জুতোর পাশ দিয়ে পাথরের কুচি বোধ হয় দু-একটা ভিতরে ঢুকেছিল—একটা আঙুল গোড়ালির ফাঁক দিয়ে একবার পুরে আবার বার করে এনে উঠে দাঁড়ালেন—আমি হঠাৎ জিগ্‌গেস কর্‌লুম, "মশাই, আপনারা কোথায় যাবেন?"

ছোক্‌রা আমার দিকে কি এক রকম ভাবে খানিকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, সে চাওয়ার ভিতর খানিকটা বিস্ময় আর অনেকটা তাচ্ছিল্য ছিল। তার কারণ বোধ হয় তিনি ভাব্‌লেন যে—এই ময়লা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী গায়, দাড়ি ঝোলানো, চশ্‌মা-পরা, রোগা হ্যাঙ্‌লা লোকটার এমন করে আমাকে প্রশ্ন করবার কি "রাইট্"

আছে ? আমি সে ভাবটা বুঝেছি বলে তাঁকে জানতে না দিয়ে আবার জিগ্‌গেস্ করলুম, "আপনারা কোথায় যাবেন ?"

এবার ছোকরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে :—বললে, "ঘ্যাটো—।" ভাগ্যিস তখনি একখানা মালগাড়ীর গার্ড সাহেব গাড়ী ছাড়ার বাঁশীটা বাজালেন—"সুঃ-র্‌-র্‌-র্‌" তাইতেই জায়গার নামের পাদ-পূরণটুকু হয়ে গেল। ভিতরে ছোটবাবু তখনো কথা কইছিলেন, এবার শুনলুম, "একুশ—? আচ্ছা গাড়ী কোথায় ?" ইন্ সাইট ? আচ্ছা ! জমাদার জমা—দার !"

বাইরে থেকে তিনি জবাব দিলেন, "হুজুর।"

"প্যাসেঞ্জার আসছে"—

"তেরি পাসিন্‌জার"—বলে জমাদার উঠে হাঁকলেন :—"এ রঘুয়া, আরে ঘন্টি দে হো, পাসিন্‌জার আতা হ্যায়।"

ছোকরাটী তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পা ফেলে চার-পাঁচ ধাপ এক সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন :—"গাড়ী আস্‌চে, গাড়ী আস্‌চে।" উকীলবাবু অমনি পিছন ফিরে উত্তর কর্‌লেন, "আস্‌ছে ?" গাড়ী কিন্তু তখনো পাক্‌সীতেই পৌঁছোয়নি। চকিতে—এ কি—চমৎকার ! নিটোল অঙ্গে তার নবযৌবন স্বপ্ন জাগিয়ে জমে উঠেছে—! এ যে এক সুন্দরী !

সে প্রগল্‌ভা রমণী, তন্বী। নীল সাড়ী কুঁচি দিয়ে পরা, আঁচ্‌লাটায় সাঁচ্চার কাজ করা ; ফেরোজা ব্লাউজের বুকের কাট্‌টা "চোলির" ধরণে নামিয়ে টেনে কাটা। পায়ে জরির চটী, গলায় নেকলেসের সোনার উপর জহরী জড়োয়ার আলো আছাড় খেয়ে পড়্‌ছে—হাতে দু'গাছি করে সোনার চুড়ি।

তরুণী স্বচ্ছন্দ লঘু পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে উকীল বাবুর সাম্‌নে গিয়ে বেশ বিনম্র ভাবে বল্লেন, "দেখুন,—নমস্কার ! যদি কিছু মনে না করেন—একটা কথা—"

উকীল বাবু তাড়াতাড়ি দু'হাত যোড় করে বুকের একটু উপরে তুলে বল্লেন,—

"নমস্কার—নমস্কার। বলুন, বলুন—মনে করবার আর কি আছে ?"

ছোকরাটীও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—"নমস্কার ! বলুন, বলুন।" এখন বেশ পুট্‌ পুট্‌ করে কথা ফুট্‌লো !

তরুণী বল্লেন,—"আমি একটু মুস্কিলে পড়েছি—এক রকম বিপন্ন বল্লেই চলে—"

উকীল ও সঙ্গী ছোক্‌রা বাবুটি একসঙ্গে বলে উঠ্‌লেন, "কি রকম ? কি রকম ?"

"একজন—আপনারা হিন্দু, নিশ্চয়—?"

"হ্যাঁ।"

"ব্রাহ্মণ ?"

দুজনে একস্বরে যেন "কনসার্ট" বাজিয়ে উত্তর দিলেন, "বৈদ্য।" তরুণী বল্‌তে লাগ্‌লেন—"একজন ব্রাহ্মণ, বুড়ো, গরীবও বোধ হয় ; পূর্ব্ব বাঙলায় বাড়ী, নেহাৎ সাদা-সিদে ভাল মানুষ—তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নাম্‌তে যাচ্ছিলেন—ভিতর থেকে মোট ধরে একটা কুলি পিছনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো,—"হট্‌ যাও, হট্‌ যাও বাবু, উৎরেগা।"

ছোক্‌রাটী টিপ্পনী কাট্‌লেন :—"কি impertinent !"

উকীলবাবু জিগ্‌গেস কর্‌লেন—"হ্যাঁ, তারপর ?"

—"ঠাকুর যা-যা বল্লেন আমি তাই ঠিক তেম্নি করেই বল্‌ছি। ঠাকুর উত্তর করলেন :—"রহ রহ—বাবু, যাতা হয় তো কি হোতা হয়? আমি যাতা হয় না?"

"ওঃ নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে—তা হলে?" বলে ছোক্‌রা ফিক্ করে হাস্‌লে, আর ঠোঁট দুখানা সাইকেল রেঞ্চের স্ক্রু ঘোরালে যেমন হয় তেমনি ধাঁ করে একটু ফাঁক হয়ে গেল।

তরুণী বল্‌লেন,—"হ্যাঁ, সাবেকী লোক, তা ঠিক। ঠাকুরের কথা শুনে কুলিটা আর জবাব কিছু না করে এক ধাক্কা মার্‌লে, ঠাকুর অমনি হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। চটীর একপাটী ছিট্‌কে কোথায় গিয়ে পড়লো—ঠাকুর চটে আগুন হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন :—"পাজী, হারামজাদা, হালা, যাইবো যাইবো চটী—আমি হালাকে দেখুম" ব'লে আর একপাটী চটী নিয়ে রুখে উঠতে গেলেন কিন্তু পারলেন না—বেচারীকে ব'সে পড়্‌তে হল—মাথাটা ফেটে গিয়ে রক্ত ছুটছিল—"

উকীল বাবু বল্‌লেন,—"সত্যি নাকি? এ যে প্রায়—"বল্‌তেই ছোক্‌রা কথাটা শেষ করে বল্‌লে,"—culpable homicide।"

সুন্দরী মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিলেন :—"Not amounting to murder"—বাঁ পাটাতেও খুব চোট লেগেছে—পাতাটা ফুলে উঠেছে।"

ছোকরাটী বলে উঠ্‌লেন—ডাক্তারি কেতায়—"ফুলে উঠেছে! তা হলে compound fracture।"

তরুণী ছোক্‌রার বিদ্যের বহর বুঝে এ কথায় আর কিছু উত্তর না করে উকীল বাবুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—"এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই মজা দেখ্‌ছিলেন—কুলীটা তো পিছনের দরজা খুলে অনেক আগেই ভাগোয়া হয়েছিল—এবার আর ঠাকুরের কথা কারো ভাব্‌বার ফুরসুৎ হলোনা—যে যার মত গুটী সুটী স'রে পড়লেন। সব-শেষে প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি—বেচারী বুড়োকে ধরে তুলতে গেলুম—বুড়ো অমনি বলে উঠ্‌লেন :—"রাহেন, রাহেন—করেন কি? করেন কি? পর-স্ত্রী পর-পুরুষ স্পর্শ করবেন না।" আমি বল্লুম, "আপনি আমার বাবার বয়সী লোক, কিছু ভাবনা নেই। আপনি আসুন"—আমি বুড়োকে ধরে কোনমতে ওয়েটিং রুমে এনে জল-টল দিয়ে একটু সুস্থির করেছি, কিন্তু ব্যথাটা তার বড্ড বেড়েছে।"

উকীল বাবু বলে উঠ্‌লেন,—"এ যে দস্তুরমত Case চলে। কেন, ষ্টেশনের বাবুরা কি Railway police কেউ এদিকে দেখ্‌লে না? কি আশ্চর্য্য irresponsible লোক সব! আপনি report করুন।"

তরুণী বল্‌লেন,—"প্লাট্‌ফর্ম্মের একেবারে শেষের দিকে ঘটনাটা ঘটেছিল আর এত রাত্তির—ওঁরা হয়তো কেউ খবরই পান নি—আমিও তাঁদের notice-এ এ কথা আনি নি, কারণ তাতে লাভ-ফলের চেয়ে হায়রাণই বেশী।"

এর ভিতর ছোট বাবু সাদা সুট্‌টী পরে বেরিয়ে এলেন; তাঁর পিছনে তার-বাবু। জমাদার তো অনেকক্ষণ হলো গা মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সুন্দরীর রোশ্‌নাই-রাঙা মুখের পানে কেবলি তাকাচ্ছিল, কখনো

বা ঘাড়-মাথা নেড়ে "হাঁ, হাঁ" করে মাঝে মাঝে সুন্দরীর রূপ ও কথার তারিফ করছিল। বাবুরা বেরিয়ে এসে আর জিগ্‌গেস করবেন কি, তরুণীর মুখের উপর কার গোলাপী রঙ বুলিয়ে টানা সে-রূপের আল্‌পনার দিকে কেবলি তাকাতে লাগলেন। সুন্দরী নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতে একবার-মোটে সে-দিকে তাকিয়ে উকীল বাবুকেই তাঁর নিবেদন জানালেন যে—ঠাকুর নাটোর যাবেন, আর শুনেছেন, ওঁরাও যখন নাটোরেই যাচ্ছেন—যদি দয়া করে আহত বুড়ো বেচারীকে সঙ্গে নিয়ে ঠিকানায় পৌঁছে দেন, তা হলে তিনি নিতান্ত বাধিত হন।

কথা শুনেই উকীল বাবু আস্তে আস্তে পাশে সরে গিয়ে বল্‌লেন,—"আমি নাটোরেও যেতে পারি—সেখান থেকে আবার রাজসাহী যাবার কথা আছে,—কাজেই ওঁকে সঙ্গে নেওয়া তেমন সুবিধা হবে—" বলতে বলতেই সুন্দরীকে এড়িয়ে-ছাড়িয়ে তিনি অন্যদিকে এগিয়ে সরে গেলেন।

তাঁর ছোকরা সঙ্গীটী—"আর সেখান থেকে আমরা ড্যার্‌জিলিংও যেতে পারি, বুঝলেন—আচ্ছা, নমস্কার!"—বলে প্রভুর পাছু নিলেন। চোখের পলক তুলে তাকাবার ফাঁকটুকুর ভিতরেই দেখি, রেলের বাবু দুটী আবার ঘরের মধ্যে ঢুকছেন। আমি প্রথম থেকেই সব শুন্‌ছিলুম, এবার তরুণী একটু কিন্তু-মতন হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিটা ফেরাতেই আমি বল্লুম—"নমস্কার, চলুন তো ঠাকুরটীকে একবার দেখে আসি।"

সুন্দরী যেন অনেকখানি আশ্বাস পেয়ে নম্রভাবে নমস্কার নিবেদন করে কৃতজ্ঞতা-ভরা স্বরে বল্‌লেন, "যাবেন? দয়া করে আসুন তা হলে।"

আমি তাঁর পিছনে পিছনে ওয়েটিং রুমে ঢুকে দেখি, একটা আরাম-কেদারার উপর ঠাকুর হেলান দিয়ে কাত হয়ে আছেন,—মাথায় জল-পটী, এক-খানা হাতে হেম দিয়ে সুতো বার করে "ট্রিম" করা আদ্দির গোটা রুমালেই পটী দেওয়া হয়েছে। পায়েও জলপটী আছে। কিন্তু ব্যথাটা বোধ হয় বড্ড বেড়েছিল, ঠাকুর কাত্‌রাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে ঠাকুর ব্যথা-ভরা ভারী গলায় বলে উঠ্‌লেন, "গেছি, গেছি বাবু, আরে গ্যাছিগো—"

আমি বল্লুম, "না, যাবেন কেন? আপনার কিছু ভয় নেই। আর গেছে কি?"

"হুক্কাডা মশায়, হুক্কাডা একবারে দুই খণ্ড অইছে। আহা, এমন উত্তম হুক্কাডা—বাবু পেতি বিনাইএর মাথাডার মত চক্‌চক্যা খুলিডা।"

এটা করুণ রস হলেও উত্তরে হাস্যই প্রবল হয়ে আসা স্বাভাবিক। আমি অনেক কষ্টে মুখ টিপে হাসি চেপে নিয়ে বল্লুম,—"আহা, হুঁকো গেছে—আবার হবে।"

"অয় অইব। মশয়, সেইডীর মতন কি আর অইব?"

তরুণীও অনেক কষ্টে মুখ ফিরিয়ে হেসে হাসি চেপে নিয়ে বল্‌লেন, "ও কথা এখন থাক্ ঠাকুর মশাই, আপনার মাথার কাটা আর পা-টা এঁকে একবার দেখান।"

"পাও দেখাইমু? আপনি ব্রাহ্মণ?"

"না। আপনি দেখান।"

দেখে মাথায় জলপটী দিলেই বেশ

উপকার হবে বুঝলুম ; কিন্তু পায়েই একটু শক্ত লেগেছিল। ব্যথা যা তা পায়েই, বুঝতে পারলুম। তরুণীকে সেইখানেই বসতে বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে সোরাবজীর দোকান থেকে এক "পেগ" ব্র্যাণ্ডি এনে পায়ে খুব করে ডলে দিলুম। ওষুধটার নাম আর ঠাকুরকে বললুম না ; কারণ সাত্ত্বিক লোক, ওষুধের জন্য আবার প্রায়শ্চিত্ত না করতে হয়! মালিস করার পর ঠাকুর যেন একটু আরাম বোধ করলেন। আমি সুন্দরীকে এইবার জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

তরুণী একটু হেসে বল্লেন,—"আমার একটী বন্ধুকে এগিয়ে দেবার জন্য আমি এই অবধি এসেছিলুম। তিনি অনেকদিনের জন্যে বিলেত যাচ্ছেন—আমি আবার এই next ট্রেণেই মৈমনসিং ফিরে যাব।"

বন্ধুর কথা শুনে আঁৎকে ওঠবার আমার কোনো কারণই ছিল না ; শুধু ঠাকুর একবার কথাটা শুনে হঠাৎ চোখ মেলে তরুণীর পানে চাইলেন, তারপর বললেন—"অবিবাহিতা?"

কিছু না বলে সুন্দরী আবার মুচকে হাসলেন। আমি সে রূপের প্রশংসা করবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারলুম না, বল্লুম,—"দুঃসাহস আর ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন—হাসির সঙ্গে গালে টোলটী পড়ে, মনে হয় যেন কোন ছবিওয়ালা রংএর তুলি আলগোছে বুলিয়ে চট্ করে ওটুকু বসিয়ে দেয়!"

সুন্দরী সম্পূর্ণ সপ্রতিভভাবেই আবার হেসে উত্তর করলেন,—"আপনারা বুঝি সেইটে খুব সুন্দর দেখেন?"

"না, আমি আর ও-সব সুন্দর দেখিনে, তবে যাদের দেখবার চোখ আছে, অধিকার আছে, তারা দেখে কি না, তাই বললুম।"

"আমার মান বাড়ালেন! ধন্যবাদ। এখন মন রাখবার কিছু ব্যবস্থা করবেন না? ঠাকুর মশাইএর পক্ষে একলা যাওয়া থার্ড ক্লাশের ভিড়ের ভিতর—"

আমি কথার পিঠে উত্তর দিলুম, "সে ব্যবস্থা হয়েই আছে। আমিই ঠাকুরমশাইকে নিয়ে নাটোরে তাঁর ঠিকানায় রেখে আসবো।"

"আমার বড় অন্যায় যে আপনার ঘাড়ে এ বোঝা চাপাচ্ছি, তবে এটা একটী ভদ্র মহিলার সত্যিকার-একজন পুরুষের দয়ার কাছে বিনীত দাবী!—বোধ হয়, কিছু মনে করলেও দোষ নেবেন না!"

"তা হলে আর নিজে যেচে আসবো কেন?"

"ঠিক কথা। যদিও প্রথমে যখন আপনিই ভদ্রতার সূক্ষ্ম গণ্ডীটা সরু এক সুতো এড়িয়ে গিয়েছেন, তখন আমারও সেটা অমন strictly observe করার দরকার আছে বলে মনে করিনে। তাই বলচি, যদিও মন্দ লোকে এর পিছনে একটা কিছু সরস কথা আছে বলে মনে করতো—"

"সেটা তারা বড্ড অন্যায় করে একটা মিথ্যা কথা ভাবতো—"

"একেবারেই মিথ্যা কথা। সত্যি!"

এমন সময় ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ হুস্ হুস্ করে এসে প্লাটফরমে থামলো। আমি ঠাকুর মশাইকে ঘাড়ে ভর দিয়ে উঠতে বললুম।

তরুণী ও আমি ধরাধরি করে ঠাকুরকে

এক রকম ঘাড়ে তুলে নিয়েই গাড়ীতে এনে তুললুম। আমার টিকিট ছিল না--নেমে গার্ডকে বলে এসে আবার গাড়ীতে উঠে ঠাকুরকে আরাম-মত শুইয়ে দিয়ে জানালার কাছে বস্‌লুম।

"এই আপনার যাবার ভাড়াটা--আর ঠাকুর মশাইএর থার্ড ক্লাশের উপর সেকেণ্ড ক্লাশের Fareটা নিন্"—বলে সুন্দরী একখানা দশ টাকার নোট আমার হাতের কাছে তুলে ধর্‌লেন। আমি বল্‌লুম ;—"আমি গরীব, কিন্তু তবু এ অপমানটা না করাই আপনার উচিত ছিল।"

"অপমানটা তো আপনিই আগে করেছেন।"

"একটা কথা হঠাৎ বলে ফেলেছিলুম বলে বারে বারে খোঁচা মারছেন! আচ্ছা, এইবার শোধ-বোধ।"

"কিন্তু আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

"আপনার বিশেষ দয়া—"

"আর এই যে উপকার করলেন—এ কথা কখ্‌খনো ভুলবোনা।"

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লুম, "ও কথা আপনি বল্‌বেন না। ঠাকুর মশাই আপনারও যা, আমারও তা।"

"হ বাবা ঠিক কইছ। আমি তোমাগোর ক্যাডা? কিন্তু যে দয়া করছ আমি তা ভুলুম না। মা, আমার আশীর্ব্বাদ লও, মা, জননী জগদ্ধাত্রী মা, আশীর্ব্বাদ করি, বন্ধু তোমার সুস্থ থাক্যা ল্যাখা-পড়ি শিখ্যা ছ্যাশে ফিইর্‌য়া সুখে থাক্।"

তরুণী নীচে থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—"আপনাকে প্রণাম, ঠাকুর মশাই। কেমন থাকেন, আমাকে চিঠি লিখ্‌বেন—মৃণালিনী ব্যানার্জ্জী, পণ্ডিত-পাড়া রোড, মৈমনসিং বলে।"

"হ, হ, ল্যেখুম" বলে ঠাকুর চোখ বুজলেন।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমি সুন্দরীকে বল্‌লুম,"আমাদের শুভ ইচ্ছা—নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো এই খানে এমন অবস্থায়! স্মৃতিটা অনেকদিন মনে থাকবে।—এ একটা চমৎকার গল্পের আরম্ভ—"

তরুণী নমস্কার করে বল্লেন—"হ্যাঁ, চমৎকার আরম্ভ কিন্তু শেষ হবে এর কোথায় যে—?"

"সে বুঝি আর হবে না, কেন না তা হবার যো নেই। আমি একটা কালো বউ বিয়ে করেছি আর পুত্র-কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা—এই নজীরে দশ বৎসরে পাঁচটা। আপনারও যে বন্ধুটীকে এগিয়ে দিতে এতদূর এসেছিলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি ফিরে আসুন, তারপর আপনার হৃদয় তাঁর হউক, তাঁর হৃদয় ইত্যাদি। আর এই বিবাহিত জীবনের সাহস ও জোরেই অমন নিঃসঙ্কোচে আপনার সঙ্গে কথা বলেচি,—ক্ষমা করবেন।"

তরুণী এবার একটু জোরেই হেসে উঠে বল্‌লেন, "কিন্তু এ যে আগাগোড়া ভাই। আপনাদের ভুল হয়েছে—বন্ধুটী আমার পুরুষ নন্, নারী। আর আমার স্বামী পশ্চিমে একজিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার।"

আমি হঠাৎ অবাক হয়ে একটু চুপ করে

থেকে তরুণীর সিঁথির উপর সিন্দূর-রেখাটি লক্ষ্য করে বল্লুম,—"আচ্ছা, তবে আসি। সৌরীন বাবুকে লিখবো'খন—তিনি যদি কোন রকমে এ গল্পের শেষ করে দিতে পারেন!"

তরুণী হেসে বল্লেন,—"বেশ, তাই লিখবেন। এখন ধন্যবাদ। নমস্কার!"

"নমস্কার! তা হলে আসি।"

"আসুন। au revoir—ও রিভোয়া।"

বল্‌তে বল্‌তেই গাড়ী বাঁশী বাজিয়ে ষ্টেশন ছেড়ে ছুট্‌লো।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সঙ্কলন

রবিবার

১

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া-গাড়ি।
রবিবার সে কেন, মাগো,
এমন দেরি করে?
ধীরে-ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে?
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

২

সোম মঙ্গল বুধ এরা চায়
থাকবারি জন্যেই,
বাড়ি ফেরার দিকে এদের
একটুও মন নেই।
রবিবার সে কেন, মাগো,
এমন তাড়া করে?
ঘণ্টাগুলো বাজে যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়িতে তার
কাজ আছে সব চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

৩

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোট ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেম্‌নি উঠি জেগে
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

মা-হারা

১

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেল্‌তে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুন্‌গুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলোয় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোল্‌না ঠেলে-ঠেলে;
মা গিয়েচে, যেতে-যেতে
গানটি গেচে ফেলে।

২

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলি-বনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে?
কবে বুঝি আন্‌ত মা সেই
ফুলের সাজি ব'য়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হ'য়ে।

৩

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জান্‌লা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে,
মনে হয় মা আমার মুখে
চাইচে অনিমিখে।
কোলের পরে ধরে' কবে
দেখ্‌ত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেচে
সারা আকাশ ছেয়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

শাস্তি

সাত-আট্‌টে সাতাশ আমি
বলেছিলুম বলে'
গুরুমশায় আমার পরে
উঠ্‌ল রাগে জলে'।
মাগো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেই যে রঙীন পুতুলখানি
দিয়েছিলে কিনে
খাতার মধ্যে ছিল ঢাকা;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগে-মেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে।
মাগো, আমি জানাই কাকে?
ওঁর কি গুরু আছে?
আমি যদি নালিশ করি
এক্ষণি তাঁর কাছে?
ওঁর কি কোনো নেইক পুতুল?
করতে গিয়ে খেলা
কোনোরকম পড়ায় উনি
করেন নি কি হেলা?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে
বল্‌ দেখি, মা, ওঁর মনে তা'
কেমনতরো লাগে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

মূর্খ

১

সেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোসাঁই,
আমি ত, মা, চাইনে হ'তে
পণ্ডিত মশাই।
না যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে,
আমার তাতে কিইবা হবে?
মূর্খ যা'রা তাদেরি ত
সমস্ত-খন ছুটি?

২

তারাই ত, মা, রাখাল-ছেলে,
গোরু চরায় মাঠে,
নদীর ধারে বনে-বনে
তাদের বেলা কাটে।
ডিঙীর পরে পালটি তুলে'
ঢেউয়ের মাথায় দুলে-দুলে
তারাই ত যায় ঝাউ কাটতে
নদীপারের চরে।
তারাই মাঠে মাচা পেতে
পাখী তাড়ায় ফসল-ক্ষেতে,
বাঁকে করে' দই নিয়ে যায়,
বেচে ঘরে-ঘরে।

৩

কাস্তে হাতে, চুবড়ি মাথায়,
সন্ধে হলে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ-ছেলে,
মন যে কেমন করে।
যখন হাতে নিয়ে খড়ি
পাঠশালাতে লিখি-পড়ি,
গুরুমশাই দুপুর-বেলায়
বসে-বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে কা'রা গোরুর গাড়ি
গান গেয়ে যায় গলা ছাড়ি'
শুনে আমি পণ করি যে
মুর্খু হব বলে'।

৪

দুপর-বেলায় চিল ডেকে যায়
দূর-আকাশের পারে,
হঠাৎ-হাওয়া বাঁশি বাজায়
বাঁশ-বাগানের ধারে।
পুবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ডালে-ডালে উছলে ওঠে
শিরীষ-ফুলের ঢেউ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব এড়িয়ে চলে,
আমি জানি, এরা ত, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ।

৫

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান।
ঘরে-ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
এমনি কাটে সারাবেলা,
আমি ত, মা, চাইনে আদর
তোমার আদর ছাড়া।
তুমি যদি, মুর্খু বলে'
আমাকে, মা, না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদ্‌লা মেঘের পাড়া।

৬

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে দেব চুল।
ঘাটে যখন যাবে আমি
করব হুলুস্থুল।

রাত থাক্‌তে অনেক ভোরে
আসব নেমে আঁধার ক'রে',
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকব ঘরে
দুয়ার ঠেলে' ফেলে'

তুমি বল্‌বে মেলে' আঁখি
"দুষ্টু দেয়া ক্ষেপ্‌ল না কি ?"
আমি বল্‌ব, "ক্ষেপেচে আজ
তোমার মুখু ছেলে।"
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

যাত্রার আয়োজন

১

দেখ চ না কি, নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার,
সাত সমুদ্র তেরো নদী
আজকে হ'ব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইক হরিশ খোঁড়া,
তাই ভাবি যে কা'কে আমি
করব আমার ঘোড়া ?
কাগজ ছিঁড়ে এনেচি এই
বাবার খাতা থেকে,
নৌকো দে না বানিয়ে, অমনি
দিস্‌ মা ছবি এঁকে।
রাগ করবে বাবা বুঝি
দিল্লি থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাতসমুদ্র-তীরে।

২

এম্‌নি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ ত রোজই থাকে।
বাবার চিঠি এক্ষণি কি
দিতেই হ'বে ডাকে ?
নাইবা চিঠি ডাকে দিলে,
আমার কথা রাখো,
আজকে না-হয় বাবার চিঠি
মাসী লিখুন নাকো।
আমার এ যে দরকারী কাজ
বুঝতে পারো না কি ?
দেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠ্‌বে
বৃষ্টি বন্ধ হ'লে
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কোথায় যাবে চ'লে।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

নক্ষত্রতত্ত্ব

১

ঐ যে রাতের তারা
জানিস্‌ কি মা কা'রা ?
সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন-ধারা।

আমার যেমন নেইক ডানা,
আকাশেতে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেম্‌নি ওদের পা নেই বলে'
পারে না যে আস্‌তে চলে'
এই পৃথিবীর পরে।

২

সকালে যে-নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস্ কলসি-কাঁখে
সজ্‌নে-তলার ঘাটে
সেথায়, ওদের আকাশ থেকে'
আপন ছায়া দেখে-দেখে'
সারা পহর কাটে।
ভাবে ওরা চেয়ে-চেয়ে
হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকাল-সাঁঝে
কল্‌সিখানি ধরে' বুকে
সাঁৎরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে।

৩

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায় ওরা আপন মনে,
যেথায় দুয়োরাণী
সঙ্গে ছেলে মেয়ে দুটো,
কুড়িয়ে নিয়ে কাটা-কুটো
বাঁধ্‌লে কুঁড়েখানি।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে'
হ'ত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায়-খেলায়,
তার পরে, মা, রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।

৪

যেদিন আমি নিশুৎরাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
স্বপন থেকে জেগে',
জান্‌লা দিয়ে দেখি চেয়ে
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
ঝাপ্‌সা আছে মেঘে।
বসে-বসে ক্ষণে-ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
ওদের স্বপ্ন বলে'।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
ভোরবেলা যায় চলে'।
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে
দেখ্‌তে না পায়, আলো খোঁজে,
সবই হারিয়ে ফেলে।
তাই আকাশে মাদুর পেতে'
সমস্ত-খন স্বপনেতে
দেখা-দেখা খেলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

খেলা-ভোলা

১

তুই যে ভাবিস্, দিন রাত্তির
খেল্‌তে আমার মন,
কক্ষনো তা সত্যি না, মা,
আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে'
বৃষ্টি-বাদল গেছে ছুটে',
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে,
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পুজোর সানাই বাজ্‌চে দূরে,
ঝগড়া করে তিনটে শালিখ্
রান্নাঘরের চালে;
খেল্‌নাগুলো সাম্‌নে মেলি'
"কি যে খেলি," "কি যে খেলি,"
সেই কথাটাই সমস্ত-খন
ভাব্‌নু আপন মনে।

লাগ্‌ল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারা বেলাই,
রেলিং ধরে' রইনু বসে'
বারান্দাটার কোণে।

২

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমন যেন বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাতের পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ী;
চেয়ে চেয়ে চুপ্‌ করে' রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ,
মনে ভাবি, ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাক্‌ত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তক্ষনি যে যেতেম, তারে
লাগাম দিয়ে কষে'।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে'।

৩

একেক দিন যে দেখেছি তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ্‌ করে' কি ভাবিস্‌ বসে'
ঠেস্‌ দিয়ে জান্‌লাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্‌ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই,
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠপারে কোন্‌ বটের তলার
বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে,
মনে ভাবি, কোন্‌কালে সে
কোন্‌ দেশে তোর বাড়ী ছিল
কোন্‌ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে,
তোমায় আমায় ভোরবেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে'।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৮।

ভুল স্বর্গ

১

লোকটি নেহাৎ বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল সখ ছিল নানা রকমের।

ছোট ছোট কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোট ছোট ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত—যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখীর ঝাঁক; কিম্বা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরচে; কিম্বা উঁচু নীচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝরনা হবে, কিম্বা পায়ে চলা পথ।

বাড়ীর লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগ্‌লামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগ্‌লামি তাকে ছাড়্‌ত না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায়

ফাঁকি দেয় অথচ পরীক্ষায় খামকা পাস করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে' তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বলচে, "হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা?" মেয়েরা বলচে, "চললুম ভাই, কাজ রয়েচে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে;" কেউ বলে না, "সময় অমূল্য।" "আর ত পারা যায় না" বলে' সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুসি হয়। "খেটে খেটে হয়রান হলুম" এই নালিশটাই সেখানকার সঙ্গীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে' বসতে চায় শুনতে পায় সেখানেই ফসলের ক্ষেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেচে। কেবলি উঠে যেতে হয়, সরে' যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে' যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মত।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বেঁধে নিয়েচে। তবু দুচারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে পড়ে' তার চোখের কালো তারা দেখবে বলে' উঁকি মারুচে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চঞ্চল ঝর্ণার ধারে তমাল-গাছটির মত স্থির।

জান্লা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেম্নি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই!"

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বল্লে, "কাজ করুব তার সময় নেই।"

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝ্তে পারুলে না। বল্লে, "আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

বেকার বল্লে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কি কাজ দেব?"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে' জল তুলে নিয়ে যাও তারি একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কি হবে? জল তুল্বে?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র করুব।"

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বল্লে, "আমার সময় নেই, আমি চল্লুম।"

কিন্তু বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারুবে কেন? রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয়, আর রোজ সেই একই কথা, "তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করুব।"

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগ্ল, কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্লে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করুলে, "এর মানে?"

বেকার লোকটি বল্লে "এর কোনো মানে নেই।"

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে' সেটিকে সে নানা আলোতে নানারকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্লে। রাত্রে, থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জেলে চুপ করে' বসে' সেই চিত্রটা দেখ্তে লাগ্ল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেচে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল, তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েচে। পা দুটি যেন চল্তে চল্তে আন্-মনা হয়ে ভাবুচে —যা ভাবুচে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মানুষ একপাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বল্লে, "কি চাও?"

সে বল্লে, "তোমার হাত থেকে আরো কাজ চাই।"

"কি কাজ দেব?"

"যদি রাজি হও, রঙীন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধ্‌বার দড়ি তৈরি করে' দেব।"

"কি হবে?"

"কিছুই হবে না।"

নানারঙের নানাকাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধ্‌তে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে' থাকে, বেলা বয়ে যায়।

৪

এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড় বড় ফাঁক পড়তে লাগ্‌ল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে' উঠ্‌ল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড় চিন্তিত হল। সভা ডাক্‌লে। তারা বল্‌লে, "এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটেনি।"

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বল্‌লে, "আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেচি।"

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙীন পাগ্‌ড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝ্‌লে, বিষম ভুল হয়েচে।

সভাপতি তাকে বল্‌লে, "তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।"

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বল্‌লে, "তবে চল্‌লুম।"

মেয়েটি এসে বল্‌লে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখ্‌লে এমন একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৮।

ছেঁড়া খাতা

একখানি ছেঁড়া খাতা পথে পড়ে' আছে অনাদরে,
আঁকা বাঁকা রুল টানা, হিজিবিজি সদরে অন্দরে,
একতিল ফাঁক কোথা নাই।
কোনো পাতা কালি-ঢালা একেবারে সকলখানাই
কোন্ শিশু-হৃদয়ের শ্যামল সোহাগ-রস মাখা।
কোনো পাতে আঁক কষা। কোনো পাতে সযতনে আঁকা
দূর পাহাড়ের ধারে গুটি-দুই কুটীরের ছবি,
পশ্চাতে উদিছে কিম্বা অস্তাচলে চলিয়াছে রবি,
এককোণে তন্বী চন্দ্রলেখা,
গুপারি বনেরে ছুঁয়ে চলে' গেছে দীর্ঘ পথরেখা
কোন্ সুদূরের পানে
কেউ নাহি জানে,
ফুটেছে দীঘির জলে কুমুদ কমল ফুলদুটি,
কলস ভরিয়া ঘাটে চলে যায় গ্রামের বধুটি।

আকাশে পাখীর ঝাঁক, গাভীদল মাঠে,
একটি পাতার বুকে কত আর আঁটে!
তারি মাঝে একপাশে ঘেঁষাঘেঁষি বহু শ্রম করে'
কবিতার ছন্দে লেখা সুন্দর সরল হস্তাক্ষরে,
'যে কেহ এ বহিখানি মালিকেরে না বলিয়া নিবে,
অনন্ত নরক পরলোকে তার নিশ্চয় জানিবে!'
এত বড় ভয়!
নহে কারা দ্বীপান্তর, পিলরি কি গিলোতিন্, একেবারে অনন্ত নিরয়!
চতুর্ব্বিংশ বৎসরের ছোট ছোট সাধ-আশা, দুদণ্ড সঞ্চিত হাসি-গান,
চুকাইয়া দুদিনের ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়া,—তারপরে লভিব নির্ব্বাণ
চির জনমের লাগি' অজানা আঁধার দেশে কোন্ মহা-বিভীষিকামাঝে!
তবুও এ খাতাটিরে করিবারে হাত-ছাড়া পরাণে ক্ষতির মতো বাজে।

না-জানি কি লাগি' আছি, না-জানি কি লাগি' পথ চলি,
কোথা চলি কার পানে, কি লাগিয়া ছলি
মনেরে মানস-গড়া স্বরগের লোভ-ছবি দিয়া,
কি-হেতু আশ্বাস জাগে; রথচক্রে আমারে বাঁধিয়া
দুঃখ-সুখ দুই অশ্ব কে চালায় অলক্ষ্যের পানে,
কোথায় সে উতরিবে তীব্র তমিস্রার মাঝখানে,
কি মহা-বিনাশ-মাঝে ফেলে যাবে, চিরকাল ধরি'
কি বোঝা বহিতে হবে, কি ক্লেশ সহিতে হবে। নিতে সাধ হয় সাথে করি'
পরিচিত প্রিয় এই ক্ষণিকের জীবনের স্মৃতি,
ক্ষণিকের দুঃখ-সুখ, মান-অভিমান স্নেহ-প্রীতি,
ক্ষণিকের জীবনের সমস্যায় সংশয়ে আকুল
ছোট ছোট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ছোট ছোট ভুল,
এই খাতাটিতে করি' সে চির আঁধার-পথে পাথেয়ের মত;
অনন্ত নিরয় ভয় লোভে মূর্চ্ছাগত!...

সহসা কে ডাকে কলভাষে!—
চোখ তুলে চাহি চমকিয়া, চারিপাশে
যাহা-কিছু পড়ে চোখে, যা-কিছু নিরখি,
বলে সবে, ভুলেছ কি

আমি যে তোমারে ভালোবাসি !
আমি আলো, দিছি হাসি।
আমি বারি, বেদনার স্নিগ্ধ সরসতা।
আমি নভঃ দিছি শান্ত প্রসন্ন স্তব্ধতা
তব বক্ষ-তল জুড়ে। আমি বায়ু, দিয়েছি নিশ্বাস
নিবিড় জীবনে ভরি'। মোদেরে কোরো না অবিশ্বাস !
বলে তা'রা,
অনন্তের বুক থেকে কোথা পাবে ছাড়া ?
কোথা আর স্থান আছে ? সব জোড়া আমাদের স্নেহ।
আলোয় আলোয় ছাওয়া এ নিখিল, ভরা এর দেহ
আমাদের সোহাগে সোহাগে ; তুমি তারি এক কণা।
ছেড়ে মোরা দিব ত না
তোমারে নিমেষ লাগি'।
মোদের প্রহরা আছে জাগি'
সকল সুখের পথ, সকল দুঃখের পথ জুড়ি',
ক্ষতি মোরা সহি না কিছুরি,
সহি না ধূলির অপচয় !

ধীরে রাত হয়।
ধীরে এসে পশি গৃহে। অঙ্গনে নিস্তব্ধ অন্ধকার
লজ্জিতা বধূর মতো অসতর্কে কহি' আপনার
লুকানো প্রেমের কথা আছে যেন অবনত মুখে !
স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব ভুলে যাই। পরিপূর্ণ সুখে
শয়ন লভিয়া বুক ভরি'
বিপুল বিস্ময়ে ভরা আপনারে অনুভব করি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

(৭)

ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি—

আধ্যাত্মিক শক্তির বলের মাত্রাটা তো দেখা গেল। যে ক্ষেত্রে সেই শক্তিটার প্রয়োগ হবে সেটাও একটু ভালরকমে বুঝে দেখা দরকার। মনের জোরে জগতে অনেক অসাধ্য সাধন হয়েছে, একথা যেমন সত্য, চারিদিকের প্রতিকূলতার মাত্রা খুব বেশী হ'লে—বাধা একান্ত দুলর্ঙ্ঘনীয় হ'লে, ব্যর্থতার আশঙ্কাও যে সেই পরিমাণে বাড়ে একথাটাও তেমনি সত্য। সুতরাং ইংরেজ অধিকারের অন্তস্তলে একটু প্রবেশ করা দরকার। কাজেই ইতিহাসের পাতা দুচারটী ওল্‌টানো দরকার।

ইংরাজের ভারত-অধিকার জগতের ইতিহাসে একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। একরূপ ঐন্দ্রজালিক ঘটনার সামিল। যে মুষ্টিমেয় বণিক সম্প্রদায় এখানে বাণিজ্য করতে এসে অল্পদিনের মধ্যে গোটা দেশটাকে গ্রাস ক'রে বসেছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারাও বোধ হয় ঠিক ক'রে বলতে পারতনা কাণ্ডটা ঘটল কি ক'রে। সে কোন্ আলাদিনের প্রদীপ, যার কল্যাণে এ অঘটনটা ঘটা সম্ভব হয়েছিল। জিঙ্গোশ্রেণীর ইংরাজরা অবশ্য কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য তলোয়ার আস্ফালন ক'রে শুনিয়ে থাকেন যে, আলাদিনের প্রদীপটা ব্রিটিশের বীর-হস্তের তরবারি। কথাটা যেমন দাম্ভিকতা-পূর্ণ তেমনি মিথ্যা। মিথ্যাটা আবার এম্‌নি ক্ষণভঙ্গুর যে সামান্য একটা জেরার আঘাতেই কাৎ হয়ে পড়ে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের সুদূর দ্বৈপায়ন পিতৃগৃহ হতে কতগুলি তরবারি আমদানী করেছিলেন এবং সমস্ত ভুভারতে সে সময়ে তরোয়াল চালাবার শাদা হাতই বা কখানি ছিল, তার নিকাশ তলব করলেই আওয়াজটা যে কত-বড় ফাঁকা আওয়াজ বুঝতে কারো বাকী থাকবেনা।

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাতে হ'লে খরচ-পত্রের যে কিছু কিছু দরকার হয়ে থাকে ইংলণ্ডের সে অভিজ্ঞতা যথেষ্টই আছে। নেপোলিওনীয় যুদ্ধের ব্যয়-ভারের চোটে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় দেহে যে ক্ষত হয়েছিল—সে ঘা সারতে অন্ততঃ এক শতাব্দী লেগেছিল। জর্ম্মণ-যুদ্ধের-ঘা কোনও কালেই সারবে কিনা সে সম্বন্ধে বড় বড় ক্ষত চিকিৎসকদেরও বিশেষ সন্দেহ আছে। কিন্তু ভারত অধিকার করতে এক পয়সা খরচও ইংলণ্ডের পাকা বা কাঁচা রোকড়ে কোন ঐতিহাসিক গবেষণাই যে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে, এরূপ শোনা যায়নি। অন্য পক্ষে মহম্মদ ঘোরী হতে আরম্ভ ক'রে অন্য যে কোনও বিদেশীকে সত্য সত্যই তরবারির সাহায্যেই এদেশে একছটাক জমিও দখল করতে হয়েছে, তাকে ঘরের রেস্ত কিছু না কিছু খরচ করতেই হ'য়েছে। এমন কি তৈমুরলঙ্গের নাদির সাহের মতো যারা এদেশটাকে মাছ-ভাজা করতে এসেছিল, তারাও সে কাজটা যে পুরোপুরি মাছের তেলেই সেরেছিল এমন মনে হয় না। মধ্য এসিয়ার তেল তাদের একটু না একটু সঙ্গে ক'রে আনতে হয়েই ছিল।

অনেকেরই ধারণা পলাশীর যুদ্ধের পর হতেই এদেশে ইংরাজের অধিকারের পত্তন হয়েছে। কিন্তু ওটা একটা ঐতিহাসিক কুসংস্কার মাত্র। সকল রকম কুসংস্কারেরই যে কারণে উৎপত্তি ঘটে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—অর্থাৎ ভাসা ভাসা উপর-টপকা পল্লবগ্রাহী জ্ঞানের দরুণ। সমসাময়িক ঘটনাগুলি একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে মুর্শিদাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা সুদূর স্বপ্নেও ক্লাইবের মনে উঠেনি। উঠলেও তাতে যে বিশেষ ফল হতোনা ক্লাইবের মতো সুচতুর লোকের পক্ষে সেটা বুঝা মোটেই শক্ত ছিলনা।

সিরাজদ্দৌলার বদলে মীর জাফরকে মেনে নেওয়া লোকের পক্ষে তেমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার ছিলনা। মুর্শিদাবাদের নবাবী মসনদে এরূপ ওলট-পালট কাণ্ড পূর্ব্বেও কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার যায়গায় ক্লাইব বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে মেনে নেওয়া এদেশের লোকের পক্ষেও সহজ হতোনা। ক্লাইব সেটা বিলক্ষণ জানতেন। পলাসীর যুদ্ধের আট বৎসর পরেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও শক্তি-সামর্থ্যের ধারণা ক্লাইবের মনে এতটা জাগেনি যে, বাংলার শাসন-দণ্ড অবলীলাক্রমে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার কথা তাঁর মনে উঠতে পারত। সেরূপ উঠা সম্ভব হলে, রীতিমত প্রণালীতে কুর্ণিশ ক'রে নজর দিয়ে বাদসাহের দরবার হতে বাংলার দেওয়ানীর সনদ লাভ করতে ছুটতেন না। আসল কথা পলাশীর যুদ্ধের পরও অনেক দিন ইংরাজের আকাঙ্ক্ষার দৌড় কারবারের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে বেশীদূর এগোতে সাহস করেনি। দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে হাতের পুতুল ক'রে রাখার জন্য রীতিমত প্ল্যান ও চেষ্টা হয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কোন বাণিজ্যের সুবিধালাভের জন্য।

পলাশীর যুদ্ধজয়ের সঙ্গে এদেশে ইংরাজের আধিপত্য স্থাপনের সম্বন্ধটা যে তেমন ঘনিষ্ঠ নয়, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। উক্ত যুদ্ধে জয় ও ইংরাজের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভের মধ্যে কয়েকজন নবাব বাংলার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ মানুষের মতো মানুষ হতেন, তাহলে ইংরাজের ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাটা "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকতনা। ইংরাজের পরম সৌভাগ্য যে এঁদের 'নবাবী'টা এঁদের মনুষ্যত্বকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল।

যেটুকু লিখেছি তাহ'তেই সকলে অনায়াসে বুঝতে পারবেন, এদেশে ইংরাজ অধিকার স্থাপন সম্বন্ধে বাহুবলের সপক্ষে যে দাবী উথাপিত করা হয়, সে দাবী সম্পূর্ণ ভুয়ো ও ভিত্তিশূন্য। ঘটনা মাত্রেই বিবিধ কারণ-পরম্পরার সহযোগে ঘটে থাকে। এদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠারও অনেকগুলি কারণ আছে। সেই সকল কারণের মধ্যে কাউকে যদি মুখ্য কারণের মর্য্যাদা দিতে হয় তাহলে বলতেই হবে সেই কারণ এদেশের লোকের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সম্মতি। এদেশের লোক ইচ্ছে ক'রেই ইংরাজের অধীনতা পাশ বরণ ক'রে নিয়েছে। এই

প্রায় সার্ব্বজনীন সম্মতিই ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠার আলাদিনের প্রদীপ। সম্মতিটা যে কেন দিয়েছিল এবং কাজটী ভাল হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল সে কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পর্কে সে আলোচনায় বিশেষ লাভও নাই।

সম্মতি শব্দটী একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। একথা নিশ্চয়ই সত্য নয় যে এদেশের লোকেরা ভোটের দ্বারা ইংরাজকে শাসনকর্ত্তা রূপে নির্ব্বাচিত করেছিল। আসল ব্যাপারটা এই:— অনেক লোক অর্থলোভে বা অন্যবিধ স্বার্থ-সিদ্ধির কামনায় ইংরাজকে অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রীতিমত সাহায্য করেছিল, কতক লোক মুসলমান শাসনের প্রতি অরুচি বশতই নিছক মুখ বদ্‌লানোর উদ্দেশ্যেই ইংরাজ অধিকার কামনা করেছিল এবং অধিকাংশ লোকই এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। মোট কথা ইংরাজের সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব বিস্তীর্ণভাবে কোথাও ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে—প্রতিকূলতার অভাবই গৌণ-ভাবে সহযোগিতা। ইংরাজ স্থচ হয়ে প্রবেশ ক'রে নিজগুণে ফাল হয়ে বেরিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ স্থচ হয়ে প্রবেশ লাভটাই ঘটত না, যদি তেমন বিস্তৃত ভাবে প্রতিকূলতা কোথাও থাকত। সুতরাং সত্যশীল ইতিহাসকারকে এ কথা বলতেই হবে যে, এদেশের লোকের সহযোগিতার উপরই ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে দেশটা ইংরাজের হাতে তুলে দিয়েছি।

এই তুলে দেওয়া ব্যাপারটাকে অনেকে তাহা ডাইনীর হাতে ছেলে সঁপে দেওয়া বলেই মনে করেন—যার ফলে ছেলে ক্রমশঃ শুকিয়ে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে উঠছে। অনেকে আবার বলেন—মনের মধ্যে কি ভাবেন জানিনে, কারণ, পর-চিত্ত অন্ধকার—না, এ হচ্ছে বিশ্বামিত্রের হাতে দশরথের রামচন্দ্রকে সমর্পণ। এর ফল ইংরাজরূপ বিশ্বামিত্রের নিকট ভারতবর্ষরূপ রামচন্দ্রের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ দিব্যাস্ত্র শিক্ষা, কুসংস্কার-রূপিণী তাড়কাবধ এবং উপসংহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-রূপিণী সীতা লাভ। সীতার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমি এই উন্নতিটাকে ভুইফোঁড় বলে কোনও রূপ গূঢ় ইঙ্গিত করছি, আশা করি পাঠকেরা সেরূপ কিছু মনে করবেন না। আমি নিতান্ত সরল চিত্তেই তুলনাটা করেছি।

এই দুই দলেই বিস্তর হোমরা-চোমরা বড় বড় লোক আছেন—সুতরাং কোন্ মতটা সত্য তা ঠিক ক'রে বলা আমার মত সাধারণ লোকের পক্ষে নিতান্তই কঠিন। হয়তো দুই মতের মধ্যেই আংশিক ভাবে সত্য আছে। যাই হোক এ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমার কোনও লাভ নাই। কারণ, আমি এই প্রবন্ধের পোড়াপত্তন করেছি—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্" মনুর এই মহাবাক্যের উপর। ইংরাজের অধীন থেকে বা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সামিল হয়ে আমরা হয়তো কোনও কোনও বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করতে পারি, কিন্তু মানুষের আসল শ্রী-স্বাধীনাতাকে খুইয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারা যায়, কোনও শ্রীবৃদ্ধিরই এতটা মূল্য নয়। শ্রীবৃদ্ধি যে কার ভোগে

লাগে সেটা ত ভাবার কথা। বন্য-গোরুর চেয়ে গ্রাম্য গোরু দুগ্ধদান বিষয়ে অনেক শ্রীবৃদ্ধি লাভ ক'রে থাকে। কিন্তু সেইজন্য মানুষের গোয়ালে ঢুকে তার যে বিশেষ লাভ আছে, সেরূপ মনে হয় না। গোরুর পক্ষে মানুষের গোয়াল যেমন, আমাদের পক্ষে ব্রিটিশ এম্পায়ারও ঠিক তেমনি। আসল কথা স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব যেমন, মানুষ মাত্রেরই পক্ষে স্বাধীনতাও ঠিক তেমনি। কোনও অবস্থাতেই এবং কোনও কারণেই ও-জিনিষ বেচা যেতে পারেনা।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথার উল্লেখ করলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হবেনা। উপরে যে দুই দলের কথা বলেছি, তাঁদের মতটা সত্য হোক মিথ্যা হোক স্পষ্ট বুঝা যায়। আর এক দল লোক আছেন, তাঁদের মতটা ঠিকমত বুঝে উঠা বিষম সমস্যা। তাঁরা যখন নানাবিধ statistics ও অঙ্কপাতের দ্বারা ভারতবর্ষের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান দারিদ্র্যের ছবিটী আঁকেন, তখন ছেলে ডাইনীর হাতে পড়েছে সে বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকেনা। কিন্তু যখন প্রতীকারের কথা উঠে তখন তাঁরা constitutional agitationএরই দোহাই পাড়েন। বোধহয় তাঁরা মনে করেন, ডাইনী যে এতকাল ধরে ছেলেটীকে শোষণ ক'রে আসছে সে কেবল পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক এতদিন কৃতাঞ্জলি-পুটে তাকে নিরস্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেননি ব'লেই; নতুবা এ বিষয়ে তার নিজের লাভালাভের কোনও কথাই নাই। হয়তো বা তাঁরা এটাও ভাবতে পারেন, ছেলেটা যে দিন দিন শুকিয়ে উঠছে ডাইনী তা টের পায়নি। সুতরাং অঙ্কপাতের দ্বারা ঐ ব্যাপারটা একবার প্রমাণ ক'রে দিলেই আর কোনও ভাবনা থাকবেনা—ডাইনি তার দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিবে। এঁদের এই দু-কূল রাখা ভাবটা যে কি রকম ছেলেমানুষী, একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এঁদের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র যে সমস্ত Statistics, তার সকলগুলিই তো গবর্ণমেণ্টেরই সঙ্কলিত। সুতরাং সেগুলির যা প্রকৃত সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট তা জানেন না, এরূপ মনে করা বোধহয় কোনও বয়স্ক লোকের পক্ষেই শোভা পায়না। Digby, রমেশ দত্ত, দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি মনস্বীদের ভারতের দারিদ্র্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যে আমার লক্ষ্যীভূত, সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন দেখিনা। শেষোক্ত মহাত্মা যে দীর্ঘ জীবনের কল্যাণে আপনার ভ্রম-সংশোধনের অবসর পেয়েছিলেন, সে কথাও অবশ্য পাঠকেরা জানেন।

আসল বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক্। এদেশের ইংরেজের অধিকার প্রতিষ্ঠা যে এদেশের লোকের সাহায্যে ও সম্মতি-ক্রমেই হয়েছে সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। সেই অধিকার যে ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছে এবং তাদের শাসনের ফলটা যে এমন অব্যাহত সুচারু ভাবে চলছে, সেও ওই সম্মতি ও সাহায্যেরই কল্যাণে। চোখ খুললেই যে জিনিষটা দেদীপ্যমান হয়ে উঠে তার আর অন্য প্রমাণের দরকার হয় না। ইংরাজের আফিস, আদালত, কারখানা, স্কুল-কলেজ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রমাণগুলি ভারত জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা ইংরাজকে আমাদের পক্ষে এমনি

অত্যাবশ্যক ক'রে তুলেছি যে ইংরাজের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা অতি-বড় অসহযোগীর পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছে—সাধারণ লোকে তো কল্পনাতেও আনতে পারে না। এই যে ইংরাজের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাব, ইংরাজের আধিপত্য স্থাপনে আমরা কি পরিমাণে সহায়তা করেছি এইটেই তার সব-চেয়ে বড় প্রমাণ। তাদের প্রতি নির্ভর ও তাদের আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করা একই ব্যাপারের দুই দিক।

ইংরাজ অবশ্য এই সহায়তার কথাটা যথাসাধ্য চেপে যান। আমরাই তাঁদের উপর নির্ভর করছি কিন্তু তাঁরা নিজে স্বয়ম্ভু এবং স্বয়ংস্তব আমাদের মনে এই সংস্কারটা জন্মানোর জন্য তাঁরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাঁদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে এই সংস্কারটা যে একান্ত প্রয়োজনীয়! ভালমানুষ সাহেবেরা তাঁদের অলৌকিক শাসন-ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য-গঠন প্রতিভার দোহাই দেন। কিন্তু আসল জনবুল খোলাখুলি বলে ফেলেন, তাঁদের শার্দ্দূল স্বভাবের (Tiger qualities) গুণেই দেশটা তাঁরা করতলগত ক'রে রেখেছেন এবং ওরি উপর তাঁদের চরম ভরসা। এই মিথ্যা স্পর্দ্ধাটা এতই দুর্ব্বল, নিরস্ত্র ও অসহায় যে, এর উপর কোনও রূপ অস্ত্র-ক্ষেপ করা কেবলমাত্র অস্ত্রের অপব্যয় নয় কাপুরুষতাও বটে। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে এরূপ মিথ্যা দম্ভ সহ্য করাও কঠিন। কাজেই দু-একটা কথা বলতে হলো। কেবল মাত্র বাহুবলের দ্বারা এদেশে ইংরেজের আধিপত্য রক্ষিত হ'তে পারে কিনা আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

কোনও বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় হয় তিনরকম প্রণালীতে। (১) Theoretically অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক জ্ঞান-জনিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-নির্ণয়ের দ্বারা। (২) নজীর-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা। (৩) Experimentally অর্থাৎ হাতে-কলমে পরীক্ষা ক'রে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় চোখে পড়ে। (১) ভারতবর্ষ হতে ইংলণ্ডের দূরত্ব। বিজ্ঞানের কল্যাণে দূরত্বের অসুবিধা বহুল পরিমাণে দূর হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা সত্বেও বিজিত রাজ্যকে আয়ত্তাধীন রাখার পক্ষে এটা একটা বিষম বাধা। তার উপরে য়ুরোপে যদি কোনও গোল বেধে উঠে তাহলে বাধাটা কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, গত জর্ম্মণ-যুদ্ধের সময় তার পরীক্ষা হয়ে গেছে (২) ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের আয়তন ও লোক-সংখ্যার একান্ত পার্থক্য। ভারতবর্ষে সরকারী বেসরকারী সকল রকমের ইংরেজ কত আছে ঠিক জানিনে। সম্ভবতঃ লাখদুয়েক হবে। হাজার চেষ্টা করলেও এই সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ানো ইংরাজের সাধ্যাতীত। সুতরাং সিভিল মিলিটারী সকল বিষয়েই তাকে প্রধানতঃ এদেশের লোকের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে ও চিরকালই হবে। (৩) এদেশের লোকের ভাষা ধর্ম্ম আচার ব্যবহার সংস্কার সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বৈপায়ন (Insular) অজ্ঞতা। (৪) এদেশের আবহাওয়া। এ আবহাওয়া এদেশে ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপনের একেবারেই অনুকূল নয়। (৫) আর্থিক সমস্যা। এত-বড় প্রকাণ্ড দেশকে

কেবল ফৌজের বলে দখল রাখতে হলে যে পারিমাণ অর্থের আবশ্যক, ইংলণ্ডের পক্ষে তা সংগ্রহ করা অসম্ভব। তার উপর জর্ম্মন-যুদ্ধের ফলে ইংরেজের অর্থকৃচ্ছ্রতা যেরূপ সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তাতে ও-কথা মনে স্থান পেতেই পারে না। (৬) আয়ারলণ্ড ও মিসরের অন্তর্দ্রোহ। আফগানিস্থান, জাপান প্রভৃতি দেশের ঈর্ষা। ভারতবর্ষের লোক ইংরাজের অনুগত, কেবলমাত্র এই বিশ্বাসেই তারা ঈর্ষাটাকে কোনরূপে চেপে রেখেছে।

সুতরাং কিরূপ সাংঘাতিক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইংরাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সে কথা সহজেই অনুমেয়। এই প্রতিকূলতার তীব্র বিষ কেটে যাচ্ছে কেবলমাত্র এদেশের লোকের অনুকূল ভাবের দ্বারা। যদি কোনও কৌতুক-প্রিয় দেবতা ক্রীড়াচ্ছলে একদিন শেষরাত্রে লোকের মন হ'তে এ ভাবটা সম্পূর্ণ মুছে দেন এবং সকালে উঠে কেহই ইংরাজকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করতে যদি সম্মত না হন, তাহলে একদিনের মধ্যেই কিরূপে অপূর্ব্ব কাণ্ডটী ঘটে, পাঠকেরা সেই ছবিটী মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন, ইংরাজের অধিকার পদ্মপত্রে জলের মত কিরূপ টলমল করছে। বুঝতে পারবেন তলোয়ার দিয়ে আধিপত্য রক্ষা করার স্পর্দ্ধা-বাক্যটা কতই মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য। তাঁদের হালফ্যাসনের বড় বড় কামানগুলি হয়তো ঘণ্টায় দশহাজার লোকের দফারফা করতে পারে, কিন্তু সেগুলি ফোর্ট হ'তে বাইরে আসার সুযোগলাভ করতে পারবে কিনা সেই সম্বন্ধেই ঘোরতর সন্দেহ। ব্যাপারটী যদি এইরূপই দাঁড়ায় এবং কর্ত্তারা যদি ভালমানুষের মতো এদেশে থাকতে গররাজী হন, তাহলে চিরস্থায়ী ফার্লো নিয়ে দেশের দিকে পাড়ি দেওয়া ভিন্ন তাঁদের উপায়ান্তর থাকবেনা। পোটলা-পুটলি কিছু সঙ্গে ক'রে বেঁধে নিয়ে যেতে পারবেন সে আশা খুবই কম—কম্বল-বস্ত হয়েই আপনাদিগকে ভাগ্যমন্ত মনে ক'রে সন্তুষ্ট হতে হবে। আর সেই মহাচম্পট ব্যাপারের জন্যও খুব সম্ভব এদেশের লোকেরই সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে।

যাঁরা দম্ভ ক'রে বলেন যে, হোকনা সমস্ত দেশের লোক প্রতিকূল, আমরা ফৌজ দিয়ে সব ঠাণ্ডা ক'রে রাখবো, তাঁরা ও-কথা বলার সময় একটা সামান্য বিষয় ভুলে যান—ফৌজে সাদা সৈনিকের সংখ্যা সাধ্যমত বাড়াবার চেষ্টা সত্ত্বেও এখনো তার $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভারতবর্ষীয়। একথা অবশ্য স্বীকার করি, তারা আপনাদিগকে ভারতবাসী বলে যতখানি জানে, ইংরেজের নিমোকখোর ব'লে মনে করে তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে জানা-অজানার রাজ্যে যেরূপ ওলোট-পালোট কাণ্ড লেগে গেছে, তাতে তাদের আপনাদিগকে ভারতবাসী ব'লে জানতে এবং ইংরাজের নিমকটাকে Liver-pool salt না ভেবে ভারতীয় সৈন্ধব মনে করতে খুব বেশী বিলম্ব নাও হ'তে পারে।

(২) নজীর :—একটা দেশের সঙ্গে আর-একটা দেশের সকল বিষয়ের মিল আশা করা অসম্ভব। সুতরাং ষোল-কলায় খাপসই নজীর প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আসল বিষয়টীর নজীরের অভাব নাই। আসল বিষয়টী হচ্ছে এই :—

কোন দেশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী দিন আয়ত্তাধীনে রাখা অন্য দেশের পক্ষে সম্ভব নয়, বিজেতা দেশ শৌর্য্য-বীর্য্য ধন-বিভবে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হলেও নয়।

প্রথম দৃষ্টান্ত ইটালী। ইটালী যখন অষ্ট্রীয়ার অধীন ছিল তখন শৌর্য্য-বীর্য্য পরাক্রমে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারতনা। অষ্ট্রীয়া ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য—ইটালী খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। দুই দেশ পরস্পর-সংলগ্ন। এরূপ সুবিধা সত্বেও ইটালীকে বেশী দিন কবলে রাখা অষ্ট্রীয়ার পক্ষে যে সম্ভব হয়নি তার একমাত্র কারণ ইটালী ও-ভাবে থাকতে মোটেই রাজী হয়নি।

ইটালীর তুলনায় অষ্ট্রীয়ার যে-সব সুবিধা ছিল, ভারতবর্ষের তুলনায় ইলণ্ডের যে তার একটীও নাই পূর্ব্বেই তা দেখিয়েছি। সুতরাং যদি কোনও দিন ভারতবাসী ব্যাপক ভাবে ইংরাজের সঙ্গে রাজা-প্রজা খেলা করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে খেলা যে আর এক দণ্ড চলতে পারিনা সে কথা লেখাই বাহুল্য। খেলা ভাঙ্গতে ইটালীকে যে বেগটুকু পেতে হয়েছিল ভারতবর্ষকে তার সিকি পরিমাণও পেতে হবেনা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, হল্যাণ্ড :—স্পেনের সে সময়ে ভুবন-বিজয়ী প্রতাপ। তার বিক্রমে সমস্ত য়ুরোপ সন্ত্রস্ত। ওলন্দাজেরা নিরীহ ব্যবসাদারের জাতি। যুদ্ধ-বিদ্যায় কোনও কালেই তারা খ্যাতি লাভ করতে পারেনি। তথাপি এই নিরীহ দেশটাকে আয়ত্তাধীনে রাখা স্পেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৩। Experimental method বা হাতে-হাতিয়ারে পরীক্ষার প্রণালী :—

এদেশে এরূপ হাতে-হাতিয়ারে পরীক্ষা তেমন ভাবে হয়নি। সুতরাং ফলাফল সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নিতান্ত আংশিক ভাবে পরীক্ষাটা হয়ে যেরূপ ফল হয়েছিল, তাতে বিস্তৃতভাবে হ'লে ব্যাপারটা যে অন্যরূপ দাঁড়াতো, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। উক্ত বিদ্রোহ কেবল মুষ্টিমেয় সিপাহীর বিদ্রোহ। এমন-কি দেশী ফৌজেরও অনেক অংশ ইংরাজের অনুকূল ছিল। মোটামুটি বলতে গেলে সমস্ত দেশই তখন ইংরাজের দিকে ছিল। এদেশের লোকের সহায়তাতেই বিদ্রোহটা থামানো হয়েছিল। এ বিষয়ে যদি কারো সন্দেহ থাকে, Colonel Chesneyর "Indian Polity" নামক বইখানি প'ড়ে দেখতে পারেন। নিঃসন্দেহ হবেন। যদি এখনকার মত দেশাত্মবোধ ভাব দ্বারা সে সময়ের লোক অনুপ্রাণিত হতো, তাহলে বিদ্রোহ নিবারণ করা যে কিছুতেই সম্ভব হতো না, সে কথা বোধ হয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

উপসংহারে আচার্য্য সীলির Expansion of England গ্রন্থ হ'তে দু-একটী অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন, অসহযোগ-নীতির দ্বারা ভারতবর্ষ যে ইংরাজের কবল হ'তে মুক্তিলাভ করতে পারে—এটা কেবল মহাত্মা গান্ধীর খেয়াল মাত্র নয়—বিজ্ঞ ইংরাজ ইতিহাস-কারের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও তাই। তবে তিনি ইংরাজকে এই আশ্বাসটুকু দিয়েছেন—ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ কোনও

দিনই ছিলনা এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কোনও দিনই কাজ করেনি। অর্থাৎ তিনি পাকে-প্রকারে জানিয়াছেন, ন-মণ তেল পোড়ানোর যখন কোনই সম্ভাবনা নাই তখন রাধার নাচও প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। কিন্তু সামান্য কারণেই ইংরেজ উত্তেজিত হয়ে যেরূপ বীভৎস হিংস্রকাণ্ডের অভিনয় করেন তাতে অনায়াসেই বলতে পারা যায়, তাঁরা ঐ আশ্বাস-বাক্যে বিন্দুমাত্র আস্থা রাখেন না। আর কেমন ক'রেই বা রাখবেন! ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যা ঘটেনি—বিংশ শতাব্দীতে যে তা ঘটবেনা এ-কথা কে জোর ক'রে বলতে পারে? উপযুক্ত কারণ ও পারিপার্শ্বিকের সমবায় হ'লে ব্যক্তির চরিত্রও যেমন পরিবর্ত্তিত হয় জাতির চরিত্রও ঠিক সেইরূপ হয়ে থাকে। সে অবস্থায় পরিবর্ত্তন হওয়ার চেয়ে না হওয়াটাই অধিকতর আশ্চর্য্য মনে হয়। ইতিহাস নিবিষ্ট-চিত্তে পড়লে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুকের কথা মনে হচ্ছে। যাঁরা ভারতবাসীর চরিত্রের ভালোর দিকে পরিবর্ত্তন একেবারেই বিশ্বাস করতে পারেন না, মন্দর দিকে পরিবর্ত্তন বিশ্বাস করতে তাঁদের বিন্দুমাত্র বাধা হয় না। গ্রীক ও চৈনিক পর্য্যটকদের অঙ্কিত ভারতবাসীর চরিত্র-চিত্র ও বর্ত্তমান য়ুরোপীয়দের অঙ্কিত চিত্র তুলনা ক'রে দেখলেই এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

(১) If there could arise in India a nationality movement similar to that which we witnessed in Italy, the English power could not even make the resistence that was made in Italy by Austria, but must succumb at once.

... ...

Now if the feeling of common nationality began to exist there only feebly,—if without insiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion phat it was shameful to assist him in maintaining his dominion,—from that day almost our Empire would cease to exist;

... ...

P. P. 262 & 263

(2) The moment India began really to show herself what we so idly imagine her to be, a conquered nation, that moment we should recognise perforce the impossibility of retaining her.

P. 264.

(3) But if such a rising took place, it would be put down by the native soldiery so long as they have not learned to feel themselves brothers to the Hindu and foreigners to the Englishmen that commands them.

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী।

গজল্-গান

গুল্‌নার্-বাগে ফুল বিল্‌কুল্,
নাশ্‌পাতি
গালে গাল দিয়ে লালে-লাল হ'ল
বোস্‌তানে!
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের
আব্‌ছায়া,
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল
খোস্-গানে!
কহিল সহেলি, 'আজ যে গানের নওরোজা!
ফুল দলে' চল, কেন গো ফলের বও বোঝা?'
—সে কোন্ শরাবে করিলি বেহোঁস্-
মস্তানা—
নার্গিশাক্ষি! কি কথা আমার
কো'স্ কাণে!

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী!
হর্‌দম্ দাও! আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?

তার সে ভুরুর এক্‌টুকু চাঁদ
আধ্ ঢাকা
'রোজা'র উপোস ভেঙে দিল যেন
'ইদ্'-রাতে!
রাত হ'ল দিন সেই আতশের
রোশ্‌না'য়ে—
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল
নিদ্ প্রাতে!
ইয়ারা! তোমার পিয়ালা শপথ— সেই দিনই
শরাব খানার পথটি প্রথম 'নেই চিনি'!
পাথে বাহিরিনু, পিরাহান্ মোর
মদ-মাথা—

সেই দিন হ'তে ঠাঁই নাই আর
'ঈদ্গা'-তে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্দম্ দাও ! আজ বাদে কাল ভর্সা কি ?

কালো-কস্তুরী—জুল্ফি যে তার
ঘা'ল্ করে !
বিছার মতন নড়ে সে গালের
গুল্বাগে !
চিবুকের সেই তিলটি যে তার
দিল্-দাগা' !—
এতদিনে মোর স্বস্তি-সুখের
ভুল ভাগে।
পিয়ারী ! ও তোর ঠোঁটের দু'খানি লাল চুনী
জুড়াবে দরদ্,—আমি সে স্বপন- জাল বুনি !
মজ্নুঁর গোরে এখনো যে তার
বুক জুড়ে'
লায়লী-অধর-'লালা'-ফুলটির
মূল জাগে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্দম্ দাও ! আজ বাদে কাল ভর্সা কি ?

গুলাব গুলা যে লাল হয় লাজে !—
মউ-ভরা
পিয়ালা কা'রেও পিলায়—এমন
দেখ্ছি নে—
পিয়াসী চামেলি বেলী যে মু'খানি
চূণ করে !
কতদূর হ'তে বুল্বুল্ আসে
দেশ চিনে' !
শিরীন্ শরাব বড় যে রঙীন্ ! কয় সাকী,—
যত নেশা হোক্, রাতটি ফুরালে, রয় তা' কি ?

তোমার সুরত্-সুরায় যে জন
মস্তানা,
হুঁস্ হবে তার 'আখেরি-জমানা'-
শেষদিনে !

বড় মিঠা মদ ! ফের্ পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্দম্ দাও—আজ বাদে কাল ভর্সা কি ?

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

চয়ন

মানুষের চোখের রহস্য-রশ্মি

সংপ্রতি ডাঃ চার্লস রাস এক অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষের চোখ থেকে এমন এক শক্তিপূর্ণ রশ্মি-ধারা ফুটে বেরোয়, যার জোরে সে আর-একজন মানুষের দেহকে স্বেচ্ছামত চালাতে-ফেরাতে পারে।"

কাল্পনিক উপন্যাসে আর রূপকথায় এই ধরনের অনেক কাহিনী আছে। সে-সব কাহিনীকে আমরা অবসররঞ্জনের গালগল্প হিসাবেই গ্রহণ করি। কিন্তু ডাঃ রাসের আবিষ্কার যদি পরীক্ষার পর প্রামাণিক ব'লে গৃহীত হয়, তবে বিজ্ঞান-সমাজের অনেক সিদ্ধান্তই উল্টে-পাল্টে যাবে।

এক-একজন মানুষের চোখের দীপ্তি যে অত্যন্ত প্রখর এবং আমাদের মনকে সহজেই অভিভূত ক'রে ফেলে, আমরা অনেকেই বোধহয় তা লক্ষ্য ক'রে দেখেছি। নির্ব্বাসিত জার্ম্মান-সম্রাট, প্রিন্স বিস্‌মার্ক ও লর্ড কিচেনার প্রভৃতি জননায়কদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাম্‌নে অনেক লোকই যে মুখ তুলে চাইতে পার্‌ত না, তাঁদের জীবনচরিতে তাও পাঠ করেছি।

মহাবীর নেপোলিয়নের দৃষ্টি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ইংরেজের জাহাজে নেপোলিয়ন যখন বন্দী, তখনো তাঁর দৃষ্টির সাম্‌নে জেতা শত্রুরা সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌ত।

সেনাপতি নে'র স্বমুখে নেপোলিয়ন তাঁর এক দোষী কর্পোর‍্যালকে নিকটে আহ্বান করেন।

কর্পোর‍্যাল ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। নেপোলিয়ন তাঁর ধূসর চক্ষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি তার উপরে স্থাপিত ক'রে জান্‌লার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "লাফাও !"

কর্পোর‍্যাল বিনাবাক্যব্যয়ে সেই উচ্চ গবাক্ষের দিকে ফির্‌ল এবং পর-মুহূর্ত্তেই লাফ দিয়ে মৃত্যুর কোলে গিয়ে পড়্‌ল।



চোখের রশ্মিতে সম্মোহন

নেপোলিয়নের দৃষ্টির এই অসাধারণ ক্ষমতা সে-যুগের বড় বড় শক্তিবান পুরুষকেও একেবারে গোলাম ক'রে ফেলেছিল। এই বিচিত্র দৃষ্টি-শক্তির কারণ কি? ডাঃ রাসের মতে, মানুষের চোখ দিয়ে যে তীব্র রশ্মি নির্গত হয়, অন্যের মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে তা কাজ করে।

মানুষের চোখ স্বচ্ছ এবং খোলা গবাক্ষের মত। গবাক্ষ-পথে অপরের দৃষ্টি স্নায়ু জালের মধ্য দিয়ে সোজা মস্তিষ্কের ভিতরে চ'লে যায়। চোখের দৃষ্টিতে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। (কারণ আলোক মাত্রকেই electro-magnetic phenomenon বলা হয়।) এবং সেই বৈদ্যুতিক শক্তির জন্যেই একের দৃষ্টিতে অন্যে অভিভূত হয়ে পড়ে। চোখের দৃষ্টির সঙ্গে যে বিদ্যুতের সম্পর্ক আছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ডাঃ রাসও অনেকবৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়েছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সে-সব দুর্ব্বোধ ব্যাপার চিত্তাকর্ষক হবে না ব'লে আমরা এখানে অত-শত খুঁটিনাটির পরিচয় দিলুম না।

আমরা দৈনিক জীবন-যাত্রাতেই মানুষের চোখের দৃষ্টি-শক্তির অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি। আপনি যখন ঘরের ভিতরে একলা ব'সে থাকেন, তখন আর কেউ গোপনে এসে যদি আপনার দিকে তাকায়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা না-জানলেও

এবং তাকে দেখ্‌তে না-পেলেও, তার সেই দৃষ্টি আপনি অনেক সময়েই অনুভব কর্‌তে পারেন।

মা যখন ছেলেকে স্তন্য দেন, তখন অন্য কোন পুরুষের দৃষ্টি তাঁর উপরে পড়্‌লে, সেই পুরুষকে দেখ্‌তে না-পেলেও অনেক সময়ে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠে নিজের উন্মুক্ত বক্ষ আবার বস্ত্রাবৃত ক'রে ফেল্‌বেন। ঘুমন্ত মানুষের দিকে বাইরের কেউ ঝুঁকে প'ড়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌লেও সে জেগে উঠ্‌তে পারে। আবার, এটাও আমরা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, এক-একজন লোকের সঙ্গে চোখোচোখি ক'রে থাক্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হয়।

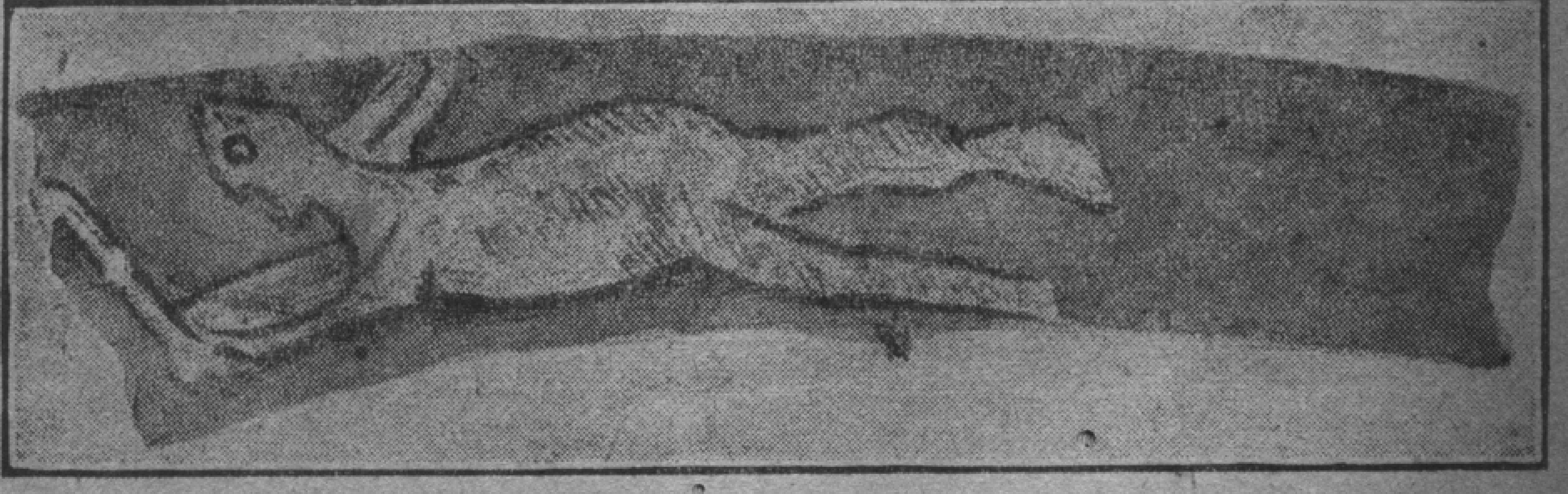
এম্‌নি ছোটখাটো নানা প্রমাণে বেশ বুঝা যায়, মানুষের চোখের ভিতরে একটা কিছু রহস্যময় ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে।

'হিপ্‌নটিজম্‌' বা সম্মোহন-বিদ্যাও মানুষের চোখের শক্তিকেই জাহির ক'রে দেয়।

ষাট হাজার বছর আগে

দৈব-গতিকে ষাট হাজার বছর আগেকার একটি রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সুইজার-ল্যাণ্ডে Neuchatel নামে একটি হ্রদ আছে। এ-বৎসরে হ্রদের জল হঠাৎ অত্যন্ত বেশীরকম শুকিয়ে গেছে। তার ফলে হ্রদ-গর্ভ থেকে স্মরণাতীত কালের অনেক রকমের জিনিষ বেরিয়ে পড়েছে।

পণ্ডিতদের মতে, সুইজারল্যাণ্ডের নানা স্থানে আগে হ্রদ-বিহারী মানুষ বাস কর্‌ত। ইতিহাস-পূর্ব্বকালে পৃথিবীর মানুষ-বাসিন্দাদের মধ্যে তারাই সব-চেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন-গুজ্‌রাণ কর্‌তে পার্‌ত। জলের উপরে মাচান বেঁধে বসবাস কর্‌ত ব'লে, বুনো জন্তু আর শত্রুদের আক্রমণ থেকে তারা অনেকটা নিরাপদ হ'তে পেরেছিল। কিন্তু সেকালে যারা গিরিগুহায় থাকৃত, বাঘ, ভাল্লুক, নেক্‌ড়ের কবলে তাদের বিপদ ঘট্‌ত পদে পদে।



হ্রদবিহারী শিল্পীর হাড়ের উপরে আঁকা, সাবেক মানুষের ছবি

আমরা যে যুগের কথা বল্‌ছি, তাকে 'নূতন শিলা-যুগ' (Neolithic age) ব'লে ডাকা হয়। তখনকার কালে এই হ্রদ-বিহারীরাই নর-জাতির মধ্যে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছিল। তাদের জীবনী-শক্তি ছিল এতটা বেশী যে, ঐতিহাসিক কাল পর্য্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কেউ কেউ বলেন, সুইজারল্যাণ্ডের কোন আধুনিক পল্লীগ্রামে এখনো পর্য্যন্ত হ্রদবিহারী-দের বংশধররা বাস করে এবং এ-যুগেও তারা অতীতের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পদ্ধতি একেবারে ত্যাগ কর্‌তে রাজি হয়-নি! অবশ্য সভ্যতার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে তারা যে অনেক বিষয়ে মান্ধাতার আমোলকে উঁচিয়ে গেছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

Neuchatel হ্রদ থেকে যে-সব জিনিষ পাওয়া গেছে, তার দ্বারা ষাট হাজার বছর আগেকার মানুষদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। জানা গিয়েছে, তারা পাথরের তীর ব্যবহার কর্‌ত, দাঁড় দিয়ে নৌকো বাইত, হাড়কে নানা ধাঁজে নিপুণভাবে কেটে তার উপরে ছবি আঁকৃত, বঁড়্‌শী দিয়ে মাছ ধরৃত, এবং রূপসীরা হাড়ের মালা প'রে প্রিয়তমের মাথা ঘুরিয়ে দিত;—এমন-কি তারা যে গরু-ভেড়া আর কুকুর পালন কর্‌ত, তাও প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি বিচিত্র জিনিষ পাওয়া গেছে—পাথরের পাঁজি। তারা ঠিক স্বাভাবিক নিয়ম-অনুসারেই বৎসরকে মাসে ও দিনে ভাগ ক'রে নিয়েছিল।

শীতের মাঝখানে দিন যে বেড়ে যায়, সেটাও তাদের চোখে এড়িয়ে যায়-নি। সাবেক কালের সব জাতির মত তাদেরও কাছে নববর্ষের প্রথম দিন সব-চেয়ে বড় উৎসবের দিন ব'লে বিবেচিত হ'ত—কারণ শীতের কষ্ট যে ফুরুতে আর দেরি নেই, এই শুভদিন সেই বার্ত্তাই বহন ক'রে আনে।

মাচানের উপরে বাড়ীগুলি তীর থেকে প্রায় একশোফুট তফাতে থাকৃত। মাচান থেকে তীরে আসা-যাওয়া হ'ত জলের উপরে তক্তা ফেলে। তক্তাগুলো রাত্রে তুলে রাখা হ'ত—শত্রুদের আচম্‌কা আক্র-মণে বাধা দেবার জন্যে। বাড়ীগুলির আকার হ'ত গোল। ডালপালা দিয়ে আগে কাঠামো ক'রে তাতে মাটির প্রলেপ দেওয়া থাকৃত। মেঝেতেও



শিলা-যুগের একটি ট্রাজেডী। পাথরের তীরের ফলা মানুষের মাথার খুলিতে বিঁধে রয়েছে। এই খুলিটি সংপ্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে

থাক্‌ত মাটি আর কাঁকরের ছাউনি। রসদাদি দড়ি দিয়ে ছাদে ঝোলানো থাক্‌ত। তারা শনের সুতোয় (খুব-সম্ভব) তাঁতে কাপড় বুন্‌ত। কুমোরের চাকা তখনো আবিষ্কৃত হয়-নি ব'লে তারা হাতেই মাটি ড'লে, নানারকমের পাত্র আগুনে পুড়িয়ে নিত। কাঠ কুঁদে' থালা তৈরি কর্‌ত। মেয়েরা কাঠের চিরুনীতে চুল আঁচ্‌ড়ে খোঁপা বাঁধ্‌ত।

হ্রদবিহারীরা বোধহয় কোনরকম ধর্ম্মের সাড়াও পেয়েছিল। কারণ মৃতের প্রতি তারা সম্মান দেখাত। মৃত যোদ্ধার দেহের পাশে তারা খাবার ও অস্ত্রাদি স্থাপন কর্‌ত। যে জাতি আত্মার অমরত্ব ধারণা করতে অক্ষম, তারা কখনোই মৃতের জন্য এতখানি মাথা ঘামাতে পারে না। নিশ্চয়ই তারা কোন উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস কর্‌ত।

সুইজারল্যাণ্ডের এই হ্রদ-বিহারী মানুষরা পৃথিবীর কোন্ অংশ থেকে প্রথম এসেছিল, সে কথা আজ আর কেউ জানে না। মাইল কয়েক তফাতে ফ্রান্সের গিরিগুহায় যে প্রাচীন মানুষরা বাস কর্‌ত, তারা ভিন্ন জাতির লোক। হ্রদবিহারীদের চেয়ে তাদের মাথা ছিল বেশী লম্বাটে।

বিছানায় পড়ার নিয়ম



এই-ভাবে পড়া অনুচিত

বিছানায় শুয়ে আপনার কি বই-পড়ার অভ্যাস আছে? তাহলে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের উপরে বই রেখে বা তুলে ধ'রে উর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে কখনো পড়্‌বেন না। তাতে চোখ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু বিছানার উপরে বসে, বালিসে ঠ্যাসান দিয়ে হাতে বই ধ'রে নিম্নদৃষ্টি হয়ে যদি পড়াশুনো করেন, তবে চোখের কোনই অনিষ্ট হবে না। দীপটি পিছন দিকে এমন ভাবে রাখবেন, যাতে তার আলো কাঁধের উপর দিয়ে আপনার কেতাবের উপরে এসে পড়ে। আলো যেন ম্লান না হয়।

মৎস্য-যুগে ফিরে চল

আসুন, ফের আমরা মাছ হই! জীবনের প্রথম উদয় সমুদ্র-গর্ভে। সুদূর অতীতে জলের ভিতর থেকেই আমাদের মেরুদণ্ড পরিণত হয়ে উঠেছে। মেরুদণ্ডী জীবদের মধ্যে মানুষ আজ সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করেছে। কিন্তু পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন যে, জীবসৃষ্টির প্রথম যুগে এই মানুষও আগে মৎস্যরূপে সাগরে সাগরে জললীলা ক'রে বেড়াত। তাই কি আমাদের প্রথম অবতার মৎস্যরূপী? এর মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত আছে কি?

ইউরোপের বিশেষজ্ঞরা সভ্যতার এই—চরম না হোক্—পরম উন্নতির যুগে তাই আবার বল্‌তে সুরু করেছেন,—আসুন, আমরা মাছ হই! আসুন, আমরা আরো বেশী সাঁতার দি! কারণ মানুষের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত ও পরিণত ক'রে তোল্‌বার পক্ষে সাঁতারের মত উপযোগী ব্যায়াম আর দ্বিতীয় নেই। লাফিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, এবং অনায়াসে হাতে-পায়ে জল কেটে আর ঠেলে অগ্রসর হোন! ঢেউএর তালে তালে আপনার প্রতি মাংসপেশী, প্রতি পেশী-বন্ধনী, প্রতি অস্থি, প্রতি রক্তবহা নলী এবং প্রতি স্নায়ুটি পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হ'তে থাকবে। আমরা খাড়া ভাবে উঠি-বসি, চলি-ফিরি, কিন্তু জলের মধ্যে আমরা থাকি ঠিক তার বিপরীত ভাবে, উপুড় হয়ে। এতে যে আমাদের কতটা উপকার হয়, আমরা অনেকেই তা জানি না।

সাঁতার দিবার সময়ে আমাদের ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য শরীর-যন্ত্রগুলি, এমন-কি চোখ ও নাক পর্য্যন্ত এই নূতন ব্যায়ামের মধুর প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার-উপরে দেহের রোমকূপগুলিও পরিষ্কার হয় এবং আরো নানারকমে আমাদের ত্বক উপকার লাভ করে। কিন্তু সাঁতারে সব-চেয়ে বেশী উপকার পায়, আমাদের মেরুদণ্ড। বিলাতী ডাক্তার নাথানিয়েল বয়েড বলেন, "পরীক্ষার দ্বারা আমি জান্‌তে পেরেছি যে, সাঁতারে হাত-পা-দেহ নাড়্‌বার সময়ে মাছের মত মানুষেরও পিঠের শিরদাঁড়া কখনো সিধা হয়ে ওঠে, কখনো বা বেঁকে যায়, দুম্‌ড়ে পড়ে—এতে দেহের ও মস্তিষ্কের অনেক ত্রুটি সংশোধিত হয়। এইজন্যেই শ্রীমতী আনেট কেলার-



এই-ভাবে পড়া উচিত

ম্যানের দেহ এমন নিখুঁৎ হয়ে উঠেছে। নারীরা যদি নিয়মিত সাঁতার অভ্যাস করেন, তবে তাঁদের সুন্দর গড়ন দেখে স্বর্গ-রূপসীরাও লজ্জা পাবেন। প্রত্যেকবার হাত-পা



মিস্ কেলারম্যান জলে ঝাঁপ দিতেছেন

ছোঁড়বার সময়ে জলের যে ধাক্কা লাগে, সেই সংঘর্ষেই দেহ গড়ে ওঠে।

মেরুদণ্ড যখন এম্‌নি সঞ্চালিত হয়, তখন পাঁজ্‌রার হাড়গুলিও ঘুরে, বেঁকে যায় এবং তার ফলে বুকের নানাদিক পুরন্ত ও উপকৃত হয়। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে পাঁজ্‌রার হাড়গুলি প্রসারিত এবং বক্ষ বিস্তৃত হয়—সঙ্গে সঙ্গে হয় তার মধ্যে রক্তের সমাগম। কাজেই তার ফলে ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায় এবং শ্বাসের সঙ্গে বায়ুর আগম ও প্রশ্বাসের সঙ্গে carbon dioxideএর নির্গমনেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

অনেকে শুন্‌লে বোধ করি অবাক হবেনযে, অনেক ক্ষেত্রে সাঁতার কাটবার ব্যবস্থা দিয়ে হৃদ্-রোগ (functional heart disease) আরাম করা যায়। সন্তরণের দ্বারা শোণিতের সম্প্রসারণ হয়, তাই হৃৎপিণ্ডের কর্ত্তব্য অনেকটা হাল্‌কা হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাঁতারের সময়ে মানুষের দেহ জলের ভিতরে যে-ভাবে থাকে, তাতে ক'রে শরীরের সর্ব্বত্র রসের (lymph) প্রবাহ অনাহত ভাবে বইতে পারে। এক-কথায়, সাঁতারে শরীর রীতিমত তৈরি ও কর্ম্মোপযোগী হয়ে ওঠে এবং রোগের ভয় যথেষ্ট ক'মে যায়। সাঁতার খালি বাল্য বা যৌবনের নয়, মধ্য ও বৃদ্ধ-বয়সের পক্ষেও এটি একটি উপযোগী ব্যায়াম।"

নামজাদা ইংরেজ-সাঁতারু মণ্ট্যাগু এ, হোল্‌বিন তাঁর "Swimming" নামক পুস্তকে বলেছেন, স্নায়বিক রোগগ্রস্তদের পক্ষে সাঁতার হচ্ছে অত্যন্ত উপকারী ব্যায়াম। এতে মাংসপেশীর শক্তি বাড়ে। সাইকেল চড়ে যেতে যেতে একটি দুর্ঘটনায় আমার একখানি পা ভেঙে যায়। ডাক্তারের উপদেশে সাঁতার অভ্যাস ক'রে আমার সেই ভাঙা পা আবার ভালো হয়ে গেছে।

আমেরিকার Physical Culture নামে



জললীলার বিপুল পুলক !

মাসিকপত্রে প্রকাশ, সাঁতারে যে দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড সবল, বাঁকা শিরদাঁড়া সোজা আর জন্ম-রুগ্ন পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করে, তার অগুন্তি প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাঁরা অতিরিক্ত মোটা, নিয়ম ক'রে সাঁতার কাট্‌লে তাঁদের মাংস-বাহুল্য বিলক্ষণ কমে যায়। যাঁরা অতিরিক্ত রোগা, তাঁদের দেহের "বিধান-তন্তু" (tissue) ও মাংসপেশীগুলি সাঁতারে আশ্চর্য্য উপকার লাভ করে এবং ফলে অল্পদিনেই মাংসবৃদ্ধি ঘটে। অন্যান্য খেলা-ধূলার ক্ষেত্র থেকে অধিকাংশ ব্যায়াম-বীরকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিদায় নিতে হয়। কিন্তু সাঁতারের প্রতিযোগিতায় মানুষ যে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর বয়সেও বাহাদুরি দেখাতে পারেন, অনেক প্রৌঢ় সাঁতারু তা প্রমাণিত করেছেন।

অবশ্য এখানে এটা বেশ মনে রাখ্‌তে হবে যে, যাহোক-তাহোক ক'রে নিজের খুসিমত সাঁতার কাট্‌লে দেহের কোনই উপকার হবে না। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের পরামর্শ না নিলে প্রথমে কিছুতেই চল্‌বে না। সব-চেয়ে দরকার, আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে নিয়ম-সঙ্গত হস্ত-পদ সঞ্চালনের ভঙ্গি শিক্ষা করা। এরই উপরে সাঁতারের ভালো-মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে—খামখেয়ালে কোনই ফল হবে না।

বিজ্ঞানের গোয়েন্দাগিরি

আজকাল অপরাধী ধরবার জন্যে এত-রকমের উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে যে, আইনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব চালাকের পক্ষেও শক্ত হয়ে উঠেছে।

অপরাধ-বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ ফরাসী-ওস্তাদ বার্টিলিয়ন সর্ব্বপ্রথমে পাপীদের আঙুলের ছাপ ও দেহের মাপ্ নেবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন এবং তার ফলে আজ-পর্য্যন্ত অনেক দোষী হাতকড়া পর্‌তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান যে এখন আরো কতদিকে উন্নত হয়ে উঠেছে, তা আর ব'লে শেষ করা যায় না।

এখন একগাছি চুলকেও ফ্যাল্‌না ভাবা চলে না। কিছুকাল আগে একগাছি চুল দেখে কেউ বিশেষ কোন অজানা কথা জান্‌তে পারত না। খালি বোঝা যেত, এই চুল যার, তার কেশের রং কি? এখন কিন্তু কোন হত-ব্যক্তির জামা-কাপড় বা হাতের মুঠোয় একগাছি মাত্র চুল পেলে অভিজ্ঞদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। কারণ অণু-বীক্ষনের সাহায্যে সেই চুল পরখ করলে, তাতে অনেক বিশেষত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের চুলেই প্রভেদ থাকে যথেষ্ট। চুলের রং ছাড়া আরো বোঝা যায়, তা কর্কশ, মাঝারি, বা কোমল ও সূক্ষ্ম কিনা? তা গোল না চ্যাপ্টা, ছোট না বড় মণ্ডলে গঠিত? এ চুল কোন্‌জাতীয় লোকের? অনেক জাতির কেশেও জাতীয়তার ছাপ্ থকে। চুল যার, তার মস্তিষ্কের ত্বকে—যেমন ধরুন, টাক—কোন রোগ থাক্‌লে চুল দেখে তাও বোঝা যায়। এ-সব প্রকাশ হ'লে পাপী ধরা পড়্‌লে পর আইনের কবল থেকে আর তার রেহাই পাবার কোন উপায় থাকে না।

ধরুন, ঘটনাস্থলে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে খুনীর কোটের কাপড়ে খোঁচা লেগে গাছকতক সুতো ছিঁড়ে গেছে। প্রথমে অণুবীক্ষণে সেই সুতোগুলি দেখে বোঝা যাবে, তাতে কতটা পরিমাণে পশম, রেশম ও তুলো মেশানো আছে। সেই পশম কোন্ জাতীয়? তারপর রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে প্রকাশ পাবে, কোটের কাপড় রং করবার সময়ে কি-রকম রং ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর পুলিসের পক্ষে সেই কাপড়ের ব্যবসায়ীকে খুঁজে বার করা অনেক সময়েই সহজ হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিক্রেতা বা দর্জ্জীর নাম জানা যায়। এইভাবে পুলিস ধীরে ধীরে—কিন্তু নিশ্চিতরূপে—প্রকৃত অপ-রাধীর দিকে অগ্রসর হ'তে পাবে।

আর-একটি নতুন উদ্ভাবনায়—"ফোটো-টেলিগ্রাফি"—আঙুলের ছাপের ফোটো সাধারণ টেলিগ্রামের মত অল্পসময়ের মধ্যে বহুদূরে পাঠানো যেতে পারে। আজকাল রঞ্জন-রশ্মি বা "এক্সরে"র সাহায্যে আঙুলের ছাপ নেওয়াও হয়—তাতে ভুলচুক হবার যো থাকে না। "মিথ্যা-ধরা-যন্ত্র"ও উদ্ভাবিত হয়েছে। আসামী মিথ্যা বল্‌লে এই যন্ত্র তখনি তাকে ধরিয়ে দেব।

এই যন্ত্রের নাম sphygmomanometer। এর দ্বারা রক্তের মধ্যে চাপ্ পড়্‌লে বা কোন পরিবর্ত্তন হ'লে তা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়।

পুলিসের বা উকিলের অর্থপূর্ণ প্রশ্নের নির্দ্দোষ উত্তর পাকা অপরাধীরা খুব সহজেই দিয়ে থাকে। তার অবিকৃত মুখ দেখে মনের আসল কথা ধরা অসম্ভব। এইখানেই যন্ত্রটি সাহায্য করে।

সকলেই জানেন, উত্তেজনা বা ভয়ের সময়ে মানুষের মুখ অবিকৃত থাকলেও, তার মনের ভিতরে সেই ভাবের কতটা প্রভাব পড়ে। হৃৎপিণ্ডের গতি তখন—এক পলকের জন্যে হ'লেও—রক্তের চাপ বাড়ে। ভীতি-কর প্রশ্নের মিথ্যা জবাব দেবার সময়ে অপরাধীর মনের ভিতরে সামান্য ও ক্ষণিক উত্তেজনা বা ভয়ের সঞ্চার হ'লেই, পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রটি তার নাড়ী ধ'রে সেটা স্পষ্টাস্পষ্টি প্রকাশ ক'রে দেবে। বারংবার এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ কোথাও মিথ্যা ধ'রে দিতে অক্ষম হন নি!

প্রসাদ রায়

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

মূকেরে বাচাল করে—হেরি নাই, শুনিয়াছি—দেবতার বরে,
বাচালে অবাক্ করে—এ কথা যে সত্য, বুঝি অন্তর-অন্তরে,
যখন তোমার বাণী, তোমার ও প্রতিভার সীমাহীন ভাতি
সমগ্র ধরিতে মোর রসনার—রচনার—জাল খানি পাতি।
শুধু স্তব্ধ, শুধু মুগ্ধ, শুধু লুব্ধ, চিরদিন অতৃপ্ত-পিয়াসী—
তোমার ঝরণাতলে আমি নিত্য সুনির্জ্জনে যাই আর আসি!

তাই আমি কাব্য-গীতি-মুখরিত তব পূজা-উৎসবের দিনে,
লুপ্ত করি' আপনারে, একান্ত নিঃসঙ্গ যেন জনতা-বিপিনে,
বসেছিনু বাক্যহারা; গণি নাই মানি নাই কিবা প্রয়োজন
খুলি' দিতে কণ্ঠ মোর সে-সভায়, মুক্ত যবে নয়ন-শ্রবণ!
কত ভক্ত নিবেদিল পূজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
মন্ত্র পড়ি' পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্য-সম্ভার!
হেরি' মোর মূঢ় দৃষ্টি, রিক্ত হস্ত, নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
ডাকে নাই কেহ মোরে,—ধন্যবাদ! সে যে হ'ত বড় অশোভন!

তোমারে পূজিব আমি কোন্ মন্ত্রে, বুঝি না যে হে রবীন্দ্রনাথ!
যে বীজ যখনি জপি—ভুল হয়, হেরি' নিত্য নব রশ্মিপাত!

ধ্যানে মোর, জ্ঞানে মোর ধরিবারে চাই তোমা অখণ্ড-স্বরূপে,
তা' না হ'লে চিত্ত মোর প্রসন্ন হ'বে না জানি, দীপে আর ধূপে !
সত্য আর সুন্দরের যে বিগ্রহ গড়িয়াছ মানস-ভুবনে,
অসীমের রূপ-সীমা ফুটায়েছ আঁখি-আগে জাগ্রতে-স্বপনে—
হেরি তা'য় রাত্রি দিবা একাকার ! ভেদ নাই আলো-অন্ধকার !
অধরে নির্ব্বাণ বাণী ! মন্ত্রহীন তাই মোর গুরু-নমস্কার !

তোমারে বরেছি আমি আমা হ'তে বহুদূরে, আমার বাহিরে—
সত্যের শাশ্বতলোকে, শেষতীর্থে, নিস্তরঙ্গ পারাবার-তীরে !
যতটুকু যেই দিন অগ্রসরি পথে মোর—সেই মোর পূজা !
আনন্দ-আরতি মোর—সে যে তোমা নিত্য আরো বড় ক'রে বুঝা !
তোমার কবিতা-বিশ্বে অন্তহীন বিবিধ সে বিচিত্রের পানে—
দিকে-দিকে ধাই, তবু জানি তার সত্য এক !—সেই কোন্‌খানে
একবৃন্তে অগণন ফুটিয়াছে অবিচ্ছেদ ! জানি, আমি জানি,
তোমার কবিতা মোরে দিবে সেই আদিমন্ত্র, একাক্ষরা বাণী।

ভারতের শেষ ঋষি ! যে সাধনা অর্দ্ধ পথে গিয়েছিল থামি'
সহস্র বর্ষেরও আগে,—যে আলোক পূর্ণ হ'য়ে আসে নাই নামি'—
অসমাপ্ত সেই সিদ্ধি, পরমা সে ঋদ্ধি আজ দৈবী প্রতিভায়,
ফুলের মতন করি,' স্বচ্ছন্দ সতেজ বৃন্তে, ফুটাইলে গানে-কবিতায় !
রসে-রঙ্গে-রূপে তুমি, সম্বোধিলে সনাতন নিত্য সত্য-ধনে—
ধূলায় আসন রচি' বসিলা যে মহেশ্বর সহাস্য আননে !
সৃষ্টিপদ্মে যেই মধু মর্ম্মকোষে চিরদিন বিরাজে বিমল,
তারি বর্ণে গন্ধে স্বাদে ভরি' দিলে জন্ম-জরা—কটু-তিক্ত ফল !
সেই মন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছি হৃদয়ের গভীর অতলে,
জ্ঞানের ললাট-নেত্রে নেহারিব যেই দিন,—লয়ে করতলে
সেই সত্য পূজাঞ্জলি, বাহিরিব মহাহর্ষে উচ্চারিয়া জয় !
ততদিন র'ব মৌনী, অন্তরে বহিয়া শুধু ব্যাকুল বিস্ময়।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৩

আরো চার-পাঁচদিন মুখ বুজিয়া পিতার সঙ্গে সকালে-বিকালে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর নিখিলের পানে ভগবান অবশেষে একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সেদিন বেলা দুপুরের প্যাশেঞ্জার ট্রেনে নায়েব আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে বিস্তর কাগজ-পত্র-ভরা পোর্টম্যাণ্টো। অভয়াশঙ্কর তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—কি হে শ্রীনাথ, তুমি হঠাৎ কি মনে করে? আগে কোন খপর পাইনি ত।

প্রভুকে প্রণাম করিয়া শ্রীনাথ বলিল,—আজ্ঞে, ভারী জরুরি কাজ পড়ল, তাই খপর দেবার আর ফুরসুৎ হলোনা, একেবারে নিজেই এসে হাজির হলুম।

—ব্যাপার কি?

শ্রীনাথ তখন ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সুনন্দার জমিদার দেবদুর্ল্লভ বাবুর আর্থিক অবস্থা একেবারে খারাপ হইয়া পড়ায় তাঁহার যে জমিদারী অভয়াশঙ্করের কাছে বন্ধক রহিয়াছে, দেবদুর্ল্লভ এখন সেই জমিদারী বিক্রয় করিতে চায়। অভয়াশঙ্কর যদি কিনিতে না চাহেন, তাহা হইলে ওধারকার মহেশ্বর উকিলের জমিদারীটা কিনিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাকেই অগত্যা বেচিয়া ফেলিতে হয়। এ সম্বন্ধে চিঠি-লেখালেখিতে অনেকখানি সময় নষ্ট হইতে পারে বলিয়া দেবদুর্ল্লভ বাবু একেবারে শ্রীনাথকে কাগজ-পত্রসমেত শিমুলতলায় গিয়া বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিতে বলেন,—সেইজন্যই সে আসিয়াছে; খপর দিবার আর অবসর ছিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমাদের পাওনা হয়েছে কত টাকা? দেবদুর্ল্লভ কি দর চায়?

শ্রীনাথ পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া একখানা মোটা খাতা বাহির করিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া সেটা দেখিয়া-শুনিয়া হিসাব পাড়িয়া বলিল,—দর-কষাকষি করিয়া ঘর হইতে আর দশহাজার টাকা বাহির করিয়া দিলেই জমিদারীটা হস্তগত হয়। আর—

অভয়াশঙ্কর একটু উৎফুল্ল ভাবে বলিলেন—আচ্ছা, এখন ও-সব রাখো, তুমি নেয়ে-খেয়ে নাও, তার পর দুপুরবেলা হিসেব-পত্তর দেখা যাবে'খন। তার দলিল-দস্তাবেজ ত দেখাই আছে, তবে ইতিমধ্যে আর কোন নতুন দায় জড়িয়েছে কি না, রেজেষ্ট্রী অফিসে একবার সার্চ্চ করিয়ে দেখো।

শ্রীনাথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া নিখিল বাহিরে আসিতেই শ্রীনাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। নিখিল খুশী হইয়া বলিল,—কি করে এলে তুমি এখানে? এঁ্যা—এখানেই থাকবে ত? বেশ হবে'খন।

শ্রীনাথ বলিল,—কৈ গো খোকাবাবু, তুমি মোটা হওনি ত! যেমন রোগা ছিলে, তেমনিই আছ যে।

অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—যাও হে শ্রীনাথ, এখন তুমি নেয়ে-খেয়ে নাও গে—এখন আর আলাপ-আপ্যায়িতের সময় নেই। অনেক বেলা হয়ে গেছে—যাও, যাও।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি। বলিয়া নিখিলকে কোল হইতে সে নামাইয়া দিল।

অভয়াশঙ্কর তখন নিখিলকে বলিলেন,—নিখিল, যাও দেখি, একটা চাকরকে ডেকে দাও, বাক্সোটা তুলে রাখুক্, আর শ্রীনাথকে নাইবার জায়গা-টায়গা দেখিয়ে দেবে। যাও।

নিখিল চলিয়া গেল। শ্রীনাথ গায়ের মোটা কাপড়টা কাছেই দেওয়ালের একটা হুকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া জামা খুলিতে লাগিল। অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—সুনন্দা গ্রামখানা নদীর ঠিক উপরেই, না ?

—আজ্ঞে হাঁ, বাঘমতী নদীর উপরে।

—গ্রামটা ভালো ? ম্যালেরিয়া নেই ?

—না। ঐখানেই দেবদুর্ল্লভ বাবু বাস করেন যে। তিনি নানা শোকে জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছেন, তার বিস্তর দেনা—সব বিক্রী-সিক্রী করে কাশী গিয়ে বাস করবেন, বলছেন। আপনি যদি জমিদারীটা নেন্, তাহলে তাঁর মনে তেমন দুঃখ থাকে না!

—বটে—বলিয়া অভয়াশঙ্কর কি চিন্তা করিতে বসিলেন।

২৪

শ্রীনাথের আহারাদি শেষ হইলে অভয়াশঙ্কর তাহার সঙ্গে আবার কাগজ-পত্র পাড়িয়া বসিলেন; প্রত্যেক দলিল, প্রত্যেক কাগজখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বেলা পড়িয়া আসিল; ওদিকে নিয়ম-মত নিখিল সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া পিতার ঘরের সম্মুখ দিয়া কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল, অভয়াশঙ্করের সেদিকে এতটুকু লক্ষ্যও নাই। অথচ সে পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, এমন সাহসও তাহার ছিল না। সে দেখিল, কখনো শ্রীনাথ কাগজ পাতিয়া হিসাব লিখিতে বসে,—অভয়াশঙ্কর তাহা টানিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া কাট্‌কুট্ করিয়া নানা আলোচনা পাড়িয়া কতকগুলা অঙ্ক পাড়িয়া বসেন, এমনিভাবে দুইজনে সেই বাক্স-ভরা কাগজ পত্রের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেলেন,—বাহিরের জগতের দিকে কাহারো এতটুকু হুঁস্ রহিল না।

নিখিল ঘুরিয়া-ফিরিয়া শেষে মার কাছে গেল। সুষমা বলিল,—বেড়াতে যাওনি যে নিখিল।

—না।

—কেন ? উনি কোথায় ?

—বাবা কি-সব কাগজ দেখচে।

—তুমি ওঁর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াওগে না, তাহলেই দেখতে পেয়ে যাবেন'খন।

—না মা, বাবা যদি বকে—!

সুষমা এ কথার কোন জবাব দিল না। নিখিল বলিল,—তুমি আজ চলো না মা,—তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।

—আমি আর আজ বেড়াতে যাব না, নিখিল।

—কেন ? নিখিলের স্বরে অনেকখানি কাতরতা ফুটিয়া উঠিল।

সুষমা একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—আমার শরীরটা আজো তেমন ভালো নেই, তা-ছাড়া—

—কি অসুখ করেছে মা তোমার ?

—কোন অসুখ নয়! এমনি শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না!

—তবে তুমি গরম জামা গায়ে দাওনি কেন ?

সুষমা সস্নেহে নিখিলের গাল টিপিয়া দিয়া কহিল,—বেড়াতে যাবনা বলেই গায়ে দিই নি, বাবা।

—বা রে, বেড়াতে গেলেই বুঝি গরম জামা গায়ে দিতে হয়! আমি তবে দুপুর-বেলায় গরম জামা গায়ে দিয়ে থাকি কেন! এই ত এখন আমিও বেড়াতে যাচ্ছি না, তবে আমি কেন গরম জামা গায়ে দিয়ে থাকব? দেবো না ত।

এই নিতান্ত সহজ আব্দারের সুরে সুষমার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে ভাবিল, হায়রে, যতই ইহারা তোর আর আমার মধ্যে বড়-বড় ব্যবধান তুলিয়া দুইজনকে পৃথক করিতে চায়, ততই তুই কি এ স্নেহের পাকে পাকে নিবিড় করিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিস্, নিখিল! এই যে বাঁধন আর মুক্তি—ইহারই মধ্য দিয়া ফাঁকে-ফাঁকে জীবনটা এ কোন্ পথে ছুটিয়া চলিয়াছে! শেষটা ইহার কি দাঁড়াইবে—ইহা ভাবিয়া সুষমার চোখের কোলে ফোঁটা-দুই জল গড়াইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চোখের কোণ মুছিয়া নিখিলকে কোলে টানিয়া সুষমা তাহার মুখচুম্বন করিল।

নিখিল বলিল,—তুমি বেড়াতে যাবে না ত মা? তোমার অসুখ করছে বল্‌চ, বেশ, তাহলে চল, তুমি ঘরে শোবে, চল, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব'খন।

—নারে পাগলা, আমার এমন অসুখ করেনি যে মাথায় হাত বুলোতে হবে। তুমি ঐ বাড়ীর বাইরে বাগানে বরং খেলা করে বেড়াও গে নিখিল।

—না মা, তার চেয়ে তুমি ঐ বাইরের চাতালে চল, সেখানে বসে গল্প বলবে, আমি শুনবো। অনেকদিন তোমার গল্প শুনিনি, মা।

—চল—বলিয়া নিখিলকে লইয়া সুষমা চাতালে গিয়া বসিল। ওধারে অস্তগামী লোহিত সূর্য্য তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিকে দিকে রক্তের ঢেউ তুলিয়া বড় পাহাড়টার আড়ালে গড়াইয়া পড়িল। আকাশে কুয়াশার ক্ষীণ স্তর ভেদ করিয়া চাঁদের আলো ফুটিল—জ্যোৎস্নায় চারিধার অমনি নিমেষে ঝলমল করিয়া উঠিল। সুষমা এক-মনে গল্প বলিতেছিল আর সুষমার কোলে মাথা রাখিয়া তাহারই মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া-চাহিয়া নিখিল সেই গল্প শুনিতেছিল। গল্পের পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে-চড়া রাজপুত্রের মতই সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া তাহার শিশু-চিত্ত সেই কোন্ তেপান্তর মাঠের পারে গহন বনে অত্যন্ত ত্রস্ত শঙ্কিত পায়ে এমন উধাও হইয়া চলিয়া ছিল যে ওদিকে যে রাত্রি বাড়িয়া উঠিতেছে, সেদিকে দুইজনের কাহারো খেয়াল ছিল না। গল্পে রাজপুত্র আসিয়া যখন ঠিক বনের সীমান্তে রাক্ষস-প্রহরী-রক্ষিত কঠিন পাষাণ-দুর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়াছে—এই-খানটা শুনিতে শুনিতে নিখিলের গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল, সে উঠিয়া সুষমার বুকের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহার মুখের পানে অধীর ভীত আগ্রহে চাহিয়াছিল, এইবারে কি হয়—হঠাৎ এমন সময় অভয়াশঙ্করের স্বর যেন সেই রাক্ষস প্রহরীর বজ্র-স্বরের মতই গর্জ্জিয়া উঠিল,—এই ঠাণ্ডায় বসে ওখানে তোমাদের ও কি হচ্ছে গা?

সুষমা ও নিখিল দুইজনেই এক সঙ্গে চমকিয়া উঠিল। সুষমা চমকিয়া গল্প থামাইয়া চারিধারে চাহিয়া দেখিল! চমকিয়া থামিয়া গেল। এতক্ষণ তাহার

চৈতন্য ছিল না, তন্ময় হইয়া গল্প বলিতেছিল। খেয়াল হইতে সে দেখে, তাইত, রাত্রি যে অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে! এই হিমে—ছি, ছি, এ কি করিয়াছে সে? সে কি পাগল হইয়াছিল—!

ধড়মড়িয়া উঠিয়া নিখিলের হাত ধরিয়া উঠাইয়া সুষমা বলিল,—ওঠো নিখিল, রাত হয়ে গেছে। হিম লাগ্‌ছে।

নিখিল উঠিয়া ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখে, অদূরে দাঁড়াইয়া পিতা! তাহার পায়ে কে যেন ব্রেক্ আঁটিয়া দিয়াছিল—সে চলিতে পারিতেছিল না। সুষমা বলিল,—এসো নিখিল।

দুইজনে উপরের দালানে আসিলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হিমে এতক্ষণ কেন বসে ছিলে দু'জনে?

সুষমা কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—নিখিল বেড়াতে যেতে পেলে না, গল্প শুনতে চাইলে, তাই আমি গল্প বলছিলুম,—এত রাত হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এমন বেহুঁস! হিম লাগ্‌চে তা খেয়ালই নেই!

ঘরের মধ্যে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। সুষমা ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া একটু হাসি ফুটাইয়া বলিল,—বেশী নয়, এই আটটা বাজছে,—তবু ভালো! তা ওর গায়ে গরম জামা আছে ত—

অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—দোষ হয়েছে, তবু স্বীকার করবে না! তাঁহার স্বরে আবার তেমনি আগুনের হল্‌কা!

সুষমা ভাবিল, হায়রে, যতই সহজভাবে সে এই সব বিশ্রী ব্যাপারগুলাকে উড়াইয়া দিতে চায়, ততই কি সেগুলা এমনি চাপিয়া ধরিবে! সে ঘরের দিকে যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—নিখিলের বেড়াতে যাওয়া হলো না কেন, শুনি?

নিখিল ভয়ে চোরের মত একধারে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সুষমা তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—ও ঠিক সময়েই সেজে-গুজে তৈরী হয়ে তোমার কাছে গেছল, তুমি ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমায় ডাকতে সাহস পায়নি।

—বেশ ত, আমি যেন ব্যস্ত ছিলুম, তুমি ত ঘরেই ছিলে, তোমার সঙ্গেও যেতে পারত ত।

সুষমার বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ বেদনা গুমরিয়া উঠিল,—বটে, তাহারই দোষ বটে! হুকুম দিবার সময় হুকুমটুকু ত বেশ দিয়াছিলে! মাথায় কখন্ কোন্ খেয়াল চাপিয়া বসিবে, সুষমা ত জ্যোতিষ পাড়িয়া তাহা জানিয়া রাখে নাই! তুমিই হুকুম দিবে, আবার সে হুকুম অমান্য করিবার স্পর্দ্ধা সে দেখায় নাই বলিয়া কৈফিয়ৎও সুষমাকেই দিতে হইবে! এ যে চমৎকার বিধান! আজ এখন তাই সে ভাবিল, চুপ করিয়া এ সব আঘাতই বা বিনাদোষে সে সহিয়া মরিবে কেন! এত বড় আঘাত! নিঃশব্দে যতই সে গ্রহণ করে, ততই যে আঘাতেরও আর অন্ত থাকে না! আজ সে জোর করিয়া মুখ ছুটাইল। সুষমা বলিল,—তুমি যে ওকে বারণ করে দেছ, আমার সঙ্গে যেতে। নিজে নিয়ে বেড়াতে যাবে, বলেছ—

বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ও, তাই! একটা কথা রাগের মাথায় বলেই না হয় ছিলুম—সেটাকে কি এমনি রাজার

অটল আদেশের মতই শিরোধার্য্য করতে হয়! কেন, তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক করে জোর করে ওকে নিয়ে যেতে পারতে না! আমি কি তাতে 'না' বল্‌তুম! তুমি যদি আজ ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতে, আর ফিরে এলে যদি আমি তার কৈফিয়ৎ তলব বল্‌তুম, তাহলে তুমি তার জবাবে এ কথা ত অনায়াসে বলতে পারতে,—তুমি কাজে-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকো, নিখিলকে নিয়ে কখন বেড়াতে যাবে? আমি মা, আমার ছেলে তার মার সঙ্গেই বেড়াতে গেছল—তাহলে আমি যে কোনো জবাব খুঁজে পেতুম না। আর তোমায় এমনি দেখলে আমারো যে কি আনন্দ হত! বুঝতুম, যে আসনে তোমায় এনে বসিয়েছি, সে আসনের মর্য্যাদাও তুমি ঠিক বজায় রাখছ, সুষমা—!

পরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অভয়াশঙ্কর আবার বলিলেন,—আমারি অন্যায়, সে প্রত্যাশা করা! পর কখনো আপনার হয় না, সুষমা! ও যদি তোমার পেটের ছেলে হোত, তাহলে কি আর আমার সে-হুকুম শুনে তুমি এমন উদাসীন থাকতে পারতে? কখনো না! তুমি আমার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে ওকে নিয়ে যেতে!

কথাটা বলিয়া অভয়াশঙ্কর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সুষমা মাটীর মূর্ত্তির মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এ কি, এ! এই যে অনর্থক কথা-কাটাকাটি, এই যে মনটাকে খুলিয়া কেহই কাহারো হাতে দিতে পারে না—এ-সবের পরিণাম কি? দুইজনে কি তবে দুইজনকে এমনি ভুল বুঝিয়া ঠোকর খাইতে খাইতেই জীবনের বাকী পথটা চলিবে! জোর করিয়া নিখিলকে সে ছিনাইয়া লইবে! হায়রে এতখানি স্পর্দ্ধা সে আজ দেখাইতে যাইবে, কিসের ভরসায়! একদিন তবু এ ভরসা, এতখানি জোর ফলাইবার এক্তিয়ার আছে বলিয়া বিশ্বাস তাহার মনেও ছিল! সে কি বিশ্বাস! তুমিই নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা চূর্ণ করিয়াছ, আর স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছ, নিখিলের উপর তাহার কোন জোর চলিবে না! সে ঐ ছবির মত, মাটীর গড়া মূর্ত্তির মত শুধু খেলা-ঘরের মা সাজিয়া নিখিলকে ভুলাইয়া রাখিবে মাত্র! এছাড়া তাহার আর কোন অধিকার নাই! এ কথা বারবার কাঁটার চাবুক মারিয়া বুকে বিঁধিয়া দিয়াও আজ তুমিই আবার এমন অনুযোগ কর! হায়রে, এমন বেড়া আগুনে নিরুপায়ভাবে জ্বলিবার পুড়িবার জন্যই কি বিধাতা তাহার এ জন্মটার সৃষ্টি করিরাছিলেন!

নিখিল আসিয়া ডাকিল—মা!

সুষমা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। নিখিল বলিল,—ঘরে চলনা মা। তোমার শীত লাগচে, তুমি যে কাঁপচো মা।

সুষমা সত্যই কাঁপিতেছিল,—শীতে নয়, কি এক অদ্ভুত ভাবে তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। সুষমা বলিল,—চলো নিখিল।

ঘরে গিয়া সুষমা নিখিলকে বলিল,—তুমি যাও ত বাবা, ঠাকুরকে বল, এই ঘরে তোমার খাবার দিয়ে যাক্, তুমি বসে খাও। আমার বড় শীত করচে, আমি আর ওদিকে যেতে পারচি না!

—না মা, তোমায় যেতে হবে না—আমি

ঠাকুরকে বলচি। বলিয়া নিখিল ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২৫

পাঁচ-সাত দিন পরে অভয়াশঙ্কর শ্রীনাথকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। যাইবার সময় সুষমাকে বলিয়া গেলেন, সুনন্দার জমিদারীটা দেখিয়া শুনিয়া কিনিয়া ফিরিতে প্রায় দশ-বারো দিন লাগিতে পারে। নিখিলের সমস্ত ভার সুষমার উপরই তিনি দিয়া গেলেন; আর বলিলেন,—নূতন যে মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গেও নিখিল বেড়াইতে যাইতে পারে, তবে সুষমাও যেন ঘরের কোণে বসিয়া না থাকে, তাহারো বেড়ানো চাই। নহিলে শরীর সারিবে কেন?

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলে নিখিলের মনে হইল, তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীর উপর হইতে কে যেন একটা মস্ত নিবিড় আবরণ টানিয়া লইয়াছে—চারিধারে এত আলো, এত হাসি অবাধ মুক্ত অজস্র ধারে ফুটিয়া উঠিল যে তাহার মনে হইল, এ যেন আর এক কোন্ নূতন রাজ্যে সে হঠাৎ আজ পদার্পণ করিয়াছে! জীবনের ধারাই যেন আগাগোড়া বদ্‌লাইয়া গিয়াছে! মুক্ত চঞ্চল মৃগ-শিশুর মতই নাচিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া তাহার আশা যেন আর মিটিতে চায় না!

এমনি চঞ্চল আনন্দে মাতিয়া যখন সে বাহিরে একটা ফুল গাছের নীচে কতকগুলা কাঠি-কুটা কুড়াইয়া ছোট কুটীর বাঁধিয়া তাহার নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে জল ভরিয়া পুষ্করিণী তৈয়ার করিয়া নৃত্য সুরু করিয়াছে, তখন সুষমা ডাকিল,—নিখিল।

নিখিল ছুটিয়া আসিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—কি মা? কেন মা? ডাকচ কেন মা?

—কি করছিলে নিখিল, বাইরে? ধুলো ঘাঁট্‌ছিলে বুঝি! হ্যাঁ, এই যে গা-ময় ধুলো!

—হ্যাঁ মা, বকোনা মা। আমার এমনি ভালো লাগ্‌চে মা যে—কি আর বলবো! দেখবে এসো মা, কেমন পুকুর করেচি, পাহাড় করেচি—দেখবে এসো।

কথাটা বলিয়া সুষমাকে এক রকম টানিয়াই সে আপনার হাতে গড়া কেল্লা পাহাড় দেখাইতে চলিল।

নিখিলের এই আনন্দ দেখিয়া পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের কথা সুষমার বেশী করিয়া মনে পড়িল। হায়, এই বিকাশোন্মুখ শিশু-চিত্তটিকে কঠিন শাসনের পাষাণ-তলে ফেলিয়া কি-ভাবেই না চূর্ণ করা হইতেছে! আহা, বেচারা শিশু! আজ যদি নিখিলের নিজের মা বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এই কঠিন শাসন কি কখনও সে সহ্য করিত? না! পৃথিবীর এই অবাধ মুক্ত আলো-হাসি ও আনন্দ-গানের অজস্রতার মধ্যে সম্পূর্ণ বাঁধন কাটিয়াই তাহাকে সে-মা যে ছাড়িয়া দিত। স্বামীর এই কঠিন তর্জ্জনী-আস্ফালন একটি ভ্রূ-ভঙ্গীতে সে কোথায় ছাঁটিয়া ফেলিত! সুষমা ত নিখিলের নিজের মা নয়, ভাড়া-করা মা—এই সহজ সত্য কথাটাই সে আজ স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে গেলে চারিধারে অমনি রুদ্র গর্জ্জন ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে,—খবর্দ্দার!

কিন্তু না,—সে ভাবিল, সেদিন রাত্রিকার সেই কথাটাকেই সে এবার হইতে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে! ছেলের উপর জোর না

থাকুক, তবু জোর সে করিবে! সে ত দেখিয়াছে, অভিনয়ের সাজা রাজা রাজা না হইয়াও বেশ কঠিন স্বরেই আদেশ দেয় ত! সেও এবার হইতে জোর করিয়া নিখিলের ঐ কঠিন বাঁধনগুলাকে দুই হাতে কাটিয়া দিবে। চুপ করিয়া থাকিলেও কু-কথা যখন সহিতে হয়, অথচ ছেলের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলও তাহাতে হয় না, তখন আর সে চুপ করিয়া থাকিবে না! কথা যদি সহিতে হয়, হউক, তবু ছেলেটাকে এই নির্য্যাতন হইতে কতক বাঁচাইতে পারিবে ত! তাহার মনটায় আলো ও হাওয়ার ঝলক্ লাগিবে তবু!

সুষমা নিখিলের বন্ধনের দড়িগুলা কাটিতে সুরু করিল। সেদিন বেড়াইতে গিয়া পথে নিখিল দেখিল, কতকগুলা সাঁওতালী ছেলে একটা গাছের ডালে দড়ির দোলা খাটাইয়া ভারী আনন্দে দোল খাইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সুষমা বলিল,—দাঁড়ালে যে নিখিল?

—বেশ মা—কেমন দোল খাচ্ছে, দেখ।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নিখিলকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিয়া সাঁওতালী ছেলের দল আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল, বলিল,—এসো গো রাজা বাবু,—দোল খাবি?

নিখিলের মনটা তাহাদের সঙ্গে দোলায় দোল খাইবার জন্য লাফাইতে ছিল। কিন্তু বাপের যে-শাসনে সে এত বড় হইয়াছে, তাহাতে মন ছুটিলেও উপায় ছিল না। তবু আজ সেই বাপ কাছে নাই বলিয়া নিখিল দুই চোখে কাতর মিনতি ভরিয়া মার পানে চাহিল; মুখে কোন কথা বলিল না। সুষমা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিল,—দোল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, না নিখিল?

—একটু দোল খাব মা? ওরা বলচে—

—যাও, ইচ্ছে হয় ত একটু দুলে এসো গে—

নিখিল সানন্দে গিয়া দোলায় বসিল—দুইটা সাঁওতালী ছেলে তাহার দুইপাশে বসিয়া সতর্ক রহিল, রাজাবাবু না পড়িয়া যায়,—আর দুই জনে দুই দিক হইতে দোলায় দোল দিতে লাগিল।

বহুক্ষণ দোলায় দুলিয়া নিখিল বাড়ী ফিরিবার সময় মাকে বলিল,—মা, আমাদের বাড়ীতে একটা দোলনা করে দিয়ো মা—তুমি দোল দেবে, আর আমি দুল্‌বো।

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, উনি ফিরে আসুন—বলে দোলা খাটিয়ে দেব'খন।

ইহার পর ঐখানেই দুই বেলা বেড়াইতে যাইবার জন্য নিখিলের মন এমনি ঝুঁকিয়া উঠিল যে সুষমা কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। দুইবেলা সাঁওতালীদের সঙ্গে দোলায় দুলিয়া তাহাদের সহিত নিখিলের এমনি অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া গেল যে একদিন দুপুরবেলা দুই-তিনটা সাঁওতালী ছেলে তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিখিল অত্যন্ত সঙ্কোচে ভয়ে-ভয়ে তাহাদের লইয়া ফটকের ধারে কাঠি-কুটা দিয়া যে পাহাড় গড়িয়া ছিল, দেখাইল; পরে সকলে মিলিয়া সেই পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছের ডাল পুঁতিয়া মাথার উপর নুড়ি-পাথর সাজাইয়া প্রকাণ্ড কেল্লা তৈয়ার করিল। সাঁওতালী ছেলেরা ক্রমে প্রত্যহ দুপুরবেলায় এমনি ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল যে

সুষমা প্রমাদ গণিল। স্বামীর ফিরিবার সময় হইয়া আসিল, তিনি আসিয়া যদি ইহাদের দেখেন—তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিবেন! তাঁহার ছেলে এই-সব বর্ব্বর ছোট লোক ছেলে-গুলার খেলার সাথী! অথচ কি বলিয়াই বা তাহাদের এ আনন্দে বাধা দেয়! আহা, গরিবের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া উহারা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, উহাদের সঙ্গ নীচে পশুর মত বর্জ্জন করিতে হইবে! সেই যেদিন তাহারা অমন আগ্রহে অতখানি স্নেহে-সম্ভ্রমে নিখিলকে দোলায় উঠাইতে চাহিয়াছিল,—সেদিন তাহারা যে কতখানি সরল উদার মনের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা শুধু সেই জানে!

সেদিন খেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কয়দিনের চেষ্টায় পাহাড় প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার তলা দিয়া সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে, পাহাড়ের মাথার উপর বিচিত্র বর্ণের তকতকে নুড়ি ও পাথর কুচিতে কেল্লাটিও জমকালো দেখিতে হইয়াছে, আর পাহাড়ের নীচে দিয়া তারের রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে। সাঁওতালীদের লখু কাঠ কাটিয়া গাড়ী তৈয়ার করিবার ভার লইয়াছিল। আজ সেই গাড়ী চলিবে। এজন্য আজ একটু ধূমধামেরও আয়োজন হইয়াছে—ছেলেরা রাজাবাবুর কাছে পুরী খাইতে চাহিয়াছে—পুরী খাইয়া গাড়ী চালাইবে। সুষমা ভিতরের রান্নাঘরে নিজে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল,—আর ছেলের দল বাহিরে কাঠের গাড়ীতে চাকা পরানো দেখিতেছিল, এমন সময় নির্ম্মল মুক্ত আকাশের কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। নিখিল সহসা সভয়ে চাহিয়া দেখে, ফটকের অদূরে অভয়াশঙ্কর কুলি-সঙ্গে বাড়ী আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে এমন ভয় পাইল যে সে যে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলের দল ওদিকে গাড়ীতে চাকা পরাইয়া মহা-কলরব জুড়িয়া দিল, আর ঠিক সেই সময় অভয়াশঙ্কর বাড়ীর ফটকের মধ্যে পা দিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত পরে রাগে জ্বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—এ কি এ! কারা এরা? কি হচ্ছে সব? তারপর নিখিলকে ঐ সংসর্গে দেখিয়া তাহার কাণ ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলেন, কহিলেন,—বা, ক'দিনে বেশ চমৎকার উন্নতি হয়েচে, দেখচি যে! শূয়ার, বাড়ী চল্! তারপর সাঁওতালী ছেলেরা ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই অভয়াশঙ্কর তাহাদের পানে চাহিয়া গর্জ্জন করিলেন—নিকালো!

ছেলের দল এই অতর্কিত আঘাতে ভীত হইয়া বাড়ীর বাহিরে পলাইয়া গেল—পলাইয়া দূরে গেল না, বাহির হইতে তাহাদের রাজা-বাবুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া বজ্র-হুঙ্কারে ডাকিলেন,—নিখিল।

নিখিল কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ওরা তোমার বন্ধু, বুঝি! যাও, ওধারে গিয়ে ওদের বলে এসো, আর এ বাড়ীতে কখনো যেন ওরা না ঢোকে!

আহা, বেচারারা! উহাদের কি অপরাধ যে এমনি লাঞ্ছিত করিয়া গৃহ হইতে উহাদের সে তাড়াইয়া দিবে! নিখিল ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অভয়াশঙ্করের কথা শুনিয়া সুষমা ছুটিয়া আসিল—আসিয়া ব্যাপার বুঝিল। কাতর স্বরে সুষমা বলিল—ওগো থাক্। আহা, ওরা লুচি খেতে চেয়েছে, কখনো খেতে পায়না ত—। আশা করে এসেছে, গরিব-দুঃখী, তায় ছেলেমানুষ—ওরা খেয়ে নিক্। তার পর আমিই ওদের বলে দেব, আর কখনো আসবে না এখানে।

সুষমাকে কোন জবাব দিয়া, তাহার প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়াই অভয়াশঙ্কর মুখ-হাত ধুইবার জন্য বাথরুমে চলিয়া গেলেন। সুষমা ছেলেদের ডাকিয়া লুচি তরকারী দিয়া ও মিষ্ট কথায় তাহাদের ভুলাইয়া বিদায় দিল; পরে অভয়াশঙ্করের আহার শেষ হইলে নিখিলকে রান্নাঘরের মধ্যে ডাকিয়া সে যখন বলিল—তোমাদের বন-ভোজনের লুচি ওরা খেয়েছে, তুমি এবার খাও বাবা,—তখন নিখিলের রুদ্ধ অভিমান সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিপুল ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল,—ও লুচি আমি খাব না মা, কখনো খাবনা!

সুষমা বলিল,—ছি বাবা, উনি শুনলে আবার বক্‌বেন! খাও—

—বকুক, বাবা বকুক, আমায় তাড়িয়ে দিক্ বাড়ী থেকে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি ঐ ছেলেদের বাড়ী গিয়ে ওদের সঙ্গে থাক্‌বো—আমি থাকতে চাই না এখানে—এখানে থাকতে চাই না আর—

—আচ্ছা পাগল ছেলে ত! বলিয়া সুষমা নিখিলকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিল।

সন্ধ্যার দিকে নিখিল একটু ঠাণ্ডা হইয়া সুষমার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর আসিয়া কহিলেন,—দোহাই তোমাদের,—আমার যেগুলো ভালো লাগে না, সেগুলো আর করো না। ছোট লোকদের সঙ্গে মেলা-মেশা আমি মোটে পছন্দ করি না। স্বামী বলে আমায় যদি একটুও মানো সুষমা, তাহলে, দোহাই তোমার, ছেলেটাকে ওদিকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না।—আর ক'টা দিন—শীঘ্রই বাড়ী ফিরচি, তার পর স্থির করেচি, সুনন্দায় গিয়েই থাকবো। বাড়ী-ঘর মেরামত করারর বন্দোবস্ত করে এসেচি। ছেলে থাকবে মাষ্টারের জিম্মায়—ও-সব নাকি কান্না আর মায়া-মমতার মধ্যে ছেলে মানুষ করলে ছেলের চোখের পাতা চির-কাল ভিজেই থাকবে,—জল আর কোনকালে শুকোবে না! যতদিন সুনন্দায় না যাই, ততদিন দয়া করে আমার এই ইচ্ছাটার উপর একটু শ্রদ্ধা রেখে নিখিলের হেফাজতী করো, তাহলেই আমি কৃত-কৃতার্থ হব। বুঝলে?

কথাটা বিদ্যুতের মত একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া বিদ্যুতেরমতই অভয়াশঙ্কর বাহির হইয়া গেলেন। সুষমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে মনে সে বলিল, এক ত এই গোয়েন্দার মত খপর না দিয়া আসা—তারপর এই সব কথার জবাব লইবার এতটুকুও অবসর হইল না —!

নিখিল বলিল—বেড়াতে চলো না, মা—

—না বাবা, তুমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যাও আজ।

—এই ত, তুমি যাচ্ছিলে মা—

—না বাবা, দুষ্টুমি করোনা। যাও, আজ মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যাও—কাল থেকে আমার সঙ্গে যেয়ো।

নিখিল বলিল,—তাহলে আমিও যাব না, মা—।

—যাও নিখিল, নাহলে উনি বকবেন।

—বকুন্ গে। আমি বুঝেচি মা,—বাবা বকলে বলে তুমি যাবেনা বল্‌চ, না ?

—না রে, না।

—আমি জানি মা, সব জানি। বাবা যা বলে, আমি তা বুঝতে পারি—। আমি ত— কিছুক্ষণ সুষমার মুখের পানে চাহিয়া নিখিল বলিল,—হ্যাঁ মা, সত্যিই তুমি আমার মা নও ?

সুষমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ এ কি কথা ! সে পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি একটা আশ্রয় পাইবার জন্য নিখিলকেই প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও কথা বলিস্ নে, বলিস্ নে তুই নিখিল, আমি তাহলে পাগল হয়ে যাব, মরে যাব, বুঝলি !

সুষমার মুখে কাতর কম্পিত স্বর শুনিয়া নিখিল ভয় পাইল, সেও তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—না মা, তুমি মরে যেয়োনা মা, আর আমি ও-কথা বলব না। নিখিলের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

—আর কখনো বলিস্ নে—মনেও ওকথা আনিস্ নে, নিখিল—লোকে কখনো যদি অমন বিশ্রী কথা বলে ত তুই তা কাণেও তুলিস্ নে। তুই ও কথা মনে আনলে কি হবে—জানিস্ ?

অত্যন্ত সভয় দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া নিখিল বলিল,—কি হবে, মা ?

নিখিলকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে সুষমা বলিল,—তোর মা তাহলে মরে যাবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্রোতের মুখে

দেখ্ রে ওই রাঙা রবি ডুবছে পূবে
পুরবীর সুরভি ওই যায় যে উবে।
সুদূরে তরুর শিরে
আলো যে নিভলো ধীরে
আজিকার ইঙ্গিতে তুই চল্‌বি রে বল্ সঙ্গী বিনে
আঁট্ দিতে আর ঘাট পাবিনে।

পিছনে রইলো যারা রইলো ঘরে,
ব্যথাতে ব্যাকুল এ বুক আকুল করে।
আগেতে যায় রে যারা
মেলে না তাদের সাড়া,
কালের এ বেলার বুকে রয়না কারো চরণ চিনে
আঁট্ দিতে আর ঘাট পাবিনে।

সুমুখে গহন রাতি আলোক-হীনা
জানিনে চন্দ্র-তারা উঠ্‌বে কি না ?
তবু যে হবেই যেতে
উতরোল উৎসবেতে,
বিপুল ত তুফান্-স্রোতে ভাস্‌তে হবে রাত্রি-দিনে
আঁট্ দিতে আর ঘাট পাবিনে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সমালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্র। জীবন, যুগ ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লেখা নাই। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী-সম্বন্ধে যে দুই-একখানি গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়িয়াছে, সেগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পাশ দিয়া সেই সব জীবনী-গ্রন্থের লেখকেরা নিজেদের খাড়া করিয়া তুলিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহার ফলে গ্রন্থে আনুসঙ্গিক নানা দোষ ঢুকিয়া সে সবগুলিকে প্রায় অপাঠ্য করিয়াই তুলিয়াছে। এ গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব, লেখক ইহার সাহায্যে বঙ্কিমকে পাঠকের সম্মুখে দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। দ্বিতীয় গুণ, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে বাঙলা দেশের সমাজ ও সাহিত্য কিরূপ ছিল, তাহার একটা আদরা ছবি লেখক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন;—ইহার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করা পাঠকের পক্ষে বেশ সহজ হয়। তাহার উপর লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলির যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা মুরুব্বিয়ানার বোল-চালে ভারাক্রান্ত হয় নাই; লেখক বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনায় গ্রন্থ-সমূহের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন—Literary criticism এর ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রচনাটিতে শৃঙ্খলা ও সংযম বেশ মিশ্ খাইয়াছে এবং তাহার ফলে গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছেই; তা'ছাড়া বাঙলা-জীবনী বিভাগে এ গ্রন্থখানি বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্যতার যথেষ্ট দাবী করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

চিড়িয়াখানা। প্রথম ভাগ (পশু) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক, ইউ, রায় এণ্ড সন্স, ১০০, গড়পার রোড, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত। ইউ. রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এই গ্রন্থখানি বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত। ইহাতে বানর, বনমানুষ, গিবন, হনুমান, মর্কট, মোনা ও ডায়না বানর, বেবুন, মাকড়সা, লজ্জাবতী বানর এবং মাংসাশী পশু—বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, ও ভালুক; খুরী জন্তু,—মৃগ, কালসার কুরঙ্গ, নীলগাই, হরিণ, লাল হরিণ, সম্বর, চিতাহরিণ, কাকার, পাতিহরিণ, জিরাফ, উট, জলহস্তী, টেপির, গণ্ডার, জেব্রা, হাতী ও কাঙ্গারু এই জন্তুগুলির পরিচয় বেশ সহজ ভাষায়, সরল ভঙ্গীতে অতি মনোজ্ঞভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থে প্রত্যেক জন্তুরই ছবি দেওয়া হইয়াছে। বহিখানির ছাপা কাগজ ছবি—সমস্তই বেশ সুন্দর। বহিখানির ভিতর-বাহির পরিপাটী, মনোজ্ঞ—বালক-বালিকাদের হাতে এ বহির যথেষ্ট সমাদর হইবে; হইয়াছেও—তাহা এ গ্রন্থের দুইটী সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। যে যে গৃহে ছেলে-মেয়ে আছে, সেই সেই গৃহেই এ গ্রন্থ বিরাজ করুক। আনন্দের সহিত ছেলে-মেয়েরা ইহা পাঠে জ্ঞানও লাভ করিবে প্রচুর।

স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবী। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে প্রণীত। কলিকাতা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, দেবালয় কার্য্যালয় হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এই মহিলা দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী। এই বঙ্গমহিলার জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। লেখক তাঁহার নানা গুণের কথাও সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র জীবনী-গ্রন্থখানি বঙ্গীয় মহিলাগণের বিশেষ করিয়া পড়িয়া দেখা উচিত।

ঈশ্বরের আদেশ। পত্রিকামালা, পত্রিকা নং ১ ও ২। দি হরনাথ সোসাইটি বোম্বাই। কলিকাতা, মার্কাণ্টাইল প্রেসে মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দুটীতে শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী হইতে কয়েকটি ভগবৎ-বাণী সংগৃহীত ও হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



অলস বেলায়

শ্রীযামিনীরঞ্জন রায় অঙ্কিত

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৮ [নবম সংখ্যা

মিলিতোনা

৬

তাহার পরদিনও আন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাহার সকল বন্ধুর বাড়ীতেই খোঁজ লওয়া হইয়াছিল, দুই দিন হইতে তাহাকে কেহ দেখে নাই।

ইহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আন্দ্রে হঠাৎ হয়ত কোন জরুরী কার্য্য উপলক্ষে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করিলেন। ডন-জেরোনিমো ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর করিল,—তাহাদের মনিব দুইদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যা ৬ টার সময় নিত্যানুসারে আহারাদি করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন। যাইবার জন্য কোন উদ্যোগ-আয়োজন করেন নাই এবং এমন-কোন কথাও বলেন নাই যাহাতে তিনি যাইতেছেন বলিয়া তাহাদের কোন সন্দেহ হইতে পারে। 'পাদোতে" বেড়াইতে যাইবার মত, একটা কালো কোর্ত্তা, একটা হল্‌দে রং-এর ফতুয়া আর একটা সাদা পেণ্টুলন পরিয়াছিলেন।

ডন-জেরোনিমো ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আন্দ্রের কামরাটা একবার খোঁজ করিতে বলিলেন, যদি কামরায় কোন আস্‌বাবের উপর প্রস্থানের কারণ বলিয়া কোন পত্র রাখিয়া গিয়া থাকে।

কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখা গেল, সিগারেটের কাগজ ছাড়া তার কামরায় আর কোন কাগজ ছিল না।

এই দুর্ব্বোধ্য অন্তর্ধানের আর কি-কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে?

আত্মহত্যা?

তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। কেন না, আন্দ্রের প্রেম-ঘটিত কোন কষ্ট ছিল না, ধনেরও কষ্ট ছিল না; যাহাকে সে ভালবাসে

তাহারই সহিত আন্দ্রের শীঘ্র বিবাহ হইবার কথা; আর তাহার বাৎসরিক নিশ্চিত আয় একলক্ষ টাকার কম নহে। তবে কি, কোন শত্রু ওৎ পাতিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে?

কিন্তু আন্দ্রের ত কোন শত্রু নাই; অন্তত আন্দ্রে জানে না যে তাহার কোন শত্রু আছে। তাহার যেরূপ শান্তমধুর স্বভাব, তাহার যেরূপ সংযত-ব্যবহার, তাহাতে কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আর সত্যই যদি কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিত, তাহা হইলে, মৃতই হউক, জীবিতই হউক তাহাকে নিশ্চয়ই তাহার বাড়ীতে আনা হইত।

অতএব ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে যাহার উদ্‌ভেদ একমাত্র পুলিসের লোকেরাই করিতে পারে।

সরল-অন্তঃকরণ ভালমানুষের মতন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পুলিস সর্ব্বশক্তিমান ও অভ্রান্ত। তিনি পুলিসেরই শরণাপন্ন হইলেন।

পুলিসের কর্ত্তা, নাকে চষমা লাগাইয়া রেজিষ্টারি-বই দেখিতে লাগিলেন; তাহাতে কিছুই পাইলেন না। যেদিন আন্দ্রে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই তারিখের কোন রিপোর্টই তিনি পান নাই। সেই তারিখের রাত্রিটা খুবই শান্ত ছিল, কেবল কতকগুলা সিঁধ-চুরী, প্রাচীর-টপ্‌কানো চুরী, কতকগুলা খারাপ জায়গায় গোলমাল, শুঁড়ীখানায় মাতালের ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি—ইহা ছাড়া মাদ্রিদ্ শহরে সে রাত্রিটা খুবই ভাল ছিল।

রেজিষ্টারি-বই বন্ধ করিবার পূর্ব্বে, গম্ভীর মেজিষ্ট্রেট বলিলেন, "কেবল একজায়গায় খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র; ব্যাপারটা তেমন কিছুই গুরুতর নহে।"

জেরোনিমো ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আপনি ঐ ব্যাপারটার সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে পারেন কি?"

পুলিস মেজিষ্ট্রেট গভীর চিন্তার ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় তিনি কিরূপ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন?"

জেরোমিনো খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উত্তর করিলেন;—"একটা কালো কোর্ত্তা"।

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন;—

"আপনি কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, কোর্ত্তাটার রং কালো ছিল? কাফ্রি-মুখের রং, সবুজ-তাঁবাটে রং, গেরুয়া রং, বাদামী রং ছিল না, এ-কথা কি আপনি ঠিক করে বল্‌তে পারেন? রংটা ঘোর, কি ফিঁকে এ সমস্ত জানা খুবই দরকার।"

"আমি নিশ্চয় করে বল্‌ছি। কোর্ত্তার রং কালো ছিল। দেবতা সাক্ষী করে বল্‌ছি, ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌ছি, আমার ভাবী জামাতা কালো রং-এর কোর্ত্তাই পরেছিলেন। আমার কন্যা ফেলিসিয়ানা বলেন, ঐ রংটাই সম্ভ্রম-সূচক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট অবান্তর প্রসঙ্গের হিসাবে বলিলেন, "আপনি যেরূপ উত্তর দিচ্চেন তাতে মনে হয় আপনি খুব ভাল রকম শিক্ষা পেয়েছিলেন। আচ্ছা, তাহলে আপনার দৃঢ়-বিশ্বাস, কোর্ত্তাটা কালো রং-এরই ছিল?"

—"আজ্ঞে হাঁ, কালো রং-এরই ছিল।"

—"যাকে খুন্ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার গায়ে তামাটে রং-এর একটা হাত-কাটা

মেরজাই ছিল।" মেজিস্ট্রেট মনে মনে ভাবিলেন, রাত্রে একটা শাম্‌লা রং-এর মেরজাই, কালো রং-এর কোর্ত্তা বলে' ভুল হতেও পারে। "দেখুন, সে রাত্রে ডন্‌-আন্দ্রে কি-রকম হাত-কাটা জামা পরেছিলেন, সেটা পর্য্যন্ত কি আপনার স্মরণ হয় ?

"হল্‌দে রং-এর জামা।"

—"আহত ব্যক্তির গায়ে নীল রং-এর জামা ছিল; হল্‌দে ও নীলের মধ্যে একটা নৈকট্য সম্বন্ধ আছে বলে ত মনে হয় না। ঐ দুই রং-এর মধ্যে মিল খুবই কম। আচ্ছা মহাশয়, তাঁর পেণ্ট্‌লনটা কি রকম ছিল ?"

—"সাদা পেণ্ট্‌লন। বুট্ জুতা পর্য্যন্ত নামিয়ে "ফিট্" করে তৈরী করা। আমি এ সমস্ত খুঁটিনাটি আন্দ্রের চাকরের কাছে শুনেছি।"

—"পুলিসের রিপোর্টে দেখা যায়, ধূসর রং-এর কাপড়ের চোওরা পেণ্টলুন; বাছুরের চাম্‌ড়ার সাদা জুতো। আপনি যা বল্‌ছেন তা তো নয়। নৈশ-প্রহরী তার চেহারার যে বর্ণনা করেছে, তা এই;—ডিম্বাকার মুখ, গোলাকার থুৎনি, সচরাচর-ধরণের কপাল, মাঝামাঝি আকারের নাক, কোন বিশেষ রকমের চিহ্ন নাই। এই বর্ণনা থেকে কি তাঁকে চিন্‌তে পারচেন ?"

ডন্‌-জেরোনিমো দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উত্তর করিলেন,—"একটুও না······কিন্তু কি করে' তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় ?"

—"তার জন্য চিন্তা নাই; নগরবাসীদের উপর পুলিসের বেশ নজর আছে; পুলিস সব দেখ্‌তে পায়, পুলিস সব শুন্‌তে পায়; পুলিসের গতি সর্ব্বত্রই; পুলিসের দৃষ্টি হতে কিছুই এড়াবার জো নেই; ইন্দ্রের মতো পুলিসের সহস্র চক্ষু; বাঁশি বাজিয়ে পুলিস্‌কে ঘুম পাড়ানো যায় না। অতল রসাতলের মধ্যে থাক্‌লেও আমরা আন্দ্রেকে আবার টেনে বের করব। দুই গোয়েন্দাকে আমি তার পিছনে লাগাচ্চি; একজনের নাম আর্গমশিল্লা; আর একজনের নাম কোবাকুয়েল্লা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এর একটা কিনারা করবই।"

ডন্‌-জেরোনিমো ধন্যবাদ-সহ নমস্কার করিয়া খুব দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বাহির হইলেন। গৃহে ফিরিয়া, পুলিসের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সমস্ত তাঁহার কন্যাকে বলিলেন। শিল্পজীবী শ্রেণীর লোকের পোষাক-পরা আহত ব্যক্তি ফেলিসিয়ানার ভাবী পতি বলিয়া ফেলিসিয়ার এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হইল না।

সদ্‌বংশজাত মহিলা-সুলভ সংযমের সহিত ফেলিসিয়ানা তাঁহা ভাবী পতির জন্য, "নব্যের" জন্য, একটু অশ্রুপাত করিলেন; কেন না, নবযুবতীর পক্ষে কোন পুরুষমানুষের জন্য বেশী কান্নাকাটি করা অশিষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার নেত্র-পল্লবের কোণে যে একটি অশ্রুবিন্দু অতি-কষ্টে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার 'লেসের'-পাড়-বিশিষ্ট রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। "যুগলবন্ধ" গান সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়া আছে—পিয়ানো বন্ধ। ফেলিসিয়ানার নৈতিক অবসাদের ইহাই নিদর্শন। ২৪ ঘণ্টা কখন অতিবাহিত হইবে, কখন গোয়েন্দাদ্বয়ের সফল অনুসন্ধানের রিপোর্ট আসিবে তজ্জন্য ডন-জেরোনিমো অধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ঐ দুই চতুর গোয়েন্দা প্রথমে আন্দ্রের গৃহে গিয়া, আন্দ্রের অভ্যাসাদির কথা খুব নিপুণতার সহিত, আন্দ্রের ভৃত্যদের মুখ হইতে বাহির করিল। গোয়েন্দাদ্বয় অবগত হইল,—আন্দ্রে সকালে চকোলেট্ খায়, দুপুরবেলায় একটু নিদ্রা যায়, তিনটার সময় কাপড়-চোপড় পরিয়া ডনা-ফেলিসিয়ানার বাড়ী যায়, সেইখানে ৬টার সময় 'ডিনার' খায়, তারপর, বেড়াইয়া আসিয়া কিংবা থিয়েটার দেখিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে বাড়ী আসিয়া শয়ন করে। এই সব বিবরণ অবগত হইয়া গোয়েন্দদ্বয় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইল। উহারা আরও জানিতে পারিল যে, আন্দ্রে "আলকালাব" রাস্তা ধরিয়া, "পেলিগ্রো" পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

গোয়েন্দাদ্বয় "পেলিগ্রোর" রাস্তায় গিয়া জানিতে পারিল, আন্দ্রে দুইদিন পূর্ব্বে, ৬টা কয়েক মিনিটের সময় ঐ রাস্তা দিয়া গিয়াছিল; খুব সম্ভব আন্দ্রে তাহার পর ডেলক্রুজ-রাস্তা দিয়া চলিয়াছে।

অনুসন্ধানের ফলে একটা খুব দরকারী কথা জানিতে পারিয়া এবং শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া উহারা একটা "আশ্রমে" ঢুকিল—মাদ্রিদ্ নগরে শুঁড়ীর দোকান আশ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, এক বোতল সুরাপান করিতে করিতে উহারা তাস খেলিতে লাগিল।

তাসখেলা প্রভাত পর্য্যন্ত চলিল!

একটু ঘুমাইয়া লইয়া, উহারা আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল; এবং আন্দ্রে "রাষ্ট্রো" পর্য্যন্ত গিয়াছিল—এ সন্ধানও উহারা পাইল। তার পর আবার খেই হারাইল! কালো কোর্ত্তা, হল্‌দে ফতুয়া, সাদা পেণ্টলুন-পরা কোন এক যুবকের আর কোন খবর কেহই দিতে পারিল না। একেবারে সম্পূর্ণ অন্তর্ধান! সকলেই তাকে যাইতে দেখিয়াছে, কেহই তাহাকে ফিরিতে দেখে নাই···উহারা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

পূর্ণ দিবালোকে, মাদ্রিদ্ শহরের একটা লোকাকীর্ণ অঞ্চলে, তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাও সম্ভব নহে। তবে যদি তার চলিবার পথে পায়ের নীচে একটা খোলা ফাঁদ পাতা থাকে, আর তাহাতে পড়িবামাত্র সেই ফাঁদ বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে,—ইহা ভিন্ন তাহার অন্তর্ধানের আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

গোয়েন্দাদ্বয় "রাষ্ট্রোর" চারিদিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোরা-ফেরা করিল; কতকগুলি দোকানদারকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে আর কোন কথা বাহির করিতে পারিল না। এমন-কি, যেখানে আন্দ্রে পোষাক বদলাইয়াছিল, সেই দোকানেও উহারা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন দোকানদার ছিল না, দোকান-দারের পত্নী ছিল। দোকানদারই আন্দ্রেকে পোষাক বিক্রয় করে। সুতরাং দোকানদার-পত্নী কোনও খবরই দিতে পারিল না। এমন-কি উহাদের বদ্ চেহারা দেখিয়া উহাদিগকে সে দস্যু ঠাওরাইয়াছিল। কোন জিনিস ইতিমধ্যে হারাইয়াছে কি না, চারি-দিকে একবার নজর করিয়া দেখিয়া চটা-মেজাজে উহাদের মুখের সাম্‌নেই ধরাস্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সমস্ত দিনের অনুসন্ধানের ফল এই ত হইল। ডন-জেরোনিমো আবার পুলিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিস গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, অপরাধীদিগের খোঁজ করা যাইতেছে, বেশী ত্বরা করিলে সব কাজ নষ্ট হইবে।

ভালমানুষটি বিস্মিত হইয়া, গৃহে ফিরিয়া গিয়া, পুলিস যাহা উত্তর দিয়াছিল, ফেলিসিয়ানাকে বলিলেন। ফেলিসিয়ানা আকাশের দিকে চোখ্ তুলিল এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া শুধু এই কথা বলিয়া উঠিল ;—"বেচারী আন্দ্রে !"

একটা অদ্ভুত কাণ্ড, এই দুর্ব্বোধ ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। ১৪ বৎসর বয়স্ক একটা অদ্ভুত ছোক্‌রা আন্দ্রের গৃহে আসিয়া একটা বড় বোচ্‌কা রাখিয়া যায় এবং এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া যায় ;—"আন্দ্রে-মহাশয়ের জন্য"।

কথাটা ত সাদসিধা, কিন্তু যখন বোচ্‌কাটা খুলিয়া দেখা হইল, তখন গোয়েন্দাদিগের নিকট একটা নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া মনে হইল।

বোচ্‌কাটার ভিতর কি ছিল অনুমান কর দেখি ! উহার ভিতর ছিল আন্দ্রের একটা কালো কোর্ত্তা, একটা হল্‌দে ফতুয়া ও একটা সাদা পেন্ট্‌লন ও একজোড়া বার্ণিস-করা বুট্ জুতা। তাছাড়া একজোড়া প্যারিসের দস্তানা অতি-যত্নে গুটাইয়া রাখা হইয়াছিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া—অপরাধের ইতিবৃত্তে যাহার কোন দৃষ্টান্ত নাই—গোয়েন্দাদ্বয় বিস্ময়-স্তম্ভিত হইল। হতাশ ভাবে উহাদের মধ্যে একজন আকাশের দিকে দুই হাত তুলিল, আর একজন কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগে বাহুদ্বয় স্থাপন করিল। প্রথম ব্যক্তিটি বলিল ;—"কালের কুটিলা গতি !" আর একজন বলিল ,—"আজব কাণ্ড দুনিয়ার !" হত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় হত্যাকারী বেশ গুছাইয়া ভাঁজ করিয়া, বাঁধিয়া-সাঁধিয়া তাহার গৃহে ফেরত পাঠাইয়াছে —এরূপ মার্জ্জিত শঠতা কি বিরল নহে ? একে ত গুরুতর অপরাধ, তার উপর আবার উপহাস !

গোয়েন্দাদ্বয় বোচ্‌কার কাপড়গুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া আরও হতবুদ্ধি হইল।

কোর্ত্তার কাপড়টা বেশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; ছোরা কিংবা গুলি কাপড় ফুঁড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ কোন তেকোণা কিংবা গোলাকার ছিদ্র কাপড়ে নাই। হয়ত লোকটাকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে ; কিন্তু তাহা হইলে ত একটা যুঝাযুঝি হইত। তাহাতে ফতুয়া ও পেনটুলন এরূপ ফিট্-ফাট্ থাকিত না। উহা দুম্‌ড়াইয়া যাইত, ছিঁড়িয়া যাইত, কুটি-কুটি হইত। এরূপ কখনই সম্ভব নহে, যে ধনশালী আন্দ্রে তাহার কাপড়-চোপড় বাঁচাইবার জন্য কাপড় ছাড়িয়া তারপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এ যে অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা ! ইহাতে গোয়েন্দাদ্বয়ের অপেক্ষা বড় বড় মাথাও ঘুলাইয়া যাইবার কথা।

এই দুজনের মধ্যে একজন একটু বেশী তর্ক-বাগীশ ছিল। পাছে তীব্র চিন্তায় তাহার প্রতিভা-দীপ্ত ললাট ফাটিয়া যায় এইজন্য দুইহাতে কপালের দুই রগ্ ১৫ মিনিট কাল ধরিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার মুখ হইতে এই কথাটা মহা-জয়োল্লাসসহকারে বাহির করিল ;—

"যদি আন্দ্রে-মহাশয় না মরিয়া থাকেন,

তাহা হইলে অবশ্য তিনি বাঁচিয়া আছেন—কারণ মানুষের এই দুই রকম অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থা হইতে পারে না। তৃতীয় কোন অবস্থা আছে বলে' আমি ত জানিনা।"

তাঁহার জুড়িদারও মাথা নাড়িয়া এই কথায় সায় দিল।

"যদি তিনি জীবিত থাকেন—আমার বেশ মনে হচ্চে তিনি জীবিত আছেন—তাহা হইলে তিনি কখন উলঙ্গ হয়ে যান নি। তিনি যখন বাড়ী হতে বাহির হন তখন তাঁর সঙ্গে কোন বোচ্‌কা-বুচ্‌কি ছিল না। এই কাপড়গুলা যখন তাঁহারই কাপড় তখন তিনি অবশ্যই এই কাপড়গুলা অন্যের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন। কারণ এ কথনো মনে করা যাইতে পারে না যে, এই উন্নত সভ্যতার দিনে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া দিগম্বর হইবে।"

জুড়িদারের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তি গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, তাহার এই অকাট্য যুক্তি যখন শুনিল তখন তাহার চোখদুটি অক্ষি-কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আমার মনে হয় না যে, ডন্‌-আন্দ্রে, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহার পর, যে অঞ্চলে আমরা তাঁর "খেই" হারাইয়া ছিলাম, সেই অঞ্চলের কোন বাড়ীতে আসিয়া সম্ভবত ঐ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন; তিনি নিশ্চয়ই নিজের কাপড়গুলা বাড়ী ফেরত পাঠিয়ে কোন পুরোনো-কাপড়ওয়ালার দোকান থেকে এই সব পুরোনো কাপড় কিনেছিলেন।"

তাহার জুড়িদার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই বুদ্ধিতে বৃহস্পতি; আয় তোকে আলিঙ্গন করি! আজ থেকে আমি আর তোর বন্ধু নই,—আমি এখন তোর গোঁড়া ভক্ত, আমি তোর কুত্তা, আমি তোর গোলাম, আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নে, যেখানে তুই যাবি, আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে যাব। সরকারের যদি ন্যায় বিচার থাক্‌ত তাহলে সামান্য পুলিসের কর্ম্মচারী না হয়ে তুই রাজ্যের কোন বড় শহরে একটা মস্ত পদ পেতে পারতিস্‌। তবে কি না, কোন রাজ-সরকারই ন্যায়ের পথে কখনো যায় না!"

—তৈরী কাপড় যারা বিক্রী করে সেই সব পুরোনো কাপড়ের দোকানে এস আমরা যাই, আর সেইখানে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করি। তাদের বিক্রীর জাবদা বই সব ভাল করে দেখি, তাহলে ডন-আন্দ্রে-মশায়ের আর কোন নূতন পরিচয়-চিহ্ন পাওয়া যেতেও পারে। যে ছোক্‌রাটা কাপড়ের বোজ্‌কা এনেছিল তাকে যদি দরোয়ান আট্‌কিয়ে রাখ্‌ত তাহলে জান্‌তে পারা যেত, কে তাকে পাঠিয়ে দিলে, সে কোত্থেকে আস্‌ছে। কিন্তু এ-সব কথা কারও মনে হয়নি। চল ভাই এখন যাওয়া যাক্‌। তুমি "মেয়ারের" দর্জ্জিদের দোকানে যাও; আমি "রাষ্ট্রোর" পুরানো কাপড়ের দোকানে যাই।"

কয়েক ঘণ্টা পরে দুই বন্ধু মেজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিল।

উহাদের মধ্যে একজন উহার অনুসন্ধানের ফল তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিল। বড় লোকের ধরণের পোষাক-পরা একব্যক্তিকে

খুবই উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছিল, সে একটা বড় দর্জ্জির দোকানে একটা 'ড্রেস-কোট্' ও একটা কালো পেন্ট্লুন কিনেছিল। মূল্যের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।

আর একজন বলিল,—"রাষ্ট্রোর' একজন দোকানদার, কালো কোর্ত্তা ও সাদা পেনটুলন-পরা একব্যক্তিকে একটা ওয়েষ্ট-কোট্, একটা ফতুয়া ও একটা শিল্পজীবী-ধরণের কোমর-বন্ধ বিক্রী করেছিল। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ডন-আন্দ্রে। দুজনেই দোকানের পিছন-দিকে গিয়ে কাপড় বদ্‌লে নতুন কাপড় পরে রাস্তায় বের হয়েছিল। তারা যে শ্রেণীর লোক তাতে মনে হয় দুজনেই ছদ্ম বেশ পরেছিল। একই দিনে, একই সময়ে একজন ভদ্রলোক, একজন নিম্নশ্রেণীর লোকের আংরাখা এবং একজন নিম্নশ্রেণীর লোক একজন ভদ্র লোকের ফতুয়া কি মৎলবে পরিয়াছিল, তাহা এই প্রহরীদ্বয় কিছুই স্থির করিতে পারিল না; ভাবিল, মেজিষ্ট্রেট মহোদয়ের তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ বুদ্ধি এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে অনায়াসেই সমর্থ হইবে।

কিন্তু উহারা ভাবিল,—এই যে রহস্যময় অন্তর্ধান, এই-যে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই সময়ে দুইজনের ছদ্মবেশ ধারণ, এই-যে স্পর্দ্ধার সহিত হতব্যক্তির গৃহে হত-ব্যক্তির কাপড়-চোপড় পুনঃপ্রেরণ— এই সমস্ত ব্যাপারের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বোধ হয় এ-একটা কোন বড়রকম ষড়যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ব্যাপার— বোধ হয় স্পেনের সিংহাসনে আর কোন দাবীদারকে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। ছদ্মবেশ পরিয়া কতকগুলা অপরাধী এই উদ্দেশে যাতায়ত করিতেছে। এখন স্পেন একটা আগ্নেয়-গিরির উপর অবস্থিত;— কখন ফাটিয়া উৎপাত আরম্ভ হইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমাদিগকে যদি কিছু দক্ষিণা দেওয়া হয়, আমরা এই আগ্নেয়-গিরির আগুন নিবাইয়া দিতে পারি—বিপ্লবকারীদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিতে পারি।

মেজিষ্ট্রেট প্রহরীদ্বয়ের রিপোর্ট যথোচিত মনোযোগে শুনিয়া উহাদিগকে বলিলেন;—

"ছদ্মবেশ ধারণ করবার পর ঐ ব্যক্তি কোথায় গেল সে বিষয়ে কি তোমরা কোন খোঁজখবর পেয়েছ?"

উহাদের মধ্যে একজন বলিল;—

যে—"শ্রমজীবী, ভদ্রলোকের কাপড় পরেছিল—সে "প্রাদোর" বেড়াবার জায়গায় বেড়াতে গেল—তার পর থিয়েটারে গেল, তারপর একজায়গায় কাফির কুল্পি খেলে।"

আর একজন বলিল;—

"ভদ্রলোকটি যে শ্রমজীবীর কাপড় পরেছিল সে "লাভাপির নগর প্রাঙ্গনে কয়েকবার ঘোরা ফেরা করলে, তারপর তারই সংলগ্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, জানলায় কোন শিল্পজীবী-শ্রেণীর সুন্দরী মুখ বাড়িয়ে আছে কি না, সেইদিকে নজ্‌রা মারতে লাগল। তারপর একটা সঙ্গীতের আড্ডায় গিয়ে এক গ্লাস বরফে জমাট্ লেমনেড খেলে।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন—"প্রত্যেকেই দেখ্‌ছি, —যার যে-রকম ছদ্মবেশ সেই ছদ্মবেশের অনুরূপ চরিত্রের অভিনয় করচে। একজন নিম্নশ্রেণী লোকদের মনোভাব তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করচে; আর একজন

উচ্চশ্রেণী লোকদের সহানুভূতি পাবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু আমরা পুলিস—আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। ষড়যন্ত্রী ভায়ারা—তোমরা নরমপন্থীই হও—আর গরমপন্থীই হও-আমাদের কাছে কোনও পন্থীরই জারিজুরী খাটবে না। হা! হা! ইন্দ্র সহস্র-লোচন ছিল, কিন্তু পুলিসের লক্ষ লোচন। তাছাড়া, পুলিসের চোখে ঘুম নেই।'' দেখ আর্গমসুল্লা, তোমাদের পারিশ্রমিক তোমরা পাবে। কিন্তু তোমরা ত জানতে পার নি, চলে যাবার পর সেই বদমাইশদের শেষে কি হ'ল ?"

—"না, আমরা তা জানতে পারি নি। কারণ, সেই সময় অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রাত্রি হবার পর থেকে আমরা তার থেই হারালাম।''

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,

—"মোলো যা ! বড়ই দুঃখের বিষয়।''

গোয়েন্দাদ্বয় খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল ;—

"আমরা আবার তাদের খুঁজে বের করব।''

এই সময় ডন-জেরোনিমো কোন নূতন খবর আছে কি না জানিবার জন্য আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মেজিষ্ট্রেট বেশ-একটু শুষ্কভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। জেরোনিমো থতমত খাইয়া নানা ওজর দিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে পর, মেজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বলিলেন ;—

"এরূপ প্রকাশ্যভাবে এতটা দরদ দেখিয়ে ডন-আন্দ্রের খোঁজ-খবর নেওয়াটা আপনার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হচ্চে না। ডন-আন্দ্রে একটা মস্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত আছেন, আমরা দুদিন থেকে তারই সন্ধান করচি।''

ডন-জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন ;—

—"আন্দ্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত !"

একজন পুলিসের কর্ম্মচারী বলিলঃ—"হাঁ তিনিই।"

—"ছেলেটি এমন ভাল-মানুষ, এমন শান্ত, এমন আমুদে, এমন নিরীহ !"

—"ব্রুটস্ যেমন পাগলামির ভাণ করেছিল আন্দ্রে তেমনি বাইরে ভালমানুষি দেখাত। লোকের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়ে আপনার মৎলব হাসিল করবার এ-একটা ফন্দি। আমরা পুরোনো ঘাঘি, আমরা ও-সব বেশ জানি। যদি তাকে আর না পাওয়া যায় তাহলেই তার পক্ষে ভাল। আপনি যদি তার ভাল চান ত ঐ কামনাই করুন।"

স্বকীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব উপলব্ধি করিয়া, এবং অত্যন্ত 'মর্চ্চিভঙ্গ' ও লজ্জিত হইয়া বেচারী ডন-জেরোনিমো প্রস্থান করিলেন।

যে ব্যক্তি আন্দ্রেকে শিশুকাল হইতে জানিত, যাকে শৈশবাবস্থায় কোলে লইয়া নাচাইয়াছে, সেই ডন-জেরোনিমোর এখন একটুও সন্দেহ রহিল না যে এই আন্দ্রে একজন ভয়ানক ষড়যন্ত্রী। যে বিষয়ে ডন-জেরোমিনোর কখন লেশমাত্র সন্দেহ করেন নাই,—অথচ অপরাধীকে প্রতিদিন দেখিয়া আসিতেছেন—এমন কি, তাহাকে আপনার জামাই করিবেন বলিয়া প্রায় স্থির করিয়াছিলেন—এখন কিনা তার সম্বন্ধে এই গুপ্তকথা পুলিস এত অল্প সময়ের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছে! পুলিসের এই ভয়ানক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুরতা দেখিয়া, পুলিসের উপর

ডন-জেরোনিমোর ভীতি-বিস্ময়মিশ্র অপরিসীম ভক্তির উদয় হইল।

ফেলিসিয়ানা যখন জানিল যে, বহুশাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট একটা বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নেতা, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য এত সাধ্য-সাধনা করিতেছে, তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আন্দ্রের খুব মনের জোর আছে বলিতে হইবে,—সে এমন উচ্চতর রাষ্ট্রনৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও, কিছুই কাহাকে জানিতে দেয় নাই—বেশ ঠাণ্ডাভাবে সেই যুগলবন্ধ গানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে! ইহার পর—শান্ত মুখের ভাব, শান্ত চোখের ভাব, হাসি-হাসি মুখ—এই সবের উপর আর কি বিশ্বাস করা যায়! সে যে ষাঁড়ের লড়ায়ে এত উৎসাহ দেখাইত—এই সব ছেলেমানুষি আমোদ ভালবাসে বলিয়া ভাণ করিত, সে শুধু তার আসল মনের ভাব গোপন করিবার জন্য কি নহে?

গোয়েন্দাদ্বয় আবার নবোদ্যমে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং অবশেষে অবগত হইল যে, যে যুবকটি আহত হইয়াছিল এবং মিলিতোনা যাহাকে আপন গৃহে লইয়া গিয়াছিল, সেই যুবকই "রাস্ত্রোর" পরিচ্ছদ ক্রয় করে। নৈশ-প্রহরী ও দোকান্‌দারের কথিত বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল ছিল। চকোলেট্ রং-এর ওয়েষ্ট-কোট, নীল ফতুয়া, লাল কোমরবন্দ– আর কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

আর্গমসুল্লা ও কোভাচুল্লা, ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যে আশা মনে মনে পোষণ করিয়াছিল, এই নূতন আবিষ্কারে, সেই আশা একটু ভণ্ডুল হইয়া গেল। আন্দ্রে যদি একেবারেই অন্তর্ধান করিত, তার কোন কূল-কিনারা পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে উহাদের পক্ষে খুব সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন এই ব্যাপারটা একটা সাদাসিদা প্রেমের ষড়যন্ত্রে পরিণত হইল—ইহা শুধু প্রেমিক-প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের অতি তুচ্ছ সামান্য একটা কলহ মাত্র! প্রতিবেশীরা-শেরি নেড' গান শুনিতে পাইয়াছিল। ইহা হইতে, আসল ব্যাপারটা কি হইয়াছিল সমস্তই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

কোভাচুল্লা, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল।—

"আমার জীবনে কখনই সৌভাগ্য লাভ হয় নি।"

অর্গমসুল্লা কাঁদো-কাঁদো স্বরে উত্তর করিল "একটা কুগ্রহে আমার জন্ম হয়েছিল।"

আহা বেচারা! ঐ বন্ধুদ্বয় একটা মস্ত ষড়যন্ত্র বাহির করিতে গিয়া কিনা শুধু একটা গুরুতর আঘাতের অপরাধের আবিষ্কার করিল! ইহাতে হতাশ হইবারই কথা।

এখন আবার জুয়াঙ্কোর নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক্। আন্দ্রের সহিত যখন তাহার যুদ্ধ হয়, সেই সময় হইতে আমরা জুয়াঙ্কোকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এক ঘণ্টা পরে জুয়াঙ্কো বাঘের মত নিঃশব্দে পা ফেলিয়া, যুদ্ধ ঘটনার স্থলে আবার আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, আন্দ্রের মৃত শরীর ঐখানেই সে দেখিতে পাইবে। কিন্তু দেখিতে না পাইয়া জুয়াঙ্কো যার-পর-নাই বিস্মিত হইল। তবে কি, আহত অবস্থায়, যন্ত্রণায় আবেশে নিজের শরীরটাকে টানিয়া-টানিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে? নৈশ-প্রহরীরা তাহাকে কি তুলিয়া লইয়া গিয়াছে? জুয়াঙ্কো কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না। এখন এখানে থাকা,—

না, এখান হইতে পলায়ন করা শ্রেয় ? পলায়ন করিলে উহাকে অপরাধী বলিয়াই সকলে মনে করিবে। তাছাড়া, মিলিতোনা হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া, মিলিতোনাকে নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়া—এই কল্পনাটা ঈর্ষা দগ্ধ চিত্তের পক্ষে অসহ্য। সে রাত্রিটা ঘোর অন্ধকার ছিল, রাস্তা জনশূন্য ছিল, কেহই জুয়াঙ্কোকে দেখে নাই। কে তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ আনিবে ?

তবে যুদ্ধটা এতক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল যে জুয়াঙ্কোর প্রতিদ্বন্দী জুয়াঙ্কোকে আবার দেখিলে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে। কারণ অভিনেতাদের ন্যায় বৃষমল্লদেরও মুখ সর্ব্বজন পরিচিত। যদি আন্দ্রে না মরিয়া থাকে তাহা হইলে সে হয়ত জুয়াঙ্কোর নামে অপরাধের আরোপ করিয়াছে। জুয়াঙ্কো ছোরা চালাইতে সিদ্ধহস্ত একথা পুলিসের অবিদিত ছিল না; তাই জুয়াঙ্কো মনে করিল, যদি সে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তাহা হইলে, আফ্রিকার কোন স্পেনীয় উপনিবেশে তাহার কয়েক বৎসর বাস করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই মনে করিয়া সে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া তাহার ঘোড়া বাহির করিয়া আনিল এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে একটা বহু-বর্ণের কম্বল চাপাইয়া, তাহাতে চড়িয়া, ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল।

যদি কোন চিত্রকর দেখিত, একটা কালো ঘোড়ার পার্শ্বদেশ দুই পায়ে চাপিয়া একজন অশ্বারোহী রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; ঘোড়ার ঘাড়ের চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, ঘোড়ার পুচ্ছ অনল-শিখার মত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, অশ্ব-খুরের আঘাতে বাঁধানো রাস্তার অসমান ভূমি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠাইয়া নিস্তব্ধ সহরের মধ্য দিয়া, প্রশান্ত রাত্রে অশ্বারোহী সশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে সেই চিত্রকর এই অশ্ব ও অশ্বারোহীর মূর্ত্তি চিত্র করিয়া দর্শকের নয়ন-মন নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিতে পারিত। কিন্তু তখন চিত্রকরেরা সকলেই নিদ্রামগ্ন।

জুয়াঙ্কো শীঘ্রই সহরের সীমা ছাড়াইয়া পল্লিগ্রামের বিষণ্ণ মাঠ-ময়দানে আসিয়া পড়িল। সেই স্থান মাদ্রিদ শহর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে। তখন মিলিতোনার মুখখানি তাহার মানস-পটে উদয় হইল; তাহার পক্ষে এখন আর বেশী দূরে যাওয়া একেবারেই অসাধ্য হইল। তাহার মনে হইল, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আঘাত করিতে পারে নাই; সে হয়ত গুরুতর আঘাতে আহত হয় নাই। সে কল্পনা করিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আরোগ্যলাভ করিয়া এতক্ষণে স্মিত-হাস্যাননা মিলিতোনার আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়াছে।

শীতল স্বেদজলে জুয়াঙ্কোর ললাটদেশ পরিষিক্ত হইল। দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল ও স্নায়বিক আক্ষেপ-বশত তাহার জানুদ্বয় ঘোড়ার পার্শ্বদেশ এরূপ আঁটিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল যে ঘোড়ার দম বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঘোড়াটা থমকিয়া দাঁড়াইল। যেন কেহ অগ্নি-তপ্ত শলাকা তাহার বক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে, এইরূপ যন্ত্রণা তাহার অনুভব হইতে লাগিল।

জুয়াঙ্কো ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিয়া ঝড়ের বেগে সহরের দিকে ছুটিয়া চলিল। তখন রাত্রি তিনটা; জুয়াঙ্কো "পোভারের" রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। একটা পুরাতন প্রাচীরের কোণে তখনও, কম্পমান অকলঙ্ক তারকার

ন্যায় মিলিতোনার দীপ জ্বলিতেছিল। বৃষভ-মল্ল গলি-পথের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল—অসাধারণ বলসত্ত্বেও দ্বার ভাঙ্গিতে পারিল না।

মিলিতোনা পূর্ব্বেই ভিতর দিকে সযত্নে লৌহ-অর্গল নামাইয়া দিয়াছিল। ভীষণ অনিশ্চিততার মধ্যে যন্ত্রনায় প্রপীড়িত্ হইয়া হত ভাগ্য জুয়াঙ্কো গৃহে ফিরিয়া গেল। কারণ, মিলিতোনার পর্দ্দার উপর সে দুইটা ছায়া দেখিয়াছিল। তবে কি আসল লোককে না মারিয়া ভুলক্রমে আর কাহাকে মারিয়াছে!

রাত্রি প্রভাত হইলে মল্লবীর, আস্তিন-বিরহিত খাটো আলখাল্লা পরিধান করিয়া, ও টুপিটা চোখের উপর নামাইয়া দিয়া, রাত্রির ঘটনাসম্বন্ধে কে কি বলিতেছে শুনিতে আসিল। জানিতে পারিল, যুবকটি মরে নাই; এবং বহিয়া লইয়া যাইবার অবস্থা নহে বলিয়া, মিলিতোনা তাহাকে তুলিয়া নিজ কক্ষে রাখিয়া দিয়াছে। এই সদয় ব্যবহারের দরুণ কল্পনাপ্রিয় লোকেরা মিলিতোনার খুব প্রশংসা করিতেছে। বলিষ্ঠ হইলেও, জুয়াঙ্কো, অনুভব করিল যেন তার পা টলিতেছে, সে বাধ্য হইয়া প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া রহিল। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিলিতোনার পালঙ্কে! তাহার জন্য এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা অন্ধতম নরকও উদ্ভাবন করিতে পারে না। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া জুয়াঙ্কো মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করিল। এবং প্রবেশ করিয়া গুরুপদক্ষেপে ও সশব্দে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইরাণী

যৌবনেরি মউবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি,
দুপুর-বিজন ঝর্ণাতলায় একলা বসে চুল খুলি'।
পূর্ণিমারি ঢেউ উঠেছে রূপ-সায়রের মাঝখানে,
থির রহেনা মোতির মালা, উঠ্ছে কাণের দুল্ দুলি'।

ফুলের ফিতায় বিনায় বেণী ফাল্গুনেরি দিনটিতে,
দুষ্ট-অলক বশ মানে যে কঙ্কণেরি কিন্‌কি-তে!
হাত দু'খানি খোঁপার 'পরে, বাহুর বাঁকে জওসমের
ঝুম্‌কো দু'টি দুল্‌ছে, সে কি আলিঙ্গনের ইঙ্গিতে?

মখ্‌মলেরি বিছ্‌না'পরে ঘুমায় কোলে সারঙ্গী,
নীল্-রঙিলা কাচের থালায় আনার-আঙুর-নারঙ্গী—
একটি ছোট টুক্‌রা-ফালি টুকটুকে-লাল তরমুজের
রাঙা ঠোঁটে ঠেকায় শুধু, মুখে দেওয়া বারণ কি?

কালোডানার শ্বেত-মরালী !—স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র-তনুর ডান্-বামে !
গোলাপফুলের তাজটি মাথায়, জাফ্‌রাণী-রং পায়জামা—
যুবতী নয়, বালক-কিশোর বস্‌ল এসে তাঞ্জামে !

রাতের বেলায় জ্বালিয়ে বাতি মুকুরে তার মুখ ত্থাখে,
কাঁচল খানি খুলেই আবার মুচ্‌কি হেসে বুক ঢাকে !
দর্পণে সে চুম্ দেবে তার গালের টোলে লাজ-রাঙা—
ঠোঁটেই পড়ে ঠোঁটের চুমা, তাই ত' প্রাণে দুখ থাকে।

বাসর-দোসর বরের বুকে অঘোরে ঘুম যায় না সে,
স্বপন ভেঙ্গে হঠাৎ জেগে প্রিয়ের পানে চায় না সে,
সুর্ম্মা-ধোয়া দুখের শিশির গোলাপ-গালে গড়ায় না—
ফুট্‌লে হাসি বঁধুর মুখে, সুখের গজ্‌ল্ গায় না সে !

আপন প্রেমেই আপ্‌নি বিভোর, পর্-পিয়াসা পায় না যে !
রূপের ছায়া ধরবে চোখে—পুরুষ শুধুই আয়না যে !
হাওয়ায়-ওড়া ওড়্‌না-আড়ে দৃষ্টি কি তার দুরন্ত !
গুরু উরুর গুমর-ভরা জোড়-পায়েলা পা'য় বাজে।

জ্যোৎস্না-জরীন্ ঘাসের ফরাস—ছায়ারা সব কোণ খুঁজে'
'সরো'র সারির তলায় জোটে, নিঝুম রাতির মন বুঝে';
তারার চোখে আলোর ধাঁধা—ঠাউরে' না পায় কোন্ তিথি,
বুঁদ হ'য়ে চাঁদ গড়িয়ে পড়ে বাদ্‌শা-বাড়ীর গম্বুজে।

'নিশি'র ডাকে তখন যে তার মন্-মহলের খিল খোলা !
সেতার খানায় কি সুর হানে ! দুল্‌ছে নিশার নীল দোলা !
ঝাঁপ্‌টাখানা দুল্‌ছে মাথায়, ফণির ফণায় মণির প্রায় !
শিরায় শিরায় গানের গমক—সুরের সুরায় দিল্-ভোলা !

গানের শেষে হাতটি ধরি হেনায়-রাঙ্গা তুল্-তুলে—
সকল বাঁধন শিথিল তখন, নিবস্ত চোখ ঢুল-ঢুলে !
সাহস-ভরে অধর 'পরে দিলাম চুপে দিল্-মোহর—
নুইয়ে প'ল গোলাপ-শাখা, ঘুমিয়ে প'ল বুল্‌বুলে !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বিক্রমপুর নামের পুরাতত্ত্ব ও তাহাতে ইতিহাসের সূত্র

ঢাকা-জিলা পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর আবার ঢাকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও উন্নত স্থান। কেবল ঢাকা কেন, বিক্রমপুর সমগ্র বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষেও বিশেষ প্রখ্যাত। সুতরাং বিক্রমপুরের সুশিক্ষিত সন্তানেরা থাকিতে বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্বের আলোচনায় হস্তক্ষেপ আমার মত ব্যক্তির পক্ষে যে অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা আমি বিশেষ রূপেই অনুভব করিতে পারিতেছি! বস্তুত বিক্রমপুরের দুইজন কৃতী সন্তানই 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' ও 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণয়ন করিয়া ঢাকা ও বিক্রমপুরের পুরাবৃত্ত-উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে বিক্রমপুরের নামতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহারা অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয়ই দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই নাম-তত্ত্ব-দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, সুতরাং বিক্রমপুর ও ঢাকার ইতিহাসের ইহা একটী অসম্বদ্ধ প্রসঙ্গরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরের নামতত্ত্ব বিক্রমপুর ও ঢাকার মূল ইতিহাসের সহিত অসংলগ্ন না থাকিয়া বরঞ্চ সুসংলগ্ন থাকাই উচিত। ঐতিহাসিক সূত্রযুক্ত এরূপ কোন নাম-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, এই ভরসাতেই আমি এই আলোচনাটী সাধারণের গোচরীভূত করিতে সাহস করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় "ঢাকার ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয়েই বিক্রমপুরের নাম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন যে বিক্রমপুরে এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে বিক্রমাদিত্য রাজার নামানুসারেই বিক্রমপুর নাম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এই প্রবাদটী অগ্রাহ্য করিয়া সেনবংশের আদি-পুরুষ "বিক্রম সেন" নামক রাজা হইতে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছে, ইহাই বিক্রমপুর নামের প্রকৃত তথ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বিক্রম সেনকে বিক্রমপুরের স্থাপয়িতা বলিয়া প্রমাণিত করিতে হইলে তাঁহার সহিত বিক্রমপুরের কোন ঐতিহাসিক সংস্রব দর্শন করা একান্তই আবশ্যক। কিন্তু যতীন্দ্রবাবু বা যোগেন্দ্রবাবু এরূপ কোন ঐতিহাসিক সংস্রবের প্রমাণ যে দিতে পারিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। যোগেন্দ্রবাবু বিক্রম সেনকে বঙ্গের সেন-রাজগণেরই পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সেনরাজদিগের বংশ-তালিকায় তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না। যতীন্দ্র-বাবু গৌড়ের রাজারূপে এক বিক্রম সেনের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া লিখিয়াছেন—কিন্তু গৌড় রাজাদিগের মধ্যে তিনি সেই বিক্রমের স্থান বা সময় নির্দ্দেশ করেন নাই বা সেন-রাজগণের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বিক্রম সেন যদি বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতাই হইবেন তবে

তাঁহার অসাধারণ বলবিক্রম বা কীর্ত্তি-কলাপের পরিচায়ক আখ্যা অবশ্যই প্রচলিত থাকিত। তৎপরিবর্ত্তে কেবলমাত্র ঃ—

"তদ্বংশে বিক্রম সেনোজাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতং সুধীঃ॥"

এইরূপ সামান্য একটী উক্তিতে তাঁহার পরিচয় অতি দুর্ব্বল প্রমাণই বলিতে হইবে। বিশেষতঃ যদি তিনি সেনদিগেরই একবংশীয় হইবেন বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষই হইবেন—তবে সেনবংশীয়দিগের অশেষ কীর্ত্তি-কাহিনীর বর্ণনা উপলক্ষে সর্ব্বাগ্রেই তদীয় গুণ-গরিমা সগৌরবে কীর্ত্তিত হইত। কিন্তু একমাত্র স্থল ব্যতীত আর কোথায়ও যে তাঁহার কথিত কীর্ত্তির কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না, অথবা সমসাময়িক কি পরবর্ত্তী কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে কিংবা কিম্বদন্তীতেও উহার অনুবর্ত্তন বা সমর্থন দেখা যায় না—তাহাতে বিক্রম সেনের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মে, তাহা নহে, প্রত্যুত সেনবংশ ও বিক্রমপুরের সহিত তাঁহার যোগ সম্পূর্ণরূপে আরোপিত বলিয়া দৃঢ় প্রতীতিই জন্মে।

বিক্রমাদিত্য রাজার নাম হইতে বিক্রমপুর নাম হইয়াছে—এই জনশ্রুতিকে আমরা সহজে উপেক্ষা করিতে চাই না; কারণ জনশ্রুতি একেবারে উপেক্ষণীয় হইলে "নহ্যমূলা জনশ্রুতি" এরূপ বাক্যের উৎপত্তি কখনও হইত না। কিন্তু জনশ্রুতি অমূলক না হইলেও, তাহা নির্ব্বিকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজার সহিত জনশ্রুতিটী সংযোজিত হওয়াই ইহার গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তির কারণ হইয়াছে। কারণ উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য কখনও যে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন এরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহা হইতে বিক্রমপুরের সহিত "উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের" যোগ ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য বিক্রমাদিত্যের যোগও যে ভ্রমাত্মক তাহা বলা যাইতে পারে না।

পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের ন্যায়ই প্রসিদ্ধ চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। আমরা চালুক্য বিক্রমাদিত্যকেই বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাই। তিনি চালুক্য-রাজ আহুর মল্ল বা ত্রৈলোক্য মল্লের পুত্র ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের লক্ষণ সকল সূচিত হয়। বিশ্বকোষে এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "এই পুত্রের অসাধারণ রূপলাবণ্য ও দেহ-জ্যোতিঃ দেখিয়া নৃপতি তাহার নাম রাখিলেন বিক্রমাদিত্য"। বিশ্বকোষকার তাঁহার আরও কয়েকটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাঁহার আরও অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়, যথা—বিক্রমণক ও বিক্রমণকদেব, বিক্রমলাঞ্ছন, বিক্রমাদিত্য দেব, বিক্রমার্ক, ত্রিভুবনমল্ল, কলিবিক্রম ও পরমাভিরাম।"

সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অতুলনীয় বিক্রমের খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষে তদীয় বিজয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"বিক্রম পিতার আদেশ-ক্রমে দেশজয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চোল রাজগণকে পরাস্ত করেন,

কাঞ্চী লুণ্ঠন করেন, ও মালব-রাজকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন, এমন কি সুদূর গৌড় ও কামরূপ পর্য্যন্ত সেনা-বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা তাঁহার ভয়ে সুদূর বনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি মলয়পর্ব্বতের চন্দনবন ধ্বংস করেন এবং কেরল-নৃপতিকে নিহত করেন। তিনি অসীম বিক্রম-প্রকাশ, গঙ্গাকুন্দ, বেঙ্গী এবং চক্রকোট প্রভৃতি প্রদেশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাপতি, বিহ্লণ বিক্রমাদিত্যের জীবন-চরিত লইয়া সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত "বিক্রমাঙ্কক চরিত" নামক গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বুলার সাহেব এই বিক্রমাঙ্কক চরিতের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে তিনি বিক্রমাদিত্যের গৌড় ও কামরূপ জয় সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"The assertion that Vikrama defeated the kings of Garuda and Kamrup sounds very strange, it is however possible that he made with his country a raid into their territories." p. 31 (preface)

বিক্রমাদিত্যের উল্লিখিত গৌড় কামরূপের বিজয়াভিযান স্মরণীয় করিবার জন্য তৎকর্তৃক বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠার অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। উপরিউক্ত অভিযান ব্যতীত বিক্রমাদিত্য রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে তদীয় সেনাপতি মহাবীর আচ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যায়। বিশ্বকোষে এতৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"এ ছাড়া তিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জ্জর, চের ও চোলপতিকে চালুক্যপতির অধীন করিয়াছিলেন।"

প্রভুর জন্য রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্মৃতিরক্ষার্থে বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি কর্ত্তৃক বঙ্গে 'বিক্রম-পুর' নামক নগর স্থাপনও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যেরূপই হউক চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত্যই বিক্রমপুরের যোগ থাকিতে পারে, প্রাগুক্ত প্রমাণ সকল হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

বৌদ্ধ গ্রন্থে বিক্রমপুরের নাম বিক্রমণীপুর পাওয়া যায় বলিয়া প্রকৃতিবাদ অভিধানে লিখিত হইয়াছে, যথা "সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থে ইহা বিক্রমণী-পুর' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।" বিক্রমা-দিত্যের নামান্তর যে 'বিক্রমণক' ও 'বিক্রমণক-দেব' ছিল, তাহা আমার পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'বিক্রমণী' নাম এই বিক্রমণক নাম হইতেই রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়। এইরূপে চালুক্য বিক্রমাদিত্যের নামে 'বিক্রমপুরের' বৌদ্ধনামের ব্যাখ্যা পাওয়াতে বিক্রমপুরের চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সংশ্রবের বলবত্তর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি। বিশেষতঃ চালুক্য বিক্রমাদিত্য যে স্বনামে অপর একটী পুরী নিজদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিশ্ব-কোষ-কার লিখিয়াছেন, "তাঁহার অন্যান্য অগণ্য কীর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুকমলা-বিলাসীর মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সম্মুখে এক বিশাল সরোবর খনিত হয়। উহার পুরোভাগে তিনি বহুল দেব মন্দির ও সুরম্য হর্ম্ম্যাদিপূর্ণ বিক্রমপুর নামে এক বিশাল নগরী

নির্ম্মাণ করেন।" যিনি স্বদেশে নিজের স্মৃতি-রক্ষার্থ এরূপ ব্যগ্র ছিলেন—তিনি যে বিদেশে আত্মস্মৃতি-রক্ষার্থ আরও অধিক আগ্রহান্বিত হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

এক্ষণে ঐতিহাসিক সময়ের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের কিরূপ সামঞ্জস্য হয়, তাহাই আমরা একটু অলোচনা করিয়া দেখিব। বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়ের সময় সম্বন্ধে যতীন্দ্র বাবু তদীয় ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—"কল্যাণের চালুক্যরাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পিতার আদেশ-ক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন।" ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৭০ পৃঃ।

এই একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা দেখিব, অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণে ইহার কিরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। যতীন্দ্র বাবু ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ৯ম শতাব্দীতেও বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হয় নাই। তখনও তৎপরিবর্ত্তে সমতট নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায় -

"বিশ্বরূপসেনের তাম্র-শাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই স্থান সমতট নামে পরিচিত ছিল।" ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬ পৃঃ।

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন যে, পালবংশের সময়েই বিক্রমপুরের কথা জানা যায়, তৎপূর্ব্বে বিক্রমপুরের কথা জানা যায় না, যথা :—

"অবশ্য বিক্রমপুর নামটী প্রাচীন পালবংশের সময়ে বিক্রমপুর একটী প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়াই গণ্য ছিল। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালিপি বা তাম্র-শাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ নাই।"

এই সকল প্রমাণের দ্বারা নবম শতাব্দীর পরে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পালদিগের রাজত্বকালেই যে বিক্রমপুরের নামকরণ হয় তাহাই বলিতে পারা যায়।

হরিবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয় সেন প্রভৃতি যে সমস্ত বঙ্গ-রাজগণের তাম্র-শাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের কেহই একাদশ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য অভিযানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হন নাই। সুতরাং তাম্র-শাসনের প্রমাণও আমাদের অনুমানের বশংবাদী হইতেছে না।

বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা ও গৌড়বঙ্গে সেন রাজবংশের অধিষ্ঠান দুইটীই ঐতিহাসিক বিশেষ সমস্যা। দিগ্বিজয়ী চালুক্য বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিলে বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠা সমস্যার যেমন সুসমাধান হয়, তেমনই গৌড়বঙ্গে সেন বংশাধিষ্ঠান সমস্যারও সুসমাধান হয়। চালুক্য রাজ্য কর্ণাট দেশের সহিত অভিন্ন বলিয়াই ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেন-বংশের পরিচয়েও তাঁহারা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সেন-বংশীয়দিগের একটী ঘনিষ্ঠ যোগেরই

সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেন-বংশীয়গণ চালুক্য রাজাদিগের সেনা-নায়করূপেই প্রতীয়মান হয়। "সেন' খ্যাতিটী সেনার সহিত যোগের ইতিহাস স্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই যোগ হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, চালুক্য বিক্রমদিত্যের দিগ্বিজয়াভিযানে সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষই সেনাদিগের নেতা হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং গ্রীক্ মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের আশিয়ার দিগ্বিজয়ের পর তদীয় সেনাপতিগণ যেমন বিজয়লব্ধ রাজ্য আপনারা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন –তেমনই বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়ের পর সেনবংশীয়গণই তদীয় বিজয়লব্ধ রাজ্যে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে এতৎ সম্বন্ধে আমাদের একজন প্রধান ঐতিহাসিকের আলোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"গৌড়রাজ-মালার লেখক মহাশয় এই সমুদায় প্রমাণ-পরম্পরা আলোচনা পূর্ব্বক প্রাচীন লিপির "কর্ণাট রাজ্য" কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদান জন্য কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিহ্লন দেব রচিত "বিক্রমাঙ্ক চরিত" গ্রন্থের একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া কল্যাণীয় চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সমর-যাত্রার সহিত সামন্তসেনের বল আগমন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

* * *

"প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্ত সেন শেষ-বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। অথচ এই দুইটী লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্যকালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজ্যের পদানত ছিল, এবং কর্ণাটরাজ কর্ত্তৃক রাঢ়-শাসনার্থ নিয়োজিত, (লক্ষ্মণসেনের মাধাই নগর তাম্র-শাসন কথিত) "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশেই কর্ণাটরাজ্যের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলেই এই বিরোধের ভঞ্জন হয়। বিহ্লন-বিবৃত চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য, গৌড়াধিপের এবং (হয় ত গৌড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত) কামরূপাধিপের পরাজয়-বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দেল-রাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার (রাজত্ব ১০৪০—১১০০ খৃষ্টাব্দে) আশ্রিত "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া সেই রাঢ় দেশ গৌড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাট-রাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়সেনা-নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাহারই বংশধর।" (১)। ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড ৩০০—৩০২ পৃঃ।

গৌড়-রাজমালার উপরি-উক্তির অনুমোদন করিয়া বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"সেন-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে থাকিয়া কালক্রমে (দক্ষিণ

(১) গৌড় রাজমালা—(৪৬—৪৭), পৃঃ

রাঢ়ে কর্ণাট রাজ্যের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর) বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচিত পাল-রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র-মণ্ডলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” —গৌড়রাজমালা। উপক্রমণিকা, ৬০ পৃষ্ঠা।

এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বিক্রমপুর যে চালুক্য বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, বিশেষরূপেই এই মতের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে।

এক্ষণে বিক্রমপুরের সংস্থান কোথায় ছিল তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেনের তাম্রশাসনে "পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি বঙ্গে বিক্রমপুর" ভাগে বা "ভাগপ্রদেশ" বলিয়া যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতেই বিক্রমপুরের প্রথম সংস্থানের রহস্যের আভাস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল। বিক্রমপুর এই উত্তর বঙ্গেই সংস্থিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিশ্বকোষে বিক্রমপুরের উত্তর দিকের বিস্তার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে আমাদের অনুমানের বিশেষ সমর্থনই পাওয়া যায়—

—"পাল ও সেন বংশীয়দিগের অধিকার-কালে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।" শ্যামলবর্ম্মার রাজধানীর স্থান-নির্দ্দেশেও বিক্রমপুর গৌড়ান্তর্গত বলিয়াই জানিতে পারা যায়, যথা "গৌড়ান্তর্গত কান্ত বিক্রমপুরান্তে পুরীং নির্ম্মমে॥" শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার 'পুরাবৃত্তে' উদ্ধৃত রামদেবের "বৈদিক কুল-মঞ্জরী," এক্ষণে উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে বিক্রমপুর স্কন্ধাবার বা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই বিশেষ বিবেচ্য হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ভৌগোলিক সংস্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।*

'বিক্রমপুর' করতোয়া নদীরই তীরে স্থাপিত হয় বলিয়া মনে করি। করতোয়া তীরে পালবংশের প্রথিতনামা রামপাল রামাবতী নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ রামপাল এখানে পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। গঙ্গা ও করতোয়া সঙ্গমে তাঁহার নূতন রাজধানী শ্রীরামাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" †

বিক্রমপুরের পূর্ব্বাধিষ্ঠানেই রামাবতীর নূতন পত্তন হয় বলিয়া আমরা মনে করি। বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে বিক্রমপুর নাম কল্পিত হয়, রামপাল ও তদনুকরণেই আপনার নামানুসারেই নগরীর নামকরণ করিলেন। অনুকরণ যে কেবল রাজধানীর নামকরণেই সন্নিবদ্ধ রহিল তাহা নহে, বিক্রমপুর নগরের নাম সেরূপ একটী পরগণার ও নামকরণ হইয়াছে রামপালও তেমনই রামাবতী নগরীর নামে একটী সমগ্র পরগণাই নাম রামাবতী প্রচারিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত পরেশ বাবু 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে' এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার জিন্নতাবাদের অন্তর্গত রামাবতী

* বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত। † বিজয়া—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ; ভাদ্র ১৩২০

নামক একটী পরগণার উল্লেখ আছে। আমাদের বিশ্বাস রামাবতী নগরীর নামানুসারে উক্ত পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বিক্রমপুরের পূর্ব্বে যে শ্রী শব্দের প্রয়োগ তাম্র শাসনাদিতে পাওয়া যায়, রামাবতীর পূর্ব্বে সেই শ্রীশব্দটী পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়া অনুকরণের পূর্ণতা স্পষ্ট সাক্ষ্যই যেন প্রদান করিতেছে। এই অনুকরণে বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করার গর্ব্বিত উদ্দেশ্য দ্বারাই রামপাল প্রণোদিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত ইহারই ফলে বিক্রমপুরের প্রাচীন বিস্তাতের খর্ব্বতা সাধিত হয়। ইহাতে বিক্রমপুর রাজধানীর নামে বিরূপ পাইলেও বিক্রমপুর পরগণা সগৌরবে এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া রামপালের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করয়াই যেন বিক্রমাদিত্যের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এইরূপেই বিক্রমপুর বিক্রমাদিত্য স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সপক্ষ ও বিপক্ষভাবে সেন ও পাল রাজদিগের অতীত ইতিহাসের সূত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সুশ্বেতা

(বৌদ্ধ-যুগের একটি কাহিনী অবলম্বনে)

পথে যেতে আজ কুড়ায়ে পেয়েছি প্রাণের পরশমণি !
চির-অধন্য হ'য়েছি হঠাৎ সকল ধনীর ধনী !
আহ্লাদ মোর সকল অঙ্গে !—অঙ্গে ধরে না আর !
বন্ধ্যা এনেছি তব তরে স্বামী সন্তান-উপহার !
জঠরে ধরিতে স্থান্ নি যা' বিধি সে ধন পেয়েছি পথে
মন ছোটে আজ আট-ঘোড়া জুড়ে মনের মানস-রথে।
জগতের আগে আজিকে আমার লজ্জার অবসান,
আঁটকুড়া নাম দূর হ'ল, দেহে জেগেছে মায়ের প্রাণ !
স্নানে চলেছিনু শোণ্-গঙ্গার সঙ্গমে আজ প্রাতে
অশথে বাঁধিতে আঁচলের সুতা মাথার চুলের সাথে,
হারীতীর বরে সুতা ধ'রে সুত আঁচল ধরিবে এসে
এ ছিল কামনা ; তখন জানি না এত ত্বরা পূরিবে সে।
ছাড়ি 'সুগঙ্গ-প্রাসাদের ঘাট' 'সঙ্কর্ষণ-ঘাটে'—
স্নান সারি ভরি' লয়ে হেমঝারি অশথ-বটের বাটে,—
চলেছিনু জল-অঞ্জলি ডালি' ছায়াতরু মূলে যত—
ভুট্টার দানা ভিখ্ দিয়া দুটো ভুখারে রোজেরি মত।

মহা-পদ্মের নগর জুড়িয়া ধোঁকে আজ পালে পাল
কোটর-চক্ষু বারো-বছরিয়া আকালের কঙ্কাল।
কঙ্কাল-পাণি পেতে ব'সে কেহ, বলিবার নাহি বল,
অধর-ওষ্ঠ কেঁপে থেমে যায়, ঘোলা চোখ নিশ্চল।
জন্মের মত নেছে কেউ মাটি, চোখের মণিতে মাছি,
দাঁতে কাটে চানা অবিকারে কেউ ব'সে তারি কাছাকাছি!
মন করে যাই মাটিতে লুকায়ে; সেদিকে ফিরাই আঁখি
মহামরণের অট্টহাস্য আঁখি-জলে মাখামাখি।
আকালে বেহাল মানুষের পাল পলে পলে মেশে চুপে
মহাপদ্মের মহানগরের আবর্জ্জনার স্তূপে।
ধিক্কার বুকে ওঠে ঢেরি হ'য়ে, মানুষ-জনমে গ্লানি,
আয়ু না ফুরাতে টুটে প্রাণ-বায়ু অনশনে মরে প্রাণী।

বিক্ষত মনে স্খলিত গমনে চলিতে পথের বাঁকে
সহসা কি শুনি!···শিশুর রোদন!···কি নড়ে ঝোপের ফাঁকে?
কঙ্কাল-সার শবরীর কোলে চাঁদ সে পড়েছে খসি'!
সদ্য শিশুরে দংশিছে! আরে! প্রসূতি না রাক্ষসী!
ছেড়ে দে!···ছেড়ে দে!···লইনু কাড়িয়া;···সহজে কি স্থায় ছেড়ে?
দশটা আঙুল বঁড়শীর মত মাংসে বসেছে গেড়ে!
লইনু কাড়িয়া ঝট্‌কান দিয়া; লট্‌কান রাঙা দাঁতে
জিভটা বুলায়ে বলে রাক্ষসী কর হানি বুকে মাথে,
'মরি,···মরে যাই,···ক্ষিদের জ্বালায়,···বুকে পিঠে খিল ধরে
একে অনাহার তাহে লোহু ক্ষয় দেহ ঝিম্ ঝিম্ করে,
একমুঠা ভাত ভিখ্ পাওয়া ভার দুর্ভিক্ষের দিনে
ধিক্ দিল শুধু ভিখ্ দিল নারে সবারে নিয়েছি চিনে,
কেউ দিলে নাক',···বিধাতা দিয়েছে,···এ মোর মুখের গ্রাস
কোথা হ'তে এলি তুই চণ্ডালী!···কেড়ে নিয়ে কোথা যাস্?"
দাঁড়ানু থমকি' একহাতে রুখি' ক্ষুধা-উন্মাদ নারী
আর হাতে বুকে চাপিয়া শিশুরে ফেলিয়া জলের ঝারি।
আঁচলে যে ছিল ভুট্টা সেগুলো ছড়ায়ে পড়িল ভুঁয়ে;
মেয়েরে ছেড়ে নারী ভুট্টার লোভে মাটিতে পড়িল শুয়ে।
ভুট্টার বেশী কাঁকর কুড়ায়ে চিবায় বিকৃত মুখে
ধক্-ধক্ পেট কুত্তা-ক্ষুধার দংশনে মুহু ধুঁকে।

হাঁকুপাঁকু করে কি যে গালে ভরে রুখু চুল লোটে ধূলে
চোখে জল এসে উবে গেল, তার দশা দেখে আঁখি-কূলে।
"হল না, হল না মিটিল না ক্ষুধা" সহসা ফুকারি কহে
"ফিরে দে মাংসপিণ্ডটা মোরে, খাইব তোরেই নহে।"
কথা শুনে তার আঁখি থির, ফেরে আঁখিতারা শিশু'পরে
পড়িল নজর মাংসপিণ্ড বন্ধ্যার পয়োধরে।
কহিলাম "ওরে!' দিবনাক তোরে খেতে এ দুধের বাছা,
মাংসপিণ্ড চাস্ যদি নে রে এ মোর মাংস কাঁচা;
বৃথা মাংস এ বন্ধ্যার স্তন, আয় ক্ষুধাতুরা আয়
এতে ক্ষুধা যদি মেটে তোর কেটে নেরে তুই খাপ্‌রায়।
বাঁচুক প্রসূতি বাঁচুক কুমার বাঁচুক দু'দুটা প্রাণ,
বন্ধ্যার দানে বন্ধ হউক সন্তান বলিদান।
তা'সনে ঘুচুক বওয়া এ অপয়া পয়োহীন পয়োধর।"
বিস্ফারি' নারী কোটর-চক্ষু চাহে মোর মুখ 'পর!
ক্ষুধায় হন্যা বন্যের মত মুখে তার যুগপৎ
ফোটে বিস্ময়, বিশ্বাস, ভয় উল্লাস সুমহৎ।
"দেখি, দেখি, খুঁজি; না, না, না, পালাবি, আঁচলটা ধ'রে রাখি"
বলি' তরুমূলে খাপ্‌রা সে খোঁজে দুইমুখো দুটো আঁখি!
খোলা খুঁজে ফেরে ক্ষুধাতুরা নারী ঘোলা দুটা চোখ রাঙা,
দৈবে মিলিল শিকড়ের ভিড়ে আঁকৃষীর ফলা ভাঙা।
মুঠা ক'রে ধ'রে টুক্‌রা লোহার নেহাৎ নিকটে এসে
চোখে চোখ রেখে সুধায় "পারিবি?" নিশাসে নিশাস মেশে;
"পরের ছেলের পরাণ বাঁচাতে পারিবি সহিতে দুখ?
কাঁটাটি ফুটিলে কী ক্লেশ জানিস্?...কেটে দিবি নিজ বুক?"
"জানি রে পারিব; করিস্ না দেরী।" "বড় দেখি বুক দড়,
তার চেয়ে মোর পেটের ফসল দেরে খাই ক্ষুধা বড়।
পারবি না তুই আপনার দেহ কেটে দিতে, ঠাকুরাণী,
কেহ পারে নাক; শুধু ক্ষুধা-খেদ বাড়াইবি মোর, জানি।"
কহিনু "শবরী! আর্যের নারী যা' বলে কাজে তা করে;
দে' দেখি লোহাটা, মাংস কাটিয়া দিব আমি নিজকরে।"
লোহা-হাতে যেন কাঠের পুতুল চাহে সে মূঢ়ের মত
আঁকষীর ফলা দিতে মোরে করে ঈষৎ ইতস্তত।

মুঠা থেকে তার নিয়ে হাতিয়ার অধর চাপিয়া দাঁতে
দিনু বসাইয়া নিজের বুকের মাংসে নিজেরি হাতে।
ভোঁতা হাতিয়ারে ছেঁচে গেল গাটা, টপ্ টপ্ লহু ঝরে,
শিরে উপশিরে শিহরে তড়িৎ তীক্ষ্ণ ব্যথার ভরে!
আবার হানিনু,—নিশ্বাস রুধে; নাড়া-ছেঁড়া একি ব্যথা,
চক্ষু ঠিকরে যন্ত্রণা ভরে ঝিম্ ঝিম্ করে মাথা।
টলমল মন, টলমল পণ, সজারুর কাঁটা—চুল,
সংজ্ঞা টুটিলে টুটে প্রতিজ্ঞা,—এই ভয়ে সমাকুল।
সহসা কাঁদিয়া উঠিল ছেলেটা, যন্ত্রণা গেনু ভুলে;
অশরণ সেই মুখ চেয়ে, আঁখি ঝটিতি উর্দ্ধে তুলে,
"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" কহিলাম মনে মনে
নিজেরে সঁপিনু বিশ্ববোধের বুদ্ধের শ্রীচরণে।
তারপর শুধু দৃঢ় করি মুঠা নিজেরে হেনেছি নিজে
জানিনা কখন লোহুর বদলে পীযূষে উঠেছি ভিজে!
পাগলের মত কেবলি হেনেছি, যন্ত্রনা-বোধ হারা,
জানি নাই ছেঁড়া হাজারো নাড়ীতে ঝরিছে দুধের ধারা!
মমতায় লোহু ক্ষীর যে হয়েছে জানিতে পারিনি আমি
বুদ্ধের বরে বন্ধ্যার বুকে পীযূষ এসেছে নামি!
হুঁশ ছিল নাক' দুর্দ্দম বেগে হেনেছি দু'চোখ মুদে,
জানিনে বসনে রক্তের লেখা ধুয়ে গেছে দুধে দুধে!
ভাঙিল চমক শবরীর স্বরে, কহে সে "চমৎকার!"
অঞ্জলি ভরি পিয়ে ক্ষুধাতুরা বন্ধ্যার ক্ষীরধার!
ক্ষত-ক্ষীণ স্তনে পান করে মাতা ক্ষতহীন স্তনে ছেলে
স্বপ্ন এ যেন দেখি জাগ্রতে বিস্মিত আঁখি মেলে!
ক্ষুধা-উপশমে কহিল শবরী "মা! তুই জীবনদাতা
উপোষে যে পশু হ'তে বসেছিল বাঁচাইলি তারে, মাতা!
তুই দেবী, তুই অঘট ঘটাস্; চরণে নোয়াই শির;
ক্ষীরমাতা ক্ষীরভবানী গো তোর লোণালহু মিঠা ক্ষীর!
এ ছেলে তোমার, নিয়ে যাও তুমি, জীবন দিয়েছ এরে,
আমি রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নে চেয়েছি ফেলিতে মেরে।
আমার বুকে মা স্তন্য নাহিক', আমার জঠরে ক্ষুধা,
পেটে যা ধরেছি বাঁচাতে পারি যে নাহি মা বুকে সে সুধা।

তাহার উপর ক্ষুধা বর্ব্বর, মানে না পেটের ছেলে,
জঠরে আগুন জ্বলিলে কি ঘটে জানিনা মা ক্ষুধা পেলে।
নিয়ে যাও ছেলে, দয়াময়ী দেবী, নিয়ে যাও তুমি ওরে,
বাঁচে যদি, বড় হয় যদি, মায়ী ! রেখো কিঙ্কর ক'রে।
নিয়ে যাও মাতা ; মায়ের মমতা কলিজায় জ্বালে বাতি,—
আপন মনের প্রভু নই মোরা অবর শবর জাতি।
ও ছেলে তোমার, কিনেছ ও তুমি নিজের মাংস দিয়ে
লোভ করিব না, চলে যাই আমি বাছার বালাই নিয়ে !"
এত বলি ছুঁয়ে শিশুর ললাট কঙ্কাল-করে খালি
স্খলিত গমনে মিলাইল বনে এলোকেশী কঙ্কালী।
আমি ফিরে এনু, ছেলে নিয়ে, স্বামী, সঁপিতে তোমার কোলে,
আর পায়ে তুমি ঠেলিতে আমারে নারিবে বন্ধ্যা ব'লে।
ভিখ্ দেছে দুর্ভিক্ষ আমারে নিধি দেছে আলো-করা,
বুকের মাংস বিনিময়ে, দ্যাখো, পেয়েছি কী !—বুক-ভরা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাটকোঠায়

"জুতো খুলে উঠে বসুন।"

"না, বেশ আছি। এখুনি যাবো।"

"বসবেন না ? তবে এলেন কেন ?"

"এমনি।"

"পান খাবেন ?"

"পান খাই না।"

"হাসছেন যে ? আমার ঘরে গান্ধী-মহারাজের ছবি দেখে ?"

"গান্ধী-মহারাজকে দেখে কি কেউ হাসতে পারে ?"

"আচ্ছা, গান্ধী-মহারাজ নাকি গঙ্গা শুকিয়ে দিয়েছিলেন ?"

"গঙ্গা ? কোথাকার গঙ্গা ?"

"বড়বাজারের ?"

"তা তো শুনিনি।"

"সবাই তো বলছে। আচ্ছা, ওঁকে নাকি গুলি মেরেছিল, তাতেও নাকি মরেন নি ?"

"গুলি মেরেছিল ? কে ? তাঁকে গুলি মারতে যাবে কেন ?"

"কোথায় থাকেন ? কাছেই নাকি ?"

"কাছেও নয়, দূরেও নয়।"

"তবুও ?"

"শ্যামবাজারে।"

"শ্যামবাজারে ? আমিও তো সেখানেই ছিলুম, সাত বছর। ফড়েপুকুরে থাকতুম, হরি-মিত্তিরের কাছে। তারপর সে চোলে

গেল। তখন থেকে এই অবস্থা, মাটকোঠায় এসে ঢুকেছি।

"এই সেদিন ছাবা হয়েছিল। বল্লুম এসো। বল্লে—নাঃ আর কেন?

"হরি-মিত্তির গিলাণ্ডারের আপিসে কাজ করে। বুড়োর মত হয়ে গেছে। মনে তো সুখ নেই! অমন ছেলেটা অকালে মারা গেল!

"ছোটবেলা থেকেই ছেলেটার কী বুদ্ধি! একদিন আমার ঘরে এসে হাজির। বয়স তখন কতই বা, এগারো বারো হবে, বড় জোর তেরো। বল্লে, তুমি আমার বাবাকে কেন ধোরে রেখেছ? আমি বল্লুম, সে কি? ধোরে রাখতে যাবো কেন? সে বল্লে, বাবা কোথায়? আমি বল্লুম, সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। বল্লে, মিথ্যে কথা বলছো, তোমার ঘর দেখবো। বোলে ঘরে ঢুকে তক্তাপোষের নীচে, বাকসো প্যাঁটরার পাশে, ঘরের এধার ওধার চারিদিক দেখলে, খুঁজে না পেয়ে বল্লে, নাঃ নেই। মা মোরে গিয়ে পর্য্যন্ত বাবাটা ভারি—হয়ে গেছে। কি একটা ইংরিজি কথা বল্লে। অতটুকু ছেলে ইংরিজি কথা শিখেচে! কী বুদ্ধি! বাঁচবেনা কিনা! তারপর বল্লে, তোমার ঘরের সব জিনিস বাবার, এসব নিয়ে যাবো। আমি বল্লুম, তোমার বাবার হবে কেন? সে রেগে বল্লে, হ্যাঁ আমি জানি, এ-সব বাবার। বোলে দেয়ালগিরিটা তুলে নিয়ে চোলে গেল। বাড়ীউলি বল্লে, যাকগে বাপু, আর গোলমাল করিসনি। খানিক পরে কি জানি কি মনে কোরে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

"হরি-মিত্তির সব শুনে ছেলেকে ডেকে বলেছিলো, ছিঃ বাবা, ওখানে কি তোমার যেতে আছে? ছেলেও তেমনি! বলে কিনা, তুমি যাও কেন?

"হরি-মিত্তির যেদিন চোলে গেল মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর বোসে দুহাতে মাথাটা চেপে ধোরে কাঁদতে লাগলো। বল্লুম, ওকি! কাঁদছো কেন? কি হয়েছে? সে বল্লে, পঞ্চু মারা গেছে। আমার বাইস বছরের ছেলে, তিন-তিনটে পাশ দিয়েছিল! আমায় পথে বসিয়ে গেছে! অনেকক্ষণ কাঁদলে। বল্লুম, কেঁদে কি করবে! যাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন! তুমি আমি কি করতে পারি! বল্লুম, একটা পান খাও। বল্লে, নাঃ আর পান খাবনা। যখন আসতুম যেতুম তখন পান খেতুম। এখন আর নয়! বল্লুম, তবে বিড়ি-টিড়ি কাছে থাকে তো খাও।

"একটা বিড়ি ধরিয়ে খেলে, তারপর চোলে গেল। আর আসে নি।

"ওকি? না না ও রাখুন, দিতে হবেনা। আপনি তো বসলেন না।"

"তাও কি হয়, তোমার এতটা সময় নষ্ট করলুম। নাও।"

"আপনার দয়া!"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবাহে পণ-প্রথা

আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহে পণের অত্যাচারের আন্দোলন স্বর্গীয়া স্নেহলতা ও তাঁহার অনুবর্ত্তিনীদিগের আত্মাহুতিতেও জমিতে পারিল না। ইহাতে শাস্ত্র ও হিঁদুয়ানীর কোন সম্পর্ক না থাকিলেও বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধেও প্রাচীন প্রথা চালাইবার চেষ্টাই তাহার প্রধান কারণ। পুরুষদিগের বিবাহের বয়সের কোন সীমা না থাকায় বিদ্যা ও অর্থ-উপার্জ্জনের সমস্যার সহিত তাঁহারা পূর্ব্বের মত অল্পবয়সে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না, অথচ মেয়েদের বিবাহের বেলায় আগের আদর্শই বজায় রহিল, সুতরাং বরদের ঘুষ দেওয়া আবশ্যক হইল। এদিকে ইংরেজী পাশের দর ও মাহাত্ম্যও অযথারূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতিভেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রতিযোগিতা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। যখন একপক্ষে কোন তাগিদ নাই ও অপর পক্ষে গরজ এত অধিক, তখন অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম এখানেও যে কাজ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এইরূপে হিন্দুবিবাহের এত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্বত্বেও আমাদের দেশে ইহা যেরূপ দোকানদারীতে দাঁড়াইয়াছে, এমন ত কোথায়ও আছে বলিয়া শোনা যায় না! ইহার জন্য বাধ্য হইয়া অনেক স্থলে মেয়ের বিবাহের বয়স কিছু বাড়িতেছে বলিয়া অনেকে শুভ চিহ্ন মনে করিতেছেন বটে, এবং তাহা কতকাংশে শুভ চিহ্নও, সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দ হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে-ভাল অন্ধভাবে আসিয়া পড়ে, তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ ভালো ফল কখনও পাওয়া যাইতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। প্রথমতঃ আগে যে সময়ে হইত, এখনও প্রায় সেইরূপ এগারো-বারো বৎসর বয়স হইতেই মেয়ের বিবাহের খোঁজ আরম্ভ হয়। টাকা ও পাত্র যাঁহারা যোগাড় করিতে পারেন, তাঁহাদের ঐ বয়সেই "দায়" উদ্ধার হইতে কোন বাধা থাকে না। কাজেই বিবাহের বয়স যে সম্পূর্ণরূপে বাড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। এদিকে যেস্থলে বাধ্য হইয়া দেরী হইতেছে সেখানেও তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ তাঁহাদেরও একান্ত বালিকার মতই কোন মতামত না লইয়াই বিবাহের ব্যবস্থা হয়। বরং তাঁহাদের সম্বন্ধেই কোনরূপ নির্ব্বাচনের অবসর থাকে না। কারণ "দায়" তখন আকণ্ঠ, কোনরূপে উদ্ধার পাইলেই হইল! সুতরাং যে-সকল বালিকার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইতেছে, বিবাহ কি জিনিষ বুঝিতে শিখিতেছে, বাজারের বাছ-পড়া রদ্দি মালগুলিই তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। তাহার মধ্যে বিপত্নীকের দলই প্রধান।

কিন্তু এই সকল দুর্ভাগা মেয়ের মনের দিকে চাহিবার কথা কখনও কি কাহারও মনে আসিয়া থাকে? তাহারাও জন্ম-অপরাধী, আপনাদের মনের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতেও কখনও বোধ হয় তাহাদের সাহস হয় না। কিন্তু তবু উহারই মধ্যে প্রকৃতি আপনার কাজ একেবারে বন্ধ করেন না। দেওয়াল, বেড়ার ফাঁকের মধ্য

দিয়া হয়ত তাঁহার বাণী তাহাদের কানেও পৌঁছিয়াছে। কালের বাতাসের ঢেউও তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ লাভ করিতেছে। তাহাদের মনে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা সকলই হয়ত অস্পষ্টরূপে জাগিয়াছে। এমন সময় গুরুজনদের সহিত দরে বনিয়া গেল, ও বর স্বয়ং আসিয়াই পরখ করিয়া দয়া হইলে পছন্দ করিয়া তাহাদের পিতৃমাতৃকুলের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া গেলেন। এইখানে একটি কথাও না বলিয়া পারা যায় না, পূর্ব্বে দুইপক্ষই বালক-বালিকামাত্র থাকিত এবং গুরুজনে দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করিতেন। সে প্রথা এখনকার কালের হিসাবে যতই পশ্চাৎপদ হউক, তাহার পরস্পর-সঙ্গতি ছিল। কিন্তু এখন বর বয়স্ক, সুতরাং তিনি গুরুজনদের নির্ব্বাচন মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। এদিকে কন্যার বয়স সে আন্দাজে বাড়ে নাই, এবং যাহা বাড়িয়াছে, তাহাও কিছুমাত্র স্বীকার করা হয় না। সেটা বিবাহ-বাজারে তাহার একটা গুরুতর ত্রুটি মাত্র। সুতরাং এখন বিবাহে বর-কন্যার যে বৈষম্য ইহা আমাদের দেশেও আগে ছিল না। বাস্তবিক আমাদের জেদের বশে কালের প্রভাব অস্বীকার করিয়া সামাজিক সকল ব্যাপারেই যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে যে কত সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এবং তাহার ফল অবশ্য পনেরো আনা পড়িয়াছে মেয়েদেরই উপর। সুতরাং এই সমস্ত-পৃথিবী-ব্যাপী নূতন জাগরণের, মেয়েদের সকল-বিষয়ে মনুষ্যত্ব-লাভের দিনে আমাদের দেশে তাঁহাদের অবস্থা অনেক বিষয়ে অধিকতর শোচনীয়ই হইয়া উঠিতেছে। জেদ ছাড়িয়া সকল বিষয় সত্যের আলোকে নূতন করিয়া দেখিবার চেষ্টা না করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতই জয়লাভ হউক, দুর্গতি ঘুচিবার নহে। অন্যায় যে ক্ষেত্রেই হউক, তাহার ফল সমস্ত সমাজে ও রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িবেই।

এই প্রসঙ্গে বিবাহের অন্যবিষয়ের সংস্কারের আভাষ মাত্র দিয়া অর্থনৈতিক সমস্যার সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

মেয়ের বিবাহ নির্দ্দিষ্ট বয়সে দিবার অবশ্য-বাধ্যতা দূর হইয়া বিবাহটাকে "দায়" হিসাবে দেখার সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, ও ইংরাজী পাশের মাহাত্ম্য কমিয়া আসিলে, বরের দর আপনা হইতেই কমিয়া আসিবে। এদিকে (জাতিভেদ-প্রথা শীঘ্র সম্পূর্ণ দূর না হইলেও) নির্দ্দিষ্টশ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিয়মের বন্ধন কিছু শিথিল হইলেও নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র অনেকটা প্রশস্ত হইয়া পড়িবে। এ কথা মনে রাখা উচিত, আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার কোন বৈষম্য নাই। মেয়ের সংখ্যাই বরং কিছু কম, সুতরাং মেয়ের বিবাহের স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা আমাদের দেশে নাই। তাহার পর আমাদের এই দরিদ্র দেশে বিবাহাদিতে যেরূপ অযথা ব্যয়বাহুল্য হয়, এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে কোনমতেই তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। এই সাবধানতার জন্য সামাজিক প্রথাগুলির সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেও অর্থ-লালসা অনেক কমিয়া যাইতে পারে। কারণ অনেক সময়েই দেখা যায়, পাত্রীপক্ষের রক্ত-শোষণ করিয়া যে টাকাগুলি আদায় করা হয়, তাহার অধিকাংশই বরপক্ষ অপরপক্ষের বিবাহে

ধূমধাম করিয়া খরচ করিয়া ফেলেন। এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক মনে হয়। জোর করিয়া আদায় করা ঘৃণার্হ হইলেও কন্যার পিতার কন্যাকে অবস্থানুযায়ী অর্থালঙ্কারাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রচলিত আইন অনুসারে কন্যা যখন সম্পত্তির অংশ পান না, তখন তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ আজকালকার এই বস্তুতন্ত্রতার দিনে কন্যার রিক্তহস্তে জীবন আরম্ভ করাও গৌরবজনক নহে। সকল বিষয়ে অযথা অপব্যয় নিবারণ করিয়া, অলঙ্কার যেমন কন্যার আপন সম্পত্তি, সেইরূপ অবস্থানুযায়ী কিছু অর্থও কন্যার নিজ-নামে দেওয়া কর্ত্তব্য। বরপক্ষের অবশ্য তাহাতে কোনই অধিকার থাকা উচিত নহে। বাস্তবিক আমাদের দেশে মেয়েদের যখন উপার্জ্জন করার কোন পথই খোলা নাই, তখন ছেলেদের—যাহাদের নিজহস্তে উপার্জ্জন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই সর্ব্বথা হিতকর ও কর্ত্তব্য তাহাদের—জন্য অতিরিক্ত টাকা জমাইবার নেশা কখনই উচিত নহে। মানুষের জীবন অনিশ্চিত, সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না তাহারা উপযুক্ত হয়, ততদিন যাহাতে তাহারা অভাবগ্রস্ত না হয়, তাহার জন্য, আপনার বৃদ্ধ বয়সের জন্য ও পত্নীর জন্যই সঞ্চয় আবশ্যক। উপযুক্ত পুত্রদের জন্য মৃত্যুর পর কতকগুলি টাকা রাখিবার চেষ্টা ন্যায় এবং কালধর্ম্ম সকলেরই বিপরীত। তাহাতে তাহাদের উপকার না হইয়া অনেক স্থলে অপকারই হইতে দেখা যায়। এ বিষয়ের নেশা ও মোহ কাটিলেই মেয়েকে দেওয়া সহজ হইয়া পড়িবে। এদিকে স্বভাবতঃই তাহাতে বিবাহ-বাজারে মেয়ের দাম বাড়িয়া যাইবে। বাস্তবিক আমাদের সকল কাজই যে কিরূপ মোহাচ্ছন্ন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা মেয়ের জন্য এতগুলি টাকাও খরচ করি, অথচ তাহার স্থায়ী সম্মান-লাভের কোন ব্যবস্থা করি না!

বঙ্গনারী।

অভিনেত্রী

সে ছিল অভিনেত্রী। কলুষিতা মায়ের কলঙ্কের নিশান! কলঙ্কের পশরা মাথায় ধরে সে জন্মেছিল। কলঙ্কিত নারীত্বের কলঙ্ক সে;—তবুও পাঁকে-ফোটা পদ্মের মতই সে ছিল পবিত্র, নির্ম্মল। বহির্জগৎ তাকে জান্‌ত অপবিত্রা ব'লে। দিন-রাত যেখানে রূপের ব্যবসা চলে, ভগবানের নারীত্বের যেখানে বীভৎস অপব্যবহার হয়—তার মাঝে কি কখনো পবিত্র জিনিস থাকতে পারে? কিন্তু তবুও সে ছিল নির্ম্মল—তবুও সে ছিল নিষ্পাপ। জ্ঞানের উন্মেষ থেকেই সে দেখে এসেছে রূপের ব্যবসা। রজনীতে যেখানে পৈশাচিক আনন্দের হর্‌রা, দিবসের আলোক-সম্পাতে সেখানে নরকের বীভৎস

প্রতিকৃতি। সারা-রজনীর উদ্দাম উল্লাসের পর প্রভাতের নেশা-জড়ানো ম্লান অবসাদ! সে দেখে এসেছে অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা প্রেমের কলুষিত পৈশাচিক অভিনয়—যেখানে হৃদয় নেই, প্রাণ নেই, রূপ নেই; শুধু মিথ্যা, শুধু প্রতারণা, শুধু অভিনয়! এই-সব দেখে এই-সবের ভিতরে বর্দ্ধিত হ'য়ে সে একটা নূতনত্বের মত চারিদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হ'য়ে বর্দ্ধিত হয়েছিল। বুঝি সে শুন্‌তে পেয়েছিল পবিত্রতার সুখ; বুঝতে পেরেছিল সে প্রতারণার বীভৎসতা। তাই বীভৎসতার মধ্যে বর্দ্ধিত হ'য়েও বীভৎসতা তার কাছে বীভৎসই ছিল।

তাই সে হয়েছিল অভিনেত্রী। যেখানে সত্য নেই, হৃদয়-ভরা সত্য ভালবাসার অবকাশও নেই, সেখানে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে যদি সে নিজের হৃদয়ের অতৃপ্তিটাকে ঢাক্‌তে পারে! কলঙ্কিতার গর্ভজাত সে—জগতের নিয়মে ভালো কিছু পাবার যে তার অধিকার নেই। সেই অতৃপ্তির মাঝে, সেই আকুল বেদনার মধ্যে একটু তৃপ্তিও যদি সে পায়! তাই সত্যের মিথ্যা অভিনয়ের মধ্যে সে আপনাকে পূর্ণপ্রাণে ঢেলে দিয়েছিল। অভিনয়কেই সে তার জীবনের সার করেছিল। যখন সে অভিনয় কর্ত্তে নাম্‌ত, দর্শকবৃন্দ তখন আর অভিনেত্রী মলিনাকে দেখ্‌তে পেত না, তারা দেখ্‌তো—অভিনীত অংশের জীবন্ত নায়িকাকে,—কবির মূর্ত্তিমতো কল্পনাকে। সেখানে তার নিজের স্বরূপতা প্রকাশ পেয়ে ভেসে উঠ্‌ত। প্রাণের ভিতর থেকে তার গভীর ভাব ফুটে উঠ্‌ত—তাই বুঝি তাকে অমন ক'রে ভূমিকার সঙ্গে মিশ্‌ খাইয়ে দিত। ধীরে ধীরে অঙ্কের পরে অঙ্ক কেটে যেত—ক্রমে অভিনয়-শেষে যবনিকা পড়ত, দর্শকেরা যে যার বাড়ী চ'লে যেত, তখন শূন্য রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ত। সেই রঙ্গমঞ্চে যে সে নিজেকে আবার সংসারের সত্য নায়িকা রূপে ফুটিয়ে তোলে! সেই রঙ্গমঞ্চ তাকে যে তৃপ্তিটুকু দিয়েছিল—তা যে সে আর কোথাও পায়নি!

এম্‌নি ভাবেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল—কেটেও তাই যেত হয়ত। অন্ধকারময় জীবনের পথে অন্ধের মত ভয়ে ভয়ে পা ফেলে ফেলে সে যাচ্ছিল—আলো দেখ্‌বার আশা সেখানে করেনি! মানব-চিত্তের প্রেমের ক্ষুধা তার পক্ষে সত্যের সত্যতায় পূর্ণ হ'বার ত কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই কল্পনার মধ্য দিয়েই সে দুর্লভকে পাবার চেষ্টা করেছিল। কল্পনাই তার ক্ষুধিত প্রাণের তৃপ্তি হ'য়েছিল। দিন হয়ত এম্‌নি ভাবেই কেটে যেত—এই আধ-তৃপ্তি নিয়েই। কিন্তু তা' হলো না। সে হঠাৎ আলোর আভাস দেখ্‌তে পেলে—প্রেমের জগতের উজ্জ্বল আলোর একটা রশ্মি তার অন্ধকার ঘরের ছিদ্র পথে প্রবেশ করলে। সে ত তা চায়নি—চাইবার সাহসও যে তার ছিলনা! তবু এ সে পেয়েছিল।

দর্শকের আসনে বসে একজন তাকে দেখেছিল—ব্যর্থতার প্রতিমূর্ত্তি, অশ্রুর মূর্ত্তিমতী ছবি। অভিনয়ে তার হৃদয়-ভরা আবেগ তাকে সত্য-সত্যই অশ্রুময়ী নায়িকার জীবন্ত ছবিতে, সত্যকার মূর্ত্তিতে পরিণত ক'রে তুলেছিল। সমস্ত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে

এক স্বপ্নরাজ্যের ব্যর্থ প্রেমিকা যে স্বপ্নময় ভাবে রঙ্গমঞ্চে আসছিল, যাচ্ছিল—প্রাণের তন্ত্রীর ঝঙ্কার কেঁদে কেঁদে যার ব্যর্থ প্রেমের বদ্ধ দুয়ার থেকে ফিরে যাচ্ছিল, সমস্ত দর্শকের প্রাণে সে ঝঙ্কার গিয়ে সত্যের মতই বেজেছিল। সব-চেয়ে বেজেছিল একজনের নির্ম্মল প্রাণের নিভৃত বন্দরে, যেখানে কোনও রেখাপতি তখনও হয়নি। প্রথম প্রভাতের আলোক-রেখার মত; মূক স্তব্ধতার মাঝে সে প্রথম সুর-ঝঙ্কার একটা করুণ রাগিণীর মত তার তরুণ হৃদয়কে আলোড়িত ক'রে ফেলেছিল। একটা তীব্র অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভিতরে সাড়া দিয়ে উঠেছিল। সে ভেবেছিল, তার ক্ষুদ্র জীবনের অতি-ক্ষুদ্র শক্তিকণা দিয়ে সে কি একটা জীবনকেও পরিণত ক'রে তুল্‌তে পারে না? তার একফোঁটা অশ্রু কি অত-বড় শুষ্ক মরুভূমিকে তৃপ্ত কর্‌তে পার্ব্বে? কিন্তু একফোঁটা হ'লেও সে ছিল তার হৃদয়-গলা অশ্রু। সে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল।

মলিনার জীবনে সে কি মহা জাগরণের মুহূর্ত্ত! হতাশার মধ্যে তার সে কি আনন্দময় আশা-ভরা অনুভূতি! সে ত কিছু নয়! শুধু 'কিছু নয়' না—তার চেয়েও সে নীচে যে! কত যুগ-যুগান্তরের পবিত্রতার পিপাসা যে সেই মলিনা বালিকার অতৃপ্ত হৃদয়ে জেগে উঠেছিল, কে জানে? সেই তৃষ্ণার তৃপ্তি! মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকও বোধ হয় জল দেখে অমন তৃপ্ত হয় না—যতখানি তৃপ্তি সে পেয়েছিল। তার ব্যর্থ নারীত্বের সম্মান সেখানে যে ধ্বনিত হচ্ছিল! তার জীবন যে ছিল অনন্ত ব্যথা—তার মাঝে কে এলো গো, হাতে নিয়ে পূর্ণ পরিত্রাণ! অনন্ত আশ্বাসে নয়ন তার অশ্রুতে ভরে এল, বুকে যে তৃপ্তির, সুখের অনন্ত তুফান উঠ্‌ছিল তাকে দমন করা ত সহজ কথা নয়।

পবিত্র সুন্দর বিবাহিত জীবনের আশা তার সম্মুখে। সে কি তৃপ্তি! সে কি শান্তি! কি আনন্দ! সারাজীবন যে সে এরই আরাধনা ক'রে এসেছে! হে চিরবরেণ্য প্রভু, তার হৃদয়ের ব্যথায় তুমি আশ্বাস-রূপে এসেছ; হাতে দিয়ে পাঠিয়েছ তার সারা-জীবনের কামনার পূর্ণ তৃপ্তি, অনন্ত আকাঙ্ক্ষার শান্ত সুন্দর সমাপ্তি! কিন্তু এত বড়, এত উঁচু হৃদয় নিয়ে যে এসেছে—তার মাথায় কি সে তার এত-বড় ব্যর্থ জীবনের আকুল ব্যর্থতা তুলে দিতে পারে? তার অনন্ত অতৃপ্ত জীবনকে যে ফুলে-ফলে ভরে দিতে এসেছে, তার সারা ভবিষ্যৎকে কি সে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারে? যে কলঙ্কের ভার বহন ক'রে সে জন্মেছে, সে নিজে পবিত্র হ'লেও মানব-সমাজ যে তার পবিত্রতার অধিকার-দাতাকে হীন চোখে দেখবে! জীবনের প্রথম উষার অরুণ—তার ব্যর্থতা সে দেখ্‌তে পার্ব্বে না!

তীব্র পিপাসা তার! শীতল নির্ম্মল জলধারা তাকেই তৃপ্ত কর্ত্তে তারই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। দূর থেকে সে একবার শুব্ধ বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখ্‌লে। নব মিলনের আশা রাগিণীর শেষ রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি! নব-প্রভাতের অরুণ-রশ্মি তখনও তার হৃদয়-ভিত্তির উপর স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ কচ্ছিল। তার নিজের গড়া দেওয়ালে তখনও সে বাধা পায়নি, অনন্ত আশাময়

চোখ নিয়ে সে চেয়ে দেখ্‌লে—ফুটে উঠেছিল সেখানে অনন্ত তৃপ্তির অতৃপ্ত আভাষ। সে দৃষ্টি স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত, ত্যাগের মহিমায় তা' উজ্জ্বল।

নিজের গাঁথা ফুলের মালা নিজে সে ছিঁড়ে ফেল্‌লে! নিজের পোষা আশার বিহঙ্গটিকে নিজেই সে উড়িয়ে দিলে শীতের বরফ-গলা বাতাসে। নিজের হাতে সে পর্দ্দা নামিয়ে দিলে তার জীবন-সূর্য্যের আলো বন্ধ ক'রে। তার নারীত্বের পূর্ণ মহত্ত্ব ফুটে উঠ্‌ল সেইখানে। সেইখানে হ'ল তার ব্যর্থ নারী-জীবনের অপূর্ব্ব-সুন্দর পরিণতি!

* * *

স্তব্ধ নিশীথে মেঘে-ঢাকা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সাগর-বাহিনী নিজের ব্যথা গাইতে গাইতে ছুটে চলেছিল, দু'পাশে দাঁড়িয়ে তার গাছের সারি, দুর্ব্বোধ ভাষায় তারা কি-সব যেন কথা কচ্ছিল। চারিধারে বিরাজ কচ্ছিল এক মূক নীরবতা। এর মাঝে এক জায়গায় জলে একটু শব্দ হলো; একবার কতকগুলো বিপরীত ঢেউ নদীর স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তারপরে ধীরে ধীরে আপনাদের হারিয়ে ফেল্‌লে। তারপর আবার সব স্থির হয়ে গেল। আর এরই মাঝে একটা প্রদীপ অনন্ত মহিমা বক্ষে নিয়ে নিভে গেল। শুধু আকাশের কোলে তারাগুলোর চোখে এক ফোঁটা সহানুভূতির অশ্রু চিকমিক ক'রে উঠ্‌ল।

"অশোক"

বাঙ্গালী হিন্দু-নারীর মর্য্যাদা

পরাধীন ভারতবাসী যখন কংগ্রেস ইত্যাদি করিয়া রাশীকৃত আবেদন ও অশ্রুজল সাত-সমুদ্র তেরো নদীর অপর পারে পাঠাইয়া দিল, তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি না হইলেও এদিক-সেদিক হইতে সমালোচনা-বৃষ্টি যে হইয়াছিল তাহা আমরা জানি, আর তাহার ফলে যে ভারবর্ষের নাম দুই-একবার পার্লামেণ্ট মহাসভায় উঠানো হইয়াছিল এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে যে করুণ-পন্থীদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও আমরা জানি। কিন্তু সে আবেদন ও অশ্রুজলের কোনও প্রকৃত ফল ফলিয়াছিল কি? যাঁহারা বলিবেন ফলিয়াছিল, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান ভারত ইতিহাসখানি আর একবার চশ্‌মা খুলিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

ঠিক ঐ-রকমের আবেদন ও অশ্রুজল লইয়া কয়েকজন লেখিকা মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তবে পার্থক্য এই, সকল পাঠক-পাঠিকাই ঘরের লোক, আপনার জন। যাঁহারা সাত সমুদ্র তেরো নদীর অপর পারে বাস করেন তাঁহাদের মত ইঁহারা দেশের অবস্থা ও সমাজে অজ্ঞ ও সহানুভূতি-শূন্য নন। তবু এই প্রকার আবেদনে ও অশ্রুজলে যে কোনও সুফল ফলিবে তাহা আমাদের একবারেই মনে

হয় না। আবেদন ও অশ্রুজলের ফলে ভিক্ষা মিলিতে পারে, কিন্তু সে ভিক্ষাতে যে জগতের নর-নারী-আকাঙ্ক্ষিত মনুষ্যত্বই দলিত ও অপমানিত হইবে!

সকলেই জানে, বাঙ্গালী পুরুষ তাহার পুরুষত্ব দেখায় অন্তঃপুরে আসিয়া। বহির্জগতে তাহার প্লীহা সহজেই ফাটিবার অবকাশ পায়, সেখানে তাহার মান-সম্ভ্রম অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে রক্ষিত হয় না। রাস্তা-ঘাটে, খেলার মাঠে, রেল-ষ্টেশনে আর হাসপাতালে, আদালত ফৌজদারীতে—এমন-কি স্কুল-কলেজে পর্য্যন্ত কোন আসামী আপনার মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। কথায় বার্ত্তায়, চাল-চলনে তাহার অপুরুষোচিত সঙ্কোচ, দুর্ব্বলতা ও সহায়-হীনতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে কারণেই হউক পুরুষের স্বভাব তেমন ভাবে বিকশিত হইতে পারে নাই। সেইজন্যই পুরুষ তেমন ভাবে নারীকে বহির্জগতে ডাকিয়া আনিতেও পারে নাই। নিজের অপমান পকেটে পুরিয়া রাখিতে পুরুষ অনেকটা শিখিয়াছে, কিন্তু নারীর অপমান এতই কষ্টপ্রদ ও অসহনীয় যে, সে অপমানের প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ ঠিক থাকিতে পারে না। কিন্তু পুরুষের বাহুতে শক্তি নাই, হৃদয়েও বল নাই, তাই নারীকে সে সঙ্গিনী করিতে পারে নাই; অন্তঃপুরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া সে নারীর সম্বন্ধে এক নূতন প্রকার নীতি-তন্ত্র গড়িয়া ফেলিয়াছে।

মুসলমান ভারতের কথা না বলাই ভাল। তখন আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মানের জন্য, শাস্ত্রের নিষেধের জন্য নয়, হিন্দুনারী অন্তঃপুরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিন্দু ভারতের সময় পুরুষকে যুদ্ধ করিতে হইত, আর সেই পুরুষের জননী হইতে হইত নারীকে। নারী না হইলে নূতন যোদ্ধা আর জন্মিবে না, দলের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, সুতরাং নারীর আদর হইয়াছিল তখন অত্যন্ত অধিক, আর তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল অন্তঃপুরে বা গ্রামের মধ্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেক পশ্চাতে। আর বিবাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল অন্য গোত্রে বা ভিন্ন গ্রামে, আর অদল-বদলে অর্থাৎ নারী-প্রদানে ও নারী-গ্রহণে। তখন যুদ্ধে জয় লাভ করিলে জেতার দৃষ্টি পড়িত সর্ব্ব-প্রথমে নারীর উপর। সুতরাং প্রাচীন হিন্দু নারীকে দেখিত জননীত্বের দিক হইতে। সেই জন্য সমাজ বন্ধ্যা নারীকে অশুভ ও অকল্যাণের হেতু বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আর পুত্র না হইলে নারীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল পুন্নামক নরকে। আর সেইসঙ্গে গঠিত হইয়া পড়িয়াছিল সুপ্রজনন বিদ্যার রীতি-নীতি, যাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায় পঞ্জিকায় ও শাস্ত্র ইত্যাদিতে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নারীকে অপমানিত করিবার জন্য ঐ সকল বিধি-ব্যবস্থা গঠিত হইয়া উঠে নাই। দলকে ও জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই ঐ সকলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আরও অনেক পূর্ব্বে সমাজের সকল শক্তিই ছিল নারীর হাতে। তখন পুরুষকে খাওয়াইতেন-পরাইতেন নারী। ঘরের কাজ ছিল পুরুষের হাতে, আর নারীর স্থান ছিল তখন বহির্জগতে। নারী যখন দেখিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাজ-কর্ম্ম পুরুষের দ্বারাই ভাল

চলে, সন্তান প্রসব করিয়া পুরুষকে দুর্ব্বলও হইতে হয় না বা অসহায় হইয়া কত দিন বসিয়াও থাকিতে হয় না, তখন পুরুষকে নারী ক্রমে ক্রমে বাহিরে টানিয়া আর তাহাদিগকে যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত করিয়া আপনারা গৃহস্থালী সুরু করিয়া দিলেন। ক্রমে ঘর হইল বাহির আর বাহির হইল ঘর।

বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন কালের মত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর নাই। এখন যে যুদ্ধ হয় তাহা বাণিজ্য লইয়া, জমি লইয়া, আর স্বাধীনতা বা সম্মানের জন্য। এ যুদ্ধে লোক-বল অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয় বুদ্ধি-বল, শাস্ত্র-বল ও অর্থ-বল। সেইজন্য লোকে নারীকে এখন জননীর দিক দিয়া না দেখিয়া দেখে স্ত্রীর দিক দিয়া, সুখের দিক দিয়া, প্রেমের দিক দিয়া। সেইজন্য প্রাচীন আদর্শে চলিয়া এখন নর-নারী সুখ পায় না। কাব্য না হইলে এখন আর চলে না। কিন্তু অন্তঃপুরে নারীকে আবদ্ধ রাখিলে এই কাব্যের ক্ষুধা মেটে না। আর জননী হিসাবেও নারীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিলে সুফল পাওয়া যায় না। সে কথা সকলে আজ কিছু-না-কিছু বুঝিয়া ফেলিয়াছে। পুরুষের দিক হইতেই সে বিষয়ে নানা প্রকারের উদ্যোগ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নারীই সেদিকে তেমন ভাবে সহানুভূতি দেখান নাই। "লেখাপড়া শিখিয়া আমরা কি অফিস যাইব না ডন-কুস্তি করিয়া পালোয়ান হইয়া লড়িব?" এ সব কথা নারীর দিক হইতে অনেকস্থলে অনেক প্রকারে বলা হইয়াছে। এখন নারীর আত্ম-বোধ জাগিয়া উঠিতেছে। অফিস্ যাওয়া আর কুস্তি লড়া তাঁহাদের চোখে সম্মানেরই হইয়া উঠিতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে এই আত্মবোধ আরও পরিস্ফুট হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। নারী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের গল্প ও উক্তি লইয়া আর পুরুষের কলঙ্ক রটাইয়া কিম্বা আবেদনে অশ্রুজলে মাসিক-পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলে নারীরও উপকার হইবে না, পুরুষেরও নয়। মাসিক পত্রের শতকরা নিরানব্বই জন পাঠক নিশ্চয়ই নারীর উন্নতির পক্ষপাতী। যেখানে আধুনিক উচ্চ-শিক্ষার আলোক এখনও পৌঁছে নাই সেখানে নর-নারীর তারতম্য খুব অল্পই আছে। সেখানে আছে শাস্ত্রের ব্যভিচার আর শস্ত্র ও শক্তি লইয়া গুণ্ডামি। তাহাদের সমাজ এ সমাজের বাহিরে। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়াই আলোচনা ও নারীর পথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ স্থলে নারীর প্রতি সমাজ ও দেশ অন্যায় সাধন করিয়া যাইতেছে, আর কি কি উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, সমাজের পক্ষ হইতে পুরুষের শিক্ষার জন্য যতটুকু যত্ন লওয়া হয়, ততটুকু যত্ন নারীর জন্য লওয়া হয় না। পুরুষের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবক-গণ যতখানি যত্নশীল, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা ততখানি যত্নপরায়ণ নহেন ও বর্ত্তমান অবস্থায় হইতেও পারেন না। কিন্তু মানুষ-হিসাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষার প্রয়োজন। তবে শিক্ষা দিতে গিয়া মনে রাখিতে হইবে, মনের

বিকাশ কি করিয়া হয়, অবশ্য—জ্ঞাতব্য জ্ঞানের সহিত মানুষ কি করিয়া পরিচিত হইতে পারে আর কেমন করিয়া জীবন-সংগ্রামে সে অন্যের গলগ্রহ না হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। সুতরাং আর্টের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষারও ব্যবস্থা স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

তারপর চোখে পড়ে নারীর শারীরিক ও মানসিক বলের অবস্থাটা! শারীরিক বল না হইলে যে মানসিক বল হইতে পারে না, তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। এই উভয়বিধ বলের অভাবে স্ত্রীলোক যে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেছেন তাহা আমরা সাময়িক পত্রে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা নারীর পক্ষে আজ বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুরুষের সঙ্গে হাতাহাতি সুরু হইলে নারী যাহাতে টিঁকিয়া থাকিতে পারেন সেজন্য নারীর পক্ষে সুনিয়মিত ব্যায়াম অত্যন্ত আবশ্যক। এবং সেইসঙ্গে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত নারীকে পরিচিত করানোও নিতান্ত দরকার; নতুবা শরীর কিছুতেই সুস্থ থাকিতে পায় না।

তারপর দেখিতে পাই, বর্ত্তমান বিবাহ-বিধিতে নারীর প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। অপরিপক্ক মস্তিষ্ক অপরিণত শরীর লইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মত অন্যায় ও পাপ বোধ হয় দুনিয়ায় আর নাই। কিন্তু অন্ধ সমাজ নারীর বিবাহ দেয় এমন অবস্থায়, যখন তাহাকে বালিকা বলিলেই চলে। এই নিন্দনীয় বিবাহ-প্রথা রদ না করিলে নারীর নিস্তার নাই, পুরুষেরও নাই। নারীর ব্যক্তিত্বে সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগে, যখন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাহার বিনা-মতে তাহাকে জুড়িয়া দেওয়া হয়। তের-চৌদ্দ কিম্বা পনের-ষোল বৎসরের নারীর মতামত তেমন সুস্থির ও সুস্পষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়, সুতরাং বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন। অভিভাবকগণের পক্ষে পাত্র স্থির করিয়া তাহার মধ্য হইতে নারীকে বাছিয়া লইতে বলিলেই অভিভাবকগণের মর্য্যাদাও রহিয়া যায়, আর নারীর ব্যক্তিত্বেও আঘাত লাগে না।

আধুনিক সমাজে যৌথ পরিবারের অভাব-অভিযোগের মধ্যে পড়িয়া বিবাহিত নারীকে সময় সময় বড়ই নির্য্যাতিত হইতে হয়। আর প্রতিপালনে অক্ষম স্বামীর স্কন্ধে পড়িলে নারীর অসুবিধা ও দুঃখের সীমা থাকে না, সুতরাং প্রতিপালনে সক্ষম পুরুষকেই বিবাহ করিতে দেওয়া সঙ্গত। অক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহ দিয়া অভিভাবকগণ যে পাপ সঞ্চয় করেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিবাহের পূর্ব্বে নারীকে জানানো উচিত, যে ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হইবে তাহার ঘর-বাড়ীর উপার্জ্জন ইত্যাদির অবস্থা কেমন। যদি জানিয়া-শুনিয়াও কোন নারী নিজের মতে অক্ষম পুরুষকে বরণ করেন, তবে সেজন্য অভিভাবকগণকে কেহ দায়ী করিতে পারিবেন না। নারীর পক্ষে আরও জানা আবশ্যক, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে সে তাহাকে লইয়া পৃথক ভাবে থাকিতে পারিবে কিনা। একজনের মন যোগাইয়া চলাই অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য কাজ; তার উপর যদি নারীকে যৌথ

পরিবারের বাচ্ছা-কাচ্ছাটি হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়াবুড়ীর মন পর্য্যন্ত যোগাইতে হয়, তাহা হইলে নারীর অবস্থা যে কেমন শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহা যাঁহারা যৌথ পরিবারে বাস করেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন। আর এত লোকের মন যোগাইয়া চলাও একপ্রকার অসম্ভব, তাই যৌথ পরিবারে ঝগড়া মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকে। এত লোকের মন যোগাইয়া চলিতে গেলে নারীর মধ্যে পদার্থ টুকু যাহা থাকে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়, আর সেখানে জাগিয়া উঠে এক অস্বাভাবিক দাস-মনোভাব অর্থাৎ slave-mentality।

আমরা যে দায়ভাগ মানিয়া চলি তাহাতে নারীর প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইয়াছে দেখিতে পাই। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রেরই অধিকার থাকিবে, আর কন্যার—সে যখন বন্যার জলে ভাসিয়া আসা জীব, তখন তাহার অধিকারই বা থাকিবে কেন—আর স্ত্রী সে যখন স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী তখন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মরাই উচিত ছিল, তাই তিনি যখন মরিলেন না তখন তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী করিয়া রাখিলেই ত যথেষ্ট হইল! এইরকম একচোখো বিচার দায়ভাগে অনেক আছে। এই সকলের প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

স্বামী যে দেবতা—সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাহা যে দিনের শাস্ত্র ছিল এখন আর সেদিন নাই। স্বামীর পাদ-পূজা, পাদোদক পান ইত্যাদি অনেক বস্তুই এখন নরনারী সকলেই ঘৃণাকর মনে করেন। স্বামী বদমায়েস হইলে কিম্বা কুরোগগ্রস্ত হইলেও যে নাক-চোখ বুজিয়া তাহার সঙ্গে টিকিয়া থাকিতে হইবে, তাহা এখন কেহ আর বিশ্বাস করে না এবং অকর্ত্তব্য মনে করেন। বদমায়েস, অত্যাচারী স্বামীর সহিত থাকাও অসহনীয়। কিন্তু আধুনিক নারী এরূপ স্বামীকে বরখাস্তও করিতে পারেন না কারণ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার তাঁহার শক্তি নাই। তাই আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া নারী এমন অবস্থায় অধিকাংশ সময়ে নাকচোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকেন, আর যখন নিতান্তই অসহ্য হয় তখন কেরোসিন ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বসেন।

এই সকল অবমাননা হইতে নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে নারীকে তাহার স্বামীর উপার্জ্জনের কতকটা অংশের উপর আইনতঃ অধিকার দিতে হইবে। আর স্বামী ভ্রষ্ট-চরিত্র হইলে কিম্বা অত্যাচারী হইলে স্ত্রী যেন স্বামীর উপার্জ্জনের প্রাপ্য অংশ লইয়া স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করা উচিত। তেমনই আবার স্ত্রীরও ঐ সকল কুগুণ থাকিলে স্বামী ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন—এরূপ ব্যবস্থাও আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ডিভোর্স প্রথা ঠিক প্রবর্ত্তন না করিলেও, যাহাকে legal separation বলে তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে যে কেমন করিয়া নারী মর্য্যাদা লইয়া বাস করিতে পারিবেন তাহা বোঝা অসম্ভব। সুতরাং এক কথায় দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্র ছাড়িতে হইবে। যেখানে শাস্ত্র মানিলে মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্ক পড়ে সেখানে শাস্ত্রকে গঙ্গায় ধুইয়া পরিষ্কার করিলে হিন্দুত্ব লোপ পাইবে না, বরং উজ্জ্বল ও পরিস্ফুটই হইবে।

এখন দেখা যাক, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে নারী এই অধিকার পাইতে পারেন। আইন-কর্ত্তা হইয়াছে এখন দেশের লোক, দেশের প্রতিনিধি। সুতরাং আন্দোলন করিতে হইবে দেশ জুড়িয়া। আর দেশের প্রতিনিধিগণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, নারীর পক্ষে কোন কোন অধিকার না হইলে তিনি আর মর্য্যাদার সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। প্রতিনিধি দ্বারা এখন আইন গঠন করাইয়া লইতে হইবে এবং প্রতিনিধি-সভায় যাহাতে সে আইন পাশ হয় সে বিষয়ে ও যথেষ্ট যত্ন করিতে হইবে।

সুতরাং নারীর চতুর্দ্দিকে আজ যথেষ্ট কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। তাই বলিতেছি, গলাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সকলে গাছ-কোমর বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়ুন! ভগবান নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করিবেন। আরও একটা সুবিধা আছে। সকলেই জানে, বাঙ্গালী ঘর-পোষা মানুষ। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ আইন-সভায় প্রতিনিধি হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তঃপুর যদি রুখিয়া দাঁড়ায় আর দিন-কয়েকের জন্য অসহযোগ নীতি অবলম্বন করে—তবে প্রতিনিধিগণ নিশ্চয়ই অন্ধকার দেখিবেন চোখে, আর নারীর পক্ষে চোখ বুজিয়া ভোটও দিয়া ফেলিবেন। নতুবা তাঁহাদের কাহারও যে নিস্তার থাকিবে না, তাহা আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

প্রিয়ার উদ্দেশে

৬

অবশেষে তোমার চিঠি, দীর্ঘ চিঠি! আজ সকালে সামনের লাইন থেকে ফেরবার পথে কামানের সারের কাছে গেলুম। আজ ঠিক সেই রকম দিন, যে-দিন মানুষ নিজের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আশা করে। আকাশ যেন অনেক উপরে উঠে গেছে—সাদা মেঘের টুকরো ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে; কাদা শুকিয়ে যাচ্ছে, বাতাসে নবীন বসন্তের আমেজ পাচ্ছি। এমন দিনে আমরা লণ্ডনে প্রিমরোজ দেখবার আশা করি, আর নিউইয়র্কে—তোমাদের রাস্তায় কি ফুল বিক্রী হয়? একদিন, যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তুমি আমায় Fifth Avenueতে বেড়াতে নিয়ে যাবে, সেদিন তা জানা যাবে। এমন দিনেই ত লোকে কত রকম মতলব করে' ভবিষ্যতের কথা ভাবে, আর মনে-প্রাণে অনুভব করে যে, সে চিরকাল বাঁচবে।

আমরা যখন নিউইয়র্কে মিলবো, তখন প্যারিতে তুমি যে পোষাক পরেছিলে তার ফ্যাশন উঠে যাবে। তুমি কি-রকম সাজবে তাই ভাবছি। শুধু আমায় খুসী করবার জন্যে হয়ত তুমি—কি বল? না, না, এত বেশী যাওয়া আমার উচিত হবে না। কোন পুরুষকে খুসী করবার জন্যে কোন মেয়েই দু-বছরের পুরানো বাসন্তী ঢঙে সাজতে পারে না।

যুদ্ধটা কি-রকম তাহলে কিছু দেখছ ? তুমি বেশ স্পষ্ট ক'রে আমায় লিখতে পারনি, কিন্তু তোমার লেখার ভিতর থেকে সেটা আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। একমাস আগে গুজব শুনেছিলুম, ফরাসীদের একটা আড্ডা জার্ম্মাণ-আক্রমণে নষ্ট হয়েছে ! তুমি যে সেখানে থাকতে পার এ-কথা আমার মনেই হয়নি ! সেজন্যে কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। নিজে সাহসী হওয়া সহজ, কিন্তু তুমি বিপদের সীমার মধ্যে আছ খবর পেলে আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে উঠতো। তোমার মনে আছে ত, যুদ্ধের প্রথম সারের খুব কাছাকাছি এক হাসপাতালে তোমায় পাঠাচ্ছে শুনে আমি কি-রকম প্রতিবাদ করেছিলুম ! এত প্রতিবাদ করেছিলুম যে, তুমি প্রায় আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলে ; আমাদের সঙ্গে এই মরণের খেলায় যোগ দেবার তোমার কি বিচিত্র আগ্রহ ! তুমি তখন কি বলেছিলে তা আমি ভুলিনি—"তোমাদের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের জীবনের দাম কম—জগতে মেয়ের অভাব হবে না। তোমরা যদি মরবার যোগ্য বলে ছাড়া পাও তবে আমরা কেন মরবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো ?" তোমার জন্যে আমার গর্ব্ব হচ্ছে—তোমার গৌরব করছি।

এতক্ষণে তোমার সুদীর্ঘ নীরবতার কারণ বুঝতে পেরেছি। সাধারণ লোকদের সহর ছাড়বার হুকুম আসবার পর থেকে তোমাদের চিঠি লেখা বন্ধ করতে হয়েছে। যাই হোক, যদি লেখবার বাধাও না থাকতো, তবু তোমার কাজও তো অনেক ছিল ! আমি সেই-সব কষ্টকর দিনের মানসিক উদ্যোগ ও উত্তেজনার কল্পনা করছি, যেদিন জার্ম্মানরা লাইন ভেঙ্গে ভিতরে এল—কতখানি তা কে জানে ! তোমায় যেন দেখছি—ambulance corps-এ তুমি চারিদিকে বেড়াচ্ছ—বোমার আঘাতে জীর্ণ ও ধ্বংসগামী সহরের অসহায় শিশু-রক্ষার ভার যে তোমার উপরে ! তারপর সে কাজ যখন শেষ হ'ল, যুদ্ধের মধ্যে থাকবার আশায় তুমি আহতদের সেবার ভার নিলে। খরচের খাতায় নাম লিখিয়ে যারা গান করতে করতে যাত্রা করলে, সেই সব সৈন্যকে তুমি দেখেছ, পথের ধারে দাঁড়িয়ে তুমি তাদের উৎসাহ দিয়েছ, তারা মহা-স্ফূর্ত্তিতে হেসে তোমায় চুম্বন উড়িয়ে দিয়েছে, আর হাসি-মুখে তুমি সে চুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছ ! অনেকের পক্ষে তুমিই শেষ মেয়ে, যাকে তারা এ জগতে দেখে গেল। মহান ত্যাগের সাম্‌নে সব জিনিষ কত সরল কত সুখের ! মার্কিন রেড ক্রশের উর্দ্দি-পরা তোমার ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে—তোমার মাথার সাদা ওড়নাটা পিছনে উড়ছে—মুখখানি আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তোমার সামনে মৃত্যু-চিহ্নিত সৈন্যদল অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে, বীরত্বের আনন্দে সব জিনিষকে তুচ্ছ ক'রে ! তুমিই আবার সেই দলকে ফিরে আসতে দেখেছ, সেই বিরাট প্রবাহের রক্ত-মাখা ছোট ছোট ঢেউগুলো—হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডুলিতে শুয়ে তাড়াতাড়ি সব হাসপাতালের মধ্যে ঢুকলো। তুমি আমায় যা-সব বলেছ তার মধ্যে সব-চেয়ে বেশী আমার মনে বেজেছে সেই লোকটার কথা, যার ঠোঁট দুখানা উড়ে গেছে, অথচ কৃতজ্ঞতার আবেগে শুধু ব্যাণ্ডেজটা তোমার পোষাকের উপর চেপে

ধরলে। তুমি লিখেছ যদি তোমায় এখন দেখি, তবে অনেক পরিবর্ত্তন দেখতে পাবো। এত রাত যে বিনিদ্র কাটিয়েছ তার ফল ফলছে, আগুনে যেমন ধাতুর পরীক্ষা হয় তোমার সেই-মত পরিবর্ত্তন আমি দেখতে পাব, আশা করছি।

তাহলে তোমার বন্ধুর মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হলো। চাপা ফুঁপিয়ে-কান্নার মত তীব্র স্বরে তিনি যে কথাটা বলেছিলেন তা আমি কোনকালে ভুলব না—"তাকে বিয়ে করলেই ভাল করতুম।" তাঁর প্রণয়ী যুদ্ধে মারা যাবার পর থেকেই তিনি কেবলই এগিয়ে চলছিলেন, ক্রমে ক্রমে বিপদের সীমানার দিকে। তাঁর প্রিয়ের ভাগ্যে ভাগ বসিয়ে তিনি এখন খুব খুসী হয়েছেন নিশ্চয়ই। এই যে ভাবনাটা তাঁর মনকে ঘিরে ধরেছিল, এর ভিতর একটা বিবেকের দংশন ছিল হয়ত, তোমার কি মনে হয়? হয়ত যুদ্ধে যাবার আগে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ইনি রাজী হন নি। আমার ত তাই মনে হয়। মরণোন্মুখ প্রিয়তমকে শেলের বৃষ্টি থেকে নিজের দেহ দিয়ে রক্ষা করার মধ্যে ভারি একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যে একেবারে ব্যর্থ! তুমি ত লিখেছ যে, তিনি কোনরকমে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্যেই বদ্ধ-পরিকর হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর ব্যর্থতা মরণকে আরও বীর্য্যময় ক'রে তুলেছে।

তাঁকে দেখে ত সে ধরণের মেয়ে বলে মনে হতো না। তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে খুব দৃঢ়-চিত্ত, স্বার্থপর আর ভারী হিসেবী ব'লে মনে হতো; তাঁর চরিত্রে খুব একটা দৃঢ়তা ছিল হয়ত, সব সময়ে তিনি ও-রকম নন। তাঁর অন্তরের কোমলতা। শুধু সেই কথায় ধরা পড়েছিল "তাকে বিয়ে করতুম যদি।" যুদ্ধকে তুমি গালি দিতে পার, কারণ সাহসের বাজে-খরচ এর চেয়ে কোন কাজেই বেশী হয় না, অথচ এর মত আর কিছুতে শেখায় না, বন্ধুর জন্যে কেমন ক'রে মরতে হয়! সাধারণ লোকের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন গৌরব আছে তা প্রকাশ ক'রে দেবার মত শক্তি শুধু যুদ্ধেরই আছে, শান্তির মধ্যে তার কণামাত্রও নেই।

এখন তুমি অপেক্ষাকৃত নিরাপদে আছ—সেটা কি রকম তাই ভাবছি। আবার তুমি লাইনের পিছনে অসহায় শিশুদের সেবায় মন দিয়েছ। লিখেছ, ছোট Gaston তোমার প্রিয়পাত্র। সে মোটে ছ'দিনের—আশিবছরের বুড়োর মত তার মুখ আর আকাশের মত নীল চোখ ছুটি। তুমি যেখানে বাসা পেয়েছ সেটা ভয়ানক বদ্ধ আর অস্বাস্থ্যকর, অথচ তুমি খুব সুখে আছ! বেশ!

তোমায় একটা গোপন কথা বলবো? প্যারিতে যখন তোমার সঙ্গে ছিলুম তখন তোমার মনে স্থির-বিশ্বাস হয়েছিল যে, তুমি এ কাজে টিঁকতে পারবে না। যখন তুমি যুদ্ধের প্রথম সারের কাছ যাবে বল্লে, তখন আমার স্পষ্টই মনে হ'ল যে, তুমি যে-কাজ করতে যাচ্ছ, তার সম্বন্ধে একবিন্দু ধারণা তোমার নেই। তোমায় দেখে এমন কোমল, সুন্দর ও ভঙ্গুর মনে হয়! জীবনে তোমায় কোনদিন কাজ করতে হয় নি। তুমি শুধু সাজ-পোষাক করেছ, আর গাড়ী চ'ড়ে বেড়িয়েছ। কোন কাজ করতে হলে যতখানি ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা তোমার ছিল না।

তোমার চোখে সাধারণ জীবন সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞতার দৃষ্টি দেখেছিলুম, তা কেবল সম্ভ্রান্ত জীবনেই সম্ভব, কারণ অনেক দাম দিয়ে তা কিনতে হয়, তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা একসঙ্গে ভাবা যায় না। যুদ্ধের পশ্চিম রঙ্গভূমির বীভৎসতা তুমি বুঝতে পারনি—না, তার গৌরবটুকুও না। তোমার চার দিকে ছিল শান্তি আর বিরামের আবহাওয়া।

থিয়েটারে বা হোটেলে যখন তোমার পাশে ব'সে অন্য-সব লোকদের দিকে চাইতুম, তখন প্রায়ই মনে হ'ত, এই যে-সব লোক হাসছে আর মজা লুটছে, ছ' মাস পরে এদের অবস্থা কি-রকম হবে? সেই অজানার দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে এদের সব গাড়ী-থেকে পড়ে-যাওয়া বস্তার মত অসহায়ভাবে প'ড়ে থাকতে দেখেছি—তাদের মুখ কুৎসিত ভাবে বদলে গেছে আর পরিবর্ত্তনশীল আকাশের দিকে তাদের স্থির চোখ দৃষ্টিহারা হয়ে চেয়ে আছে।

ভেবেছিলুম, তুমি এ-সব জাননা। কোন কালে এ-সব জানবেও না। কোন মেয়েকে ভালবাসলে সবায়ের যেমন হয় আমারও তেমনি আন্তরিক সাধ ছিল, তোমায় অবাস্তবের খাঁচায় বন্ধ ক'রে রাখবো, জীবনের রূঢ়তার রুদ্রতার বীভৎসতার কোন খবরই তুমি পাবে না। কত অন্যায় করতুম—তাহলে তোমার এই ফুল-তনু করুণার অসি নিয়ে যুদ্ধের মাঝে আত্ম-বিসর্জ্জনে আসতে পারত না। আজ তুমি সৈনিকের স্ত্রী হবার যোগ্যতা দেখিয়েছ—তখন তুমি ছিলে শুধু খেলার জিনিষ!

আমার মনে আছে, একবার তুমি আমায় বলছিলে, "ধনী হয়ে জন্মানোয় কি কষ্ট! সবই তৈরী! তোমার কাছ থেকে কেউ কিছু আশা করে না—তুমি যেন কিছু করতে আসনি।" তুমি চাইতে—কি যে চাইতে, তা তুমি নিজেই জানতে না; কিন্তু তোমার ঈপ্সিত বস্তুটি নিশ্চয়ই সুন্দর, তোমার মনের মত। বিবাহের রঙ্গমঞ্চে তাড়াতাড়ি ঢুকে প'ড়ে আবার নতুন ক'রে নিজে তোমার মায়ের ভূমিকা অভিনয় করবে, এ চিন্তা কোনদিনই তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি। তুমি চেয়েছিলে মাটী ছেড়ে উঠতে, উড়ন-জাহাজে চড়ে আকাশে উড়তে, তারায় তারায় ধাক্কা দিয়ে ফিরতে, আবার নতুন ক'রে গ্রহ-নক্ষত্রের খেলার মাঠের সন্ধানে যাত্রা করতে। জার্ম্মান-আক্রান্ত সহরে গোলাবৃষ্টির মধ্যে থেকে এবং যে-সব সৈনিক মরণের মুখে ছুটে চলেছে তাদের হাসিমুখে বিদায় দিয়ে ভাল ক'রেই তোমার স্বপ্ন সফল করেছ।

আমাদের কি সত্যই কষ্ট হয়? সন্দেহ হয় আমার। কাদা আর আঘাতের ক্ষত, দৈহিক যাতনা আর অসুবিধা যতই হোক, কি এসে যায় তাতে, মন যদি আগুনের শিখার মত আকাশের দিকে জ্বলে জ্বলে ওঠে! তুমি আর আমি দুজনেই বিভিন্ন রকমে জীবনকে ভয় করতুম; আজ একটা ন্যায়ের জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভয় হারিয়েছি। এ সাহসের জগৎ। আমরা তফাৎ আছি ব'লে সাহস যেন আরও বাড়ছে। আমার পক্ষে সেইটিই যে সব-চেয়ে বড় ত্যাগ। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে নিজেকে 'না' বলবার জন্য মানুষের একটা ঝোঁক চেপে যায়; মানুষ বৈজ্ঞানিকের মত কুতূহলী হয়ে ওঠে শুধু

আবিষ্কার করতে—তার আত্ম-ত্যাগের সীমা-রেখাটা কোথায়!

যখন তুমি শিশুদের কথা লেখ তখন মনে হয়, তোমার শিশুদের যেন আমি পেয়েছি। এখানে কামান-গর্ত্তের পিছনে বসে দেখি, তুমি দু'হাত দিয়ে শিশুর ছোট দেহটীকে বেষ্টন করেছ, তাদের ছোট ছোট মাথা তোমার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। তোমায় এখনও বালিকা ব'লে আমার মনে হয়, হাতীর দাঁত থেকে খুঁদে-বার-করা তন্বী প্রতিমার মত! একটা অবর্ণনীয় স্বর্গীয় পবিত্রতায় তুমি মণ্ডিত! ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে-ঘেরা তোমার ছবিখানি যখন মনে আসে, তখন এমন সব ভবিষ্য দিনের কথা মনে জাগে, যা কখনও আমাদের জীবনে ঘটবে না। মুহূর্ত্তের জন্যে আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠি। যারা মরে গিয়েছে, তাদের ছেলেরাই তাদের অমরত্বের বিজয়-নিশান। কত লোককেই দেখলুম সকালে জেগে উঠলো, আর রাত্রে চিরদিনের মত স্থির হয়ে শুয়ে পড়লো।

আমার এ-সব চিন্তা আমার অযোগ্য, তোমার দৃষ্টিগোচর হবার কোন অধিকারই এদের নেই!

তুমি লিখেছ—"বিদায়! যুদ্ধ যে কেমন, তা দেখেছি বলেই লিখছি যে, নিজের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন—যতখানি প্রয়োজন তার বেশী বিপদের মুখে এগিয়ে যাবেন না।" কিন্তু, বন্ধু আমার, যে-সব বিপদ লোকে এড়ায়, তাইতে সাহস ক'রে যাবার জন্যেই যে আমি এখানে এসেছি! ভাল সৈনিকের একমাত্র প্রমাণ যে সে আশার অতিরিক্ত করে। যাই হোক, তোমায় মিনতি ক'রে বলছি, যদি বেরিয়ে যাবার ভদ্র উপায় থাকে, তবে লক্ষ্মীটি, বোমা-বর্ষণের মধ্যে তুমি থেকো না!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ

পরশমণি হারিয়ে যাওয়া
কেমন করে সইবো?
ওই ফুরালো দিনের আলো
ওরে দারুণ দৈব!
আগিয়ে যাওয়ার সুখ নাহি আর
পশ্চাতেও নিবিড় আঁধার,
একলা বিজন পারের ঘাটে
কেমন করে রইবো?

২

নেইকো কোথাও আলোয় চিনে
যেথায় ফিরাই দৃষ্টি,
পারাপারের নৌকা সুদূর
নাম্‌লো শিলা বৃষ্টি।
আঁধার তীরে চকায় ডাকি
মরছে কেঁদে চক্রবাকী,
দিনের শেষে বিচ্ছেদেরি
যন্ত্রণা কি কইবো!

৩

আগিয়ে যেতে লজ্জা করে
কান্না আসে ফিরতে
হারিয়ে ফেলে অঙ্গুরীয়
অপ্সরারি তীর্থে।
যাবো বিপুল রাজসভাতে
কেমন করে শূন্য হাতে,
লজ্জা-ঘৃণার এই দেহভার
কেমন করে বইবো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভিখারিণী

সকাল ছ'টা হবে। কলকাতা তখন নিস্তব্ধতার রাজত্ব না হলেও, ভাড়াটে গাড়ীর ঘড়-ঘড়ানি ও লোকের ভিড়ে সহর সরগরম হ'য়ে ওঠেনি। রাস্তা দিয়ে বেশী লোক চলাফেরা কর্চ্ছিল না। আর যারা চলছিল, তাদেরও মধ্যে শ্রমজীবিদের সংখ্যাই বেশী।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরে বাড়ী ফিরছি। অল্প অল্প বাতাস বইছিল। প্রভাতের পবিত্রতা মনটাকে বেশ-একটা প্রফুল্লতার আবহাওয়ার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। মনের আনন্দে শিষ্ দিতে দিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে দেখি—হাতের আঙুল-হীন, পায়ে নেকড়া-জড়ানো, ছেঁড়া কাপড়-পরা এক ভিখারিণী, একটা ছোট ছেলে বুকে ক'রে ভিক্ষা কর্চ্ছে।

দৃশ্যটা দেখে মনটা একসঙ্গে ঘৃণা, দয়া ও বিরক্তিতে ভ'রে উঠল। থম্‌কে দাঁড়াতেই ভিখারিণী হাত পেতে ভিক্ষা চাইলে।

বিরক্তি হ'ল নির্ম্মল প্রভাতের শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমনতর একটা বিশ্রী অসুন্দর দৃশ্য দেখে! দয়া ও ঘৃণা,—সে ভাবটাকে ঠিক দয়া ও ঘৃণা বলা চলে না বরং তাকে অনুকম্পা ও ক্রোধের সংমিশ্রণ বলা চলে। ভিখারিণীর শরীরের অবস্থা দেখলে সত্যিই মনে দয়া হয়, তাকে সাহায্য কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ঐ যে ছেলেটা, এইটেই ত যত গোল বাধালে! হায়রে, ভিক্ষান্নে যাদের জীবন নির্ভর কর্চ্ছে, তাদেরও মনে বংশ-বৃদ্ধির সাধ! এই যে ছেলেটা, শিক্ষার অভাবে, এ হবে একটা সিদ্ধহস্ত পকেট-মার বা বড় হ'লে প্রচণ্ড চোর অথবা গুণ্ডার সর্দ্দার। দেশে যে দুষ্ট ও দোষীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, তার কারণ ত এরাই। সুতরাং এদের সাহায্য না করাই উচিত। কিন্তু তবুও কিছু না দিয়ে যেতে মন সরছে না। যুক্তির দিক দিয়ে দেখ্‌ছি না-দেওয়াটাই উচিত, কিন্তু হৃদয়ের আর-এক দিক দিয়ে ভাবতে গেলে কিছু দেওয়াটাই উচিত বলে মনে হচ্ছিল।

ভাবের এই দোটানার মধ্যে পড়ে পকেটে হাত দিয়ে, দেব কি দেব না ভাবছি, এমন সময় আমার চমক ভাঙ্‌ল, ভিখারিণীর একটা আশীর্ব্বাদে—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বাবা।" দেখি, একটা মিঠাই-ফেরিওয়ালা তার ঝুড়ি থেকে একটা লাড্ডু দিয়ে মুখে প্রসন্নতার হাসি নিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল।

লজ্জায় আমার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। কেমন একটা ভাবের আবেশে পকেট থেকে হাত দিয়ে যা উঠল,—সেটা আনি কি সিকি না দেখে তাই দিয়েই দ্রুত-পদক্ষেপে চলে এলুম।

বাকী পথটুকু ভাবতে ভাবতে এলুম—এটা পয়সার মায়া, না, বর্ত্তমানের পাষাণ সভ্যতা ও শিক্ষা, যা আমাদের হৃদয় ব'লে জিনিষটাকে গলা টিপে হত্যা কর্ব্বার উদ্যোগ কর্চ্ছে!

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

মূল্য

রায়-বাহাদুর হয়েছেন বাবু দিতেছেন ভোজ তাই,
পাঁচশত দিয়ে লক্ষ্ণৌ হতে এসেছে সিরাজী বাই ;
ললিত লাস্য ফুল্ল হাস্য মাদক-মাখানো গান ,
আজিকে নিশীথে সুখের সায়রে ডাকিয়াছে যেন বান !

বেজেছে ঘড়িতে বারোটা তখন হাঁকিলেন নব "রায়",
"জল্‌দী কর্‌কে সিরাজী বোলাও—খান্‌সামা কোন্ হায় !"
বার বার হাঁকি মিলিলনা সাড়া, "বাহাদুর" লাল রেগে,
ঘূর্ণিত আঁখি রক্তমূর্ত্তি বাহিরে এলেন বেগে।

দরজার পাশে বালক ভৃত্য পড়েছিল ঘুমে লুটি,
মারিলেন বাবু সবুট চরণ সজোরে ধরিয়া টুঁটি ;
মারেন যতই বেড়ে যায় ক্রোধ ধরিবার নাই কেহ,
ভৃত্যেরা সব ভয়ে জড়সড় থরথর কাঁপে দেহ।

ঝলকে রক্ত উঠিছে মুখেতে দেখিয়া থামেন প্রভু ;
চলে গেলে বাবু চুপি চুপি এসে উঠাতে যাইল "নবু।"
ডেকে অবশেষে গায় হাত দিয়ে পাইলনা কোন সাড়া,
তখন বালক গেছে বহুদূর—মুক্ত প্রভুর তাড়া !

বাজের মতন পশিল কথাটা মজলিস-মাঝে যেয়ে,
তখন ঠুংরি টপ্পা খেয়ালে দিতেছে বাইজী ছেয়ে।
একজন বাবু উঠিলেন ব'লে বড় আপশোষ-ভরে,
"এমন আমোদ মাটি ক'রে দিল হতভাগা ব্যাটা ম'রে।"

টাকা আছে যার বিশ্বভুবনে নাহিক তাহার পাপ,
দরোয়ান গিয়ে আনিল ডাকিয়া মৃত বেয়ারার বাপ।
বাবু চাহিলেন কিছু টাকা দিতে—হয়ে গেছে যাহা যাক্,
"হয়নাকো যেন গোলমাল কিছু, নোট্ পাঁচখানা রাখ্।"

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

প্রত্যাবর্ত্তন

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অরুণ চলিয়া গেলে হিমুর প্রথমটা ভারী কান্না পাইতেছিল। মা-দিদিমার চোখ এড়াইয়া সে তাই ঘুরিয়া আসিয়া অরুণের পরিত্যক্ত বাহিরের ঘরখানিরই শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। আজ সে ঘরে খালি তক্তাপোষ ছাড়া আর কোন-কিছুই ছিল না। তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রথমে সে খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল; কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে অরুণের উপর অনেক রকম করিয়া রাগ করিল। ছুটিতে সে বাড়ী আসিলে কি উপায়ে তাহার সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহার মনে আঘাত দিয়া হিমু তাহাকে জব্দ করিবে, তাহারও একটা 'খসড়া' তৈয়ার করিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া চোখ মুছিয়া সে ঘরের বাহির হইল। ছেলেমানুষের মনের বেদনা যেমন গভীর, তেমনি ক্ষণস্থায়ী! শীঘ্রই তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া সে যখন কেবল অরুণের স্মৃতি-চিহ্নই দেখিতে লাগিল, তখন মনে করিল, 'আড়ি' না দিয়া অরুণ ফিরিয়া আসিলে এবারকার মত না হয় 'ভাব'ই বজায় রাখিবে। উপস্থিত কাল সকালে ঝি যখন বাজারে যাইবে সে তাহাকে একখানি পোষ্টকার্ড কিনিয়া আনিতে বলিবে; এবং তাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসার জন্য অরুণকে লিখিয়াও দিবে। মা গো, এমন বুনো দেশে কি একা-একা মানুষ কখনো থাকিতে পারে? মা বল্লেন, "পাড়ায় কি আর ছেলে-মেয়ে নাই? সঙ্গীর অভাব কি!" ভারী ত সব সঙ্গী! উহারা কি অরুণের মত ভাল! না, শুধু উহাদের সহিত রাতদিন খেলিতেই কাহারো ভাল লাগে? আর সে কি এখনও বড় হইতেছে না, যে এখনো রাতদিন কেবলই খেলিয়া বেড়াইবে? লেখাপড়া না করিলে মানুষ মূর্খ হইয়া থাকে, পৃথিবীর কোন কিছু ভাল জিনিষই জানিতে বা শিখিতে পারে না। অবশেষে তাহাকেও সেই মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে? কেই বা আর তাহাকে পড়া বলিয়া দিবে, কেই বা লেখা শুধরাইবে? মা ত এ-সব কিছুই বোঝে না। কিছুদিন মনের বৈরাগ্যে সে খেলাধূলা ছাড়িয়া খুব মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিল। অরুণকে এবার চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে। তাহার হাতের অক্ষর দেখিয়া অরুণ যেন মনে করিতে পারে যে হাঁ, হিমুরও মাথা আছে, বুদ্ধি আছে, সেও বোকা নয়।

অরুণকে সে প্রথম যেদিন চিঠি লিখিল, সেদিন সারা সকাল বেলাটাই তাহার ঐ একখানি পোষ্টকার্ড লিখিতেই কাটিয়া গেল। তবু অনেক যত্নে লেখা অক্ষরগুলি ঠিক মনের মতও হইল না। চিঠিতে কথা বড় বেশী কিছু ছিল না; অক্ষর গুলির ছাঁদ হিমুর যত মনের মতই হউক, আকারগুলা মোটেই তাহার পছন্দ হইল না। হিমুর মনের সব কথাই তাই অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। শুধু ছুটি হইলেই অরুণ যেন

চলিয়া আসে, এই একটি মাত্র অনুরোধই করা হইল—দুই-তিন দফায়।

সময়ে চিঠির জবাব আসিল। অরুণ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে; এবং ছেলে পড়াইবার কাজ পাইয়াছে। পূজার ছুটির আর তিনমাস দেরী—এই তিনটি মাস কাটিয়া গেলেই সে বাড়ী আসিবে।

চিঠি পাইয়া হিমুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার বয়সে এই প্রথম সে অপরের কাছ হইতে চিঠি পাইয়াছে। ঠিকানার উপর আবার তাহারই নাম প্রথমেই লেখা! চিঠিখানি অনেকবার পড়িয়া পড়িয়া সে যখন তৃপ্ত হইল, তখন মা-দিদিমাকে দেখাইবার জন্য বাড়ীর ভিতর গেল। সেদিন অপরাহ্লের মধ্যে হিমুর এই পত্র-প্রাপ্তি-সংবাদ জানিতে পাড়ার কোন ছেলে-মেয়েই বাকী রহিল না।

ক্রমে অরুণের বিচ্ছেদ-দুঃখ কমিয়া আসিলে সে আবার নূতন বন্ধু-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল; ঘোষেদের পঙ্কজিনীর সহিত সই, শৈবালের সহিত মকর ইত্যাদি পাতাইয়া খেলার মজলিস বেশ জাঁকাইয়া তুলিল। তবুও খেলাধূলার মধ্যেও অরুণকে সে প্রায়ই চিঠি লিখিত। তাহার নূতন বন্ধুদের কথা, ভট্টাচার্য্যদের বাতাবি লেবুর গাছে কিরূপ ফল ধরিয়াছে, মিনুদের বিড়ালের যে তিনটি বাচ্চা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়টি সাদা ও কয়টি ভিন্ন রঙের—এ সব কথারই উল্লেখ থাকিত। এবার সে আর একটি নূতন খবর লিখিয়াছিল—মুখুয্যেদের ভুবন এখন তাহাদের খেলার সঙ্গী।

হিমুর খেলার সাথী ভুবনকে অরুণ চিনিত। সম্প্রতি তাহার বাবা মারা গিয়াছেন লিখিয়া হিমু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। পিতৃহীনা বালিকা এ দুঃখটি ভাল করিয়াই বুঝিত। তাই সহানুভূতির অশ্রু নিজে মুছিয়াই শান্ত হইতে পারিল না। ব্যথার ব্যথী অরুণকেও সে-দুঃখের অংশ সে বণ্টন করিয়া দিল। ছুটিতে অরুণ আসিলে সেখানকার সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া হিমু কহিল, "অরুণদা, বরুণার কথা তুমি ত আমায় কিছুই লেখনি—তার কথা সব বলনা ভাই।"

"তার কি কথা?" বলিয়া অরুণ হাসিয়া হিমুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল।

"এই সব--সে কেমন দেখ্‌তে? কত বড়? আচ্ছা অরুণদা, সে তোমায় অরুণদা বলে ডাকে ত?"

"না—স্যার বলে।"

"সে কাকে বলে অরুণদা? আমি ত কারুকেই ও কথা বলি না। সে বুঝি ইংরিজি কথা?" বলিয়া বিপুল বিস্ময়মাখা চোখছুটি সে অরুণের মুখের উপর ন্যস্ত করিল। অরুণ কহিল, "তাই—তুমি ত বাংলার গণ্ডী পেরুবে না। হবে কি, বল! যদি ইংরিজি শিখ্‌তে আরও কত জান্‌তে বুঝ্‌তে পারতে। বরুণা এই ক'মাসেই খাসা কথা বল্‌তে পারে ইংরিজিতে।"

"তোমার সঙ্গে বলে? তার হাসি পায় না ইংরিজিতে কথা বল্‌তে?" বলিয়া হিমু নিজেই মুখে কাপড় চাপিয়া খিল খিল করিয়া একচোট হাসিয়া লইল। কিন্তু সে হাসিতে অরুণ ত যোগ দিলই না; বরং গম্ভীর মুখে রহিল দেখিয়া হাসি থামাইয়া চোখ্ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিয়া সে কহিল, "আচ্ছা গো, আচ্ছা, পড়াও না—কে বারণ করেচে? জানি আমি, সে যখন জানে

তখন আমায় জান্‌তেই হবে। তোমার হুকুম ত আর না হবে না। কিন্তু কেন বল ত—?” বলিয়া সে বিরক্ত মুখে উঠিয়া গেল।

এ কেনর উত্তর অরুণও দিল না, সেও যথার্থ ভাবে চাহিল না। পরদিন যথাকালে দেখা গেল, শিক্ষক ও ছাত্রী বিপুল মনোযোগে নূতন ভাষার চর্চ্চায় ব্যাপৃত। ছুটির অর্দ্ধেক কাল বন্ধু-গৃহের পূজা-উৎসবে কাটাইয়া আসায় শীঘ্রই অরুণের ফিরিবার সময় হইল। ফার্ষ্ট-বুকের অর্থ-পুস্তক ও বাংলা হাতের লেখায় হিমুর বুঝিবার পক্ষে সহজ সঙ্কেতে যথাসাধ্য বুঝাইবার প্রয়াস নিজে নিজে পাঠাভ্যাসের জন্য হিমুকে প্রস্তুত করিয়া দিয়া অরুণ বিদায় লইল। পরের বার ছুটিতে আসিয়া সে আশ্চর্য্য হইল, মেধাবিনী বালিকা অর্থ-পুস্তকের সাহায্যে ফার্ষ্টবুক শেষ করিয়া সেকেণ্ড বুক আরম্ভ করিয়াছে। আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে অরুণ কহিল, “তুমি যে খুব ভাল তা আমি জান্‌তুম। কিন্তু খুবটা যে কত বড় তাই কেবল জান্‌তুম না।” অরুণের প্রশংসায় হিমুর শ্রম সার্থক মনে হইলেও স্বভাব-বশে সে কহিল, “ভারী ত—বরুণার চেয়ে ত আর আমি ভাল নই।”

“নয় বই কি বরুণার কি! ভাল? তাকে চিরকাল ধরে চেষ্টা করে লোকে শেখাচ্চে তাই সে শিখেচে। পাখীকে কথা বল্‌তে শেখালে সেও কথা বলে। ওর বাহাদুরীটা কোন্‌খানে? যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও শিখ্‌তে পারে, সেই ত—আশা করি, বাংলা দেশ একদিন হিমানী দেবীর লেখা দেখে অবাক্ হয়ে যাবে।”

হিমু মনে মনে খুসী হইলেও মুখে কহিল, “তোমার কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে অরুণদা—”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পূজার ছুটি কাছে আসিয়া পড়ায় দেশ জুড়িয়া একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। অফিসের চাকুরে হইতে স্কুল-কলেজের ছাত্রদলেও এ ব্যস্ততার লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। অরুণদের মেসও এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিল না। বাড়ী যাইবার আগ্রহে অনেকেই আগে হইতে জিনিষ-পত্র কেনা ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাশুনা বিদায়-পর্ব্ব সারিয়া লইতেছিল। লম্বা ফর্দ্দ লইয়া বাড়ীর চিঠিও সকলের ঘন ঘন আসিতেছিল।

সারা মেসখানার মধ্যে কেবল দুইটি মানুষের মানসিক বিপ্লবের কোন সংবাদই বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেখা গেল না। প্রফুল্লর মানসিক উচ্ছ্বাস কোন-কিছুতেই বাহিরে কখনো প্রকাশ পাইত না, তাই ইহাতে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলেও অরুণের প্রতি কাহারো কাহারো চোখ পড়িতেছিল। যাহাদের পড়িতেছিল, তন্মধ্যে জলদই প্রধান।

কয়েকদিনের দ্বিধা কাটাইয়া একদিন সে কহিল, “অরুণবাবু ছুটিতে আপনি বাড়ী যাবেন ত?”

অরুণ একটু হাসিয়া একটু কাশিয়া সংক্ষেপে কহিল, “যাব।”

“কবে যাচ্ছেন? ছুটির গোড়ায়?” বলিয়া সে উৎসুক দৃষ্টিতে অরুণের মুখের ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছিল।

“দেখি—” বলিয়া অরুণ এবারও এড়াইয়া উত্তর দিল। জলদ বুঝিল, বাড়ী যাইবার জন্য বন্ধুর খুব বেশী ত্বরা নাই। তাই খুসী

হইয়া সে কহিল, "আমাদের বাড়ী পুজো হয়। এ বছর কাকারা সকলেই দেশে আস্‌বেন। একটু বিশেষ রকম ধুমধামও হবে, শুন্‌চি। আপনিও চলুননা—সেখানে পূজোটা খুব আমোদে কাট্‌বে তাহলে। লক্ষ্মী পূজোর আগেই না হয় ফির্‌বেন।"

বন্ধুর আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিতে অরুণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিল না। মনটি তাহার তখন ঝাল্‌দার পথেই অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। হিমু লিখিয়াছে, "আর কত দেরী করবে অরুণদা? ছুটি কি আর তোমার হবে না?" এ অনুরোধের পর কি আর দেরী করা যায়? তবু অরুণের আট-ঘাট-বাঁধা সতর্ক মন এমন অবস্থাতেও নিজ-অধিকারের সীমা বিস্মৃত হইল না। হিমু ছেলেমানুষ, সে নিজ খেয়াল-মতই না হয় ত্বরা দিয়াছে, কিন্তু তাহার মা দিদিমার ত্বরা কতটুকু, তাহা ত অরুণের বিশেষরূপে জানা নাই। তাই মনে কুণ্ঠা জাগিতেছিল,—পাছে মালতীদেবী কিছু মনে করেন! মুক্তা ঠাকুরাণী বিরক্ত হন্! উঁহাদের না দেখিয়া সেও যে থাকিতে পারিবে না। তবু দীর্ঘ ছুটিটায় নিজের সমস্ত ব্যয়-ভার সেই দুইটি অনাথা বিধবার স্কন্ধেই বা সে চাপাইবে কোন্ সাহসে? সেখানে তাহার কতটুকুই বা দাবী! কিসেরই বা দাবী!

ছুটিতে মেসের ঠাকুর-চাকর কেহ থাকিবে না, থাকিলে সে এখানেই কিছুকাল থাকিয়া দিন সংক্ষেপ করিয়া লইত। জলদের প্রশ্নের উত্তরে এই সব বিষয় তাহাকে মনে মনে আরও একবার ভাবিয়া লইতে হইল, তাই উত্তরে নিজের সম্মতি জানাইতে তাহার একটু বিলম্ব হইল। এখানেও যে সঙ্কোচে বাধিতে ছিল না, তাহা নহে; তবু বন্ধুর সে আগ্রহ-ব্যাকুল আহ্বান সে ফিরাইতে পারিল না। সে বুঝিত, জলদ তাহাকে ভালবাসে। সেও যে ভালবাসারই কাঙাল! তাই মন তাহার ভিন্ন পথে ছুটিতে চাহিলেও বন্ধুর অযাচিত স্নেহের আহ্বানটিকে সে ব্যথা দিয়া ফিরাইতে পারিল না।

এবারকার ছুটিটি যে কেমন আনন্দ-উৎসবে কাটিবে, তাহারই একটি সরস তালিকা মুখে-মুখে বানাইয়া লইয়া জলদ যখন এ সম্বন্ধে অরুণের নিরুৎসুক মনটিকেও একটু প্রলুব্ধ করিয়া ফিরিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অরুণের স্বল্পালোক ঘরখানির মধ্যে অন্ধকার তখন পূর্ণাধিকারেই নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অরুণ প্রসন্ন মনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে বেড়াইয়া আসিবার জন্য দড়ির আলনা হইতে খাকি রংয়ের সার্টটি পড়িয়া গায়ে দিয়া সে ধীর পদে বাহির হইয়া পড়িল।

ছুটির আগের দিন প্রফুল্লকে বাক্স গুছাইতে ব্যস্ত দেখিয়া অরুণ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, যদি সে কোন কাজে লাগিতে পারে। প্রফুল্ল মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "কি অরুণ, বাড়ী যাচ্ছ নাকি?"

অরুণ কহিল, "জলদ নিমন্ত্রণ কল্লে, তাই আগে ওর ওখানেই যাব?"

"নেমন্তন্ন পেয়েচ—বাঃ! তাহলে ছুটিটা কাটবে ভাল। বল?" বলিয়া সে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিল। অরুণ চুপ করিয়া তাহার পাশে বসিয়া কাজ দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। এ নীরবতা অরুণের ভাল লাগিতেছিল না; তাই প্রথমে সেই কথা কহিল, বলিল, "প্রফুল্লদা বাড়ী যাচ্চ ত?"

প্রফুল্লর আদেশ-মত অরুণ এখন তাহাকে আপনি ছাড়িয়া তুমি ধরিয়াছে। প্রফুল্ল মুখ না তুলিয়াই কহিল, "না।"

"তবে—কোথায় যাবে প্রফুল্লদা?" অরুণের প্রশ্নে বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হইল। প্রফুল্ল তাহা লক্ষ্য করিল। কাজে চোখ রাখিয়া অনাগ্রহভাবে সে কহিল, "বাইরে একটু ঘুরে আসা যাবে।"

অরুণ কহিল, "বাড়ী থেকে মত আনিয়ে নিয়েচ ত প্রফুল্লদা? তাঁরা হয়ত দুঃখিত হবেন কত, না যাওয়ায়।"

"হতে পারেন। না অরুণ, মত চাইলে তা তাঁরা দিতেন না, বিশেষ করে ঠাকুমা। কাকাবাবুও রাজী হতেন না। কিন্তু না চাইলেও বিদ্রোহ করবেন না, এও আমি জানি।" বলিয়া সে কাজ শেষ হওয়ায় বাক্স বন্ধ করিয়া এইবার ফিরিয়া বসিল; এবং ছুটিতে অরুণের পড়াশুনার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত তাহারই আলোচনা করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাহাকে আর পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তির অবকাশ দিল না। অরুণ মনে করিয়াছিল, এই অবসরে সে প্রফুল্লদার পারিবারিক জীবনের একটু খবর জানিয়া লইবে। কিন্তু প্রফুল্লর ভাবে তাহাকে এ সম্বন্ধে অনিচ্ছুক বুঝিয়া এ আলোচনাও সে আর তুলিতে চাহিল না। তাহার কথায় যে-দুইজনের উল্লেখ সে করিয়াছিল তাহাতে অরুণ বুঝিল, আপত্তি করিতে ঠাকুমা ও কাকাবাবু। তবে কি প্রফুল্লদাও তাহার মত ভাগ্যহীন! পিতৃ-মাতৃহীন অভাগা!

চিন্তার সঙ্গেই তাহার হাসি হাসিল। নিজের সহিত সে আবার অন্যের তুলনা করিতে চাহে! হউক পিতৃমাতৃহীন, তবু উহার ঠাকুমা আছেন, কাকাবাবু আছেন। নিজের বলিতে গৃহ-ভূমি—আত্মীয়-স্বজন সবই আছে,—তবু যেন, কেন কে জানে, অরুণের মনে হয়—প্রফুল্লদার মনেও যেন তাহারই মত একটা অভাবের ঝড় দিবারাত্রিই হাহাকার তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওই মানুষটির পরম-সহিষ্ণু সংযত মুখে আবেগ-বর্জ্জিত ব্যবহারে সকলের প্রতি ভালবাসায়—উহার মনের যে নিরুপদ্রব ছবিটি প্রকাশ পায়, আসলে কিন্তু তা নয়। হইতে পারে, ইহা ভ্রম। অরুণ হয়ত ঠিক্ মত তাহাকে বুঝিতে পারে নাই। ইহা অমূলক হওয়াই তাহার একান্ত প্রার্থনীয়। তবু স্নেহ-দুর্ব্বল চিত্তের সংশয় যেন কাটিতে চায় না। প্রফুল্ল নিজেকে বুঝিতে দেয়না, নিজে হইতে অগ্রসর হইয়া বুঝিবার সাহসও অরুণের হয় না। বন্ধুর এই আত্মগোপন-চেষ্টায় অভিমানে অনেক সময় তাহার চোখে জল ভরিয়া আসে—মনে হয় প্রফুল্লদা এখনও তাহাকে পর মনে করে, তাই কিছু বলে না। বন্ধু কি সুধু সুখের সাথী—দুঃখের অংশীদারও কি নয়? অরুণের যে সংসারে বলিবার কথা কিছু নাই, তাই সে নির্ব্বাক। কিন্তু যাহার আছে, সে কেন বলে না?

সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রফুল্লর একটি কথা বার বার তাহার মনে উঠিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিয়াছিল, "মত চাইলে তাঁরা

দেবেন না। কিন্তু না চাইলেও বিদ্রোহ করবেন না।"

কেন তা করবেন না? প্রফুল্লর পারিবারিক জীবন কি তবে শান্তিপূর্ণ নয়? তাহার আত্মীয়েরা কি তাহার জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা অনুভব করেন না? খুব সম্ভব, তাই। সেই জন্যই প্রফুল্লদা বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হন্‌না।

অরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল, কে জানে, দুঃখী কে? যাহার নাই? অথবা যাহার থাকিয়াও নাই? জগতে দুঃখ বুঝি স্বাভাবিক —তা সে যাহার পাশে যেরূপেই দেখা দিক্!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

চরকার আরতি

এস এস চির-চারু চির-চেনা চরকা!
এস ঘরে শ্রীর পাদপদ্মের ভোমরা!
অপলক চক্ষের জ্বেলে কোটি দেউটি
তোমার আরতি করি ত্রিশকোটি আমরা।

শিবের ললাটে চাঁদ সে চাঁদের বক্ষে
অঙ্কিত তোমারি সে স্বস্তিক-মূর্ত্তি,
ঘরে ঘরে জ্বেলে দাও হরষের জ্যোৎস্না
ঢেলে দাও দেহে প্রাণে কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি।

খুল্লনা-হেন দীনা শ্রীহীনা এ বঙ্গ,
তুমি এলে ফিরিবে শ্রী,—ফিরিবে শ্রীমন্ত,
বাংলার ফিরে এস পুরাতন বন্ধু
অশরণা দুখিনীর কর দুখ অন্ত।

এস বাস্তুর প্রিয়! গৃহমেধী শিল্পে—
জীয়াইয়া গৃহে গৃহে পাল,হে গৃহস্থে,
বস্তির দস্তুর হ'য়ে যাক্ লুপ্ত,
দুর্ভিক্ষের রাহু যাক্ চির-অস্তে।

যে দেশে বানাত টুপি নিজ-হাতে বাদ্‌শা
পদতলে ছিল যার দিল্লীর তক্ত,
চরকার চর্চ্চায় সেথা কার লজ্জা?
হিন্দু ও মোস্‌লেম চরকার ভক্ত।

তোমারে করিয়া হেলা, শুনি চীন-পুরাণে,
বঞ্চিতা পতি-প্রেমে সূর্য্যের কুমারী;
হ'ল স্বামী-সোহাগিনী সেবি' পুন তোমা' সে,
পূজার প্রচার চীনে তদবধি তোমারি।

ময়দানবের দেশে ইন্‌কার পেরুতে
গৃহে গৃহে পূজা পেতে তুমি গৃহ-দেবতা,
পতিপ্রাণা পেনেলোপে ঘেরে পর-পুরুষে,—
বাঁচায়েছ তুমি তারে, কে না জানে সে কথা।

তোমারে নিধান ক'রে তিন বোন নিয়তি
রচে নিতি দুনিয়ার ভাগ্যের সূত্র,
অধনের ধন তুমি চির-যুগে ধন্য
অনাথার স্বামী তুমি অবীরার পুত্র।

সতী সে মগের রাণী সতিনীর কুৎসায়
হ'ল যবে বনবাসী, তুমি দিলে অন্ন;
সখী তুমি ব্রিটেনের রাণী আনী-বুলেনের
কাড়াকাড়ি যার বোনা 'মিটেনে'র জন্য।

কবি কবীরের মিতা সঙ্গীতে সঙ্গী
তোমারে বরণ করি কবীরেরি সঙ্গে,
কিং-লীয়রের কবি হ্যাম্‌লেট-স্রষ্টা
করেছে তোমার সেবা কৈশোর-রঙ্গে।

বুলবুল-কুল শোনো উল্লাস-অন্তর
বলিছে কি বস্‌রাই গোলাপের ফুলে লীন,—
"ইরাণের কবিবর জুলাহা-ই-অব্‌হর্‌
চরকার চর্চ্চায় মশ্‌গুল হর্‌-দিন।"

শুভ-সূচী! এস শুচি-জীবনের বন্ধু!
কর্ম্মীর হে সুহৃৎ! অকেজোর শুদ্ধি!
কৃষাণীর কি রাণীর যতনের রত্ন!
দানো ফিরে জনে জনে মর্য্যাদা-বুদ্ধি।

ভুখা যে তোমার বরে লভুক্ সে আরবার
আত্মবশের স্বাদ— আপনাতে নির্ভর;
যন্ত্রের যন্ত্রণা দূর হোক দুনিয়ার,
কলে-গড়া 'কম্ফর্ট্‌!'—খেসারৎ বিস্তর।

নগরের নোংরায় ডুবে যায় সম্ভ্রম
ম্লান করে মানুষেরে চিম্‌নীর নিশ্বাস,
অকুলীন 'কুলি' নাম—পঙ্কের অঙ্ক
মুছে দাও, দাও তুমি বিশ্বেরে আশ্বাস।

ভস্মলোচন নব ভব্যতা রুক্ষ
কল ক'রে গিলে খায় জোয়ানের জোয়ানী,
চুঁয়ে যায় ক্ষেত-ভুঁই চিম্‌নীর ধোঁয়াতে
গঙ্গা সে সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কের ধোয়ানী!

ভুত-বাদুড়ের মত বুক চাপে বিশ্বের
বাষ্পীয় সভ্যতা ইস্পাত-দন্ত,
কারখানা মানুষের হাড়খানা বাদে আর
সব খায়, আয়ু বল সব করে অন্ত।

ঘর্ঘর কলঘর থর-থর ইমারৎ
বুক-দুর্ব্বল-করা অহরহ কম্প,
দানবের দাঁতগুলো ঝল্‌সিয়ে দৃষ্টি
নরমাংসের লোভে দ্যায় যেন লম্ফ!

বাঘের গলার হাড় বার করে চড়ুয়ে!
দানবের পেটে ঢুকে মানবেরা করে কি!
যাবে যে হজম হ'য়ে নিগমের আগেতেই!
হুঁস্‌ নাই! হাঁশ ফাঁশ্‌! ওঠে কি সে পড়ে কি!

সারি সারি খাটে কুলি স্ত্রী-পুরুষ একসা,
রাশ রাশ ওড়ে ফেঁশো পেটে গেলে যক্ষ্মা;
ঘড়ঘোড়ে কল-ঘরে কার শিশু সুপ্ত?
ধূলো-তুলো রোধে শ্বাস, কেবা করে রক্ষা?

বাস্তুতে ঘুঘু চরে, তার ঠাঁয়ে বস্তি!
উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড়;
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে স্বামী রুগ্ন
ভেগে যায় 'মেট্' সাথে অনাচার করে ভিড়।

পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পর্দ্দা,
শহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর
লালসার লোল শিখা বাড়ে রে বে-ফয়দা।

ধ্বসা পশ্চিমা লেগে পচে যায় দুনিয়া,
ছেয়েছে কুকুর-লোভী কামনার ছোঁয়াচে,
শয়তান লেলিয়েছে বোতলের বেতালে,—
দহিছে আগুন-পানি, কে বাঁচাবে ও-আঁচে?

বিজ্ঞান-বিজ্ঞের বিজ্ঞতা-ঝট্‌কায়
উড়ে গেল 'ওপ্‌পাউ'! উপে গেল সন্ত!
হাজারো নিরীহ প্রাণ অকারণ বলিদান
দেমাকে করাতে পান ডাকিনীর মন্ত্র!

জগৎ ফুকারি বলে, ক্ষমা দে রে আর না,
নাচাস্‌নে ভূত আর অভিচার-মন্ত্রে,
সাধনার শব জেগে সাধকের মুণ্ড
ঘন ঘন করে দাবী ভৈরব-মন্ত্রে।

ব্যথিত দুনিয়া কাঁদে ; এস তুমি চরকা !
কলবলে কাজ নাই, প্রাণ চায় শান্তি,
এসো ফিরে দুনিয়ায়, ধ্রুব হও বাংলায়
শিল্পীর ইজ্জৎ ! শিল্পের নান্দী !

হিংসা-বিরাগী-জনে দিলে তুমি সুবসন,
ব্রাহ্মণে হে পুরোধা ! দিলে তুমি পৈতা ;
বাখানিতে তব গুণ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ,
বল দেখি কোন্ মতে এক মুখে কই তা' ?

মিছিল সাজায়ে করি মোরা তব উৎসব
রঙ্গ-সবিতা তুমি ক্রোর-দাতা বঙ্গে,
আবুরুয়াঁ, শব্‌নম্, জাম্‌দানী, মস্‌লিন্,
স্বপ্নের কিঙ্খাব নিয়ে এস সঙ্গে।

ঘরে ঘরে আরবার ঠাঁই নাও আপনার
চারুতায় ছাই দাও মিল্-মেড্ শিল্পে,
কারু-ছত্রের ছাতা ! বিশাইএর হাতিয়ার !
গেঁথে তোলো গ্রামে গ্রামে ঋদ্ধির পিল্লে।

"যা কিছু নিজের বশে সেই সুখ-স্বর্গ"
প্রতি গৃহ-কোণে রহি দাও এই মন্তর,
চির-দুর্ভিক্ষের কর তুমি উচ্ছেদ
মর্য্যাদা-বোধে ভর গরীবের অন্তর।

শিশিরে যেমন ক'রে পালক গজিয়ে তোলে
প্রকৃতির ইঙ্গিতে পাখীদের অঙ্গ,
কল্যাণে চরকার আপনার দর্‌কার
পূরণ করুক আজ সেইমত বঙ্গ।

পর প্রত্যাশা ছার দূর হোক সবাকার
নিঃস্বে স্বয়ম্প্রভু হোক উদ্‌বুদ্ধ।
পতিতা ত্যজিয়া পাঁক সৎপথে ভাত পাক্
অবিরোধে মরণের দ্বার হোক রুদ্ধ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

খুনী

ঝঞ্ঝাময়ী রজনী। রুদ্ধদ্বার সুপ্তগৃহ নগরের বিজন পথে ক্ষুব্ধ বাতাস মৃত মত্ত আত্মার মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, কাজল-মেঘ হইতে আকুল বারি-ধারা অবিশ্রাম ঝরিতেছে ; কে যেন তাহার ঘন-কৃষ্ণ মুক্তবেণী দিয়া বিশ্ব-চরাচরকে বেষ্টন করিয়া আপন উন্মুক্ত কবরী বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল নখ দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বুভুক্ষু অন্তরের আর্ত্তনাদ-মুখর ঘন তমিস্রপুঞ্জে অবিশ্রাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

এই ঝড়ের রাত্রে হর্ষ-শঙ্কা-কম্পিতা চকিত-চরণা অভিসারিকার মত বৃষ্টি-স্নাত একখানি লাল মোটর-কার বৃক্ষশ্রেণী-মর্ম্মর মুখর বারি-কল-ধ্বনিময় নগরের জলপূর্ণ পথে পথে ঘুরিতেছে ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে বড় রাস্তার এক রুদ্ধদ্বার অন্ধকারনিমগ্ন স্তব্ধ প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দুয়ার খুলিয়া গেল। গৃহ হইতে বিদ্যুতের তীব্র আলোক-স্রোত বারিসিক্ত মোটরে পড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল। দ্বারবর্ত্তিনী এক সুন্দরীর লালসা-তীব্র মধুর কটাক্ষে ষ্টীয়ারিং হুইল ছাড়িয়া মোটরের দরজা খুলিয়া প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক বসন্ত বাহির হইয়া,

রূপাজীবার পুষ্পবল্লীসম স্বর্ণবলয়াঙ্কিত হস্ত আপন হস্তে জড়াইয়া, রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাফলসম লাল শাড়ী জড়ানো অরুণ তনুর উত্তাপ আপন জল-সিক্ত দেহে ছড়াইয়া প্রমুগ্ধ হইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সুন্দরী ধীরে রক্তগোলাপ রক্তপদ্মকদম্বকেতকী-বিকচ সুকোমল শয্যায় তাহাকে বসাইল, দ্বার বন্ধ করিয়া, বিদ্যুতের প্রখর আলোগুলিতে লাল-নীল কাপড়ের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, বসন্তর পায়ের তলায় বসিয়া এস্রাজ লইয়া গান ধরিল,—

আজু রজনী হম ভাগে গমাওনু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।

সঙ্গীতের সুরে-সুরে সুন্দরীর রক্তগোলাপ-মাল্যবিজড়িত মুক্তকৃষ্ণ কেশদাম, ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারা, উন্নত বক্ষস্থল, সুঠাম কটি, অলক্তক-রাঙা চরণ দুলিয়া উঠিতে লাগিল। বসন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত গায়িকার দিকে চাহিয়া রহিল—সে এক সুধা-গরল-মিশ্রিত লালসা-তৃষ্ণাতপ্ত প্রেমাশ্রু-রক্ত ফেনিল জ্বালাময় পরম তৃপ্তি! সেই অনল-সম দেহসুধাভরা মোহিনী সর্পিণীসম সুন্দরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বসন্তর তরুণ কোমল মুখ তপ্ত হইয়া উঠিল—কি সুতীব্র জ্বালাময় আনন্দে দেহ চঞ্চল হইল, উন্মত্তের মত উঠিয়া সে এস্রাজ-শুদ্ধ সুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিল। এস্রাজের কয়েকটি তার ছিঁড়িয়া গেল, বাদ্যযন্ত্রের আঘাত গীতসুরদীপ্ত রক্তিম গণ্ডে লাগাতে সুন্দরী ভয়ে একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই দীর্ঘ আঁখিপক্ষ্মে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিল! এস্রাজ সরাইয়া যুবককে একটু ঠেলা দিয়া সে বসাইল। বসন্ত ধীরে তাহার সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেট হইতে এক সোনার হার বাহির করিয়া সুন্দরীর গলায় পরাইয়া দিল, তারপর তাহাকে মাদক বেষ্টনে জড়াইয়া পুষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

পাইয়াছে, সুন্দরীকে সে পাইয়াছে তাহার বক্ষে,

জীবন-যৌবন সফল করি মানল
দশদিশি ভেল নিরনন্দা।

সুন্দরী তাহার, অনন্তকালের জন্য তাহার—এ সুখ-পাশ হইতে তাহাকে সে কখনও ছাড়িবে না! ধীরে ধীরে বসন্ত সুন্দরীর সাপের মত কোঁকড়ানো চুলগুলি মুক্তার হার-জড়ানো সুন্দর গলায় জড়াইয়া তাহার সহিত সোনার হার জড়াইয়া খেলা করিতে লাগিল। সুন্দরী কোন্ অসহনীয় বেদনাময় সুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, মুখে কথা ফুটিতেছিল না, শুধু চোখদুটি বলিতেছিল, এ স্বর্গ! কোন্ মদিরাসম তীব্র সুখে পাগল হইয়া বসন্ত কেশে-জড়ানো সোনার হার গলার দড়ির মত করিয়া টানিতে লাগিল। একবার সুন্দরী একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল, কিন্তু সে ব্যথায় নয়, অপরিমেয় অসহ্য সুখে। আরও নিবিড় আরও নিবিড় গভীর করিয়া বসন্ত সোনার হার গলায় জড়াইয়া টানিতে লাগিল—ধীরে সুন্দরীর নিশ্বাস রোধ হইল, শিরা-উপশিরায় রক্তের কল্লোল বন্ধ হইল, তপ্ত সুবাসময় তনু নিস্পন্দ হইয়া এলাইয়া পড়িল। কিন্তু বসন্ত দেখিতেছিল, তাম্বুলরঞ্জিত অধরে বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল নয়নে, এলায়িত তনুর রেখায়-রেখায় কি ছন্দে গান বাজিতেছে,—

আজু রজনী হম ভাগে গমাওনু
পেখল পিয়া-মুখ-চন্দা।

অন্তরের শিরা-উপশিরা কিসের প্রবাহে

উন্মত্ত হইয়া কলধ্বনি করিতেছে। গোলাপ-মালা-জড়ানো মাথা সে হাতে তুলিয়া লইল, মাথা এলাইয়া তাহার কোলে লুটাইয়া পড়িল। তখন সে কুসুম-শয়ন পাতিয়া অতিস্নেহের সহিত সুন্দরীর নিস্পন্দ তনু সুন্দরভাবে শয্যায় শোয়াইয়া পাশে বসিয়া ক্ষুধিত মুগ্ধ নেত্র দিয়া চাহিয়া রুদ্ধদ্বার স্তিমিত-রঙীন-আলোময় বিজন গৃহে মধুর মিলন-রাতি যাপন করিতে লাগিল।

বাহিরে শ্রাবণ-গগনে তিমির-শয্যা পাতিয়া কে ক্ষুব্ধ হাহাকারে অবিশ্রাম অশ্রুজলে আকুল করিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছে।

বাহিরে তখন বৃষ্টি ধরিয়াছে, মাতালের চোখের মত ঘোলাটে আকাশ—প্রভাতের আলো কালো মেঘের যবনিকার ভিতর দিয়া পৃথিবীতে পৌঁছাইবার কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

রুদ্ধ দুয়ারে কে যেন আঘাত করিল। বসন্ত পাগলের মত শান্তিহারা চঞ্চল হইয়া এতক্ষণ ঘরের এক কোণ হইতে অপর কোণে বাক্‌হীন লুকাইয়া বেড়াইতেছিল। কখনও এ কোণের চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করে, কিন্তু কিছুক্ষণ থাকিয়াই মনে হয়, সে সুন্দরী উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছে,—অমনি উঠিয়া গিয়া ও-কোণের টেবিলে মুখ গুঁজিয়া পড়ে। মনে হয়, ওই বুঝি শায়িত দেহ নড়িয়া উঠিল! আলনা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত নয়নে শয্যাবলুণ্ঠিতার দিকে চাহিয়া থাকে,—সে দেহ কি একবারও একটুও নড়িবে না?

দরজায় আবার যেন আঘাত হইল। বসন্ত অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কম্পিত পদে অবলুণ্ঠিত তনুর দিকে অগ্রসর হইয়া সুন্দরী-দেহের আনন-কপোল বক্ষ-হস্ত-পদ সব স্থান আপন তপ্ত হস্ত দিয়া স্পর্শ করিল। না, না, সে খুন করে নাই, কখনও খুন করে নাই—তবু হস্তে সে মাদক স্পর্শ কোথায়! বক্ষে সে সৌরভময় উত্তাপ কোথায়! কোথায় সেই দেহ-এস্রাজে রক্ত-ধারার ছন্দে মিলনের গান? ভীত নয়নে দরজার দিকে সে চাহিল, তারপর মৃত সুন্দরী-দেহের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে পলাইতে চায়, পারিতেছে না, সুন্দরীকে আবার ছুঁইতে গেল, যেন কোন্ আলো-ছায়াময় পঙ্কিল পথে মৃত সাপের স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল! সুধা-গরল-মিশ্রিত সে স্পর্শ সে পঙ্কিল মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে, টানিতেছে, একবার পলাইয়া আবার ছুটিয়া আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে সে হস্ত বুলাইল, সুন্দরীর হাতে তাহার হাত পড়িয়া গেল, সেই শীতল কোমল হাত যেন তাহার হাত দুইটিকে অতি-দৃঢ় বাঁধিতেছে! জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া গিয়া সে দরজা খুলিল। সত্যই এ মৃতা! বসন্ত চেঁচাইতে চাহিল, 'খুন, খুন'—কে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। পিছনে কাহার পদশব্দ! ফিরিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই! গলিতে সে বাহির হইয়া পড়িল। সামনে মোটর পড়িয়া রহিয়াছে, উঠিয়া চালাইতে চাহিল, মোটর অচল হইয়া বসিয়া গিয়াছে, চলিতে কিছুতেই চায় না! ষ্টীয়ারিং হইলে এ কাহার এলোচুল জড়ানো! চীৎকার করিয়া মোটর ছাড়িয়া বসন্ত লাফাইয়া পড়িল। ওই, আবার কাহার পায়ের আওয়াজ, গলির মোড়ে ও কাহারা চুপে চুপে কথা কহিতেছে! ফিরিয়া না তাকাইয়া সে সম্মুখে দৌড় দিল! গলির

বাঁকে মিউনিসিপ্যালিটির মেথরদের একখানা গাড়ী প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল,—মহিষের মত কালো এক মেথরের ছেলে তাহাকে মাতাল ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল।

ছুটিতে ছুটিতে শ্রান্ত হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া সে দাঁড়াইল। কিন্তু মোড়ের পুলিস তাহারই দিকে যেন চাহিয়া রহিয়াছে। সে হাঁফাইতেছে, পা ব্যথা করিতেছে, আর ছুটিতে পারে না, ধরুক্ তাহাকে ;—সে ত সত্যই খুন করে নাই। পুলিস তাহাকে ধরিল না। সে সাহস দেখাইয়া পুলিসের গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। কিছুদুর গিয়া দেখিল, সেই পুলিসটা আর কয়েকজনের সহিত কি কথা কহিতেছে, তাহার দিকে চাহিতেছে। এবার নিশ্চয় জানিয়াছে—বসন্ত ছুট দিল।

ক্ষান্ত-বর্ষণ বর্ষা-প্রভাতে জন-বিরল পথ ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পথের পাশে মুদির দোকান, খাবারের চায়ের দোকান একে একে সব খুলিতে লাগিল। গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী মোটরকারের শব্দে মুখর জনস্রোতপূর্ণ হইয়া সহরের পথ সজাগ হইয়া উঠিল। বিপুল জনস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া, লোকের ভিড়ে আপনাকে লুকাইয়া, গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে মনকে ডুবাইয়া বসন্ত বারবার শান্ত হইতে চেষ্টা করিল, বার বার কোন্ অশান্তি ভূতের মত ভয়ের দুঃস্বপ্ন-জাল রচনা করিয়া কাণে কাণে বার বার বলে, পালাও, পালাও, আরো দূরে, আরো দূরে। কখনও সে লোক-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া বরাবর সোজা চলে, কখনও কোন জন-বিরল

হইয়া পড়ে। এই বেগবান জনপ্রবাহ তাহার কাছে ছায়া, কোন্ অবাস্তব মায়ার মত বোধ হইতে লাগিল,—যেন ছবির স্রোত ভাসিয়া, স্থূল বাস্তব জগৎ ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে, সেই জগৎ-স্রোতে ভূতের মত সে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল, পায়ের তলায় মাটি যেন দৃঢ় শক্ত নয়, চারিদিকে ছায়াবাজির খেলা—এইবার বুঝি একটা সংঘাত-বিপ্লব হইবে, ওই মোটরের সহিত ঘোড়ার গাড়ীর, ট্রামের সহিত মহিষের গাড়ীর বুঝি ঠোকাঠুকি হয়! কিন্তু কিছুই হইল না দেখিয়া সে যেন একটু আশ্চর্য্য নিরাশ হইয়া উদাসভাবে তাকাইয়া থাকে। দূরে কয়েকজনে মিলিয়া চুপে চুপে কি পরামর্শ-ষড়যন্ত্র করিতেছে, অমনি বসন্ত জোরে ছুটিয়া চলে। সে কোথায় যাইতেছে তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, মগ্নচৈতন্য লোক হইতে কোন্ অজানা শক্তি তাহাকে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে!

চলিতে চলিতে সহসা সে দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। পথের উপর তাহার পায়ের সামনে ফুটপাথে সেই সুন্দরীর মন-মাতানো মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, ওই নড়িতেছে! চমকিয়া উঠিয়া নত হইয়া সে দেহ সরাইতে যায়, কর্দ্দমাক্ত ফুটপাথে দুই হাত বুলাইয়া পথের কাদা ঘসে, সে দেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা অদৃশ্য হইয়া যায়! কোন পথিক বলে, পকেট থেকে পয়সা পড়ে গেছে, মশাই? পানওয়ালী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, মুসলমান ছেলের দল হাসিয়া ওঠে। বসন্ত বরাবর কাদা মাখা হাত ঘসিয়া ঘসিয়া

সে খুন করে নাই! ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়া উদ্দীপ্ত নেত্রে চারিদিকের জনস্রোতের দিকে সে চায়। কি সৌন্দর্য্যহীন পথ, কি কুৎসিত জনপ্রবাহ! ওই জলের কলে যে নারীরা জল লইতেছে, কি কুৎসিত কদাকার তাহারা—কি কদর্য্য ওই বারাঙ্গনার মুখটা, ওই মুসলমানের কালো দাড়ি সে টানিয়া ছিঁড়িয়া দিতে চায়! অফিসের কেরাণীরা ছুটিতেছে, কাহারও মুখে একটুও সৌন্দর্য্য নাই। কেন মানুষের সহিত মানুষের ঘাতপ্রতিঘাতে একটা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয় না? মোটরে কাহাকে দেখিয়া ভয়ে আবার সে চলিতে আরম্ভ করে।

এইরূপে মেঘসমাচ্ছন্ন প্রভাত ভীতোন্নত হইয়া ঘুরিয়া দ্বিপ্রহরে বসন্ত নগরের প্রান্তে জীর্ণ প্রাসাদ ও তৃণ-কুটীর-সমাকীর্ণ পল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। আকাশ সাপের কুণ্ডলীর মত কালো মেঘে ভরা, বাতাস আর্দ্র, পথ জনবিরল। অতি অবসন্ন হইয়া পথের পাশে গাছের তলায় সিক্ত ভূমিতে সে বসিয়া পড়িল। সে নগর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে, এখানে কোথাও কেহ নাই দেখিয়া মন কিছু শান্ত হইল। কিন্তু মনে শান্তি-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুক কিসের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল; তাহার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, কণ্ঠের তালু জ্বলিতেছে। জল, কোথায় জল? আকাশ ভরিয়া জল রহিয়াছে, দূরে পুষ্করিণীতে জল রহিয়াছে, কিন্তু তাহার মুখে একবিন্দু জল কে আনিয়া দিবে! সে এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে উঠিয়া গিয়া জল পান করিবার শক্তি ছিল না, ভূমিতে মুখ গুঁজিয়া জলসিক্ত তৃণগুলি জিহ্বা দিয়া চাটিতে লাগিল। একটু জলের আস্বাদে প্রাণ আরও তৃষিত হইয়া উঠিল। দূরে পুকুরের পাড়ে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। আপনাকে কোনমতে টানিয়া টানিয়া পুকুরের তীরে সে গিয়া পৌঁছিল, কিন্তু জলে মুখ দিতে গিয়া নিজের মুখের ছায়া দেখিয়া জলে মুখ দিতে পারিল না, আবার মুখের ছায়া দেখিল, আবার মুখ ফিরাইল। ওই কি তাহার মুখ! কিশোরীর মত কোমল গণ্ড এত দৃঢ়, এত রুক্ষ হইয়া গিয়াছে, নির্ম্মল চোখ এত কালি-ভরা। তাহার মাথায় ত সাদা চুল ছিল না, এ কি তাহার যৌবনের ব্যঙ্গ ছবি! অবাক হইয়া নিজের বেশভূষার দিকে সে তাকাইল। পায়ের লাল সেলিম শু ছিঁড়িয়া কাদায় ভরিয়া কালো হইয়া গিয়াছে, লালজরির পাড়ওয়ালা দেশী ধুতি ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত, সিল্কের পাঞ্জাবী ভিজিয়া কাদার ছাট লাগিয়া কি কদর্য্য! সে শুধু কুৎসিত নয়, সে বীভৎস, ঘৃণার যোগ্য! কিন্তু আপন কদর্য্যতা সম্বন্ধে দুঃখভোগ করিবার সময় বেশী ছিল না, জলের তৃষ্ণায় গলা জ্বালা করিতেছিল, সকল দুঃখ ভুলিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া বসন্ত শ্রান্ত হইয়া ঘাটে লুটাইয়া পড়িল।

তবু বুকের জ্বালা যায় না, পেট ঘড়ঘড় করিতেছে, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। যে প্রতিদিন চার-পাঁচবার করিয়া খায়, আজ বিশঘণ্টা কিছু খায় নাই। কেহ এক কাপ চা আনিয়া দেয় না? নিশ্চয় কাছে চায়ের দোকান আছে, কিন্তু উঠিবার যে একটুও শক্তি নাই। দূরে পথে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করিয়া ভীষণ চীৎকার তুলিল, বসন্ত

মুখ ফিরাইয়া দেখিল, গাছের তলায় একটি মোটর দাঁড়াইল, তাহা হইতে তিনটি পুলিস কন্‌ষ্টেবল্‌ ও একটি ইন্‌স্‌পেক্টর নামিতেছে। আপনার অজ্ঞাতে সে দাঁড়াইয়া উঠিল, পাশের বাঁশবনের মধ্যে ছুটিয়া গেল—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, কাদায় অর্দ্ধেক পা ডুবিয়া গিয়াছে, মাথায় পিঠে বুকে বাঁশের ডগা পাতা লাগিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত—সেই তৃষিত ক্ষিপ্ত ভীত কম্পমান মূর্ত্তি লইয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শূন্য মোটরের দিকে সে চাহিয়া রহিল। পুলিসেরা গ্রামের ভিতর ঢুকিয়াছে। কত যুগ কাটাইয়া পুলিসের দল ফিরিল, মোটরে করিয়া নগরের দিকে চলিয়া গেল। মোটর-কারের শব্দ যখন আর শুনা গেল না, বসন্ত তখন ধীরে ধীরে বাঁশবন হইতে বাহির হইল। তথায় ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য। মরিতে হয়, না খাইয়া মরিবে না, খাইয়া সে পুলিসে ধরা দিবে।

কিছুক্ষণ পরে সেই রুক্ষকেশ শীর্ণমুখ কর্দ্দমাক্ত মলিন মূর্ত্তি এক খাবারের দোকানের সামনে গিয়া প্রদীপ্ত প্রখর দৃষ্টি দিয়া খাবার গুলির দিকে চাহিয়া অস্পষ্টস্বরে অস্ফুট ভাষায় কি বলিল। দোকানদার সে তরুণ যুবকের কদর্য্য মলিন মূর্ত্তির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া বুঝিল না, সে খাবার চাহিতেছে, না ভিক্ষা চাহিতেছে! ভিক্ষুক ভাবিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলে বসন্তর রাঙা চোখ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, কম্পিত হস্তে পকেটে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতে গেল; কিন্তু কোন পকেটেই মণিব্যাগ খুঁজিয়া পাইল না, সকালে সহরে কুখ্যাত পকেট-কাটা তাহার মণিব্যাগ চুরি করিয়াছে, তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে! সঙ্গে টাকা নাই দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, চোখ জ্বলিতে লাগিল। দোকানী তাহার দিকে সন্দিগ্ধ ঘৃণিত নয়নে তাকাইয়া আছে। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আঙুল হইতে হীরক-খচিত দুই স্বর্ণ-অঙ্গুরী খুলিয়া দোকানীর সম্মুখে ধরিয়া ক্ষুব্ধস্বরে সে বলিল—খাবার দোকানদার বিদ্রূপ-হাসি হাসিয়া সে আংটি লইতে রাজী হইল না। সে গরীব মানুষ,—সোনার আংটি লইয়া কি চোর বলিয়া শেষ ধরা পড়িবে? তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া চলিয়া যাইতে বলিল ক্ষোভে ক্রোধে ক্ষুধা-লজ্জা-ঘৃণায় বসন্তর সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল, দোকানীকে সে মারিতে ছুটিল। সহসা দোকানের কোণে চার-পাঁচ জন কদাকার পুরুষ মিলিয়া সেখানে কি ফিস্‌ফিস্‌ করিতেছে দেখিয়া দ্রুতপদে বসন্ত দোকান ছাড়িয়া চলিল।

কিন্তু বেশী দূর তাহাকে যাইতে হইল না। জন-হীন পথের ধারে এক গাছের তলায় আসিতে কয়েকজন বলিষ্ঠ মুসলমান তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়া আক্রমণ করিয়া হাত হইতে আংটি দুইটি ছিনাইয়া লইল। বসন্ত প্রথমে একজনকে এক ঘুসি মারিল, তারপর স্ব-ইচ্ছায় আংটি দিয়া জানাইল, তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, সে কিছু খাইতে চায়। একটা লাল লুঙ্গি-পরা বসন্তের দাগভরা মুখ মুসলমান হাসিয়া তাহাকে পথের কাদা দেখাইয়া দিল, কিন্তু একটি তরুণ মুসলমান যুবক পকেট হইতে একটি টাকা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বসন্তর পা কাঁপিতেছে, বুক ধপ্‌ ধপ করিতেছে, পেট গড় গড় করিতেছে, কম্পিত

হস্তে পথের কাদা হইতে টাকাটি তুলিয়া লইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই খাবারের দোকানের সামনে আসিয়া দোকানীর গায়ে টাকাটা সে ছুঁড়িয়া মারিল। দোকানদার প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তারপর তাহার অসহায় করুণ অবস্থা দেখিয়া ব্যথায় মন ভরিয়া গেল, এক টাকার খাবার ঠোঙায় করিয়া তাহার হাতে দিল। হিংস্রভাবে দোকানীর হাত হইতে খাবারের ঠোঙাটা ছিনাইয়া লইয়া বসন্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত অতি দ্রুতবেগে কচুরি সিঙাড়া সন্দেশ রসগোল্লা সব খাবার ব্যগ্রভাবে মুখে পুরিয়া নিমেষের মধ্যে নিঃশেষিত করিল। তাহাকে অত তাড়াতাড়ি খাইতে দেখিয়া দোকানদার ভয় পাইয়া বার বার সাবধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। খাবার শেষ করিয়া বসন্ত জল চাহিল। এক বড় ঘটির এক-ঘটি জল একেবারে পান করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে নিঃশব্দে সে দোকান ছাড়িয়া গেল।

গ্রাম ছাড়িয়া সে বেশীদূর যাইতে পারিল না, গা বমি-বমি করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, পা টলিতেছে; খালের ধারে ক্ষেতের পাশে এক গাছের তলায় বসিয়া পেটের ব্যথায় অস্থির হইয়া ছটফট করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যাহা খাইয়াছিল, সব বমি হইয়া গেল। সমস্ত অন্তর ক্ষোভে বিদ্রোহে জ্বলিয়া উঠিল। কাহাকে যেন সে অভিশাপ দিতে চায়, বিদ্রোহ করিতে চায়। হায় বিধাতা, কি পাপ সে করিয়াছে, যে ক্ষুধার সময় সময় খাইবার পরিতৃপ্তি হইতেও সে বঞ্চিত! বিশ্বলক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দ্বার তাহার নিকট বন্ধ হইল! বেশ, আজ সে সয়তানের পক্ষ লইয়া ঈশ্বরের সহিত লড়িবে, সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণ স্তব-গানপ্রিয় শক্তিময় বিশ্ব-বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে।

সে জঘন্য স্থানে সে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়াও কিন্তু বেশীদুর যাইতে পারিল না, আর এক গাছের তলায় ক্ষিন্ন অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়াও শান্তি নাই। কে তাহার পার্শ্বে শুইয়া তাহার তুষার-সম হিমস্পর্শে মাদক-বেষ্টনে তাহাকে জুড়াইতেছে। উঠিয়া পলাইতে গিয়া আবার সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে সুপ্তি আসিল, কিন্তু সে নিদ্রাও দুঃস্বপ্নময়। বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ জলাকার পথ দিয়া সয়তানের রথের মত সে মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে, আর তাহার পাশে কে সুন্দরী সর্পসম বাহু-আলিঙ্গনে জড়াইয়া ষ্টীয়ারিং হইলে ঘুরিয়া গেল, মোটর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোন ঘনতমিস্র-পুঞ্জে পড়িতেছে, পড়িতেছে,—একরাশ কালো চুল, তাহার মধ্যে এক সোনার সাপ খেলা করিতেছে!

এইরূপ দুঃস্বপ্নময় নিদ্রা যখন ভাঙিল, তখন রঙীন বর্ষা-সন্ধ্যা। দক্ষিণের আকাশ নীল, পশ্চিমে পুঞ্জীকৃত মেঘস্তূপে সন্ধ্যাসূর্য্যের রক্তিম আলোকচ্ছটা, উত্তরে মেঘের ঘন ঘোরঘটা। খালের কালো জল রাঙা হইয়া টলমল করিতেছে, সম্মুখে স্বর্ণ-শীর্ষ ধান্যক্ষেত্র গোধূলির আলোকে নাচিতেছে, বারি-স্নাত তৃণগুলি ঝিকমিকি করিতেছে। কিন্তু এ অপরূপ সন্ধ্যাশ্রী বসন্তর চোখে পড়িল না, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যালোক হইতে সে যেন নির্ব্বাসিত, মন ভয়-বিভীষিকাময় পঙ্কিলকারার

বেদনায় বন্দী। প্রদীপ্ত নেত্রে সে দেখিতেছিল ওই কালো মেঘরাশি কাহার মুক্ত কবরী, কাহার অরুণ-তনু পশ্চিমাকাশের স্বর্ণশয্যায় শুইয়া, আলোকরশ্মি স্বর্ণহারের মত তাহাকে জড়াইতেছে। তবু, এই স্নিগ্ধ বর্ণবৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যলোক তাহার মনকে শান্ত করিল।

সহসা এক বাঁশীর শব্দে সে সচকিত হইয়া উঠিল। খালের ওপারে এক বাউল বাঁশী বাজাইতেছে। তাহার তপঃক্লিষ্ট মেদরিক্ত সুঠাম দেহ সন্ধ্যার আলোয় আকাশের রাঙা পটে এক কালো ছবির মত আঁকা, ব্যাকুল ধেনুর মত বাঁশীটি সুরের হাওয়ায় কাঁপিতেছে। বাউল বাঁশীর তানে সারা দিনের গান সন্ধ্যা দেবীর পায়ে নিবেদন করিতেছিল। প্রভাতে নীড়ে নীড়ে পাখী-কলরবে যে গান ধ্বনিত হয়, জাগ্রত শিশুর কলহাস্যে মঙ্গলকর্ম্ম-রতা গৃহিণী-কঙ্কণে গৃহে গৃহে যে গান বাজে, পথে পথে রথ-ঘর্ঘরে পথিকের পদধ্বনিতে যে গান ওঠে ; বর্ষার বারি-ঝরঝরে বেণুবনের মর্ম্মরে খালের জলের কলধ্বনিতে প্রকৃতি-দেবীর পায়ের নূপুরের রিনিঝিনির মত যে সঙ্গীত—সুরে সুরে বাঁশী পুরিয়া বাউল একে একে সব গান গাহিতেছিল।

সে-বাঁশীর সুর শুনিতে শুনিতে বসন্ত আকুল হইয়া উঠিল, তপ্ত শুষ্ক চোখ জলে ভরিয়া আসিল, অস্ফুট আর্ত্তনাদে ভিজা ঘাসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাঁশীর তানে তাহার প্রাণে কান্নার জোয়ার আসিল। ধীরে ধীরে তাহার মনে পড়িল কলেজের বন্ধুর কথা, সে যে-মেয়েটিকে ভালোবাসে তাহার কথা—ছোট বোন দাদা আসে নাই বলিয়া কত না রাগ করিয়াছে, কতবার দরজায় ছুটিয়া আসিয়াছে, কতবার না মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর তাহার মা পুত্র-হারা হইয়া তাহারি মত বুঝি নিরন্ন রহিয়াছেন। বাউল বাঁশী বাজানো শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। বসন্তর চোখের কান্না আর কিছুতেই থামিতে চায় না। বেদনা, অসহনীয় জ্বালাময় বেদনায় অন্তর ছিঁড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া তীরে গিয়া সে জলে নামিতে আরম্ভ করিল, বুক ডুবিল, গলা পর্য্যন্ত ডুবিল, তবুও যাতনার নিবৃত্তি নাই!

দৃঢ় পদে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া নগরের দিকে দ্রুত সে চলিতে আরম্ভ করিল। সেই ক্ষিন্ন পিপাসিত অবসন্ন ভীতি-ক্লিষ্ট দেহটাকে কোন্ অজানা প্রবল শক্তি টানিয়া লইয়া চলিল।

পথে যাইতে যাইতে, এক গলির মোড়ে সে দেখিল, ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া এক তরুণী মাতা শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া চাঁদ দেখাইতেছে। ইচ্ছা হইল, একবার যদি ওই নবীন কোমল শিশুকে তাহার বুকে দেয়, সে প্রাণ ভরিয়া চুমু খায়! ছুটিয়া গিয়া হয়ত শিশুকে ছিনাইয়া লইবে, এই ভয়ে সেখান হইতে সে ছুট দিল।

এক চায়ের দোকানে কয়েকটি যুবক আনন্দে চা পান করিতে করিতে গল্প করিতেছে। এক কাপ গরম চা এখন তাহার কাছে স্বর্গ! লোভ দমন করিয়া জোরে সে পথে চলিল।

সুসজ্জিত আলোক-দীপ্ত গৃহে সুন্দরী গায়িকা গাহিতেছে, পাশে এক তরুণ যুবক বসিয়া। কাল রাত্রে ওই যুবকের চেয়েও সে কত সুন্দর,

কত আনন্দে ছিল ! নিমেষের জন্য মুক্ত দ্বারের নিকট দাঁড়াইল ; তারপরে ভয় হইল, হয়ত পাগলের মত ওই তরুণীর দিকে সে ছুটিয়া যাইবে। মাটি হইতে আপনাকে যেন সে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিল।

রজনী আঁধার হইয়া আসিতে লাগিল। সব ছায়া, মায়া, স্বপ্ন,—এই কৃষ্ণ প্রাসাদ-শ্রেণী, কম্পিত আলোকমালা, এই বেগবান শকটস্রোত, ধাবমান জনপ্রবাহ, সব কোন্ ভূতলোকের বায়স্কোপের ছবির মত। সমস্ত জীবন একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্ন, সুখ শুধু নিদ্রায়,—সে নিদ্রাও যে দুঃস্বপ্নময় হইয়াছে !

পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া বসন্ত চলিতে লাগিল।

রাত্রি গভীরা, আবার ঝঞ্ঝাময়ী উন্মাদিনী হইয়া উঠিল। শ্রাবণ-ধারায় আপনাকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া বসন্ত চলিল।

মোটর লইয়া রূপাজীবার বাড়ীতে গতরাত্রে যখন পৌঁছিয়াছিল, ঠিক সেই সময় সেই বাড়ীতে আসিয়াই রুদ্ধদ্বারে সে আঘাত করিল। প্রহরী পুলিশ তখন বেশ নিদ্রা দিতেছিল, এরূপভাবে ঘুম ভাঙ্গাতে গালাগালি দিয়া চটিয়া সে দরজা খুলিল।

'আমি খুনী' বলিয়া কম্পিত পদে বসন্ত ঘরে ঢুকিল। তাহার বিপর্য্যস্ত দীর্ঘ কেশ ঝরিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া জল পড়িতেছে, বারিধারায় জামা-কাপড়ের সব কাদা ধুইয়া গিয়াছে, সিক্ত শুভ্র বসনে দীপ্ত মুখে বিদ্যুতের আলো ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। এ আবার কোন আপদ আসিল ভাবিয়া পুলিসটা ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল।

শূন্য শয্যায় কয়েকটি শুকনো ফুল-পাতা পড়িয়া আছে। বাহিরের প্রমত্ত শ্রাবণ-রাত্রির মত উদ্বেলিত অন্তরের অশ্রু-বর্ষণে ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদে শূন্য গৃহ ভরিয়া বসন্ত শূন্য শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

দেন্‌দার

বাগান-বাড়ি বিকিয়ে গেছে—টান পড়েছে বাস্তুতে,
পুঁজি-পাটা যা ছিল তা লুটে নিল পাঁচভূতে,
এবার জ্বালিয়ে দিয়ে নীল বাতি
গাছতলা সার করতে হবে পরতে হবে পাঁচ-হাতি,
পালিয়ে বেড়াই ধরবে কবে আদালতের যমদূতে।

পাওনাদারে দিইনা-গালি, তার যেন না কেউ মরে,
পুত্র-পৌত্র তস্য পুত্র মনের সুখে ভোগ করে,
ওসে করলে বটে দিগ্‌দারি,
পাওনা-গণ্ডা কেইবা ছাড়ে ? তারেই কেন গাল পাড়ি ?
কেউ-বা আসল বাড়ায় সুদে কেউ-বা সুদের সুদ ধরে !

বাবার নিজের হাতের পোঁতা উঠোনে কৎবেলগাছে,
নতুন মালিক এসে যদি ভয় হয় কোপ্ খায় পাছে !
মার লক্ষ্মীপূজোর ভোগ-ঘরে
নিত্য-ধোয়া গঙ্গাজলে ম্লেচ্ছয়ানী কেউ করে !
দেউলে যে জন তার কেন মন হয় গো এমন সাত-পাঁচে ?

পরিবারের গয়নাগাঁটি দিয়েছি ত সব ফুঁকে,
একরতি তিল নেইক সোনা চাইব যে ধার কোন্ মুখে ?
ওমা কেমন ক'রে দিন চলে !
ময়রা মুদি গয়লা এদের ঠেকিয়ে রাখি কোন্ ছলে ?
সাতশো কথা অপমানের মুখ ফুটে কয় বুক ঠুকে।

বন্ধুজনে এড়িয়ে চলে, আয়না আমল আর মোটে,
দেখলে—ভাল ? কেমন ! ভাল ?—শুক্‌নো হাসি বয় ঠোঁটে,
তারা আদর-খাতির সব জানে,
মানুষ বুঝে যত্ন-আদর অবজ্ঞারি বাণ হানে,
ঘৃণার কাঁটা কোথাও,—কোথাও আপ্যায়নের ফুল ফোটে !

মেয়েটা এই ভুগছে জ্বরে ভিজিট দেবো কোত্থেকে ?
ডাক্তারে চায় নগদ নগদ বাজার-খাতির নাই দেখে !
ওসে যায় যদি সে যাক্ মরে,
কাঠের পয়সা না জোটে তোর মাটি খুঁড়েই দিস্ গোরে,
ষাট্ ষাট্ ষাট্, বাছা আমার, অদৃষ্টে তোর এই লেখে ?

দুবেলা পেট চলতো যাদের ঠাকুরদাদার পায় ধরে,
তাদের বংশধরেরা আজ কর্‌বে আমায় একঘরে !
আমার এই দুনিয়ায় ঠাঁই কোথা ?
ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর মাটিতে আর নেই পোঁতা,
থাক্‌লে পরে বুঝে নিতুম ; লড়বো এখন কার জোরে ?

নেই কোন দোষ ভাগ্যদেবীর, লক্ষ্মী বড় চুলবুলে,
এই ছিল এই পালিয়ে গেল খিড়্‌কি দোরের খিল খুলে,
ওমা এম্‌নি সে এক ছুট্ দিলে,
মিথ্যে তার আর পিছু ধাওয়া ; ফেল্লে বিষম মুস্কিলে !
দুষ্টু মেয়ে ফিরবে কি আর ? চাইবে ফিরে মুখ তুলে ?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

ইয়াঙ্কি স্থানে বাঙালী-মল্ল

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রান্স কোন হোটেলের প্রান্তে বসে আহার কর্‌ছিলেন। এমনসময়ে চারিদিকে একটা সোরগোল উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, দিগ্বিজয়ী ফরাসী মুষ্টি-যোদ্ধা কার্পেনটিয়ারও সেই হোটেলের মধ্যে আস্‌ছেন—তাঁর পিছনে এক বিপুল জনতা !

জনতার মুখে কার্পেনটিয়ারের নামে উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি শুনে ফ্রান্সের এক ভক্ত বন্ধু দুঃখিতভাবে বল্‌লেন, "সাধারণ লোকের চরিত্র দেখুন ! আপনি অতুল পাণ্ডিত্য আর প্রতিভার অধিকারী,—কিন্তু ঐ জনতা কার্পেন-টিয়ারের মত পালোয়ানকে যেমন আদর কর্‌বে, আপনাকে কখনোই ততটা কর্‌বে না !"

ফ্রান্স বল্‌লেন, "বন্ধু, এজন্যে দুঃখিত হবার



কার্পেন্‌টিয়ার

কোন কারণ নেই—এ তো আনন্দের কথা! কার্পেনটিয়ার যে সম্মান পাবার যোগ্য পাত্র! আমাদের এই বিংশ-শতাব্দীর বৈচিত্র্যহীন জগতে কার্পেনটিয়ারের মত পালোয়ানরাই যে অতীত যুগের অপূর্ব্ব বীরত্বের শরীরী অবতার হয়ে বিরাজ করছেন—এই বীরত্বের প্রেরণাতেই যুগে যুগে বিশ্বের সাহিত্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! এস, আমরাও বীর-পূজায় যোগ দি!" এই ব'লে আনাতোল ফ্রান্স সাগ্রহ আনন্দে আসন ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে, জর্জ্জেস কার্পেনটিয়ারের দুই হাত ধ'রে অভিবাদন করলেন!

বাঙালী কবে এই বীর-পূজার যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে পারবে! শিক্ষিত বাঙালী ম্যাড়ার লড়াইকে যে-ভাবে দেখে, মল্লযুদ্ধকে তার চেয়ে বড় বেশী উঁচুতে ঠাঁই দেয় না—এবং তার একমাত্র কারণ বোধ হয়, পালোয়ানদের নামের পিছনে বি-এ, এম-এ ডিগ্রী নেই! কিন্তু বাঙলাদেশে আজ যদি বীর-পূজা যথার্থভাবে প্রচলিত থাকত এবং বাঙালী যদি বরাবর শারীরিক বীর্য্যের চর্চ্চা রাখত, তবে খুব-সম্ভব আজ তাকে দেহে-মনে ভারতের মধ্যে সব-চেয়ে পরাধীন জাতি রূপে দেখতে পেতুম না। ইউনিভার্সিটির এম-এ পাস-করা নন্দদুলাল হয়েও আজ আমরা স্বাধীনতার জন্যে হাহাকার করছি, এবং চল্লিশবৎসরেই বুড়িয়ে প'ড়ে অসহায় হয়ে পরকালের দুশ্চিন্তায় শিউরে উঠছি, কিন্তু চেয়ে দেখুন ঐ সুদূর সীমান্তের প্রান্তে! বন-পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় শক্তির পূজক আফ্রিদীরা নিটোল দেহে অটল পদে বিচরণ করছে—তারা বি-এ এম-এর ধারও ধারে না, কিন্তু অকাল-জরা তাদের দেখলে লজ্জায় নরুদ্দেশ হয় এবং স্বাধীনতা তাদের জন্মলব্ধ অধিকারের মধ্যে গণ্য! ইংরেজ সহজেই এই পণ্ডিত বাঙালীকে পায়ের তলায় এনে ফেলেছেন, কিন্তু তার বিশ্ব-জয়ী শক্তি, লক্ষ লক্ষ কামান-বন্দুক আর উড়ো-জাহাজ এতদিনেও এই মুষ্টিমেয় আফ্রিদী-জাতিকে গোলাম বানাতে পারলে না। খাঁচার পাখী যেমন শেখানো বুলি কপ্‌চাতে পারলেও বনের পাখীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, তেম্‌নি সায়েন্স-ফিলজফির কেতাবী পাঠ মুখস্থ না করতে পারলেও শক্তির পূজক স্বাধীন আফ্রিদীরা মনুষ্যত্বে বাঙালীর চেয়ে ঢের-বেশী শ্রেষ্ঠ।

আমরা লেখাপড়ার নিন্দা করছি না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যার শরীর তৈরি নয়, রোগ যার নিত্য-সঙ্গী, মৃত্যু-ভয় যার পদে পদে, সবলের কাছে নিয়তই যার অপমান, শক্তির মহিমা যার ধারণার বাইরে, কেবলমাত্র লেখাপড়া, আর কালেজী জ্ঞানের দ্বারা তার মনুষ্যত্ব কখনোই সার্থক হবে না! মনুষ্যত্বের দুই দিক শারীরিক ও মানসিক। যে একসঙ্গে দেহে-মনে সেরা, তাকেই বলি আস্ত মানুষ—নইলে একের অভাবে অন্যটি যে স্ফূর্ত্তিলাভ করতে পারে না, ভিন্ন-প্রবন্ধে আমরা তা দেখিয়েছি।

যে-সব কথা বললুম, এদেশের অনেক জ্ঞানী বুড়োর কাছেও বোধহয় তা অশ্রুত কথা,—কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কচি কচি ছেলে-মেয়েরাও জ্ঞানলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই এ-সব কথা শিখে নিয়েছে। তাই আজ সেখানে পালোয়ানী প্রায়-গুণ্ডামিরই সামিল নয় এবং দেহ-চর্চ্চা কাঠখোট্টা দরোয়ানের কর্ত্তব্য ব'লেও ধর্ত্তব্য হয় না। সেখানে মেটারলিঙ্ক, আন্দ্রীভ, গোর্কি, ফ্রান্স ও হার্ডি প্রভৃতিরও সমাদর



গোবরবাবু

আছে, আবার স্যাণ্ডো, স্যাক্সন, হেকেনস্মিথ, গচ্, বিস্কো, ডেম্প্সী ও কার্পেনটিয়ারের নামেও লোকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। শরীর-চর্চ্চার বাহুল্যের জন্যে সেখানে মানস-চর্চ্চার কোনই ক্ষতি হয় নি। বরং দৈহিক শক্তির প্রতি বিমুখ ও সাহিত্য অনুশীলনে উন্মুখ বাঙালী তার স্বদেশী কবির জন্যে যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করছে, শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত পাশ্চাত্য জগতে তাঁর সম্মান ও সমাদর তার চেয়ে যে যথেষ্ট বেশীই হয়েছে,

এটা হাতে-নাতে প্রমাণিত হয়েও গেছে।

কিন্তু কেবল সাহিত্যে ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নয়—দৈহিক শক্তিতেও বাঙালীকে এখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা কর্‌তে হবে। কারণ বাঙালার প্রতিভার পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতা তাতে ক'রে যতটা বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, ততটা আর-কিছুতে নয়। ধর্ম্মে রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র প্রমুখ পুরুষ-সিংহরা পৃথিবীতে বাঙালীর নাম বিখ্যাত ও অমর ক'রে এসেছেন, কিন্তু শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বাইরে তো দূরের কথা, ভারতের ভিতরেও বাঙালীর নাম এতদিন কেউ মুখেও আনে নি। সবাই জানে বাঙালী শিশুর মত দুর্ব্বল, ভ্যাড়ার মত ভীরু। এ-বিভাগে অ-বাঙালীরা আমাদিগকে অস্পৃশ্যের মতই ঘৃণা করে।

অনেকদিন আগে বাঙ্‌লার ছেলে সুরেশ বিশ্বাস সমুদ্র-পারে গিয়ে সামরিক শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছিলেন। "কিঞ্চিৎ" বল্‌লুম ব'লে কেউ যেন রাগ না করেন। কারণ ক্ষাত্রবীর্য্যহীন বাঙ্‌লাদেশে সুরেশ বিশ্বাসকে নিয়ে আমরা যতটা গর্ব্বই অনুভব করিনা কেন, সামরিক প্রতিভার আধুনিক লীলাক্ষেত্র শ্বেতাঙ্গ-মুল্লুকে তাঁর মতন যোদ্ধা পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে দেখা যায়। প্রতীচ্য দেশে সুরেশ বিশ্বাসের নাম কেউ চিন্‌বে না—কারণ অসংখ্য পাশ্চাত্য যোদ্ধার মধ্যে তিনি বিশেষ-কিছুই অসাধারণত্ব দেখাতে পারেন নি।

কিন্তু সম্প্রতি আমরা এমন একজন বাঙালীকে পেয়েছি, দৈহিক শক্তির প্রতিযোগিতায় যিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেছেন এবং যাঁকে নিয়ে আমেরিকার পালোয়ান-সমাজ রীতিমত আন্দোলন প'ড়ে গিয়েছে। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ গুহ। ভারতে তিনি "গোবরবাবু" নামেই পরিচিত। তিনি এখন "লাইট-হেভি-ওয়েটে" "পৃথিবী-জয়ী বাহাদুর" (Light heavy-weight Champion of the World) নামে সম্মানজনক উপাধি লাভ করেছেন। সকলেই মনে রাখ্‌বেন, এই উপাধি গোবরকে লাইট-হেভি-ওয়েটে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় আসন দিয়েছে। বাঙ্‌লার মাটিতে যে কেবল ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার চাষ হয় না, এখানে যে বিশ্বজয়ী শারীরিক শক্তির উপাদান আছে, গোবর সর্ব্বাগ্রে কার্য্যক্ষেত্রে তা প্রমাণিত ক'রে দিলেন। তিনি আমাদের সকলকার শ্রদ্ধার পাত্র।

সংক্ষেপে গোবরের পরিচয় এই। কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ার বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত গুহ-পরিবারে গোবরের জন্ম। এই ধনী পরিবার দৈহিক শক্তির জন্যে অনেকদিন থেকেই প্রসিদ্ধ। নামজাদা পালোয়ান স্বর্গীয় অম্বুচরণ ও ক্ষেত্রচরণ গুহ গোবরের পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত।

ছেলেবেলা থেকেই গোবর দেহচর্চ্চা ক'রে আস্‌ছেন। ভারতের দিগ্বিজয়ী বিখ্যাত পালোয়ান রহমনি, কাল্লু, গামা, ইমামবক্স ও গুট্টা সিং প্রভৃতির সঙ্গে নিয়মিত-ভাবে কুস্তি ল'ড়ে তিনি নিজের দেহকে তৈরি ক'রে তুলেছেন। উপর-উক্ত পালোয়ানদের কেউ কেউ মাহিনা নিয়ে তাঁর কাছে কাজ করেছেন। ষোল-সতেরো বৎসর বয়সে তিনি প্রথম-বার বিলাতে যান, কিন্তু নানাকারণে সেবারে সেখানকার মল্লক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হ'তে পারেন নি। দ্বিতীয়বারে য়ুরোপে গিয়ে, প্যারিস সহরের প্রতিযোগিতায় নানাদেশী শ্বেতাঙ্গ মল্লযোদ্ধার সঙ্গে গোবর কুস্তি ল'ড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। তখন বিলাতে সব-চেয়ে বড় পালোয়ান ছিলেন জিমি এসন। এডিনবার্গ সহরে তাঁর সঙ্গে গোবরের কুস্তি হয়। ফলে গোবরই জয়লাভ ক'রে "সারা-ইংলণ্ড-জেতা বাহাদুর" উপাধি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন।

কিছুকাল বিশ্রামের পর গোবর পৃথিবীজয়ী পালোয়ান গামাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। কলিকাতায় গামার সঙ্গে কুস্তি লড়বার জন্যে গোবর যখন তৈরি হচ্ছিলেন এবং স্থান-কাল-পাত্র সবই যখন স্থির, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে দুরন্ত ডিপথিরিয়া রোগে হঠাৎ তিনি শয্যাগত হয়ে প'ড়েন। রোগ এতটা সাংঘাতিক হয়ে হয়ে ওঠে যে, ডাক্তাররা তাঁর প্রাণরক্ষার সম্বন্ধেও চিন্তিত হয়েছিলেন। যাহোক, অনেক চেষ্টার পর সে-যাত্রা তিনি প্রাণে বাঁচলেন বটে, কিন্তু সেই রুগ্ন-ভগ্ন দেহ নিয়ে গামার সঙ্গে কুস্তি লড়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হোলো না। কেবল তাই নয়, গামা ও ভারতের নানাদেশী পালোয়ানদের কল্‌কাতায় আনাতে, খোরাক যোগাতে ও মল্লক্ষেত্র নির্ম্মাণ করতে মাঝে থেকে গোবরের হাজার হাজার টাকা অকারণে লোকসান হয়ে গেল।

আবার কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে গোবর গেল-বছরে ইয়াঙ্কিস্থান বা আমেরিকায় গিয়েছেন। শারীরিক বল-বীর্য্যের সকল ক্ষেত্রেই আমেরিকার মল্লবীররা এখন অদ্বিতীয়। য়ুরোপীয় পালোয়ানরাও ইয়াঙ্কিদের আর কোন ক্ষেত্রেই এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। সুতরাং এখন আমেরিকার পালোয়ানদের হারাতে পার্‌লেই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হ'তে পারা যায়। প্রমাণ, ভারতেরই অন্যতম বিখ্যাত পালোয়ান, গামা।

গোবর একে 'কালা-আদ্‌মি,' তায় আমেরিকায় তিনি অপরিচিত। কাজেই প্রথম প্রথম তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পালোয়ান-দের সঙ্গে ল'ড়ে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হোলো। কিন্তু তাদের সবাইকেই তিনি যখন একে একে তুলে পট্‌কান দিলেন, তখন স্যান-ফ্র্যান্সিকো সহরের "লাইট হেভি ওয়েটে পৃথিবীজয়ী বাহাদুর" অ্যাড্‌ স্যাণ্টেল নামে প্রসিদ্ধ পালোয়ান তাঁর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হোলো। আমরা আমেরিকার নানা খবরের কাগজে সেই মল্লযুদ্ধের যে বিবরণ পড়েছি, তাতে জান্‌তে পেরেছি যে, কুস্তির গোড়া থেকেই গোবরের হাতে অ্যাড্‌ স্যাণ্টেল সিংহের কবলগত মেষের মত অসহায় হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, অল্পক্ষণের মধ্যেই অ্যাড্‌ স্যাণ্টেল পরাজিত হয়ে, গোবরকে "পৃথিবীজয়ী বাহাদুর" উপাধির দাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হোলো।

কিন্তু "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"র তথাকথিত ভণ্ড সাধক শ্যাম-চাচা (ইংলণ্ডের 'জন-বুলে'র মত এটি হচ্ছে আমেরিকার ডাক-নাম) কালো জাত-কে-জাতের উপরেই যতটা হাড়ে চটা, তার তুলনা আর-কোথাও মেলে না। ভারতের 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'দের বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষও এর কাছে সামান্য ও আমেরিকার নগণ্য। নিগ্রো বেচারীদের একমাত্র অপরাধ, তাদের গায়ের চাম্‌ড়া কটা নয়। এই অমার্জ্জনীয় অপরাধে প্রত্যেক বৎসরেই খবরের কাগজের

হিসাবে দেখা যায়, শ্যাম-চাচার আদুরে ও গোরা ছেলে-মেয়েরা—একশো-দুশোও নয়—হাজার হাজার নিগ্রোকে ধ'রে ক্রমাগত চাবুক মেরে, গুলি ক'রে, ফাঁশীকাঠে লট্‌কে, জ্যান্ত পুড়িয়ে এবং জলের ভিতরে চুবিয়ে পরলোকে পাঠিয়ে দেয়। এ-সব হচ্ছে ইয়াঙ্কিদের ভারি সখের খেলা,—এ খেলায় মেয়েরাও সমান খুসিমুখে যোগ দিতে ছাড়ে না এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পরম মৌখিক ভক্ত ইয়াঙ্কি-গভর্মেণ্ট আজ বৎসরের পর বৎসর ধ'রে এই সাংঘাতিক খেলা দেখেও নীরবে হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন। কয়েক বৎসর আগে নিগ্রো মুষ্টি-যোদ্ধা জ্যাক্ জনসন (অদ্যাবধি এমন শক্তিমান মুষ্টিযোদ্ধা পৃথিবীর আর-কোথাও দেখা যায় নি) শ্বেতাঙ্গদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুই মুষ্টিযোদ্ধা বার্ণস্ ও জেফ্রিস্‌কে মেরে-ধ'রে হাড় গুড়িয়ে মুখ থেঁতো ক'রে হারিয়ে দিয়েছিলেন। নিগ্রোর সেই জয়লাভে ইয়াঙ্কিরা ক্ষেপে উঠে নিগ্রো পল্লীতে আগুন তো লাগিয়ে দিয়েছিলই—তাছাড়া ন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন ব'লে জনসন-বেচারীকে মিথ্যা অপবাদে সমস্ত সম্পত্তি হারাতে ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। তারপর থেকে ইয়াঙ্কিরা থেঁতো মুখ ভোঁতা হবার ভয়ে "পৃথিবী-জয়ের প্রতিযোগিতায়" নিগ্রোদের আর কাছে ঘেঁষ্‌তে দেয় না। আজ ইয়াঙ্কি জ্যাক ডেম্প্‌সী মুষ্টিযুদ্ধে "পৃথিবীজয়ী বীর" ব'লে নামে কিনেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ-মাত্রেই জানেন, আমেরিকায় এখন হ্যারি উইল্‌স্ নামে এমন বিপুলবপু একজন নিপুণ নিগ্রো-যোদ্ধা আছে, যার কবলে পড়লে-ডেম্প্‌সীরও কপালে খুব সম্ভব বার্ণস্ ও জেফ্রিসের মতই দুর্দ্দশা ঘট্‌তে বিলম্ব হবে না। কিন্তু হ্যারি উইল্‌সের কালো রঙের অছিলা তুলে ডেম্প্‌সী তাঁর সঙ্গে লড়্‌তে রাজি নয়! প্রৌঢ় জ্যাক্ জনসন এখনো অপরাজিত ও বর্ত্তমান। সংবাদপত্রে দেখ্‌লুম, এই প্রাচীন বয়সেও (৪৩ কি ৪৪ বৎসর) তিনি যুবক ডেম্প্‌সীকে মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করতে সঙ্কুচিত হন নি। কিন্তু সে আহ্বানের উত্তরেও ডেম্প্‌সী শিলামূর্ত্তির মত নীরব! একেই বলে কেঁদে-ককিয়ে বীর-নাম কেনা! এমনধারা পৃথিবী-জয়ের বাহাদুরের মূল্য কতটুকু!

যাক্ সে কথা। শ্বেতাঙ্গদের অবিচার দেখাবার জন্যেই অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও উপরের কথা-গুলি বল্‌তে বাধ্য হলুম। তাছাড়া আমেরিকার ফেরৎ বন্ধুদের মুখেও শুনেছি যে, ইয়াঙ্কিরা ভারতবাসীদেরও কাফ্রি ব'লে ডেকে অপমান করে। ভারতবাসীর গায়ের রংও কালো, অতএব তারাও কাফ্রি নয় তো কি!

সুতরাং একজন কালা-আদ্‌মির হাতে অ্যাড্ স্যাণ্টেলের এমন শোচনীয় পরাজয়ে ইয়াঙ্কিদের দ্বিতীয় রিপু যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, তা সহজেই বোঝা যায়। এখন আমেরিকার পৃথিবীজয়ী দুইজন পালোয়ান আছে। প্রথম ষ্ট্যানিস্‌লাস্ বিস্কো (বা ছোট বিস্কো) দ্বিতীয় ও 'ষ্ট্র্যাংলার' লিউইস। এর-মধ্যে লিউইসকে খাড়া ক'রে দেওয়া হোলো, গোবরের 'দর্পচূর্ণ' করতে।

লিউইসের একরকম বিশেষ প্যাঁচ্ আছে, তাতে দম-বন্ধ হবার ভয়ে বিরোধী পালোয়ান হার মান্‌তে বাধ্য হয়। সেই প্যাঁচে সিদ্ধ-হস্ত ব'লে লিউইসের নাম হয়েছে 'ষ্ট্র্যাংলার'। ষ্ট্র্যাংলারের আর-একটি গর্ব্বের ব্যাপার, আ

পর্য্যন্ত কেউই তাকে চিৎ করতে পারে-নি।

গেল ৮ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার উইচিটা নামে এক জায়গায় গোবরের সঙ্গে ষ্ট্রাংলারের কুস্তির বন্দোবস্ত হয়। এই মল্লক্ষেত্রে দর্শকের আসন ছিল পঁচিশ হাজার। সুতরাং সেটা যে কত-বড় সমারোহের ব্যাপার হয়েছিল, আপনারা সকলেই তা অনুমান করতে পারবেন।

রাত দশটার সময়ে বাঙালীবীর গোবরের সঙ্গে ষ্ট্রাংলারের কুস্তি সুরু হোলো। আমরা আমেরিকার চার-পাঁচখানা খবরের কাগজে এই কুস্তির যে বিবরণ পড়েছি, এখানে তারই সারোদ্ধার ক'রে দেব। কিন্তু তার আগে বিলাতী কুস্তির একটু বিশেষত্বের কথা এখানে খুলে বলা দরকার।

পাশ্চাত্য দেশে Cumberland and West-moreland Style, The Cornwall and Devon Style, The Græco-Roman Style ও The Lancashire or Catch-As-Catch-Can Style প্রভৃতি কুস্তির যে-সমস্ত পদ্ধতি চলিত আছে, তা ভারতীয় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। গোবরের সঙ্গে ষ্ট্রাংলারের কুস্তি হয়েছিল, শেষোক্ত পদ্ধতি অনুসারে। এতে ভারতের মত রদ্দা মারবার বা ল্যাঙট ধ'রে দাঁও কষ্‌বার (ভারতীয় পালোয়ানদের যা হচ্ছে একটি প্রধান প্যাঁচ্) কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া আরো অনেক ভারতীয় প্যাঁচ্ এই পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ ব'লে গণ্য হয়। ভারতবর্ষের মত কোনরকমে প্রতিপক্ষকে একবার পলকের জন্যেও সামান্য-রকম চিৎ করতে পারলেই (বছর-কয়েক আগে কলিকাতায় গড়ের মাঠের মল্লক্ষেত্রে, পালোয়ান হোসেন-বক্সকে এম্‌নি ক্ষণিকের জন্যে সামান্য রকম চিৎ ক'রেই গামা প্রায় ফাঁকি দিয়েই জয়ী নাম কিনেছিলেন।) এখানে কুস্তি জেতা যায় না। পালোয়ানের দুই কাঁধ মৃত্তিকা স্পর্শ করা চাই—তবেই তার হার হবে। গোবর যে সর্ত্তে কুস্তি লড়্‌তে রাজি হয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই; তিনবার কুস্তি হবে। তার মধ্যে যে বেশীবার প্রতিপক্ষকে চিৎ করতে পারবে, সেইই জয়ী ব'লে সাব্যস্ত হবে।

বিশ্বজয়ী ষ্ট্রাংলারের নিজের মুখেই প্রকাশ, সে ঠাউরেছিল খুব সহজেই গোবর তার হাতে কাবু হয়ে পড়্‌বেন। কিন্তু আসলে ব্যাপার হোলো ঠিক উল্টো-রকম। কুস্তি সুরু হবার পরেই দেখা গেল, গোবরো প্যাঁচ্ যেমন সাফ্, পাঁয়তারা যেমন চমৎকার, গতি যেমন ত্বরিত, গায়ের জোরও তেমনি অসাধারণ! গোড়া থেকেই গোবরের নিপুণতা দেখে ষ্ট্রাংলার রীতিমত চম্‌কে ও ভড়্‌কে গেল, গোবরকে কাবু করবে কি, সে নিজেই ক্রমে কাবু হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কয়েক-সেকেণ্ড-কম এক ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ষ্ট্রাংলারের পায়ে এক বিচিত্র প্যাঁচ্ মেরে, গোবর তাকে একদম চিৎ ক'রে ফেল্‌লেন। আগেই বলেছি, এর আগে ষ্ট্রাংলার জীবনে কখনো চিৎ হয়-নি। সুতরাং এই অপমানে সে রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠ্‌ল।

তারপর দ্বিতীয়বারের কুস্তি। এবারে ষ্ট্রাংলার দুই-দুইবার "হেড্‌-লক" নামে বিষম শক্ত প্যাঁচে গোবরকে নীচে এনে চিৎ

কর্‌বার চেষ্টা পায়। কিন্তু এই দুই-দুইবারেই গোবর সে নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর গায়ের জোর ষ্ট্র্যাংলারের চেয়ে দুগুণ বেশী! এই সময়ে সুসভ্য ইয়াঙ্কি দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে ভদ্র ভাষায় চীৎকার সুরু কর্‌লে—"ষ্ট্র্যাংলার, ঐ নিগ্রোটার ঘাড় মটকে দাও তো হে!"—"ওকে খুন ক'রে ফেল" প্রভৃতি!

ইতিমধ্যে ষ্ট্র্যাংলার গোবরকে এক অন্যায় প্যাঁচ্‌ মেরে আধ্‌-চিৎ ক'রে ফেল্‌লে। কিন্তু গোবরের দুই কাঁধ ভূমি স্পর্শ কর্‌বার আগেই তিনি ষ্ট্র্যাংলারের হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়্‌লেন। মধ্যস্থ পল সিক্‌নার তবু বল্‌লে, "ষ্ট্র্যাংলার, তুমি জিতেছ!"

গোবর, ষ্ট্র্যাংলারের দিকে পিছন ফিরে হাত নামিয়ে (যখন পালোয়ানের হাত নামানো থাকে, তখন তাকে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ) মধ্যস্থের কাছে নালিস কর্‌লেন, ষ্ট্র্যাংলার তাঁকে অন্যায় প্যাঁচ্‌ মেরেছে!

ঠিক সেই সময়ে, কোনরকম জানান্‌ না দিয়েই, ষ্ট্র্যাংলার পিছন্‌ থেকে অজ্ঞাতসারে গোবরকে আবার এক অন্যায় প্যাঁচে মাটিতে পেড়ে ফেল্‌লে। হঠাৎ এই অন্যায় প্যাঁচ্‌ মারার দরুণ গোবর তখনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তারপর কুড়ি মিনিটকাল তিনি আচ্ছন্নের মতন ছিলেন। কাজেই সেদিন তার তৃতীয় বারের কুস্তি হোলো না। কিন্তু মধ্যস্থ তবু ষ্ট্র্যাংলারকে জেতা ব'লে পুরস্কার দিতে লজ্জিত হলেন না।

আমেরিকার ইয়াঙ্কি খবরের কাগজেই প্রকাশ, গোবরকে দুই-দুইবার অন্যায় প্যাঁচ্‌ মারা হয়েছিল এবং এই কুস্তিতে ষ্ট্র্যাংলার জেতেনি, সুতরাং তাকে পুরস্কার দেওয়াও হয়েছে নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ।

অতএব ষ্ট্র্যাংলারের সঙ্গে গোবরের আবার কুস্তি লড়্‌বার প্রস্তাব হয়েছে। এখানে এটাও ব'লে রাখা দরকার যে, ষ্ট্র্যাংলারের কাছে যদি হতেন সত্যসত্যই পরাজিত তাহ'লেও গোবর "লাইট-হেভি-ওয়েটে পৃথিবী-জয়ী বাহাদুর" থাকৃতেন, কারণ ষ্ট্র্যাংলার "লাইট-হেভি-ওয়েট" শ্রেণীর পালোয়ান নয়।

ইয়াঙ্কি কাগজওয়ালারা যখন নিজেদের মুখেই স্বীকার কর্‌ছেন যে, গোবরের উপরে নিষিদ্ধ প্যাঁচ্‌ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং হার-জিতের কোন মীমাংসা হবার আগেই ষ্ট্র্যাংলারকে অন্যায়-রূপে জেতা সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তখন কুস্তি না দেখেও আমরা অনায়াসে বল্‌তে পারি যে, গোবরের চামড়া কালো ব'লেই মধ্যস্থ পল সিক্‌নার ছলে-কৌশলে তাঁকে হার মানিয়ে অপূর্ব্ব উপায়ে মার্কিন বীরত্বকে রক্ষা করতে চেষ্টা পেয়েছেন। এ-রকম উপায়ে শ্বেত-বীর-গর্ব্বকে অক্ষত রাখ্‌বার চেষ্টাও এই নতুন নয়। সকলের কাছেই এটা এখন প্রকাশ্য গুপ্তকথা যে, জ্যাক্‌ জনসন ন্যায়-যুদ্ধে মুষ্টিযুদ্ধে "পৃথিবীজয়ী বাহাদুর" ব'লে প্রমাণিত হবার পর, শ্বেত-মদ্দরা যখন কিছুতেই জনসন্‌কে আর হারাতে পার্‌লে না, তখন তারা গৌরাঙ্গের হেঁট মাথা উঁচু হবার এক বিচিত্র উপায় আবিষ্কার কর্‌লে। তারা কয়েক লক্ষ টাকা ঘুস দেবার লোভ দেখিয়ে, জনসনকে কোন শ্বেত-পালোয়ানের কাছে মিছামিছি হার মানতে রাজী করালে। ফলে, অর্থলোভে জনসন স্বেচ্ছায় জেস্‌ উইলার্ডের কাছে প্রকাশ্যে

কৃত্রিম মুষ্টিযুদ্ধের অভিনয়ে নিজের হার মেনে নিলেন। অথচ আসলে উইলার্ড একজন যার-পর-নাই নিচুদরের মুষ্টিযোদ্ধা,—বিশেষজ্ঞমাত্রই স্বীকার ক'রে থাকেন যে, জনসনের সত্যিকারের ঘুসি খেয়ে উইলার্ড ছয়-সাত মিনিটও পায়ের উপরে ভর্ দিয়ে দাঁড়াতে পারে কিনা সন্দেহ! যে-দেশে এমন-সব উপায়েও শ্বেতাঙ্গরা মুখরক্ষার চেষ্টা কর্‌তে লজ্জিত হয় না, সেই দেশেরই মধ্যস্থ ও দর্শকদের কাছ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ গোবরের ন্যায়পরায়ণতার আশা করাই পাগলামি ব'লে মনে হয়। এর চেয়ে বিলাত বরং মন্দের ভালো। কারণ ইংরেজ মল্ল জিমি এসনও কালা আদ্‌মির হাতে আছাড় খেয়ে চটে গিয়ে, কুস্তি লড়্‌তে লড়্‌তে গোবরের উপরে মুষ্টিবৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ইংরেজ মধ্যস্থ স্বজাতীয় পালোয়ানের এই অন্যায় সহ্য করেন-নি, তিনি তখনি গোবরকে জয়ী ব'লে মেনে নিয়ে, জিমি এসনকে মল্লভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গোবরবাবু পালোয়ান বটে, কিন্তু সাধারণ পালোয়ানের মত তাঁর কাছেও 'ক' অক্ষর গোমাংস নয়। আধুনিক ইংরেজী ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত এবং এ-বিষয় নিয়ে তিনি যে-কোন উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে সমানভাবে আলোচনা কর্‌তে পারেন। যে রসবোধ ও 'কালচার' সাহিত্য-আলোচনার প্রধান সহায়, তাঁর মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণেই আছে। পালোয়ানের এই মানসিক উৎকর্ষ দেখে শিক্ষাভিমানী ইয়াঙ্কিরাও অত্যন্ত অবাক হয়েগেছে। সে-দেশের সমস্ত সংবাদপত্রেই বিশেষ ক'রে গোবরের এই মার্জ্জিত ও শিক্ষিত মনের দিকে পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করা হয়েছে।

উইচিটার একখানি সংবাদপত্র থেকে এই কথাগুলি তুলে দিলুম।—"গোবরের বিপুল বপু অপূর্ব্ব সুন্দর। তিনি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক—অন্তত যুক্তরাজ্যের সিনেটের সমধিক বিখ্যাত সভ্যদের চেয়ে ভ্রমণাভিজ্ঞতায়, শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞানচর্চ্চায় তিনি কিছুমাত্র কম যান না এবং যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রণা-সভার সাধারণ সদস্যদের চেয়েও তাঁর দৃষ্টি অধিকতর প্রশস্ত।"...এমন একজন লোক—তিনিই কিনা কুস্তি-ব্যবসায়ী!

উইচিটার আর-একখানি সংবাদপত্র (The Wichita Beacon) লিখেছে:—"He (গোবর) is a well-educated Hindu gentleman who is informed of a large number of subjects. * * While at The Beacon office today he discussed Kipling, Hugo, India's ten-thousand-year old-civilization, Bolshevism, Rabindranath Tagore and other things comprehensively.

অতএব গোবরকে যাঁরা গোঁয়ার, কাঠ-খোট্টা একজন জোয়ান লোক ভাববেন, তাঁরা মস্ত ভুল করবেন। এই বৃহৎকায়, মাথায় ছয়ফুট তিনইঞ্চি-উঁচু ও ভীমের-মত-বলবান লোকটির প্রাণের ভিতরটি শিশুর মত কোমল, এবং কবির মত সরস। সকলকেই তিনি একদিনেই বন্ধু ক'রে নিতে পারেন—তাঁর ভাবে-ভঙ্গিতে কখনো হামবড়াই অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পায় না। কুস্তিও সাহিত্যের মতন, সঙ্গীতেরও তিনি বিশেষ ভক্ত। নিজেও কুকুভ খাঁ ও

করমতুল্লা খাঁ প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত ওস্তাদ রেখে সেতার-যন্ত্র বাজাতে শিখেছেন। আসলে, দেশের ও দশের মাঝে বিশিষ্ট হবার সমস্ত সৎগুণই তাঁর চরিত্রে আছে। অনেকের মনে মনে বিশ্বাস, শারীরিক বল-চর্চ্চায় মানুষের দেহকে কর্কশ আর বুদ্ধিকে মোটা ক'রে ফেলে। গোবরকে দেখ্‌লে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌লে সাধারণের এ স্থূল-বিশ্বাসও দূর হবে। গোবর বেশ ভালো রকমই জানেন, মল্লভূমিতে নিছক পশু-শক্তির দ্বারা প্রাধান্য লাভের যুগ চলে গেছে! এ যুগ হচ্ছে নিছক মস্তিষ্কের যুগ,—এখন সকল ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের শক্তিই বিজয়ী হবে এবং দেহ-চর্চ্চার দ্বারা মস্তিষ্কের জোর দ্বিগুণ বাড়ে বৈ কমে না।

ষ্ট্র্যাংলার জুয়াচুরির দ্বারা জয়লাভ ক'রেও গোবরের হাতে মান বাঁচাতে পারে-নি। আমেরিকার নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে গোবরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন। এমন-কি, ষ্ট্র্যাংলারের নিজেরা ম্যানেজার বিলি স্যাণ্ডো পর্য্যন্ত স্পষ্ট মান্‌তে বাধ্য হয়েছে যে, "অদূর-ভবিষ্যতের 'বাহাদুর' গোবর ছাড়া আর কেউ নয়।" The Kansas City Post" নামে সংবাদপত্রে সে মত প্রকাশ করেছে যে, "Gobar is the Greatest wrestler of modern times" (বর্ত্তমান যুগে গোবরই হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর)। প্রতিপক্ষের এই স্বেচ্ছাকৃত প্রশংসার উপরে টীকা অনাবশ্যক।

আপাততঃ গোবরবাবু জো ষ্টেচার নামে আমেরিকার আর-একজন প্রথম শ্রেণীর নামজাদা বাহাদুর-পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন (হয়ত এতদিনে সে কুস্তিও হয়ে গেছে)। বিশেষজ্ঞরা আগেই মতপ্রকাশ করেছেন যে, এই মল্লযুদ্ধেও গোবরবাবুর সাম্‌নে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেশীক্ষণ টিক্‌তে পার্‌বে না। তাই যেন হয়। কায়মনোবাক্যে কামনা করি, গোবরবাবু অচিরেই 'হেভি-ওয়েটের' প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রধান সম্মান পেয়ে তাঁর উজ্জল যশের শিখা অধিকতর সমুজ্জ্বল ক'রে, নিরাপদে আবার সোনার বাঙ্‌লায় সরস মাটিতে ফিরে আসুন—সমগ্র বাঙালী জাতি আজ তাঁর মুখ চেয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে।

কিন্তু খালি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌লেও চল্‌বে না। আজ এই জাতীয় অধঃপতনের যুগে, শোচনীয় দুর্ব্বলতার দিনে বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে গোবরের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক্, প্রত্যেক বাঙালী বাপ-মা সন্তানদের খালি মনে নয়—দেহেও শক্তি-অর্জ্জনের সুযোগ ও ব্যবস্থা ক'রে দিন, সকলেই বুঝ্‌তে শিখুন যে, দুর্ব্বলের অধীনতা বিধাতার স্বাভাবিক বিধান,—দেহে যে অক্ষম, স্বপ্নেও সে স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য—জগতে চিরদিনই গোলামের প্রয়োজন থাক্‌বে এবং সে প্রয়োজনের সাম্‌নে স্বেচ্ছায় মাটি কাম্‌ড়ে ধূলায় গড়াগড়ি দেবে খালি ঐ অশক্ত ও কাপুরুষেরই দল! বাঙালী, এ দলে নাম লিখিয়ে যদি ঘৃণিত না হতে না চাও, তবে এখন আর-সব ভুলে আগে শক্তি-সাধনায় মন দাও--শক্তি বিনা জাতি গ'ড়ে উঠ্‌বে না!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হাফিজের অনুসরণে

আগর আঁ তুর্কে শীরাজী বেদস্ত্ আরদ্ দিলে মারা
বখালে হিন্-দুয়শ্ বখ্শম্ সমরকন্দ্ ও বোখারারা ॥

শিরাজের সেই তুরাণী রূপসী
                                        বে-দরদী,
        যদি কোনো দিন দরদ্ বোঝে এ সুখহারার,
লাল সে গালের কালো তিল্‌টির বদলে গো,
                দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা আর !

যেটুক্ শরাব পড়ে' আছে শেষ—ঢালো সাকী !
বেহেশ্‌তেও সে জায়গা এমন আছে না কি ?—
রোক্‌নাবাদের নীল নহরের
                                    কিনারাটি—
                গুল্-গলাগলি গলিটি এমন মুসল্লার ?

বে-শরম এই ছুঁড়িগুলা সব চারিপাশে,
সারাটা শহর গুল্‌জার করে—ভারি হাসে !
ধৈরয মোর লুটে নেয় এরা—
                                        করিব কি !
                তাতার-দস্যু ভেঙ্গে ফেলে যেন ঘর-দুয়ার !

পিয়ারা আমার বড় যে রূপসী !—চাহে না সে—
এমন গরীব-অভাজন তারে ভালোবাসে,
কাজ নাই তাঁর সুর্ম্মা-মেহেদী,
                                        জরী-ফিতা—
                চায় না পরিতে টিপ্, পুঁতিমালা খোঁপায় তার !

চলুক শরাব, রবাবে ছড়িটি টানো সাকী !
আঁধার ধাঁধার জওয়াব মেলে না—জানো নাকি ?
কেউ সে বোঝেনি, কেউ বুঝিবে না
                                        কথাটা কি,
                সারা দুনিয়ায় পাবে না খুঁজিয়া সমঝ্‌দার !

য়ুসুফের রূপ দিন-দিন যে গো ফুটে' ওঠে !
কুমারী-ধরম শরম যে তার পায়ে লোটে !
জুলায়্‌খার ঐ আব্‌রু এবার
গেল টুটে'—
ইজ্জত্‌ রাখা ভার হ'ল সেই লজ্জিতার !

আখেরে যাদের ভালো হয়, সেই যুবারা যে
প্রাণের অধিক জ্ঞান করে এই ধরামাঝে—
বুড়াদের কথা, নীতির বচন !
তবে শোনো
মন রে ! তোমার প্রাণের কথা সে চমৎকার !

গাল দিলে তুমি !—সেই যে আমার ভালো কথা !
বেঁচে থাকো তুমি, এমন সুহৃদ পাব কোথা ?
তবু মনে হয়, চিনি-গড়া ওই
চুনীছুটি
কেমনে ঢালে গো বিষ-কটু এই বচন-ধার !

গীত শেষ হ'ল—সারা হ'ল গাঁথা মোতিমালা !
এস গো হাফিজ ! গাও দেখি হেন সুধাঢালা—
শুনিতে শুনিতে নিশীথিনী যেন
দিশাহারা,
খুলে' ফেলে দেয় তারার জড়োয়া-সিঁথিটি তার !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।

চয়ন

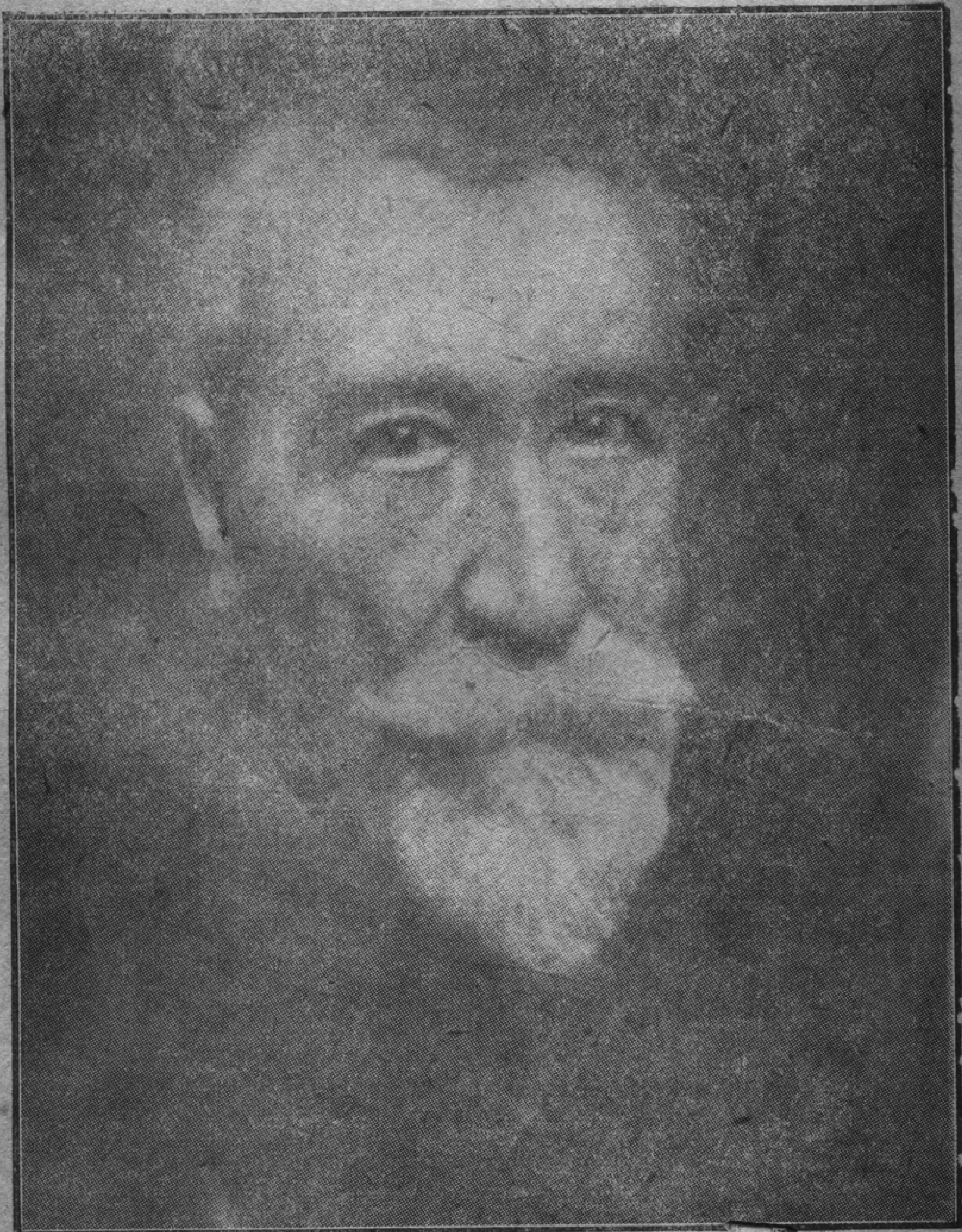
আনাতোল ফ্রান্স

এ-বৎসরে সাহিত্যে "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন, আনাতোল্‌ ফ্রান্স। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই।

গত ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে পারি সহরে আনাতোল ফ্রান্স জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর বাপের নাম Noel Thibault ; দশম চার্লসের রক্ষী ফৌজে তিনি যখন সৈনিক, তখন সেনাদলে তাঁর

আদরের ডাকনাম ছিল—Pere France এবং সেই নামেই তিনি পরিচিত হন। সেই নাম থেকেই তাঁর ছেলের নামকরণ।

Pere France চিরদিন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ও প্রজাবিদ্রোহের বিপক্ষে ছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের পরে তাঁর দোকান-ঘরটি রাজতন্ত্রীদের প্রিয় আড্ডায় পরিণত হয়—সেখানকার আসরে যে-সব কথাবার্ত্তা ও আলোচনা চল্‌ত, বালক আনাতোল তা শুনতে পেতেন এবং তার প্রভাব জীবনে তিনি ভুল্‌তে পারেন-নি। শৈশবের সে ছবি তাঁর লেখার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে।



আনাতোল ফ্রান্স

আনাতোলের বাপ-মা দুজনেই ক্যাথলিক ছিলেন। মায়ের জানুর উপরে ব'সে তিনি সাধুদের জীবন-চরিত পড়তেন। সে-সব জীবনী তাঁর শিশু-চিত্তকে এতটা আলোড়িত ক'রে তুলেছিল, যে শৈশবে তাঁর প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, সাধু হবার জন্যে। তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ, শৈশবে বারকতক তিনি সাধুগিরি করবার জন্যে চেষ্টাও পেয়েছিলেন, কেবলমাত্র বাড়ীর লোকের উৎসাহের অভাবেই তাঁর চেষ্টা সফল হয়-নি। সাধুদের দেখাদেখি পশু-লোমের জামা পরবার মৎলোবে আনাতোল একদিন একখানা চেয়ারের ঘোড়ার-চুলের গদী ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলেছিলেন। সাধুতার সেই চেষ্টার জন্যে তাঁর মা তাঁকে বেত-মেরে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেন, কাজেই সংসারে থেকে সাধু হওয়া অসম্ভব বুঝে আনাতোল শেষটা সে চেষ্টা ছাড়্তে বাধ্য হন।

পিতার রাজতন্ত্রের পক্ষপাতিতা এবং মাতার ধর্ম্মানুরাগ ছাড়া আর এক প্রভাব বালক আনাতোলের মনের উপরে কাজ করেছিল। এ প্রভাব হচ্ছে তাঁর ঠাকুরমার। তাঁর ঠাকুরমা নীতিকে রীতিমত হাল্‌কা ও যথেচ্ছ-ভাবে গ্রহণ করতেন। আনাতোলের মা জীবনের সব ব্যাপারকেই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নিতেন, তাই দেখে তাঁর ঠাকুরমার হাসিখুসি ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের অন্ত ছিল না। আনাতোল সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "আমার নাতি কখনোই তার বাপের মত হবে না।" তাঁর কথাই সত্য হয়েছে। আনাতোলের চরিত্র বাপের মত হয়-নি, হয়েছে ঠাকুরমায়ের মত।

যথাসময়ে আনাতোলের বিদ্যারম্ভ হয়। তাঁর বাপ-মা ধনী না হ'লেও ছেলেকে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে কোনরকম ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হন-নি। সেই পড়া-সুরুর সঙ্গে-সঙ্গেই আনাতোলের পথে পথে ঘোরাও সুরু হোলো। এই পথে-বেড়ানো এবং সহরের ভালো-খেলো ছোট-বড় সব ব্যাপারই তন্ন তন্ন ক'রে দেখা, আনাতোলের একটি ভারি সখের কাজ ছিল। পারির চারিদিকে সম্পদের ও দারিদ্র্যের, আনন্দের ও বিষাদের এবং জম্‌কালো ও সাদাসিধে যে-সব চিত্র তিনি দেখেছেন, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তার প্রতিলিপি পাওয়া যায়। কালেজী জীবনেও তাঁর উপকার হয়-নি কম। এই কালেজে থেকেই তিনি গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং বিচার-শক্তিকে লাভ করেন।

ছাত্র-জীবনেই আনাতোলের চিত্তে সাহিত্যানুরাগ দেখা দিয়েছিল, পনরো বছর বয়সের সময়েই তাঁর মনে সাহিত্য-সেবার সাধ জাগে। কালেজে থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁর জ্ঞানস্পৃহাও এতটা বাড়ে যে, নানা বিষয়ের নানা পুস্তক নিয়ে তিনি সর্ব্বদাই মেতে থাক্‌তেন— যদিও তিনি কখনোই প্রথমশ্রেণীর "কেতাব-কাট" হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি।

কালেজ ছেড়ে আনাতোল কয়েক বৎসর এ-কাজ সে-কাজ ক'রে বেড়ান। কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। কিছুকাল মাসিক-সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কিছুকাল সম্পাদকী করেন। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর লেখা আলফ্রেড ডি-ভিগ্নীর চরিত্রচিত্র প্রকাশিত হয়। এখানিই তাঁর প্রথম বই। এর দুই বৎসর পরে প্রুসিয়ানদের সঙ্গে ফরাসীদের

যুদ্ধ বাধে। পকেটে ভার্জ্জিলের কাব্য আর হাতে তরবারি নিয়ে মাতৃভূমির আহ্বানে তিনি রণক্ষেত্রে যাত্রা করেন। রণক্ষেত্রের কামান-বন্দুকের অবিশ্রাম গর্জ্জন ও অগ্নি-বর্ষণের মধ্যে ব'সে, তিনি আর এক বন্ধুর সঙ্গে নিশ্চিন্ত প্রাণে ভার্জ্জিলের কাব্য-রসে ডুবে থাক্‌তেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আনাতোল ফ্রান্সের দ্বিতীয় রচনা প্রকাশিত হয়। এখানি কবিতার বই। প্রথম কবিতা-পুস্তকেই যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়ে, তিন-বছর পরে তিনি আর একখানি কবিতার বই প্রকাশ করেন। তার দ্বারা কাব্য-সাহিত্যে তাঁর নাম-ডাক আরো বেড়ে ওঠে। তারপর কিছুকাল তিনি প্রাচীন সাহিত্য-প্রকাশের সম্পাদন-ভার নেন। এই সময়ে তিনি দক্ষ সমালোচক ব'লেও নাম কেনেন।

কিন্তু কবি ও সমালোচক রূপেই আজ ফ্রান্সের এত নাম নয়। এতদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যে তিনি হাত-মক্স করেছিলেন মাত্র। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা প্রথম দুটি গল্প প্রকাশিত হয়। তারপর তাঁর প্রথম দীর্ঘ উপন্যাস "Le Crime de Sylvestre Bonnard" বাজারে বাহির হয় এবং এই প্রথম উপন্যাস থেকেই তাঁর পৃথিবীব্যাপী যশের সূত্রপাত। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখেছেন, সে সমস্তের বিশদ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

আনাতোল ফ্রান্স ঔপন্যাসিক এমিল জোলার বিরুদ্ধবাদী। জোলা-সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আমি জোলার ঘৃণাকর যশের জন্য তাঁকে হিংসা করি না। মানবতাকে অবনত এবং সত্য ও সৎকে অস্বীকার করবার জন্যে আর কোন মানুষ এমন প্রাণ-পণ চেষ্টা করে-নি। মানুষের আদর্শকে আর কেউ এত উল্টোও বোঝে-নি।" কিন্তু এই জোলার মরণের পরে ফ্রান্স তাঁর স্মৃতির উপরে আন্তরিক ও মর্ম্মস্পর্শী শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হন-নি।

প্রথম-জীবনে তিনি কুলীন-তন্ত্রের পোষকতা করতেন, কিন্তু শেষ-বয়সে ফ্রান্স রাজনীতিতে Socialist সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। রুস প্রজাদের উপরে রাজতন্ত্রের অত্যাচার নিয়ে তিনি অনেকবার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছেন। সংপ্রতি নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি রুসিয়ার দুর্ভিক্ষ-তাড়িত প্রজাদের সাহায্যের জন্য দান ক'রে, রুস-প্রজার প্রতি নিজের অকৃত্রিম সহানুভূতির জলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন। ফ্রান্স বরাবর প্যারি সহরে বাস করেছেন। প্যারিকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তাঁর প্রাণ কাঁদে। কিন্তু এমন দারুণ সহুরে হয়েও তিনি জনসাধারণের সাম্‌নে প্রকাশ্যভাবে এসে দাঁড়াতে সঙ্কুচিত হন। হাল-ফ্যাসানের বিলাসী সম্প্রদায়ের সংসর্গ থেকে তিনি সর্ব্বদাই তফাতে থাক্‌তে ভালোবাসেন।

নোবেল পুরস্কারের উপরে তাঁর দাবী অনেকদিন আগে থাকতেই ছিল। কারণ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যে তাঁর আর জুড়ী নেই। তাই এতকাল তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়-নি ব'লে চারিদিকেই প্রতিবাদ ও আন্দোলন চল্‌ছিল। এখন বাকি রইল খালি ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির দাবী।

রূপলক্ষ্মীর দুরদৃষ্ট

সমালোচকরা বলেন, পৃথিবীতে সব-চেয়ে সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গ্রীক রূপলক্ষ্মী ভেনাস ডি মিলোর প্রতিমাটি। (ভারতীতে আগেই একাধিকবার এই প্রতিমূর্ত্তির ছবি বেরিয়ে গেছে, তাই আর এখানে দেওয়া হোলোনা।) ভেনাসের এই মূর্ত্তির হাতদুটি এখন আর নেই। কিন্তু সকলেই ব'লে থাকেন, নারীর নিখুঁৎ গড়ন কি-রকম হওয়া উচিত, ভেনাসের এই মূর্ত্তিটি দেখ্‌লে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্পূর্ণ অবস্থায় মূর্ত্তির হাতদুটি কোন্‌ ভঙ্গিতে কেমন ভাবে ছিল, বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন এবং অনেকরকম কল্পনা করেছেন, কিন্তু কেহই স্থির-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারেন-নি।

খালি এই নিয়েই মতভেদ নয়—ভেনাসের মূর্ত্তি নিয়ে আরো অনেক রহস্য এখনো পরিষ্কার হয়-নি। এমন যে পরম সুন্দর নিখুঁৎ নারী-মূর্ত্তি,—যে শিল্পীর হাতে এটি কঠিন পাষাণের বুকে কোমল কমলের মত বিকসিত হয়ে উঠেছে, সে হাত নিশ্চয়ই উঁচুদরের ওস্তাদের হাত! কিন্তু কে তিনি? কি নাম? এ যে গ্রীক ভাস্করের কীর্ত্তি, তাতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় কি? এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বোধহয় আর-কখনো পাওয়া যাবে না।

ভেনাসের মূর্ত্তি কি ক'রে পাওয়া যায়, তার ইতিহাস এই। গ্রীসের অনতিদূরে মিলো নামে একটি ছোট দ্বীপ আছে। প্রায় একশো বছর আগে, মিলো-দ্বীপের বোটোনিয়া নামে এক চাষী, একটি পাহাড়ে পাথর খুঁজ্‌তে গিয়েছিল। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সে হঠাৎ একটি পুরানো চোর-কুঠোরি দেখ্‌তে পায়। কৌতুহলী চাষা তার ভিতরে ঢুকে একেবারে অবাক হয়ে গেল। কারণ সেই অন্ধকারকে আলো ক'রে শ্বেত-পাথরে গড়া এক অপূর্ব্ব দেব-প্রতিমা একাকিনী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাকে দুই হাজার বৎসরের দীর্ঘতাও কিছুমাত্র মলিন কর্‌তে পারে নি! এই মূর্ত্তিই এখন ভেনাস ডি মিলো নামে বিখ্যাত। বোটোনিয়া যখন ভেনাসকে প্রথম পায়, তখনো মূর্ত্তিটির হাতদুটি অভগ্ন ছিল। আরো-একটা জানবার কথা এই যে, ভেনাসের বাম হাত-খানি এমন কৌশলে গড়া ছিল, যাতে-ক'রে তাকে ইচ্ছামাত্র কাঁধ থেকে খুলে নিতে বা লাগিয়ে দিতে পারা যেত।

আবিষ্কারের কিছুকাল পরে ফরাসীরা ভেনাসের কথা জান্‌তে পারে। একজন লোক বোটোনিয়ার কাছে গিয়ে মূর্ত্তিটি কেনবার প্রস্তাব কর্‌লে এবং বোটোনিয়াও তখনি রাজি হয়ে গেল। ফরাসীরাও তখনি মূর্ত্তিটিকে আন্‌বার জন্যে একখানি যুদ্ধ-জাহাজ পাঠিয়ে দিলে।

এর-মধ্যেই মিলো দ্বীপের মোড়লরা স্থির ক'রে ফেল্‌লে, তারা কোন কাজ বাগাবার জন্যে একজন গ্রীক রাজকুমারকে মূর্ত্তিটি উপহার দেবে।

ফরাসী যুদ্ধজাহাজ যখন মিলো দ্বীপের বন্দরে এসে হাজির হোলো, তখন দেখা গেল, একদল তুর্কী নাবিক ভেনাসকে একখানি গ্রীক-জাহাজে তুলে চালান দেবার যোগাড় কর্‌ছে। ফরাসীরা তখনি নেমে প'ড়ে তাতে

বাধা দিলে। ভেনাসকে নিয়ে আগে গ্রীক দেবতাদের মধ্যেও লড়াই হয়ে গেছে, এখন তাঁর প্রতিমাকে নিয়ে পৃথিবীর মানুষদের মধ্যেও মারামারি বেধে গেল। দেবতাদের লড়ায়ে ভেনাসের নিজের কোন ক্ষতি হয়-নি বটে, কিন্তু মানুষদের মারামারির হাঙ্গামে প'ড়ে তাঁর প্রতিমা আর আত্মরক্ষা করতে পারলে না। কারণ বিজয়ী ফরাসীরা ভেনাসের প্রতিমাকে যখন নিজেদের জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুললে, তখন দেখা গেল যে, প্রতিমার হাত-দুটি আর নেই! রূপলক্ষ্মী ভেনাসের হাতভাঙা প্রতিমা এখন ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পশালায় সগৌরবে বিরাজ করছে এবং 'তার কাছে গিয়ে আজ পৃথিবীর আধুনিক রূপসীদের দেহের দেমাক্" নিত্যই চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন-নিদ্রা

সম্মোহন বা hypnotismএর দ্বারা আজকাল মানুষের অনেক উপকার হচ্ছে। সম্মোহনের প্রথম সূত্রপাত ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার মেস্মারের দ্বারা। তিনি সম্মোহনের সাহায্যে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে অস্ত্রোপচার করতেন। তারপর গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দুইজন ফরাসী ডাক্তারের কৃতিত্বে স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় আরোগ্য লাভের প্রধান উপায় ব'লে সম্মোহনকে এখন একটা বিজ্ঞান রূপে মানা হয়েছে। ন্যান্সি-সহরের "Suggestive Therapeutic Department আজ পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

সংপ্রতি ফ্রান্সের ডাঃ ষ্টিন এ-সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি সম্মোহন-শক্তিতে উৎপাদিত এই কৃত্রিম নিদ্রার নাম দিয়েছেন "psycho-anæsthesia"। একে "স্বপ্ন-নিদ্রা" ব'লেও ডাকা হয়। অধিকাংশ মানুষের ভিতরেই তাদের অজ্ঞাতে এমন অনেক জ্ঞান ও শক্তি অকেজো ও সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, "স্বপ্ন-নিদ্রা'র মহিমায় যেগুলিকে আবার মনের অতল গভীরতা থেকে উপরে টেনে তুলে আনা যায়; যে-সব ব্যাপারের স্মৃতি অনেক-দিন আগেই আমি ভুলে গিয়েছি, সে-সব আবার আজকের ব্যাপারের মত তাজা হয়ে মনের চারিদিকে উঁকি মারতে থাকবে। বোকা ছেলের পড়াশুনোর ক্ষমতা বাড়বে, ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রৎ হবে, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূরে যাবে এবং সদাই লাজুক ও থতমত-খাওয়া লোক আবার সপ্রতিভ হয়ে উঠবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

একটি যুবতীর গান গাইবার ক্ষমতা আছে অল্প। কিন্তু তার মনে মনে অর্দ্ধ-চেতন বিশ্বাস আছে যে, যদি তার আত্মনির্ভরতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে, তবে সে একজন উচুঁদরের কলা-কুশলী হ'তে পারবে। Psycho-anæsthesiaর দ্বারা জানা যেতে পারে, সে সত্যই শ্রেষ্ঠ গায়িকা হয়ে দাঁড়াবে, না, তার বিশ্বাসটা একেবারেই ভ্রান্ত! কিংবা ঐ যুবতীর মধ্যে গান গাইবার উচ্চ-শক্তি যদি অকেজো ভাবে সুপ্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে তাকে অবিলম্বে কাজে খাটাতে বাধ্য করা যেতে পারে।



চোখের ক্ষমতা

তারপর ধরুন, একজন নেসাখোর নেসা ছাড়তে চায়, কিন্তু কিছুতেই সে বদ-অভ্যাস ছাড়তে পারছে না। "স্বপ্ন-নিদ্রা"র দ্বারা তার সে বদ-অভ্যাস খুব সহজেই দূর করা যাবে।

মনে করুন, সারাদিন ধরে আমি কোন সমস্যা নিয়ে ভেবে মরছি, কিন্তু কিছুতেই সমাধান করতে পারলুম না। অথচ আসল উত্তরটা আমার অজ্ঞাতে হয়তো মনের মধ্যেই গুপ্ত হয়ে আছে। "স্বপ্ন-নিদ্রা"র ঘোরে এমন সমস্যার সুন্দর সমাধান হতে পারে।

ডাক্তার ষ্টিনের পদ্ধতিতে এম্‌নি-সব অনেক মুস্কিল আসান হচ্ছে। আর-একটি উল্লেখ-যোগ্য কথা এই যে, ডাক্তার ষ্টিন ঘুম-পাড়ানো লোকের সঙ্গে নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে নীরবে এমন আলাপ করতে পারেন—স্বজ্ঞানে-শ্রুত কথিত বাক্য যার চেয়ে স্পষ্ট হয় না।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে একখানি ছবি দেওয়া গেল। এই ছবিখানি চোখ থেকে দু-ফুট তফাতে রাখুন এবং মিনিট পাঁচেক ধ'রে একাগ্রচিত্তে ছবিতে আঁকা চোখদুটির দিকে চেয়ে থাকুন। যাঁদের মন দুর্ব্বল, যাঁরা সহজেই অভিভূত হন, নির্নিমেষে, একমনে ছবির চোখের দিকে পাঁচমিনিট তাকিয়ে থাকলেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়বেন। যদি আপনার মাথা ধ'রে থাকে, যদি আপনি চরিত্রগত কোন বদ-অভ্যাস দূর করতে বা স্বভাবের কোন বিশেষত্ব বদ্‌লাতে বা কোন সুপ্ত শক্তি জাগাতে চান, ঘুমোবার আগে একমনে তা ভাবতে থাকবেন। খুব-সম্ভব ঘুম ভেঙে উঠে আপনার জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাবেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আপনার মনের একাগ্রতার উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে,—চঞ্চল মন এ চেষ্টার ব্যর্থ হবে।

ক্যারুসোর কণ্ঠনালী

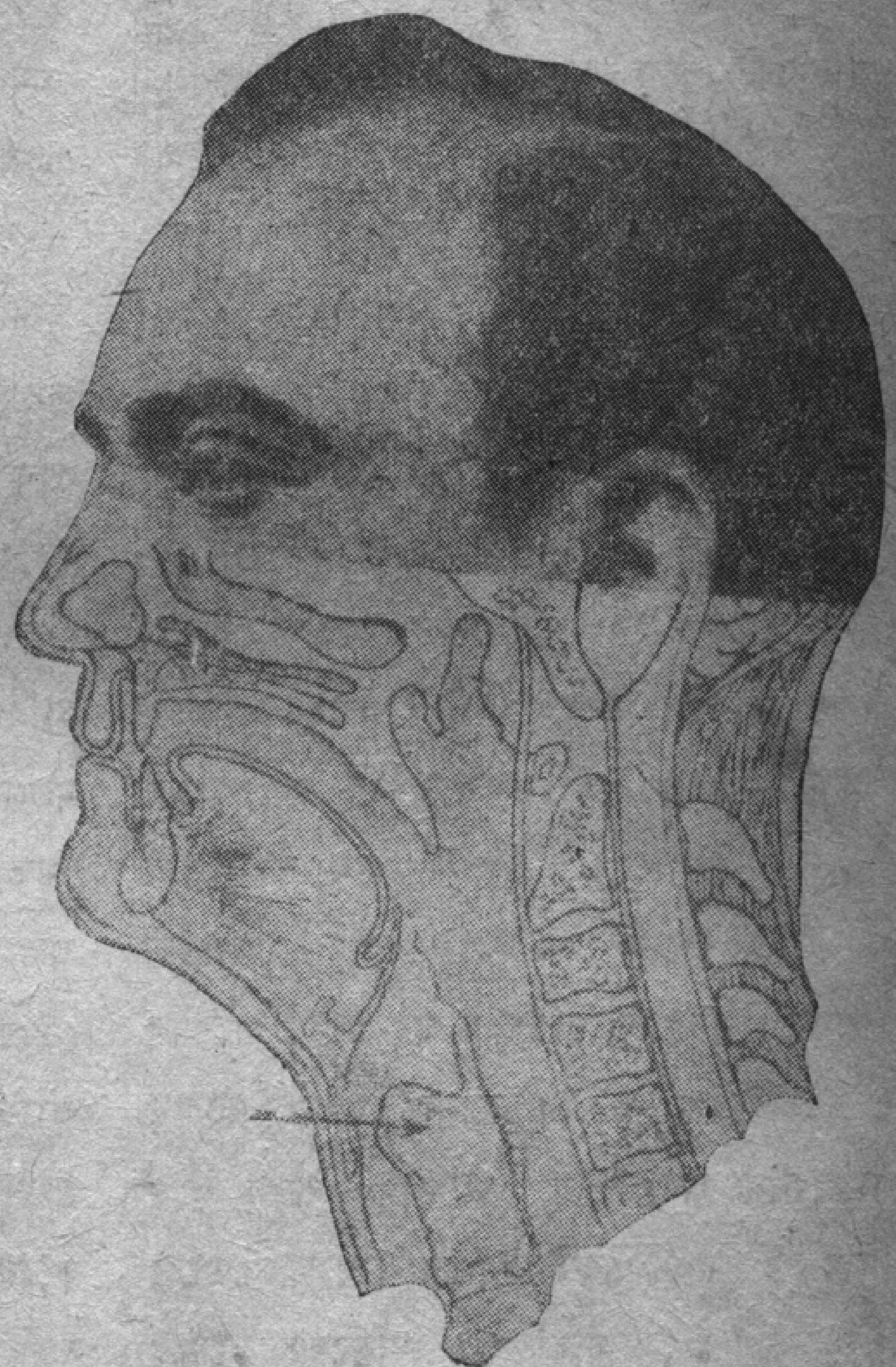
প্রতীচ্যর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক এন্‌রিকো ক্যারুসো সংপ্রতি পরলোকে গিয়েছেন। গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তার গলার একটি শির ছিঁড়ে যায় এবং সেই দুর্ঘটনাই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ!

প্রতীচ্যে ক্যারুসোর জুড়ী ছিল না। আমরা বিলাতী গান বুঝি না এবং ক্যারুসোর গান শুনবার সুযোগও আমাদের ভাগ্যে কখনো ঘটে-নি। কিন্তু শুনেছি, ক্যারুসো যখন গান গাইতেন, তখন স্বর্গ যেন মর্ত্ত্যে নেমে আস্‌ত।

সমুদ্রের ওপারে গুণীর আদর যথেষ্ট। তার ফলে, ক্যারুসো প্রতিমাসে —দু-এক হাজার নয়—লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার কর্‌তেন। তাঁর গান শোনবার জন্যে সারা য়ুরোপ আর আমেরিকা যেন পাগল হয়ে উঠত।

ক্যারুসো মারা যাবার সময়ে এক অপূর্ব্ব সম্পত্তি দান ক'রে গেছেন। সেটি তাঁর কণ্ঠনালী! ইতালির নেপল্‌স্ সহরের যাদুঘরে এটি সযত্নে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে—সেই সুরক্ষিত অবস্থায় ভবিষ্য বংশের মঙ্গলের জন্যে চিরদিন তাকে টিকিয়ে রাখা হবে।

বাপ-মার বিশেষ কোন দৈহিক গুণ সন্তানে বর্ত্তাতেও পারে, না বর্ত্তাতেও পারে। স্যাণ্ডোর মত তাঁর ছেলেরও হাতের মাংসপেশী যে ঠিক ততটাই পরিপুষ্ট হবে, তার কোনই মানে নেই। অবশ্য দৈহিক বংশানুক্রমের দৃষ্টান্ত যে একেবারেই নেই, তাও



ক্যারুসোর কণ্ঠনালী

বল্‌ছিনা। কিন্তু ক্যারুসোর এই দানে ভবিষ্য সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের যে অনেক মঙ্গল হবে, সেটা এক রকম দৃঢ়নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কণ্ঠনালীর বিশিষ্টতার গুণেই ক্যারুসোর গান অতটা নিখুঁৎ হ'তে পেরেছিল।

কয়েক বছর আগে কারুসোর ডাক্তার তাঁর চিকিৎসার সময়ে আবিষ্কার করেন যে, ক্যারুসোর কণ্ঠনালী এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, এমন-কি অসম্ভব বল্‌লেও চলে। কণ্ঠনালী বা larynx হচ্ছে শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুক্‌বার

একটি দরজা বা ছিদ্রের মত। যখন আমরা খাবার খাই, তখন এটি বন্ধ হয়ে ফুস্‌ফুস্‌কে রক্ষা করে। যখন আমরা নিঃশ্বাস টানি, তখন এটি খুলে যায়। তেম্‌নি, যখন আমরা কথা কই বা গান গাই, কণ্ঠনালী তখন এমন-ভাবে খুলে থাকে, যাতে-ক'রে শ্বাস-নালীর প্রান্তস্থিত স্বর-তন্ত্রীগুলির (vocal chords) উপর দিয়ে বহমান বাতাস সে-গুলিকে কম্পমান ক'রে তোলে—ধ্বনি জাগাবার জন্যে। স্বরতন্ত্রীর মাংসপেশীগুলিকে গায়ক যেমন-ভাবে সঞ্চালিত কর্‌তে পারে, কেবল তারই উপরে ঐ কম্পন নির্ভর করে না—পরন্তু, এই মাংসপেশীর আকারের তারতম্য অনুসারেও কম্পন কম বা বেশী হয়। এইখানেই ক্যারুসোর আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। সচরাচর মানুষের স্বর-তন্ত্রীর আকার হয় একইঞ্চির চার-ভাগের তিন ভাগ। ক্যারুসোর স্বর-তন্ত্রীর আকার পূরো এক ইঞ্চির উপরেও, একইঞ্চির যোলভাগের তেরো ভাগ—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চেয়ে দু-গুণেরও বেশী! এই অসাধারণ ব্যাপার দেখে ক্যারুসোর ডাক্তার একবারে অবাক হয়ে যান। তাঁরই পরামর্শে ক্যারুসো মৃত্যুকালে জানিয়ে গেছেন যে, তাঁর কণ্ঠনালী যেন কেটে নিয়ে যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়।

ক্যারুসোর দেহের মধ্যে আরো অনেক এমন আশ্চর্য্য বিশেষত্ব আছে, যা প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁর ফুস্‌ফুস্‌ও প্রকাণ্ড—দানবের ফুস্‌ফুসের মত! তাঁর গলার আওয়াজ যে অতদূর চড়্‌তে পার্‌ত, এই ফুস্‌ফুসের বিপুলতাই তার কারণ। একটি প্রকাণ্ড 'গ্র্যাণ্ড' পিয়ানোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বক্ষ স্ফীত ক'রে তুলে, ক্যারুসো কেবলমাত্র বায়ু-সংঘর্ষণের জোরে পিয়ানোর চাবিগুলোকে নড়াতে পারতেন! ঘরের মধ্যে একটা কাঁচের গেলাস রেখে, গেলাসের সমতানে কণ্ঠস্বর বেঁধে নিয়ে, ক্যারুসো গলার আওয়াজের জোরেই গেলাসটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে পারতেন! এ-ছাড়া ক্যারুসোর স্বর নালী ও দেহের হাড় প্রভৃতিতেও এমন-সব বিচিত্রতা ছিল, যাতে-ক'রে প্রমাণিত হয়, তাঁর আপদমস্তক ছিল সঙ্গীতেরই উপযোগী—তাঁর সারা-দেহই যেন একটি বাদ্যযন্ত্রের মত। ক্যারুসোর দেহ দেখে সেই পুরাণো প্রবাদটিকেও সত্য ব'লে বোঝা যায়, 'ঈশ্বর-দত্ত কণ্ঠ না থাকলে গান হয় না।'

প্রসাদ রায়।

আঁধি

২

মার আদরে মনের সমস্ত যাতনা ভুলিয়া নিখিল বলিল,—আজ মা তুমি মাষ্টার মশায়কে বলে পাঠিয়ো মা, আমায় যেন শীগ্‌গির-শীগ্‌গির ছুটি দেন। তোমার কাছে সেই আগেকার মত গল্প শুনব একটু।

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, তাই হবে। তুমি এখন পড়তে যাও। আমি তোমার জন্যে এখনি গিয়ে নিজের হাতে মোহন-ভোগ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিস্‌মিস্‌ দেব মোহনভোগে—কেমন?

—হ্যাঁ মা, অনেক কিস্‌মিস্‌ দিয়ো—আমার বেশ লাগে। আর মা, একদিন সেই—সেই জিনিসটা তৈরী করো না মা,—বড্ড খেতে ইচ্ছে কচ্ছে।

—কি জিনিষ?

নিখিল বলিল,—সেই যে শিমুলতলায় তৈরী করেছিলে, ডিম দিয়ে—সেই পুডিং—

সুষমা হাসিয়া বলিল,—বেশ, ওবেলায় বেড়াতে যাবার সময় পুডিং খেয়ে যেয়ো—দুপুরবেলা তৈরী করব'খন।

নিখিল মাকে চুমু দিয়া পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল। সুষমাও তাড়াতাড়ি গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া ছোট কড়া চাপাইয়া মোহন-ভোগ করিতে বসিল। খুন্তি দিয়া সুজি নাড়িতে নাড়িতে সে অতীতের কথা ভাবিতে-ছিল। শিমুলতলায় থাকিতে সেই যা ক'টা দিন নিখিলকে সে কাছে পাইয়াছিল। এখানে আসিয়া অবধি স্বামী নিয়ম-কানুনগুলা এমন দুরস্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন যে দুইজনকে একত্রে বসিয়া পরস্পরের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিবার একটু ফাঁক রাখেন্‌ নাই। প্রথম প্রথম এই ধরা-বাঁধা নিয়মগুলার বিরুদ্ধে সে একটু অনুযোগ তুলিয়াছিল, অভয়াশঙ্কর কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে গম্ভীর কণ্ঠে কি রূঢ় ভাবেই না তার জবাব দিয়াছিলেন! অভয়াশঙ্কর আরো বলিয়া দিয়াছিলেন, অন্দরে সুষমার বাঁচিয়া থাকাটা প্রয়োজন শুধু এই জন্যই যে নিখিল বুকের মধ্যে মা-নাই বলিয়া ফাঁকটা না বুঝিতে পারে! নহিলে তিনিও যেমন জানেন, সুষমাও তেমনি ভাল করিয়াই জানে, নিখিল মাতৃহীন! সুষমা সত্য সত্যই কিছু আর নিখিলের মা নয় যে নিখিলকে না দেখিলে দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিবে!

এত বড় রূঢ় কথার ঘা খাইয়া তাহার ছোট্ট অভিমান-ভরা অভিযোগ-উদ্যত মনটা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাহার এত স্নেহ, এই মমতা অভয়াশঙ্করের চোখে শুধু ভাণ মাত্র,—অভিনয়-মঞ্চের একটি রাত্রির অভিনয়ের মতই তাহা তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী! সত্য স্নেহের অধিকার যেখানে কেহ দিতে চাহে না, সেখানে স্নেহের দাবী করিতে যাওয়ার মত অপমানের ব্যাপার আর কিছুই নাই! বারবার ঘা খাইয়া সুষমা এ কথাটা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিল, তবুও নিঃসম্বলের একটিমাত্র সম্বল বলিয়াই সে নিখিলকে স্নেহার্ত্ত দুই উদ্যত বাহুর বন্ধনে বাঁধিবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়া যায়! তার উপর শুধু নিজের মনকে বুঝানোর ব্যাপার হইলেও সে বুঝাইয়া কোনমতে নিরস্ত করিতে পারিত, কিন্তু নিখিল—বেচারা নিখিল! অভাগা মাতৃহারা ছেলেটা যে তাহাকেই মা বলিয়া জানে! আর মা বলিয়া জানে বলিয়াই তো বাহিরের ঐ কঠিন বাঁধনের চাপে ব্যথিত জর্জ্জরিত হইয়া নিজের মনের পিপাসা মিটাইবার জন্য ছুটিয়া সে সুষমার কাছেই আসিতে চায়! অভয়াশঙ্করের কথায় প্রাণে পাষাণ বাঁধিয়া সুষমাও কি তাহাকে রূঢ় নির্দ্দয় ভাবে তাড়াইয়া দিবে, বলিবে, ওরে পলাইয়া যা রে, পলাইয়া যা!

তুই এ কাহার কাছে তোর ও-কিসের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আসিস্! আমি তোর মা নই, মা নই—যে-মার কাছে তোর স্নেহের আব্দার রক্ষা পাইত, যে-মা তোর সমস্ত ভুল-চুক, সমস্ত যাতনা জুড়াইতে পারিত, সেই মা তোর মরিয়া গিয়াছে! সে নাই রে, সে নাই! দারুণ জ্বালায় অহর্নিশি নিজে তাই দগ্ধ হইতে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া এ-সব কথা বলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া নিখিলকে সে কিছুতেই সরাইতে পারিবে না!

কিন্তু বুকে টানিবার চেষ্টা করিয়াই বা ফল কি! অভয়াশঙ্কর কিছুতেই তাহা বরদাস্ত করিবেন না! কেন? ওগো, এ বিরাগ কেন? এই প্রশ্নটার কোনো সমাধানই সুষমা খুঁজিয়া পায় না! নিখিল অভয়াশঙ্করেরই পুত্র, নিখিলের সুখই তাঁহার একমাত্র কাম্য! সেই নিখিলের পায়ে কোথাও কাঁটা ফুটিলে অভয়াশঙ্কর সেখানে বুক দিয়া পড়িতে চান, এমনি গভীর তাঁহার ভালবাসা। তবে সেই নিখিলকে সুষমা ভালবাসিতে গেলে, সেই নিখিলকে সুখী করিতে গেলে কেন তিনি মাঝে পড়িয়া দুইজনকে দুইঠাঁই করিবার জন্য এতখানি চঞ্চল হইয়া ওঠেন? সুষমা যদি পেটে একটা ছেলে ধরিত, তাহা হইলেও নয় স্বতন্ত্র কথা ছিল! কিন্তু সন্দেহের সে মূলটাকে স্বামীর মন বুঝিয়াই না সে নিজে হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! তবে? তবে? কেন গো তবে এই অমূলক শঙ্কা! অকারণ এই কঠিন শৃঙ্খলে বেচারার হাত-পা বাঁধিয়া দেওয়া কেন! ভাবিতে ভাবিতে সুষমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

তার পর এই কাল রাত্রিকার ঘটনা! বৃষ্টিতে ছেলের ঘরে ফিরিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। ছেলে না আসায় তাহার মনেও ভাবনা খুবই হইয়াছিল—নিজে পেটে না ধরিয়াও নিখিলের জন্য কাতর হইয়া কায়-মনে কেবলই সে ঠাকুরকে ডাকিয়াছে, এখানে-ওখানে চারিধারে লোক পাঠাইয়াছে, ঘর-বাহির করিয়া মরিয়াছে! সেই ছেলে ঘরে ফিরিয়া যখন না আসার স্পষ্ট কৈফিয়ৎ দিল—আর সে কৈফিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে-চোখে কত বড় অপরাধীর ক্ষমা-প্রার্থনার কি প্রকাণ্ড করুণ-মিনতি উছলিয়া পড়িতেছিল, তখন তাহাকে এমন রাক্ষসের মত কঠোর শাস্তি দেওয়া—এ কি মানুষের কাজ! সারারাত্রি নির্জ্জন ঘরে ছেলেটা খুনী-আসামীর মতই চাবি-বন্ধ পড়িয়া রহিল, মুখে একটু জল অবধি দিতে পাইল না—এ নৃশংসতা সুষমার বুকে বাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর বাজিয়াছে! কিন্তু কিছু করিবার উপায় ছিল না! সে মা নয়, মা নয়! সে যদি নিখিলের মা হইত, তাহা হইলে দেখিয়া লইত, অভয়াশঙ্কর কেমন করিয়া ঐ দুধের ছেলেকে মার কোল হইতে ছিনাইয়া অমন হাজত-বন্ধ আসামীর মত ঘরে পূরিয়া রাখিত! সে ভাবিল, হায়রে, পাছে পরের মুখে ছেলে কোনদিন জানিয়া ফেলে, সুষমা তার মা নয়, তার মা মরিয়া গিয়াছে এবং জানিয়া কোনদিন সে পাছে অশান্তি ভোগ করে, এজন্য বাড়ীর সমস্ত জঞ্জাল বাড়ীতে রাখিয়া স্বামী আসিয়া এই নির্জ্জন গ্রামে সুনন্দায় সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্যে নূতন বন্দোবস্তে জীবন-যাত্রার নূতন পালা আরম্ভ করিয়াছেন! কিন্তু এই যে ব্যবহারগুলা—ইহাতে ছেলের কি আর সে দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে কিছু

বাকী থাকিবে? এই যে সুষমার প্রতি ব্যবহার—এই দাসীর মত, বাঁদীর মত,—ছেলের মা বলিয়া বাহিরে লোকের সাম্‌নেও এতটুকু সম্মানের চোখে স্বামী তাহাকে দেখিতে পারেন না—এগুলার কারণ কি ছেলে কোনদিন খুঁজিতে যাইবে না? আর পাঁচটা বাড়ীতে এবং তাহার পড়িবার বইগুলাতেও ত সে মা আর ছেলের সম্পর্কের কথা নিত্যই দেখিতেছে, পড়িতেছে! তবে?

ভাবিতে ভাবিতে সুষমার মন শেষে ভাঙিয়া উঠিল। এটুকু সম্ভ্রম, এটুকু সম্মান দিবার শক্তিই যদি না রহিল, তবে লোককে মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া মা-হারা ছেলেকে মায়ের অভাব জানিতে দিবে না বলিয়া ভড়ং করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া আনা হইল কেন! বিবাহের পূর্ব্বে তাহার সামনেও যে অত-বড় প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া ছিলে—আমার মা-হারা নিখিলের মা হয়ে তুমি থাকবে,-তোমাকেই সে নিজের মা বলে জানবে—সে কথা যখন রাখিতে পারিবে না, তখন কেন তাহার এ সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে? কেন তাহাকে আগুনে পোড়াইবার জন্য ধরিয়া আনিলে! কেন এ মাতৃ-হৃদয়া নারীর এ স্নেহের পিপাসা চিরদিনের জন্য অতৃপ্ত রাখিলে! সুষমা ত তোমার কাছে কোনদিন কোন অপরাধ করে নাই! তোমার করুণার প্রত্যাশী হইয়াও সে দিন সে তোমার পথে দাঁড়ায় নাই! হারে স্বার্থান্ধ পুরুষ,—নিজের সুখটাকে ইন্দ্রের মত সহস্র চক্ষু মেলিয়া বেশ দেখিতে পাও ত, আর ক্ষুদ্র নারীর মনের অত-বড় যে ক্ষুধা—সেটা তোমার চোখেও পড়ে না!

দামু আসিয়া বলিল—মোহনভোগ হয়েছে মা?

সুষমা ডিশে মোহনভোগ তুলিয়া একটা চামচ-সমেত ডিশটা দামুর হাতে দিয়া বলিল,—এইটে দিয়ে এসে খোকাবাবুর দুধ নিয়ে যেয়ো, দামু।

দামু গমনোদ্যত হইলে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—খোকাবাবু পড়ছে ত?

—হ্যাঁ মা, পড়ছেন।

—তোর বাবু কোথায় রে দামু?

—কি জানি মা, কোথায় গেলেন যে! দুটি বাবু এসেছিল কোথা থেকে, তাঁদের সঙ্গে বেরুলেন।

২

নিখিল বসিয়া পড়িতেছিল,—C-l-o-u-d-s ক্লাউড্‌স্; ক্লাউড্‌স্ মানে মেঘসকল। G-a-t-h-e-r গ্যাদার; গ্যাদার মানে জড়ো হওয়া; In the sky মানে আকাশে। Clouds gather in the sky মানে আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছে। T-h-e-r-e দেয়ার; দেয়ার মানে সেখানে। w-o-u-ld উড্ b-e বী, would be মানে হবে। a—a মানে একটি। s-t-o-r-m ষ্টর্ম; ষ্টর্ম মানে ঝড়। There would be a storm মানে সেখানে একটি ঝড় হবে। তারপর হঠাৎ মাষ্টার মশায়ের পানে চাহিয়া সে বলিল—সেখানে কি মাষ্টার মশায়? কোন্‌খানে?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—ওখানে there কথাটা ইংরিজির মাত্রা—বুঝলে? ওটা idiom। ওর যে একটা বিশেষ-কোন মানে আছে, তা নেই,—অথচ there না দিলে ইংরিজি হবেই না। ও-সব ঘোর-প্যাঁচগুলো

একটু বড় হলে বুঝবে—এখন There would be a storm কথাটার মানে বলবে, ঝড় উঠবে।

ঝড়! নিখিলের অমনি মন পড়ার বই ছাড়িয়া কাল সন্ধ্যার সেই ঝড়ো হাওয়ায় গিয়া উঠিল। বিশাল নদী বাঘমতীর তীরে একটা গাছের তলায় কাল সন্ধ্যায় সেই সে দাঁড়াইয়াছিল। ঘন কালো মেঘে ওপার ঢাকিয়া গিয়াছিল, সেই মেঘের আঁধারে ওপারে গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, যেন প্রকাণ্ড একদল দৈত্য জলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাহার একটা ইঙ্গিতের আশায়! যেন সে ইঙ্গিতটুকু পাইলে এখনই ঝাঁপাইয়া পড়ে! নিখিল তন্ময় হইয়া ভয়-ভারাতুর মনে গাছগুলার দিকেই চাহিয়া ছিল। সহসা কোথা-হইতে সোঁ-সোঁ গর্জ্জন উঠিল। আর সে-ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই চারিধার ঝাপ্‌সা করিয়া কি সে বৃষ্টি নামিল! ভয়ে দিশাহারা হইয়া কোন্ দিকে যে পলাইবে কিছুই ঠাওর করিতে না পারিয়া একদিকে সে ছুট দিল। সে কি ছুট! তারপর সেই ঘন-ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে সে আসিয়া একটা কুটীরে আলোর একটু রশ্মি দেখিল, আর সেই কুটীরেই শান্ত-সুন্দর একটি গৃহকোণে তাহার আশ্রয় মিলিল—আহা, সেই গৃহকোণে সোনার, বনমালীর কি সে স্নেহ! কালিকার সেই দুর্য্যোগ রজনীর ভয়-গম্ভীর ভীষণতা আজ এ স্নিগ্ধ প্রভাতে স্মৃতির মাধুরীতে মাখিয়া কি সুন্দর ছবির মত মনে হইতেছে! সোনার সেই কলকাকলী বাঁশীর তানের মতই মধুর বোধ হইতে লাগিল। সেই খড়ে-ছাওয়া, মাটীর দেওয়ালে ঘেরা, মিট্‌মিটে প্রদীপের আলো-জ্বালা স্যাঁৎসেঁতে ঘরের মধ্যে কি সুখেই না তাহার সে সময়টুকু কাটিয়াছিল! সোনা ভাবিয়াছিল, সে রাজপুত্র,—তাহার তালপত্রের খাঁড়া আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে! নিখিল মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, সোনা নেহাৎ ছেলেমানুষ কিনা, তাই ও-সব গল্পগুলাকে সত্য বলিয়াই সে বিশ্বাস করে! তবু, হোক সে ছেলেমানুষ,—সোনার চলা-ফেরায় সে কাল যে স্বচ্ছন্দ সরল ভঙ্গীটুকু দেখিয়া আসিয়াছে, মুক্ত স্বাধীনতার যে অবাধ হিল্লোল তাহার কথার সুরে দৃষ্টির ভঙ্গীতে লক্ষ্য করিয়াছে, নিজে ছেলেমানুষ হইলেও সেটা হইতে সে-নিজে যে কি করুণভাবেই বঞ্চিত, তাহা সে বুঝিল। তাহার পিছনে এই যে মাষ্টার মহাশয়, দাসী, চাকর, দ্বারবান প্রভৃতির কড়া পাহারা, মাথার উপর পড়ার চাপ,—চলিতে ফিরিতে আইন-কানুনের কাঁটা আষ্টে-পৃষ্ঠে ফুটিয়া বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সোনাকে দেখিয়া তাহার অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া আজ যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কল্পনা-নেত্রে সে দেখিতে লাগিল, এই যে বৃষ্টি-ভেজা প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ আলোয় সে এই বন্ধ ঘরের মধ্যে এখন কতকগুলা ইংরাজী কথার মানে মুখস্থ করিয়া সারা হইতেছে, আর ওদিকে সোনা হয়ত এ-সময় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের দলে মিশিয়া গাছতলায় ঝরা ফুল কুড়াইয়া আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে!

সামনেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া আপনার দৃষ্টিটাকে নিখিল বাহিরে প্রসারিত

করিয়া দিল,—ঘরের পাশেই ছোট বাগান,—গাছের পাতাগুলা ভিজিয়া ধুইয়া চক্‌চক্ করিতেছে, গাছের নীচে মাটীর শুষ্ক ঢেলা ভিজিয়া নরম হইয়া রহিয়াছে—তুই-একটা পাখী নিঝুমভাবে বর্ষা-স্নাত প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে। এ সময়টা একবার যদি সে ছুটি পাইত—! তাহা হইলে এখনই সে পা দিয়া দলিয়া পিষিয়া ঐ নরম মাটীর ভিজা স্তূপটাকে কেমন চোস্ত করিয়া ফেলিত—ভাঙ্গা ছেঁড়া গাছের ডাল-পাতা লইয়া নরম মাটিতে পুঁতিয়া ছোট-খাট একটা বাগান তৈয়ার করিয়া ফেলিত। —পথের ওধারে যে মস্ত নালা আছে, জলে সেটা নিশ্চয় পুরিয়া গিয়াছে, আর সেই জল নদীর স্রোতের বেগেই ছুটিয়া চলিয়াছে,—সেই নালার জলে কাগজের নৌকা ভাসাইয়া দিত! আঃ, কি মজাই যে হইত! হায়রে, সে যদি বড়লোক জমিদারের ছেলে না হইয়া ঐ বনমালীর ঘরে সোনা কি তাহাদেরি ঘরের অন্য-একটা ছেলে হইয়া জন্মিত! নৈরাশ্যের এক তীব্র নিশ্বাস নিখিলের শিশু চিত্তটাকে তোলপাড় করিয়া ফুটিয়া বাহির হইল!

মাষ্টার মহাশয় তখন কাছে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিলেন। হঠাৎ নিখিলকে এত-বড় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া তাহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন। নিখিল তখনো শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—বসে আছ কেন নিখিল? পড়ো। তারপর—কি? বলিয়া বই-খানার পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন,—তারপর ঐ যে Birds are flying to their nests. Birds মানে পাখী—পড়ে যাও।

নিখিলের কল্পনার যে ফানুশ আকাশে উধাও হইয়া উড়িয়া চলিয়াছিল, মাষ্টার মহাশয়ের কথায় সে ফানুশ ছিঁড়িয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে সে আবার পড়িতে লাগিল,—B-i-r-d-s বার্ড্‌স্; বার্ড্‌স্ মানে পাখীগুলি।

বাহিরে তুই-চারিটা পাখী ভোরের আলোর দেখা পাইয়া রাত্রিকার দুর্য্যোগের কথা ভুলিয়া আনন্দে কলতান তুলিয়াছিল,—সে কলরবে নিখিলের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত আবার ঐ মেঘমুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশের পথে উড়িয়া চলিল। মুখ শুধু মাষ্টার মহাশয়ের আদেশ-চালিত কলের গান গাহিতে লাগিল—B-i-r-d-s বার্ড্‌স্; বার্ড্‌স্ মানে পাখীগুলি—B-i-rd-s বার্ড্‌স; বার্ড্‌স্; এ—বার্ড্‌স্ মানে পাখীগুলি।

৩

সারা তুপুরবেলাটা নিখিল হাতের লেখা আর অঙ্ক কষায় অনেকগুলা ভুল করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের হাতে সেগুলা শুধরাইবার জন্য তুলিয়া দিল। মাষ্টার মহাশয় ভুল কাটিতেছিলেন, নিখিলের মন সেদিকে কিন্তু কিছুতেই সায় দিতে চাহিল না,—সে শুধু মাথা নাড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাঘমতীর তীরে কাজল-কালো মেঘের তালে নাচিতে নাচিতে গাছের তলায় ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট ওপারের সেই গাছের সারি, কালো জলে তরঙ্গের সেই মৃদু-মধুর বিচিত্র দোলে রঙ্গ-নৃত্য,—লাল

পেন্সিলের দাগের মত কালো আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের সে দাপাদাপি,—আর সোনাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর—অপূর্ব্ব রঙীন্ ছবির মতই তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, আজও সে ঐ-ধারেই বেড়াইতে যাইবে। সোনাদের বাড়ীতে নাই গেল, সোনাদের বাড়ীর সামনে দিয়া সেই নদীর ধারের জাম গাছটার তলায় গিয়া বসিবে,—ওপারের কোণ ঘেঁষিয়া নদীর বাঁক সেই ঘুরিয়া গিয়াছে,—নদীটাকে কি মস্তই না দেখায়! সেইখানে গিয়া সে বসিবে, আর দিনের আলোয় বনমালীদের বাড়ীখানাও ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে! বনমালীদের সঙ্গে মিশিতেই বাবার বারণ আছে, তাহাদের ঘর-বাড়ী দূর হইতে চোখে যদি সে দেখে, তাহাতে ত আর বারণ নাই!

কোনমতে রুটিনের বাঁধা সময়টুকু এ খাতা পাড়িয়া ও-বই নাড়িয়া কাটাইয়া দিয়া সে খাবার খাইবার জন্য অন্দরে গেল। সুষমা ডিমের পুডিং করিয়া রাখিয়াছিল, পুডিং ও খাবার খাইয়া মার কাছেই সাজগোজ করিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। সুষমা বলিয়া দিল, —একলা যেয়োনা যেন আজ বাবা, আর সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরো। না হলে জানো ত, উনি আবার রাগ করবেন!

—সে ভয় নেই মা। নন্দকে নিয়ে আমি বেড়াতে যাব। বলিয়া তীব্র আগ্রহে নিখিল অনুগত নন্দ-ভৃত্যকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল।

নন্দ বলিল,—কোন্ দিকে যাবে, দাদাবাবু?

—চল্ না, এক জায়গায় আমি নিয়ে যাই। বেড়ে জায়গা, দেখবি। কখনো দেখিস্ নে।

আকাশে তখন মেঘ ছিল না—নন্দর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল। হাটতলা পার হইয়া শিবের মন্দির ঘেঁষিয়া, রায়েদের প্রকাণ্ড পানা-পড়া পুকুরটার পাড় ঘুরিয়া, অশথতলা দিয়া ক্রমে দুইজনে নদী-তীরের খোয়া-বাহির-করা পথে আসিয়া পড়িল। অদূরে 'গঙ্গা'যাত্রীর ঘাট, পাশেই শ্মশান। নন্দ বলিল—এই ঘাটে রাত্তির বেলায় আসতে পারো দাদাবাবু, তবেই বলি তুমি বীর!

নিখিল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কেনরে?

—বাবা, জানো না ত দাদাবাবু, এই ঘাটে মড়া পোড়ায়। রাত্রে এখানে ভূত-পেত্নীর মেলা বসে। ওঃ, সে সময় এধার দিয়ে চলে, কার সাধ্যি!

কথাটা শুনিয়া নিখিল মজা পাইল। সে বলিল,—দূর, ভূত-পেত্নী বুঝি আবার আছে! সে শুধু বইয়ের গল্প, সব মিথ্যে!

নন্দ বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলিল,—তবেই ত তুমি ভারী জানো দাদাবাবু! একদিন শুনবে তবে, কর্ত্তাবাবু এধারে ঐ যে মহিম ভশ্‌চাজ্যি আসে, তার বাড়ী এইদিক দিয়ে যেতে হয়—তা তাকে রাত্রে লণ্ঠন ধরে এগিয়ে দিতে এসেছিলুম কিনা—তখন ত দু'জনে ছিলুম, কিছু হলো না। তার পর একলা যখন ফিরছিলুম, আমার অত মনে ছিল না,-গান গাইতে গাইতে আসছি, যেমনি এই ঘাটের সাম্‌নে এসেচি অমনি ভেতর থেকে এমনি-একটা আলো জ্বলে উঠল আর সঙ্গে-সঙ্গে ফটাফট্ ফটাফট্ কাঠ ফাটার শব্দ! বাবারে কি লড়াই—আমি

ত চোঁচা দৌড় দিলুম। তারপর খানিক দুর এসেচি, আর পিছনে গোঁ-গোঁ আওয়াজ! আমি চালাক ছেলে, আর কি পেছন ফিরি? দৌড়, দৌড় দৌড়! একেবারে সেই হাটতলায় পৌছে তবে দাঁড়াই! তা তুমি দাদাবাবু এদিক্‌বাগে এলে বেড়াতে—! জানো না ত ব্যাপার!

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল—তোর মিছে কথা নন্দ। আচ্ছা, আজ ত এদিকে এসেচি, সন্ধ্যার সময় তুই যদি ভূত দেখাতে পারিস, তাহলে তুই যা চাবি, তাই দেব।

নন্দ ভীতস্বরে বলিল,—না দাদাবাবু, আমি কিচ্ছু চাই না তোমার কাছে। ও দেখাতেও পারব না। বাবারে, শেষে মরি আর কি ভূতের হাতে! সেদিন যে পালান্ পালিয়েছিলুম!

এমনি গল্প করিতে করিতে নিখিল বনমালীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ভিতরের উঠান হইতে ছেলেমেয়েদের খেলার কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল। নিখিলের মন অমনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, একবার বনমালীকে ডাকি! সোনা কি খেলা খেলিতেছে দেখিয়া যাইতে দোষ কি! কাল রাত্রে অত যত্ন অত আদর করিয়াছে। আহা! নিখিল দাঁড়াইয়া বনমালীর কুটীরের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। নন্দ বলিল,—দাঁড়ালে কেন দাদাবাবু? চল।

নিখিল বলিল,—কাল রাত্রে এদের বাড়ীতে ছিলুম রে আমি। সেই যে যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল—

নন্দর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এইখানে, সেই-ঝড় বৃষ্টির রাত্রে—আর অদূরে ঐ ঘাট, আর শ্মশান! কাল রাত্রে সে যখন বোসপাড়ার দিকে দাদাবাবুর খোঁজে বাহির হইয়াছিল, ঝড়ের গর্জ্জনে কি ভয়ই যে সে তখন পাইয়াছিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে নন্দ নিখিলের পানে চাহিল।

নিখিলের প্রাণ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল,—একবার ওদের ডেকে দেখব নন্দ? কাল আমায় অত যত্ন করেছিল—একবার শুধু বলে আস্‌ব,—যে অত জলে ভিজে কোন অসুখ করেনি আমার। তারা জান্‌তে চেয়েছিল—এইটুকু বলিয়া কি চঞ্চল আগ্রহে সে এক মুহূর্ত্তও নন্দর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একেবারে গিয়া বনমালীর কুটীরের দ্বারে ঘা দিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল,—কে? এ সোনার গলা, নিশ্চয়!

একটা অসহ্য আনন্দে নিখিলের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখ-চোখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই দ্বার খুলিয়া সোনা চীৎকার করিয়া উঠিল,—ও-মা, দেখ. দেখ, কালকের সেই রাজপুত্তুর এসেছেন।

সোনার মা আসিয়া আদর করিয়া নিখিলকে ভিতরে লইয়া গেল। উঠানে পাড়ার একপাল ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া কাণা মাছি খেলিতেছিল, তাহারা নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই ইংরাজী পোষাক-পরা ফুটফুটে ধনী-সন্তানকে দেখিতে লাগিল। নিখিল বলিল,—সোনা, তোমার বাবা কোথায়?

সোনা খুব সপ্রতিভভাবেই জবাব দিল, বলিল,—বাবা গস্তে গেছে। এখনি ফিরবে।

কথাটা বলিয়া সগর্ব্বে সে ক্রীড়া-সঙ্গীদের পানে চাহিল, অর্থটা,—দেখ, রাজপুত্রের সঙ্গে আমার ভাবের মাত্রাটা তোমরা দেখ একবার!

সোনার মা একটা বেতের মোড়া আনিয়া উঠানের মধ্যে পাতিয়া দিলে নিখিল তাহাতে বসিল। নন্দ দাওয়ার উপর চোরের মত বসিল, দৃষ্টি রহিল, মাথার উপর আকাশে বহু ঊর্দ্ধে যে একটা চিল উড়িতেছিল, তাহার পানে। সোনা বলিল,—আজ যদি আবার বৃষ্টি আসে, তাহলে বেশ হয়, —না? তাহলে বেশ কালকের মত অনেক রাত্তির অবধি থাকো। বলিয়া সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কথাটা শুনিয়া নিখিল মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিল, একবার আকাশের দিকেও চাহিল—আকাশ আজ পরিষ্কার, কোথাও মেঘ নাই। আঃ! সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

তারপর সোনার সঙ্গে কত কথাই যে হইল—। কোনটা বইয়ে পড়া, কোনটা বা মার কাছে শোনা এমনি নানা গল্প বলিয়া নিখিল তাহার এই ক্ষুদ্র ভক্তটির চিত্ত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল। সোনা স্থির হইয়াগল্প শুনিতে লাগিল, আর তাহার খেলুড়ির দল প্রথম-বিস্ময়ের মাত্রা কাটিলে দূরে বসিয়া পড়িল এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে সে-সব গল্প শুনিতে লাগিল।

সোনা বলিল—মার কাছে সেই বুড়ো দত্যির গল্পটা শুনবে? বেশ গল্প। বল না মা, রাজপুত্তর সে গল্পটা শুনবে,—বলো—

সোনার মা ছোট একখানি পরিষ্কার ডালায় নারিকেলের কুচি ও সদ্য-ভাজা গরম মুড়ি আনিয়া নিখিলকে বলিল,—দুটি খাও, বাবা, খাও—নাহলে আমাদের মনে দুঃখ হবে। কাল ঐ রাতে তোমায় পাঠিয়ে অবধি মন এমনি হয়েছিল—যে বাছার আমার অসুখ না করে! সুখী প্রাণ, যে জল-ঝড় মাথার উপর দিয়ে গেছে! সোনার বাপ্ বলছিল, আজ রাত্রে গিয়ে খপর আনবে—সারাদিন ত আর একতিল ফুরসুত্ পায় না।—আর সোনা যে কত কথাই বলছিল—কেবলি বলছিল,—আমি রাজপুত্তুরের বাড়ী যাব, যাবই মা—কি আব্দারই যে ধরেছিল। সোনার মা নন্দকেও মুড়ি দিল—নারিকেল দিল; তারপর নিখিলকে বলিল,—গল্প শুনবে? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি গাইটেকে খড় দিয়ে এসে গল্প বল্‌চি।

সোনার মা কাজ-কর্ম্ম সারিয়া গল্প বলিতে বসিল। ও-দিকে সূর্য্যের আলো ম্লান হইয়া আসিয়া ক্রমে নিভিয়া গেল—বনমালীর উঠানও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। গল্প শুনিতে-শুনিতে নিখিল বা নন্দ কাহারো সেদিকে খেয়াল ছিল না। গল্প যখন থামিল, আকাশে তখন অনেক-গুলা তারা ফুটিয়াছে। দেখিয়া নিখিলের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। এ কি—এ যে রাত্রি হইয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ—আজ কি আর বাবার কাছে রক্ষা থাকিবে!

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, বলিল—রাত হয়ে গেছে, আমরা যাই।

সোনার মা বলিল,—একটা আলো দি বাবা,—যে অন্ধকার পথ!

নিখিল খুব ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

না, না, আলোর দরকার নেই। আমি নন্দর সঙ্গে যাব। বলিয়া সে আর বিদায়ের কালে কোন কথা না পাড়িয়া একেবারে ছুটিয়া দ্বারের বাহিরে পথে গিয়া দাঁড়াইল—নন্দকে চুপি-চুপি বলিল—নন্দ, ছুটতে পারবি? ছুটে যাই, চ, নাহলে বেশী রাত হলে বাবার কাছে বকুনি খাব।

নন্দরও ভয় হইতেছিল। সে বলিল—ছুটতে পারব দাদাবাবু। দেখ দেখি, তুমি যদি গল্প শুনতে না বসতে!

—তুই ত আমায় বলিস্‌নে নন্দ, যে রাত হয়ে গেছে!

—বাঃ, আমিও যে গল্প শুনছিলুম—আমি কি খেয়াল করেচি যে রাত হয়েছে!

কথা কাটাকাটি করিয়া ফল নাই বুঝিয়া নিখিল বলিল,—আয়, ছুটে আয়। ছুটে গেলে কতক্ষণই বা লাগবে?

দুইজনে তখন ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কত পথ ছুটিবে? খানিক ছুটিয়া নিখিল হাঁফাইয়া পড়ে, অমনি আবার ধীরে ধীরে চলে—আবার যেই দেখে, অন্ধকার খুব গাঢ় ঘন হইয়া আসিয়াছে, ঐ যে গাছপালায় ঝোপে-ঝাপে ঝিঁঝিঁর রব রাত্রিটাকে আরো ভারী করিয়া তুলিয়াছে, তখন সে আবার ছুট দেয়। এমনিভাবে কখনো ছুটিয়া কখনো ধীরে চলিয়া আবার কখনো বা থামিয়া দম্ লইয়া নন্দর সঙ্গে নিখিল যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

চোরের মত পা টিপিয়া সে ধীরে ধীরে পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। সর্ব্বনাশ,—অভয়াশঙ্কর সেখানে বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সে ঘরে ঢুকিতেই অভয়াশঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন,—নিখিল।

—বাবা—বলিয়া নিখিল পিতার পানে চাহিল।

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—তুমি ঘড়ি দেখতে শিখেচো, না? ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, শিখিয়াছে।

দেওয়ালে ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কটা বেজেছে বল তো!

সর্ব্বনাশ! নিখিল ঘড়ির দিকে চাহিয়া চোখ নামাইল, কোন কথা বলিল না। অভয়াশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—বল।

নিখিল ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল,—ন'টা বাজতে বারো মিনিট—

—হুঁ। এখন পড়। রাত্রে দু'ঘণ্টা তোমার পড়বার কথা। এগারোটা বাজতে বারো মিনিট হবে যখন, তখন পড়া বন্ধ করে ভিতরে খেতে যাবে, তার আগে খাওয়া বা ঘুম কিছুই হবে না—বুঝলে! এ কথা মনে থাকবে?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, থাকিবে।

—বেশ। বলিয়া অভয়াশঙ্কর কক্ষ ত্যাগ করিলেন। নিখিল টেবিলের ধারে চেয়ারে গিয়া বসিয়া বই খুলিল।

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—ভূগোলখানা খোলো। আজ এশিয়াটা সব দেখে রাখো, কাল সকালে উনি ঐ পড়াটা নেবেন, বলে গেছেন।

নিখিল ধীরে ধীরে ভূগোল খুলিয়া বসিল। এতখানি পরিশ্রমের পর ক্ষুধায় কাতর দেহ,—চোখে ঘুমের ঘোর জড়াইয়া আসিতেছে,

তবুও সে চোখের কোণে জলও জমিয়া উঠিতেছিল,—সে জল শেষে এমনি ঠেলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল যে বইয়ের পৃষ্ঠা হইতে বড় বড় মোটা অক্ষরে লেখা এশিয়া কথাটা একেবারে অস্পষ্ট, লুপ্ত হইয়া গেল। কাণের কাছে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা দুলিয়া-দুলিয়া এমনি শব্দ করিতে লাগিল যে নিখিলের মনে হইতে লাগিল, ঘড়িটা যেন রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর —এই কথাটাই বার বার বিদ্রূপচ্ছলে উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শুনাইতেছে। রাজপুত্র! হাঁ, সে রাজপুত্রই বটে—বন্দী রাজপুত্র!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের বাঙ্গালা সমস্যা-পূরণ। কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি-এ সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রকাশক, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ভিক্টোরিয়া প্রেস ও গিরীশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। সেকালে রাজসভায় কবির কিরূপ সমাদর ছিল, তাহা যাঁহারা ইতিহাসের সহিত একটুও সম্পর্ক রাখেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। রস-কবি কৃষ্ণকান্ত কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তিতে কৃষ্ণকান্তকে সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তিনি মুখে-মুখে পয়ার ত্রিপদী ও চতুষ্পদী ছন্দে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কেহ কোন সমস্যা দিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র তাঁহাকে রস-সাগর উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি যেমন সুরসিক ও সুচতুর ছিলেন, তেমনি আমোদ-প্রিয় ও সুবক্তাও ছিলেন। দ্রুত রচনা সম্বন্ধেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সমস্যা-পূরণের কবিতাগুলি কবিত্বে মণ্ডিত। এই গ্রন্থে রস-সাগরের প্রায় তিনশতাধিক সমস্যা পূরণের কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। সম্পাদকের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম অসাধারণ—সন্দেহ নাই, এবং তিনি ভূমিকায় রস-সাগরের জীবনী ও কবিত্বের যে আলোচনা করিয়াছেন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার মূল্য বড় অল্প নয়। রাজার সভায় নানান্ ধরণের লোক উপস্থিত থাকিতেন ; কেহ একটা ছত্র ফরমাস করিলে রস-সাগর ছন্দোবন্ধে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। দুই-একটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একদিন শ্রীশচন্দ্র সভায় বসিয়া সমস্যা বলিলেন—'বধূর অধর নয় এত সুমধুর'—রস-সাগর অমনি কবিতা রচনা করিলেন,—

জামায়ের যে আদর শ্বশুর বাড়ীতে
আঙুরের সে আদর কাঠের কৌটাতে।
কৌটার ভিতরে তারে গদীর উপরে
থরে থরে শোয়াইয়া রাখে সমাদরে।
কি কব তাহার রূপ—বলা নাহি যায়,
কালিদাস হার মানে বলিতে তাহায়।
কোথা লাগে মুক্তা মালা আঙুরের কাছে,
ইচ্ছা করে গলে ধরি গাল যায় পাছে।
তুলতুলে দেহখানি কিবা সুকোমল
টলটল্ ঢলঢল্ করে অবিরল।
তাহার গুণের কথা কি কহিব আর—
গণ্ডা গণ্ডা মোণ্ডা খাও—তার কাছে ছার!
দাম শুনে গরীবের কালঘাম ছোটে
হাম্ হাম্ পুরে দেয় ভাগ্যবান পেটে!
ধন্য হে কাবুল, ধন্য তোমার আঙুর—
'বধূর অধর নয় এত সুমধুর'!

মহারাজ গিরীশচন্দ্র একদিন সভায় এক মূর্খ ব্রাহ্মণকে

দেখিয়া সমস্যা বলিলেন—"বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য—মহাবিড়ম্বন।" রস-সাগর সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন—

হরিহীন শেষনাগ, গঙ্গাহীন দেশ,
তৈলহীন কেশপাশ, উর্ণাহীন মেষ
ভূমিহীন ভূমি-পতি, গন্ধহীন ফুলে,
নারীহীন অট্টালিকা, পুত্রহীন কুলে।
বারিহীন সরোবর, ধর্ম্মহীন জন—
বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য মহাবিড়ম্বন।

এমনি তিনশতাধিক সমস্যা-পূরণের কবিতায় গ্রন্থ খানি পূর্ণ। কবিতাগুলি উপভোগ্য ত বটেই—তাছাড়া বঙ্গীয় কবিতার ইতিহাসে এগুলির স্থান কোথায় তাহাও বিবেচ্য। এ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া সম্পাদক মহাশয় বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য তিনি বঙ্গ সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। বহিখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই চমৎকার।

খোকার বই। শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুবিনয় রায়, ইউ রায় এণ্ড সন্স, ১০০ নং গড়পার রোড, কলিকাতা। ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা গল্পের বই। দশটি ছোট গল্প আছে—রাক্ষসী রাণী, নাপিত রাজা, চার কন্যা, রামধনের স্বর্গলাভ, প্রজাপতি ও মৌমাছি, গোয়ালার ছেলে, দুবার ভোজ, দুষ্ট শেয়াল, চার বন্ধু ও তেল চুকচুকি। গল্পগুলির ভাষা বেশ হাল্‌কা ঝর্‌ঝরে; লিখিবার ভঙ্গীটুকুও বেশ মিঠা। 'প্রজাপতি ও মৌমাছি' গল্পটির কবিত্ব ছোট্ট পাঠক-পাঠিকাদের বেশ উপভোগ্য লাগিবে; সব-চেয়ে মজার গল্প হইয়াছে তেল-চুকচুকি; গল্পটিতে নূতনত্ব আছে। বইখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে। ছবিগুলি ভালো।

নারীর কথা। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। চন্দননগর, বোড়াই চণ্ডিতলা, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীরামেশ্বর দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। নারীর কথা, নারী-সমস্যা, নারী-স্বাতন্ত্র্য, বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধ, দাম্পত্য সম্বন্ধের কথা, এবং পুরুষ ও নারী—এই ছয়টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক ছোট একটু নিবেদন লিখিয়াছেন;—সমস্ত বহিখানির Key-note এই ক্ষুদ্র নিবেদনে তিনি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। বহিখানিতে বর্ত্তমান যুগের নারীর অধ্যাত্ম ও আধিভূত জীবনের কথা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম জীবন বলিতেই আমাদের পাইয়া বসে সন্ন্যাসীর আদর্শ; সমবেত সাধনার কথা তুলিলেই আমরা ভাবি কেবল পুরুষের সাধনা—আমাদের জীবনের গভীরতম প্রয়াস হইতে নারীকে বয়কট করার যে চেষ্টা তাহা একান্ত অসম্ভব না হইলেও অনাবশ্যক।" নারীর কথা এবং নারী-সমস্যা—নিবন্ধ দুইটিতে এই কথাই লেখক বেশ সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বাকী কয়টিতে তাঁহার বক্তব্য—"এই গভীরতম অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে নারী আপনার স্থান করিয়া লইবে। সেজন্যও বটে এবং ইহার নিজস্ব মূল্য আছে বলিয়াও বটে, আধিভূত জীবনে অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে নারীর মুক্তি চাই, চলিবার ফিরিবার বাড়িবার বৃহৎ অবকাশ চাই। পরিণামের ভয় করিলে হইবে না।" এ বক্তব্যও তাঁহার লেখার গুণে যুক্তির ধারায় সুন্দর ফুটিয়াছে। লেখক ঠিকই বলিয়াছেন, "নারী গৃহলক্ষ্মী। স্বাস্থ্যে শক্তিতে সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে সে গৃহটি গড়িয়াছে, সাজাইয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে—অন্তরের গৃহ ও বাহিরের গৃহ, আমার এই আধার-রূপ গৃহ আর আমার জীবন-গৃহ। নারী-ব্যতিরেকে গৃহ নাই; গৃহ ছাড়া জীবন নাই, জগৎ নাই। নারীই হইতেছে কেন্দ্র, তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার চারিদিকে সমাজ দানা বাঁধিয়াছে।" দেশের সৌভাগ্য দেশের সুধী ব্যক্তিরা নারীর মর্য্যাদা আজ বুঝিতে শিখিয়াছেন—নারী যে শুধু অন্ন পাকাইয়া তুলিবার যন্ত্র নহেন—তাঁহার মন আছে;—বুদ্ধি আছে, প্রাণ আছে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে—এটুকু দেশের সুধী সমাজ কতক বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই দেশের নাট্যে, উপন্যাসে, কাব্যে Sex Problem এর আলোচনা চলিয়াছে,—এবং তাই লেখকও ঠিক বলিয়াছেন,—আত্ম-বোধনের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে "কিন্তু পুরুষ

জোর করিয়া সে পথ দেখাইতে চাহিলে ঠিক হইবে না; বরং নারী নিজে যদি চলে নিজের পথে—তবে হয়ত কত অপ্রত্যাশিত সত্য সৌন্দর্য্য তাহাতে ফুটিয়া উঠিবে, পুরুষের চিন্তা পুরুষের সংস্কার তাহা ধারণাও করিতে পারে না।" এই গ্রন্থখানি দেশে এই নারী-সমস্যার যুগে চিন্তার বহু খোরাক যোগাইবে। গ্রন্থখানির প্রধান গুণ—ইহার কোথাও গোঁড়ামি নাই, ভালো-মন্দ সকল দিকই সমাজের তরফ হইতে বেশ নিরপেক্ষভাবে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। আশা করি, সমাজের কথা যাঁহারা ভাবেন, সমাজের যাঁহারা হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা এ গ্রন্থ-পাঠে ঔদাসীন্য করিবেন না।

রংমশাল—। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত। প্রকাশক, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা দশ আনা। এখানি ছেলেমেয়েদের জন্ম লেখা কবিতা গল্প ও ছবির বই, বৎসরে একবার করিয়া পূজার সময় বাহির হয়। এবার রংমশালের দ্বিতীয় বর্ষ। বইখানি ছবিগল্প কবিতার সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের নূতন নূতন লেখা গল্পে কবিতায় প্রতি পৃষ্ঠা, কলাকুশল শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের হাতে আঁকা বিচিত্র ছবিতে উজ্জ্বল। প্রথমেই জগৎকবি রবীন্দ্রনাথের ফ্যাক্ সিমিলি হস্তাক্ষরে তাঁহারই লেখা অপূর্ব্বকবিতা "রবিবার"—ছন্দে ঝঙ্কারে ভাবে-ভাষায় এমনি চমৎকার যে ছেলেমেয়েরা পড়িবামাত্র মুখস্থ করিয়া ফেলিবে। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর পাইয়া তাহারা খুব খুসী হইবে। তারপর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজপুতানার গল্প "ভায়ে-ভায়ে"—পৃথ্বিরাজ, সঙ্গ ও জয়মলের বিচিত্র কাহিনী তুলির নিপুণ টানে ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিশু-লেখক মোহনলালের "মগের মুলুকে," "ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনের "রাখীপুর্ণিমা," সুলেখক হেমেন্দ্রকুমারের "কাঠুরের কপাল" প্রবাসীর সহঃসম্পাদক চারুচন্দ্রের "বোকা চাষা" এবং ভারতী-সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহনের "না-দি আর না-ছাড়ি" এই ত সব গল্প হাস্যে-কৌতুকে চটুল-করুণ বিচিত্র রসের গল্পগুলি যেমন রমণীয়, তেমনি মধুর। তারপর নরেন্দ্র দেবের কবিতা "শরতের ডাক," "গল্প" ও "ভূতোর কাণ্ড"; কবি সত্যেন্দ্রনাথের "সাঁতার সঙ্গীত," "বর্ষার ফুল" স্বপন-বোনা কবি কিরণধনের মিঠা হাতের "শরতে," গিরিজাকুমারের "খুকী"—কবিতাগুলিতে সুরের ফোয়ারা যেন উছলিয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর বাইশখানি ছবি—নিপুণ আর্টিষ্ট চারু রায়, ৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—ইঁহাদের হাতের নিপুণ তুলির লেখা। তাহার উপর চকচকে ঝকঝকে কাগজে ঝরঝরে ছাপা ছেলেদের বার্ষিক উপহারের এ বইখানি বাঙলা ভাষার অলঙ্কার, বাঙলা দেশের অলঙ্কার —পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ Childrens' Annaulগুলির সঙ্গে বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য্যে সমান আসন দাবী করিবে—এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। বাঙলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে-হাতে এ বই বিরাজ করুক, বাঙালীর সংসার তাহা হইলে হাস্যে-আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। ছেলেমেয়েদের মনে আনন্দ দিতে তাহাদের তরুণ চিত্তে কল্পনার খোরাক জোগাইতে তাহাদের শিক্ষা দিতে এমন বই বাংলা দেশে আর নাই—একথা বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না। বইখানি যাহাতে সকল ঘরে সকল ছেলেমেয়ের হাতে পৌঁছিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় এবৎসর রংমশালের দাম করিয়াছেন, এক টাকা দশ আনা। দাম খুবই সস্তা হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



দাসখৎ

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

(ক্যালক্যাটা রিভিউ-পত্রের সৌজন্যে)

ভারতী

৪৫শ বর্ষ]　　মাঘ, ১৩২৮　　[দশম সংখ্যা

আবেস্তা সাহিত্য

আধুনিক যুগের যাবতীয় বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্রভূমি হইয়াছে ইউরোপ। আর আমাদের দেশে আলোচনার অভাবে দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাসাদি কেবল লোপ পাইয়াই আসিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে জ্ঞান-গরিমা ও সভ্যতার আলোকে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া চিন্তা করিতে যে-আনন্দে আমাদের বুক নাচিয়া উঠে, সে কেবল আমাদের বহুকাল-বিস্মৃত প্রাচীন সভ্যতার সহিত আধুনিক যুগের অভিনব পরিচয় বশতঃ স্বাভাবিক আত্মতৃপ্তি বা আত্মশ্লাঘার নিদর্শন। যে বেদ লইয়া আমরা প্রাচীনতার অভিমানে উন্মত্ত, সে বেদ আমাদের ছিল কোথায়? বিস্মৃতির করাল কবল হইতে আমাদের বেদকে রক্ষা করিয়াছেন ইউরোপীয় প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ মনস্বিগণ। আমরা যাহা ভুলিয়াছি তাঁহারা তাহা আবিষ্কার করিতেছেন। আমাদের প্রাচীন কালে যে সভ্যতা ছিল, আধুনিক যুগে তাহা লুপ্ত। পশ্চিমে প্রাচীনকালে কিছু না থাকিলেও আধুনিক যুগে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার একত্র সঞ্চিত। সুতরাং প্রাচীন সভ্যতার অন্ধকারে বিচরণ করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের পন্থা অবলম্বনীয়। অতএব যে কোন বিষয়ের জ্ঞানালোচনা আমরা করিতে যাইব, সেই বিষয়েই পাশ্চাত্য দেশের আলোচনা, গবেষণা বা অনুসন্ধানের ইতিহাস আমাদের জানা আবশ্যক। তাই ইরাণীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার আলোচনা করিতে হইলেও ইউরোপে এ বিষয়ে কি আলোচনা হইয়াছে, তাহার ইতিহাস সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য।

আবেস্তা বা জেন্দ্-আবেস্তা অগ্নি-উপাসক পার্সীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বা বেদ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব

যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই রূপ অতি প্রাচীন কালে ইরাণ বা পারস্য দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে (বা তৎসন্নিহিত কোনও অজ্ঞাত দেশে) জরথুষ্ত্র (zoroaster) এই জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পার্সীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এই আবেস্তার সহিত তাঁহাদের ঋষি জরথুষ্ত্রের নাম যে ভাবে সংলিপ্ত, আমাদের বেদের সহিত সেরূপ কোনও একজন ঋষির নাম সম্পৃক্ত নহে। আমাদের বেদ যেমন অপৌরুষেয়, পার্সীদিগের আবেস্তাও তেমনি অপৌরুষেয়। কিন্তু আমাদের বেদমন্ত্র-সমূহের সহিত যেমন অসংখ্য ঋষির সম্পর্ক, আবেস্তার সেরূপ নহে। আবেস্তার একজন ঋষি জরথুষ্ত্র। এই জরথুষ্ত্র নামের অর্থ লইয়াও নানা মত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জরথ (√জৃ, আ.√জর, জরাপ্রাপ্তি) ও উষ্ত্র (সং উষ্ট্র) লইয়া জরথুষ্ত্র শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'বৃদ্ধ-উষ্ট্র-রক্ষক', বা 'জরথ' (—সং হরিত) শব্দের 'পীত' বা 'হরিত' অর্থ করিয়া 'পীত-উষ্ট্র-রক্ষক।' পার্সী পুরোহিতগণ 'উষ্ত্র' শব্দ উষ্ দীপ্তৌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ করেন,'যাঁহার দীপ্তি হরিত বা স্বর্ণ বর্ণ।' ল্যাসেন (Lassen) ও উইণ্ডিশ্‌মান (Windischmann) 'স্বর্ণ-বর্ণ-তারকা' (golden star) বলিয়া জরথুষ্ত্র শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন।

আবেস্তা বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং অতি প্রাচীনকালে সাইরস্ (Cyrus), দরিয়স্ (Darius), জরাক্সিস্ (Xerxes) প্রভৃতি আকিমিনীয় নরপতিগণ (Achaemenian kings) এই জর-থুষ্ট্রীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ম্যাসিডোনিয়াধিপতি সিকন্দরের(Alexander) রণ-পিপাসায় সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল আবেস্তা গ্রন্থ, এবং জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বী পার্সীগণ। বলদর্পী সিকন্দর অগ্নি-উপাসক পার্সীগণের ধর্ম্মগ্রন্থের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির অগ্নিসংস্কার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। রণলীলার অবসানে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলে পর, জরথুষ্ত্রীয়-গণ নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের পুনঃসংস্কার পূর্ব্বক যেই নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন, অমনি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্মা-বলম্বীগণ রণোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া জরথুষ্ত্রীয়-গণের দেশে আসিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করিয়া বলিল—"কোরাণের ধর্ম্ম গ্রহণ কর,অথবা তোমাদের উপাস্য দেবতা অগ্নিদেবের শীতল স্পর্শে নির্ব্বাণ লাভ কর।" দেশব্যাপী শোণিত-স্রোত ও অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে এবং ততোধিক ধর্ম্মনাশের ভয়ে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জন্মভূমির মোহ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ জরথুষ্ত্রীয়গণ ভারতবর্ষের সুরাট ও বোম্বাই অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি তাঁহারা ভারতবর্ষে। বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সংখ্যা ৩০০০০ হইবে। যাঁহারা মুসলমানদিগের নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অদ্যাপি ইরাণ দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইবে আন্দাজ ১০,০০০।

পূর্ব্বে আবেস্তা গ্রন্থের সহিত পহ্লবীভাষায় অনুবাদ বা ব্যাখ্যা থাকিত, এবং মূল ও টীকার একত্র নাম ছিল 'অবিস্তাক্-প-জন্দ',

অর্থাৎ 'আবেস্তা ও তাহার ব্যাখ্যা'। 'অবিস্তাক্' বা 'আবেস্তা' শব্দের অর্থ বোধ হয় আমাদের 'বেদ' শব্দের তুল্য 'জ্ঞান, বিদ্যা, বা বেদ গ্রন্থ।' ফরাসী যুবক আঁকেতিল দ্যু পেরঁ (Anquetil du Perron) এদেশে আসিয়া পারস্য ভাষা শিখিয়া তাহার সাহায্যে পার্সী পুরোহিতদিগের নিকট মূল আবেস্তার জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া এদেশ হইতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া লইয়া ইউরোপে গিয়া যখন ফরাসীভাষার সাহায্যে সেই জ্ঞানের প্রচার করিয়া চিরস্মরণীয় হন, তখন তাঁহারই একটী প্রমাদও তাঁহার নামের তথা আবেস্তার আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারই ভ্রমবশতঃ ভাষার নাম জেন্দ্ (Zend) এবং গ্রন্থের নাম জেন্দ্-আবেস্তা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থের নাম আবেস্তা ও তাহার পহ্লবী টীকার নাম জেন্দ্। টীকা না থাকিলে 'সাদা' শব্দ বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'ভেন্দিদাদ্ সাদা'।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের প্রাচীন অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিষয়ে ইউরোপীয়গণের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে এবং খ্রীষ্টীয়গণের বাইবেল গ্রন্থে আবেস্তা ও আবেস্তা-ধর্ম্মিগণের স্থানে স্থানে উল্লেখমাত্র আছে। হেরোডোটস্ (৪৫০ পূঃ খ্রীঃ) তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থে পারস্য-বাসিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। প্লুটার্ক (Plutarch), প্লিনি (Pliny) ও অগথিয়সের (Agathias) সময় (৫০০ খ্রীঃ অব্দ) পর্য্যন্ত ইরাণীয়গণের বিষয়ে এই প্রকার সামান্য সামান্য উল্লেখমাত্র হইয়াছে।

মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক পারস্য-বিজয়ের পর মস্উদী নামক একজন আরবী ভাষার লেখক ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জেরদুস্তের আবেস্তা, জেন্দ্ নামক তাহার টীকা ও তৎসহ একটী পাজেন্দ্ টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। আন্দাজ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌বিরুণী অবাস্তার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে শাহরাস্তানী নামক জনৈক মুসলমান লেখক 'মগী' বা জরথুষ্ত্রীয়গণের ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বার্-বাহ্‌লুল-সংগৃহীত সীরীয়-আরবী অভিধানে 'জর্দুস্তের' 'আবস্তাক' গ্রন্থের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ সাত ভাষায় লিখিত। সেই সাত ভাষা—সীরীয় (Syriac), পার্সী, অরমীয়, সেগেস্তানীয়, মার্ভীয়, গ্রীক ও হিব্রু। তৎপূর্ব্বে ৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত New Testament এর একখানি সীরীয় ভাষায় লিখিত টীকায় মোসুলের নিকটবর্ত্তী হদথ নামক স্থানের বিশপ ঈশোদাদ লিখিয়াছেন যে, জর্-দুশ্‌ত্ দ্বাদশ ভাষায় 'আভাস্তা' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আবেস্তা বিষয়ে এই সকল উল্লেখ কেবল বিদেশীয়গণই করিয়াছেন; ইরাণ দেশের কোনও বিবরণ এ পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) ইউরোপীয়গণের অধিগত হয় নাই।

ইহার পর খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জরথুষ্ত্রীয়গণের ধর্ম্মগ্রন্থ বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পারী (Paris) নগরে বার্ণাবি ব্রিসঁ (Barnabe Brisson) এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া De Persarum Principatu নামে

একখানি গ্রন্থ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তাহার পরে ইটালী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের যে-সকল প্রাচ্য পর্য্যটক ইরাণীয়গণের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পিয়েত্রো ডিলা ভেলি (Pietro della Valle, 1620), হেনরী লর্ড (Henry Lord, 1630), মাণ্ডেল্‌সো (Mandelso, 1658), ট্যাভার্ণিয়র (Tavernier, 1678), চার্ডিন (Chardin, 1721) ও ডু চিনন্ (Du Chinon) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্সফোর্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত টমাস্ হাইডের (Thomas Hyde, 1700) পরিশ্রম এ ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। তাঁহার গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং তাহার নাম Historia Religionis veterum Persarum. ইনিও মূল আবেস্তা পাঠ করেন নাই। কেবলমাত্র পার্সীদিগের কৃত অনুবাদাদি দেখিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেন। মূল আবেস্তা একালে যে ইংলণ্ড দেশে ছিল না, তাহা নহে। Canterbury সহরে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'যশ্ন' গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত ছিল। হাইড্ আবেস্তা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য প্রায়ই সকলকে অনুরোধ করিতেন। জর্জ বৌচর (George Boucher) নামক একজন ইংরাজ সুরাটে পার্সীদিগের নিকট একখানি 'ভেন্দিদাদ সাদা' সংগ্রহ করিয়া ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে (Bodleian Library) দুষ্প্রাপ্য বস্তু বলিয়া রাখিয়া দেন।

এ পর্য্যন্ত কেহই মূল আবেস্তা পড়িতে পারেন নাই। আঁকেতিল দু পেরঁ নামক একজন উদ্যোগী ফরাসী যুবক বিচিত্র উপায়ে ভারতবর্ষে আসিয়া মূল আবেস্তা পাঠ করিতে শিক্ষা করেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে একখানি আবেস্তার পাণ্ডুলিপির অঙ্কিত প্রতিলিপি পারীনগরে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়। তাহা দেখিয়া দুপেরঁর মনে এক অদ্ভুত বাসনা জাগরিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, পারস্য কিম্বা ভারতবর্ষে যাইয়া পার্সী-পুরোহিতগণের নিকট এই বিদ্যা শিখিবেন। কিন্তু কি উপায়ে ? সুদূর ভারতবর্ষে যাইবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া তিনি ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় সেনা-বিভাগে একজন সৈনিকরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত যাত্রা করেন। তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য ও অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাইয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সৈনিকের কার্য্য হইতে মুক্তি দান করেন ও ভারতবর্ষে যাতায়তের ব্যয়ভার বহন করেন। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উদ্যোগী পণ্ডিত দুপেরঁ সুরাটবন্দরে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু পার্সী পুরোহিতগণ তাঁহাকে আবেস্তা পড়াইতে রাজি হইলেন না। তিনি তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইলেন না। পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি পার্সী পুরোহিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাদের সমাজে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে পুরোহিতগণের চিত্তপ্রসাদন হইলে তিনি তাঁহাদের নিকট প্রথমে আবেস্তার ভাষা ও তৎপরে ধীরে ধীরে তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহারের জ্ঞান লাভ করেন। সাত বৎসর এইভাবে কাটাইয়া তিনি মূল আবেস্তার পাণ্ডুলিপি লিখিয়া লইয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা

করিলেন। পথে অক্সফোর্ড বোড্‌লিয়ন লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপির সহিত স্ব-কৃত পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া লইয়া বুঝিলেন যে, পার্সী পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক তিনি প্রতারিত হন নাই। তাহার পরে ঐ সকল পাণ্ডুলিপি লইয়া তাহার অনুবাদাদি কার্য্যে দশ বৎসর কাটাইয়া ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এই অমূল্য পরিশ্রমের ফল, মূল জেন্দ্‌-আবেস্তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থ তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ, এবং তাহার নাম "Ouvrage de Zoroastre," 3 vols. Paris, 1771.

দুপের্ঁর এই সপ্তদশবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী সন্তুষ্ট হন নাই। ক্যাণ্ট (Kant) প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহাতে আশানুরূপ দার্শনিক তথ্য বা ধর্ম্ম তত্ত্ব-বৈচিত্র্য দেখিতে পাইলেন না। যাঁহারা ভাষা বা সাহিত্যের অপূর্ব্বত্বের জন্য উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের কৌতূহল-তৃপ্তির কোনও উপকরণ পাইলেন না। এইপ্রকারে দুপের্ঁর অনুবাদের সমাদর না হইয়া অবজ্ঞাই হইতে লাগিল। এইরূপ সময়ে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল। সংস্কৃত নাটক যেমন গ্রীসের নাটকের অনুকরণে কল্পিত, প্রতারণা মূলক, অপ্রাকৃত সৃষ্টি বলিয়া মতবাদ উঠিয়াছিল, এবারেও তাহাই ঘটিল। দুপের্ঁর জেন্দ্‌-আবেস্তা জাল বলিয়া একদল পণ্ডিত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই দলের অগ্রণী ছিলেন স্বনাম-ধন্য প্রাচ্য পণ্ডিত স্যর উইলিয়ম জোন্স্ (Sir William Jones)। তিনি ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পত্র লিখিয়া প্রচার করিলেন যে, আঁকেতিল দুপের্ঁ প্রতারিত হইয়াছেন, তিনি জরথুষ্ত্র প্রণীত মূল ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পার্সী পুরোহিতগণ তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া মূলগ্রন্থের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অমূলক, অপদার্থ দিয়াই বিদায় করিয়াছে। ইংলণ্ডে রিচার্ড্‌সন (Richardson) ও স্যর জন চার্ডিন (Sir John Chardin) এবং জর্ম্মণীতে মৈনার্স (Meiners) স্যর উইলিয়ম জোন্সের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফরাসীদেশে দুপের্ঁর প্রতিবাদ না করিয়া সকলেই তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থকে মূলগ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ক্লেকের (Kleuker) নামক একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত দুপের্ঁর পক্ষ-সমর্থন আরম্ভ করিলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুপের্ঁর গ্রন্থের জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া জর্ম্মণীতে প্রচার করিলেন এবং গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য হইতে আবেস্তা বিষয়ক মন্তব্য ও উল্লেখ-সমূহের আলোচনা করিয়া স্বদেশের ধর্ম্মতাত্ত্বিক (Theologians) ও দার্শনিকগণকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, দুপের্ঁর আবিষ্কৃত গ্রন্থই 'মাগী' বা 'জরথুষ্ত্রীয়গণের' ধর্ম্ম-গ্রন্থ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই সংগ্রাম চলিল। তবে ক্রমে ক্রমে স্যর উইলিয়ম জোন্সের মতের উগ্রতা কমিয়া আসিতে লাগিল।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পরে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ মূল আবেস্তা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও আবেস্তার ভাষার নৈকট্য ইতিপূর্ব্বেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দেনমার্কের ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রাস্ক (Rask) একখানি

ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আবেস্তার কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং প্রতিপন্ন করেন যে, ইহার ভাষা অতি প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ হইলেও ভাষা দুইটী এক ভাষা নহে, পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। ইনি ইতিপূর্ব্বে পারস্যে ও ভারতবর্ষে পর্য্যটন করিয়া আবেস্তা গ্রন্থের ও তাহার পহ্লবী টীকার অসংখ্য মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া কোপেনহেগেন লাইব্রেরীতে প্রদান করেন। তিনি আবেস্তার বর্ণমালার বিষয়েও আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়েই ফরাসীদেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিত ইউজিনি বর্ণুফ (Eugene Burnouf) আবেস্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত ও আবেস্তীয় ভাষার নৈকট্য অবগত হইয়া এবং বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আবেস্তার মূল পাঠের পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার সাহায্যে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই দেখিতে পাইলেন যে, আঁকেতিলের অনুবাদে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বহু আসামঞ্জস্য সংঘটিত হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন যে, আঁকেতিল বহুস্থানে পার্সী পুরোহিতগণের উপদেশ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার অনুবাদের বহুস্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি এই ফরাসী অনুবাদমাত্রে নির্ভর না করিয়া খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নারিয়ো সঙ্ নামক একজন ভারতবাসী পার্সী কর্ত্তৃক লিখিত আবেস্তা গ্রন্থের অংশবিশেষের সংস্কৃত অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এ অনুবাদও মূলের অনুবাদ নহে, পহ্লবী টীকা হইতে সঙ্কলিত সংস্কৃত অনুবাদ। যাহাই হউক এই সংস্কৃত অনুবাদের সাহায্যে এবং তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বিস্তার সাহায্যে আঁকেতিল-কৃত বহু ভ্রম-প্রমাদের তিনি সংশোধন করেন।

বর্ণুফের আলোচনার ফলে আবেস্তা-চর্চ্চার প্রণালীতে এক অভিনব আলোকরশ্মি পতিত হইল। সেই অবধি আর কেহ পার্সী পুরোহিতগণের প্রবাদ ও কিম্বদন্তীমাত্রে নির্ভর করিয়া আবেস্তা-চর্চ্চা করেন না। যেখানে সন্দেহ উপস্থিত হয় সেইখানেই সংস্কৃতের সাহায্যে অর্থ নির্ণয় করা হয়। পার্সী পুরোহিতগণের নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও সংস্কৃত ভাষার সাক্ষ্য যদি অবিসম্বাদিভাবে মিলিয়া যায়, তবে আর অর্থ-নির্ণয়ে ভ্রমপ্রমাদ থাকে না। ফলে সংস্কৃত চর্চ্চারও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বৈদিক ভাষার অর্থগ্রহ আজকাল দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই প্রাচীন আবেস্তা-সাহিত্য ও আবেস্তা-ভাষার সাহায্যে বেদের ভাষা ও সাহিত্যের বহু রহস্যের তুলনামূলক সমাধান হইতেছে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রোটফেণ্ড (Grotefend), বর্ণুফ, লাসেন, স্যর্ হেনরী রলিন্সন (Sir Henry Rawlinson) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পারস্যদেশে ক্ষোদিত লিপির আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল লিপির ভাষা এবং বিষয় আবেস্তার ভাষা ও বিষয়ের অনুরূপ। সুতরাং আবেস্তা-গ্রন্থকে আর কেহ জাল বা প্রবঞ্চনাসৃষ্ট সাহিত্য বলিতে সাহস করেন না।

বর্ণুফ যে আবেস্তা বিদ্যাসৌধের ভিত্তি-প্রস্তরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বপ (Boph) হাউগ (Haug), উইণ্ডিশ্‌মান (Windischmann), ওয়েষ্টার্গার্ড (Westergaard), রোথ (Roth), ও স্পীগেল (Spiegel)

প্রভৃতি স্বনামধন্য ধুরন্ধর পণ্ডিতবর্গ সেই সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান যুগে বার্থোলোমাই (Bartholomae), দর্মেস্তের (Darmesteter), ডি হার্লেজ (de Harlez), হেবশ্‌মান্ (Hübschmann) জুষ্টি (Justi), মিল্‌স্ (Mills),* গেল্‌ড্‌নার (Geldner), ও জ্যাক্‌সন্ (Jackson) প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ও এদেশীয় বহু পার্সী পণ্ডিত বর্ণুফ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসৌধের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রসাধন করিতেছেন। সংস্কৃত ভাষাকে দর্পণ-স্বরূপ রাখিয়া পার্সী কিম্বদন্তী ও পহ্লবী অনুবাদের সাহায্যে ইহাঁরা আবেস্তা-গ্রন্থের একপ্রকার অবিসম্বাদী অর্থ-নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন; তবে সামান্য সামান্য বিষয়ে ব্যক্তিগত মতভেদ আছে এবং চিরকাল তাহা থাকিবেও।

অতঃপর অতি-সংক্ষেপে আবেস্তা-সাহিত্যের স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। এই বিরাট সাহিত্য ছয় ভাগে বিভক্ত:—

১। যশ্ন।

২। জীষ্‌পেরেদ।

৩। যশ্‌ত্।

৪। ক্ষোর্দা আবেস্তা।

৫। বেন্দিদাদ।

৬। নাস্ক সমূহ (হাধোখ্‌ত নাস্ক, প্রভৃতি)।

প্রথম পাঁচ বিভাগের আবার দুইভাগ। প্রথমভাগে বেন্দিদাদ, জীস্পেরেদ, ও যশ্ন এবং দ্বিতীয়ভাগে ক্ষোর্দা আবেস্তা ও যশ্‌ত। বেন্দিদাদ, জীস্পেরেদ ও যশ্ন লইয়াই প্রকৃত আবেস্তা। যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই তিন গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য এই তিন গ্রন্থের দুইপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়া থাকে। উপাসনা ও অনুষ্ঠানের ক্রম-অনুসারে এক গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায় স্থানচ্যুত হইয়া অন্য গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ের সহিত মিশিয়া যায়। কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান-ক্রমে এক গ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করার পর অন্য গ্রন্থের এক অধ্যায়, এবং তারপর অপর এক গ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করা আবশ্যক হয়। যেমন আমাদের ঋগ্বেদের সূক্ত-পর্য্যায় ও মন্ত্র পর্য্যায় ভাঙ্গিয়া ক্রিয়াকাণ্ডের সুবিধার জন্য যজুর্ব্বেদ হইয়াছে, এও কতকটা সেই প্রকার। বেন্দিদাদ, জীস্পেরেদ ও যশ্ন গ্রন্থ যখন ক্রিয়াকাণ্ডানুযায়ী প্রয়োজন-অনুসারে একত্র মিশিয়া থাকে, তখন তাহাদের সহিত পহ্লবী টীকা বা অনুবাদ সংশ্লিষ্ট থাকে না নতুবা প্রত্যেক গ্রন্থের সহিত একখানি করিয়া পহ্লবী টীকা বা অনুবাদ আছে। যখন টীকা সহ মিলিত না থাকে, তখন ইহাদের পৃথকরূপ নামকরণ হয়, যেমন 'বেন্দিদাদ সাদা' বা 'কেবলমাত্র মূল বেন্দিদাদ'। দ্বিতীয়ভাগ বা ক্ষোরদা আবেস্তা (ক্ষুদ্র আবেস্তা, Small Avestas) সমূহের সবগুলির পহ্লবী অনুবাদ বা টীকা নাই। এগুলি সম্পূর্ণ গ্রন্থও নহে।

প্রথম গ্রন্থ যশ্ন। যশ্ন শব্দ ও সংস্কৃত যজ্ঞ শব্দ অভিন্ন। জরথুষ্ত্রীয়গণের যজ্ঞ ও উপাসনার প্রধান গ্রন্থই যশ্ন। ইহারই অন্তর্গত আবেস্তার গাথা-ভাগই প্রাচীনতম এবং প্রাচীনতম ভাষায় লিখিত। সমগ্র যশ্ন ৭২ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম হইতে সপ্তবিংশ (১-২৭) অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ; অষ্টাবিংশ হইতে ত্রিপঞ্চাশত্তম (২৮—৫৩)

অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং শেষ দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ। সর্ব্বপ্রধান দেবতা অহুরো মজ্দার আহ্বান দ্বারা প্রথম ভাগের আরম্ভ। তৎপরে জরথুষ্ত্র ধর্ম্মের অন্যান্য দেবগণের বন্দনা ও আহ্বান, তৎপরে 'জ ও থ্র' বা জল-শুদ্ধির প্রক্রিয়া, তৎপরে 'রয়েম্ন' বা ইন্ধন-শুদ্ধি প্রক্রিয়া, তৎপরে হ ও ম বা সোম-রস প্রস্তুত প্রণালী ও তাহা উৎসর্গ করিবার প্রণালী এবং তৎপরে পিষ্টক ও মাংস উপহার দিবার প্রণালী প্রথম ভাগে আছে। দ্বাদশ যশ্ন পরোক্ষভাবে মাত্র যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ১৯—২১ যশ্ন নবদীক্ষিতগণের শিক্ষার জন্য প্রশ্নোত্তরমূলক উপদেশ। দ্বিতীয় ভাগে গাথা বা মন্ত্র বা গান। জরথুষ্ত্রের প্রাণস্পর্শী উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এই অংশে সংগৃহীত আছে। এইখানে জরথুষ্ত্র 'কু' ত্যাগ করিয়া 'সু' গ্রহণ করিবার বা অন্ধকার ত্যাগ পূর্ব্বক আলোক আশ্রয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই গাথা-সমূহ অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহার ভাষা সর্ব্বত্রই ব্যাকরণের শাসন মানে। আবেস্তার অন্যান্য অংশের ভাষা ও গাথা-সমূহের ভাষার বেশ একটু প্রভেদ আছে; প্রকৃত পক্ষে পাঁচটী গাথা এবং সেগুলি পদ্যে লিখিত। প্রত্যেক গাথার প্রথম শব্দ হইতে এই পাঁচটী গাথার ছন্দের নামকরণ হইয়াছে। এই পাঁচটী গাথায় (২৮—৩৪, ৪৩—৪৬, ৪৭—৫০, ৫১, ৫৩) মোট ১৭ টী মন্ত্র। ৩৫—৪২, এই সাতটী গাথা নহে, গদ্যে লেখা; ইহাদিগকে যশ্ন হপ্তংঘাইতি বলে। ৫২ সংখ্যক যশ্ন তৃতীয় ভাগ বা 'অপরো যশ্নো'এর অন্তর্গত। এই তৃতীয় অংশে দেবগণের স্তব ও তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ জীষ্পেরেদ। ভাষা ও প্রণালী যশ্নের অনুরূপ। ইহাতে ২৪ অধ্যায় বা 'কর্দ' আছে। এবং সমগ্র জীষ্পেরেদ গ্রন্থ সমস্ত যশ্নের সপ্তমাংশ-পরিমাণ হইবে। যাবতীয় দেবগণের স্তব-স্তুতি ও আহ্বান-গীতি আছে। জীস্পে রতবো—সর্ব্ব দেবগণ।

তৃতীয় গ্রন্থ যশ্ত। যেশ্তি (সং ইষ্টি) শব্দে 'স্তোত্র দ্বারা পূজা' বুঝায়। এই গ্রন্থে অসংখ্য দেবতা বা দেবদূতগণের (যজত,-পূজার্হ) স্তব-গান আছে। এইগুলি পদ্যে লেখা এবং উৎকৃষ্ট কাব্যরস-সম্পন্ন। পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক বহু কথা এই গ্রন্থে আছে। ফর্দুসীর শাহ্নামা কাব্যে এই প্রকার বর্ণনা আছে। যশ্ত সমূহের প্রধান—অর্দ্বি সূর-যশ্ত, জল-দেবী (৫), তিষ্ত্র্য তারকা, (৮) মিত্র বা সত্যদেব (১০), ফ্রজষী বা পরলোকগত সাধুগণের আত্মা (১৩), বিজয় বা জেরেথ্রঘ্ন (১৪), এবং রাজ-মহিমা বা ক্ষত্র (১৯)।

চতুর্থ গ্রন্থ প্রকীর্ণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল কবিতা। ন্যাইশ, গাহ্, শিরোজহ্, আফ্রিঙ্গন্ প্রভৃতি প্রতিদিন বা নির্দ্দিষ্ট উৎসবের দিনে আবৃত্তি করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব, কবিতা বা আশীর্ব্বচন।

পঞ্চম গ্রন্থ বেন্দিদাদ। 'দএব' বা দৈত্যগণের বিরুদ্ধবাদী বিধান। (বী-দ-এব-দাত)। পুরোহিতগণের আচার-ব্যবহার ও 'দ-এব' পূজার কুফল বর্ণনামূলক এই বিধি-সমূহ ২২ পরিচ্ছেদ বা ফারগার্দে

বিভক্ত। রচনা-রীতি ও রচনার কাল অনুসারে এই ফর্‌গার্দ-সমূহের মধ্যে মহান্‌ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ইহার অধিকাংশই অর্ব্বাচীন। আমাদের মহাভারতের ন্যায় এই গ্রন্থের রচনা বহু কাল ধরিয়া ও বহু ব্যক্তির দ্বারা হইবে। প্রথম পরিচ্ছেদ সৃষ্টিপ্রকরণ, সাংখ্যের দ্বৈত-বাদ-মূলক সৃষ্টি বর্ণনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যিমের রাজত্ব বা স্বর্ণযুগ (সত্যযুগ); এই পরিচ্ছেদে প্রলয়, ইরাণীয় বন্যাবিশেষ বা সৃষ্টি-ধ্বংসকারী শীতকালের বিবরণ আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কৃষিকর্ম্ম। চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্মৃতি বা আইন-কানুন। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদে মৃতাশৌচের কথা। ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদে কুকুরের কথা। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নানাবিধ অশৌচ হইতে শুদ্ধি বা মুক্তির কথা (অশৌচান্ত)। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে জরথুষ্‌ত্রের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি। বিংশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিষয়ক।

ষষ্ঠ গ্রন্থ বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ বা ধ্বংসাবশেষ। এই খণ্ডসমূহকে নাশ্‌ক্‌ বা গ্রন্থ বা কোষ বলা হয়। ইহাতে হধোখ্‌ত নাশ্‌ক্‌ হইতে দু'একটী কাণ্ড, লুপ্ত নাশ্‌ক্‌ সমূহের সূচী, নানাবিধ লুপ্ত গ্রন্থের অংশ, এবং জন্দ্‌-পহ্লবী শব্দাদি সূচী আছে। সমস্তই আবেস্তা ভাষায় লিখিত এবং এককালীন বিরাট আবেস্তা-সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ। এইগুলি ছাড়া পহ্লবী সাহিত্যেও বহু বিলুপ্ত আবেস্তা গ্রন্থের অনুবাদ আছে সুতরাং আবেস্তা-সাহিত্য হইতে পহ্লবী সাহিত্য বাদ পড়ে না।

বর্ত্তমানে আবেস্তা-সাহিত্য যে আকারে পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। কিন্তু এই সাহিত্য যে এককালে অতি বিরাট ও বিশাল ছিল তাহা এই সাহিত্যের আভ্যন্তর-প্রমাণ ও ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। সাহিত্যের ভাষা ও ভাব দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহাতে বহুকালের বহু কবির সৃষ্টিশক্তির পরিচয় একত্র হইয়াছে। প্লিনী (Pliny) বলিয়াছেন যে, জরথুষ্‌ত্রের সাহিত্যে বিশ লক্ষ শ্লোক বা কবিতা ছিল। আরব ঐতিহাসিক তবরি (Tabari) বলেন, জরথুষ্‌ত্রের লেখা ১২০০০ গোচর্ম্মে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পার্সীগণের কিম্বদন্তী সাধারণত দুইখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—রিবায়ৎ ও ডিংকার্ড। (Din-kard) ডিংকার্ড গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সমগ্র আবেস্তার দুইখানি কাপি ছিল। একখানি পার্সিপলির রাজকীয় পুঁথিশালায় রক্ষিত ছিল। আলেকজন্দর যখন রাজপ্রাসাদ অগ্নিসাৎ করেন, সেই সময়ে ঐ পাণ্ডুলিপি রাজপ্রাসাদের সহিত ভস্মসাৎ হইয়াছে। আর একখানি পাণ্ডুলিপিও ঐ প্রকারেই গ্রীকদিগের অত্যাচারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সকল অত্যাচার ও ধ্বংস-কাণ্ডের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই আবেস্তা-সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপি ও পার্সী পুরোহিতগণের স্মৃতিমাত্রে সংরক্ষিত ছিল।

খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ইরাণীয় নৃপতি খুস্‌রু অনোশির্বনের অনুশাসন-পত্রে জানা যায় যে, নিরোর (Nero) সমসাময়িক নৃপতি বলখাশের (সম্ভবতঃ Volgoses) সময়ে আবেস্তা-

সাহিত্যের পুনরুদ্ধার চেষ্টা আরম্ভ হয়। আলেকজন্দরের সর্ব্বধ্বংসী দিগ্বিজয়-বিক্রমের করাল করাঘাত হইতে দূরে অতি গুপ্ত-স্থানে লুকাইয়া যে-সকল আবেস্তার পাণ্ডুলিপি আত্মরক্ষা করিতেছিল, ইনি সেই সকল পাণ্ডুলিপি রাজভাণ্ডারে সমর্পণ করিবার আদেশ দেন এবং পুরোহিতদিগের মুখে শুনিয়া বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করাইতে থাকেন। ইনি অর্সাডীবংশীয় (Arsaciadae) নৃপতি ছিলেন। ইঁহাদের পরে ২২৬ খৃষ্টাব্দে সাসানিদীয় রাজগণ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহারা জরথুষ্ত্র-ধর্ম্মী ছিলেন এবং জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ ইঁহাদের সময়েই হইয়াছিল। প্রথম সাসানীয় (Sassanian) নৃপতি আর্ত্তক্ষীর পাপাকান বা অর্দেশীর বাবগান (২২৬—২৪০) এবং তদীয় পুত্র প্রথম শাহ পুহর (২৪০—২৭০ খঃ) আবেস্তা-সাহিত্যের পুনরুদ্ধার-কার্য্যে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন। দ্বিতীয় শাহ পুহরের রাজত্বকালে তদীয় অমাত্য আতুর-পাৎ মারাস্পন্দ কর্ত্তৃক আবেস্তা-সাহিত্যের শেষ সংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং নাশ্ক্ বা ধর্ম্ম গ্রন্থসমূহের ক্রমিক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়।

রিবায়ত ও ডিঙ্কার্ড গ্রন্থে একবিংশতি নাশ্ক্ গ্রন্থের বা সমগ্র আবেস্তা সাহিত্যের বিবরণ আছে। আমাদের গায়ত্রী-মন্ত্রের ন্যায় পার্সীদিগেরও তিনটী অতি পবিত্র কার্দ বা মন্ত্র আছে—(১) যথা 'অহু বৈর্ঘো' বা 'অহুনা বৈর্য্যো' (যশ্ন ২৭।১৩), (২) অষেম্ জোহূ' (যশ্ন ২৭।১৪), এবং (৩) 'যেঙ্হে হাতাম্' (যশ্ন ৪৭।৪)। 'অহুনা বৈর্য্যো' মন্ত্রে একবিংশতি শব্দ। সেই একবিংশতি শব্দের এক-একটী লইয়া একবিংশতি নাশ্ক্ গ্রন্থের প্রথম শব্দ হইয়াছে। এ যেন আমাদের কালিদাসের 'অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ' একবিংশতি নাশ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাক্রমে ঃ—

১। (২২ অংশ) ধর্ম্ম ও পুণ্য।

২। (২২ অংশ) ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

৩। (২১ অংশ) মজ্দা-যশ্নীয় ধর্ম্ম এবং তাহার উপদেশ।

৪। (৩২ অংশ) ইহলোক ও পরলোক।

৫। (৩৫ অংশ) গণিতও জ্যোতিষ শাস্ত্র।

৬। (২২ অংশ) যজ্ঞকর্ম্ম ও তাহার ফল।

৭। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে৫০ অংশ, বর্ত্তমানে ১৩) রাজনীতি ও সমাজনীতি।

৮। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১২) ব্যবহার।

৯। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১৫) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক।

১০। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১০) নৃপতি গুষ্তাশ্পের রাজত্ব এবং জরথুষ্ত্রের প্রভাব।

১১। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ২২ অংশ, বর্ত্তমানে ৬) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক।

১২। (২২ অংশ) আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক।

১৩। (৬০ অংশ) পুণ্যকর্ম্ম ও জরথুষত্রের বাল্যজীবনের চিত্র।

১৪। (১৭ অংশ) অহুরো মজ্দা ও তাঁহার অমাত্যবর্গ।

১৫। (৫৪ অংশ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি, ওজন ও মাপ।

১৬। (৬৫ অংশ) নবানজ্ দিষ্ত বিবাহ, অর্থাৎ নেদিষ্ঠ জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ।

১৭। (৬৪ অংশ) ভবিষ্যতে প্রাপ্য দণ্ড বা কর্ম্মফল; ফলিত জ্যোতিষ।

১৮। (৫২ অংশ) রাজশক্তি-পরিচালনে ধর্ম্মবুদ্ধি, নির্ব্বাণ ও পাপের ধ্বংস।

১৯। (২২ অংশমাত্র আছে) বেন্দিদাদ, শৌচাশৌচবিনিশ্চয়।

২০। (৩০ অংশ) মঙ্গল।

২১। (৩৩ অংশ) অহুরোমজ্দা ও তাঁহার অমাত্যবর্গের স্তব।

নৃপতি বলখাশ, সাসানীয় রাজবংশ ও অমাত্য আতুরপাৎ মারাস্পন্দের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আবেস্তা-সাহিত্যের পুনঃসংস্কার-কার্য্যে এবং প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপদ্ধতিতে কালের করাল প্রভাব সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহাও স্বীকার্য্য যে, বিরাট আবেস্তা-সাহিত্যের অংশমাত্র আধুনিক যুগের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, সমগ্র সাহিত্য নহে। এই আধুনিক যুগে বর্ত্তমান সাহিত্যও যে বহুকালের মজ্দা যস্নীয় মনস্বিগণের রচনায় পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যই যদি নানা যুগের নানা ঋষির রচনায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তবে এক ঘোর বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া যে সাহিত্য আজ সভ্যজগতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাতে যে অসংখ্য অজ্ঞাত মনস্বীর প্রভাব ও নানা যুগের নানাবিধ সমাজ-বিপ্লবের চিহ্ন পরিস্ফুট থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! ভাষার সাক্ষ্য হইতে বিচার করিলে এই মজ্দা-যস্নীয় আবেস্তা সাহিত্যের একটী কালানুযায়ী ক্রম পাওয়া যায়। যস্ন গ্রন্থের পাঁচটী গাথা অর্থাৎ যস্ন ২৮—৩৪, ৪৩—৪৬, ৪৭—৫০, ৫১ ও ৫৩, এবং যস্ন ২৭।১৩ ও ১৪, ও ৫৪ কে অতি প্রাচীন কালের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। ইহাই পরেই যস্ন হপ্তাংঘাইতী (৩৫—৪২) ও যস্ন ১২, ৫৮ ও ৪।২৬। তৃতীয় স্তরে যস্ন যশ্ত্ ও বেন্দিদাদের প্রাচীন অংশ সমূহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গ্রন্থ এবং চতুর্থ স্তরে আবেস্তা.সাহিত্যের গদ্যাত্মক অবশিষ্টাংশ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুত্রদান

১

যৌবন! যৌবন! যৌবন! এর চেয়ে বড় বালাই কি এ নারী-জীবনে আর কিছু আছে? আমার এই ক্ষুধিত তৃষিত জীবনেও আমি এই বিপদ নিয়ে পাগল হ'তে বসেছি গো! এই যে ভাঙ্গা বাড়ীর জীর্ণ দ্বারের আগড়টা খসে গেছে, গেলই বা! একটা বাঁশ-টাশ কিছু দিয়ে কি কাজ চালানো

হত না? কিন্তু না, তা সাহস হয় না। অকস্মাৎ দু'চারজন বন্ধু অযাচিত দয়া দেখিয়ে এই বিপন্না বিধবাকে সশঙ্কিত করে তুলেছেন, যা না ক'রলেই আমার বেশী উপকার করা হ'ত।

ওঃ ভগবান! ভগবান! কি কুৎসিত, কি ভীষণ করেই তুমি মানুষের প্রাণে এই হীন লালসার সৃষ্টি করেছিলে! রক্তলোলুপ শার্দ্দূলের চেয়েও এ নিষ্ঠুর—ভয়ানক!

এই যে আমার যৌবন, এই পঙ্কিল বিষ-নীর মন্থন করেই কি আমার এই বুকে ছ'টি শতদল ফুটে ওঠে নি! অমৃতের বন্যা কি আমার এ বিষদগ্ধ বুকে নামে নি! তবু আছে? তবু কি যৌবন ম'রে শুকিয়ে যায় নি?

হায়, কার দোষ দেব আমি? এ যে কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়! যাকে লোকে এই পোড়া দেহের সৌন্দর্য্য ব'লে প্রশংসা করে—সব-চেয়ে বড় বিপদ হয়েছে তাই। কত লোক আছে, যারা নিত্যি দেহের রূপ বাড়াতে পাগল, তারা থাকতে রূপের বালাই এখানে মর্‌তে এল কেন, কে জানে? আমি সত্যি বল্‌চি, রূপ আছে বলে দেমাক্ আমার কোনো দিনই হয় নি, বরং লজ্জায় মরে যাই আমি এর জন্যে।

আমার অন্ধ স্থবির বৃদ্ধ স্বামী আজ স্বর্গে। স্বর্গের অমৃত আলোয় যদি তিনি দেখবার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর ভিতরের মানুষটী আজ নিশ্চয়ই অনুতাপ করছে! সেখানে গেলে শুনেছি, মনের বিকার সেরে যায়।

শেষ-বয়সে আমাকে বিয়ে করার পর স্বামীর যখন চোখের দোষ হলো, তখন থেকেই নিতান্ত আত্মীয়া দু-একজন ছাড়া আর কারো মুখে আমার রূপের খ্যাতি শুনিনি, আজকাল তাও যেখানে-সেখানে যার-তার মুখে শুনতে পাই, ঘেন্নায় আমার সমস্ত শরীর শিউরে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

মা নেই, বাপ নেই, ভাই-বোন্ কেউ কোথাও নেই যে একদিনের জন্যেও একটু আশ্রয় পাব। এই শিশুদের আর নিজেদের জীবিকার সমস্ত ভার কেবল পরিশ্রমের উপর দিয়ে চালিয়ে নিতে যে কি ক'রে পারি, সে কেবল অন্তর্যামী ভগবানই জানেন!

সেদিন রাত্রে বেশ খানিক বৃষ্টি হয়ে ভাঙ্গা ঘরের সমস্তটা ভিজিয়ে দিয়েছিল। একে তো মাঘের শীত, ছেলেদের নিয়ে কি যে করি, ভেবে পাইনে! অনেক দিন মেরামত করা হয়নি, কোন্ দিন বা ঘরখানা ভেঙ্গে মাথায় পড়ে!

সকালবেলা, দিব্যি রোদ উঠেছিল। অনেক দিনকার রোদে-পোড়া মাটী থেকে সোঁদা-গন্ধ উঠে বাতাসটাকে ভরে দিয়েছিল। আমার পাঁচিলের গায়ের ঘুঁটেগুলি গ'লে-গ'লে কচু আর কুকুর-শোঁকার গাছগুলির উপর পড়েছিল।

ভিজে বিছানা-পত্তর রোদে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পাড়ার এক বৌমা এসে ডাকলেন, "ওগো খুড়িমা—"

আমার এই বৌমাটি আমার চেয়ে বোধ করি ত্রিশ বছরের বড় হবেন, কিন্তু আমার স্বামীর সম্পর্ক ধরে আমি এঁর

খুড়িমা হতে বাধ্য। এগিয়ে গিয়ে দোর খুলে দিলাম, বল্লাম, "কি গা বৌমা, এমন সময়ে মনে পড়লো যে!"

বৌমা সৌজন্যে হেসে উঠে বল্লেন, "মনে কি আর তোমায় করিনে বাছা—তবে বড় একটা আসতে-টাস্তে পারিনে। *আজ এই হলুদগুলো কুট্‌তে হবে, তাই বলি—"

চেয়ে দেখলাম তাঁর হাতের ডালিতে একরাশ হলুদ। শ্রমক্লান্ত মনটা একবার একটু গরম হলো, কিন্তু উপায় নেই, তাই হাত পেতে সেগুলি নিয়ে বললাম, "তা হ'লে আমার ছেলেদের এ বেলায় ছুটী খাইয়ে দিও বৌমা, আমি এগুলো কুটে দি।"

ছেলেদের খেতে দেবার নামে বৌমার সেই পাকা মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লো না। তা উঠ্‌বেনা আমি জানি, কিন্তু জেনেও আমার না বলে উপায় নেই। আমি যদি সারা দিন উপোষ করে হলুদ কুটি, তা হলে আমার বাছারা কি খাবে? বৌমা মুখ কুঁচকে বললেন, "হলুদ নিতে ওবেলায় আস্‌বো তো?"

বড় পরিশ্রম করতে হবে। তা হোক—বললাম, "আচ্ছা, সারাদিন খেটে দেখি, যদি শেষ করতে পারি, নিয়ে যেও।"

বৌমা উঠছেন-উঠছেন, এমন সময় আমি নিজেকে আর সামলে রাখ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "রামনগর থেকে তোমার ভাসুর-ঝি এসেছে, নয় গা বৌমা?"

"হ্যাঁ।"

বুকের ভিতরটা আমার কেমন যেন জমে আসছিল। ব্যাকুল আগ্রহে বুক ফেটে যেতে চাইলেও মুখে কথা ফুটে বেরুল না।

কেন?

আমার বুকের প্রথম ফুল—আমার হৃদয়-সাগর-মন্থন-করা মাণিক, সে যে আজ সেই গাঁয়েরই জমিদারের ছেলে! খেতাবী রাজার পুষ্যিপুত্তুর বলে দেশের লোকে তাকে রাজপুত্র বলে!

যার রক্ত-মাংস দিয়ে তার রাজপুত্রের মত মোহন সুন্দর রূপখানি তৈরী, সেই দীন ভিখারিণী আজ আর তার কেউ নয়, কেউ নয়! তাইতো তার,—আমার নিজের পেটের ছেলের—কুশল-প্রশ্ন করতেও এ পোড়ামুখ আট্‌কে আসে!

বৌমা আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। হাজার হলেও তো তিনিও ছেলের মা। তিনি বললেন, "কি গো খুড়িমা, অনুর কথা বলবে বুঝি? তা সে বেশ ভালোই আছে, দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল হয়ে উঠেছে। এখানে না ছিল যত্ন, না ছিল খাওয়া-দাওয়ার সুখ, তাই তেমন বিচ্ছিরি মর্কুটে দেখাতো, এখন তো দেখলে চেনা যায় না—"

মনে একটু সান্ত্বনা পেলাম। সে ভাল আছে, সুখে আছে। আচ্ছা, আমাকে কি কখনও একটু-আধটু মনে করে সে? অতি অল্প, অল্প একটু? আমি তো ন' দশ বছর অবধি মানুষ ক'রে তারপর তারই সুখের জন্যে তাকে পরের ঘরে দিয়েছি। এই প্রাণহীনা পাষাণীকে মা বলে কি তার মনে পড়ে?

মা! আমাকে আর কেন সে মা বলবে? আমি তো আর তার মা নই। এখন যে চৌধুরীদের সোনা-রূপোয় মোড়া

রাণী তার মা। যে তাকে এই দারিদ্র্য-দুঃখ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাজা করে রেখেছে,—এখন তার মা সে,—আমি নই!

ওগো আমার স্বামী, ওগো আমার জন্ম-জন্মান্তরের অভিশাপ—না, না, ছি, ও-কথা যে মনেও আনতে নেই, পরকালেও দেখছি আমার কপালে বিস্তর দুঃখ আছে।

বৌমা বললেন, "খুড়িমা, দুঃখ করোনা, তোমার কাছে থাকলে আর তার কি এমন ভাল হতো, বল! হয়তো বা দুঃখে-কষ্টে পড়ে একটা অমানুষ হয়ে দাঁড়াত, তার চেয়ে এ কত ভাল হয়েছে। তুমি না হয় মনে কর, তোমার সে ছেলেটা হয়নি—"

আর্ত্ত-গলায় বলে উঠলাম, "ও কি কথা বলছো গো, ও কথা কি ভাবা যায় কখনো? সে যে আমার প্রথম—"

"অত মায়া যদি, তবে বিলিয়ে দিতে গেলে কেন বাছা?"

কেন যে বিলিয়ে দিতে গেলাম, সে কথা আর নতুন করে লোককে কি বলবো। কাজেই আর জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। গলার কাছে একটা শক্ত পুঁটলির মত কি ঠেলে উঠে যেন শ্বাস রোধ করে ধরছিল। কিন্তু আমি জানি, আমার মরণ নেই,—আর মরণের সাধ? তাও যে আর হয় না, তাহলে এই পাপের ফল পাঁকের পঙ্কজ ছেলেরা কোথায় কার দোরে ঘুরে বেড়াবে?

ঘরে ঢুকে দেখি, আমার অনু,—হোক সে রাজা, হোক সে এখন রাজা-বাহাদুর প্রতাপ চৌধুরীর ছেলে প্রদ্যোৎ—তবু আমার সে অনুপম। আমি তাকে অনুই বলবো—ওই তার পুরোনো ছোট বালিশটী, ছেঁড়া দ্বিতীয় ভাগের পাতা-দুখানি, সুতো-খালি সুতোর কাটীমে গাঁথা মালা, সব আমার ঘরের শূন্যতা ভরে আছে—আর এরা বলে কি না, তাকে আমি ভুলে যাব?

মেজ ছেলে নিরু এসে ডাকলে, "মা—"

"কি বাবা?"

"এই ত্যাখ মা, এটা কি ফুল বলতো,—ওই ওধারের বাগানে ফুটেছিল, আমি চেয়ে আনলাম।"

দেখলাম, ছেলের হাতে একটী রজনীগন্ধা ফুল। বললাম, "ওতো রজনীগন্ধা ফুল দেখছি। কিন্তু ফুল নিয়ে কি পেট ভরবে রে,—যা, রেখে দিগে।"

ছেলে মুখখানি ম্লান করে বললে, "মা তুমি আর ফুল ভাল বাসো না?"

ছেলের মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, "না।"

২

সকাল বেলা ঘুঁটের জ্বালে ছেলেদের জন্যে ভাত চড়িয়ে দিয়ে আমি বাসি ঘর-দোর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছিলাম।

বাড়ীর বাইরের দিকে একটা কুলগাছ ছিল, যত রাজ্যের ছেলেরা ভক্ত প্রজার মত তার তলায় পড়ে থাকতো। যতদিন না ফাগুনের শেষে পাকা কুল সব ফুরিয়ে যেত, ততদিন অকেজো ছেলের দল কেউই গাছটীকে একা থাকতে দিত না। আমার ছেলে ক'টিও ওই গাছতলায় গিয়ে জুটেছে, কেবল সব-ছোটটী ভাতের উনুনের কাছে বসে পেটের জ্বালায় একঘেয়ে কান্না সুরু করে দিয়েছে।

স্নান করে ভিজে কাপড় ছাড়তে যাচ্ছি এমন সময় দেখি, একজন অজানা লোক এসে আমার উঠোনের উনুনের কাছে দাঁড়িয়েছে, আমার ছোট খোকাটা একমুখ হাসি হেসে বল্ছে, "পূর্ণ বাবু, পূর্ণ বাবু—"

জানি, পূর্ণবাবু একজন নতুন দোকানদার। কিন্তু এই অসহ্য স্পর্দ্ধা দেখে রাগে আমার গা জ্বলে গেল। লজ্জাশীলার মত পালিয়ে যাওয়া আমার প্রকৃতি নয়, কঠোর স্বরে বললাম, "কে তুমি ?"

লোকটা বিনীত ভাবেই বল্লে, "আজ্ঞে, আমার কিছু পয়সা পাওনা আছে, নিরু সেদিন চাল এনেছিল—"

"তাই তুমি বাড়ীর ভেতর এসেছ তাগাদা করতে। যাও, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও গে, নিরু তোমায় পয়সা দেবে।"

লোকটা তবু আমার খোকাকে আদর ক'রতে বস্ছে দেখে আমি রাগে চেঁচিয়ে নিরু বলে ডেকে ঘরের ভিতরে ঢুকতে গেলাম।

এই নীচাশয় লোকটার ধূর্ত্তামি-ভরা মুখ-খানি আমার তীব্র তিরস্কারে চাবুক-খাওয়া কুকুরের মত বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল। সে যাবে কিনা তাই বোধ হয় ভাবছিল, এমন সময়ে বাইরের দিক থেকে ডাক এলো, "অনুপম, ওহে অনুপম" !

কে ডাকছে আমার অনুপমকে ? আহা, ও জানে না যে, অনুপমকে তার মা এ-ঘর থেকে জন্মের মত বিলিয়ে দিয়েছে, এ-ঘরে সে সেই অনুপম, পরের ঘরের রাজা সে আজ— !

একটু পরে নিরুর সঙ্গে এসে যে আমাকে প্রণাম করলে, তাকে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। সে আমাকে বল্লে, "আমাকে চিনতে পারছেন না মা ? আমি যতীন।"

যতীন আমার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। এরা দুই ভাই মামার বাড়ী মানুষ হয়েছিল। ছোটটী মারা গেছে, এইটী বড়। একে আমি দু-একবার দেখেছিলাম স্বামী থাকতে, কিন্তু অকাল বার্দ্ধক্যে একে এমন জীর্ণ করে ফেল্ছে যে, হঠাৎ চিনতে পারি নি।

এই সব ছেলেরা কেউ আমাকে দেখতে পারে না। আমার অপরাধ ? স্বামী আমাকে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিলেন বলে —কিন্তু সে দোষ কি আমার ?

কেবলমাত্র হীন স্বার্থের জন্যে আমার এ নিরপরাধ নির্ম্মল জীবনও কি তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেন নি ?

মেয়েদের প্রাণে বা হৃদয়ের যে একটা মূল্য আছে, এ যেন বেতালের আজগুবি কথা বলে চলে আস্ছে !

যতীনকে বস্তে বলে আমি রান্নাঘরে রাঁধতে গেলাম। চব্বিশ ঘণ্টা কি কঠিন পরিশ্রম ক'রে তবে আমার এই অন্নের যোগাড় করতে হয় !

খেতে বসে যতীন বললে, "কৈ, অনু কোথায় ? সে খাবে না ?"

"সে এ-বাড়ীতে নেই।"

"নেই ? কেন, কোথায় গেছে সে ?"

উত্তর দিচ্ছিল নিরু,—কিন্তু তার প্রত্যেক কথাটি যেন আমার বুকে শেল হানছিল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে হেঁসেলে ঢুকলাম। বলুক, যা বলবার তা নিরুই বেশ বলতে

পারবে, আমি কেন আর ও ভুর্ভোগ ভুগতে যাই!

ওদের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল। আমার সেদিন একাদশী ছিল। মাটীর উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লাম। চোখের জল? সে অনেকদিন শুকিয়ে গেছে। কাল রাতে একখানা বই পেয়েছিলাম, খানিকটে প'ড়েও ছিলাম।

তাতে এক পঁচিশ বছরের বুড়ো মাগীর চোখে নূতন প্রণয়ের রং—আর বিরহ-মিলনের দুঃখ-মধুর লীলা দেখে মনে মনে খুব হেসে ছিলাম। কিন্তু আমার সম্ভ-বঞ্চিত তৃষিত মনের কোনও গোপন ঘরে তার একটু রেশ ছিল হয়তো, আমি আমার কল্পনায় আঁকছিলাম যে, ওই নায়িকাটী যদি অত বয়সে বিবাহিতা না হতো আর আমার অনুর মত তার একটী ছেলে যদি থাকত!

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নিরু ডাকলে, "মা!"

"কেন রে?"

"তোমাকে যতীন-দা ডাকছেন মা, উনি চলে যাবেন এখনি।"

"আচ্ছা, চল, যাচ্ছি।"

আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরুতেই যতীন বল্‌লে, "আপনাকে আবার বিরক্ত করলাম মা। আমি যাচ্ছি তাই একটু প্রণাম করে যাব বলে—"

"না বাবা, কিছু বিরক্ত হইনি,—তুমি কোথায় যাবে এখন?"

"এই রামনগরে যেতে হবে। আমি ষ্টেশনে কাজ করি কিনা, এবার আমায় এইখানে বদ্‌লি ক'রেছে।"

"রামনগর? রামনগর?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে—"

"অনু আছে? হ্যাঁ শুনলাম, সেখানে অনু আছে, কিন্তু এ কাজ আপনার মত বুদ্ধিমতীর উপযুক্ত হয়নি। যাক্, আমি ওখানে থাকলে তার খোঁজ-খবর পাবই।"

যতীন একখানি দশটাকার নোট দিয়ে আমাকে প্রণাম করলে। দশ টাকা! আমার এখনকার দুরবস্থায় এ বড় কম নয়! আমি টাকা হাতে করে নিয়ে বললাম, "এই টাকা তুমি আমাকে দিচ্চো?"

"গরীব ছেলে মা আপনার—"

"এ টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি যতীন, এর বদলে তুমি একটীবার আমাকে রামনগরে নিয়ে চল, সাতদিন পরে আবার ফিরে আসবো,—যাবে আমায় নিয়ে?"

আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, যতীনের মনটা সায় দিচ্ছে না, তবু তাকে নিস্তার পেতে দিলাম না। আমার মনটা যে সেই রামনগরের পথে-পথে ছুটছিল! আমি এ লোভ দমন করতে পারলাম না। বললাম, "আমি সাত দিনের বেশী থাকতে পারবো না। সাত দিন পরে তাঁর তিথি আস্‌ছে, সেদিন বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তো করাতেই হবে—"

অনেকক্ষণ কি ভেবে-চিন্তে যতীন অনিচ্ছায় রাজী হ'ল। বললে, "সে এখন যাদের ছেলে, তারা এতে রাগ করবে কিনা, কে জানে?"

"বাঃ! তা করে, করবে—আমি তো আমার ছেলে বেচি নি!

বিবেকের শাসন প্রাণের ভিতর চোখ

রাঙিয়ে বললে, "বিক্রী করিনি সত্যি—কিন্তু তার চেয়ে বেশী করেছি যে! নিজের বুকে-ফোটা ফুল ছিঁড়ে আমি দান করেছি, এখন এই যে শিরা-উপশিরা সব ব্যথায় টনটনিয়ে উঠচে, এতে কাতর হলে চলবে কেন?

মন বিবেকের শাসন মানলে না!

এর পরে এসে নিয়ে যাবে ব'লে যতীন সেদিন চলে গেল। নিরু আব্দার ধরলে, "আমি যাবো মা, ওঁর সঙ্গে,—দাদাকে দেখে আসবো—!"

যতীনও নিরুকে নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু আমি রাজী হতে পারলাম না। একেই তো সৎ-বন্ধুরা আশেপাশে যে-রকম দয়া দেখিয়ে তটস্থ ক'রে তুলেছেন, তাতে সম্বল ঐ গুঁড়োটুকু, ওকে ছেড়ে দিয়ে থাকি কি নিয়ে? বল্লাম, "না বাবা, তুই চলে গেলে যে আমার বড্ড কান্না পাবে।"

ছেলে আমার হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "তুমি কি ভীতু মেয়ে মা, আমাকেও বুঝি কোনো চৌধুরীরা ধরে নিয়ে যাবে, ভাবচো? সত্যি মা, ভাগ্যিস্ আমি রাজ-পুত্তুরদের মত দেখতে সুন্দর হইনি!"

এত দুঃখেও একটু হাস্লাম। রাত্রে ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়লো। আমি আমার দেহ-মনের উত্তাপে জ্বলতে জ্বলতে বসে রইলাম।

ফাগুন রাতের পূর্ণেন্দুর একটুখানি আলোর কণা ঘরের ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে আমার মনটাকে উতলা করে দিচ্ছিল। বাইরে নীল নির্ম্মল আকাশ চাঁদের আলোয় ছেয়ে গেছে, পাতা-ঝরা ঘোড়া-নিমগাছের উপরকার হুতোম-পেঁচার নিত্যিকার ডাক ছাপিয়ে পাপিয়ার করুণ-মধুর চীৎকার শুনে ইচ্ছে করছিল যে, একবার একটা দোর কি জানলা খুলে ভগবানের দান এই চাঁদের আলোই একটু উপভোগ করে নিই!

পারলে হয়তো একাদশীর দারুণ গায়ের জ্বালাটা একটু স্নিগ্ধ হত, মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ঘুমুতেও পারতাম, তাও না হলে ঘরে একজনের দেওয়া মণ-খানেক ধান আছে, চাল কুটে দিতে পারলে কিছু মজুরি পাওয়া যেত!

কিন্তু ভয়,--বিলক্ষণ ভয় করে আমার! ভূত-প্রেতের ভয় বা পশুর ভয়ও করিনে, তবে মানুষের দেহের মধ্যেই যেখানে এক-একজনের মাঝে জাগ্রত পশু আছে, তারি ভয়ে আলো-বাতাস অবধি আমাকে মেপে মেপে নিতে হবে তা আমি বুঝে নিয়েছি। সংস্কারের গুণে এতে আর দুঃখও মনে হয় না!

৩

আমার উপরোধ এড়াতে না পেরে যতীন তার বাসাতে আমাকে এনেছে। রেল-লাইনের ধারেই ছোট পায়রার খোপের মত কোয়ার্টার্স। একটু দূরেই ছোট্ট ইষ্টিসান। আমার পাড়া-গেঁয়ে ছেলেরা রেলগাড়ী দেখে আর একদণ্ড ঘরে থাকেনা! সব-কটি ইষ্টিসানের কাছে কাছে ঘোরে। কচি কচি সুন্দর মুখগুলি ষ্টেশন মাষ্টার থেকে কুলীদের অবধি বশ করে নিয়েছে।

এই ছোট্ট বাসাটীতে এর আগে যারা থাকতো, তাদেরই লাগানো একটী তুলসী গাছ আর গোটাকতক গাঁদা ফুলের বাহারে গাছ ছিল। গাছগুলিতে ফুল ফুটে রংয়ের চটকে চারিদিক আলো করে থাকতো।

বাড়ীর পূব-দিকে ষ্টেশন, আর পশ্চিম দিকে একটী সরু মেটে-রাস্তার ও-পারে মস্ত একটা মাঠের মত ছিল। এই শ্যামল মাঠটিতে বিকেলের দিকে অনেকগুলি ছেলে ফুট্‌বল্‌ খেলত, দেখতাম। এই মাঠটীর ও-ধারে একটু স'রে জমিদার বা রাজা প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ী, এতদূর থেকে সে প্রকাণ্ড বাড়ীর একটী কোণও সম্পূর্ণ দেখা যেতনা।

তিন দিন কেটে গেল। তবু যার জন্যে এই এত কাণ্ড করে এসেছি, তার দেখা পেতে পারিনি। নিরু রোজ বলে, "মা, কই দাদা এলো না কেন? তাকে ডেকে আন্‌বো মা?"

"কোথা থেকে ডেকে আন্‌বি রে?"

"কেন মা, ওই রাজাদের বাড়ী থেকে। আমি সেদিনে ওদের গেট অবধি গিয়েছিলাম, তা দাদাকে দেখতে পেলাম না। আনবো মা তাকে ডেকে? বলবো, মা ডাক্‌চে, চলো।"

"অমন করে ওদের বাড়ী তুই যাস্‌নে নিরু।"

আমার গলা বুঝি ভিজে ছিল, কিংবা কেঁপে গিয়েছিল, সে হঠাৎ ম্লান মুখে ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা, মা।"

আমার নিরুকে আমি বেশ জানি। সে একবার যখন স্বীকার করলে যে যাবে না, তখন সত্যি-সত্যি সে আর প্রাণান্তেও যাবে না! তবে কি করে কার সাহায্যে আমি অনুর দেখা পাব?

ওগো ভগবান, ওগো এই ব্যথাতুরা মাতৃ-হৃদয়ের স্রষ্টা অন্তর্যামী! আজ যদি একটু দয়া করে আমার বয়সটাকে বছর-কতক বাড়িয়ে দিতে, তাহ'লে মাথায় জরার নিশান এই সাদা চুল, আর শিথিল চামড়ার শরীরটা নিয়ে ওই দরোয়ান-পাইক-ভরা বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়তে আমার একটুও আটকাতো না। আমি একবার অনুকে বুকে চেপে ধরে আবার আমার সেই ভাঙ্গা ঘরে ফিরে যেতাম।

কিন্তু এখন যে তা পারিনে, শুধু এই জন্যে যে, ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই হাজার গণ্ডা চোখ হাঁ করে আমার পানে চেয়ে থাক্‌বে, সে আমি সইতে পারবো না। হয় তো দায়ে পড়লে একদিন পথে পথে ভিক্ষেও করতে হবে, কিন্তু এখনো তো সে অভ্যাস হয়নি!

আমি সারাদিন পথের ধারেই কাটাই, ছেলেরা পথে খেলা করে, তাই দেখি। সরু পথ, তার দুপাশে বড় বড় গাছ, একটী সজ্‌নে গাছে কচি কচি ডাঁটা ধরেছিল।

তার আর একটু দূরে একটা তরুণ আমের গাছে গুটি ধরেছিল, ছেলেরা ঢিলের ঘায়ে অনবরত গাছটীকে দুলিয়ে দুলিয়েও কাঁচা গুটি পাড়্‌তে পারছিল না।

একদিন ক' ভাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ যে দাদা! দাদা—"

আমার বিমূঢ় চোখের সুমুখ দিয়ে মাঠের উপরের রাস্তায় একখানা সাইকেল ছুটে চলে গেল। 'দাদা' ডাক শুনে তার যে আরোহীটি পিছন ফিরে চাইলে, তার মুখখানি আমার অনুর হলেও সে 'অনু' নয়! সে সত্যিই রাজা প্রতাপ চৌধুরীর রাজকুমার!

তার সর্ব্বাঙ্গে মূল্যবান পোষাক দেখেও

যে ছেলেরা তাকে দাদা বলে ডাকতে পেরেছে, এই ঢের !

ভায়েদের এই উচ্ছ্বসিত ডাক শুনে সে একটু চমকে গেল। কিন্তু থামলে না বা উত্তরে কোন কথাও বল্‌লে না। তখন বেলা তিনটে কি সাড়ে-তিনটে হবে, বোধ হয় সে স্কুল থেকে ফিরছিল। মিনিটের মধ্যে তার সাইকেল-খানি ওই প্রকাণ্ড গেটের মাঝে গিয়ে ঢুকলো, দেখলাম।

তার এখনকার মা, ওই রাজার রাণী, সর্ব্বাঙ্গে হয় তো তাঁর একঝুড়ি হীরে-মাণিকের বোঝা, কিন্তু বুক যেন মরুভূমি, এতটুকু পীযুষের ছিটেও কোথাও নেই! সেই মা কি মনে করে যে, সে এই পরের ছেলে পেয়েই মা হয়ে গিয়েছে? মাতৃত্বের এই যে যাতনা-ভরা সুখ,—সে কি যথার্থ মা না হয়ে পেতে পারে কেউ কখনো? নারীর জীবন ভরে শত দুঃখ-লাঞ্ছনা অপমানের মাঝেও মাতৃত্বের এই যে গৌরব, সে কি সহজ-লভ্য ?

হয় তো ছেলে আস্‌ছে ব'লে এখন তিনি রূপোর থালে কতরকম রাজভোগ সাজিয়ে ছেলেকে খেতে ডাকছেন, আর কুটুম্ব-বাড়ীতে লোকে যেমন ক'রে নেমন্তন্ন খায়, তেমনি করে ছেলে এসে চুপচাপ সেগুলি খেয়ে যাচ্ছে, কোনো গোলমাল নেই, বকাবকি, মাথা-মুণ্ড অফুরন্ত তুচ্ছ খবরের গল্প নেই, কেবল আছে নিয়ম, দস্তুর, চুপচাপ!

৪

তার পরের দিন—যতীন তখন ভাত খেতে বসেছে, আমি তাকে ভাত দিয়ে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কি একটা কাজ করছিলাম, শুনতে পেলাম, অনু ডাকছে, "নিরু,—ওরে নিরু—"

ছুটে দুয়োর খুলে বেরিয়ে পড়লাম। সে কাল এইখানে ভায়েদের ডাক শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু বাড়ী বুঝতে পারেনি, তাই সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে নিরুকে ডাকছিল, আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "মা? তুমি?"

রান্নাঘরের নোংরা কাপড় পরেই আমি আমার ছেলেকে বুকে চেপে ধরলাম। ভুলে গেলাম যে, জন-চারেক চাকরে তাকে সাজিয়েছে আর স্বয়ং রাণী অনেক পরিশ্রমে তার কোঁক্‌ড়া কালো চুলের থাক্ বাগিয়ে দিয়েছেন!

ছেলেরা আনন্দ-রোল তুলে ডেকে উঠ্‌লো, "দাদা এসেছে, দাদা—"

ভয়ে অনুর মুখ কালো হয়ে গেল। সে চারিদিকে চেয়ে দেখে বললে, "অমন করে চেঁচিয়ো না তোমরা, তাহলে ওঁরা জানতে পারলে আমাকে আর বেরুতেই দেবেন না।"

আমি ছেলেদের থামিয়ে বললাম, "কেমন আছিস্ অনু? এঁদের বাড়ী ভাল লাগে তো?"

সে কথার জবাব না দিয়ে অনু বল্‌লে, "তুমি এখানে এসেছ কেন মা? এখানে তোমার কি দরকার?"

মনে মনে ভাবলাম, এখানে যে আমার কি দরকার, তা তুই কি বুঝবি বাবা, আর তোকে বোঝাতে যাব, এমন পণ্ডশ্রমের দরকারই বা কি! বললাম, "আমার একটু দরকার ছিল।"

"কবে যাবে?"

শুকনো গলায় বল্‌লাম, "দিন-পাঁচেক

পরে। হ্যাঁরে অনু, এই পাঁচদিন তুই রোজ একটু ক'রে আসতে পারবিনে ?"

"পারবো মা। কিন্তু ওঁদের না বলে রোজ স্কুল যাওয়ার সময় আসবো, ফেরবার সময় আসা হবে না, আমার সঙ্গে তখন লোক থাকে।"

হঠাৎ পথের আর-একদিকে কাকে যেন দেখে সে চট্ করে সাইকেলে উঠে চলে গেল।

পর-পর তিন দিন রোজ একবার ক'রে অনু আমাকে দেখা দিয়ে যেত। হাজার হলেও সে অকপট শিশু, তার মনে তখনো ধনের ধোঁয়া ততটা জমে উঠতে পারে নি। আরও সে তার খেলার সাথী ছোট ভাইদের একেবারে ভুলে যেতেও পারেনি। দুদিন তার পকেট বিস্কুট আর ক্ষীরের নাড়ুতে বোঝাই হয়ে এসেছিল।

আমি বারণ করতে সে বললে, "আমি যখন মিষ্টিগুলো খাই, তখনি আমার খোকাকে মনে হয়। ও কি খুসী হয়ে মিষ্টি খায়, মা!"

বুঝলাম, সব সুখাদ্য খেতে গিয়েই তার এই দুঃখিনীর ধন ভায়েদের মনে পড়ে যায়!

চার দিনের দিন অনু আর এলো না। ছেলেরা সব তার পথ চেয়ে বসে আছে, আমি ঘরের ভিতর বসে ভাবছি যে, কাল তো আমায় ফিরে যেতে হবেই, তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তো করতেই হবে, তবে কেবল আজকের দিনটিই অনু কেন এলো না? ওরা কি জান্‌তে পেরে তাকে আট্‌কে রাখলে?

প্রতীক্ষা করে করে বেলা উৎরে গেল, সে এলোনা। হতাশ হয়ে মনটা যখন বড় বিস্বাদ লাগছে, তখন যতীন এসে বললে, "মা একজন লোক এসেচে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কে সে? জিজ্ঞাসা করে ছাখো, কি বলে।"

"আপনিই শুনুন মা, কি বলে সে। আমাকে বলতে আসেনি, আমাকে কিছু বলতে রাজীও নয়, আমি ডেকে দি তাকে।"

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক আমার সামনে এসে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। বোধ হয় আমাকে যেমন দেখবেন ভেবেছিলেন আমি তেমন নই দেখে!

তিনি মুহূর্ত্তকাল চেয়ে থেকে নিজের পরিচয় দিলেন। বুঝলাম, তিনি রাজা প্রতাপ চৌধুরীর কর্ম্মচারী। আমাকে ওঁরা কিছু বলতে পাঠিয়েছেন। বললাম, "বলুন।"

ঢোক গিলে তিনি বললেন, "দেখুন, আপনি যখন ছেলেকে দানই করেছেন, তখন আবার কেন এমন করে তার মন বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টা করছেন? যদি আপনি কিছু টাকা চান, তা হলে তা দিতে ওঁরা খুব রাজী আছেন। তবে ছেলে সম্বন্ধে আপনাকে একেবারে নির্লিপ্ত হতে হবে।"

আমি চুপ করে ছিলাম। আরো কি যেন কতকগুলি কথা সেই ভদ্রলোকটী বললেন, কিন্তু আমার কাছে তা বোধগম্য হলো না। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি অসাড় অবশ

হয়ে গিয়েছিল। তবু এইটুকু বুঝলাম যে, আমায় এ বয়সে যথেষ্ট সতর্ক হ'য়ে থাকতে হয় ইত্যাদি—

দয়া বলে কোনো পদার্থ কি পৃথিবীতে আছে গো? না, ভাগ্য-গুণে আমার নামেই জীবনের সব দয়া একেবারে শুকিয়ে যায়! জীবনের প্রথম থেকে এই এতকাল তো কেবল ফাঁকি নিয়েই চলে আসছে, মরণই বোধ হয় আসল পাব, কেন, না, তার আর নকল নেই!

অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোকটী চলে গেলেন।

তারপর! আমার সুমুখে এইগুলি যে কি তা আমি নিজের মুখেই বলছি, এ আমার ছেলে-বেচা টাকা! তবু আমি মরিনি, পাগল হইনি!—হা ভগবান!

পাছে স্নেহান্ধ হয়ে আবার কখনো ছুটে আসি, তাই এ শাস্তি হাত পেতে নিলাম, ভবিষ্যতের পথ বন্ধ করা হলো! এখন এ টাকা দিয়ে কি করবো? নিজের বুকের রক্ত বিক্রী করে সে টাকা দিয়ে কি করতে হয়?

আত্মা বা দেবতার পূজো? ভাল, তাই করবো। যে দেবতার নিষ্ঠুর সংসার-তৃষ্ণার মুখে এ প্রাণ জর্জ্জরিত, আজ যাচ্চি তাঁরই উদ্দেশ্যে, এই ছেলে-বেচা টাকা দিয়ে ভাল ক'রে শ্রাদ্ধ করতে!

আমি পাগল হয়েছি কি না জানিনে, কিন্তু কাছাকাছি হয়েছি, বোধ হয়!

অনেক দেবতা আছেন যাঁদের পায়ে রক্ত-মাংসে গড়া জীব কেটে রক্ত দিতে হয়! আমার তো এখনও ততদূর উন্নতি হয়নি, কোনো একটা ছেলে ধরে হাড়-কাঠে ফেলে কাটতে আমি পারিওনে, এখনকার আইনেও তা চলবেনা। তাই সন্তানের দাম দিয়েই এই দেবতাকে খুসি করতে চাই!

আমি জানিনে, হে আমার ভাগ্য-দেবতা স্বামী, এ পেয়েও তুমি খুসী হবে কি না?

শ্রীনীহারবালা দেবী।

জাতের লজিক্

চাঁড়াল সে নীচ জাতি, তাই
বাহিরেতে দিল তারে ঠাঁই।
বিড়ালটা খেয়ে তার পাতে
ঘরে এসে মুখ দিল ভাতে।
কর্ত্তা তো খেলো সেই ভাত,
তবু তায় বেঁচে রয় জাত!

সিদ্ধান্ত—

ছুঁলে ঘর মারা যায় হাঁড়ি,
প্রসাদে না নষ্ট হয় নাড়ী।

জের—

সাপ-জোঁক মুখে দিয়ে বিশুদ্ধ বিড়াল,
সদা মুখে হরি জপে' অশুদ্ধ চাঁড়াল!

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

ব্রিটিশ শাসনের এক যুগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হেষ্টিংসের সপক্ষে উইলসন্ সাহেবের যুক্তি আরও চমৎকার। তাঁহার মোটামুটি বক্তব্য এই যে ১৭৭৩ সালের সনদ পরবর্ত্তী ১৭৭৬ সালের সনদ দ্বারা রদ করা হইয়াছিল। ১৭৭৩ সালের সনদে বারাণসী-রাজকে রাজস্বের অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না এই কথা ছিল। তাহা যখন ১৭৭৬ সালে উল্‌টাইয়া গেল তখন আর চৈৎসিংহের পূর্ব্বসনদের অধিকার দাবী করিবার কোন যো নাই। উইলসনের এই মন্তব্য কিন্তু একেবারে ভুল। তাঁহার যুক্তির ভিত্তি হইতেছে ১৭৭৬ সালের সনদ দ্বারা ১৭৭৩ সালের সনদের আমূল পরিবর্ত্তন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত কাগজ-পত্র না দেখিয়া লেখাতে তিনি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। ফরেষ্ট সাহেবের State Papers গ্রন্থে প্রকাশিত চিঠিপত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে উইলসন্ সাহেবের যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে চৈৎসিংহের জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সনদ ও পাট্টা প্রস্তুত করান। ১৭৭৬ সালের ২১শে জুনের কাউন্সিলের সভার বিবরণী ফরেষ্ট State Papers গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৪৪ পৃষ্ঠায় ছাপিয়াছেন। তাহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে বারাণসীর রেসিডেণ্ট মিঃ ফুকের একখানি চিঠি কাউন্সিলে পড়া হইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল যে রাজা "মুচলেখা" সম্বন্ধে সনদ ও পাট্টায় যে কথা লেখা ছিল, তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ফুককে আদেশ দিলেন যেন তিনি মুচলেখা কথা সনদ ও পাট্টা হইতে উঠাইয়া দেন। ফুক আবার ১৭ই জুলাই তারিখের পত্রে গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে রাজা তখনও পাট্টা ও সনদ লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। রাজার অগ্রাহ্য করিবার দুটী কারণ—(১) সনদ হইতে কোন কথা উঠাইয়া দেওয়া (erase) এই দেশে অতি বিসদৃশ ব্যাপার, এবং (২) সনদে যে সর্ত্ত আছে যে তদ্দ্বারা পূর্ব্ব সনদ রদ করা হইবে তাহা এই দেশের প্রচলিত প্রথা-বিরুদ্ধ। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কিন্তু নিজেদের জেদ বজায় রাখেন নাই, রাজার কথা-মতই সেক্রেটারীকে আদেশ দিলেন যেন নূতন সনদ ও পাট্টা প্রস্তুত করা হয় এবং মুচলেখা বা পূর্ব্ব সনদ রদ করা সম্বন্ধে তাহাতে কোন কথা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট আরও সেক্রেটারীকে বলিলেন যেন নূতন সনদ ও পাট্টা ফুকের নিকট পাঠান হয় এবং পুরাতন পাট্টা সনদ ফেরৎ লওয়া হয়। (State papers vol II. P. 549) এই পর্য্যন্ত উইলসন্ সাহেবের সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অতি অদ্ভুত। তিনি স্বীকার করেন যে ঐ প্রকার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার ধারণা যে, সে আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ সদ্‌যুক্তি একবার তাঁহার নিজের ভাষায় পড়া উচিত—Whatever might at one time have been the disposition of the Council to accede

to the Raja's wishes it does not appear that any actual measure ensued (মিলের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, উইলসন্ কৃত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬২ টীকা)। তাঁহার মোট কথা যে কাউন্সিলের যদিও রাজার অনুরোধ রক্ষা করিবার ইচ্ছা একবার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কাজে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অতএব উইলসন্ সাহেবের যখন মনে হয় না, তখন নিশ্চয়ই নূতন সনদ প্রস্তুত হয় নাই। এবং নূতন সনদ যখন হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই পুরাতন সনদই বলবৎ ছিল। আর তাহাতে যখন অতিরিক্ত দক্ষিণা আদায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা ছিল, তখন নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্ট রাজা চৈৎসিংহের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর ন্যায়-মত আদায় করিতে পারিতেন। যুক্তিটী সত্যই অদ্ভুত। ইংরাজ ঐতিহাসিক ইংরাজ শাসন-কর্ত্তাকে বাঁচাইবার জন্য কিরূপ সদ্‌যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, একবার দেখুন; তিনি বেশ জানেন গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিয়াছেন যে নূতন সনদ প্রস্তুত হইবে এবং তাহাতে পুরাতন সনদের রদ্ সম্বন্ধে কোন কথা থাকিবে না। সুতরাং ইহা স্থির যে ১৭৭৬ সালেও গবর্ণমেণ্ট চাহেন যে চৈৎসিংহের পূর্ব্ব অধিকার বজায় থাকে। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায়, যে সেক্রেটারী ভ্রম-ক্রমে নূতন সনদ প্রস্তুত করেন নাই বা সেটী পাঠাইতে ভুলিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিকের পক্ষে কি আমলার ভুলের বা প্রভুর আদেশ অবহেলার সুবিধা লইয়া প্রভুর অন্যায় কার্য্য সমর্থন করা উচিত? ঐতিহাসিকের কাজ ত বিচারকের মত। ন্যায় অন্যায় তিনি স্থির করিবেন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে। দোষী বা নির্দ্দোষ স্থির করিবার পূর্ব্বে বিচারক প্রথমে দেখিবেন অভিযুক্তের মনোগত অভিপ্রায় কি? উইলসন্ সাহেব ত ইংরাজ, তাঁহার দেশের আইন প্রথম দেখে—"Intention of the accused" অর্থাৎ আসামীর মতলব কি? ইংরাজ হেষ্টিংসের কার্য্য আলোচনার সময় কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহার Intention বা অভিপ্রায় দেখিলেন না। ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই হইতে পারে, উইলসনই বা অভ্রান্ত হইবেন কেন? হয়ত তিনি চেষ্টা করিয়াও নূতন সনদ প্রস্তুত হওয়ার প্রমাণ পান নাই! কিন্তু সত্যের খাতিরে ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য ঐতিহাসিকের আসনে বসিয়া তাঁহার ত এটুকু বলা উচিত ছিল যে ১৭৭৫ সালেও গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, রাজা চৈৎসিংহকে অতিরিক্ত কর-দান হইতে মুক্তি দেওয়া।

তাহা না বলিয়া তিনি নূতন সনদ আর পাঠানো হয় নাই বলিয়া ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ভৃত্যের একটা ত্রুটির সুবিধা লইয়া হেষ্টিংসকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, ভৃত্যের কার্য্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ত্রুটি হয় নাই। সেক্রেটারী গবর্ণমেণ্টের আদেশ-মত নূতন সনদ প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহা রাজার ইচ্ছানুরূপও হইয়াছিল। সেটী যে রাজাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ ত আমরা ফুকের ১৭৭৬ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে পাই। তাহাতে তিনি বোর্ডকে জ্ঞাত করান—"আমি তাঁহাকে

(রাজাকে) সেক্রেটারী অরিয়ল সাহেব কর্ত্তৃক ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেরিত সনদ দিই এবং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্ব সনদ ফিরাইয়া লই। সেগুলি আমি ইহার সহিত পাঠাইলাম।" ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে উইলসন্ সাহেব এই চিঠিখানি না পড়িয়া ঘোরতর ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং তাঁহার যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন।

উপরিউক্ত সনদ পাট্টা কবুলতি প্রভৃতি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে রাজা চৈৎসিংহের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কোন কর আদায় করিবার কোম্পানীর আইনতঃ কোন অধিকার ছিল না। যাহা কিছু কোম্পানী আদায় করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে বে-আইনী এবং তাঁহাদের লিখিত ও স্বাক্ষরিত একরার-নামার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

আইন আদালতের দিক্ হইতে আমরা কোম্পানীর কাজ যতই অন্যায় বলি না কেন, হেষ্টিংসের পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। দেশের মহাবিপদে শত্রু-দমনের জন্য অর্থবল বা লোকবল আদায় করিবার রাজার স্বভাবত অধিকার আছে। রাষ্ট্র যখন বিপন্ন, তখন রাষ্ট্রের অধিপতি কি আইনের সূক্ষ্ম যুক্তি দেখিয়া কড়া-ক্রান্তির হিসাবে রাজস্ব আদায় করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন? না, অধীন রাজন্যবর্গ বা ভূস্বামীদিগের নিকট হইতে সৈন্য-সামন্ত এবং অর্থ-সাহায্য চাহিবেন?

রাষ্ট্ররক্ষার জন্য সাহায্য চাওয়ায় কোন দোষ হইতে পারে না, যুগে যুগে দেশে দেশে রাষ্ট্রপতিরা এরূপ করিয়াও থাকেন। হেষ্টিংসের পক্ষে এই দিক্ দিয়া বারাণসী ঘটনার বিচার করা উচিত। কিন্তু রাজা যেমন গভীর বিপদের সময় অতিরিক্ত সাহায্য চাহিতে পারেন, প্রজাও সেইরকম অনায়াসে বলিতে পারেন, যে সাহায্যের পরিমাণ তাহার আনুকূল্যমত হওয়া উচিত এবং তাহার জন্য ন্যায্য সময়ও তাহার পাওয়া উচিত। দেখা যাক্, হেষ্টিংস সেরূপ অবসর রাজাকে দিয়াছিলেন কি না।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রথমে স্থির করিলেন যে রাজা চৈৎসিংহকে যুদ্ধের ভার কিছু বহন করিতে হইবে এবং তাঁহাকে তিনটী সিপাহী পল্টন রাখিতে হইবে। (State Papers, Vol II, page 639), ১৭ই অগষ্ট তারিখে তাঁহার অতিরিক্ত কর ৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। এই অতিরিক্ত কর যে আইনতঃ চৈৎসিংহ দিতে বাধ্য ছিলেন না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অতিরিক্ত করটীর পরিমাণও বড় কম নয়, বার্ষিক রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ। রাজা প্রথমে নানা অজুহাতে নিষ্কৃতি পাইবার বৃথা চেষ্টা করিলেন; তৎপরে ছয় মাস আরো সময় চাহিলেন। হেষ্টিংস ইহাতেই বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, রেসিডেণ্টকে আদেশ দিলেন যে-প্রকারে হউক টাকা আদায় করা চাই। রাজা গত্যন্তর না দেখিয়া এই সর্ত্তে টাকা দিলেন যে ঐরূপ অতিরিক্ত কর তাঁহাকে আর দিতে হইবে না।

১৭৭৯ সালে ১৯ শে জুলাই রাজার নিকট পুনরায় ঐ কর চাওয়া হইল। রাজা অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। হেষ্টিংস একেবারে ক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি বোর্ডে প্রস্তাব করিলেন যে সৈন্যদিগের দ্বারা তাঁহার উপর বল প্রয়োগ

করা উচিত এবং অধিকাংশ সভ্য তাঁহার পক্ষে ভোট দেওয়ায় স্থির হইল যে রেসিডেণ্ট লিখিলেই মেজর ক্যামাক দুইটী পল্টন লইয়া বারাণসী যাত্রা করিবেন। রেসিডেণ্ট বেচারা করেন কি? তিনি ত গবর্ণর জেনারেলের ভৃত্য! কিন্তু তিনি মস্তিষ্ক স্থির রাখিলেন, সৈন্যবল প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। হতভাগ্য রাজা আর কি করেন? বেগতিক দেখিয়া আবার টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং চার মাস সময় চাহিলেন। এত টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য এই সময়টুকু এমন কিছু বেশী নয়। রেসিডেণ্ট তাহা বুঝিলেন এবং সেই মর্ম্মে বোর্ডকেও সংবাদ জানাইলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত, হেষ্টিংস ক্রোধোন্মত্ত হইয়া এক দুর্দ্ধর্ষ কাণ্ড করিলেন। তাঁহার আর একটুও দেরী সহিল না, রেসিডেণ্টকে আদেশ অবহেলা করার জন্য তীব্র তিরস্কার করিলেন এবং মেজর ক্যামাকের উপর আদেশ হইল, যেন তিনি দুইটী পল্টন লইয়া একেবারে বারাণসী যাত্রা করেন। তাঁর উপর কড়া হুকুম হইল যেন তিনি কোন প্রকারে না ফিরিয়া আসেন, কেবল রেসিডেণ্ট সব টাকা বুঝিয়া পাইয়া যদি সেই সংবাদ তাঁহাকে জানান, তবেই তিনি ফিরিবেন। রাজা ত চক্ষে একেবারে অন্ধকার দেখিলেন! কোন প্রকারে টাকার জোগাড় করিয়া ২২ শে অক্টোবর তারিখে পূরা টাকা দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও হতভাগ্যের নিস্তার নাই। আবার মেজর ক্যামাকের পল্টনের খরচ-বাবদ্ হেষ্টিংস ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা জরিমানা-স্বরূপ আদায় করিয়া লইলেন।

রাজার অপরাধ কতটুকু, পাঠক একবার দেখিবেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অগষ্ট প্রথম তাঁহার নিকট ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর চাওয়া হইল। যদি ইহা ন্যায্যতঃ পাওনাই হয়, তাহা হইলে ত ১৭ই অগষ্ট ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে আবার টাকার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু তাহার এক মাস পূর্ব্বেই ১৯ শে জুলাই আবার টাকা চাওয়া হইল! ১৭ই সেপ্টেম্বর সময় চাওয়াতে বিদ্রোহী রাজন্যকে যথারীতি শাস্তি-দানের জন্য ভারত-ভূমিতে ইংরেজ পল্টনের কুচ্ পরোয়ানাও হইয়া গেল। কিন্তু আপনারা দেখুন, তখন মোটে এক মাস মাত্র দেরী হইয়াছে। তারপর রাজা ত দ্বিতীয় বর্ষে পূরা টাকা চুকাইয়া দিলেন ২২ শে অক্টোবর তারিখে—মোটের উপর প্রায় দুই মাস দেরী। ইহাতেই বেচারাকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইল! স্বাধীন রাজার ক্ষমতা ভাল, আর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধই বা কি সুন্দর!

পর বৎসর রাজা অসুবিধা বুঝিয়া অন্য চাল চালিলেন; একেবারে দুই লক্ষ টাকা হেষ্টিংসকে ঘুষ দিলেন। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কোন ফল হইল না, টাকা রাজাকে দিতে হইল। রাজা ১৭৮০ সালের ৫ই অগষ্ট প্রথমে এক লক্ষ টাকা দিলেন। তখনও কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইতে ১২ দিন বাকী। বাকী টাকাও অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ফেলিয়া দিলেন। ইহাতেও তাঁহার নিস্তার নাই। এই বৎসরও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হইল।

অন্যদিকেও আবার গোলযোগ আরম্ভ হইল—বার্ষিক রাজস্ব ২৩ লক্ষ ও অতিরিক্ত

কর ৫ লক্ষ ব্যতীত রাজাকে ২০০ সিপাহী কোম্পানীর জন্য ঠিক করিতে বলা হইল। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর হেষ্টিংস ২০০০ কমাইয়া ১০০০ সিপাহী চাহিলেন। রাজা নিরুপায় হইয়া ২০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার অন্য অভিপ্রায় ছিল। তিনি তখন গোপনে নবাব-উজীরকে বারাণসী বিক্রয় করিবার জন্য দরদস্তুর করিতেছিলেন।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্মীছাড়ার দল

প্যারী সহরের Latin quarter যে লক্ষ্মীছাড়াদের স্বর্গ, এ কথা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। এতদিন পরে নতুন মহাদেশের স্বর্গটা আবিষ্কৃত হয়েছে—সেটী নাম-জাদা New York সহর। তার অলি-গলি, তার রাস্তা-ঘাট আজ শত শত লক্ষ্মীছাড়ার কর্ম্মক্ষেত্র। রামধনুর সাত রঙে আঁকা ভালবাসার ও খ্যাতির নেশায় বিভোর হয়ে তারা সেখানে নানা রকমে আশা-বৈতরণী পার হবার জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে—কেউ বা সফল হচ্ছে তবে অধিকাংশ লোকই বাস্তব জীবনের রূঢ় বীভৎসতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরছে, নয়ত অভিশপ্ত জীবন-ভার বহন করছে।

জীবনের বাঁধা-ধরা পথের রেখা ধরে' যারা চলতে চায় না, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' খাবার কল্পনাটা যারা কোনকালেই মনে মনে পোষণ করে না, এমন সব ছেলেই, শুধু আমাদের দেশে কেন, সকল দেশেই লক্ষ্মীছাড়া বলে' লোক-সমাজে পরিচিত। তারা মোটেই ভাল মানুষ নয়, তাদের রক্তের মধ্যে কি একটা ক্ষ্যাপামির বীজ আছে, তাই শান্ত-শিষ্ট হয়ে দশজনের মত তারা থাকতে পারে না। তারা লেখা-পড়া করে, কিন্তু গাড়ী-ঘোড়া চড়ে না,—দাস-দাসী অট্টালিকা যে মস্ত একটা প্রয়োজনীয় আসবাব, এ কথা তারা ভুলে যায়। এদের জীবনে সাধারণত কি ঘটে, তার একটু নমুনা দিই।

বাঁধা-ধরা কাজকে যারা সিদ্ধিদাতা গণেশের মত পূজা করে এবং জীবনের আনন্দকে সব-চেয়ে বড় পাপ বলে' ডরায়, এমনি একদল গোঁড়া কেজো-লোকের মধ্যে একটা ছেলে জন্মাল এবং গ্রহ-বৈগুণ্যে এই বিশেষ ছেলেটিই জীবনের চাঞ্চল্যে অভিভূত হয়ে পড়লো—তার চিত্তে কোথাকার সব বাঁশী বেজে উঠলো,—গৌরবের বিপুলতর জীবনের কত অস্পষ্ট চিত্র তার মনের চোখে ভেসে উঠলো! দিনের কাজের শেষে সে লুকিয়ে বই পড়তে সুরু করলে, এবং তার মনের ভিতরকার কথা কাগজে চারিয়ে গেল—হয়ত বা জেলার খবরের কাগজে বেনামীতে দু-একটী লেখা ছাপাও হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ইহকালটি বেমালুম নষ্ট হয়ে গেল। সে এখন লিখতে চায়, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে পড়তে চায়। তার শক্তি হয়ত একেবারেই মাঝারি—তার রচনায় হয়ত এমন দোষ আছে যে সে কোন

কালেই নিজেকে ছাপিয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু তার লেখবার বাতিক থেকে তাকে কোন মতেই নিবৃত্ত করা যাবে না। বছরের পর বছর সে লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরবে, New York সহরে লক্ষ্মীছাড়ার দলে এসে জুটবে, অনশনে অনাহারে অনিদ্রায় জীবনকে তিক্ত করে' তুলবে, কিন্তু লিখতে তাকে হবেই। হয়ত এক যুগ কেটে যাবে তার বুঝতে যে তার শক্তি সামান্যই এবং এই অনর্থক কষ্টের পর তার মনে দশজনের মত বাঁধা পথে চলে' তাদের একজন হয়ে বসতে ইচ্ছেও হবে। এই যে আত্ম-বঞ্চনা, এ থেকে তার মুক্তি নেই, এ কষ্ট তাকে পেতেই হবে। এ হচ্ছে সেই পরশ-পাথর খোঁজবার প্রবৃত্তি, সমস্ত-পাওয়ার মাঝে সেই অপ্রত্যাশিতের জন্যে চির-জাগরূক অসন্তোষ, যা যুগে-যুগে মানুষকে চঞ্চল করে তুলেছে, জগতের আর সব থেকেই তাকে তফাৎ করেছে! শুধু তাই নয়, নিজেকে ছাপিয়ে ওঠবার প্রেরণা এনে দিয়েছে!

মধ্যযুগে কর্ম্মিক তার কাজের মধ্যে অন্তরের শিল্প প্রবৃত্তিকে ফুটিয়ে তুলতো, এখন এই কল-কারখানার যুগে আত্ম-প্রকাশের আর কোন উপায় নেই; তাই তার এই চাঞ্চল্য এবং এই অবশ্যম্ভাবী দুর্ব্বিষহ কষ্ট-ভোগ।

New York সহরে সাহিত্যিক স্কুলের ছড়াছড়ি—এই সব সবুজ ও অবুঝ সাহিত্যিকদের ওড়বার মত পাখা বানিয়ে দেবার কল-কাটী নাকি তাদের হাতে! কিন্তু চিরকাল যা ঘটে, তাই হচ্ছে—স্কুল চলে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে, আর মন চলে ঠিক তত বছর এগিয়ে। তাছাড়া মনের মধ্যে না আছে mechanism, না আছে routine; কিন্তু শিক্ষা-পদ্ধতির সেই হল বিশেষ বাহাদুরী, কাজেই এই কারখানার ভিতর থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা আর সাহিত্যাকাশে বিচরণ করবার মত মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গম নয়, খবরের কাগজ লিখে পয়সা আনবার মত কেজো লোক! আনাতোল ফ্রান্স, মাক্সিম গোর্কি বা হুইটম্যান হবার আশা নিয়ে যারা আসে, তারা অবশ্য হতাশ হয়; কিন্তু কোন রকমে তারা বাঁচে এবং এমন কি অনেক সুবোধ সুশান্তদের মত গাড়ী-ঘোড়াও চড়ে, কিন্তু তাদের জীবনে সাহিত্যিক বা শিল্পী হবার চেষ্টার ব্যর্থতার কালিমা কোন কালেই ঘোচে না, হতাশার কারুণ্য তাদের কপাল ফুটেই থাকে।

প্রতি খবরের কাগজের আপিসে এমন দু'চারটে লোক মিলবেই, যারা জীবনে এই বড় জিনিষটা চেয়েছিল—আজ তারা ধনী-সমাজের সামাজিকতার রিপোর্ট লেখে, হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপায়। কাজ কিছু মন্দ নয়—কিন্তু এ তারা কোন কালেই করতে চায়নি—দুয়ে দুয়ে চার করবার ইচ্ছে তাদের ছিল না—দুয়ে দুয়ে পাঁচ হবে এই ছিল তাদের অন্তরের আশা! এক দিন ছিল, যখন শিল্পী হবার সাধ নিয়ে মানুষ এত সহজে পরিত্রাণ পেত না—হয় সে Samuel Johnson এর মত অনাহারে কষ্ট পেত, Chatterton এর মত আত্মহত্যা করতো, কিম্বা Keats এর মত শিল্পী হয়ে উঠতো—সাহিত্যিকরা কষ্ট পেত এখনকার চেয়ে অনেক বেশী এবং শক্তিমান ব্যক্তিরই শুধু সাহিত্যের চর্চ্চা রাখতো।

অধিকাংশ লোক নিরাশ হলেও দুপয়সা সংগ্রহ করছে, কিন্তু ব্যর্থ-মনস্কাম সাহিত্যিকের সংখ্যাও অল্প নয়—বছরের পর বছর কেটে

চলেছে, নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কর্ম্ম-ভারে নত দেহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তারা পরিশ্রম করে' চলেছে, জীবন-পথে তারা শিল্পী হবার সাধনা করছে। তাদের দু'একজনের কথা আজ বলবো।

ইংরেজি সাহিত্যিকদের নামের তালিকায় John Masefield এর নাম আজ খুব উপরে। New York সহরে এখনও সে-সব দোকান ও হোটেল আছে, যেখানে অনেক বছর আগে তিনি দরোয়ানী ও দোকানদারী করেছেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যে Knut Hamsun, তিনি একদিন এখানে ট্রাম চালিয়েছেন ও ডকের মজুরগিরি করেছেন। সে ডাক্তার এখনও বেঁচে আছেন, মার্কিন সাহিত্যিক Jack Londonকে সাহায্য করবার সুযোগ পেয়ে যিনি ধন্য হয়েছেন—Jack London তখন পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরছেন! তাঁর জীবনের এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে উপন্যাসে তিনি গেঁথে রেখে গেছেন।

বর্ত্তমানে New York এর ডকে মস্ত জোয়ান এক মজুরের দেখা পাওয়া যায়। তিনি সাধারণ মজুরের মত সপ্তাহে দুদিন কফি ব্যাগ আর লোহার ডাণ্ডা বয়ে দেন এবং বাকি চার দিন কবিতা লেখেন।

ছোট-খাট একটি সংসার নিয়ে এক হাঙ্গারিয়ান্ এখানে এসে জুটেছেন। সারাদিন দোকানে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন এবং রাত্রে যখন স্ত্রী-পুত্র ঘুমায়, তখন তিনি বসে' বসে' নাটক লেখেন। তাঁর রচনা দিন দিন লোকের মন আকর্ষণ করছে।

এই সবুজ সাহিত্যিকদের খাদ্য-সংগ্রহের একটি প্রিয় উপায় হচ্ছে দুপরে খুব ভিড়ের সময় হোটেলে ডিস ধোওয়া। একটি ছোকরা আজ দুবছর ধরে' একটা উপন্যাস লিখছে—প্রতি সকালে দোকানে দাঁড়িয়ে চুরুট বিক্রী করাই তার কাজ। একজন টেলিগ্রাফার আবার কবিতা লেখেন এবং সাহিত্যের দরবারে তাঁর রচনার আসন পাবার আশু-সম্ভাবনা আছে। এই সে দিন্ কাগজে একজনের গ্রেপ্তার ও কারাবাসের খবর বেরিয়েছে,—তাঁর নাম John Coffey,—তিনি ভবিষ্য দর্শন (Futurist Philosophy) সম্বন্ধে একখানি বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করছিলেন। তাঁর জীবিকা-আহরণ-চেষ্টাটি ভারী অদ্ভুত—দোকান বা হোটেল থেকে fur coat চুরি করে' তিনি খাদ্য সংগ্রহ করতেন।

এই সব লক্ষ্মীছাড়ারা আধা পথের ধার দিয়েও যাবে না! খবরের কাগজে লোক-ভুলানো কথা লিখে তারা সন্তুষ্ট হবার পাত্রও নয়। নেহাৎ হতভাগা তারা, কারণ ইচ্ছে করেই তারা অশন, বসন ও শয়নের ক্লেশ সহ্য করছে। কিন্তু যৌবনের গৌরব টীকা তাদের ললাটে প্রদীপ্ত, নিজেদের স্বপ্ন ও সঙ্গীত নিজেরা দেখবার ও শোনবার আশায় তারা বিভোর। তারা জীবনের ছোট-খাট সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে কাঁদছে না—জীবন নিয়ে পরখ করে' দেখবার আনন্দে তারা সব ভুলেছে। একদিন হয়ত তারা বুড়ো হয়ে ব্যর্থ জীবনের জন্যে অনুতাপ করবে। সেদিন এমনি একটি লোকের খবর পাওয়া গেল—ব্যর্থতার অনুশোচনায় যার-তার কাছে কাঁদছে আর ভিক্ষা চাইছে।

বর্ত্তমান যুগের প্রাণ-ধারণের এই অনন্ত বীভৎস সংগ্রাম ও কলকারখানার চিতাধূমের মাঝখানে বসে' সাহিত্য-সৃষ্টির স্বপ্ন দেখা বিত্ত-হীন লোকের পক্ষে একটা বিরাট স্পর্দ্ধা, কিম্বা পাগলামি, কিম্বা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা বই আর কিছু নয়! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মানসীর ভক্ত সেবকের অভাব নেই! পরিণাম যাই হোক, এ সাধনা চলবেই—কতক হয়ত না খেয়ে মরবে, কতক বা পাগল হবে, আবার কতক বা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। কল্প-লোকের সন্ধান পাবে কিন্তু অল্প লোকেই।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

মহামানব

জন্ম তোমার হয়েছিল কবে ঋষির মনে,
এই ভারতের মহামনীষার তপের ক্ষণে!
সর্ব্বমানবে অভেদ করিয়া দেখিল যারা—
তারাই তোমায় দেখেছে প্রথম, জেনেছে তারা!
তারপর তুমি যুগে যুগে এলে মূরতি ধরি',
অমৃত পিয়া'লে মৃত্যু-সাগর মথিত করি'!
কুরুক্ষেত্রে বাজিল শঙ্খ মাভৈঃ-রবে!
প্রথম-প্রেমিক শাক্যসিংহ উদিল ভবে!
পাপ-পশ্চিমে ভগবদ্-কৃপা দানিল ঈশা!
আরও একজন মরু-সন্তানে দেখা'ল দিশা।
সেই এক বাণীমূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তুমি!—
হে জীব-ব্রহ্ম-অভেদ! তোমার চরণ চুমি।

হে প্রাণসাগর! তোমাতে সকল প্রাণের নদী
পেয়েছে বিরাম, পথের প্লাবন-বিরোধ রোধি'!
হে মহামৌনি! গহন তোমার চেতন-তলে
মহাবুভুক্ষাবারণ তৃপ্তি-মন্ত্র জ্বলে!
ধন্বন্তরি! মন্বন্তর-মন্থ-শেষ—
তব করে হেরি অমৃতভাণ্ড—অবিদ্বেষ!
জগত-জনের বেদনা-সমিধ্ কুড়া'য়ে সবই—
সেই ইন্ধনে ঢালিলে আপন প্রাণের হবিঃ!

পরিলে ললাটে মহাবেদনার ভস্মটীকা—
জীবন তোমার হোম-হুতাশন ঊর্দ্ধশিখা !
শঙ্কাহরণ আহিতাগ্নিক পুরোধা তুমি !
যজ্ঞজীবন দৈবত ! তব চরণ চুমি।

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার !
তুমি নমস্য, করিছ সবারে নমস্কার !
চির-তমিস্রা-হরণ তোমার নয়নকূলে
অন্ধ-আঁখির অন্ধকারের অশ্রু দুলে !
অর্দ্ধ-অশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি !
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়ালে আসি' !
আদিকাল হ'তে কতকাল তুমি এমনি রত ?
হে মহাজাতক ! জাতক-চক্র ঘুরিবে কত !
কতবার দিবে আপনারে বলি যাগের যূপে !
ছোট 'আমি' গুলি ভরিয়া তুলিবে তোমার রূপে !
চিনেছি তোমারে, যুগে-যুগে অবতীর্ণ তুমি !
হে বোধিসত্ত্ব ! বুদ্ধ ! তোমার চরণ চুমি।

ধ্যানীর ধেয়ানে আসন তোমার চিরন্তন—
ইতিহাসে যবে ধরা দাও, সে যে পরমক্ষণ !
দেশে-দেশে তব শুভ-আগমন-বার্ত্তা রটে,
তোমার কাহিনী কীর্ত্তন হয় দেউলে মঠে।
পুনরায় যবে তোমারে ভুলিয়া তোমার নাম
জপ করে সবে নিজেরি লাগিয়া অবিশ্রাম—
নরে ভুলে গিয়ে শুধু 'নারায়ণ'-মন্ত্র পড়ে,
মনের মতন স্বার্থসাধন মূর্ত্তি গড়ে—
জগত-অন্ধ জগদানন্দে করিয়া হেলা
রতনে-ভূষণে সাজায় কেবলি মাটির ঢেলা—
জগজ্জীবন-মূর্ত্তি ধরিয়া এস গো তুমি !
মানব-পুত্র ! মৈত্রেয় ! তব চরণ চুমি।

এস গো মহান্ অতীত-সাক্ষী হে তথাগত !
হের এ ধরণী মরণ-শাসনে মূর্চ্ছাহত !
কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া মানব-রাজ !
গাহ জয়, গাহ মানবের জয়, গাহ গো আজ !
মহাব্যাধিভার কর গো হরণ পরশি' কর,
ধন্য হউক নিজেরে নিরখি' নারী ও নর !
আর বার ডাক' ঘরে ঘরে, 'এস আমার পিছে,
ভয়ের সাগর হেঁটে পার হও, ভয় যে মিছে !'
মৃতজনে পুনঃ নাম ধরে' ডাক' মৃতক-নাথ !
—প্রেতভূমে আজি একি হুলাহুলি রোদন সাথ !
হোক্ জাতি-পীঠ স্থতিকাক্ষেত্র—শ্মশানভূমি,
মহাদেব নয়, মহামানবের চরণ চুমি' !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

মেয়েদের শিক্ষা

শিক্ষা ও লোকমত।—দেশের বিদ্যা-পীঠগুলিই যে দেশের লোক-মত প্রতিফলিত করে, এ তথ্য অতি অল্পদিন মাত্র স্বীকৃত হইলেও উহা যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ কথা মানিয়া লইলে জাতীয় প্রচলিত অভিমত-গঠনের মূলে কি কি শক্তি কার্য্য করে তাহার সন্ধানে চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। উক্ত শক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর। একটি তাহার উন্নতিশীল প্রভাবের দ্বারা অল্প কয়েকজন জ্ঞানী ও দূরদর্শীর ধারণাকে বহুর আদর্শ রূপে গড়িয়া তোলে; অন্যটি ঈপ্সিত পরিণতির গতিকে শিথিল করিয়া আনে। কারণ উহা যে-সমস্ত কুসংস্কার পোষণ করে তাহাতে শিক্ষা-সঙ্কটের প্রধান কারণগুলি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী সমস্যায় অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। কি সমাজতত্ত্বে ও লোক-হিতসাধন কার্য্যে—কি শিক্ষা-দীক্ষা বা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র উহারাই সর্ব্বপ্রধান, বিশেষ আবার দৈনন্দিন জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনও বিষয় যখন সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, তখন উহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে।

গৃহিণী হইবার উপযোগী শিক্ষা।—মেয়েদের শিক্ষা যাহাতে তাহাদের মাতৃত্বের বিরোধী না হয়, এ দিকে সকলের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। আমরা শিক্ষা-পীড়িত মস্তিষ্ক

চাইনা, আমরা চাই প্রকৃতির প্রয়োজনোপযোগী সবল সুগঠিত দেহ। শিক্ষকগণের লক্ষ্য রাখা উচিত যে মেয়েদের যেন সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়,যাহা তাহাদিগকে সংসারে কল্যাণময়ী, গৃহকর্ম্মের উপযোগিনী করিয়া তুলিতে পারে এবং যে-শিক্ষার শক্তি ও মধুর প্রভাব অবিরাম বর্দ্ধনশীল। বস্তুতঃ তাহাদের অন্তরের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন শারীরিক শিক্ষাও সমতালে অগ্রসর হওয়া অত্যাবশ্যক, নতুবা কচিৎ ব্যতিক্রম ব্যতীত সেরূপ শিক্ষা নিশ্চয়ই বিফল হইবে, এমন কি হয়ত উহা তাহাদের পক্ষে সাজ্ঘাতিক ও স্থায়ী দুর্দ্দশারও কারণ হইবে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্নায়বিক উত্তেজনার মাত্রা স্বভাবতঃই অধিক কিন্তু উহা উপযুক্ত শারীরিক উৎকর্ষের দ্বারা অনেকটা সুসংযত করা যাইতে পারে। নিয়মিত ও যথোচিত দৈনিক ব্যায়ামের অভাব মেয়েদের অসার ও নিরুদ্যম করিয়া তোলে, মুখের রং বিবর্ণ করিয়া দেয়, কোষ্ঠবদ্ধতা-জনিত মালিন্য লইয়া আসে, মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং কেমন যেন একটা মন-মরা ভাব আনিয়া দেয়। শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করাটাও যে একটা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে—স্নায়ুর অপেক্ষা মাংসপেশীর উন্নতি যে অধিকতর প্রয়োজনীয়, এই ভাবটুকু মেয়েদের মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষক ও অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য। এবং এই উদ্দেশ্য সঙ্গত উপায়ে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাহাদের শিখাইতে হইবে যে শ্রীমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমতী হওয়াও আবশ্যক ; কিন্তু সর্ব্বোপরি তাহাদের শিখাইতে হইবে যে চরিত্র-বলের দ্বারাই অনিয়মিত স্নায়বিক ক্ষয় হ্রাস করা যায়। যদি মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিরাপদ করিতে হয় তবে তাহাদের শারীরিক উন্নতি মনের উৎকর্ষ সাধনের পূরোবর্ত্তী করা প্রয়োজন। এই সাবধানতা ব্যতিরেকে উক্ত শিক্ষা প্রণালী কিছুতেই নিরাপদ হইতে পারে না ; কারণ স্ত্রীলোকের মানসিক শক্তির উৎকর্ষ তাহার অনেকখানি শারীরিক ক্ষতির বিনিময়ে সাধিত হয়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা না রাখিলে তাহাদের নারী-জনোচিত দুর্ব্বল দেহ-যন্ত্র কিছু না কিছু গভীর অনিষ্ট ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সাধনা সহ্য করিতে পারিবে না।

স্ত্রীলোককে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার সময় এটুকুও মনে রাখিতে হইবে, যেন তাহারা শক্তিশালী সন্তানের জননী হইতে পারে। কি করিয়া হইতে পারে, সে উপায় অবলম্বন করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। উচ্চ অঙ্গের শারীরিক উৎকর্ষের দ্বারা মেয়েদের বলিষ্ঠ সুশ্রী ও সুঠাম করিয়া তোলা যায় কিন্তু উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা ব্যতীত—কেবলমাত্র মানসিক উচ্চশিক্ষার দ্বারা তাহারা অলস বিলাসী অথবা বিকৃত স্নায়ু-বিশিষ্ট কিম্বা উভয়বিধ দোষে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

মেয়েদের ব্যায়াম-ক্রীড়ার আবশ্যকতা।—মেয়েদের প্রয়োজনীয় শারীরিক উৎকর্ষ যাহাতে সুসংসাধিত হইতে পারে, সেজন্য এই ব্যবস্থাগুলির আমরা অনুমোদন করি,—

ক। মেয়েদের দৈনিক বা আশ্রম-পাঠাগারে এক-একটী ক্রীড়াভূমির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এমন দিন ছিল যখন এ বিষয়ের উল্লেখমাত্র কোন তরফ হইতে পরিহাস ও বিদ্রূপের অট্টহাসি শুনা যাইত



জাপানী মেয়ে স্কুলের এক পার্শ্বের দৃশ্য

এবং এখনও বাংলা দেশের অধিকাংশ মেয়ে-স্কুলে প্রকৃতপক্ষে খেলা-ধুলা করিবার মত কোন বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা নাই।

খ। খেলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কোন বালিকাকেই একাদিক্রমে একঘণ্টা কালের অধিক ইস্কুল-ঘরে আটকাইয়া রাখিলে চলিবে না। তাহাদের দ্রুত-বর্দ্ধনশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহাতে মাঝে-মাঝে ছাড়া পায়, ফুসফুসের ক্রিয়া যাহাতে কিয়ৎক্ষণ পূর্ণ বেগে চলে এবং আবার একটি নূতন বিষয় অধ্যয়নের পূর্ব্বে যাহাতে তাহারা কতকটা মানসিক বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হাঁটা, ছোটা, দোল খাওয়া, লাফানো ইত্যাদি ব্যায়ামই উহাদের পক্ষে চমৎকার—। হাঁটা কিন্তু সহরের বাহিরে গ্রামের মুক্ত প্রান্তরেই হওয়া উচিত। চলার গতি-নির্দ্ধারণ ও নিজের সঙ্গিনী-নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ার সম্বন্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এবং কখনই যেন উহাকে বাধ্যতামূলক ও নিয়মাধীন যন্ত্রে পরিণত করা না হয়। মেয়েদের পক্ষে সাঁতারের মত অমন উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ব্যায়াম আর নাই। এ ছাড়া বাগানের কাজ ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে ঘোরাও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং আমোদজনক।

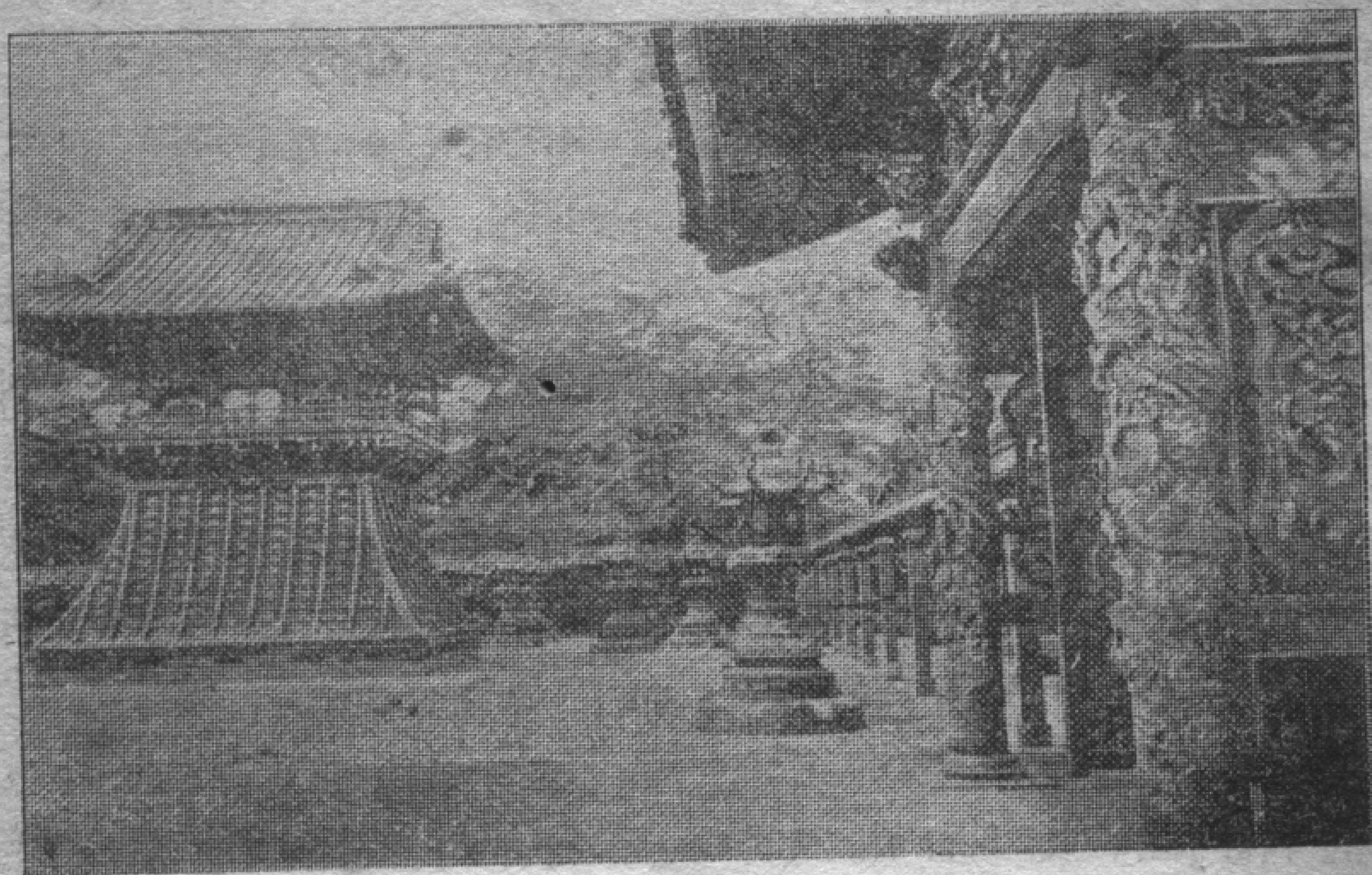
জাপানের স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতি।—

মহিলা বিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক জিঞ্জো নারুশে (Prof. Jinzo Naruse) তাঁহার ছাত্রীগণের নিকট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে জাপানের স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতির ধরণ কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

তিনি বলিয়াছেন, "শিক্ষা সম্বন্ধীয় রাজ অনুজ্ঞা পত্রে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আদেশ অনুসারে তাহারা সর্ব্বদা পরিচালিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন্ লক্ষ্য ও কি উদ্দেশ্য লইয়া স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনগুলিও অবিচলিতভাবে পালন করিবে। আত্মবুদ্ধি ও আত্মশাসনাধীন হইবার চেষ্টা করিলেও সুহৃদগণের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। অলস ও অসংযত জীবন যাপনের প্রবৃত্তি হইতে সতত তাহাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। অপরকে তাহারা সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং নিজেরাও আত্মসম্মানী হইবে। সামাজিক আচার-ব্যবহারে বিনম্রী ও ভদ্র হইতে হইবে। তাহাদের রীতি-প্রকৃতি যেন গর্ব্বোদ্ধত না হয়। তাহারা শান্ত, নম্র, ধীর এবং সত্যবাদী হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হঠকারিতার কার্য্য হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইবে, যে যে গুণ নারীকে প্রিয় ও পূজনীয় করিয়া তোলে, তাহার সকলগুলির অধিকারিণী হইবার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জন ও কলা-বিদ্যা-শিক্ষা-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব নিজেদের শক্তি ও বিচার-বুদ্ধিকে খাটাইয়া নিজেদের চেষ্টায় শিখিবার ও বুঝিবার অভ্যাসটাও রপ্ত করিতে হইবে। এই উপায়ে শিক্ষকের অভিমতগুলিই অন্ধভাবে মানিয়া লওয়ার যে দোষ, অল্পবয়স্কা ছাত্রীগণের মধ্যে প্রায়ই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—উহাও বিদূরিত হইবে। বিবিধগুণে গুণবতী ও সবজান্তা হইবার প্রয়াস না করিয়া বস্তু ও বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ ও উহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিবার ও তাহার আভ্যন্তরীন রহস্যটুকু জানিবার এবং জ্ঞান ও শিল্পকলার মূল তত্ত্ব ও তাহার চরম পরিণতি অবধারণ করিবার শক্তিটিই তাহাদের অর্জ্জন এবং লালন করিতে হইবে। ইহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইবার পরও পঠদ্দশায় যাহা শিখিয়াছিল, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে অবাধে প্রয়োগ করিয়া সুফল পাইবে, এবং সর্ব্ব-শক্তিতে শক্তিময়ী।

"দেহের স্বাস্থ্যে সুস্থ মন।" দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত নারী কেবলমাত্র যে নিজেই দুর্ভাগিনী, তাহা নহে; যে-গৃহের সে কর্ত্রী, সে গৃহেরও সে দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু সেইখানেই তাহার অপরাধ শেষ হইয়া যায় না। সে তাহার পশ্চাতে ভবিষ্যদ্বংশধরগণের জন্যও দুঃখ রাখিয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কাও আছে এবং এই জন্য সমাজেরও সে এক অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং ছাত্রীরা যাহাতে প্রচুর ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকে, এবং আহার, নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ও অধ্যয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বাস্থ্যতত্ত্বের নির্দ্ধারিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করে, এই দিকেই সমধিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

টোকিও সহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের বিদ্যালয়। টোকিও সহরে অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাদের জন্য যে-বিদ্যালয়টি আছে, মিকাদোর সাম্রাজ্যের ভিতর—সমুদয় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাজ-পরিবারের ও সম্ভ্রান্ত বংশের



টোকিও সহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের বিদ্যালয়

কন্যাদের কল্যাণের জন্য সম্রাজ্ঞী হারুকোর পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উহা সহরের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত এবং য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাগণের এই বিদ্যালয় নব্যতন্ত্রের শিক্ষা-সদনগুলির একটি হুবহু প্রতিরূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জাপানী মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে।

স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের স্বজাতির অর্থাৎ অপর স্ত্রীলোকের প্রশংসা করিতে বিধিমতে কার্পণ্য করেন, কিন্তু অল্পকয়েকজন বিদেশিনী, যাঁহারা জাপানী মহিলাদেরও আপনার বন্ধু সংখ্যার মধ্যে গণনা করিতে পারেন—তাঁহারা কেহই শ্রীমতী হিয়ু ফ্রেজারের অভিমতটি সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না,—যে—"প্রকৃত-নারীত্বের মানে,—জ্ঞান, বুদ্ধি মাধুরী, বীর্য্য ও বিনয়ের উচ্চ সমাবেশ।......এই সকল গুণে জাপানী নারী পৃথিবীর যে কোন নারী জাতির সমযোগ্য এবং তুলনায় অধিকাংশকে অতিক্রম করিয়া যায়।'

'শীনওন্না দায়গাকু' বা স্ত্রীলোকের নূতন প্রয়োজনীয় বিদ্যা। পূর্ব্বে জাপানী মেয়েদের শিক্ষা যে পরিমাণে অবহেলিত হইয়াছে—তাহার তুলনায় দেখিতে গেলে এই অর্দ্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে এই বিভাগে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর! তবে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশে পাশ্চাত্য গতিবিধি সুরু হইবার অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষার কলকব্জা যদিও চলনসই রকমের পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তথাপি শিক্ষার আদর্শ ও আনুমানিক পদ্ধতির মধ্যে অনেকটা অনৈক্য থাকিয়া গিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষায় প্রকারান্তর করিবার জন্য কতকগুলি

বিদ্যালয় যে হালে স্থাপিত হইয়াছিল ইহা সত্য—কিন্তু কনফ্যুশীয় মতবাদ সমূহই যে তখন বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং একটা প্রভুত্বের প্রভাব চালাইয়াছিল, এ কথা আজও অবিসম্বাদী সত্য রহিয়াছে। 'ওন্না—দায়গাকুর' মধ্যে যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ ছিল, কেন্‌বোরাইয়োশই (বিজ্ঞ জননী আর চমৎকার স্ত্রী) প্রভৃতি অস্পষ্ট ও অনেকটা অপরিণত ধারণা-মূলক প্রবাদগুলিই তাহার প্রমাণ। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ফুকুজাওয়া 'শীন ওন্না দায়গাকু' (স্ত্রীলোকগণের নূতন প্রয়োজনীয় বিদ্যা) নাম দিয়া 'ওন্না দায়গাকুর' একটি সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি 'ওন্না দায়গাকুর' সমস্ত অসঙ্গতি উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন; এবং উহার উপদেশাবলীকে সেকেলে বা—বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী—বলিয়া প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়াছেন। স্ত্রীলোক ও তাহাদের মানুষ করিয়া তোলার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ফুকুজাওয়া—তাঁহার অভিমত তেইশটি অনুশাসন বা সূত্রের আকারে বিভক্ত করিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে পরস্পর মেলামেশার সুযোগ তিনি আরও বিস্তৃত করিয়া দিতে বলিয়াছেন। পিতা মাতা ও তাঁহাদের বিবাহিত পুত্র-কন্যার ভিন্ন সংসারে এবং পৃথকভাবে বসবাস, স্ত্রীর সম্বন্ধে শ্বশুরালয় সম্পর্কীয় কুটুম্বগণের হস্তক্ষেপ নিষেধ,—বিবাহ-ব্যাপারে স্ত্রীলোকগণেরও সমান অধিকার আছে ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিয়াছেন। বিবাহ যে একটা চুক্তির সামিল, এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই স্ত্রীলোকগণের প্রতি তাঁহার উপদেশাবলী রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—এবং সেই কারণেই বোধ হয় তিনি বিবাহ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকারের সত্ত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারের কন্যারা এবং হিন্দু ও মুসলমান গৃহের যে সব পর্দ্দানশীন মেয়েদের বাড়ীতে লেখা-পড়া শিখানো হয়, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলাদেশের মেয়েদের পড়াশুনা প্রায় চৌদ্দ বছরের মধ্যেই অথবা তার আগেই খতম হইয়া যায়। ঐ সব মেয়েদের ছাত্রীজীবন যদিও অল্পদিনমাত্র স্থায়ী, কিন্তু অন্যভাবের ও অন্য এক প্রকারের নিয়মাধীন হইয়া তাহারা যে শিক্ষা পায় তাহা প্রায়ই অত্যন্ত কঠোর! বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরে স্বামী-গৃহে বর্ষীয়সী নারীগণের শাসনাধীনে থাকিয়া তাহারা যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা লাভ করে, তাহা যথার্থই কঠোর। যৌবনে সেই একই বয়সের য়ুরোপীয় মেয়েরা যেরূপ নিয়মে শিক্ষাধীন থাকে, ইহাদের নিয়মের বাঁধাবাঁধি ঠিক তাহার বিপরীত ধরণের হইলেও উহারও একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। উহা ব্যক্তিগত প্রকৃতির পার্থক্য-অনুযায়ী যতটা সম্ভব প্রত্যেককে জীবনের একটা কোন আদর্শের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে, বংশপরম্পরা যে ধারা মানিয়া আসিতেছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে, এবং এমন কতকগুলি ধর্ম্মবিধান, যাহার ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত থাকায় এখনও চলিয়া আসিতেছে উহাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়। এই রকমের যে শৃঙ্খলা, যদিও ইহার মধ্যে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তিত

বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষক কোন ব্যবস্থা নাই, তা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে ইহা এক প্রকার উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা-বিধি। যে আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা, সে সম্বন্ধে আমাদের যে অভিমতই থাকুক না কেন এবং অল্প বয়সের মেয়েদের দেহের অপরিপুষ্টতা ও বোধশক্তির দিকে সস্নেহ ও সযত্ন দৃষ্টি না রাখিয়া—উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ যে পরিমাণেই কঠোর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা থাক না-তথাপি এ কথা কিছুতেই আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না যে উক্ত পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে একটা সুনির্দ্দিষ্ট শিক্ষার সুযোগ আছে। এ শিক্ষা একটু সেকেলে ধরণের, অনেকটা যেন কারখানায় থাকিয়া মিস্ত্রীর কাজ শেখার মত, সংসারের মধ্যে থাকিয়া গৃহ-কর্ম্ম শিক্ষা করা!

মেয়েদের প্রধান তিনটি সহজাত প্রবৃত্তি। ভারতীয় কন্যাদের প্রকৃতির মধ্যে তিনটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি অসাধারণ সৌন্দর্য্য লইয়া বিকশিত হইতে দেখা যায়। অতি অল্প বয়সেই তাহাদের অন্তরের মধ্যে মাতৃভাবের অন্তর্নিহিত গুণটি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। যে হিন্দু পরিবারের মধ্যে তাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তথাকার শিক্ষা উপদেশ ও নীরব অনুভাবের প্রভাবে তাহাদের এই সহজাত চিত্ত-বৃত্তিটি অধিকতর উদ্রিক্ত ও প্রবল হইয়া উঠে। ভারতীয় কন্যাদের প্রকৃতির মধ্যে এই মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তির সহিত আর একটি প্রবল শক্তি জড়িত থাকে,—সেটি ধর্ম্মভাব। পবিত্র হিন্দু যে কোন সুচরিতা মহিলার দৈনন্দিন প্রত্যেক কার্য্যটিই ধর্ম্মানুশাসিত হইয়া থাকে। সাংসারিক কার্য্যে ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু রমণী হোমশিখার ন্যায় নিষ্পাপ! সে কোনরূপ যশের প্রত্যাশী নয়, সে নিরহঙ্কার এবং আপন লক্ষ্যে সতত সুদৃঢ় ও অচঞ্চল। সেখানে তাহার কর্ত্রীত্বের অপেক্ষা আদেশ-পালনের আনন্দটুকুতেই সমধিক আগ্রহ। তাহাদের এই স্বেচ্ছায় ও সগর্ব্বে বরণ করিয়া লওয়া যে অধীনতা, ইহা তাহাদিগকে সেবা করিবার একটা বিশুদ্ধ শক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি আনিয়া দেয়। এই ধর্ম্মপরায়ণা ভারত-ললনাদের তৃতীয় প্রধান স্বতঃ-প্রবৃত্তি হইতেছে, আদর্শকে রূপ দিবার শক্তি। যে কোন তুচ্ছ ও সামান্য বস্তুতেও সে একটা নিগূঢ় রহস্যময় রূপকের বিশেষত্ব আরোপ করে এবং সেই প্রতীকের ভিতর দিয়া সে অরূপকে প্রত্যক্ষ করে। তাহার নয়ন-মন বস্তুর মধ্যেই দৃষ্টির অগোচরকে সন্ধান করিয়া ফিরে। পরিশেষে আত্মসংযমের দ্বারা ও বিধি-নিষেধের নিয়মাধীন থাকিয়া তাহারা গভীর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি লাভ করিতে পারে—এবং চিত্তবিক্ষেপী দুশ্চিন্তার শৃঙ্খলজাল অতিক্রম করিয়া এমন এক শান্তির মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে, যাহা বুদ্ধিরও অগোচর!

আধুনিক শিক্ষার কুফল। হিন্দু সম্প্রদায়-ভুক্ত অনেকেরই বিশ্বাস যে আধুনিক স্কুল-কলেজের শিক্ষার কতকগুলি প্রচলিত ধারা ও ব্যবস্থা তাঁহাদের কন্যাদিগের যে-সকল স্বাভাবিক গুণ ও বিশেষ ক্ষমতা থাকে তাহার পক্ষে হানিকর। তাঁহারা মনে করেন যে পাশ্চাত্য প্রথানুবর্ত্তী শিক্ষা-পদ্ধতির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রকরণ পত্নীর ধর্ম্ম-

সম্বন্ধীয় হিন্দু আদর্শের বিরোধী। তাঁহারা আরও মনে করেন যে চিত্তাকর্ষক অন্যান্য বিষয় ও পরীক্ষায় পাশ করা প্রভৃতি অপরাপর উদ্দেশ্য মেয়েদের মনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে যে প্রাচীন মতে স্ত্রীলোকের যাহা প্রধান কার্য্য, অর্থাৎ পত্নীর কর্ত্তব্য,—তাহা শিক্ষা করা ঘটিবেই না। এ কথাও বলা হয় যে, অন্য এক পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর তীব্র প্রভাব পারিবারিক প্রাধান্যের প্রতিবন্ধকতা সাধন করিবে। প্রতিদিন য়ুরোপীয় আদব-কায়দার অনুবর্ত্তী স্কুল এবং হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুর এই দুইয়ের পরস্পর-বিরোধী পৃথক পৃথক বিধি-নিয়মের অনুশাসন মানিয়া চলার যে ক্লান্তি, তাহাতে ছাত্রীদের স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে এ আশঙ্কাও অনেকে করেন। (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের তদন্ত-পত্র—১৯১৭—১৯ সাল, ১ম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ১০৩—৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান কারণই ভারতীয় নারীগণের উচ্চ শিক্ষার অন্তরায়-স্বরূপ—

ক। অত্যন্ত অল্প বয়সে বিবাহ।

খ। অত্যন্ত অল্প বয়সে সন্তানবতী হওয়া।

গ। অবরোধ-প্রথা।

ঘ। স্বতন্ত্র সামাজিক গঠন ও পারি-পার্শ্বিক সংস্থান বিশেষ।

ঙ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার একান্ত অসচ্ছলতা।

বিধান। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা স্বতঃই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যেমন—

১। যে সব মেয়েরা নিয়মিত স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে চায়, তাহাদের শিক্ষার জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যেখানে ভারতীয় নারী-চরিত্রের বিশেষত্ব-রক্ষণোপযোগী পঠন-পাঠনের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে। কতকগুলি সংক্ষিপ্ত এবং দুর্ব্বোধ পারিভাষিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রম-শিল্প রসায়ন শাস্ত্র, ভূবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা, প্রাকৃতিক জ্যোতিষ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে অল্প আয়ে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করা, সুশৃঙ্খলে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করা, রন্ধন-বিদ্যা, স্বাস্থ্যনীতি, শিশু-মনস্তত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, কলাবিদ্যা প্রভৃতি মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গীভূত এবং তাহাদের উপাধি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

২। যে সব মেয়েরা অবরোধের মধ্যে বাস করে এবং সামাজিক ও আর্থিক কারণ বিশেষে, সাধারণ পাঠাগারে যোগ দান করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য আমরা প্রস্তাব করি যে তাহদের যোগ্যতা-অনুসারে এবং স্বতন্ত্র প্রয়োজনুযায়ী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত টিকারীর মহিলা বিদ্যালয়ের মত একেবারে সম্পূর্ণ পর্দ্দানশীন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেখানে মেয়েদের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত এই আট বৎসরের মধ্যে উপর্য্যুক্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ-ভাবে দেওয়াইতে হইবে।

প্রাদেশিক জাতীয় ভাষাকেই বালিকা ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষার বাহন করা উচিত এবং পরীক্ষা প্রভৃতিও তাহাদের মাতৃভাষায় প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব

সাহিত্যিক-দরবারে আজ একটা নতুন কথা পাড়্‌ব। মঞ্জুর হবে কি-না-হবে, জানিনা, তবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বিস্তর মাথা পেতে নিতে হবে, তা জানি। কারণ সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে কিছু কর্‌তে গেলেই বিপদ! কথাটা এখন খুলে বলি। প্রস্তাবটা হচ্ছে, "আ" থেকে "ঔ" পর্য্যন্ত বর্ণগুলোকে ভাষা থেকে উঠিয়ে দেওয়া। অনেকে হয়ত হেসে বল্‌বেন, ছেলেমানুষী আর কি! স্বরবর্ণ হলো ব্যঞ্জনে নুন, আর তাকে কি না ভাষা থেকে তুলে দিয়ে নতুন কিছু কর্‌তে হবে! উত্তরে আমি বল্‌ব, নুনের অভাব মোটেই হবে না, এ-কে বাদ দিয়েও ভাষা-কার নুনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, আমি তা ধরিয়ে দেব মাত্র।

ইংরাজিতে A, E, I, O, U দ্বারা স্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়ে থাকে। আমরা কিন্তু (অবশ্য সংস্কৃতকার) এর দুটা রূপ বা রকম করে নিয়েছি। একটা স্বরূপ, আর একটা তার সঙ্কেত বা Symbol (কিন্তু অ এর বেলা নয়)। এই Symbol যথা া, ি, ী, ু, ূ, ে, ৈ, ো, ৌ—এতে করে আমরা যে উপকৃত হয়েছি তাও নয়, বরং গোটা কয়েক বর্ণের বোঝা বাড়িয়েছি মাত্র। ইচ্ছা কর্‌লে এদের যে কোনো এক প্রস্থ বাদ দিয়েও আমরা অনায়াসে কাজ চালাতে পারি। ভাষার বর্ণগুলোকে যত কমানো যায় ততই ভাল, বিশেষ রকমে ভাল, বিদেশী শিক্ষার্থীর পক্ষে।

আমি সঙ্কেতটার কথাই এখন বল্‌ব। সঙ্কেত ব্যবহার এক জায়গায় কিন্তু চলে না, সে হচ্ছে "অ" এর বেলা। তার মীমাংসা "অ" যেম্‌নি আছে তেম্‌নি রাখা, নয়ত তার একটা Symbol সৃষ্টি করা। কিন্তু এখানেও গোল মেটে না। মুস্কিল আরো যে না আছে, তা নয়। যেমন লিখতে হবে, "বেআমল"। এ-কে যদি Symbol দিয়ে লিখি তবে তা হয়ে বসবে "বোমল"। যদি লিখতে হয় "এটা" তবে Symbol দিয়ে লিখতে গেলে তা হয়ে বসে "টো।" লিখ্‌তে হলে "ইন্দ্র" তা হবে "ন্দ্রি" ইত্যাদি। এ মুস্কিলেরও একটা আসান বের করা যেতে পারে। যেখানে এরকম গোলমালের আশঙ্কা থাকে, সেখানে "—" এরূপ ইংরেজী হাইফেন এর মত চিহ্ন ব্যবহার করা। যেমন "তেইশ" একে লেখা চলে "তে-িশ", এই চিহ্ন-দ্বারা "তেশি"'র গোলমাল থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। তেম্‌নি এক (ে-ক), ইন্দ্র (ি-ন্দ্র), বে-আমল (বে-ামল)। নীচে আরো খানিক বিস্তারিত ব্যবহার দেখিয়ে আলোচনা শেষ কর্‌ব।

(ক) "সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাো াপন সুর,
ামার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাি ে-ত মধুর।"

(খ) মুহূর্ত্তেি ঘনান্ধকারে সম্মুখ ে-বং পশ্চাৎ লেপিয়া ে-কাকার হি-য়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণে ো বামে সীমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল ুদ্দাম জলস্রোত ে-বং তাহাি ুপর তীব্রগতিশীলা েি ক্ষুদ্র তরণীটি ে-বং কিশোর-বয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেি অপ-রিমেয় গম্ভীর রূপ ুপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে কথা ামি আজিো ভুলিতে পারি নাি।

দৃষ্টান্ত বোধ হয় এতেই যথেষ্ট হয়েছে। গোড়াতেই বলে রেখেছি যে এটা প্রস্তাব মাত্র। আইন গড়্‌তে যাওয়ার দুঃসাহস আমার নেই। প্রস্তাব করার অধিকার সকলেরই আছে, তাই করেছি। যুক্তির বলে প্রস্তাবটা কেউ বাতিল কর্‌তে পারেন তো তাতে আমার মোটেই ক্ষোভ হবে না। পক্ষান্তরে যুক্তির সম্মান করে প্রস্তাবটা কাজে লাগালে সুখী হব।

আমার জনৈক বন্ধু আপত্তি করে ছিলেন যে, ওরকম লিখলে বিশ্রী দেখাবে। আমি বলি, পুরাতনকে ভাঙ্গতে গেলেই জিনিষটা বিশ্রী ঠেকে। কিছুদিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুন্দর হয়ে যায়। সুন্দর কুৎসিত তো মনের কাছে। সংস্কার-বদ্ধ মনের নিকট নতুন যা কিছু, সবই কুৎসিত।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ

(বৌদ্ধমত)

বৌদ্ধমতে পুনর্জন্মবাদ ও নির্ব্বাণঃ—বৌদ্ধমতে মৃত্যুতে বাসনা ও কর্ম্মফল বিনষ্ট হয় না। আমার বাসনা হইতে একটি নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে; কর্ম্মফল অপরিহার্য্য। আমার বর্ত্তমান জীবন ও আমার মৃত্যুর পর আমার বাসনা-সম্ভূত জীবের জীবন একই জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। কি প্রকারে আমার বাসনা হইতে একটি নূতন জীব উৎপন্ন হইয়া আমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পালি-ভাষাবিদ্ বৌদ্ধদর্শনে-পণ্ডিত Mr. T. W, Rhys Davids Hibbert Lectures 1881, গ্রন্থে লিখিয়াছেন "It is a mystery known only to the Buddhists.—এই রহস্য আমাদের অজ্ঞাত"। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে ইহার আর একটা অর্থও আছে। পিতা সন্তান-রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষের সর্ব্ববিধ দোষ ও গুণ লইয়া (শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক) সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বর্ত্তমানে Eugenic Science (সুজনন বিদ্যা) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে—"Parents undoubtedly live over again in their offspring." জায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এইরূপ।

কোন চিৎশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী আত্মার স্থান বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "Civilisation in the Buddhist Age" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আত্মার পরিবর্ত্তে বাসনা দ্বারা পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফলভোগের মীমাংসার চেষ্টা বৃথা, কথার মার-প্যাঁচ মাত্র। কোন কোন পাঠক আত্মার অভাবে পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট আমার উত্তর এই—আত্মার দ্বারাও পুনর্জন্মের মীমাংসা হয় না; কারণ স্মৃতিযোগেই ব্যক্তিত্বের একত্ব। স্মৃতির অভাবে ব্যক্তিত্বের একত্ব ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। রাম পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়া এ জীবনে, হরি-রূপে, অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এস্থলে হরির পূর্ব্বস্মৃতির অভাবে দুই ভিন্ন ব্যক্তির একত্ব অনুমান করা অসম্ভব। রাম করিল পাপ, আর শাস্তি পাইল হরি? ইহা ঘোর অবিচার। এজন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'জাতিস্মর' কল্পনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতে রামের বাসনা-জাত হরি পূর্ব্ব জীবনের অর্থাৎ রামের পাপের ফলে অন্ধ হইয়াছে। হরি রাম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন; যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ বীজ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। কার্য্য এবং কারণ একই বস্তুর ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হরির জীবন রামময় বাসনা ও কর্ম্ম দ্বারা যুক্ত হইয়া রামের সহিত এক হইয়াছে। এই অর্থে রামের পুনর্জন্ম বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হইয়াছে। (Buddhism—By Mr. Rhys Davids PP 91, 99, 124,135,144,and Budhism by Mr. T. W. Rhys Davids PP 103, 105 and Sacred Book of the East—Vol—Questions of King Milinda—ইত্যাদি গ্রন্থ আলোচ্য)। আমার কর্ম্মফলে এক নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইবে ইহা ভাবিতেও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয়েই মানব পাপ হইতে বিরত হইবে; নরকের ভয়ে নহে। Mr. Rhys Davids এর মতে ইহাই বৌদ্ধনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব। "নির্ব্বাণ" লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। Rhys Davids ও Maxmuller বলেন, নির্ব্বাণ লাভের অর্থ বাসনার বা তৃষ্ণার বিনাশ দ্বারা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং স্বীয় অন্তরের বিশুদ্ধি-সাধন ও প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা ইহ জীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। (Budhism—T. W. Rhys Davids pp 111,120,125,149, দ্রষ্টব্য) বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর স্বীকৃত হন্ নাই, তজ্জন্য কোন কোন পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। তাহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি,—বেদান্ত বলেন—শঙ্করাচার্য্যের মতে, আমা হইতে ভিন্ন, আমার অতীত, কোন ঈশ্বর আছে মনে করা মায়ার কার্য্য অবশ্য

পারমার্থিক ভাবে। 'অহং ব্রহ্মোঽস্মি' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আমিই একমাত্র সত্য বস্তু। জগৎ অধ্যাস আমারই মায়া-কল্পিত। আমিই জগৎ-স্রষ্টা ও জগৎ-বিধাতা। সাংখ্যকার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অজ্ঞেয়বাদেরই সমর্থন করিতেছেন। নৈয়ায়িক ও মীমাংসকের মতে ঈশ্বর থাকিলে 'তটস্থ', জীবের কল্যাণ ও অকল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত গীতায় ঈশ্বরবাদ, প্রফেসর শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস কৃত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করদর্শন (১ম ভাগ) গ্রন্থদ্বয়ে ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত 'জিজ্ঞাসা'র 'মুক্তি' প্রবন্ধে এই বিষয় বিশদরূপে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মিলিতোনা

৭

দোতালার সিঁড়ির মাথায় পৌঁছিয়া জুয়াঙ্কোর পা টলিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল; সেইখানে থামিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। জুয়াঙ্কো আপনাকেই ভয় করিতেছিল, যে সব কাণ্ড এখনই ঘটিবে তাহা মনে করিয়াই ভীত হইয়াছিল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদ-দলিত করিলেই কি যথেষ্ট হইবে? মিলিতোনাকে কি হত্যা করিব? ঘরে কি আগুন লাগাইব? এইরূপ ভীষণ, অসঙ্গত, নানা প্রকার পাগলামি তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য চৈতন্যোদয় হইলে, জুয়াঙ্কো নীচে নামিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া-ছিল; কিন্তু ঈর্ষা-রাক্ষসী সেই সময় তাহার তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়া জুয়াঙ্কোর হৃদয় বিদ্ধ করিল। তখন সে আবার সেই রূঢ় ধরণের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

একথা সত্য, জুয়াঙ্কোর মত বলিষ্ঠ লোক প্রায় দেখা যায় না। গ্রীবা থামের মতো গোলাকার ও সুদৃঢ়। মল্ল-সুলভ স্কন্ধের সহিত তাহার শক্তিমান মস্তক সংযুক্ত। তাহার দুর্জ্জয় বাহুদ্বয়ের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে ইস্পাতের মত পেশী-জাল প্রসারিত, তাহার বক্ষদেশ যেন সেকেলে গ্ল্যাডিয়েটারদের পাষাণবৎ বক্ষগুলাকে স্পর্দ্ধার সহিত যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। একহাত দিয়া কোনও ষাঁড়ের শিং সে অনায়াসে উৎপাটিত করিতে পারে এমনই তাহার বাহুবল। কিন্তু এই-সব সত্ত্বেও উৎকট মানসিক কষ্ট, এই দৈহিক বলকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। জুয়াঙ্কোর কপালে ঘাম ছুটিল, পায়ের উপর ভর দিয়া যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না; ঝলকে ঝলকে রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। চোখের উপর দিয়া যেন অনল-শিখা চলিয়া যাইতেছিল। পাছে সিঁড়ির উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে অনেকবার বাধ্য হইয়া সিঁড়ির গরাদে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। কি ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল, ইহা হইতেই বেশ অনুমান করা যায়। সিঁড়িতে উঠিবার সময় প্রত্যেক ধাপের উপর হিংস্র জন্তুর মত দাঁত কিড়মিড়

করিতে করিতে এই কথাটা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল ;—

"তার শোবার ঘরে !···তার শোবার ঘরে !"···এবং তাহার কটিবন্ধ হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া, যান্ত্রিকভাবে একবার খুলিতেছিল, একবার বন্ধ করিতেছিল। অবশেষে দরজার কাছে পৌছিয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া কর্ণপাত করিতে লাগিল।

কক্ষের ভিতরটা সব চুপ্‌চাপ্‌। নিজের বুকের ধুক্‌ধুক্‌ শব্দ ছাড়া জুয়াঙ্কো আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

তাহার শত্রু ও তাহার মধ্যে এখন এই দরজার ব্যবধান আছে মাত্র। "দরজার পিছনে এই নিস্তব্ধ কক্ষে না জানি কি হইতেছে !" আহত ব্যক্তির কষ্টে কাতরও উদ্বিগ্ন হইয়া মিলিতোনা আহতের কষ্টলাঘবের জন্য, তাহার নিদ্রার প্রতীক্ষায় তাহার পালঙ্কের দিকে নিশ্চয়ই ঝুঁকিয়া আছে। সে মনে মনে ভাবিল ঃ—

"যদি আমি জানিতাম কেবল একটা ছোরার আঘাতই তোমাকে খুসী করিতে পারে, তোমার মনকে আর্দ্র করিতে পারে, তাহলে আমি তাহার উপরে ছোরা না চালাইয়া তোমার দরজার সাম্‌নে মরবার জন্য আমার নিজের বুকেই ছোরা বসাইতাম। কিন্তু তুমি আমার কষ্ট নিবারণের জন্য কিছুই করতে না, আমি রাস্তার উপর পড়ে থেকেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতুম। কেননা, সাদা দস্তানা-পরা কাটা-ছাঁটা লম্বা কোর্ত্তা-পরা, আমি ত একজন সুশ্রী ফিটফাট্‌ যুবা-পুরুষ নই !"

এই কল্পনাটা তাহার রোষানলকে আবার উদ্দীপিত করায় তাহার হৃদয় খুবই ব্যথিত হইল।

আন্দ্রে পালঙ্কের উপর ক্ষতের যন্ত্রণায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। মিলিতোনা তাহার শয্যার পাশেই বসিয়াছিল,—সে যেন কলকাঠির দ্বারা চালিত হইয়া একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। বুড়ী আল্‌দঙ্গা, স্বীয় বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ চুম্বন করিয়া ক্রুশের চিহ্ন প্রদর্শন করিল।

দরজার বাহির দিক হইতে খুব একটা ঘা পড়িল,—ঐ আঘাতটা এমন সংক্ষিপ্ত, এমন জোরালো, এমন অনুজ্ঞাব্যঞ্জক যে দ্বার উদ্‌ঘাটন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। দরজায় ঐরূপ আর একটা ঘা যেই পড়িল, অম্‌নি ভিতর দিক হইতে দরজার অর্গলটা নামিয়া গেল। আল্‌দঙ্গা বুড়ী, কম্পমান হস্তে, উঁকি-রন্ধ্রের কপাট খুলিয়া, সেই চৌকোণা রন্ধ্রের ভিতর দিয়া, জুয়াঙ্কোর মাথা দেখিতে পাইল। দেখিয়া বুড়ী বেচারী ভয়ে আঁৎকিয়া উঠিল। জুয়াঙ্কোকে ভিতরে ডাকিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে সে একটি শব্দও বাহির করিতে পারিল না। আঙ্গুলগুলা ছড়ানো, দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ, মুখবিবর খোলা—এই ভাবে বৃদ্ধা পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

এ কথা সত্য, ঐ বৃষ-মল্লের মুখ নিরীক্ষণ করিলে নির্ভয় হওয়া যায় না, কোনও ভরসা পাওয়া যায় না। তাহার চোখের চারিদিকে একটা লাল রেখার ঘের ; মুখ নীলবর্ণ ; এবং গালে রক্ত না থাকায় দুই গালে দুইটা সাদা দাগ পড়িয়াছে। নিজ বধ্য শিকারকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় হিংস্র পশুদের যেরূপ

হয়, সেইরূপ তাহার নাসারন্ধ্র ফুলিয়া-ফুলিয়া স্পন্দিত হইতেছিল। দন্তের দংশনে ঠোঁটের উপর দন্তের ছাপ্ পড়িয়াছিল। এই বিপর্য্যস্ত মুখমণ্ডলের উপর রোষ ও প্রতিহিংসা যুঝাযুঝি করিতেছিল।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল :—

"মেরী-মা রক্ষা কর, রক্ষা কর। যদি মা তুমি আমাগিকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর, তাহলে তোমাকে ৯দিনের পূজো দেব, ঝালোর-ওয়ালা একটা মোমবাতী দেব, আর একমুঠো মথ্‌মল্ দেব।"

যে বিপদে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, সেই বিপদ উপস্থিত হইলে খুব নির্ভীক লোকদিগেরও যেরূপ মনের ভাব হয়, আন্দ্রে খুব সাহসী হইলেও তাহার ঐরূপ মনের ভাব হইয়াছিল। যেন কোন-একটা অস্ত্র খুঁজিতেছে এইভাবে সে যন্ত্রবৎ হাত বাড়াইল।

জুয়াঙ্কো যখন দেখিল, কেহ দরজা খুলিতেছে না, তখন সে তার কাঁধের ঠেস্ দিয়া দরজায় খুব একটা চাপ দিল; দরজার তক্তাগুলা মড়মড় করিয়া উঠিল। কব্‌জা ও তালার চারিদিক্ হইতে পলস্তারা খসিয়া পড়িতে লাগিল।

মিলিতোনা, আন্দ্রের সম্মুখে, দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে ও শান্তভাবে ভীতিবিহ্বলা বৃদ্ধাকে বলিল :—

"আল্‌দঞ্জা, দরজা খুলে দাও, আমি বল্‌চি দরজা খুলে দাও।"

আল্‌দঞ্জা অর্গল খুলিয়া, দেয়ালের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটা কবাট উল্টাইয়া দিয়া তাহার ভিতর গা-ঢাকা দিয়া রহিল।

জুয়াঙ্কো মনে করিয়াছিল, উহাকে সহজে প্রবেশ করিতে দিবে না—কিন্তু কোন বাধা না পাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইল। এখন সে ধীরপদক্ষেপে প্রবেশ করিল। কিন্তু যখন দেখিল, আন্দ্রে মিলিতোনার পালঙ্কে শুইয়া আছে, তখন তাহার প্রচণ্ড রোষ আবার ফিরিয়া আসিল। অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া বৃদ্ধা যে কপাটের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, সেই কপাটটা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। এক্ষণে বেচারী বৃদ্ধার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও, জুয়াঙ্কো সেই কপাটটা ধরিয়া জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর দরজায় পিঠ দিয়া, বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করিয়া বলিল :—

"বাবারে! ও আমাদের তিনজনকেই খুন করবে দেখ্‌ছি। এই জান্‌লা দিয়ে পুলিস ডাক্‌ব কি?" বৃদ্ধা জান্‌লার দিকে এক পা আগাইয়া গেল। কিন্তু জুয়াঙ্কো, তাহার মৎলব বুঝিতে পারিয়া, চট্ করিয়া গিয়া উহার কাপড়ের খুঁট ধরিয়া ফেলিল এবং উহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া আনিল। "দেখ্ ডাইনী, চ্যাঁচাস্ যদি, মুর্গির মতো তোকে গলা টিপে মারব। আমার শত্রু ও আমার মধ্যে যদি তুই এসে আমার কাজে বাধা দিস্, তাহলে তোকে একেবারে পিষে ফেলব।" আন্দ্রেকে দেখাইয়া সে এই কথাগুলা বলিল। আন্দ্রের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, দেহ যার-পর-নাই দুর্ব্বল। আন্দ্রে বালিস হইতে মাথাটা একটু উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

অবস্থাটা বড়ই ভীষণ; কোন গোলমাল নাই, কোন শব্দ নাই, যে তাহা শুনিয়া পাড়া-পড়সীরা ছুটিয়া আসিবে। তাছাড়া, জুয়াঙ্কো

কষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিলে প্রতিবাসীরা ভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইব না—এই ঝগড়ায় কখনই হস্তক্ষেপ করিবে না। পুলিস ডাকিয়া আনিতে গেলে, অনেক বিলম্ব হইবে; কোনো বাহিরের লোককে ত জানানো আবশ্যক; কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইবার যে কোন উপায় নাই!

ছোরার আঘাতে আহত বেচারী আন্দ্রে রক্তস্রাবে ক্ষীণ লইয়া পড়িয়াছে; তাতে আবার এখন নিরস্ত্র; অস্ত্র থাকিলেও অস্ত্র চালনা করিবার মতো তাহার অবস্থা ছিল না, এক্ষণে ক্ষত-বন্ধনের কাপড় ও লেপ-কাঁথার ভারেই সে জড়সড়, আত্মরক্ষণের কোন উপায় নাই—নির্দ্দয় শত্রুর ঈর্ষা ও রোষের ফল এখন অগত্যা ভোগ করিতে হইবে! আর এই সমস্ত ঘটিল সার্কাশে শুধু শ্রমজীবী-শ্রেণীর একটি সুন্দরী রমণীর পার্শ্বমুখ দেখিয়া! এই সময় এক মূহূর্ত্তের জন্য, পিয়ানোর জন্য, চায়ের জন্য, সভ্যতার নিতান্ত গন্ধ ধরণের আচার-ব্যবহারের জন্য তার একটু অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয় এই কথা এখানে স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই। তথাপি আন্দ্রে মিলিতোনার উপর একটি অনুনয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—তাহার ভাবার্থ এই, যেন মিলিতোনা তার জন্য নিষ্ফল যুঝাযুঝি না করে। মিলিতোনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার এই ভীতি-জাত পাণ্ডুবর্ণে তাহার সৌন্দর্য্য যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সব বিপদ সত্ত্বেও, আন্দ্রের মনে হইল, মিলিতোনার সহিত পরিচয় হওয়ায় সে আদৌ দুঃখিত নহে—বরং ইহা তাহার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মিলিতোনা সেইখানে দাঁড়াইয়া এক হাতে আন্দ্রের পালঙ্কের কিনারা ধরিয়া আছে, আর এক হাত, মহিমাময়ী রাজরাণীর মতো আদেশের ভঙ্গীতে দ্বারের অভিমুখে প্রসারিত;—মিলিতোনা কম্পিতস্বরে জুয়াঙ্কোকে বলিল:—

"—নর-হত্যাকারী পিশাচ, কি জন্য তুমি এখানে এসেছ? তুমি প্রণয়ীকে খুঁজচ—কিন্তু এই ঘরে একজন আহত ছাড়া আর কেউ নেই। এখনি প্রস্থান কর। তোমার কি ভয় হয় না, তুমি উপস্থিত থাকলে, ক্ষতস্থান দিয়ে আবার রক্তস্রাব হতে পারে। হত্যার চেষ্টা করেও যথেষ্ট হল না, আবার গুপ্ত হত্যা?"

তরুণী বালা এই "গুপ্তহত্যা" কথাটার উপর এমন একটা বিশেষ ধরণে ঝোঁক দিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে এমন একটা মর্ম্মভেদী চাহনী চাহিয়াছিল যে, জুয়াঙ্কোর চিত্ত বিচলিত হইল, লজ্জায় উহার মুখ লাল হইল, এবং তাহার হিংস্র-ভীষণ মুখের ভাবে ব্যাকুলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। খানিক-ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর, আটকিয়া-যাওয়া ভাঙাভাঙা স্বরে বলিল;—"দেবতা সাক্ষী করে, মাতৃদেবীকে সাক্ষী করে, শপথ কর্ যে, এই যুবককে তুই ভাল বাসিস্ নে, তাহলে এখনি আমি এখান থেকে চলে যাব।"

তরুণী কোন উত্তর দিল না।

তরুণীর ঈষৎ-রক্তিম মুখমণ্ডলের উপর তাহার কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি আনমিত হইল।

এই নিস্তব্ধতা আন্দ্রের পক্ষে মৃত্যুদণ্ডের নীরব ঘোষণা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আন্দ্রে উদ্বিগ্নচিত্তে মিলিতোনার উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোন উত্তর দিল না

দেখিয়া আন্দ্রের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় সন্তোষে পরিপ্লাবিত হইল।

জুয়াঙ্কো আবার বলিল :—

"যদি শপথ করতে না চাস, শুধু একটা মুখের কথা বল্। তাহলেই আমি বিশ্বাস করব। তুই কখনও মিথ্যা কথা বলিস্ নি। এখনো তুই চুপ্ করে রয়েচিস ?—তবে তোকে খুন করব।"...এই কথা বলিয়া জুয়াঙ্কো ছোরা খুলিয়া পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল..."তুই ওকে ভালবাসিস্!" তরুণীর চোখ্ হইতে যেন আগুন ছুটিতে লাগিল,—সে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল,—"আমার জন্য ওর যদি মরতেই হয়, তাহলে অন্ততঃ ও এইটুক জানুক যে, ও আমার ভালবাসা পেয়ে মরেচে। এই কথাটা ওর কবরের মধ্যে নিয়ে যাক্—এই ওর পুরস্কার-স্বরূপ হবে, আর তোর পক্ষে এই হবে মৃত্যুদণ্ড।"

জুয়াঙ্কো এক লাফে মিলিতোনার পার্শ্বে আসিয়া সজোরে তাহার বাহু ধরিল।

"এখন যা বল্লি, আবার যেন এই কথা মুখ দিয়ে বের না হয়—যদি ফের এই কথা বলিস্, তাহলে আমার এই ছোরা তোর বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে, ঐ হতভাগার শরীরের উপর তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

নির্ভীক বালা বলিল,—"তাতে আমার কি এল গেল ? তুমি কি মনে করচ ও মরে গেলে, আমি বাঁচব ?"

আন্দ্রে পালঙ্কের উপর একবার উঠিয়া বসিতে খুব চেষ্টা করিল। খুব উচ্চৈঃস্বরে কি-একটা কথা বলিবে মনে করিল। কিন্তু ঠিক্ এই সময়ে একটা লাল গাঁজ্‌লা ঠোঁটের উপর উঠিল ; ক্ষতস্থানের মুখ আবার খুলিয়া গেল। আন্দ্রে বালিসের উপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া মিলিতোনা বলিল :—

"তুমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, তাহলে আমি মনে করব, তুমি অতি নীচ, নির্লজ্জ ও ভীরু ; আমি তাহলে বিশ্বাস করব,—যখন সার্কাসে ষাঁড়টা দোমাঙ্গের বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল, তুমি তাকে অনায়াসে বাঁচাতে পারতে, কিন্তু নীচ ঈর্ষার বশে তুমি তা কর নি।"

—"মিলিতোনা! মিলিতোনা! তোমাকে আমি যতটা ভাল বেসেছি কোনো পুরুষ কোনো রমণীকে কখনো তেমন ভাল বাসে নি,—তবু আমার প্রতি বিরাগ দেখাবার অধিকার তোমার আছে ; কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তোমার নাই। দোমাঙ্গকে কিছুতেই বাঁচানো যেতে পারত না।"

—"তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে গুপ্ত-ঘাতক মনে করব না, তাহলে এখনি এখান থেকে প্রস্থান কর।"

জুয়াঙ্কো বিষণ্ণস্বরে উত্তর করিল ;—

"আচ্ছা,—যতদিন না ও সেরে ওঠে, আমি অপেক্ষা করব ; ভাল করে' শুশ্রূষা কর।...আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি বেঁচে থাক্‌তে, তুমি আর কারও হতে পাবে না।"

যখন এই বাদানুবাদ চলিতেছিল, বৃদ্ধা দরজার কপাট খুলিয়া, পাড়ার লোকদের সাহায্য চাহিয়া সঙ্কেতধ্বনি করিয়াছিল তখনি পাঁচ ছয় জন লোক আসিয়া জুয়াঙ্কোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, জুয়াঙ্কো ঘর হইতে

বাহির হইল। লোকগুলা তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। জুয়াস্কো এক-এক ঝাঁকুনি দিয়া তাহাদিগকে দেয়ালের উপর ছিটকাইয়া ফেলিতে লাগিল।

তাহার পর জুয়াস্কো রাস্তার সানের উপর দিয়া ধীর-পদক্ষেপে ও শান্তভাবে চলিতে লাগিল।

এই সমস্ত ব্যাপারে আন্দ্রের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল। আন্দ্রে উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন পর্য্যন্ত প্রলাপ বকিতে লাগিল।

মিলিতোনা প্রেমপূর্ণ উদ্বেগ-ভরে খুব সন্তর্পণে ও সযত্নে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে,—পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর আর্গমস্থল্লা ও কোভাচুল্লা জানিতে পারিয়াছে যে রাস্তায় সেই আহত ব্যক্তি আন্দ্রে ছাড়া আর কেহ নহে। ঐ অঞ্চলের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটও ডন্ জেরোনিমোকে লিখিলেন,—যে যুবকের সংবাদ জানিবার জন্য আপনি খুব উৎসুক ছিলেন, তাহাকে, একজন 'ম্যানোলা'র (শ্রমজীবী শ্রেণী রমণী) গৃহের দরজার সম্মুখে অৰ্দ্ধমৃত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সেই ম্যানোলা রমণীর গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু জানি না, তখন তাহার শরীর শ্রমজীবীর পরিচ্ছদে কেন আবৃত ছিল।

এই সংবাদ পাইয়া ফেলিসিয়ানার মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল,—কোন বাগ্‌দত্তা তরুণী, পিতাকে কিংবা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া, গুরুতর আঘাতে আহত তাহার ভাবী পতিকে দেখিতে যাইতে পারে কিনা। একজন সুশিক্ষিতা নব যুবতী কোন পুরুষ মানুষকে তাহার পালঙ্কে বিবাহের পূর্ব্বে দেখিলে একটা ভয়ানক কেলেঙ্কারি হইবে না কি? যদিও রোগ-যন্ত্রণার পবিত্রতা রোগশয্যাকেও নিষ্কলঙ্ক করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি কোনও অকলঙ্ক সতী কুমারীর পক্ষে ইহা কি বর্জ্জনীয় নহে? কিন্তু আন্দ্রে যদি মনে করে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি—আর সেই দুঃখেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হইবে। ফেলিসিয়ানা বলিল:—"বাবা, বেচারী আন্দ্রেকে আমাদের একবার দেখতে যাওয়া উচিত।"

তাহার সদাশয় পিতা উত্তর করিলেন:—

"আমি এতে খুব রাজি। আমিও তোকে এই প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলাম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মারিয়ানা

ব্যক্তিগণ

ক্লোদিও (Claudio)—হাকিম
কেলিও (Cœlio)
অক্তাভ (Octave)
তিবিয়া (Tibia)—ক্লোদিওর অনুচর
পিপ্পো (Pippo)—কেলিওর অনুচর
মালভোলিও (Malvolio)—হেরমিয়ার গোমস্তা
সরাইখানার ছোকরা
মারিয়ানা (Marianne)—ক্লোদিওর পত্নী
হেরমিয়া (Hermia)—কেলিওর মাতা
চিয়ূতা (Ciuta)—জনৈক বৃদ্ধা
ভৃত্যবৃন্দ

ঘটনা নেপলস (Naples) সহরে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্লোদিওর বাটীর সম্মুখে একটি রাস্তা।

(মারিয়ানা উপাসনা-পুস্তক হাতে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইতেছিল ; চিয়ূতা তাহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল।)

চিয়ূতা। ভদ্রে, আপনাকে একটা কথা বল্‌তে পারি কি ?

মারিয়ানা। কি চান আপনি ?

চিয়ূতা। এই সহরের একটি ছেলে আপনার প্রেমে পাগল ; পুরো একটি মাস ধরে সে আপনাকে কথাটা জানাতে বৃথায় সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছে ; নাম তার কেলিও ; বনেদী ঘরের ছেলে সে, নিজেও দেখ্‌তে সুপুরুষ।

মারিয়ানা। হয়েছে, হয়েছে। আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে গিয়ে বলবেন, সময় ও শ্রম তাঁর অযথা নষ্ট হচ্ছে, এ ধরণের কথা আমায় শোনাতে যদি তিনি আবার সাহস করেন তবে আমার স্বামীকে তা জানাবো।

(প্রস্থান)

কেলিও। (প্রবেশ করিয়া) কি হ'ল, চিয়ূতা ? কি বল্‌লে ?

চিয়ূতা। তেমনি সাধ্বী, তেমনি গরবিনী সে। বল্‌লে, যদি বেশী বিরক্ত করা হয় তবে তার স্বামীকে জানিয়ে দেবে।

কেলিও। হায়! কি হতভাগ্য আমি! আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়। ওঃ! এমন নিষ্ঠুর রমণীও আছে! আর কোন্ উপায় আমার থাক্‌তে পারে ? তুমি আমায় কি কর্‌তে বল, চিয়ূতা ?

চিয়ূতা। আমি তোমায় সবার আগে বলি, এখান থেকে স'রে যেতে। ঐ যে তার পেছনে আসছে তার স্বামী।

(উভয়ের প্রস্থান। ক্লোদিও এবং তিবিয়া'র প্রবেশ)

ক্লোদিও। তুমি কি আমার অনুগত সেবক, আমার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ? শোন তবে, আমায় একটা ভীষণ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

তিবিয়া। আপনার অপমান ?

ক্লোদিও। হ্যাঁ, আমারই। নইলে, এই বেহায়া সেতারগুলো আমার স্ত্রীর জানলার তলে গুণ-গুণ করা কিছুতেই ছাড়্‌বে না।

আচ্ছা, সবুর! এখানেই সব শেষ হচ্ছে না।—এদিকে ফেরো একটু; লোকজন রয়েছে, আমাদের কথা শুন্‌তে পাবে। তোমাকে যে গুণ্ডার কথা বলেছি আজ সন্ধ্যার সময় তাকে নিয়ে আস্‌তে হবে।

তিবিয়া। কিসের জন্যে?

ক্লোদিও। আমার বিশ্বাস, মারিয়ানা'র গুপ্তপ্রণয়ী আছে।

তিবিয়া। আপনার বিশ্বাস?

ক্লোদিও। হাঁ। বাড়ীটার চারদিকে গুপ্ত প্রণয়ীর কেমন একটা গন্ধ বেরিয়েছে। আমার ফটকের সামনে দিয়ে কেউ সহজভাবে চলে যায় না। সেতারের ঝন্‌ঝনানিতে কুট্‌নীর আনাগোনায় সব সরগরম হয়ে উঠেছে।

তিবিয়া। কেউ যদি আপনার স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে প্রেমের ছড়া গায়, তা কি আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেন?

ক্লোদিও। না, তা পারি নে; কিন্তু খিড়কী দোরের পেছনে আমি লোক বসিয়ে রাখ্‌তে পারি, আর তাকে দিয়ে যিনিই প্রথম ঢুকবেন তাঁর গর্দ্দানটি নেওয়াতে পারি।

তিবিয়া। ছিঃ। আপনার স্ত্রীর প্রণয়ী কেউ নেই। তা হ'লে আমারও প্রণয়িনী আছে, আপনি বল্‌তে পারেন!

ক্লোদিও। কেন তোমার তা থাক্‌তে পারে না, তিবিয়া? তুমি দেখ্‌তে খুব কুচ্ছিৎ বট, কিন্তু বুদ্ধি রাখ ঢের।

তিবিয়া। তা বটে, তা বটে!

ক্লোদিও। দেখ, তিবিয়া, তুমি নিজেই স্বীকার করছ। না, সন্দেহ কর্‌বার আর যো নেই, আমার অপমান জানাজানি হয়ে গেছে।

তিবিয়া। জানাজানি হ'ল কেমন করে?

ক্লোদিও। বল্‌ছি জানাজানি হয়েছে।

তিবিয়া। কিন্তু সারা সহরটাতে আপনার স্ত্রী ত সতী-সাধ্বী বলে খ্যাত। তিনি কা'রো সঙ্গে দেখা করেন না, এক উপাসনার সময় ছাড়া আর কখনও বাসা থেকে বের'ই হন না।

ক্লোদিও। যা বলি আমি, তাই শোনো।—তিবিয়া, একটা ভয়ঙ্কর মৎলব বসে বসে ফাঁদছি আমি। কি যন্ত্রণা,—আর বুঝি বাঁচিনে।

তিবিয়া। ও কি কথা!

ক্লোদিও। তোমাকে যা বলি তা অনুগ্রহ করে বিশ্বাস করে নিও।

(উভয়ের প্রস্থান)

কেলিও। (পুনঃপ্রবেশ করিয়া) ধিক্ তার জীবনে, ভরা যৌবনের মাঝে যে হতাশ-প্রণয় নিয়ে মজেছে! ধিক্ তার জীবনে, যে একটা মধুর কল্পনার আবেশে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে, অথচ জানে না—এ অলীক স্বপ্ন কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে, জানে না প্রতিদানে তার কিছু মিল্‌বে কি না। তরণীর উপর আরামে সে শুয়ে, আস্তে আস্তে তীর হ'তে সরে গিয়েছে, সুদূরে দেখ্‌ছে মায়ার কানন, সবুজ প্রান্তর, তার স্বর্গের ক্ষীণ মরীচিকা। বাতাস তাকে নিঃশব্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, কিন্তু সত্যের স্পর্শে জেগে উঠে দেখ্‌বে, যে-তীর ছেড়ে এসেছে তা থেকে সে যতদূরে, লক্ষ্য-স্থান থেকেও ঠিক ততদূরে সে পড়ে আছে—আর সাম্‌নেও চলবার উপায় নেই, পিছনেও ফেরবার উপায় নেই।

(বাজনার শব্দ শোনা গেল)

ও কিসের সঙ্? অক্তাভকে দেখ্‌ছি না?

(অক্তাভের প্রবেশ)

অক্তাভ। বন্ধুবর মহাশয়, আপনার বিরহ-শ্রী আছেন কেমন?

কেলিও। অক্তাভ! কি পাগল তুই! গালের ওপর তোর যে একহাত পুরু লাল রং! তোর এ সাজ কেন? ভরা দিনের মধ্যে তোর লজ্জা করে না?

অক্তাভ। কেলিও! কি পাগল তুই! গালের ওপর তোর যে একহাত পুরু সাদা রং! তোর এ কালো পোষাক কেন? ভরা-উৎসবের মধ্যে তোর লজ্জা করে না?

কেলিও। কেমনধারা জীবন তোর! হয় তুই মাতাল, না হয় আমিই বা মাতাল।

অক্তাভ। হয় তুই প্রেমে পড়েছিস্, না হয় আমিই বা পড়েছি।

কেলিও। চিরদিন যেমন, তেমনি সুন্দরী মারিয়ানার প্রেমে।

অক্তাভ। চিরদিন যেমন, তেমনি শীপ্রা-দেশের মদের প্রেমে।

কেলিও। তোর বাসায় যাচ্ছিলুম, এই পথে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল।

অক্তাভ। আমি যাচ্ছিলুম আমার বাসায়। আমার বাসাটা আছে কেমন? এই আট দিন তাকে দেখি নি।

কেলিও। তোকে আমার একটু উপকার করতে হবে।

অক্তাভ। কি বল, কেলিও বাছাধন, আমার। টাকা চাও? তা আর আমার নেই। বুদ্ধি চাও? আমি মাতাল। আমার তরোয়ালখানা চাও? এই ধর, একখানা ভোঁতা লাঠি। বল, বল, আমায় নিয়ে যা খুসী কর।

কেলিও। কতদিন এ ভাবে যাবে? আট-দিন বাসায় নেই! তুই মারা পড়্‌বি, অক্তাভ।

অক্তাভ। কখ্‌খনো নিজের হাতে নয়; না, ভাই, কখ্‌খনো নয়। আমি মরতে রাজি, কিন্তু আমার নিজের গায়ে নিজে আমি হাত তুল্‌বো না।

কেলিও। তোর যে জীবন, তা কি এক-রকম আত্মহত্যাই নয়?

অক্তাভ। মনে কর, দড়ির ওপর নাচ-ওয়ালা একজন, পায়ে নাল-বাঁধা বুটজুতো হাতে লম্বা বাঁশ, পৃথিবী আর আকাশের মাঝখানে দোল খাচ্ছে; তার ডাইনে বাঁয়ে রয়েছে যত জরা-জীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার ছোট্ট ছোট্ট চেহারা, যত শুক্‌নো পিংশে শ্বেতমূর্ত্তি, চতুর দেনদারের দল, আত্মীয়-স্বজনের, বারবনিতার দল; বিকট রাক্ষসদের একটা পুরো পল্টন তার কাপড় ধরে ঝুলে পড়ছে, তাকে ফেলে দিতে চারদিক থেকে টানাটানি করছে; ঘোর লম্বা লম্বা কথার বহর, বড় বড় শব্দের স্তূপ তাকে ঘিরে যেন কদমে ছুট্‌ছে; ভবিষ্যৎবাণী সব মেঘের মত কালো পক্ষ বিস্তার করে তাকে অন্ধ করে ফেলেছে। তবুও লঘুপদে সে পূব হতে পশ্চিমে তার পথে চলেইছে। নীচের দিকে যদি তাকায়, তবে পা ফস্‌কে যায়। বাতাসের আগে সে চলেছে; চারিদিক থেকে যত হাতই প্রসারিত হোক না কেন, সে যে আনন্দের পাত্র নিজে হাতে ধরে রয়েছে, তা কেউ উল্‌টে ফেলতে পারবে না। ভাই, এই হচ্ছে আমার জীবন, আমার নিজের হুবহু চিত্র।

কেলিও। তুই পাগল, কি সুখী তুই!

অক্তাভ। তুই সুখী নোস্, কি পাগল তুই! আচ্ছা বল্‌ত দেখি, তোর কিসের অভাব?

কেলিও। আমার অভাব শান্তির, সেই মধুর নির্ভাবনার—যার প্রসাদে জীবনটা হয়ে দাঁড়ায় একখানা আরশীর মত, তাতে সব জিনিষেরই ছবি এক নিমেষে ফুটে ওঠে, আবার সবই পিছলে পড়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে এক একটা কর্ত্তব্য মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা। ভালবাসাকে তোমরা আর সকলে একটু ক্ষণিক আমোদ বলে মনে কর, আমার কিন্তু তাতে সমস্ত জীবনটা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ভাই রে, তুই কখনো জান্‌বি নে, আমার মত করে ভালবাসার অর্থ কি? আমার কাজ-কর্ম্ম সব আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি; একটা মাস ধরে দিনে রাত্তিরে এই বাসাটির চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আহা! চাঁদ যখন উঠ্‌তে থাকে, তখন ঐ বাগানটির ঐ কোণে, ঐ ছোট ছোট গাছগুলির তলায় আমি আমার ক্ষুদ্র গানের দলটি জড় করি, নিজে তাল দিতে দিতে শুন্‌তে থাকি তাদের মুখে মারিয়ানার রূপ-কীর্ত্তন; কি আবেশেই না তখন আমি মুগ্ধ হয়ে যাই! কিন্তু সে ত কোন দিন জানালায় এসে দেখা দিলে না, কোনদিনও ত ঘুলঘুলির উপর তার সুন্দর কপালটি ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল না!

অক্তাভ। কে মারিয়ানা? আমার আত্মীয়াটি কি?

কেলিও। সে-ই। বৃদ্ধ ক্লোদিওর স্ত্রী।

অক্তাভ। আমি তাকে কখনো দেখি নি, তবুও সে আমার আত্মীয়াই বটে। তোর কাজের ভার সব আমার উপর দিয়ে দে ত, কেলিও।

কেলিও। কত রকমে তাকে আমার ভালবাসা জানাতে চেষ্টা করেছি, সব বিফল। কন্‌ভেণ্ট থেকে শিক্ষা পেয়ে সে বেরিয়েছে; পতির উপর অগাধ ভক্তি, কর্ত্তব্যের উপর বড় নিষ্ঠা। তার বাসায় সহরের কোন যুবক যেতে পায় না, তার কাছেও কারো ঘেঁসবার জো নেই।

অক্তাভ। বটে! দেখ্‌তে কেমন—সুন্দরী? কি বোকা আমি! তুই যখন তাকে ভালই বাসিস্, ওতে কি আর এসে যায়? আচ্ছা, আমার দ্বারা কি হতে পারে?

কেলিও। প্রাণ খুলে বল্‌ব? হাসবি না?

অক্তাভ। আমি না হয় হাস্‌ব, তুই প্রাণ খুলে বল্।

কেলিও। তুই তার আত্মীয়, সে বাড়ীতে নিশ্চয়ই ঢুক্‌তে পার্‌বি।

অক্তাভ। পার্‌ব কি? তা জানিনে। ধরে নে, ঢুক্‌তে পারি। কিন্তু সত্য কথা কি, আমাদের স্বনাম-ধন্য পরিবারটি পাটের গাঁট নয় অর্থাৎ আমাদের পরস্পরের গা-মাখামাখি একটু কম, ছোঁয়াছানি যা চলে, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে। তবু যা হোক্, মারিয়ানা আমার নাম জানে। চোর হয়ে তাকে কিছু বল্‌তে হবে কি?

কেলিও। বিশবার তার মুখোমুখি হ'তে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাছে গিয়ে বিশ বারই আমার পা টলে গেছে। বাধ্য হয়ে শেষে চিয়ুতা বুড়ীটাকে পাঠিয়েছি। তাকে দেখ্‌লে, আমার গলা চেপে আসে, নিশ্বাস

বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ঠোঁট অবধি ঠেলে এলো।

অক্তাভ। আমিও এ-রকমটি অনুভব করেছি। এম্‌নি করেই, যখন গভীর অরণ্যের ভিতরে শুষ্ক লতাপাতার উপর দিয়ে শিকারী কুকুরটি অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকে আর শিকারী শুন্‌তে পায় তার পাঁজরা ঘেঁষে তৃণগুল্ম সব একখানা পাতলা ওড়নার মত সর্‌ সর্‌ করে সরে যাচ্ছে, তখন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তার বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করে ওঠে, নিঃশব্দে, একটি পা না বাড়িয়ে দিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে, সে তার অস্ত্রটি তুলে ধরে।

কেলিও। আমার এ অবস্থা কেন? লম্পটদের মধ্যে একটা পুরোণো কথা চলিত আছে না যে, সব মেয়ে-মানুষই এক ধরণের? তবে সব ভালবাসা এক ধরণের নয় কেন? বাস্তবিক অক্তাভ, তুই যেমন ভাবে এ মেয়েটিকে ভালবাস্‌বি, কিম্বা আমিই আর একটিকে যেমনভাবে ভালবাস্‌ব, তেমনিভাবে একে কিন্তু আমি ভালবাস্‌তে পার্‌ব না। তবুও ভেবে দেখ্‌লে মোটের উপর ও জিনিষটা দাঁড়ায় কি? দুটি নীল চক্ষু, দুখানি সিঁদুরে ঠোঁট, একখানি সাদা সাটি, দুখানি ফুটফুটে হাত। আচ্ছা, তোকে যে জিনিষ উৎফুল্ল ও উত্তেজিত করে তুল্‌বে, চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয় তেমনি করে টেনে নেবে, আমাকে সে জিনিষ বিষণ্ণ অবসন্ন করে ফেলে কেন? কে বল্‌তে পারে—এতে আছে সুখ, আর ওতে আছে দুঃখ? সত্য যাকে বল, তা ছায়া মাত্র; কল্পনাই নাম দাও আর পাগলামীই নাম দাও—তা'ই ও-জিনিষটিকে একটা দিব্যমূর্ত্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে। পাগলামীই সৌন্দর্য্যের সার। প্রত্যেক মানুষ চলেছে একখানা স্বচ্ছ জাল দিয়ে মাথা হতে পা অবধি আপনাকে ঢেকে, সে মনে কর্‌ছে কত বন, কত নদী, কত সুন্দর মুখ! তার দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃতিই ঐ মায়াবী জালের আলো-ছায়া-সম্পাতে কত বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ছে। অক্তাভ! অক্তাভ! আমাকে তুই রক্ষা কর্‌।

অক্তাভ। তোর ভালবাসাকে আমি ভালবাসি, কেলিও! মদের মত তোর মাথার ভিতরে তা ফেণিয়ে ফেণিয়ে উঠ্‌ছে। আয়, দেখি, তোকে আমি উদ্ধার কর্‌ব। সবুর কর একটু, মুখে আমার হাওয়া লাগ্‌ছে, বুদ্ধিও ফিরে আস্‌ছে। হ্যাঁ, মারিয়ানাকে আমি চিনি; সে আমায় না দেখেই ভয়ানক ঘৃণা করে। ছোট্ট পুতুলটি, ভগবানের নাম অনর্গল বিড়্‌ বিড়্‌ কর্‌তেই লেগে আছে।

কেলিও। যা খুসী তোর তাই কর, আমায় শুধু ঠকাস্‌ নে, এই এক ভিক্ষা তোর কাছে। আমায় ঠকানো খুবই সহজ; নিজে আমি যে কাজ কর্‌তে চাই না, পরে যে আবার সে কাজ কর্‌তে পারে এমন বিশ্বাস ত আমার হয় না।

অক্তাভ। আচ্ছা, তুই যদি দেয়াল টপ্‌কে পার হ'স?

কেলিও। আমার আর তার মাঝখানে আছে যে একটা মনের দেয়াল, সেটাকে আমি টপ্‌কে পার হতে পারি নে।

অক্তাভ। তুই যদি তাকে চিঠি লিখিস্‌?

কেলিও। আমার চিঠি সে হয় ছিঁড়ে ফেলে, নয় ফিরিয়ে দেয়।

অক্তাভ। তুই যদি আর একজনকে

ভালবাসিস্? আয়, আমার সঙ্গে রোজালিন্দের ঘরে চল্।

কেলিও। আমার জীবনের দীপ যে মারিয়ানার কাছে; মুখের একটি কথায় সে তাকে নিবিয়ে ফেল্‌তে পারে, জ্বালিয়েও তুল্‌তে পারে। আমার পক্ষে, আর একজনের জন্যে বেঁচে থাকা, তার জন্যে মরার চেয়েও বেশী কঠিন। হয় তাকে আমি পাব, না হয় প্রাণ দেব। চুপ্! ঐ যে সে রাস্তার মোড় ঘুরে আস্‌ছে।

অক্তাভ। তুই স'রে যা, আমি তাকে ধর্‌ছি।

কেলিও। সত্যি সত্যি? ঐ রকম পোষাক নিয়ে? মুখটা মুছে ফেল্, তোকে যে পাগলের মত দেখাচ্ছে।

অক্তাভ। এই নে, হ'লো ত? নেশা আর আমি, এমন বন্ধু আমরা দুজনে, ভাই কেলিও, যে আমাদের কখন ঝগড়া-ঝাঁটি হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে চলে আমার কথায়, আমি চলি তার কথায়। ও বিষয়ে কিছু ভয় করিস্ নে। ইস্কুলের ছেলেরাই ছুটির মধ্যে একটা দিনে ভোজ পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে বসে, নেশার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। কিন্তু আমার স্বভাবই যে মাতাল হয়ে থাকা; আমার পক্ষে, ভেবে-চিন্তে কিছু করা, অর্থ না ভেবে-চিন্তে চলে যাওয়া; আমি এইভাবে এখনি রাজার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে আস্‌তে পারি, দেখ্ না, এই যেমন চল্লেম তোর প্রেয়সীর কাছে।

কেলিও। যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে—না, তুই যাস্‌নে।

অক্তাভ। কেন?

কেলিও। কেন, তা বল্‌তে পারিনে; আমার মনে হচ্ছে, তুই আমায় ঠকাবি।

অক্তাভ। এই তোকে ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমার শক্তিতে যদি কিছু হয়, তবে মারিয়ানা হবে তোরই, নয় ত কারো হবে না।

(কেলিওর প্রস্থান।—মারিয়ানার প্রবেশ, অক্তাভ তাহার সম্মুখে গিয়া)

অক্তাভ। দেবি! আপনি মুখ ফিরিয়ে যাবেন না, রাণী! এই অধম দীনের উপর আপনার কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

মারিয়ানা। আপনি কে?

অক্তাভ। আমার নাম অক্তাভ, আপনার স্বামীর আত্মীয়।

মারিয়ানা। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন? আসুন, ঘরে চলুন, তিনি ফিরে এলেন ব'লে।

অক্তাভ। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে আসিনি, ঘরেও আমি চল্‌বো না। ভয় হচ্ছে, যে জন্যে এসেছি, তা বল্‌লে হয়ত এই মুহূর্ত্তেই আবার আমায় বের করে দিবেন।

মারিয়ানা। তবে সে কথা না-ই বল্‌লেন, আমাকেও আর দাঁড় করিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।

অক্তাভ। কিন্তু না-বলেও আমার পার্‌বার জো নেই, সুতরাং আপনিও দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনে যান, এই আমার ভিক্ষা। নিষ্ঠুর মারিয়ানা! তোমার চোখের চাহনি যে বিষম ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, তোমার মুখের কথা কি তার কিছুই উপশম কর্‌তে পারে না? কেলিও তোমার কি করেছে?

মারিয়ানা। আপনি কার কথা বল্‌ছেন? আমি কি ব্যাধি সৃষ্টি করেছি?

অক্তাভ। সে ব্যাধি বড় দারুণ, কারণ তার প্রতীকার নাই। বড় ভীষণ, কারণ এ ব্যাধি নিজের খেয়ে নিজে পুষ্ট, হিতাকাঙ্ক্ষীর হাত থেকে সঞ্জীবনী পানীয় পর্য্যন্ত ঠেলে ফেলে দেয়। এ ব্যাধি অমৃতের চেয়েও মধুর একটা হলাহলে ওষ্ঠাধর নীলবর্ণ করে ফেলে, মুক্তার মত কঠিন হৃদয়কেও এক অশ্রুবর্ষণে গলিয়ে দেয়। এ এমন ব্যাধি, পৃথিবীর যাবতীয় ওষধ, মানুষের সমস্ত শাস্ত্র তাকে আরাম করতে জানে না। তাকে আহার দিয়ে পুষ্ট করছে, ঐ বাতাসের এক দম্‌কা, একটা শুষ্ক গোলাপের সৌরভ, একটা গানের অন্তরা। মৌমাছি যেমন বাগানের প্রতি কেওড়া থেকে তার মধু আহরণ করে, এ ব্যক্তিও তেমনি তার যাচনার চিরন্তন আহার চুষে নেয় চারিদিকে যা কিছু আছে সেই প্রত্যেক জিনিষটি হতেই।

মারিয়ানা। এ ব্যাধির নামটা আমায় বল্‌বেন কি?

অক্তাভ। সে নাম উচ্চারণ কর্‌বার যোগ্য যে, সেই যেন তা বলে। তোমার নিশীথের স্বপ্ন, ঐ সবুজ লেবুগাছ, এই শীতল জল-প্রপাত তোমাকে সে নাম শিখিয়ে দিক্। এক মধুর সন্ধ্যায় তুমি যেন তাকে খুঁজতে বেরুতে পার, তা হ'লে তোমার নিজের অধরের উপরেই তাকে পাবে। তার থেকে তার নাম আলাদা নয়।

মারিয়ানা। মুখে বল্‌তে তা কি এম্‌নি বিপদজনক, তার ছোঁয়াচ এমনই ভয়ঙ্কর যে, যে জিহ্বা তার গুণকীর্ত্তন কর্‌ছে সে-ই তার ভয়ে সন্ত্রস্ত?

অক্তাভ। কানে শুন্‌তে তা কি এমনি মধুর, বোন, যে তুমি জান্‌তে চাচ্ছ? তুমি ত কেলিওকে তা শিখিয়েছ!

মারিয়ানা। সে তবে অজানিতে—আমি একেও চিনিনে, ওকেও চিনিনে।

অক্তাভ। তাদের দুটিকেই যেন এক সঙ্গে চিন্‌তে পার, কখনো যেন তাদের তুমি আলাদা করে না দাও, এই আমার অন্তরের কামনা।

মারিয়ানা। সত্যি-সত্যি?

অক্তাভ। কেলিও আমার প্রাণের সখা—যদি তোমার ঈর্ষা উদ্রেক করা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, তবে বল্‌তাম, সে প্রভাতের মত সুন্দর তরুণ গরিমাময়,—আমার এ কথা তবুও মিথ্যা হ'ত না। কিন্তু আমি যে চাই তোমার করুণা উদ্রেক করতে, তাই তোমাকে বল্‌ব, যে দিন থেকে তোমায় দেখেছে, সে দিন থেকে সে মরণের মত শ্রীহীন।

মারিয়ানা। একি আমার দোষ যে, সে শ্রীহীন?

অক্তাভ। একি তার দোষ যে তুমি শ্রীময়ী? সে যে তোমা বই আর কিছু জানে না। সব সময় তোমার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। তুমি তোমার জানলার নীচে কাউকে কখন গান করতে শোন নি? মাঝ-রাত্রিতে কখনো ঐ ঘুলঘুলি, ঐ পর্দ্দা তুলে দেখ নি?

মারিয়ানা। ও জায়গাটা সকলেরই, রাত্রিতে ওখানে সবাই গান করতে পারে।

অক্তাভ। সবাই তবে তোমাকে ভাল বাস্‌তে পারে? কিন্তু তা ত বল্‌বার যো

নেই তোমায় তোমার বয়স কত, মারিয়ানা ?

মারিয়ানা। বেশ প্রশ্ন! যদি বলি আমার কেবল এই উনিশ বছর, তবে আপনার মতে আমার কি করা উচিত?

অক্তাভ। তা হলে, এখনও পাঁচ ছ-বছর তুমি ভালবাসা পেতে পার, আট-দশ বছর ভাল্‌বাসতে পার—আর বাকীটা ভগবানের জন্যে রেখে দিতে পার।

মারিয়ানা। বটে! তবে সময়ের আমার সদ্ব্যবহারই হচ্ছে। আমি ভালবাসি ক্লোদিও'কে—আপনার আত্মীয়, আমার স্বামীকে।

অক্তাভ। আমার আত্মীয় আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে গ্রামের মোড়লটি ছাড়া আর বেশী কিছু তৈরী কর্‌তে পারবেন না। ক্লোদিওকে তুমি কখনও ভালবাস না।

মারিয়ানা। কেলি'ওকেও না, এ কথা আপনি তাকে স্পষ্ট বল্‌তে পারেন।

অক্তাভ। কেন তুমি কেলি'ওকে ভালবাস্‌বে না?

মারিয়ানা। কেনই বা ক্লোদিওকে ভালবাস্‌ব না? তিনি আমার স্বামী।

অক্তাভ। কেনই বা কেলি'ওকে ভালবাস্‌বে না? সে তোমার প্রণয়ী।

মারিয়ানা। আরও বল্‌তে পারেন কি, কেনই বা আমি বসে বসে আপনার কথা শুন্‌ছি? তবে আসুন এখন—রসিকতাটা বড় বেশীক্ষণ ধরে চলেছে। [প্রস্থান]

অক্তাভ। তাই ত! তাই ত! চোখদুটি কিন্তু তার বড়ই সুন্দর! [প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

জরু

পুরুষ তোমায় বেজায় খাটায়
কাজ করে নেয় গৃহস্থালীর,
সকাল থেকে সকল বেলা
যেন বলদ কলুর ঘানির!

আপন জিনিষ বলতে তোমার
আছে কেবল হাঁড়ি হাতা,
শোবার তরে ছেঁড়া মাদুর
শীতে একটু ছেঁড়া কাঁথা!

এই মেহনৎ,—পুরস্কার এর
কত রকম গালাগালি,
মাঝে মাঝে লগুড়, আরো
মধুর অভিভাষণ,—শালী!

পাণ থেকে চুণ খস্‌ল যদি
জরু, তোমায় জরুর্ 'তালাক',
আবার একটা কর্‌বে বিয়ে
তাই এ ছুতো—এম্‌নি চালাক্!

তোমার' পরে এ অত্যাচার
যেন তুমি হালের গরু,
কারণ তুমি জেতে নারী—
কারণ তুমি নেহাৎ জরু!

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

* অগ্রহায়ণের ভারতীতে প্রকাশিত 'গরু' শীর্ষক কবিতার অনুকরণে লিখিত—লেঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জমিদার ইন্দ্রনাথের বাড়ীখানা প্রভু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লোকের চোখে বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল। সাদাসিধা ছাঁদের চক্‌মিলানো চির-পরিচিত বাড়ীখানা মাস-কয়েকের মধ্যে বর্ণে ও গঠনে সকল রকমেই যেন আশ্চর্য্য রূপে বদলাইয়া গিয়াছিল। বাড়ীখানায় নূতন করিয়া বালি খসাইয়া রঙ লাগানো হইয়াছিল, জানালায় খড়খড়িতেও রঙের বাহার খুলিয়াছিল। কলিকাতা হইতে মিস্ত্রী-মজুর আসিয়া উপরে-নীচে সমস্ত ঘরগুলিতে ঘরের রঙের সহিত মিল রাখিয়া ফুল-পাতার নক্‌সা আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। বাহিরের দিকে কাজ করা লোহার রেলিঙে ঘেরা বারান্দা তৈয়ার করাইয়া সেখানে বিচিত্র চীনা মাটীর টবে কৃত্রিম উদ্যানের শোভা সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাগানে ফোয়ারা, মর্ম্মর বাঁধানো চত্বর এবং চারিদিকে লাল সুরকির সরু পথ। পথ-গুলির আরম্ভ ভাগে লতা-পাতার একটি করিয়া তোরণ-দ্বার। অধিকাংশ তোরণ দ্বার-গুলিতেই প্রস্ফুটিত ঝুমকালতা, মাধবী, মালতী ও তরুলতার বিচিত্র শোভা। পথগুলির দুইধারে স্থানে স্থানে জাপানী ছবি আঁকা চীনা মাটীর তৈয়ারি আসন উদ্যান-স্বামীর শ্রমাপনোদনের জন্য গ্রথিত। বাগানে বেশীর ভাগই বিলাতী ফুলের গাছ। পপি, জিনিয়া র‍্যাষ্টার প্যান্‌সী ক্যামেলিয়া য্যাজেলিয়া বিচিত্র বর্ণের নানা প্রকারের লিলি প্রভৃতি ফুলের ও পাতা-বাহার ক্রোটন পাম্ ও নানা জাতীয় গাছের বাহার; কোথাও সার দিয়া, কোথাও ক্ষেত্রাকারে, কোনস্থলে বা গোলাকারভাবে সজ্জিত। উদ্যান-প্রাচীরের ধারে ধারে সবুজ গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এতদিনের যে রক্ত জবা পথের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, পুরাতন স্মৃতি রক্ষা করিয়া, কেন, কে জানে, তাহারাই কেবল এখনো বিতাড়িত হয় নাই!

বৈঠকখানা হইতে বেতের কাষ্ঠাসনগুলি দূরীভূত হইয়াছে; সেখানে এখন মখমল-মণ্ডিত পুঁতির কারুঝালর লাগানো স্প্রিংয়ের সৌখীন কৌচ সোফা শোভা পাইতেছে। বিদ্যুত পাখা চালাইবার উপায় না থাকায় সেকালের টানাপাখা এখনও স্থানচ্যুত হয় নাই বটে, তবে তাহার মোটা পরিচ্ছদ খুলিয়া তাহাকে সৌখীন পোষাক পরানো হইয়াছে। মোটা দেশী ছিটের ও সতরঞ্চির পর্দ্দাগুলির জায়গায় এখন বাহিরের কক্ষগুলিতে সূক্ষ্ম কারু শিল্পের লেশ নেট ও সিল্কের পর্দ্দা সব রঙীন ফিতা বাঁধিয়া অর্দ্ধাবরিত ভাবে অবস্থিত। বসিবার ঘরে যে সকল নারী-চিত্র বিলম্বিত হইয়াছিল, তাহা সৌন্দর্য্য ও আর্টের দৃষ্টান্ত হইতে পারে, তবে সেগুলিকে সুরুচির পরিচায়ক বলা যায়না। বাঁয়া তব্‌লা এসরাজ হারমোনিয়ম, পিয়ানো প্রভৃতিতে গৃহস্বামীর সঙ্গীতানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। সঙ্গীত-বিদ্যায় আলোকনাথের খ্যাতি ছিল; সম্প্রতি বাদ্যশিক্ষাতেও সে মন দিয়াছে। সজ্জতজ্ঞ ব্যক্তিরা জমিদার বাবুর প্রিয়পাত্র হইবার আশায় প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় মজলিস্ করিতে আসিতেন।

আলোকনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। দেহখানি লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশী। মুখ গোল ভাবের, চোখদুটি বড় বড়। বুদ্ধির দীপ্তি নাই থাক্, চোখে উজ্জ্বলতা আছে। মাথার পশ্চাদ্‌ভাগের চুলগুলি ঘন, সম্মুখ ভাগের চুল পাতলা। সেই পাতলা চুলে বহু নৈপুণ্যে টেড়ী কাটিয়া আলোকনাথ ক্রটি ঢাকিবার চেষ্টা করিত।

বাগান-বাড়ীতে প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে 'গহর বিবির' আগমন হয়। আলো, আনন্দ ও মধুর নারীকণ্ঠের সুর-তরঙ্গে সে রাত্রে পল্লীবাসীরা চমৎকৃত হইয়া উঠে, পথিকেরাও মুগ্ধ পুলকিত চিত্তে সেখানটায় কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া যায়। আলোকনাথের স্বপক্ষদল বলে, "ভগবান্ ইহাকে শুধু ধন দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহা ভোগের শক্তিও যথেষ্ট দিয়াছেন। 'যখের' ধন্ রহিল কি না রহিল, সে একই কথা।" আবার বিপক্ষ দল বলে, "এত দিনের জমীদার-বংশ—এইবার বিলাসের স্রোতে ভাসিয়াই বা যায়!" সংসারে ভাল-মন্দ দুই শ্রেণীরই লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ পরের সৌভাগ্যে সুখী, কেহ বা ঈর্ষান্বিত।

বৈঠকখানায় ও বাগান বাড়ীতে যাহাই ঘটুক, অন্দরে কিন্তু এ সব সৌখীন ব্যাপারের কোন পরিচয়ই যাওয়া যাইত না। আলোকনাথের মা বাঁচিয়া আছেন; নিজের শুচিতা ও গৃহকার্য্যের তদারকেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। স্ত্রী রুগ্না ও বন্ধ্যা, তাই সুখ ষোল কলায় পূর্ণ হইলেও সংসারে প্রকৃত মনের সুখ কাহারও ছিল না। আলোকনাথের জ্যেষ্ঠ মৃত। তাঁহার বিধবা স্ত্রী পিত্রালয়ে। জ্যেষ্ঠের একমাত্র পুত্রটি কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। আলোকনাথ ও তাঁহার জননীর ইচ্ছা ছিল না যে একমাত্র বংশধরকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে দেন। কিন্তু জেদী ছেলে কাহারও নিষেধ কানে তুলিল না। শাসন, আদর, অনুনয়—কিছুতেই সে দৃক্‌পাত করিল না। অগত্যা অনিচ্ছাতেই আলোকনাথকে তাহার মতানুবর্ত্তী হইতে হইল। তাই কি জমিদার বংশের-বংশধররূপে উপযুক্ত দাস-দাসী লইয়া সে বাসা করিয়া রহিল? 'খামখেয়ালি' ছেলে সাধারণের সহিত একটা সাধারণ মেসে সামান্যভাবেই দিন যাপন করিতেছে! বংশের কলঙ্ক,—যেমন ক্ষেত্রে জন্ম, তেমনি ত মতি-গতি হইবে! স্বাধীন-চিত্তা মায়ের ছেলে গুরুজনের বশ্যতা মানিবে কেন?

আলোকনাথ এজন্য পারিষদ-মহলে সর্ব্বদাই দুঃখ করিত। প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল খুল্লতাতের স্নেহশীলতার প্রভৃত প্রশংসা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নিন্দা করিত। তত্ত্বদর্শীরা বলিত, "ভোগ মানুষের কর্ম্ম-ফল। ভগবান্ হাতে তুলিয়া দিলেই কি মানুষ ভোগ করিতে পারে? যার যেমন পাওনা!" এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সহিত একটা নূতন তথ্যের আলোচনাও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। কোন কোন শুভানুধ্যায়ী আলোকনাথকে পুনরায় দার-পরিগ্রহে অনুরোধ করিতেছিলেন। রুগ্না ও বন্ধ্যা স্ত্রী শাস্ত্রানুসারে বর্জ্জনীয়া! সুতরাং ধর্ম্মতঃ এজন্য তাহাকে অপরাধীও হইতে হইবে না। সেই একটা 'অর্দ্ধ-উদাসীন' 'কেতাব-কীট' বালকের

মুখ চাহিয়া কেনই বা তিনি বসিয়া থাকিবেন? জমিদারী-রক্ষার উপযোগী বিষয়-বুদ্ধি কি আর তাহার ঘটে কখনো আসিবে? ভবিষ্যৎ-দর্শীরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেন, তাহা কখনই সম্ভব নয়। কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ক্রমে আলোকনাথের কাণেও বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল; এবং শুনিতেও মন্দ লাগিতে-ছিল না। আলোকনাথ যে স্ত্রীকে কখনো ভাল বাসিত না, এমন নয়। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে যেমন সকল স্বামী নিজ-নিজ স্ত্রীকে ভাল বাসিয়া থাকে, সেও এক সময় স্ত্রীকে তেমনি বাসিত। হেমলতা মেয়েটিও অত্যন্ত সাধারণ। তাহার রূপের আলোয় ঘর আলো হইত না; গুণেরও কোন বাড়াবাড়ি পরিচয় ছিল না। স্বামীকে সে হিন্দুনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, ভাল বাসিত। কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশের জন্য কোন সাড়ম্বর উচ্ছ্বাস বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান দেখা যাইত না। লেখাপড়া যৎসামান্য যাহা সে শিখিয়াছিল, তাহাতে বাংলা মাসিক পত্র হইতে রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পড়া চলে। চিঠি লিখিবার তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। থাকিলে বোধ করি বাঙ্গালী ঘরের অন্যান্য মেয়েদের মতই সে কার্য্যও সে অনায়াসে চালাইয়া লইতে পারিত। রান্না-বান্না, সাংসারিক কাজ সে সবই শিখিয়াছিল, কিন্তু বছর দুই আগে নিউমোনিয়া হইয়া দীর্ঘ কাল রোগ-ভোগান্তে যখন সে পুনরায় চলা-ফেরা সুরু করিল, তখন দেখা গেল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইবার নহে। বুকে একটা যন্ত্রণা সর্ব্বদাই রহিয়া গেল। আরও আনুসঙ্গিক অনেক রোগই ভগ্ন দেহে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল, এই সময় ভাগ্য সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রনাথের বিপুল বিষয়ের অধিকার আলোকনাথের আয়ত্তে আসিল।

বধূর বন্ধ্যাত্ব অপরাধের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু এখন ভাগ্যচক্র-পরিবর্ত্তনের সহিত শাশুড়ীর মনে ক্রমেই অভাবের ক্ষোভ জাগিতেছিল। এত বড় বাড়ী, এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে শুধু বাল-কণ্ঠের হাসি-কান্নারই শব্দটুকু নাই! এত বড় জমীদার বংশের নাম ও মান রক্ষা করিতে সেই একটা পিতৃহীন অভাগা ছেলে। তাই বা তাহার উপর ভরসা কিসের? কাণ্ডজ্ঞান-হীন বালক—বিপদ লইয়াই যাহার খেলা—তাহার কাছে সংসারের দাবী কোথায়? কোথায় দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলিতে হইবে, কোথায় জল-প্লাবনে গৃহহীন-দের সাহায্যের জন্য নদীর জলে সন্তরণ, পৃষ্ঠে খাদ্য-স্তূপ বহিয়া সাঁতার দিতে হইবে, আবার কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলনে সভা-সমিতিতে যোগ দিতে হইবে, পুলিশের অন্যায় অত্যাচার,—ইহার সবগুলিরই প্রতিবিধান করিতে সে অগ্রণী! মৃত্যু ত তাহার পায়-পায় ফিরিতেছে। সাপের মুখে বাঘের মুখে যাইতেও সে ভয় করে না। অসম-সাহসিক—সেবার যুদ্ধে যাইবার জন্যই ত প্রস্তুত হইয়াছিল। কেবল পিতৃ-পিতামহের পুণ্যবলে ও আলোকনাথের গোপন চেষ্টা ও বিপুল অর্থব্যয়ে ডাক্তারী রিপোর্টে ফিরাইয়া দিয়াছিল না! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পিতামহী তাহার ভরসা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছেন। মানুষের স্বভাব, সে এক হাতে ছাড়ে, অন্য হাতে ধরে; নহিলে বাঁচিতে পারে না। তাই তরুণ পৌত্রের উপর হইতে মন ফিরাইয়ে

গিয়াই তাঁহার মনে হইল, এখনও এ ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া যায়। ছেলের তাঁহার এমনই বা কি বয়স যে পুনরায় বিবাহ দেওয়া চলে না? বংশ-রক্ষার জন্য কত যাট সত্তর বৎসরের বুড়াও যে দ্বিতীয় বার দার গ্রহণ করিতেছে। উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যুতে—ভগবানের সহিত রেষারেষি করিয়া কত বুড়া বাপ যে পুনরায় বিবাহ করিয়া বংশ-রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এ ক্ষেত্রে তেমন কোন বিসদৃশ ব্যাপারও ত উপস্থিত নাই। এত বড় জমীদার-বংশের মান ও নাম যে বন্ধ্যা ও রুগ্না বধূ রক্ষণে সমর্থ হইল না—সুধু তাহার তরফ হইতে দেখিলেই ত চলিবে না! হেমলতাকে শুনাইয়া শুনাইয়াই আজকাল এ-সব কথা ওঠে, তাই আলোকনাথের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে হেমলতার মনে সুখ ও শান্তি ছিল না। যে অনর্থকর অর্থ হইতে সে স্বামী ও সৌভাগ্য দুই হারাইতে বসিয়াছে, কেমন করিয়াই বা সে-অর্থকে সে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবে? অদৃষ্টের যে এ নির্ম্মম পরিহাস! অবসর পাইলেই সে তাই নির্জ্জনে চোখের জল মুছিয়া মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করে।

সে একজন সাধারণ নারী, স্বামীর সখের বা শ্বশুর-বংশের মান-রক্ষার জন্য আত্মবলি দিবার মত মানসিক বল তাহার ছিল না। সে বুঝিতেছিল, স্বামীর মনেও এ দ্বন্দ্ব পৌঁছিয়াছে। এতদিন স্ত্রীর রূপ লইয়া আলোকনাথের মনে কোন ক্ষোভের অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। এখন গহরের রূপে মুগ্ধ-চক্ষু স্বামী স্ত্রীর পুরাতন মুখে কোন আকর্ষণ আর দেখিতে পায় না। বিদ্যা বুদ্ধি আচার অনুষ্ঠানেরও লক্ষ ত্রুটি তাই অহরহ আবিষ্কৃত হইতেছিল। অথচ বছর কয়েক পূর্ব্বে ইহারই বুদ্ধি-বিবেচনা ভক্তি-ভালবাসায় মুগ্ধ তৃপ্ত স্বামী মনে করিয়াছিল, জগতে এমনটি আর হয় নাই হইবেও না। কাল ও অবস্থা মানুষের মনে কত পরিবর্ত্তন আনিতে পারে—মানুষ তাহার হিসাব জানে না বলিয়াই দুঃখ পায়।

মায়ের মনের ইচ্ছা যখন মুখেও প্রকাশ হইতে শুনা গেল, তখন প্রথমটা আলোকনাথ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছিল। এও কি একটা কথা না কি! এই শারীরিক অসুস্থতার উপর উহাকে আবার মনের এত বড় ব্যথা দেওয়া কখনো সম্ভব! বংশ-রক্ষার জন্য ভাবনা কি? দাদার ছেলে বাঁচিয়া থাক্! সেই ত এ বংশের বংশধর, এমন কথা শুধু মুখে নয়, মনেও সে অনুমোদন করিয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বেচ্ছাচারিতা অনেক সময় বিরক্তি আনিলেও ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। মাতৃ-পরিত্যক্ত এই ছেলেটিকে শিশুকাল হইতেই যে সে সন্তান-বাৎসল্যে মানুষ করিয়া আসিতেছে।

পনেরো বৎসর পূর্ব্বে যেদিন দেবর ও শাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া বিধবা বধূ চিরদিনের শপথ লইয়া স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান, সেদিন আলোকনাথও ভাবিয়াছিল, তাহাদের সকল সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিবে। মায়ের কাছে তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভ্রাতৃজায়ার স্বেচ্ছাচারিতার দণ্ডস্বরূপ মাতা-পুত্রে ইহজন্মে আর তাহাদের মুখ দর্শন করিবেন না, এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন। তাহার পর যে দুইটা রাত্রি কাটিয়াছিল—হেমলতা সারারাত শুধু স্বামীকে এ-পাশ ও-পাশ করিতে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে শুনিয়াছে। সাহস করিয়া সে কিছু বলিতে

পারে নাই। স্বামীও একটি কথাও বলেন নাই।

তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে আলোকনাথকে বাড়ীতে দেখা গেল না এবং তিন দিনের পর সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আর একা নয়, সঙ্গে তাহার ভাইপো প্রফুল্ল। অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও যখন ভ্রাতৃজায়ার প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিল না, তখন আলোকনাথ ভাবিয়াছিল, এই সহজ উপায়ে তাহাকে সে বাধ্য করিবে। প্রফুল্লর মাতামহী ও মাতুল আলোকনাথের জেদে ছেলে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু মেয়ের অনিচ্ছায় মেয়ের মা মেয়ে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। যখন ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল না। শান্ত পল্লী-জীবনে সন্তান-হীন আলোকনাথ দম্পতী গভীর স্নেহে এই পিতৃহীন মাতৃ-পরিত্যক্ত ছেলেটিকে ভাল বাসিয়া সঙ্গ দিয়া তাহার মনের ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিত ও নিজেরাও তৃপ্ত হইত। সেদিনের এখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ছেলে এখন নিজের ইচ্ছায় চলিতে শিখিয়াছে। তাহারও শান্ত নিরুপদ্রব মনের নদীতে অসময়ে প্লাবন আসিয়াছে। তবু সেই অতীত দিনের অভ্যাসের বশে পূর্ব্ব স্নেহ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত না হউক, তাহার যে স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় ছিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হিমুর বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িল। ভয়ে ভাবনায় হিমুর মার বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছিল, গলায় জল নামিতে চাহে না! কেমন করিয়া সহায়-সম্পত্তি-হীনা বিধবা মনের মত পাত্রে কন্যাদান করিবেন? গ্রামে বিবাহার্থী যুবকের অভাব ছিল না, সত্য। হিমুকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতেও কেহ অসম্মত নহেন। তাই বলিয়া গরীব বিধবার পুরুষ-প্রকৃতির এই দুরন্ত মেয়েটিকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা কাহারও মনে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। যদি বা কাহারও ইচ্ছা হইত, সে পাত্র হিমুর মার পছন্দ হইত না। তাঁহার স্বর্ণলতা অবশেষে কি সেয়াকাঁটায় তিনি জড়াইয়া দিবেন!

মাসিমা কহিলেন, "কি কর্‌বি বাছা, যেমন ওর কপাল, তেমনি না হবে। হিঁদুর ঘরে অত বড় মেয়ে আর ত থুবড়ো রাখা যায় না। মুখুজ্জেদের গোবর্দ্ধনের সঙ্গেই দিয়ে দাও—ছেলে এমনিই বা মন্দ কি! বিয়ে হলে আবার রীত-চরিত্তির ভাল হয়ে যাবে।"

মালতী অশ্রু মুছিয়া মনে মনে স্বামীকে স্মরণ করিতেন,—তুমি বলিয়া দাও, তোমার বড় স্নেহের ধন্ হিমুকে আমি কেমন করিয়া জলে ভাসাইয়া দিব! ওগো আমি কি করি,—তুমি উপায় করিয়া দাও।

এমনি করিয়া ভয়ে ভাবনায় দিন কাটিতে-ছিল। কিন্তু যাহার জন্য এত ভাবনা, সে বেশ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে পথে পথে ছেলের দলে মিশিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত শাসন তাড়না সহিয়া সহিয়া আজকাল তাহার চঞ্চল গতি অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছিল; তবে একেবারে সেটুকু সে ছাড়িতেও পারে নাই।

মা কহিলেন, "হিমু, এত করে তোকে বলি রাস্তাঘাটে খেলিস্ নে, তা কি কোন মতেই তুই শুন্‌বি না?"

একখানা ছোট কুশের ডালায় গোটা কয়েক কাঁচা আমড়া লইয়া হিমু তাহার খেলার সাথীদের উদ্দেশে বাহির হইতেছিল, ফিরিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল "শুনি ত মা, আর কৈ খেলি? গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ি না,—দত্তদের গাছে এত পেয়ারা হয়েচে মা, যেমন মিষ্টি তেমন শাঁসালো—খোলা এত পাতলা আর ভেতরটা ঠিক যেন গোলাপফুলের রং! অরুণদা বলে, পরের জিনিষ নিলে চুরি করা হয়—হ্যাঁ মা, গাছ থেকে পেড়ে নিলেও কি চুরি করা হয়?"

"তা হয়।—হিমু, লক্ষ্মী মা আমার, ঘরে বসে খেলা কর্। রাস্তা ঘাটে যাস্‌নি বাছা। লোকে নিন্দে করবে—বিয়ে হওয়া দায় হয়েচে যে—" বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "আয়, তোর চুল বেঁধে দি।"

চুল বাঁধিতে বাঁধিতে মা কহিলেন, "মাসিমা মাহেশে রথ দেখ্‌তে যাবেন, তুই যাবি হিমু?"

হিমু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, "মাহেশ! সে কোথায় মা?"

"সে এক জায়গায়! ওঁর কে বোন্‌পো আছেন, তাঁরা খুব বড় মানুষ, মস্ত বাড়ী—আগে সেখানে দু'চার দিন থেকে মাহেশে যাবেন। যাবি সেখানে?"

হিমু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল, "খুব, খুব। দেখ মা, সেদিন তোমায় বললুম, নীলাম্বরী সাড়ীটা আমায় দিয়ো না,—তুমি শুন্‌লে না ত, যেমন কুশীদের বাড়ী গেছি, তা ওদের রান্না ঘরের দরজায় পেরেকে না কিসে আট্‌কে গিয়েছিল না! যেমন টান দিয়েচি, অম্‌নি ফর্দ্দাফাঁই।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। তবু হাসির সঙ্গে একটুখানি ভয়ের আভাষও ছিল। সে জানিত, এই একমাত্র পোষাকী সাড়ীখানির দুরবস্থায় মা ত খুসী হইবেনই না, বরং বিরক্তই হইবেন। সেদিন ভয়ে বলিতে না পারিলেও এইবার যে তাহা প্রকাশের কাল আসিয়াছে তাহা সে মনে মনে বুঝিতেছে—কারণ এই নীলাম্বরী-খানি ছাড়া ত বাহিরে যাইবার মত আর কোন সৌখীন দ্বিতীয় বস্ত্র তাহার ছিল না! খবর শুনিয়া মা কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কোন অনুযোগ করিলেন না দেখিয়া হিমু খুসী হইয়া কহিল, "কবে যাবে মা সেখানে?"

মা কহিলেন, "আমি ত যাব না। তুই যাস্ মাসির সঙ্গে। উনি ওঁর কুটুম-বাড়ী যাবেন, তাঁরা বড় লোক, আমার কি সেখানে যেতে আছে—পাগল!"

"তবে আমিই বা কেন যাব, ওঁর কুটুম বাড়ী? আমিও যাব না।" বলিয়া হিমু অপ্রসন্ন মুখে চুল বাঁধার বিলম্বে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে লাগিল। মা তাঁহার এক-গুঁয়ে মেয়েটিকে ভালই চিনিতেন। জোর করিয়া যে ইহাকে বশে আনা চলিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ বোঝেন। অথচ তাঁহার যে কি বিষম দায়, তাহা তিনিই কেবল জানেন। মাসি আশা দিয়াছেন, তাঁহার বোন্‌ঝীর একটি পিতৃহীন পৌত্র আছে, ছেলেটি বড় সৎ। দুইটা না তিনটা পাশও করিয়াছে সে। মেয়ে দেখাইয়া তাহার মাতাকে যদি প্রসন্ন করাইতে পারা যায়, হয়ত অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যাইতে পারে। মাতা-

পুত্র দুজনেই বড় ভাল। মাসীর বোনঝী তাঁহার সহোদরা; নহেন দূর সম্পর্কিতা; তবু সেখানে গেলে গরীব বলিয়া কেহ অনাদর করিবে না। তাঁহার কথার মান্যও তাঁহারা রাখিয়া থাকেন।

অনাথা বিধবা এই গোপন আশার কুহকেই মুগ্ধ হইয়া মেয়ের মন ফিরাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। নহিলে চোখের বাহিরে তাহাকে পাঠাইয়া তিনিই কি স্বস্তিতে থাকিতে পারিবেন! মার আগ্রহ ও প্রলোভনে হিমু শেষে দিদিমার সহিত মেলা দেখিতে যাইতে স্বীকার হইলে মা তাহাকে সেদিনের মত বাহিরে খেলিতে যাইবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, এমন কাণ্ড আর কখনো চলিবে না। সে এখন বড় হইয়াছে! এইবার গৃহ-কার্য্যে না থাকিলেও চুপচাপ ঘরে বসিয়াও তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। মায়ের মুখের গাম্ভীর্য্যে ও কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় হিমু বুঝিয়াছিল, এ আদেশ তাহাকে মান্য করিতেই হইবে। এবারকার বারণ অন্য বারের মত ফাঁকা আওয়াজ নয় বুঝিয়া সেদিনের অযাচিত পাওয়া স্বাধীনতাটুকু সে আর তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। সংসারের সহিত যতই সে পরিচিত হইতেছিল, ততই বুঝিতেছিল, এখানে মনে দ্বিভাব রাখিয়া চলার নামই শিক্ষা ও ভদ্রতা। বয়সের সহিত এমনিধারা একটি নূতন ভাব ধীরে ধীরে তাহার মনে অস্পষ্টরূপে আকার প্রাপ্ত হইতেছিল। তাই এখন সে অসঙ্কোচে সকল কথা সবার কাছে বলে না—যাহা বলে, তাহারও পরিণাম-চিন্তা মনে উদয় হয়। সরলা হিমু এইবার জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইতে সুরু করিয়াছে,—ভয় হয়, আর হয়ত তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

কয়াধু

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুর-সম্রাট হিরণ্য-কশিপুর পত্নী কয়াধু। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইহাঁর চারি পুত্র, প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ।]

কার তরে এই শয্যা, দাসী, রচিস্ আনন্দে ?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে, হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায় ?

কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ
সে কি রাজার মন ভোলাতে পরবে ফুলের বেশ ?
দুলাল যাহার শিকল বেড়ীর নিগ্রহে জর্জ্জর,
জন্তুলিকা! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর।
পার্‌ব না আর কর্‌তে 'শিঙার' রাখ্‌তে রাজার মন,
জঞ্জালে ডাল্ জঞ্জাল-জাল রাণীর আভরণ!
ফণীর মতন রাজার দেওয়া দংশে মণি-হার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার।
কেয়ূর-কাঁকন শিথ্‌লে দে রে খুলে দে কুণ্ডল
শিথ্‌লে দে এই মোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল।
রাণীত্বে আর নাইরে রুচি নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ!
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল।
মারণ-পটু মারছে বটু মারছে বাছারে
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটায় গড়া মারছে কোড়া দুধের ছেলের গায়
ত্বাখ্‌রে রাঙা দাগ্‌ড়াতে ত্বাখ্‌ আমার দেহ ছায়।
প্রাণের ক্ষতে লোহুর ধারা ঝরছে লক্ষ ধার
আর চোখে নিদ্ আস্‌বে ভাবিস্ পালঙ্কে রাজার ?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন
ক্লান্ত আঁখি মুদ্‌লে দেখি কেবল কুস্বপন,
পাহাড় থেকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদ মোর; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেল্‌ছে তরঙ্গে,
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে!
নির্দ্দোষেরে খুনীর বাড়া দিচ্ছে রে দণ্ড
কালনেমি, কবন্ধ, রাহু দৈত্য পাষণ্ড।
কভু দেখি ফেল্‌ছে বাছায় পাগ্‌লা হাতীর পায়
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায়।

চর্ম্মচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্ম্মচোখে কেবল দেখি···নৃসিংহ বিশ্বে।

* * * *

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ!···হাহা রে আফ্‌শোষ,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,···জাগায় বিধির রোষ।
কি দোষ বাছার বুঝ্‌তে নারি, অবাক্ চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও অন্য কোথাও এ রাজ্যে আর নয়
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
খড়্গো-জেতা স্বর্গপুরে নাইরে স্বর্গ-সুখ।
বুঝ্‌তে নারি কী দোষ বাছার,···ভাবি অহর্নিশ,
ষণ্ড-গুরুর শিক্ষা পেয়েও ষণ্ডামি তার বিষ,···
এই কি কসুর অপাপ শিশুর? হায় রে কে জানে
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে।···
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্ত্তে হায় এই সমাবর্ত্তন।
প্রশ্ন হ'ল "কি শিখেছ?" রাজ সভা-মাঝে
কয় শিশু "তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে;
যাঁর আদি নাই অন্তও নাই যে জন চিরন্তন
সত্য-মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি প্রভু চার যুগে
শিখেছি নাম জপ্‌তে তাঁহার গাইতে সে মুখে।"
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবত্ব-লোভী
ছেলের দেব-প্রেমে ত্থাখেন বিদ্রোহ-ছবি।
বিধির বরে দেব্‌তা মানুষ পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মন্ত।
ভাবেন মনে "হইছি অমর" অবধ্য ব'লেই!
পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই!
দেব্‌তা মানুষ পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে; এম্‌নি ব্যবহার!

দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ
ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উহাঁর রাগ !
উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
রাজদ্বেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
ডুবিয়ে দেব নির্য্যাতনে নরক সৃজিয়ে।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্‌ব না মাথা,
দণ্ডবিধান কর্‌ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা।"
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয়-বচনে
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই ;
পিতা গুরু,···মান্য করি,···শ্রদ্ধা দিই ভূপে,···
তাই ব'লে হায় ভুল্‌তে নারি সত্য-স্বরূপে।
আত্মা···আপন বিশিষ্টতা···করব না ক্ষুণ্ণ,···
স্মরণে যার মরণ মরে,···কীর্ত্তনে পুণ্য,···
সে নাম আমি ছাড়্‌ব নাক, ছাড়্‌ব না নিশ্চয়,
অঙ্গে যিনি অস্ত্রে তিনি, শাস্তিতে কি ভয় ?"
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ্‌লে ক'সে তায়
শান্ত শিশু হাস্‌ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।
চলে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
মিনতি-বোল্ বল্‌তে গেলাম দৈত্যপতিরে,···
বিমুখ হ'য়ে,···আঁক্‌ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রনায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যাই লাগ্‌ল আঘাত, হায়রে কয়াধু,
স্থূল-শরীরও মরিয়া হ'ল, টিক্‌ল না যাদু।

চলে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়
সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায়।
আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিম্বিল মোর বিধবা বেশ স্তম্ভ অগণন।
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়্ছে কবন্ধ!
ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্কে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির
সিংহনখে ছিন্ন অন্ত্র চৌদিকে রুধির!
দু'হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায়।
সেই অবধি শুন্‌ছি কেবল অন্তরে গুর্ গুর্
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজায় বিপর্য্যয়ের সুর,
টল্‌ছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্ম্মেরি ভার
হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার।
যে বিধি নয় ধর্ম্ম্য, বুঝি, তার আজি রোখ্-শোধ;
বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ।
বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্‌বে না কেউ আর
ওই শোনা যায়, জন্তলিকা! নৃসিংহ-হুঙ্কার।
রেখে দে তোর শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
হৃষিকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে-আতঙ্কে!
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ ক'রেছে মোর নির্দ্দোষী প্রহ্লাদ
সেই দুখে আজ আঁক্‌ড়ে বুকে চল্ করি জয়নাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ
উচিত ক'রে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ

প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা শিকল অলঙ্কার!
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব;
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এই মম গৌরব।
কয়াধু তোর জনম সাধু, মোছ্ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশ্‌নায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল।

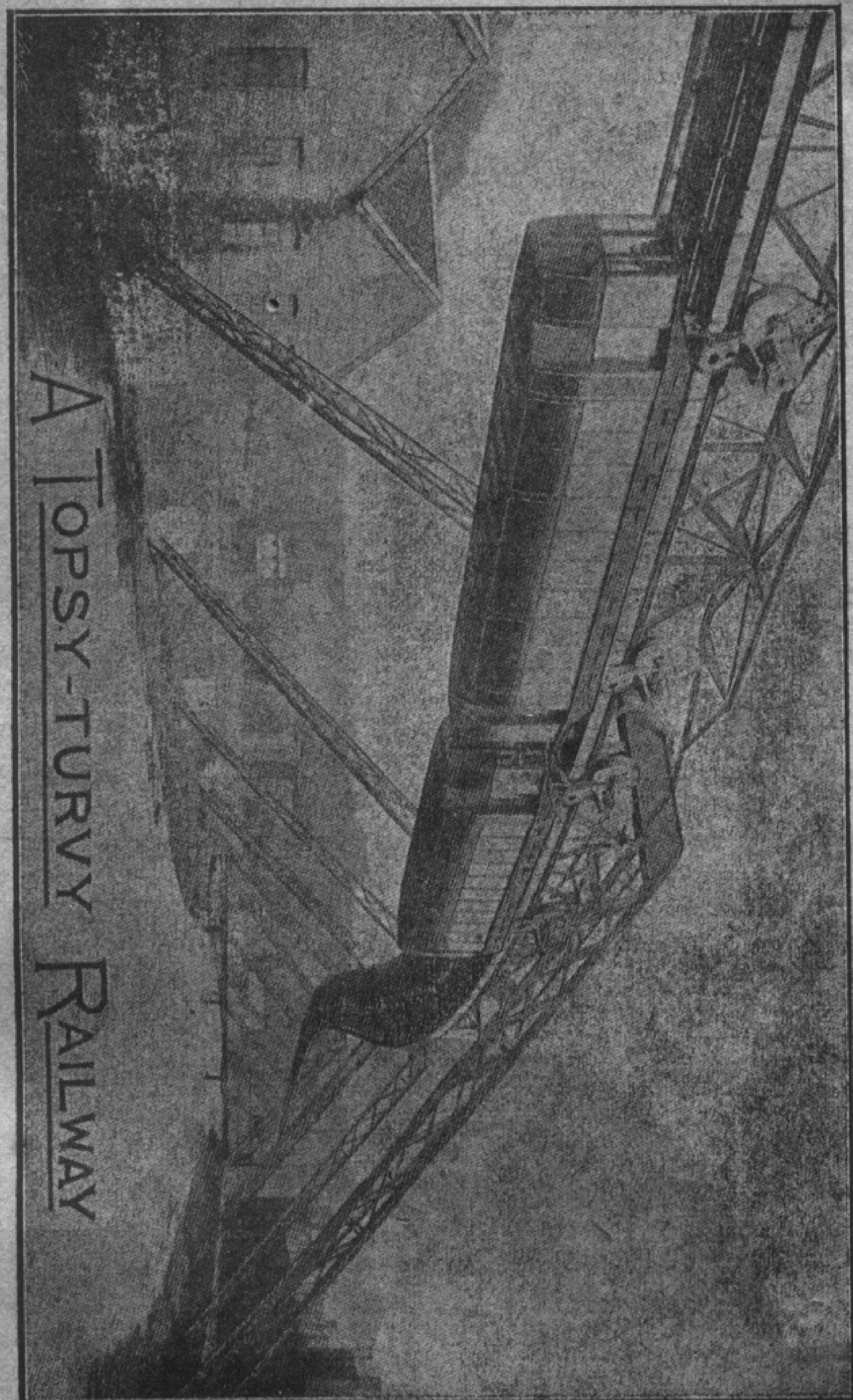
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চয়ন

বিপরীতগামী রেলগাড়ী

ইরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে,—Necessity is the mother of invention, অর্থাৎ আবশ্যকতা আবিষ্কারের জননী। এমন এক সময় ছিল, যখন রেলগাড়ী ছিল না—তখন মানুষ পায়ে হাঁটিয়া অথবা অন্য যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিত। এখন আমাদের দেশের এমন প্রদেশ নাই—যে প্রদেশে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। এখন সেই রেলপথে সহস্র সহস্র নরনারী নিরাপদে যাতায়াত করিতেছে। যদি কোন কারণে সেই রেলপথ দুই চারি দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে যাত্রিগণের সম্পূর্ণ অসুবিধা ঘটে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে মানুষ এক এক মিনিট সময় বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সময় যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে রেলগাড়ী অপেক্ষা অধিকতর শীঘ্রগামী যানাদির প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইতেছে। এই প্রয়োজনের ফলে মোটর এবং ব্যোমযানের প্রচার দিন দিনই বাড়িতেছে।

আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই রেলগাড়ী দেখিয়াছেন, কিন্তু রেলগাড়ীকে নিরাপদে চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে বোধ হয় তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। রেলগাড়ী বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য্য সাফল্য। উহা মানুষের শিল্প-নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন। কোথাও উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর দিয়া রেলগাড়ী দৌড়িতেছে—কোথাও-বা সুপ্রশস্ত নদীর উপর দিয়া চলিয়াছে। কোথাও রেলগাড়ী যাতায়াতের জন্য পর্ব্বতের ভিতর দিয়া রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে—কোথাও বা নদীর নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে, ও তাহার ভিতর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে। এই সকল কার্য্য বহু শ্রম ও



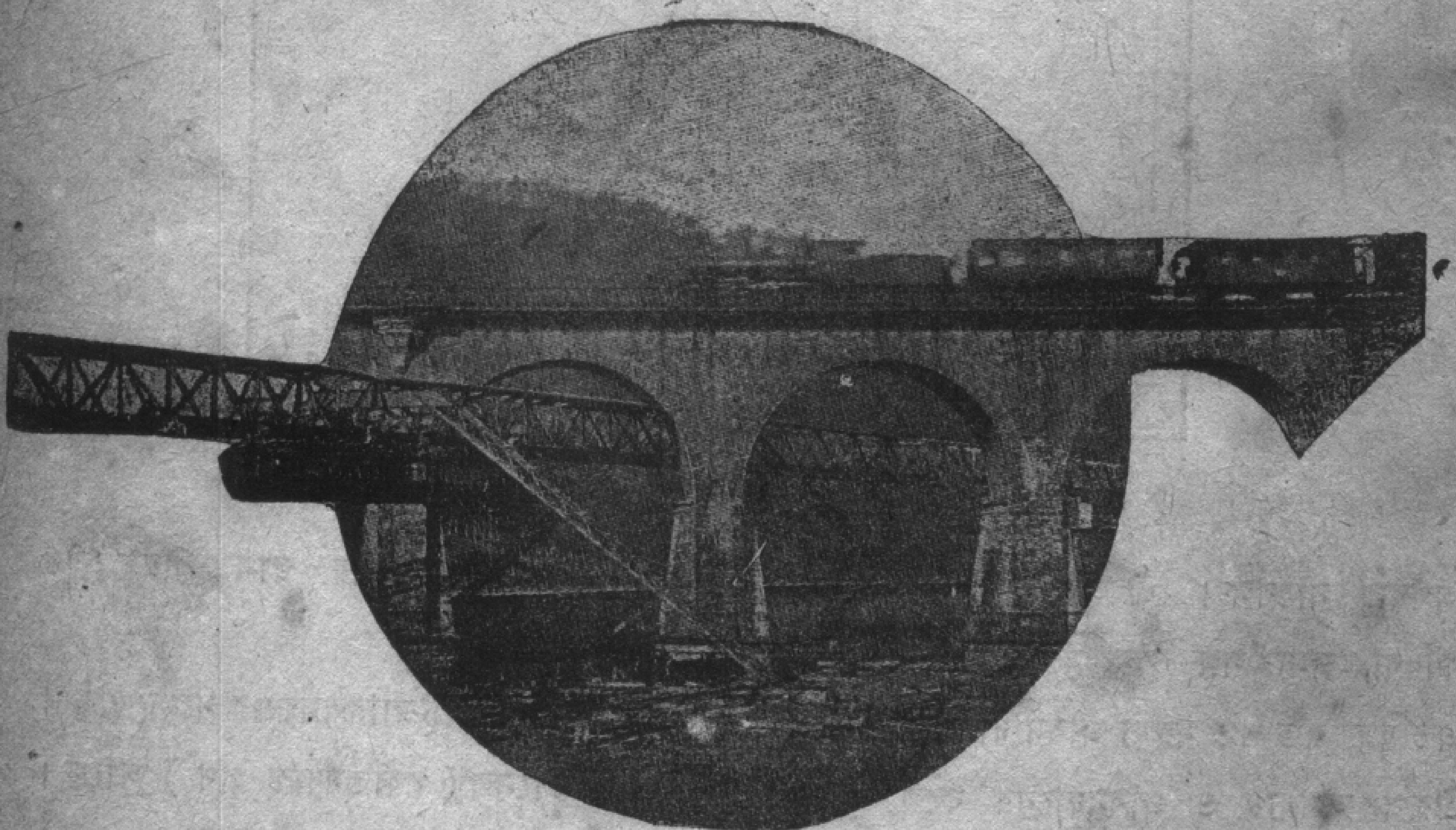
নদীর উপরে বিপরীতগামী রেলগাড়ী

অর্থব্যয় সাপেক্ষ। ঐ সকল রেলপথ প্রস্তুত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন শত শত মনুষ্য জীবন দান করিয়াছে। ঐরূপ অর্থব্যয় ও জীবনদানের ফলে আমরা ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়িয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে হাতে একখানা উপন্যাস লইয়া এক আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সকল ভীষণ বন-জঙ্গল পর্ব্বতময় স্থান পার হইয়া যাইতেছি।

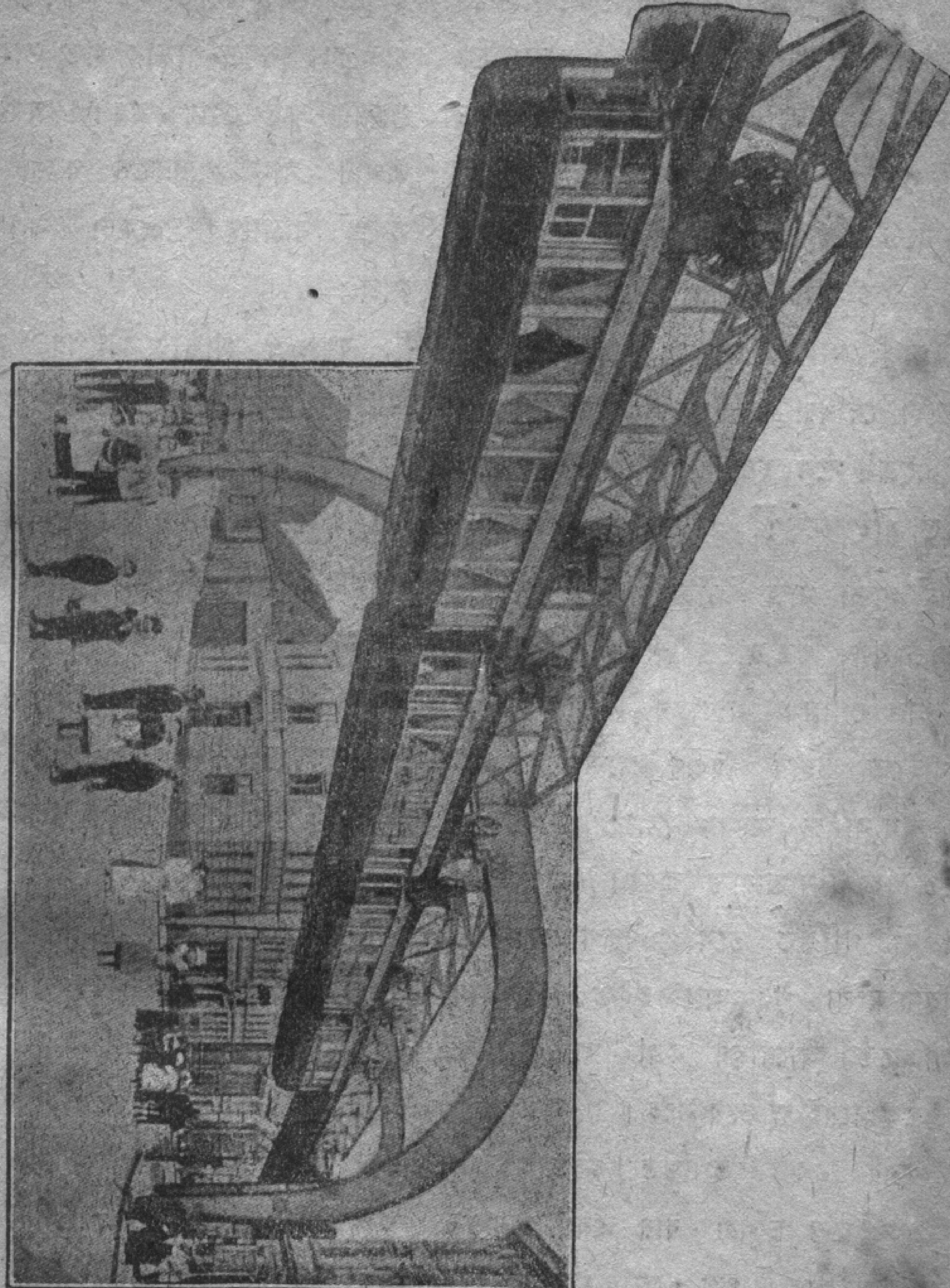
ইটালি ও সুইট্জ্যারল্যাণ্ডের মধ্যে একটা খুব প্রশস্ত টানেল (পর্ব্বতমধ্যস্থ পথ) আছে। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল হইলেও এই টানেল প্রায় সাড়ে সাত বৎসরে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার প্রত্যেক গজ খুঁড়িতে ১৬,০০০ টাকা ব্যয়

হইয়াছিল। কিন্তু টেম্‌স্‌ নদীর নীচে দিয়া যে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার একগজ প্রস্তুত করিতে ১৮০০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। এবং ১৮ বৎসরে তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়।

রেলগাড়ীর প্রচার কত বাড়িয়া গিয়াছে, ইহার একটা অনুমান করা যাউক। পৃথিবীতে এখন ৬৭০০০০ মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ পথে রেলগাড়ী চালাইবার জন্য মানুষ ১২৫০০০০০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। গ্রেটবৃটেনে প্রত্যেক মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে ৫১,৩০৮ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। প্রতিবর্ষে গ্রেটবৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রায় ১৬০০০০০০০০০ যাত্রী রেলপথে যাতায়াত করিতেছে। ঐ যাত্রিগণের মধ্যে ৩,০০,০০,০০০ যাত্রী প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। ভারতবর্ষে রেল-পথের বিস্তার ৩৩০০০ মাইল। কিন্তু এখানকার রেলপথের যাত্রিগণের তালিকা জানাইবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণীতে ভিড়ের মধ্য দিয়া ধাক্কা খাইতে খাইতে মেষাদি প্রভৃতি পশুপালের মত বদ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী প্রতিদিন তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া আপনাদের জীবন সার্থক মনে করিতেছে। এইরূপে যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমাদের দেশের রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন কত কষ্টের, আর জানেন তাহা অন্তর্য্যামী ভগ ান। জানি না, আমাদের গবর্ণমেণ্টের সানুগ্রহ-দৃষ্টিতে কবে ভারতীয় রেলপথের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের গমনাগমন সুখকর হইবে। যাক্‌ সে কথা।



রেলের পুলের নীচে বিপরীতগামী রেলগাড়ী



সহরের উপর দিয়া বিপরীতগামী রেলগাড়ী

জর্ম্মনী-দেশে এলবরফেল্ড্ এবং বার্ম্মেন নামে দুইটি গ্রাম আছে। ইহাদের মধ্যে রেলগাড়ী বিপরীতমুখী হইয়া চলে। সেতু উপরে, গাড়ী নীচে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ গাড়ী নদী পার হইবার সময়েই ঐ রূপ ভাবে চলে। ইহা দেখিয়া ঐ ট্রেনে আরোহণাভিলাষী যাত্রিগণের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—তাহাদের এইরূপ ভয় হয় যে, হায়, বুঝি এইবার নদীতে ডুবিয়া মরিলাম!

ওয়াহ উয়িংকিল ষ্টেশনে ট্রেণ পৌছিবা-মাত্র এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। রেলগাড়ী নদীর উপরিস্থ ব্রিজের নীচে

আকাশের মধ্য দিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে চলিতেছে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি আতঙ্কে ও বিস্ময়ে মগ্ন না হইবে! ইহার চাকাও বড় নিপুণ শিল্পে গঠিত। লৌহনির্ম্মিত চক্রনেমিতে দীর্ঘ দণ্ড পরস্পর গ্রথিত থাকে। ইহা দেখিতে তত সুন্দর নয়। যদি এই সময়ে গাড়ী আসিয়া যায় তবে আরোহিগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠেন। তখন এইরূপ মনে হয় যেন মাথার উপর দিয়া টরপেডো যাইতেছে।

এই গাড়ী মাত্র আট মাইল পথ চলে। ইহাতে কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা আছে। ভাড়া চার পেনি। সাধারণ গাড়ীতে এই রাস্তা যাইতে উহার দ্বিগুণ ভাড়া লাগে। ভাড়া কম বলিয়া অনেক লোক ঐ ভয়ঙ্কর গাড়ীতে চড়িয়া যাতায়াত করে। যদি এরূপ সুবিধা না থাকিত তবে ঐরূপ গাড়ীতে আরোহীর সংখ্যা খুব অল্পই হইত। কেননা এই গাড়ীতে আরোহণ করা আরোহীদের পক্ষে একেবারেই সুখকর নহে।

ষ্টেশনের নিকট উপস্থিত হইলেই ঐ গাড়ী একপ্রান্তে চলিয়া যায় এবং পুনরায় এক অর্দ্ধবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়ায়। যখন ঐ গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহা একটু ঝুঁকিয়া থাকে। মনে হয় যেন গাড়ী সুদীর্ঘ পথ আসিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাত্রিগণ গাড়ীর ভিতরে যাইয়া বসিল। যথাসময়ে সিগনল্ দেওয়া হইলে গার্ড সাহেব নীল পতাকা দেখাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। গাড়ী ছুটিতে লাগিল। আরোহিগণকে কোন ধাক্কাও লাগে না, অথবা তাহাদের অন্য কোনো প্রকার অসুবিধাও হয় না; কিন্তু জাহাজের যাত্রীদের সমুদ্র-পীড়ার মত তাহাদের একটা সামান্য কষ্ট বোধ হয়। যখন ঐ গাড়ী একটা মোড় পরিবর্ত্তন করে কেবল সেই সময়ে যাত্রীদের একটা ঝাঁকানি লাগে মাত্র।

যখন ঐ গাড়ী উইপর নদীর উপর উপস্থিত হয় তখন দেখিতে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়।

ভগবান্ ঐ নদীকে পর্ব্বত ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু এখন ঐ নদীর উভয় তীরে বড় বড় কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। সামান্য স্থানও খালি পড়িয়া নাই, সেতু রক্ষা করিবার স্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত কারখানার দেওয়ালের ভিতর দিয়া কারখানার মধ্যে প্রোথিত আছে।

যখন ঐ গাড়ী ষ্টেশনের কিছু দূরে থাকে তখন গাড়ীর উপর হইতে উহার আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা যায়;—পাতলা পাতলা ত্রুটিমাত্র কাষ্ঠখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। মনে হয় কেহ যেন আকাশের মধ্যে ঘুড়ি উড়াইয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। যখন গাড়ী ঐ ষ্টেশনের খুব নিকটে আইসে তখন মনে হয়, বাস্তবিকই উহা ষ্টেশন—যেহেতু, তখন সেই তক্তার উপর মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়।

ঐ ট্রেণের আরোহিগণ বিভিন্নপ্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পান। রেলওয়ে ব্রিজ কখনো তাঁহাদের পায়ের নীচে, কখনো মাথার উপরে দৃষ্টিগোচর হয়। কখন সেই পথ দিয়া ট্রামগাড়ী চলিয়া যাইতেছে। কখনো ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে রেল-

গাড়ী চলিতেছে। যখন গাড়ী কোনো মোড়ের নিকটবর্ত্তী হয় তখন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। তখন এরূপ মনে হয়, যে, এই রেলগাড়ীতে আর কখনো আরোহণ করিব না। যখন বার্ম্মেন ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায়, তখন মানুষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। সকলে বলে, সাধারণ গাড়ী ইহা অপেক্ষা ভাল। ইহাতে ভাড়া কিছু কম বটে কিন্তু সাধারণ গাড়ীর অতিরিক্ত ভাড়াও যেন বাঞ্ছনীয়, আর আমরা এমন ফ্যাসাদে কখনো পড়িব নাই!

—সত্যবতী-বাঙ্গী দুবে

পৃষ্ঠ-পটে উল্কি-চিত্র

এই যে লোকটিকে দেখ্‌ছেন, এর পিঠের পটে উল্কির ছবিখানির উপরেও একবার চোখ বুলিয়ে নিন্‌। এর-চেয়ে ভালো উল্কির ছবি পৃথিবীতে আর নেই। এই লোকটির নাম জ্যাক গোউল্ড। সে নাবিক। তার দেহের আগাপাশতলায় ছুঁচ ফুটিয়ে উল্কি-চিত্র আঁকা হয়েছে। পিঠের যে ছবিখানির প্রতিলিপি আমরা দিলুম, কেবলমাত্র সেইখানি আঁকাতেই সময় লেগেছে গোটা দুই বৎসর, এবং খরচ হয়েছে সাড়ে সাত হাজার টাকা।



পৃষ্ঠ-পটে উল্কি-চিত্র

উল্কির চলন পৃথিবীতে অনেকদিন। চার হাজার বছর আগেও মিশরীরা উল্কির ছবি আঁকৃত। এখন উল্কি আঁকা হয়, শোভার্থে। তখন কিন্তু উল্কিতে মালিকত্ব বুঝানো হোতো। মনে করুন, কারুর একটি কলসী আছে! এক্ষেত্রে সে তার গায়ে উল্কিতে কলসীর ছবি এঁকে সকলকে বুঝিয়ে দেবে, সে একটি কলসীর মালিক! একালে জাপানের উল্কি পটুয়ারাই নিপুণতায় আর-সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৪

আদেশ দিয়া অভয়াশঙ্কর আসিয়া যখন উপরের ঘরে ঢুকিলেন, সুষমা তখন সেই ঘরেই জানালার ধারে বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়াছিল। অভয়াশঙ্করকে একলা দেখিয়া সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নিখিল এলো না যে! সে খেতে গেছে কি?

গম্ভীরভাবে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—না।

সুষমা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—তবে? সে যে ফিরেচে, শুনলুম।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হ্যাঁ, সে এই এখন ফিরেচে, তাই তার সাজা হয়েচে, এগারোটা অবধি পড়ে তবে সে খেতে পাবে, শুতে পাবে। তার আগে নয়।

সুষমা সে গম্ভীর স্বর শুনিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না। অভয়াশঙ্কর একটু থামিয়া বলিলেন,—কাল রাত্রে এই শাসনটা হলো, আবার আজ এই!

কথাটুকু বলিয়া অভয়াশঙ্কর বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সুষমা ভয়ে কাঠ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সকালে সে কত করিয়া মনকে বুঝাইয়া শক্ত করিয়াছিল, যে নিখিলের উপর স্বামী কড়া শাসন প্রয়োগ করিলে সে যেমন করিয়া হৌক, শাসনের সে বাঁধনটাকে কতক শিথিল করিয়া দিবে, কিন্তু অভয়াশঙ্করের ক্রোধ-গম্ভীর স্বর ও কঠিন ভঙ্গী দেখিয়া কাজে তাহা করিতে পারিল না, শুধু ভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি বিপদেই তিনি পড়িলেন, এই নিখিলকে লইয়া। ছেলে যদি একটুও তাঁহার মন বুঝিয়া চলিত! সে যদি বুঝিত, তাহাকে শাস্তি দিতে বাপের প্রাণে কতখানি বাজে! অথচ এ অপরাধ করার জন্য শাস্তি না দিলেও যে নয়! শাসন আল্‌গা করিয়া ছেলের ভবিষ্যৎটাকে তো আর মাটী করা যায় না। সুষমা যে আসিয়া তার মার আসনে বসিয়াছে, তা সেই-বা সে মার কাজ কোথায় করিতেছে! সে তো নিখিলকে বুঝাইতে পারে, কোন্ কাজগুলা তাহার করা সাজে না, করা উচিত নয়! ছেলেকে বুকে তুলিয়া ননী-ছানা খাওয়াইলেই তো আর ছেলে মানুষ করা হয় না! তিনি চান, ছেলে সুষমাকে মার মতই ভাল বাসিবে, আবার সেই মার মত ভয়ও করিবে! এই শাসনের ভারটা তাঁহার হাত হইতে সুষমা নিজের হাতে তুলিয়া লইলেই যে ভালো হয়! তাহা ত সুষমা বুঝিবে না! তিনি কি-ভাবিয়া সুষমাকে বিবাহ করিলেন, আর কাজে এ ঘটিল কি! নিখিলকে লইয়া যে বিশৃঙ্খলা, সেই বিশৃঙ্খলাই রহিয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন,—সুষমা তেমনি পুতুলের মতই স্থিরভাবে তখনো দাঁড়াইয়া ছিল। অভয়াশঙ্করের বিরক্তি ধরিল। এইখানেই তো প্রভেদ! নিখিলের এত-বড় শাস্তির কথা শুনিয়া সুষমা বেশ নিশ্চিন্তভাবেই দাঁড়াইয়া আছে ত! কেন, সে কি তাহার কাছে আসিয়া একবার মিনতি

করিয়া বলিতে পারে না, যে, ওগো, অত রাত্রে খাইলে ছেলেটার যে অসুখ হইবে,—খাইয়া সে এখানে আসিয়া একটু পড়ুক, তার পর যে ব্যবস্থা হয়, করিয়ো! হায়রে, এ কথা সে বলিবে কেন? সে তো কিছু আর সত্যই নিখিলের মা নয়! সে যে—

ভাবিতে ভাবিতে অভয়াশঙ্করের বিরক্তি বাড়িয়া উঠিল। তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সুষমা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শেষে বলিল,—তুমি শুলে যে,—খাবে না?

বিরক্তির স্বরেই অভয়াশঙ্কর বলিলেন—না।

এ কথার পর কি বলিবে, কি জবাব দিবে, সুষমা তাহা ভাবিয়াও পাইল না। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার সেই জানালার ধারে গিয়াই বসিল। আকাশে ছোট-ছোট কয়েক টুকরা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, পাশের বাগানের বড় বড় তাল-গাছের আড়ালে ক্ষীণ চাঁদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সদ্য-আরোগ্য-পাওয়া রোগীর মতই শীর্ণ বিবর্ণ মূর্ত্তি—ছোট মেঘগুলা কখনো চাঁদের গায়ে পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, আবার কখনো নিজেদের পাৎলা আবরণটুকু চাঁদের মুখ হইতে টানিয়া সরাইয়া লইতেছে। মেঘেদের এই লুকোচুরি খেলায় ক্ষীণ চাঁদ হাসিয়া সারা হইতেছে। শান্ত স্তব্ধ রাত্রি—অদূরে পল্লীর কোন্ আখড়া হইতে ছেলেদের গলার গানের শব্দ সে স্তব্ধতাকে মাঝে মাঝে চিরিয়া চিরিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সুষমা ভাবিল, বেচারা নিখিল! কি বেদনা বুকে লইয়াই না সে এখন পড়ার বই মুখস্থ করিতেছে! মুখে পড়া বলিয়া গেলেও বেচারী হয়তো এ বিপদে সুষমার কথাই ভাবিতেছে—মা আসিয়া কখন্ তাহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে! সে তো জানেনা, তার এ-মার শক্তি কতটুকু? একটা সামান্য দাসীরও যে অধিকার আছে, সেটুকু অধিকারও এ-মার নাই! সে কতখানি অসহায়, কত নিরুপায়। হায় রে—এমনি করিয়াই উনি ছেলেকে বুঝাইবেন যে, না, সে মাতৃহীন হয় নাই! তাহার কোনদিকেই কোন অভাব নাই! নিরুপায় চিত্তে সুষমা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। তার পর সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে আকাশের পানেই চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে ঐ একটা, দুইটা, অনেকগুলা নক্ষত্র ফুটিয়াছে। ছেলেবেলায় সে শুনিয়াছিল, ওগুলা চোখ! যে-সব লোক মরিয়া যায়, তাহারাই সন্ধ্যায় জগতের কোলাহল থামিলে প্রাণের অসহ মায়ায় চোখ মেলিয়া তাহাদের চির-পরিচিত সুখের নীড় এই পৃথিবীটুকুর পানেই চাহিয়া থাকে! ঐ নক্ষত্রের চোখ মেলিয়া নিখিলের মাও কি পৃথিবীর এক কোণে এই বাড়ীটির পানেই অধীর একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, এখন? ছেলেবেলাকার সেই সরল বিশ্বাসটুকু আজো যদি তাহার মনে তেমনি অটুট থাকিত! এই ছেলে-ভুলানো রূপ-কথাটা যদি নিছক কল্পনার না হইয়া সত্য হইত! সুষমা আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার দুই অলস চক্ষু ঘুমের ঘোরে কখন্ যে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। হঠাৎ একটা দাসীর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিলে সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল—উঠিয়া সে বুঝিল,

তাইত,—সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! আশ্চর্য্য! ঘুম আসিল কোথা হইতে!

উঠিয়া চোখ মুছিয়া সে চাহিয়া দেখে, শয্যায় অভয়াশঙ্কর নাই। সে বিস্মিত হইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু কোথায় রে?

দাসী বলিল,—বাবু নীচেয় খেতে গেছেন, দাদাবাবুকেও খাওয়াচ্ছেন, তাই মা, তোমায় ডাকতে এলুম,—কি দরকার হয়, না হয়—!

সুষমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দাসীর পানে চাহিল,—দাসী ত জানেনা, স্বামীর সঙ্গে সুষমার কি সম্পর্ক! স্বামী উঠিয়া গিয়াছেন, সুষমাকে একবার ডাকাও উনি প্রয়োজন বুঝিলেন না! অভিমানের অসহ্য বেদনায় সুষমার বুক ফাটিয়া পড়িবার মত হইল! কিন্তু হায়, এ কার উপর কিসের তার অভিমান! তাহার দুই চোখের পিছনে যেন সাগরের জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া আসিল। পাছে দাসীর কাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া নীচে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর ও নিখিলের খাওয়া তখন চুকিয়া গিয়াছে। নিখিল আঁচাইতে ছিল, অভয়াশঙ্কর পাশে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন—যা, যা বলেচি, সব এবার থেকে মনে থাকবে? একচুল এদিক-ওদিক হবে না আর?

আঁচানো শেষ করিয়া নিখিল অত্যন্ত মৃদু ভীত কণ্ঠে বলিল,—হ্যাঁ।

—আচ্ছা—বলিয়া অভয়াশঙ্কর নিকটস্থ আন্‌লা হইতে একটা শুষ্ক তোয়ালে টানিয়া ছেলের হাতে দিলেন; নিখিল তোয়ালেয় মুখের হাতের জল মুছিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অভয়াশঙ্কর তখন আচমন শেষ করিয়া ছেলেকে বলিলেন,—আজকের মত তোমার ছুটী। এখন শোবে, চল—দশটা বেজে গেছে।

সেনাপতির আদেশ-চালিত সৈনিকের মতই নিঃশব্দে নিখিল পিতার আগে-আগে সিঁড়ির দিকে চলিল। অভয়াশঙ্কর যাইবার সময় সুষমার পানে চোখের এমনি একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন যে সে দৃষ্টি বিষ-মাখানো তীক্ষ্ণ শরের মতই তাহার হাড় অবধি বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। সে কেমন মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইল, যখন ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিল—খেয়ে নাও মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রাত ত অল্প হলো না!

সুষমা মৃদুস্বরে বলিল,—আজ আমি কিছু খাবো না ভাই বামুন দিদি। তুমি খাবার তুলে রাখো—আমার বড্ড অসুখ করচে!

কথাটা বলিয়া তাহার উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্তও সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ঝড়ের বেগে আসিয়া সুষমা শয়ন-কক্ষে মেঝের উপর আপনার দেহভার লুটাইয়া দিল। চোখের জল আর বাঁধ মানিল না—সুষমার বুকের সমস্ত বেদনাটাকে গলাইয়া ভাসাইয়া দুই চোখ বহিয়া সে অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িল!

৫

সকালে স্বামীকে একান্তে পাইয়া সুষমা বলিল,—আ মার একটা কথা রাখবে?

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—কি কথা? বল।

সুষমা বলিল,—আমায় কোথাও পাঠিয়ে দেবে, দিন-কতকের জন্যেও অন্ততঃ?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় যেতে চাও তুমি?

সুষমা বলিল,—যাবার আর ঠাঁই কোথায়, বল? এক পিশিমার কাছে, আর না হয় দেশের বাড়ীতে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হঠাৎ এ খেয়াল হলো যে?

সুষমা বলিল,—খেয়াল নয়। আমি ঢের ভেবে দেখেছি,—এ ছাড়া আর-কোন উপায় নেই।

—কিসের উপায়?

—তোমার সুখের। আমায় এনে অবধি তুমি অত্যন্ত মন-কষ্টে আছ। নিখিলের জন্যেই আমায় আনা, সেই নিখিলের কিছুই আমি করতে পারি না, করিও না। তুমি বিরক্ত হও, সে বিরক্তির যা-কিছু ঝাঁজ, তা ঐ ছেলেটার উপর গিয়েই পড়ে। তার জন্যে মায়া হয়, এ কথা বলচি না। কেননা, তা বললে তুমি বিশ্বাসও করবে না, আমি ত আর তার মা নই,—তবে তার উপর এই যে অনর্থক অত্যাচার হয়, এ পাপের সব দায় আমার ঘাড়েই ত পড়ে! আর-জন্মে অনেক পাপ করেচি, তার জন্যে এ-জন্মে এই তিলে-তিলে পুড়ে মরচি, এ-জন্মে জেনে-শুনে আর এ পাপ করি, কেন?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বুঝেচি, আমার হাতে পড়েচ, এটা তোমার মস্ত পাপের ফল বৈ কি!

সুষমা এ কথার কোন জবাব দিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—একটা কথা শুধু তুমি, শোনো—আমায় অপরাধী করো না। আমার অপরাধ কি? ভালো ভেবেই এ ব্যবস্থা আমি করেছিলুম। এ ব্যবস্থা করতে আমার বুকে কত বেজেছে, তা তুমি বুঝবেও না—কিন্তু মানুষে যা ভাবে, তাই কি ঘটে সব সময়? তুমি কোনদিন আমার মন বোঝবার চেষ্টা করলে না ত! যদি করতে, তাহলে তুমিও সুখী হতে পারতে, আমিও সুখী হতুম!

সুষমা একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও গো, তুমি কি চাও? আমি জ্ঞানতঃ কখনো তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি ত। তবে আমি মেয়েমানুষ, বুদ্ধি আমার কম, তোমার মত লেখাপড়াও শিখিনি, এটা বোঝো ত। যদি আমি কোথাও ভুল বুঝে থাকি ত সে ভুল আমার শুধরে দাও। আমাদের চারিধারে কালো মেঘ জমে আছে—যদি একটা কথার হাওয়ায় সে মেঘ কেটে আকাশটা ফরসা হতে পারে, তবে কেন তুমি সেকথা বলছ না গো? বল, আমার কোথায় ত্রুটি, কি ত্রুটি হয়েছে, আমি নিশ্চয় তা শুধরে নেব। চারিদিকের এ ঘোলাটে ভাবে আমার একলারই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠেনি শুধু, ছেলেটাও যায়, তুমিও কষ্ট পাচ্ছ।

অভয়াশঙ্কর আজ এখন এই সুষমার ত্রুটি দেখাইবার অবসর পাইয়া চারিধার হাতড়াইতে লাগিলেন। একটু পূর্ব্বে যে-সমস্ত ত্রুটিগুলা প্রকাণ্ড জাঁতার মত মনের মধ্যে প্রচণ্ড রবে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এখন হাতড়াইতে গিয়া কোথায় যে ছায়ার বিন্দুর মত সেগুলা সরিয়া পলাইয়া যায়—হাতে আর কিছুতেই আঁকড়াইতে পারা যায় না! যেগুলা নাগালের

মধ্যে মনের কাছে-কাছে পড়িয়া ছিল, সে-গুলাকে কুড়াইয়া লইয়া অভয়াশঙ্কর দেখিলেন, এ যে অতি তুচ্ছ! সেগুলাকে লইয়া মস্ত-বড় তর্ক বা উপদেশ দেওয়া চলে না—উপদেশ দিতে গেলে তাহাদের নগণ্যতা, তাহাদের তুচ্ছতা দেখিয়া হাসি আসে, সেগুলার সম্বন্ধে কিছু বলিতে লজ্জা পায়, সঙ্কোচ হয়!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আচ্ছা, এক সময়ে বলবো'খন।

সুষমা বলিল,—তাই বলো। কিন্তু তার আগে একটা মিনতি করতে পারি কি? একটা কথা আমি বলতে চাই শুধু,—শুনবে?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—বল।

সুষমা বলিল,—নিখিলের সম্বন্ধে আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি? না পারলেও একবার চেষ্টা করে গ্যাখো। যত-বড় শপথ করতে বলো তুমি, আমি সেই তত বড় শপথ করেই বলতে পারি, আমার কাছে তার কোন অনিষ্ট কল্পনাও করো না, তুমি। আমি তার মা নই, সত্যি,—সাজা-মা—তবু আমি বলচি, মায়ের যত্ন না করি,—তবু সে আমার স্বামীর ছেলে একটিমাত্র ছেলে, তার মঙ্গলে আমার স্বামীর মঙ্গল, আমারো মঙ্গল, এটা ভেবেও ত তাকে আমি যত্ন করতে পারি!—এইটুকু ভেবেও যদি আমার এ কথাটা রাখো—!

অভয়াশঙ্কর একটু চমকিয়া বলিলেন,—কেন, তাকে ত তোমার কাছে আসতে আমি বারণ করি নি!

সুষমা বলিল,—মুখের কথায় বারণ করিনি, সত্যি—কিন্তু তার যে-ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমার কাছে দু'দণ্ড আসতে তার অবসর কোথায়! আর এই বয়সে পড়ার অত চাপ তার উপর চাপিয়ো না গো—একটু হাঁফ ছাড়তে দিয়ো তাকে। সে ত আমাকেই মা বলে জানে—আমার কাছে ছুটো-চারটে আদর-আব্দার করবার অবসর তাকে দিয়ো—তাতে তার মন ভালোই থাকবে। এ-বয়সে ছেলেরা মার কোল ঘেঁষেই থাকতে চায় বেশী, তা-থেকে তাকে একেবারে বঞ্চিত করো না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কি জানো, সুষমা, তবে সত্য কথাটাই খুলে বলি। আমি ঢের ভেবে দেখেছি, এ কৃত্রিম বন্ধন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখবার যত চেষ্টা, যে-আয়োজনই আমরা করি না কেন, এ বাঁধন একদিন এম্নি অলক্ষ্যে আল্‌গা হয়ে যাবে, যে সেদিন ও-বেচারী আপশোষে একেবারে সারা হয়ে যাবে। ও সেদিন পৃথিবীতে আপনাকে অত্যন্ত প্রবঞ্চিত, অসহায় বলে' মনে করবে, আমাদের দু'জনেরি উপর ওর মন তিক্ত, বিষাক্ত, বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে, তাই ওকে তোমার কাছ থেকে একটু-একটু করে সরিয়ে নিচ্ছি, মনকে ও শক্ত করে নিক্‌,—স্নেহ-মায়া-মমতা এ-সব কোমল বৃত্তিগুলো ওর মনের উপর যেন কোন আধিপত্য না করতে পারে! বুঝলে?

সুষমা বলিল,—এই রকমে তুমি ওর মনের স্বাভাবিক গতিকে বেঁধে দিতে চাও? ওর মনকে একটা পাথরের মতই শক্ত করে দিতে চাও? আমি মেয়ে-মানুষ, তোমার মত অত বুঝি না—কিন্তু এতে ওর মন কত-বড় ঘা খাবে, ভাবো দেখি! ছেলেমানুষের ছোট্ট কোমল মনটুকু এত-বড় প্রকাণ্ড অস্বাভাবিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যে

একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে।

তারপর একটু থামিয়া দম্ লইয়া সুষমা আবার বলিল,—একটা কথা বলবো?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বল।

সুষমা বলিল,—আগে থেকেই তুমি মন্দ দিক্‌টা অত ভাবচো কেন? আমাকে মা বলে জেনেই যদি ও বড় হয়ে ওঠে,—আর তার জন্যে তুমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, অনেক যুজেছ, তুমি মনে করোনা, আমি তা বুঝি না! সে আমি খুব বুঝি, আর বুঝি বলে তোমায় শ্রদ্ধাও আমি খুব করি—তাই জেনেই যদি ও বড় হয়ে ওঠে, তাতে এমন কি ক্ষতি হবে? আমি তোমায় এইটুকু বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে এমন ব্যবহার ও কখনো পাবে না, যাতে করে তিলেকও ওর সন্দেহ হতে পারে যে, আমি ওর মা নই! তবে কেন মিছে মনে ও-সব কু গড়ে এত দড়ি-দড়া দিয়ে চারিধার এঁটে বেঁধে দিচ্ছ। এতে করে ও তোমাকে কতখানি নিষ্ঠুর বলে ভাবচে, বল দেখি। এখন ক্রমেই ও বড় হয়ে উঠচে, চারিধারে মা-বাপের কি প্রচুর স্নেহের মধ্যে যত ছেলে-মেয়েকে মানুষ হতে দেখচে—এ সব থেকে ওর মনকে তুমি আট্‌কে রাখতে পারবে?

বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই জন্যেই ত কারো বাড়ীতে ওর যাওয়া-আসা আমি পছন্দ করি না, বাইরের সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করি!

সুষমা বলিল,—এত গণ্ডী টেনে ছেলে মানুষ করা চলে না। তার চেয়ে ওকে ছেড়ে দাও দেখি, বাহিরের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে। চারিধারে এই যে প্রাণের মুক্ত হিল্লোল চলেছে, এর মধ্যে প্রাণ ভরে মিশুক ও! তার পর ভবিষ্যৎ! সে ভার আমার উপর দাও, দ্যাখো—

অভয়াশঙ্কর একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, —আচ্ছা, ভেবে দেখব তোমার কথা। তবে ঐ যে বললে, তোমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিচ্ছি, এটা ভুল কথা! আমি তা নিইনি। আর ঐ অবসর? সেটা তোমরা এরি ফাঁকে করে নিতে পারো যদি, ত তাতে আমার কোন আপত্তি নেই—কোনদিন ছিলও না!...

তারপর এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এত কথাই পাড়লে যখন, তখন শোনো,—তুমি সাধারণ মেয়েদের মত নও, তোমার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে—তুমি মিথ্যা অভিমান না করে, এ ব্যাপারের সূক্ষ্ম দিকটাও ধরতে পারবে,—তাই বল্‌চি, তোমার উপর ওকে সম্পূর্ণভাবে ফেলে দিতে আমার অনিচ্ছা নেই, আমি সেটা চাই-ও—কিন্তু আপাততঃ এমনি হয়েছে, যে যখনই ওটা ভাবতে বসি, তখনই কোথা থেকে লীলার ছল-ছল জল-ভরা দুটি চোখ আমার মনের সামনে জেগে ওঠে,—আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে যেন সে বলে,—আমার শেষ চিহ্ন, আমার স্মৃতি সব একেবারে লোপ করে দেবে?...সে দিক্‌টার সম্বন্ধে কি করি, বল দেখি, সুষমা?

সুষমা এ কথার জবাব দিতে পারিল না সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। একজনের স্মৃতি তাহারই জন্য একেবারে পৃথিবীর পট হইতে ধুইয়া মুছিয়া তবে তাহার আসন বিছানো! তাহার মন হুঙ্কার দিয়া বলিয়া

উঠিল,—না, না, না, এত বড় স্বার্থপর সে হইতে পারে না! হইতে চায়ও নাই কখনো! তবে—তবে? একটা কূল-হারা অসীম অকূলে তাহার সর্ব্ব-হারা মন দারুণ নৈরাশ্যে অতি ক্ষুদ্র একটু আশ্রয় খুঁজিয়া ভূতের মত অন্ধভাবে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমি একেবারে অমানুষ নই, সুষমা। সম্প্রতি আমার ব্যবহার দেখে তুমি হয়তো আমায় রাক্ষস মনে করছ। কিন্তু সত্যিই আমি রাক্ষস নই। কি করবো, বল? আমি যে কি বিষম বিপদেই পড়েছি, কোন দিকে সামঞ্জস্য আনতে পারছি না। নিজের সঙ্গে আমি অহরহ যুদ্ধ করছি। তোমার কাছে মুখ দেখাতে সঙ্কোচ বোধ করি, তাই হামেশা তোমার কাছে আসতে পারি না—তোমায় তাচ্ছল্য করে নয়। তোমায় দেখলে আমার কি মনে হয়, জানো? তোমার এ-জীবনটাকে আমি আমার সঙ্গে মিশিয়ে ধরে সেটাকে একবারে ব্যর্থ দুর্ব্বহ করে তুলেছি। তবু একটা জিনিষ মনে রেখো, তুমি যে কত-বড় ত্যাগী, কত উঁচুতে তুমি আছ, তা আমিও বুঝি। এই স্বার্থের দুনিয়ায় তুমি নিজের পানে একেবারে না চেয়ে কি-ভাবে আত্মবলি করেছ, তা আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝি, আর সে-জন্যে তোমায় যে কি শ্রদ্ধা করি আমি, তা বল্‌লে তুমি বিশ্বাস হয়ত করবে না।

কৃতজ্ঞতায় সুষমার দুই চোখে জল ছাপিয়া আসিল। মাথা নত করিয়া ভূমির দিকে সে চাহিয়া রহিল। চোখের জলে দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। অভয়াশঙ্কর ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পায়ের ধ্বনি সুষমার কাণে যেন কোন্ সুদূর দেশের পার হইতে একটা মুক্তির আভাষ আনিয়া দিল। সে একেবারে পাগলের মত ভূমে বসিয়া পড়িল, বসিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিল। তাহার প্রাণ-মন ডুকরিয়া কাঁদিয়া বলিল—ওগো ভুল গো, তোমার ভুল। আমি ত্যাগী নই, ত্যাগী নই, এ মন আমার স্বার্থের বিষে ভরিয়া আছে! শ্রদ্ধা চাই না গো, আমি তোমার শ্রদ্ধা চাই না, শুধু ভালবাসা, একটু সহানুভূতি, একটু মমতা—ভালবাসার একটু অঞ্জন চোখে মাখিয়া আমার পানে চাহিয়ো—একটু শুধু মমতার দৃষ্টির প্রত্যাশী আমি গো!

৬

তার পর কয়েকটা দিন মন্দ কাটিল না। নিখিল হাঁফ ফেলিবার একটু অবসর পাইল, সুষমাও তাহার পিপাসাতুর মনটাকে তৃপ্তির সুধা পান করাইয়া বাঁচিল।

দুই-তিন মাস পরের কথা বলিতেছি। সেদিন দুপুর বেলায় নিখিল পড়িবার ঘরে বসিয়াছিল—মাষ্টার মহাশয় খাতায় রুল টানিয়া দিতেছিলেন; রুল টানা হইলে তাহাকে হাতের লেখা লিখিতে হইবে। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আজ চারখানা লেখা লিখতে হবে, নিখিল, বুঝলে? ইংরিজি টানা একটা, বড় এ-বি, ছোট এ-বি, আর বাংলা একটা। বুঝলে? তার পর হাতের লেখা হলে অঙ্ক কষবে। আজকে পড়া নেই, সকাল-সকাল ছুটি পাবে।

নিখিল বলিল,—কেন মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—আজ চারটের পর বাড়ীর সামনে মাঠে বাঁশ বাজি হবে—দেখবে।

নিখিল বলিল,—বাঁশ বাজ কি, মাষ্টার মশায় ?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—সে দেখো তখন। একটা বাঁশ নিয়ে তার উপর একজন মানুষ চড়ে ছুলবে, খেলা দেখাবে, বাঁশটা পুঁতবে না, অথচ—

নিখিল বিস্মিতভাবে কহিল,—পড়ে যাবে, না ?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—না।

নিখিল অবাক হইয়া ভাবিতে বসিল। কল্পনা তাহার হাত ধরিয়া এক অপূর্ব্ব ক্রীড়া-মঞ্চের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। একটা বাঁশ লইয়া না পুঁতিয়া মাটীতে শুধু খাড়া রাখিয়া তাহার উপর চড়িয়া নানারকমের কসরৎ দেখাইবে! বাঁশ বাজির নামও সে কখনো কাণে শোনে নাই তাই কল্পনার সাহায্যে সে ব্যাপারটায় স্পষ্ট ধারণাও কিছু করিতে পারিল না। তবু সে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল—ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখের সাম্‌নে বাহিরের জগৎ একটা মস্ত বাঁশের ডগায় দোল্ খাইতে লাগিল—কল্পনা তাহাতে আর কোন-রকম রং ফলাইতে না পারিয়া সেই দোদুল জগৎটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ বাহিরে একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল—এই বাড়ী, বাবা ?

এ কি, এ যে পরিচিত স্বর! এ স্বর সোনার না ?

নিখিল উঠিয়া অতিশয় সন্তর্পিত পদক্ষেপে মাষ্টার মহাশয়ের অলক্ষ্যে জানালার পিছনে আসিয়া উঁকি দিয়া পথের পানে চাহিল। সত্যই ত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া ঐ যে সোনা আর সোনার বাবা। সোনা বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার বাবার হাত ধরিয়া তাহাদেরি বাড়ীটার পানে চাহিয়া আছে। কাহাকে খুঁজিতেছে সে? কি চায়? নিশ্চয় নিখিলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। তাই ত, নিখিল এখন কি করে? দেখা দিবে কি? আহা, কতদূর হইতে সে আসিয়াছে! কিন্তু বাবা যদি দেখিতে পায়? তাহাকে সোনার সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া বাবা যদি সোনাকে আর সোনার বাবাকেও তীব্র তিরস্কার করেন! নিজের মার সে সহ্য করিতে পারে, তিরস্কারেও কিছুই আসিয়া যায় না—কিন্তু ও বেচারীরা অনর্থক কেন বিনা-দোষে বকুনি খাইয়া মরিবে? শিমুলতলায় সেই সাঁওতালী ছেলে-মেয়েগুলার দুর্দ্দশার কথা তাহার মনে পড়িল। কি লাঞ্ছনাটাই না তাহারা ভোগ করিয়াছিল! অথচ তাহারা কোন দোষে দোষী ছিল না ত!

নিখিলের প্রাণটা অধীর হইয়া উঠিল। এই গ্রামখানির মধ্যে ঐ একটি মাত্র প্রাণীর বাড়ীর লোকদের সে জানে, শুধু—তাহারা নিখিলের কি সমাদরই না করিয়াছিল! আর সে? এমনি করিয়া একটা দেওয়ালের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়াই তাহাদের নীরবে বিদায় দিবে!

একটা কথা চকিতে তাহার মনে হইল। যদি উহারা বাড়ীর মধ্যে ঢোকে? ঢুকিয়া নিখিলের সঙ্গে দেখা করিতে চায়? কথাটা মনে হইতেই ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। উহারা ত জানে না, তাহার বাবার মেজাজ কেমন!

নিখিল ধীরে ধীরে পা টিপিয়া বাহিরে গেল। যাইবার সময় অত্যন্ত সতর্কভাবে মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিয়া গেল,—

মাষ্টার মহাশয় তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন কি না! না। মাষ্টার মহাশয় নিবিষ্ট মনে তখনো খাতায় রুল টানিতেছিলেন,—একটা, দুইটা, পাঁচটা, সাতটা পাতায় রুল টানিয়াই চলিয়াছেন। খাতাখানা নূতন বাঁধা হইয়াছিল—মাষ্টার মহাশয় সব পাতা-গুলাতেই রুল টানিয়া দিবেন, এখনি! তবে আর কি! নিখিল সতর্ক ভঙ্গীতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ যে সোনা দূরে দাঁড়াইয়া তাহার বাবাকে কি বলিতেছে।

চারিধারে চাহিয়া খুব সতর্ক মৃদু স্বরে নিখিল ডাকিল—সোনা—

সোনা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—রাজপুত্তুর—ঐ যে! সে বনমালীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—ঐ যে বাবা, রাজপুত্তুর। বলিয়াই ছুটিয়া সে একেবারে নিখিলের কাছে আসিল।

নিখিলের বুক তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে বলিল,—কোথায় যাচ্ছ তোমরা, সোনা?

হাসিয়া সোনা বলিল,—তোমাদের বাড়ীই দেখতে এসেচি ভাই, আমি। বাবাকে কত বললুম, বাবা কিছুতেই আসছিল না। শেষে খুব কাঁদতে লাগলুম—তখন মা বাবাকে বললে,—যাওনা গা নিয়ে—হুঁ-হুঁ, কেমন চলে এসেছি।

শুনিয়া আনন্দে মন ভরিয়া উঠিলেও ভয়ে নিখিল সারা হইয়া গেল। সোনা তাহার কাছে আসিয়াছে,—তাহার সঙ্গে খেলা করিবে বলিয়াই আসিয়াছে! কিন্তু সে—কি করিয়া খেলে সে? তাহার যে হাত-পা বাঁধা—এখন লেখা-পড়ার ঘণ্টা—খেলিবার অবসর কৈ? তা ছাড়া বাবা বাড়ীতে আছেন! সোনার সঙ্গে এ-বাড়ীতে খেলা করা—সে যে অসম্ভব ব্যাপার।

সোনা বলিল,—চল না ভাই, তোমার মাকে দেখে আসি। আমার মাকে দেখেচ ত—তোমার মাকেও ভাই, আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। আর তোমার বাবা—রাজা। তাঁকেও দেখবো, ভাই।

সর্ব্বনাশ! সোনা এ বলে কি! তীব্র নৈরাশ্য নিখিলের বুকে পাহাড়ের মত প্রচণ্ড ভার লইয়া জমিয়া উঠিল। চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। সোনার মনের এত-বড় আশা কি করিয়া দুই হাতে সে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়! কিন্তু হায়রে, সে যে একেবারে নিরুপায়!

ভিতর হইতে মাষ্টার মহাশয় ডাকিলেন,—নিখিল—

নিখিল ভড়কিয়া গিয়া বলিল,—এখন যাই ভাই, সোনা। মাষ্টার মশায় ডাকচেন—আমায় এখন হাতের লেখা লিখতে হবে কিনা। তুমি ভাই, বাড়ী যাও। আমি ওবেলায় তোমাদের ওখানে যাব'খন।

—তোমার মাকে দেখাবে না, ভাই? সোনার স্বর অভিমানে ভরিয়া উঠিল।

অত্যন্ত আদরে সোনার ছোট হাত দুখানি ধরিয়া নিখিল বলিল,—এখন নয় ভাই, আর-একদিন দেখাব। আমি এখন আসি, সোনা,—হাতের লেখা লিখতে হবে আমাকে। তুমি ভাই এখন বাড়ী যাও।

কথাটা বলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে নিখিল ছুটিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কাছে চলিয়া গেল। সোনা সেইখানেই হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল—ছেলেমানুষ অত-শত না বুঝিলেও,

তাহার মনে হইতে লাগিল, বুকের মধ্যে কি একটা যেন ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার দম বন্ধ করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে!

সোনা এক পাও নড়িল না দেখিয়া বনমালী বলিল,—আয় সোনা, বাড়ী যাবি না?

সোনা প্রায় কাঁদিয়াই জবাব দিল,—না বাবা, একটু থাকি বাবা।

বনমালী বলিল,—কি হবে মা থেকে! শুনলি ত, তোর রাজপুত্তুর এখন লেখাপড়া করছে। বড় লোকের ছেলে—ভদ্দর ঘরের—লেখাপড়া না করলে চলবে কেন মা?

সোনা কোন জবাব না দিয়া হতাশ নয়নে গৃহের প্রকাণ্ড দ্বারের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ঐ দ্বার-পথেই নিখিল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

বনমালী বলিল,—আয় না সোনা, বাড়ী আয় না। তোর রাজপুত্তুর ত বিকেলে যাবে, বললে!

অভিমান-গাঢ় স্বরে সোনা বলিল,—না।

বনমালী বলিল,—এখন লেখাপড়ার সময় কি খেলা করে?

তবুও সোনার সেই একই উত্তর,—না।

বনমালী তখন পথের ধারে যে-একটা ঢিপি ছিল, তাহার উপর বসিল; আর সোনা কি সে অধীর দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড বাড়ীটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

কতক্ষণ এমনি ভাবে কাটিবার পর দামু বাহিরে কোথায় যাইতেছিল, হঠাৎ বনমালীকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল,—তোমায় কোথায় দেখেচি না? তা এখানে কাকে খুঁজচ?

বনমালী বলিল,—আমার নাম বনমালী। সেই যে তোমাদের খোকাবাবু একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন না—

দামু বলিল,—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি দাদাবাবুকে নিয়ে আসছিলে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হলো—না? তা এদিকে আজ কোথায় এসেছিলে?

বনমালী উঠিয়া একটা আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া বলিল,—এইখানেই এসেছিলুম। মেয়েটা ক'দিন বায়না নিয়েছিল বাবুদের বাড়ী দেখবে বলে। আজ এমন ঝুলোঝুলি বাধিয়ে দিলে যে না এসে আর পারলুম না।

দামু বলিল—দাদাবাবু জানে?

বনমালী বলিল—হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন। এসেই চলে গেলেন,—বলে গেলেন, এখন লেখা-পড়া করছেন কি না, তাই চলে গেলেন।

দামু বলিল,—হ্যাঁ, এখন লেখাপড়া করছেন। এখন যে বেরুতে মানা আছে বাবুর—

বাধা দিয়া বনমালী বলিল,—তাই বোঝাচ্ছিলুম ওকে যে এখন চ,—বিকেলে খোকাবাবু আমাদের ওদিকে যাবেন বললেন ত, তা মেয়েটা কিছুতে শুনবে না—বলে, রাণীমাকে দেখব—খোকাবাবুকে ও রাজপুত্তুর বলে কি না, বড্ড ভালবাসে।

হাসিয়া দামু বলিল,—বেশ মেয়েটি। রাণী-মাকে দেখবে? আচ্ছা, এসো। আমার ঘরে এসে তুমিও একটু তামুক খেয়ে যাও, আমি ওকে রাণীমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি—

বনমালী বলিল,—ওরে সোনা, চ'—তাহলে তোর রাণীমাকে দেখেই যাবি চ'।

বনমালী ও সোনাকে লইয়া দামু নিজের

ঘরে আসিল্। এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বনমালীর হাতে হুঁকাটা দিয়া সে সোনাকে বলিল,—এসো খুকী আমার সঙ্গে। তোমার রাণীমার কাছে নিয়ে যাই। রাণীমা দেখবে, এসো।

প্রসন্ন চিত্তে সোনা বলিল,—রাজপুত্তুর?

দামু হাসিমুখে বলিল,—রাজপুত্তুর যে এখন লেখাপড়া কচ্ছে, মা।

সোনাকে লইয়া দামু অন্দরে গেল। সুষমা তখন রান্নাঘরের দালানে খাইতে বসিয়াছিল। দামু সোনাকে আনিয়া অদূরে দালানের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া বলিল,—ঐ তোমার রাণী-মা। দেখেচ?

দামুর সঙ্গে অপরিচিতা একটি বালিকাকে দেখিয়া সুষমা বলিল,—এ মেয়েটি কে, দামু?

দামু এ বাড়ীর বহু-পুরাতন ভৃত্য। তাই তাহার সম্মুখে সুষমার কোনদিনই সঙ্কোচ ছিল না। দামু সুষমার দিকে একটু আগাইয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—সেই যে ঝড়ের রাত্রে সে-মাসে দাদাবাবুর বাড়ী আসতে খুব রাত হয়ে গিয়েছিল না? তা দাদাবাবু এদের বাড়ীতেই ছিলেন তখন! এই মেয়েটি আজ এসেছে রাণীমাকে দেখতে। কথাটা বলিয়া দামু মৃদু হাসিল,—পরে সোনার দিকে চাহিয়া হাসি-মুখেই বলিল,—এই তোমার রাণী-মা, খুকী, দেখেচ!

সোনা অবাক হইয়া গিয়াছিল। এই রাণী-মা! তাহার মারই মত সাদা-সিধা এক-খানি সাদা কাপড় পরা, তবে রংটা খুব ফর্সা, আর গায়ে সোনার কয়েকখানা গহনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! এই রাণী-মা? সে ভাবিয়াছিল, দেখিবে, রাণী-মার মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, পরণে বড় বড় জরির ফুল-বসানো রাঙা কাপড়, আর রাণী-মা অমনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আশে-পাশে কত দাস-দাসী চামর ঢুলাইতেছে! তাহার পরিবর্ত্তে এ কি! রাণী-মা ঐ মাটীর উপরই একখানা কি-রকম ও আসন পাতিয়া তাহাতে বসিয়া ভাত খাইতেছেন!

প্রথমটা বিস্ময়ে তাহার কথা ফুটিল না। সুষমা দামুকে বলিল,—ওকে ঐখানে একখানা আসন-টাসন কিছু পেতে দাওনা, দামু—ও বসুক!

সুষমার কথা-মত দামু আসন পাতিয়া সোনাকে তাহাতে বসিতে বলিল, সে কুণ্ডলী পাকাইয়া আঁচলের ডগাটা মুখের মধ্যে পুরিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

দামু বলিল,—বসো খুকী—

খুকীর সে সঙ্কুচিত অপ্রতিভভাব তবুও কাটিল না।

সুষমা যখন বলিল—আসনে বসো খুকী—তখন তাহার শিশু চিত্তের অত্যন্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত ভাব লইয়াই আসনে সে বসিয়া পড়িল, একাগ্র দৃষ্টিটুকু কিন্তু রাণীমার উপরই ন্যস্ত রহিল।

দামু বলিল—তুমি তাহলে বসো, খুকী। আমি বাইরে তোমার বাবার কাছে যাই।

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া সোনা সম্মতি জানাইল।

সুষমা আহার শেষ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া সোনাকে লইয়া নিজের ঘরে গেল। অভয়াশঙ্কর তখন ঘরে বসিয়া কি-সব কাগজ-পত্র দেখিতে-ছিলেন। সে-ঘরে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া সোনাকে লইয়া সুষমা তখন তাহার

বসিবার ঘরে গেল। সেখানে গিয়া সোনাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি খুকী?

সোনা কুণ্ঠিতভাবে কহিল,– আমার নাম স্বর্ণময়ী। মা-বাবা কিন্তু আমাকে সোনা বলে ডাকে।

তারপর সুষমা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল,—তাহারা কোথায় থাকে, সে বাড়ী এখান হইতে কত দূরে? বাবা কি কাজ করে—মা সারাদিন কি করে? সে দুরন্তপনা করে কি না—এমনি করিয়া সোনাদের সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটী খবর সংগ্রহ করিয়া দুই দণ্ডেই সুষমা সোনাকে আপনার করিয়া ফেলিল। তারপর নিখিলের সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল—নিখিল মাঝে-মাঝে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়, সোনার মা নিখিলকে কত জিনিষ খাইতে দেয়, তাহাদের কত গল্প বলে, নিখিল সোনার সঙ্গে কেমন খেলা করে। নিখিলের কথা বলিবার সময় কি গভীর শ্রদ্ধায়, অনুরাগে, কি বিপুল গর্ব্বে বালিকার ছোট্ট বুকখানি ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহা সুষমার নজরে এড়াইল না। সে বুঝিল।

বুঝিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—নিখিলের সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়েছে? তোমার রাজপুত্তুর—?

সোনা বলিল,—হ্যাঁ। তারপর তাহার চোখ ছল-ছলিয়া উঠিল; সে বলিল,—রাজপুত্তুর চলে গেল,—আমায় বললে, তুমি এখন বাড়ী যাও, বলেই দৌড়ে চলে গেল।

সুষমা ইহার অর্থ বুঝিল, বলিল—এখন সে লেখাপড়া করছে কি না! আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সুষমা তখন একটা দাসীকে ডাকিয়া বলিল, -নিখিলকে একবার ডেকে আন্‌তো রে এখানে—বল্‌গে যা, মা একবার ডাক্‌চে, আবার এখনই চলে যাবে।

দাসী চলিয়া গেল। সুষমা তখন কাচের আলমারি খুলিয়া বড় একটা পুতুল বাহির করিয়া সোনার হাতে দিল। সোনা পুতুল পাইয়া আনন্দে সেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

সুষমা বলিল,—পুতুল পছন্দ হয়েছে ত?

ঘাড় নাড়িয়া এক মুখ হাসিয়া সোনা বলিল,—হ্যাঁ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জাপানী শ্রাদ্ধবাসরে

তোকাজি মন্দিরের বিপুল ঘণ্টা ক্ষণে ক্ষণে গম্ভীর সুরে নিনাদিত, যেন মিনিট-তোপ। ধাতুময় ঘণ্টার তীব্র গম্ভীর ধ্বনি হ্রদের জলে কাঁপন তুলে গৃহছাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিরিবেষ্টনীয় শ্যামল বুকের উপর সকরুণ আর্ত্তনাদে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

আজ তরুণ ছাত্র য়োকোডির স্মৃতি-তর্পণ ভারি সুন্দর বড়ই মর্ম্মস্পর্শী এই অনুষ্ঠান। আদিম উৎপত্তি চীনে, কালক্রমে জাপানী বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অনুষ্ঠান ব্যয়সাধ্য, য়োকোডির পিতা-মাতা দরিদ্র। তবুও স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের স্বেচ্ছাদত্ত

অর্থে কিছুরই ক্রটি নাই। ইজুমোর জেন্‌-সম্প্রদায়ের সকল বিখ্যাত মন্দিরের ধর্ম্মযাজকেরাই উপস্থিত। বিরাট মন্দিরের সমুচ্চ বেদীর দক্ষিণে ও বামে শহরের যাবতীয় শিক্ষক ও ছাত্র উপবিষ্ট। মেঝে পুরু মাদুরে ঢাকা, তার উপর তাঁরা বসেছেন হাঁটু গেড়ে। বাহিরে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী, তার ধাপে ধাপে হাজার জোড়া জুতা আর খড়ম।

মন্দিরের মুখোমুখি সিংহদ্বার। তার সামনে এক মঞ্চ। মঞ্চের উপর একটি মুক্তদ্বার আন্‌কোরা নূতন আলমারি—বুৎসুদান। তার মাঝে মৃত বালকের নামাঙ্কিত সোনালি-গালাকরা কাঠের ফলক ঝিকমিক করছে। এর নাম ইহাঈ। বুৎসুদানের সম্মুখে তেপায়ার উপর ধূপাধার, তার আশেপাশে ফলফুল পিঠে ও তণ্ডুলের নৈবেদ্য। বুৎসুদানের দুই পাশে মনোরম দীর্ঘাকার পুষ্পাধারে ফুটন্ত পুষ্পস্তবকের অনুপম সজ্জা। মন্দির-অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড দীপাধারে দীপ প্রজ্জালিত। দীপাধারের সুমার্জ্জিত কাংস্যদণ্ডে সঞ্চরমান ভয়াল সরীসৃপের উৎকীর্ণ চিত্র—উর্দ্ধগামী বা অধোগামী ড্রাগন। ধূপধূম উঠছে কুণ্ডলাকারে নানা আকারের পাত্র হতে—কোনটি কূর্ম্মের ন্যায়, কোনটি বা বৌদ্ধপুরাণ-কথিত ধ্যানী ক্রৌঞ্চের ন্যায়। এ সবের পশ্চাতে বিরাট বেদীর আধ-আলো আধ-অন্ধকারে বোসে ভগবান বুদ্ধ হাসছেন পরিপূর্ণ বিরামের হাসি।

বুৎসুদান ও দীপাধারের মধ্যে ছোট একখানি টেবিল। তার দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ পুরোহিতগণ জানুর উপর ভর দিয়ে মুখোমুখি উপবিষ্ট। সারি সারি মসৃণ মুণ্ডিত মস্তক, সিঁদুর-রঙের ঝলমলে রেশমী পোষাক আর সোনার পাড়-বসানো জোব্বা, যেন একখানি রঙিন ছবি।

বিপুল ঘণ্টা নীরব হল। লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে আহার্য্য-নিবেদন—সেঙাকি প্রার্থনা—উচ্চারিত হল। তারপর সহসা করুণ সুরে এক আবৃত্তি সুরু হল তানলয়সহযোগে। তাল দেওয়া হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড দারুময় সোনালি-গালাকরা মাছের মাথার উপর। জাপানী ভাষায় তার নাম মোকুগ্যো। আবৃত্তিটি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের এক পরিচ্ছেদ। তাতে পরম দেবতার আবাহন-গীতি অপূর্ব্ব সুন্দর—

"নির্ম্মল যাঁর নয়ন, দৃষ্টি যাঁর দয়া মমতা ও মাধুর্য্যে ভরা, হে সুন্দর! বড় সুন্দর তোমার নয়ন ও আনন!

"তুমি পবিত্র! তোমার আলোকে কোথাও কলঙ্ক নাই—তোমার জ্ঞানে কোথাও ছায়া নাই! চিরদিন তুমি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল—তোমার মহিমা কে ব্যাহত করিবে? সূর্য্যের ন্যায়, তোমার করুণার পথে, তুমি অহরহ বিশ্বভুবন আলোকিত করিতেছ!"

নায়কদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট মধুর ও সমুচ্চ। পুরোহিতদলের অনুবৃত্তি গম্ভীর অনুচ্চ সুরে। তাদের কণ্ঠে ঐ মহাসঙ্গীতের আবৃত্তি যেন অনন্ত পারাবারের অস্ফুট কলরোল।

মোকুগ্যো নীরব। মহাসঙ্গীতের সমাপ্তি। নায়কেরা এবং বিখ্যাত মন্দিরের প্রধান পুরোহিতেরা একে একে ইহাঈ-এর নিকট উঠে গেলেন। আনত হয়ে প্রণাম কোরে সূত্র আবৃত্তি করতে করতে একটি ধূপ জ্বালিয়ে

তাঁরা স্বল্পায়তন কাংস্যাধারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

ক্ষণকাল সভা নিস্তব্ধ। তারপর সুরু হল মৃত বালকের আত্মার উদ্দেশে সাইবুন বা অভিনন্দন-পাঠ। প্রথমে ছাত্রেরা, পরে শিক্ষকগণ। স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরই অভিনন্দন-পাঠের অধিকার। ক্রমান্বয়ে তারা সমুচ্চ বেদীর সামনে ছোট টেবিলটির কাছে এগিয়ে গিয়ে দেবোদ্দেশে প্রণাম কোরে বুকের কাছ থেকে এক একখানি কাগজ বার কোরে পাঠ করতে লাগলো। মনে হল যেন করুণ মিষ্ট সুরে মন্ত্রপাঠ চলছে। সকলেই বলতে লাগলো, যে চোলে গেছে তার প্রতি যারা পোড়ে আছে তাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসার কথা। সে-সব কথা শোকে করুণ, স্নেহে কোমল এবং অনির্ব্বাণ আশায় মর্ম্মস্পর্শী। সবার শেষে উঠলো শান্ত একটি মেয়ে। সে নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রী। তার কণ্ঠস্বর যেন পাখীর কাকলি, এমনি স্নিগ্ধ মধুময়।

এবার শিক্ষকদের পালা। ছোট টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। তাঁর নাম কাতায়ামা। তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়, চীনা ভাষার শিক্ষক। উপরন্তু তিনি একজন কবি। ছাত্রেরা তাঁকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। সভা একেবারে স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো তিনি যখন অভিভাষণ সুরু করলেন—কো-শিমানে-কেন্-জিঞ্জো-চুগাক্কো-য়ে'-নেন্-সেই······

"মেইজি-যুগের চতুর্ব্বিংশ বর্ষে দ্বাদশ মাসে ত্রয়োবিংশ দিবসে শিমানেকেন-স্থিত জিঞ্জো-চুগাক্কোর শিক্ষক, আমি কাতায়ামাযোকেই, শোকার্ত্ত হৃদয়ে মৃতের শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া আমার ছাত্র য়োকোজি তোমিসাবুরোর আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করিতেছি—

"তোমার অজ্ঞাত নয়, বিভিন্ন সময়ে দশ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট ছাত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু যে-কোনো বিদ্যালয়ে যে-কোনো শিক্ষকের তোমার মত শিষ্যলাভ ভাগ্যের কথা—তোমার ন্যায় সহিষ্ণু, তোমার ন্যায় পরিশ্রমী, তোমার ন্যায় নিষ্ঠাবান, সর্ব্বথা তোমার ন্যায় সতর্ক ও বুদ্ধিমান শিষ্য। বিদ্যালয়ের সকল নিয়ম তুমি মানিয়া চলিয়াছ, কোনো নিয়ম কখনো লঙ্ঘন কর নাই—তোমার ব্যবহারে কখনো দোষ স্পর্শে নাই। সহপাঠীদের মধ্যে তুমি ছিলে স্ব-তন্ত্র, স্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

"প্রাচীনকালে কিহোকু-দেশ অশ্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব না মিলিলে সে দেশের লোকে বলিত—অশ্ব নাই। আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে উত্তম ছাত্র অনেক আছে—অনেক তরুণ ও সুন্দর অশ্ব। হায়! কিন্তু সবার সেরাটিকে আমরা হারাইয়াছি।

"সপ্তদশ বৎসর বয়সে, শিক্ষালাভের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়ে, তুমি চলিয়া গেলে। এই অল্পকাল মধ্যে শিক্ষার দশটি ধাপের ছয়টি ধাপ অতিক্রম করিয়াছিলে! ভাবিলে দুঃখ হয়! আরো ক্লেশ হয় যখন মনে পড়ে তোমার শেষ পীড়ার কারণ পাঠে তোমার অক্লান্ত অনুরাগ। যে-উপাদানে তুমি গঠিত

ছিলে তা দুর্লভ, অসাধারণ ছিল তোমার চরিত্র। তার সাহায্যে নিঃসন্দেহ তুমি গৌরবময় কল্যাণকর্ম্মে সার্থকতা লাভ করিতে, পিতৃপিতামহের নাম উজ্জ্বল করিতে পারিতে। কিছুই হইল না, সব পণ্ড হইল—বয়োবৃদ্ধির পূর্ব্বেই তরুণ বয়সে অকালে তুমি চলিয়া গেলে! এ দুঃখ রাখিব কোথায়?

"মানস-নয়নে দেখিতেছি, ক্লাসে বসিয়া আছি। তুমি হাত তুলিয়াছ, কি একটা প্রশ্ন করিবে। তারপর তোমার ছোট ডেক্সের উপর ঝুঁকিয়া তোমার এই দুর্ভাগা প্রাচীন শিক্ষকের মুখের উত্তর লিখিয়া লইতেছ! আবার দেখিতেছি শ্রেণীবদ্ধ বালক-দলে বন্দুক-কাঁধে সোজা দাঁড়াইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিতেছ! এখনো তোমার সহাস্য আনন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—যেন তুমি জীবিত রহিয়াছ! তোমার কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনিতেছি—যেন তুমি এইমাত্র স্তব্ধ হইলে! তবু জানি স্মৃতিতে ভিন্ন আর তোমার কণ্ঠস্বর শুনিব না, সে হাসি-মুখ আর দেখিবনা। ভগবান! কেন সেই বিকাশোন্মুখ তরুণ জীবনটিকে অকালে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিলে আর এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে কি প্রয়োজনে রাখিয়া গেলে! এ কী তোমার অবিচার! আমার দ্বারা তোমার কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে?

"তোমার সহিত আমার শিষ্যগুরুর সম্বন্ধ মাত্র। তবুও আজ আমার কত দুঃখ কত বেদনা! আমার পুত্রের বয়স চতুর্বিংশ, তোমাপেক্ষা সে অনেক বড়। সে অদূরপ্রবাসে, একান্ত নির্গুণ সে, তবুও তার স্মৃতি তার বৃদ্ধ পিতার অন্তরে নিয়তই জাগরূক। আর এই নম্র ধীর গুণবান মেধাবী বালকের তিরোধানে তার পিতামাতা ভাইভগ্নীর মনোভাব কে বর্ণনা করিবে! ভবিষ্যতেও চোখে জল আসে, অন্তর শোকে মুহ্যমান হয়, আর বলিতে পারি না।

"হায়! আমাদের পশ্চাতে ফেলিয়া তুমি চলিয়া গেলে! চিরদিনের মত চলিয়া গেলে! তোমার একাগ্রতা, তোমার সততা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণের নিকট দীর্ঘকাল আদর্শ হইয়া থাকিবে! এইমাত্র আমার সান্ত্বনা।

"আজ এখানে আমরা—তোমার শিক্ষকগণ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ—সমবেত হইয়া তোমার আত্মার কল্যাণকামনায় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছি। তুচ্ছ এই দান গ্রহণ করিয়া আমাদের স্নেহ-প্রীতিকে সার্থক কর।"

তারপর একটা রুদ্ধ বিলাপধ্বনি সহসা লুপ্ত হল প্রকাণ্ড মোকুগ্যোর বুম্‌বুম্ শব্দে। অমনি গায়কদলের নায়কেরা উচ্চকণ্ঠে নির্ব্বাণ-সূত্র আবৃত্তি সুরু করলেন—জন্ম-মরণের দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হবার গৌরব গীতি। মোকুগ্যোর ফাঁপরা আওয়াজ আর নায়কদের উদাত্ত স্বরের অনেক তলে শত শত কণ্ঠে উচ্চারিত গীতি সাগর-গর্জ্জনের ন্যায়!

"শো-গ্যো মু-জো, জে-শো মেপ্পো—সবই ক্ষণস্থায়ী, সবই ভঙ্গুর! জন্ম হইলেই মরণ নিশ্চিত! যেদিন জন্মিলে সেইদিনই তো মৃত্যুর আহ্বান পাইয়াছ! মরণেই আনন্দ, কারণ মরণে শান্তি।" *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Lafcadio Hearn হইতে

দ্বিতীয় শৈশব

করতে বোধন বরতে অকাল শৈশবে
বন্ধুরা আজ কোথায় তারা ? কই সবে।
অগস্ত্য তার আস্‌লো ফিরে আস্‌লো কি,
মগ্ন তরী আজ্‌কে হঠাৎ ভাস্‌লো কি ?
কালের রথের চক্র কি আজ ঘুরলো হে,
ছিন্নপাখা মানস মরাল উড়লো হে ?

শৈশবে এই ? কই সে তাজা বর্ণ কই
সূর্য্য-করে কই সে কাঁচা স্বর্ণ কই ?
আম-মুকুলে কই সে আকুল গন্ধ রে
কই সমীরে নৃত্য-দোদুল ছন্দ রে ?
প্রাণের সূতায় নবীনতার মাঞ্জা কই,
আনন্দে সে অসীমতার পাঞ্জা কই ?

ভোর ললিতে দূর বেহাগের সুর কেন,
দেব-প্রতিমায় এতই ভাঙা চূর কেন ?
নয় ত আঙুর, নিম্বফল এ তিক্ত যে,
রাজসূয়ের এ ভাণ্ডার হায় রিক্ত যে,
শুষ্ক বোঁটায় নামটী ফুলের রাখ্‌লে কে
চিত্ত-বলে ব্যঙ্গ ছবি আঁক্‌লে কে ?

এই শিশুতে সেই শিশুতে ভুল করা
মনকে সে যে ভুল বুঝিয়ে ভুল করা।
বিসর্জ্জনের ঠাটটি পড়ে আন মনে,
পূজার নিশির স্বপন দেখে, গান শোনে,
পশ্চিমেতে ডুব্‌ছে ছলছল্‌ রবি
চোখের জলে তুল্‌ছে বুড়া জলছবি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সঙ্কলন

নেপালে নেওয়ারদিগের ভাই পূজা

বাংলাদেশে যে পার্ব্বণকে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বলে, নেপালে তাকেই 'ভাইপূজা' বলে। বাংলার বাইরে নেপাল ছাড়া অন্য দেশে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'র রীতি আছে কিনা জানি না। কিন্তু এই পার্ব্বণের উদ্দেশ্য ও মাধুর্য্যের কথা ভাবলে স্বতই মনে হয় আমাদের এই নব জাগরণ—এই জাতীয় একতাসাধনের দিনে ইহা ভারতের জাতীয় উৎসব বলে গণ্য হওয়া উচিত। ইচ্ছা হয় এম্‌নি একটা উৎসবের দিনে ভারতের সকল দেশে প্রত্যেক বোন্‌ জাতী ধর্ম্মের দিকে না তাকিয়ে ভাইদের স্নেহে সিক্তিত করে মঙ্গলটীকা পড়িয়ে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ কামনা করুক।

নেপালে সকল জাতই ঠিক একই প্রথানুসারে 'ভাইপূজা' করে না। ব্রাহ্মণ ছত্রি প্রভৃতির নিয়ম এক-রকম, আর নেওয়ারদের প্রথা ভিন্ন। আমি আজ নেওয়ারদের ভাইপূজার কথাই বলব।

ভাই পূজা হয় সন্ধ্যার পর রাত্রে। ভাইপূজার দিন প্রথমে ঘরের মেঝেতে প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য এক একটী মণ্ডল আঁকতে হবে। মণ্ডল আঁকবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে জলের আলপনা দিয়ে তার উপরে তেলের দাগ দিতে হবে। এই তেলের দাগের উপরে আবার শুকনা চা'লের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রেখা টানতে হবে। মণ্ডলের বাইরে চার কোণে এবং ভিতরে ঠিক মাঝখানে কিছু কিছু ধান রেখে তার উপরে

আস্ত চাল রাখতে হবে। এই চাল তৈরী করতে খুব সাবধান হতে হবে যেন একটুও না ভাঙ্গে। সেই চালের উপরে ফুল* ও ধূনা রাখতে হবে। এই সব রেখে তারপর সকলের উপরে রাখতে হবে 'যজ্ঞন্‌কা।' আঙ্গুলে তৈরী ছোট পৈতার নাম ও দেশের ভাষায় বলে 'যজন্‌কা।'

এর পরে ভাই মণ্ডলের দিকে মুখ করে বসবে। বোন তখন 'সগুন্' বা 'সগোন' এনে একে একে ভাইদের হাতে তুলে দেবে।‡ মদ, মাংস, ডিম, আদা, রসুন ইত্যাদি মিশিয়ে তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করে 'সগুন্' তৈরি করা হয়। ভাই ভক্তি ভরে তাহা হাতে নিয়ে আপন মাথায় স্পর্শ করাবে, এবং সেই সঙ্গেই (বোন্ বড় হলে) প্রণাম করবে। বোন্ যদি ছোট হয়, তবে বোন্ ভাইকে প্রণাম করবে। তারপর ভাই সেই 'সগুন্' খাবে। খাওয়ার নিয়ম এক একটি জিনিষ নিয়ে—তার সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাবে। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম।+ যাঁরা দীক্ষিত—তাঁদের প্রত্যেকটী জিনিষ খাবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। কোন্ জিনিষটী আগে খেতে হবে, আর কোনটী পরে খেতে হবে তারও নিয়ম আছে। প্রথমে ডিম ইত্যাদি এবং শেষে আদা ইত্যাদি খাওয়ার নিয়ম। 'সগুন্' দেওয়া হলেই বোন্ ভাইকে 'টীকা বা সিন্' (অর্থাৎ ফেঁাটা) দেয়। শ্বেত চন্দন, 'অক্ষতা' (চাল) দই এই তিন জিনিষ দিয়ে ফেঁাটা দিতে হয়। আগে চন্দন দিয়ে, তারপর দই ও 'অক্ষতা' দিয়ে কপালে ফেঁাটা দিতে হবে। 'সগুন্' খাবার সময় বোন্ খই এবং নানান্ ফলের টুকরা ভাইয়ের মাথায় এমন ভাবে ঢেলে দিবে যেন সেগুলি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এর পরে মাটিতে যা পড়ল তা ঝাঁটি দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। তারপর একটি শালপাতার 'দোনা' অথবা 'টপরা' অথবা 'ঠাহরের' (ঠোঙ্গাকৃতি) মধ্যে নানান্ রকম ফল (তার মধ্যে আক্‌রোট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিমিরা লেবু থাকা দরকার) একটী শুপারি, পয়সা 'যজন্‌কা' (এটা ব্যবহারের উপযুক্ত) এবং ফুলের মালা রেখে সেই ঠোঙ্গাটী ভাইকে দিতে হবে। ভাই তাহা গ্রহণ করে রেখে দিবে।

এর পরে কয়েকটী পল্‌তে একত্র করে তার দুই মুখে আগুন ধরিয়ে বোন্ তাহা দু'হাতে ধরে ভাইয়ের নিকট আনবে। ভাই সেই আগুন স্পর্শ করে হাত মাথায় ছোঁয়াবে। বোন্ তারপর সেই পলতেগুলি মণ্ডলের উপর আড়াআড়ি করে এমন ভাবে রাখবে যেন চার জায়গায় ধানের উপর জ্বলতে থাকে। তখন মণ্ডলের উপর ধূপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। এর পরে ঝাড়ু দিয়ে সব পরিষ্কার করে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু সল্‌তে রাখবার পরে এবং পরিষ্কার করবার মধ্যে বাতি নিভতে পারবে না।

সব পরিষ্কার হলে ভাই নিমন্ত্রণ খাবে। এই খাওয়াটা দিবে বোন্। কিন্তু এ নিমন্ত্রণে ভাত খাওয়া চল্‌বে না। যে সব জিনিষ খাওয়া হয় তার মধ্যে চিড়াই প্রধান।

খাওয়ার শেষে ভাই বোন্‌কে টাকা ও শাড়ী ইত্যাদি উপহার দেয়।

ভাই পুজার দিন বোন্ সারাদিন উপবাস করে সব শেষ হলে তারপর খায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

পরিচারিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

---

* যে কোন ফুল রাখলে চলবে না। পাহাড়ে যাকে 'শুপরি' ফুল বলে তাই প্রশস্ত। তা না জুটলে 'ছাইপত্রি' বা গেন্ধা ফুল দরকার।

নেওয়ার ভিন্ন অন্য জাতের ভিতরে 'সগুন্' খাওয়ার নিয়ম নাই।

+ আজকাল গৃহস্থঘরে কেবল নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য অতি সামান্য পরিমাণে 'সগুন্' ব্যবহৃত হয়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৮ [একাদশ সংখ্যা

প্রত্যাবর্ত্তন

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দিদিমার বোনঝির বাড়ী-ঘর সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিমু মুগ্ধ হইল। গরিবের ঘরের মেয়ে সে—এমন সব বিলাস-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও বড় শোনে নাই। অরুণের মুখে বরুণাদের বাড়ীর যে-সব বর্ণনা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছিল, তাহাই ছিল তাহার ধনী-গৃহের আদর্শ। তারপর জলদ বাবুর বাড়ীর বর্ণনা ও দুর্গোৎসবের বিবরণ শুনিয়া হিমু ভাবিয়াছিল, তাঁহারা ইহাদের কাছে কিছুই নন্। দুইদিন ত সুধু বাড়ীখানার ঘর কয়টা প্রদক্ষিণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেই কাটিয়া গেল; তারপর বাগান। এত বড় বাগান, এত রং-বেরঙের ফুল, এত বিচিত্র পাতা-গাছ,—কোন গাছের পাতার রং সিঁদুরের মত রাঙা, কোন গাছের পাতা বা গুটাইয়া চক্রাকার ধরিয়াছে, কোন গাছের পাতায় ঘুঙুর-গাঁথা মলের মত বাজনা বাজে। এ-সব গাছ পাতা ও ফুলের অর্দ্ধেকের নাম ত হিমু জানেই না, চোখেও কখনো এ-সব দেখে নাই। চিড়িয়াখানায় কত বাহারে পাখী—ময়ূর, পায়রা,—হরিণ, খরগোস, গিনিপিগ, সাদা ইঁদুর আরো কত-কি। এ-সব দেখিয়া হিমুর আনন্দ হইত, আবার দুঃখও হইত। মনে হইত, অরুণ যদি সঙ্গে থাকিত! ভাল জিনিষটি প্রিয়জনকে না দেখাইতে পারিলে মানুষের যথার্থ সুখ হয় না। তা ছাড়া এই বৃহৎ অপরিচিত রাজ্যে আনাড়ির মত সুধু হাতড়াইয়া বেড়াইতে তাহার ভাল লাগিতে ছিল না। গৃহকর্ত্রী দিদিমার বোন্ঝী প্রায় তাঁহার সমবয়সী। অনেক দিনের পর দেখা-শুনা হওয়ায় ও নিজের বর্ত্তমান সুখ স্বচ্ছন্দে দরিদ্র আত্মীয়কে দেখাইতে পাওয়ায় সুখী মনেই তাঁহাদের তিনি গ্রহণ করিলেন। হেমলতাও এই আনন্দময়ী সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়াই স্নেহমুগ্ধ হইল, শাশুড়ীকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, "মা এটিকে আমাদের বৌ

করে ঘরে নিলে হয় না? কি সুন্দর রূপ, দেখেচ! সব-চেয়ে সুন্দর চোখ দুটি।"

মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তেম্‌নি আমার কপাল কি না। সে ছেলে বিয়ে করে বৌ আন্‌বে, তবে আর ভাবনা ছিল কি? হাঁ বৌমা, ফুলু না আস্‌বে, লিখেছিল? তা এল কৈ?"

হেমলতা মৃদুস্বরে কহিল," যখন বলেচে তখন আসবেই। হয়ত আবার কিসের কাজে আটকে গেছে।"

"বাবা, আচ্ছা মা খুড়ী পেয়েছিল যাহোক্। বংশের মধ্যে একটা ছেলে, তবু সব এত অগ্যে-রাজ্জি! বিদ্বান মা ছেলেকে দিলেন দেশের কাজে উচ্ছুগ্‌গু করে। দেব্‌তার কাজে লোক মোষ-পাঁঠাই উচ্ছুগ্‌গু করে, জানি। ছেলে-বলি দিতে দেয়, এ ত কখনো শুনিনি। মায়ের এত দম্ভ—ভগবান্‌ও তাই নিচ্ছিলেন--ভাগ্যে কাকা ছিল তাই সে যাত্রা তরে এলো। আবার শুন্‌লুম, ছেলে স্বদেশী হয়েচে—কোম্পানি থেকে পুলিশ আস্‌বে ধর্‌তে! পুলিশে চোর-ডাকাতই ধরে নে যায়, তাই জানি,—এ কিরে বাবা!" বলিয়া গৃহিণী বিরক্ত মুখে বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন। যেন ইহার মূলে অনেকখানি বধূরই অপরাধ!

তা সে কথা তিনি মনে করিতেও পারেন। সুধু তিনি কেন, বাড়ীর সকলেই জানিত যে সেই যুবককে শাসন করিবার কিছুমাত্র শক্তি যদি এ-বাড়ীতে কাহারও থাকে ত সে তাহার খুড়িমারই। হেমলতার কথার উপর সে কখনও না বলিতে পারিত না। ছোটবেলায় কতদিন তাহাকে দুঃখ দিয়া সে নিজেই কাঁদিয়া হাট বসাইত। শেষ খুড়িমা আসিয়াই তাহাকে শান্ত করিত। তাই অভিমানে পূর্ণ হইয়া ঠাকুমা ভাবিতেন, বাহিরের লোক খুড়ী হইল আপন, আর হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তিনি হইলেন পর! ইহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইত। অথচ কেহ ভাবিয়া দেখিত না যে কতখানি সহিয়া কতদুর সাবধানে চলিয়া তবে হেমলতাকে এই অসাধ্য সাধন করিতে হইত।

প্রথম দেখাতেই হিমু হেমলতাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিল। হেম হাসিয়া কহিল, "আমি তোমার দিদি হই না, বৌদি হই।"

হিমু একটুখানি ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া তাচ্ছল্যের সুরে কহিল, "উঁহু, তুমিই দিদি।"

আলোকনাথকে সে যে ভ্রাতৃ-সম্বোধনে সম্মত নয়, কথার ভাবে যেন ইহাই বুঝাইল। হেম হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া স্নেহমাখা কণ্ঠে কহিল, "সেই বেশ। আমি দিদি, আর উনি বোনাই। কেমন?"

হিমু বুদ্ধিমতী, কিন্তু সাংসারিক অনেক জ্ঞানেই অনভিজ্ঞা। বিস্মিত হইয়া সে কহিল, "উনি?"

"হ্যাঁ গো, আমার স্বামী! আমি দিদি হলে তিনি তোমার ভগ্নীপতি হলেন না?"

হিমু অনাগ্রহভাবে কহিল, "হলেন ত।"

এই মেয়েটিকে পাইয়া হেমও যেমন খুসী হইয়াছিল, হেমলতাকে দিদি বলিয়া হিমুরও তেমনি আনন্দ হইয়াছিল। ইহাকে না পাইলে এত বড় জাঁক-জমকের মধ্যে কেমন করিয়াই বা হিমুর দিন কাটিত! হিমু ছোট বেলায় একবার থিয়েটার দেখিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য সাজ-সজ্জা—জরির পোষাক-পরা মুক্তার মালা

গলায় দোলানো সব রাজা আর রাণী। আসন গ্রহণ করিয়া হিমুর ভাবনা হইয়াছিল, এমন দৃশ্য কতক্ষণই বা আর দেখিতে পাইবে? যদি সারারাত্রি ধরিয়া চলিত, তবু হয়ত কতকটা ক্ষোভ মিটিতে পারিত। কিন্তু সে ভুল তাহার কত শীঘ্রই না ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! চঞ্চলা হিমু অভিনয়ের অর্দ্ধাংশ না হইতেই বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভাবিয়াছিল—এত দীর্ঘ কাল কি ঐ একঘেয়ে রাজা-রাণী ও রাজ-ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিতে পারা যায়? সে তখন লেখাপড়া জানিত না। গল্পের বিষয় কিছুই বুঝিতে ছিল না, সুধু দর্শক মাত্র। মনে হইল, অরুণের কাছে সে আজ কত ঋণী। নহিলে সেদিনের সহিত এদিনের আজ কোন তফাৎ থাকিত না। আলোকনাথের সুসজ্জিত লাইব্রেরি-কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে তাহার জ্ঞান-দাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। এ ঘরে বাংলা বইয়ের চেয়ে ইংরাজী বইই অধিক। বরুণা ইংরাজী জানে শুনিয়া বছর খানেক হইতে সে যে ইংরাজী শিখিতে সুরু করিয়া ছিল, তাহা আজ সার্থক বলিয়া মনে হইল। শিক্ষকের অভাবে কায দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে নাই; ছুটিতে অরুণের কাছেই যেটুকু যা' পড়া হয়, তারপর কোন দিক হইতে কোন সাহায্যই আর পায় না। দুই-চারিটা শক্ত কথা বা বিশেষ কোন কঠিন মীমাংসা-স্থল চিঠিতে লিখিয়া সে অরুণের কাছে জানিয়া লয়। মেয়ের আগ্রহে মালতী দেবীর একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাড়ার স্কুল-মাষ্টারকে ধরিয়া যদি এ বিষয়ে কোন সাহায্য পান! কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী দশনে অধর কাটিয়া বলিয়া ছিলেন,—"ক্ষমা দাও রাণু, শেষ কি মেয়ের সখের জন্যে কলঙ্ক কিনবে! একেই ত পাড়ার লোকে নিন্দে করে, এত-বড় থুবড়ো মেয়ে দেখে "

মালতী দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, থাক্, কাজ নাই গরীবের মেয়ের এত সখে!

এখানে সঙ্গী-অভাবে প্রথম দুই চারিদিন হিমুর একটু কষ্ট বোধ হইয়া ছিল। হেমলতা বিছানা ছাড়িয়া বড় একটা উঠিতে পারে না। তাহার সঙ্গে হিমুর মত চঞ্চল প্রকৃতি মেয়ের কতক্ষণই বা মিষ্ট লাগে! দেখিবার জিনিষ এত আছে যে দেখিয়া শেষ করা দায়—কিন্তু বিনা প্রশ্নে শুধু চোখের দেখায় তুষ্ট হওয়া তাহার স্বভাব নয়। এই অভাবটা যখন সে পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছিল, এমন সময় সহসা এক অতর্কিত বন্ধু-লাভ হইল। সে দিন সকাল বেলা ভিজা ঘাসের জলে পা দুটি ভিজাইয়া হিমু আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, পথে উদ্যান-বায়ু-সেবনেচ্ছু আলোকনাথের সহিত দেখা হইল। হিমুর আঁচল-ভরা ফুলের রাশি—ইঁহারই বাগানের ফুল—হয়ত এত ফুল নষ্ট করায় বাবু বিরক্ত হইবেন—একটু তাই কুণ্ঠিতভাবে সে পথের ধারে সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে সুধু একটু লজ্জা-জড়িত কুণ্ঠিত হাসি! আলোকনাথ কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "এত ভোরে ফুল তুলতে এসেছ? আর ফুল চাই না কি? দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি।"

হিমু অবাক হইয়া গেল,—বকুনি ত খাইল'ই না, তাহার উপর ইনি আবার ফুল তুলিয়া দিতে চান! হিমু আলোকনাথের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া

কহিল, "বড় একটা রাঙা গোলাপ হলে মন্দ হতো না—মালার মাঝখানে দিতুম।"

"মালা গাঁথ্‌বে? এসো, আমি গোলাপ তুলে দিচ্চি। তা গোলাপ তুমি তোলোনি কেন?"

হিমু কহিল, "বড় মালী বল্‌ছিল, ও-সব গাছে হাত দিয়ো না—"

"ওঃ!" বলিয়া আলোকনাথ অগ্রসর হইলে হিমু ফিরিল। মালীরা ব্যস্ত হইয়া ফুল তুলিয়া দিতে আসিয়া ধমক খাইয়া সরিয়া গেল; এবং হিমুর সাক্ষাতেই বাবুর আদেশ প্রচারিত হইল—অতঃপর যে-কোন গাছের ফুল তোলায় কেহ যেন তাহাকে বাধা না দেয়।

ইহার পর প্রায়ই আলোকনাথ ও হিমুকে বাগানে দেখা যাইতে লাগিল। কোন্ পাখীটার কি নাম, কোন পায়রাটা কেমন করিয়া লোক চিনিতে শিখিল, ময়নাটাকে কে এত কথা শিখাইয়াছে—এই সকল প্রশ্ন ও ইহার সত্য-মিথ্যা উত্তর-প্রত্যুত্তরে এই তরুণী মেয়েটি ও প্রৌঢ় গৃহকর্ত্তার সকাল-সন্ধ্যা বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। মানুষ যা পায়—তাহাতেই যদি তুষ্ট হইতে জানিত, তবে সংসারে অনেক দুঃখ-অশান্তি কমিয়া যাইত। কিন্তু মানুষের স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত! আলোকনাথও ভগবানের অনেক করুণাই অযাচিতরূপে পাইয়াছিল। অবিমিশ্র সুখ-লাভ মানবের আয়ত্তের বাহিরে। যে অভাব ছিল, যাহা এতদিন অভাব-রূপে তাহাকে পীড়িত করিতে পারে নাই, আজ এই সুন্দর মেয়েটির সঙ্গ-মোহে সেই অভাব-দুঃখই তাহার সকল সুখের মাত্রা ছাপাইয়া উঠিল। মনে হইল, জীবনের তৃতীয়াংশ কাল বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছে, দাম্পত্য জীবনের কোন সুখই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। মানুষ যখন অভাব অনুভব করে, তখন তাহা পূরণের ইচ্ছাও মনে ওঠে। আলোক-নাথের মনে হইল, হিমুকে পাইলে তাহার জীবনের সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হইবে। মা ত আভাষে ইহাই জানাইতেছেন। হিমুও তাহাকে অপছন্দ করে না। স্ত্রী? বহুকাল তাহার মুখ চাহিয়া সে সময় নষ্ট করিয়াছে—চিরদিনই বা পারিবে কেন?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অন্ধকারে হিমুকে একটু কাছে টানিয়া মুক্তাঠাকুরাণী গানের সুরে কহিলেন, "তোরা উলুধ্বনি দে। দময়ন্তী বিরহিণীর কপাল ফিরেচে। বলি, হ্যাঁলা হিমি, বর মনে ধরেচে ত?"

অন্ধকারে দিদিমার মুখ দেখা গেল না। সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া হিমু বিস্মিতভাবে কহিল, "বর! কার বর, দিদিমা—?"

দিদিমা রসিকতা করিয়া কহিলেন, "যার বিয়ে তার মনে নেই—পাড়া-পড়্‌শীর ঘুম নেই! নাত্‌নি লো, এবার আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌ল যে। বর তোর, আবার কার!"

হিমু দিদিমার আর একটু কোল ঘেঁসিয়া সকৌতুকে কহিল, "কৈ দিদিমা, আমি ত দেখিনি।"

"না, তা কি আর দেখেচ! বর যে পায়ে পায়ে ফিরচে। গাছের ফুলটি ফলটি নিজের হাতে পেড়ে দিচ্চে। অত সব দামী সাড়ী আনিয়ে দিলে—কেন বল্‌ দেখি। সুধু চাঁদপানা মুখ দেখে বুঝি—ভেবে রেখেচ?

না গো, তা নয়। বাবু বলেচেন, বংশ-রক্ষের জন্যে বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন তোমায় পেলেই করবেন, নইলে নয়!"

হিমু ঘোর অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল, "তবে ত বয়েই গেল। ওর ত বৌ বেঁচে রয়েচে।"

দিদিমা কহিলেন, "সে ত মিথ্যে মানুষ,—ভাঙ্গা বাসন। তাকে নিয়ে কি সংসার-ধর্ম্ম বজায় থাকে! এত বড় সংসার—একটা ছেলে নেই! বুড়ো মা কবে আছে, কবে নেই—জল-পিণ্ডি চাই ত! আর তাও বলি বাছা, এ সংসারে যে পড়বে, সে অনেক কল্প তপস্যা করচে।"

হিমু খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, "দিদিমা, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন। ও বুড়োকে বিয়ে করবার জন্যে যারা অনেক জন্ম তপস্যা করচে, তাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে, চল, আমরা বাড়ী যাই। তোমার মেলা ত হবে না—আমার মার জন্যে মন কেমন কচ্চে।"

মেয়ের ভাব ভাষার উদ্ধতাতেই প্রকাশ পাইতেছিল। এই স্বাধীনচিত্তা আদুরে মেয়েটিকে তিনি বেশ ভাল করিয়াই চিনিতেন, তবু আশা ছাড়িতে পারিলেন না। অনাথার কন্যা বিনা-পণে যুবা-বরে যদি নাই বিকায়, বুড়ায় ক্ষতি কি? অর্থ-কষ্ট, অন্ন-কষ্ট ত কখনো পাইবে না। সতীন আছে—তা থাক্! কিছুদিন পূর্ব্বে এ ব্যাপার ত ঘরে-ঘরেই ছিল। দুই পুরুষের অনভ্যাসে মেয়েদের অত অসহিষ্ণু হইলেই বা চলিবে কেন? পেটে দুইটা হইলেই মন ভরিয়া যাইবে। সব দিকের সব সুবিধাই কি মানুষ পায়! মনের বিরক্তি দমন করিয়া শান্তভাবে মুক্তাঠাকুরাণী কহিলেন, "বুড়ো বলিসনি তা বলে। ওর আর বয়স কত? চুলও পাকেনি, দাঁতও পড়েনি। বুড়ো দেখ্‌লি কোনখানটায়? তুইই বা কি খুকী, বল্ ত।"

হিমু দিদিমার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ওর নাতনী হতে পারি তবু। তুমি বাপু গঙ্গাজোলেদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড় দেখি। সকাল হলেই উঠে ওর জিনিষ-পত্র সব ফিরিয়ে দেব তখন। কে জানে বাপু, এ-সব ঘুষ! আমি ত ভেবেছিলুম, বড়লোকদের কায়দা—বাড়ীতে যে আসে, তাকেই বুঝি এমনি সব দিতে হয়। রামঃ, ও-সব আর আমি ছোঁব কি না।"

ইহার পর প্রবল প্রতাপান্বিতা মুক্তা ঠাকুরাণী আর দ্বিতীয় কথা কহিলেন না। তিনি জানিতেন, ইহার পর বাদ-প্রতিবাদের ফল যাহা ঘটিবে, তাহা উভয় পক্ষেরই সুখকর হইবে না। হয়ত অপরেরও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে।

দিদিমার অনুনয়-বিনয় ও উপদেশের মাত্রা ও বাড়ীর লোকদের আদর-যত্ন যতই অধিক হইতেছিল, হিমুরও সেই পরিমাণে এখান হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছায় মনটা ছটফট করিতেছিল।

এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত বাস করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। আলোকনাথের সহিত বিবাহের কথা ওঠায় বাড়ীর সকলকার কাছেই সে এখন নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া মনে করে। যে রুগ্না দিদি যথার্থ ভগ্নী-স্নেহে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছিল, সাপের মত তাহারই রোগজীর্ণ বক্ষে

সেই কি না শেষ ছোবল মারিল! ছি—ছি! কেমন করিয়া হিমু আর তাহার কাছে নিজের পোড়ার মুখ বাহির করিবে? তাই এ বাড়ীর একমাত্র আকর্ষণীয় মানুষটির সঙ্গ সে ইচ্ছা করিয়াই ত্যাগ করিয়াছে। প্রথম দুই তিনদিন হিমু মনে করিয়াছিল, হেমলতা হয়ত তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে। যদি ডাকে, সে কেমন করিয়া যাইবে? তবু এই ডাকের প্রতীক্ষাতেই সে উন্মনা হইয়া বসিয়া থাকিত। ক্রমে সে আশাও ফুরাইল, সেখান হইতে ডাক আসিল না। এ চিন্তায় হিমুর ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যথিত হইলেও প্রতিকারের পথ দেখিতে পাইল না। সে কি নিজ হইতে দিদির পায়ে পড়িয়া বলিবে, "আমার কোন দোষ নেই—ও-সব ছাইয়ের কথা আমার একটুও ভাল লাগে না। তুমি কর্ত্তাবাবুকে বারণ কর দিদি, ও-সব বল্‌তে,—"বাঃ তাও কি কখন হয়? ছি!"

হিমু এই চিন্তা চাপা দিবারই চেষ্টা করিল। দিদির সঙ্গ ছাড়া আর একটি লোভের জিনিষ ছিল, বাগানে ফুল তুলিয়া বেড়ানো। এ লোভও তাহাকে দমন করিতে হইয়াছিল। আজকাল হিমু বাগানে নামিলেই আলোকনাথের বায়ু-সেবনেচ্ছা বর্দ্ধিত হয়। প্রথম প্রথম না জানিয়া সে যখন ইঁহার সাহায্য লইয়াছিল—তখন খুসী হইয়াই লইয়াছিল। সরলা হিমু ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বুঝিত না। বাবুর এ অযাচিত অনুগ্রহেরও সে তাই কারণ-অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয় নাই। এই সব নূতন নূতন পাখী—হিমু ইহাদের নাম জানে না—গুণাবলী ত জানেই না। এত রকম যে ফুল,—ইহাদের সম্বন্ধেও তাহার অজ্ঞতার সীমা নাই। অরুণের কাছে এ সকলের গল্প করিবার সময় শুধু পরিপূর্ণ আনন্দোজ্জ্বল মনটুকু ছাড়া তাহার তহবিলে সঞ্চয় কিছুই হইত না। এমন সময় বাবু যখন অযাচিতভাবে তাহাকে সঙ্গ দিয়া সকল সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন স্বতঃই কৃতজ্ঞতায় তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাবু তাহার দিদির স্বামী—তাঁহারই বাড়ীতে ইহারা অতিথি—তা ছাড়া সম্বন্ধ যখন হইল ভগ্নীপতি, তখন ইঁহার সঙ্গ খুসী হইয়াই বা সে গ্রহণ না কেন? করিবে। মনে ইঁহার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধাই জাগিল। এমনি করিয়া ঘনিষ্ঠতা যখন বর্দ্ধিত হইল, তখন সে দিদিমার মুখে শুনিল, বাবু তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন। দিদিমাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেও বাড়ীর গৃহিণী কর্ত্তা-মা হইতে সকলকার মুখেই ঐ একই কথা। এ বাড়ীর কর্ত্রীর আসন খালি নাই, অর্দ্ধ-মৃতা এখনও সেখানে সে পড়িয়া আছে যে! ধিক্কারে হিমুর আপাদ-মস্তক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। না জানিয়া, না বুঝিয়া সে এ কি কাণ্ড করিয়াছে? কাহাকে সঙ্গ দিয়া কাহার সঙ্গে লইয়া সে আজ লোক-চক্ষে নিজেকে এত অবহেলার পাত্র করিয়া বসিল! দিদিমা রথ না দেখিয়া কোন মতেই বাড়ী ফিরিবেন না। তাহারও এখনো কয়দিন দেরী রহিয়াছে। কিন্তু হিমু যে এখানকার বাতাসে আর স্বচ্ছন্দে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না! হরিণীকে বেড়া-জালে আবদ্ধ করিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, হিমুরও নিজেকে তেমনি অসহায় মনে হইতেছিল। আলোকনাথের মা এখন তাহাকে অধিক যত্ন দেখান, স্নানাহারের

তদারকে ব্যস্ত হন, দাসী-চাকরেরা সম্ভ্রম করিয়া চলে। তাহার নিজের জন্য সুসজ্জিত কক্ষ, ভাল ভাল কাপড়-চোপড়,—মুক্তা-ঠাকুরাণীরও আদর-আপ্যায়নের ক্রটি হইতে ছিল না! তাঁহার মুখে প্রসন্নতার ছায়াই দেখা যাইত। তবু মুক্ত আকাশের পাখী সোনার পিঞ্জরের ভয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। কতক্ষণে এ রাজ-প্রাসাদের রাজ-ভোগ ছাড়িয়া সে তাহার কুটির-বাসিনী মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই ছিল তার প্রতি-মুহূর্ত্তের কামনা। ইহারই মধ্যে নিজের জন্য হিমু একটুখানি নিরাপদ আশ্রয় আবিষ্কার করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের লাইব্রেরি কক্ষ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে তাহার সব দুঃখ ভুলাইয়া দিত। সে জানিত, বাড়ীর অনেক কক্ষেই বাবুর শুভাগমন-সম্ভাবনা, কিন্তু এদিকটায় নাই। চাকরেরা সকাল বেলা ঘরে ঝাঁট দিয়া ঝাড়া-মোছার কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর এ অংশের সহিত বাড়ীর লোকের আর কোন সংস্রব থাকে না। বাবুর ভাইপোর কড়া হুকুম, তাই, নহিলে বাড়ীর অন্য কাহারও সহানুভূতি এখানে বর্ত্তমান ছিল না। দিন-যাপনের জন্য হিমু এই নির্জ্জন স্থানটিকেই নিজের জন্য বাছিয়া লইল। বাবু যে আজকাল অনেক সময় অকারণে বাড়ীর ভিতর আসিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া যান, সকালে সন্ধ্যায় কোন বনদেবীর আবির্ভাব-আশায় উন্মনা হইয়া বাগানে পদচারণ করিয়া ফিরেন, মুক্তাঠাকুরাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া যায় না। কিন্তু তিনি আর করিবেন কি? বিধাতা যে এখানে সমানে সমান মিলাইয়া দেন। নাতনীটি ত বিক্রমে তাঁহার নীচে নয়,—শাসনে বাধ্য হইবে, সে পাত্রীও সে নয়। অগত্যা মনের ক্ষোভ মনে রাখিয়া তাঁহাকে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইতেছিল। মায়ের মত হউক, দেখিয়া লইবেন —সে কত বড় জেদী মেয়ে—আর তিনিও মুক্তা বামনি কেও-কেটা নহেন। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দূরদর্শিনী ঠাকুরাণীটি জানিতেন যে দুইটা প্রবল গ্রহের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাতেরই সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে সহিয়া থাকাই ভাল। সবুরেই মেওয়া ফলে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। লাই-ব্রেরী ঘরের জান্‌লা-দরজাগুলার অধিকাংশই বন্ধ রহিয়াছে। জানালার শিরোভাগের রঙিন কাচাবরণের মধ্য দিয়া নীল লাল সবুজ রঙের আলোক-রশ্মি ঘরের দেওয়ালে ও স্থানে স্থানে রেখাপাত করিতেছিল। দক্ষিণের বড় দরজাটা খুলিয়া দিয়া তাহারই একদিকে পিঠ রাখিয়া অপর ভাগে পা বাড়াইয়া বসিয়া হিমু একখানি কাব্য-গ্রন্থ পড়িতেছিল। খোলা দরজাটার বাহিরে মার্ব্বেল-মণ্ডিত লম্বা দালান, তাহার শেষ অংশে চিত্র-করা লোহার রেলিং-ঘেরা—তাহার নীচেই বাগান। এ দিকটা বাড়ীর পিছন্ দিক। বাগানটি ফুলের নয়—ফলের। বড় বড় আম জাম কাঁঠাল জামরুল গোলাপ-জাম পিচ্ বাতাবি লেবু ফল্‌সা নারিকেল তাল আরও কত গাছ-পালা। বাগানের মাঝখানে পুকুর। তাহার বাঁধান চাতালের চারিপাশে সুপারি গাছের সারি। এ বাগানে হিমু বড় যাইত না। তাহার ভয়-ভয় করিত। বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা নির্জ্জন বীথি—বাতাসে গাছের পাতা দুলাইয়া হা-হা রব!

সঙ্গী থাকিলে তাহাকে ভয় না দেখাইয়া প্রলোভনেই ফেলিত। গাছে উঠিবার বিদ্যাটা এখানে প্রকাশের ইচ্ছা না থাকিলেও তলায় কুড়াইলেই যথেষ্ট; কিন্তু উপস্থিত মনোভাবে অথবা রাজভোগে পরিতুষ্ট রসনা এদিকে প্রলুব্ধ হয় নাই।

জামরুল গাছে বসিয়া একটা কালো কোকিল অনেকক্ষণ হইতেই হিমুর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রয়াসেই বুঝি থাকিয়া থাকিয়া 'কুহু কুহু' করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। কাব্য-রসাস্বাদিনীর সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। ভিতরের দিকের খোলা দরজা দিয়া বলাইয়ের মা ঝী একখানি রূপার পাত্রে অনেকগুলি বাছাই করা ভাল ভাল ফুল ও একটি সুন্দর তোড়া সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে কহিল, "এই যে দিদিমণি, তুমি এখানে—তোমার জন্যে আমি মারা বাড়ীখান তল্লাস করে বেড়াচ্চি।"

হিমু মুখ তুলিয়া চাহিতেই ফুলের উপর চোখ পড়িল। গভীর বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল; সে কহিল, "এত খোঁজাখুঁজির দরকার? আমি ত তোমাদের কিছু চুরি করে পালাইনি।" কথা-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টি পুনরায় বইয়ের অক্ষরে নামাইল।

বলাইয়ের মার বয়স কম—এখনও যৌবনের সবুজ হাওয়া তাহার শরীরের মধ্যে নাচিয়া ফিরে। সে বিধবা, তবু পাড়ওয়ালা সাড়ী পরে, হাতে তিনগাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি, উপর হাতে সোনার তাগা, এবং সাড়ীর নীচে রূপার বিছা। ভাল করিয়া চুণ খয়ের দিয়া পান সাজিয়া পাতলা ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখে, সুবিধা পাইলে ছড়া কাটে, গুণগুণ করিয়া গান গায়, বধূঠাকুরাণীর সহিত সময় বুঝিয়া একটা-আধটা রসিকতাও করিয়া থাকে। এ-ছাড়া তাহার আর কোন অপবাদ ছিল না। সে অল্প বয়সে বলাইকে কোলে লইয়া বিধবা হয়, সেই পর্য্যন্ত এই আশ্রয়েই কাটাইতেছে। হেমলতা তাহাকে ভালবাসিত। সাধারণ দাসীদের চেয়ে সে উচ্চশ্রেণীর। সে হেমলতার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিত, দুপুরবেলার তাসখেলার সঙ্গী হইত; গৃহিণীর পাকা চুল তুলিত। সংসারের ছোট কাজ তাহাকে কিছু করিতে হইত না। এখন—বিধান সবই বদল হইয়া গিয়াছে। হেমলতা আর চুল বাঁধে না, তাস খেলে না, রসালাপ করে না, সে নিজের রোগ-যন্ত্রণাতেই কাতর—বলাইয়ের মার মন যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ভার আর বিষণ্ণ মুখ—এ যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। হিমু আসায় দিনকতক কাটিয়া ছিল মন্দ না। আনন্দময়ী মেয়েটি নিজের আনন্দের আলো চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া কলকণ্ঠের হাস্যোচ্ছ্বাসে নিরানন্দ পুরীতে অমৃতের নির্ঝর বহাইয়া গৃহবাসীদের পাষাণ মনে যেন সোনার কাঠি বুলাইয়া ধীরে ধীরে আবার চেতনা ফিরাইয়া আনিতেছিল। মেয়েটির আত্ম-পর বিচার নাই, আব্‌দার-বায়নারও অন্ত নাই! এ বাড়ীতে যে এই জিনিষটিরই একান্ত অভাব। তাই মরা গাঙ্গে আবার জোয়ারের উচ্ছ্বাস সূচিত হওয়ায় বাড়ীর সব লোকই একটু তাজা হইয়া উঠিতেছিল। হেমলতার শীর্ণ অধরে হাসির রেখা প্রায়ই মিলাইবার অবকাশ পাইতেছিল না। মরণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া আরও যেন

কিছু পাইবার আছে, এমনি একটা ভাবের উচ্ছ্বাসে রোগের গতিও দিন-কতক একটু মন্থর হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীকে আজকাল আর কাছে পায় না—দিন-রাত একঘেয়ে রোগের ইতিহাসে বিরক্ত হইয়া অনেকদিন হইতেই স্বামী নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। তবু অনেকদিনের অভ্যাস-দোষেও হয়ত কতকটা আকর্ষণও ইহার মধ্যে ছিল,—এক-এক দিন বাড়ীর ভিতর খাইতে আসিয়া স্ত্রীর সহিত স্বামী সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। এমনি একদিন অতর্কিত অবস্থায় এলোকেশী রূপের ডালি প্রস্ফুট-যৌবনা তন্বঙ্গী তরুণীকে দেখিয়া আলোকনাথের দৃষ্টি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। সংসারে ভোগের জিনিষ অনেক পাইলেও তাহার মনে হইল, জীবনে এমনটি যে না পাইল, তাহার জন্মই বৃথা! অবশ্য সেই প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই এমন ভাব তাহার মনে আসে নাই। তখন কেবল সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেই সে মেয়েটির পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল। ক্রমে দর্শনের আকর্ষণ যতই বাড়িতে লাগিল, ও দ্রষ্টব্য যতই সুলভ হইয়া দেখা দিল, ততই মানুষের আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ দুর্ব্বল মন প্রিয়পাত্রকে কাছে পাইবার জন্য অধীর হইতে লাগিল। মায়ের কাছে নির্জ্জনে নিজ অনুকূল প্রার্থনাই শুনিতে পাইল—"গরীবের মেয়ে পার হচ্ছে না—তোর নাম করে মাসী এসেচে। দে বাবা, ওর দার উদ্ধার করে। খাসা মেয়ে—এমনিটি রাজার ঘরেই মানায়। আমার কি তেমন বরাত যে কথা দেব? সে ছোঁড়া নাই করুক্, তুই ওর দায় উদ্ধার কর্ত্তে পারিস্।"

সাগর-সেঁচা মাণিক এত সহজে বিকায়? আলোকনাথ লজ্জিত মুখে কহিল, "বুড়োকে অমন মেয়ে দিতে ওঁরাই বা রাজী হবেন কেন? বিশেষ সতীনে।"

"রাজী হবে না! শোনো কথা! তুই হলি বুড়ো! বেটা ছেলের কি বয়সের বিচার থাকে না কি? শোনো মাসী,—ছেলের কথা শুনে যাও। উনি বল্‌চেন, বুড়োকে তোমরা মেয়ে দেবে না—।"

মুক্তা ঠাকুরাণী বাহিরে দালানে বসিয়া দাইলের খুদ ঝাড়িতেছিলেন। গৃহিণীর আহ্বানে ললাট-ঢাকা ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন, "ওর তপিস্যে থাকে, তবে ত হবে। মা দুঃখী রাঁড়ী, উপায় নেই বলেই না পার হচ্ছে না। আর হোক না হোক, সত্যি কথা বল্‌ব বাছা, পুরুষ মানুষের চল্লিশ বছর কি আবার বয়স! এখনকার ছেলেরা সব পাশ করে চাক্‌রি করে যে বিয়ে করচে, তাদেরই কি আর বিয়ের বয়েস থাক্‌চে? সে সব ছিল সে কালে বটে। ছেলে-মেয়ে সবারই ছোট বেলায় বিয়ে হোত। এখন আর ও-সব নেই।" ইহার পর হেমলতার অনুমতি না লইয়াই—আলোকনাথ নিজ বিবাহে সম্মতি জানাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আলোকনাথ পাত্রীর সহিত আলাপ করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দেখিয়াছে, সেও তাহাকে অপছন্দ করে না। হেম? তাহার অনুমতি আশা করাই ভুল। সে যদি সন্তান দিয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিত, তবে এ-সব ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজনই বা কি ছিল? লোকে যাই বলুক, সত্যই ত, সে কচি ছেলেটি নয়। বোঝে সবই

—কিন্তু সবের উপর পিতৃ-ঋণ! আলোকনাথ পণ্ডিতের কাছে এই শ্লোকাংশটি শিখিয়া লইয়াছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।" সকল সমস্যার মীমাংসা ত এই খানেই হইয়া গেল।

দাসী হাসিমুখে কহিল, "দিদিমণি চোখ নামালে যে—ফুল নাও। বাবু নিজের হাতে বেছে বেছে তুলে দিয়েচে। চেয়ে দেখ—"

হিমু অপাঙ্গে তাহার হাস্যময় মুখের পানে চাহিয়া বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া কহিল, "দিদির ঘরে দিয়ে এস। বাবুর তোলা ফুল—তিনি খুসী হবেন। আমার দরকার নেই।"

দাসী বুঝিল, হিমানী রাগিয়াছে। তবু এ রাগটা যে কোন্ দিক হইতে জন্মিল, তাহার সূত্র খুঁজিয়া না পাইয়া সে কহিল, "তাঁর ঘরে মালীরা রোজই ফুল পাঠায়, আজও পাঠিয়েচে—এ তোমার জন্যে—নাও, ধর।"

হিমু ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "তাঁকে ফিরিয়ে দাওগে—।"

"ওরে বাস্‌রে—তবেই হয়েচে আর কি! নাও বাপু, এই রইল তোমার ফুল, ফিরে দিতে হয়, তুমিই দিও—তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে পড়ে গরীব কি শেষে মারা যাব?"

হিমু মুখ তুলিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বাবু আমায় ফুল পাঠান কেন? তাঁর বাড়ীতে যে কেউ অতিথ আসে, তাকেই কি তিনি এমনি করেন?"

দাসী তাহার উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া থ' হইয়া গিয়াছিল, আম্‌তা আমতা করিয়া কহিল, "সবাই—সে আর কথা! বাবু তোমায় ভালবেসে দিয়েচেন, দিদিমণি—"

বাধা দিয়া সবেগে হিমু কহিল, "ভাল বেসে তাঁর স্ত্রীকে দিন গে—সে মরুচে ও দিকে—আর বুড়োর খেলা পড়ে গেল।"

হিমু মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল দেখিয়া বলাইয়ের মা সহানুভূতির স্বরে কহিল, "যা বলেচ দিদিমণি—পুরুষ-মানুষদের দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল—নৈলে ঐ বৌঠাকরুণেরই কি এক দিন কম আদর ছিল! বাবু ত চোখে হারাত। যেন জোড়া পায়রা দুটি—এক দণ্ড কাছে কাছে ছাড়াছাড়ি ছিল না! তার জন্যে বৌঠাকরুণকেই উল্টে মাঠাকরুণের কাছে কত ফৈজত শুনতে হোত! বাবু রাস্তায় বেরুত যদি, বৌঠাকরুণ জান্‌লায় দাঁড়িয়ে থাকৃত—এই বলাইয়ের মা অনেকেই ত দেখ্‌লে দিদি, এখন কালে-ভদ্রে খবর নিতে যান। তাও বিয়ের কথা উঠে-অব্‌ধি ও রাস্তা আর মাড়াননি। যতই হোক, সোয়ামী ত, এত তাচ্ছিল্লি কি সহ্য হয় গা? বৌঠাকরুণ যাই মাটির মানুষ, তাই মুখটি বুজে সব সইচেন। তোমরা আমরা হলে কক্ষনো এ পারতুম না বাপু, তা হক্ কথা বলব।"

অতীতের আন্দোলনে বলাইয়ের মার চোখের পাতায় সহানুভূতিতে জলের আভাষ ফুটিয়াছিল। হিমুরও অন্যমনস্কে ক্রোধের তাপটা একটুখানি কমিয়া আসিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল, পুস্তকে পড়িয়াছে, "দূত অবধ্য।" সত্যই ত, ইহারা বেতন লয়, মনিবের আদেশ-পালনে বাধ্য—ইহার প্রতি ক্রোধ-প্রকাশে ফলই বা কি? আহা, দুঃখিনী দিদিকে এখনও ও ভালবাসে।

হাত বাড়াইয়া ফুলের পাত্রখানা টানিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইলে বলাইয়ের মা আশ্বাসের

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, যতই হোক, ছেলে মানুষ—এরি মধ্যে ফুল দেখিয়া রাগ ভুলিয়া গেল। কিন্তু এ চিন্তা সুধু মুহূর্ত্তের জন্য! বলাইয়ের মার নিষেধের পূর্ব্বেই হিমু উঠিয়া বারাণ্ডার রেলিংয়ের বাহিরে অন্ধকার বাগানের জঙ্গল-ময় অংশের দিকে ফুলগুলি উজাড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া পাত্রখানা দাসীর হাতে ফিরাইয়া দিল। অল্পক্ষণের এই পরিচয়টুকুতে বলাইয়ের মা হিমুকে যতটুকু চিনিয়াছিল—তাহাতে ফুলগুলির পরিণাম সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া সুধু মৃদুস্বরে সে কহিল, "মুস্কিল কল্লে দিদিমণি! বাবু যদি কিছু সুধোয়—কি যে জবাব দেব ?"

তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে হিমু কহিল, "সত্যি কথাই বল্‌বে—তাঁর ফুল তোল্‌বার সখ্ মিট্‌বে, আমায়ও তোমাদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে হবে না।"

"মিথ্যে বলনি দিদি-ঠাকুরুণ। তুমি একেবারে কেল্লার গোরা—বাবুর দেখছি, কপালে অনেক দুঃখু লেখা আছে—" বলিয়া দাসী এতক্ষণের বাক্‌বিতণ্ডার পর একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

হিমু বইখানা মুড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। রৌদ্রালোক ম্লান হইয়া সন্ধ্যার সূচনা জানাইতেছিল। গাছ-পালার ছায়ায় এদিকটা ইহারই মধ্যে বেশ্ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। মুক্ত আকাশে কদাচিৎ দুই-একটি পাখী উড়িয়া যাইতেছে। চিম্‌নীর পথ দিয়া কখনও পাখীর আওয়াজ কানে আসিয়া বাজিতেছিল। বাহিরে প্রচুর স্বাধীনতা! তবু কি অসহায় সে! পৃথিবীটার এ-সব অংশের সহিত তাহার পরিচয় নাই। মনেও সে কখনো এমন সব বিষয়ের কল্পনা জাগায় নাই—আশ্রয় নাই! একমাত্র আশ্রয় দিদিমা—তিনিও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছেন! তবে কে তাহাকে এ বিপদে রক্ষা করিবে—? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে জুতার আওয়াজ শোনা গেল। হিমু মুখ ফিরাইয়া লইল। মনে হইল, বাবু এইবার সশরীরে তাহার অবাধ্যতার দণ্ড বিধান করিতে আসিয়াছেন। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া সে তাহার তীক্ষ্ণ-ধার রসনাকে সংযত করিল। ছি, উহাঁরই বাড়ীতে বসিয়া উহাঁর সহিত কি কোমর বাঁধিয়া মেছুনীদের মত ঝগড়া বাধাইবে সে? বাড়ী ছাড়িয়া একবার যাইতে পারিলে তখন কেই বা আর তার নাগাল পাইবে? হিমু ভাবিতেছিল, মার কোলে মুখ লুকাইলে কেহ আর তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল—খুব বেশী সময় নয়। তবু চুপ করিয়া কৌতূহল সহ্য করা হিমুর স্বভাব-বিরুদ্ধ। রাগের মূলীভূত ফুলগুলা এখনও ময়লা গাদার পাশে পড়িয়া আছে—সুতরাং অন্তরেও তাহার কৌতুক-হাস্যের একটি সুর বাজিতেছিল। সে মুখ ফিরাইয়া অপমানিতের রোষ-দীপ্ত মুখের পানে চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। যে আসিয়াছিল, সে একজন যুবাপুরুষ। হিমু তাহাকে এ-বাড়ীতে আর কখনও দেখে নাই—বাহিরের আমলা-কর্ম্মচারীরা, বাবুর মোসাহেব-বৃন্দ সকলেই যে তাহার পরিচিত, তাহা নয়—তবু অন্দরে যাহাদের যাতায়াত চলে, তাহাদের সকলকেই হিমু চেনে। বাহিরে কেদারা কৌচ সোফার বাহুল্য-সত্ত্বেও কেহ যে সাধ করিয়া মাটিতে বসিয়া পুস্তকাধ্যয়ন করিতে

ছিল, সম্ভবতঃ আগন্তুকের তাহা খেয়ালেও আসে নাই। বাহিরের অন্ধকার দালান হইতে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমটা সে ঘরের দিকেই চাহিয়াছিল। পরে যখন হিমুর উপর দৃষ্টি পড়িল—হিমুর বিস্মিত দৃষ্টি তখন তাহারই উপর ন্যস্ত। "আমি বুঝ্‌তে পারিনি, ঘরে কেউ আছেন।" নিজের অনুচিত আগমনের স্বপক্ষে এই একটিমাত্র কৈফিয়ৎ দিয়াই আগন্তুক কুণ্ঠিত ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া গেলে হিমু তাহার চলিয়া যাওয়া পথের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী

বিবাহে পণ-প্রথা

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা ইতিপূর্ব্বে এদেশের বিবাহ ও পণ-প্রথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখন আগে ঐ-বিষয়ে যে সকল কথা বলা হয় নাই, তাহারই কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে বিবাহ ধনের পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া অনেকস্থলেই গৌরব করিতে শোনা যায়। কিন্তু তাহা কি যতটা মনে করা যায় বাস্তবিকই সেইরূপ হিতকর? ধনের পরিমাণের সমতাতেও কতকগুলি স্বাভাবিক এক রকম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ঐরূপ অবস্থার পরস্পরের মধ্যে বিবাহ স্বাভাবিক ও সুখকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমাদের প্রচলিত সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-প্রথায় উভয়পক্ষের অবস্থার স্বাভাবিক সমান ভাব কিছুই থাকিতে পারে না। এখন আর জাতিভেদে ব্যবসায়-ভেদ নাই। সুতরাং একজাতির (তাহার সঙ্কীর্ণ শাখা-প্রশাখার) মধ্যে ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, সুন্দর, কুৎসিত, রক্ষণশীল, উন্নতিশীল ইত্যাদি সকলরকম লোকই থাকিতে পারেন। বিবাহ ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে তাহাদের নিজের অবস্থা,প্রকৃতি ইত্যাদির সহিত মিলিতে পারে এমন পাত্র-পাত্রী পাওয়া কঠিন হয়। এদিকে পণপ্রথা চলিত হওয়ায় ধনের কুফল অন্য সকল দেশ অপেক্ষাই এখানে বিষময় হইয়াছে। ধনী ব্যক্তিরা আপনাপন কন্যার বিবাহে ইচ্ছামত মূল্যে পাত্র খরিদ করিয়া থাকেন। সুতরাং সঙ্কীর্ণশ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রগুলি তাঁহাদেই এক-চেটিয়া হইয়া পড়ে। দরিদ্র, এমন কি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের যতই রূপ গুণ থাকুক, যোগ্য পাত্র মিলিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরের বাজারের দরও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিতে পারে না। এদিকে ধনীরাও যে সব সময়ে তাঁহাদের ইচ্ছামত পাত্র পাইয়া থাকেন, তাহা নহে। তাঁহাদেরও আপনাদের অনুরূপ অবস্থাপন্ন ঘরেই প্রধানতঃ মেয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা হয়ত নিজশ্রেণীর মধ্যে অল্পই থাকে। সুতরাং তাঁহারা অগত্যা বিদ্যা বা রূপ দেখিয়াই পাত্র

নির্ণয় করিতে বাধ্য হন। তাহাতে ধনী-কন্যাকে অনেক সময়েই মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র-গৃহে পড়িতে হয়,—তাহা যে কোনপক্ষের পক্ষেই বিশেষ সুখকর হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। ধনী পিতা আজকালকার দিনে বিবাহ-পণের মূল্য ব্যতীত পরে আর কিছু বড় দিয়া উঠিতে পারেন না, দিলেও তাহা তাঁহার কন্যার পক্ষে কখনই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। এদিকে বরাবর কন্যাকে সাহায্য করিতে তিনি ক্রমেই কাতর হইতে থাকেন। পিতার অভাবে ভ্রাতার কর্ত্তৃত্বেও ঐ সকল ধনী-কন্যার অবস্থা অনুমান করিলেই হয়। বড় মানুষের জামাই হইয়া পাত্রটিরও অনেক সময়েই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা তেমন হয় না, উপর উপর জামাই-আদরে দিন কাটাইয়া পরে যখন চৈতন্য হয়, তখন সে আপনার পত্নীর উপরই তাহার শোধ লইয়া থাকে। তাহার পর ধনী-কন্যা কুৎসিত হইলে সুন্দর বরের পরে তাহাকে মনে না ধরাই সম্ভব।

এদিকে সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের দেশে মতভেদ এতই গুরুতর ও তাহার ভিন্নতায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রকারভেদও এতই বিষম যে আপনার শ্রেণীর মধ্যে মনের মিল থাকিতে পারে এমন পরিবারের পাত্র-পাত্রী পাওয়া একরকম অসম্ভব বলিলেও হয়। তবে পাত্রীর ক্ষেত্রে তাহার, বা তাহার পরিবারের মতামতে বরপক্ষের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কারণ তাহা যেমনই হউক, তাহাকে আপনাদের মত করিয়াই চালানো হইয়া থাকে। যদিও সে ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে আক্ষেপ করিতে শোনা যায়! কিন্তু পাত্রীর পক্ষে একভাবের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী পরিবারের মধ্যে পড়িলে যে তাহার দশা কেমন হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই কঠিন।

এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, পণপ্রথা আমাদের সমাজ-ব্যাধির একটী চিহ্ন মাত্র। তাহার মূল দূর করিতে না পারিলে কেবল সাধু ইচ্ছার দ্বারা ইহা যাইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে একজাতির সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিয়ম ও কন্যার বিবাহের অবশ্যবাধ্যতা দূর করিতে হইবে, এবং বিবাহে গুরুজনের সম্মতির সহিত বরকন্যার পরস্পরের মনোনয়নপ্রথা প্রচলিত করিতে হইবে। ইহার সহিত বর্ত্তমান পণপ্রথা দূর করিয়া পুত্র-কন্যা ন্যায়তঃ পিতামাতার সম্পত্তির সমান অধিকারী-জ্ঞানে কন্যাকেও পিতামাতার অবস্থানুযায়ী সম্পত্তির অংশ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত হইবে। সম্প্রতি বিলাতে পুত্র, কন্যা পিতামাতার সম্পত্তি সমানভাবে পাইবার আইনতঃ ব্যবস্থাও হইয়াছে। আমাদের দেশেও আইন-প্রণয়ন যখন দেশী লোকের হাতে আসিয়াছে, তখন তাঁহাদের এবিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আইন না হওয়া পর্য্যন্ত সকলের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে পিতামাতার আপনা হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষতঃ কন্যার যখন আপনার উপার্জ্জন করিবার সুবিধা নাই, তখন তাহাকে সাধ্যমত কিছু দেওয়াই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবে তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায়

ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াই বিরত হইলাম।

এই সূত্রে আর একটী কথা বলাও প্রয়োজন। মেয়েদেরও নিজেদের পুরাপুরি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত হওয়ার আগেই যে সকল বিবাহ সম্বন্ধ কেবল টাকার জন্যই হইয়া থাকে, তাহাতে দৃঢ়ভাবে অমত জানাইবার সাহস জানাইতে হইবে। ইহার মধ্যে বিপত্নীক, দুশ্চরিত্র ও স্ত্রী বর্ত্তমানেও যাহারা বিবাহ করে, তাহাই প্রধান। এইরূপ বিবাহের প্রধান কারণ যে অর্থ-নৈতিক, একটু খোঁজ করিলেই তাহা দেখা যায়। অবশ্য ইহার জঘন্যতা অভ্যাসের বশ কাহারও তেমন বাজে না বটে, তবু একটু বুঝাইলেই সকলে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিবাহই মেয়েদের জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়, তাহার সহিত বিবাহের বাধ্যতা-মূলক পণপ্রথার যোগ হইয়া সোনায় সোহাগা হইয়াছে। এই বিবাহ কেন দিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বলিয়া উঠেন, "মেয়ের বিবাহ ত দিতেই হইবে, এটা কমে পাইতেছি, ইহার ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা নাই।" এরূপ অবস্থায় মেয়েদের চিরকুমারী থাকিয়াও ঐ-সকল বিবাহে অসম্মতি জানাইতে সাহস করিতে হইবে।

বাস্তবিক ঐসকল পুরুষের প্রতি মেয়েদের যে স্বাভাবিক ঘৃণা সমাজের চাপে সচেতন হইয়া উঠিতে পায় না, তাহা জাগাইতে হইবে। ঐরূপ অশুচি লোককে বিবাহ করিলে যে তাঁহাদের নারীত্ব ও কুমারীত্বেরই অপমান ও আপনাদেরও অশুচি ও কলুষিত হইতে হইবে, এই জ্ঞান জন্মানো দরকার। অভিভাবকেরা ঐরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত করিলে ধিক্কারের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহাদের থাকা প্রয়োজন।

বিপত্নীকেরা কুমারী-বিবাহের সুযোগ না পাইলেই বিধবা বিবাহের পথও কতকটা খুলিয়া যাইতে পারে। তাহারও যে কতটা প্রয়োজন, ন্যায় ও সত্যের দিকে চাহিলে কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিতে অর্থকরী বিদ্যা ও বিষয়-সম্পত্তি পরিচালন করিতে যে ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন তাহাও বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। মেয়েদের শিক্ষা কেবল পোষাকী accomplishment ভাবে হওয়া আজকালকার দিনে আর চলিবে না, চলিতে দেওয়া উচিতও নহে। বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হইলে ইংরাজী শিক্ষাও অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। শিক্ষার ব্যবস্থা কালোপযোগী হইলে মেয়েদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং বিবাহে মনোনয়ন তাহাদের সম্ভব হইয়া আসিবে। Bigami Lawও আমাদের সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত। যাঁহারা মনে করেন, বহুবিবাহ-প্রথা বিনা-আইনেই দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাঁহারা ভিতরে অবস্থা একটু খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবেন। তবে এই আইনের সাহায্যে আমাদের কিছু হওয়া যে কতটা সম্ভব, তাহা এ-পর্য্যন্ত কাউন্সিলে উন্নতিশীল কোন বিল উপস্থিত হইলেই তাহার যে দশা হয়, তাহা লক্ষ্য করিলেই জানিতে

পারিবেন। এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া আমাদের বাঙ্‌লা দেশের সুনাম অন্য প্রদেশেও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা এখন উন্নতিশীল কোন আইন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে বাঙ্‌লাকে বাদ দিয়াই তাহা করিতে থাকেন। শেষগিরি মহাশয় উত্তরাধিকার আইনের যে পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাতে বাঙ্‌লা-বর্জ্জন ও তাহার কারণের কথা স্পষ্টই উল্লেখিত আছে। যাহা হউক, সকল জানিয়াও চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া প্রকৃত মানুষের লক্ষণ নহে। সুতরাং চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে, লক্ষ্য আদর্শ বড়ই রাখিতে হইবে।

বঙ্গনারী

আন্ধারের বেড়ি

সাধবোনা মনে করি
বোঝে কই প্রাণ ?
পদে পদে সই তাই
এত অপমান !
অবেলায় বাদলায়
মানুষ কি যায় ?
মাথা খাও রাখ কথা
ধরি দুটি পায়।
আর কোন দিন যদি
করি অনুরোধ,
শুনোনাকো শুনোনাকো
দিও প্রতিশোধ!
চেয়ে দেখ আকাশের
চোখ ছল্‌-ছল্‌,
মেঘ ডাকে গুরু গুরু
এলো বুঝি জল !

কাল রাতে ভাল করে
হয়নিক ঘুম,
কাঁদবে যে খোকা, তা কি
আগে জানতুম ?
শোবো তারে নিয়ে আজ
আলাদা না হয়,
দেখো দেখো হবে ঘুম
আজ নিশ্চয়।
কথা তুমি শোনোনাক
এই ভারি দোষ,
ব্যথা দিলে পরে মনে
পাবে আফ্‌শোষ,
তাই বলি কাল যেও
থেকে যাও আজ,
ঐ দেখ বিদ্যুত
পড়ে বুঝি বাজ !

এতখানি ময়দা যে
একা মাখলুম!
লুচি হবে বলে নেচি
কেটে রাখলুম !
হাট থেকে বেছে বেছে
আনালুম পান !
দূর করে দাও ; হোক্
সব লোকসান।

কাজ আছে ? কাজই বড় ?
কাজ নেই কার ?
ক্ষতি হয় তার আমি
দেব গুনগার।
ঐ দেখ খোকা করে
চোখ ছলছল,
কী জানি কি বুঝেচে ও
পড়ে বুঝি জল !

সেই সেদিনের কথা—
বেশীদিন নয়,
কত ভালবাসতে যে
তাকি মনে হয় ?
মার কাছে সে বছর
যবে আমি যাই,
মনে পড়ে কেঁদেছিলে
কত কান্নাই ?
আমি বল্লুম—ছি ছি
এত দুর্ব্বল !
ফিরবো ত দুদিনেই
চোখে কেন জল ?
এখন বিদায় দিতে
বাধেনাক আর,
হাসিমুখে চলে যাও—
কপাল আমার !

আমি যেন পর, তবু
খোকা ত আপন,
আখো লেখা চোখে ওর
মৌন বারণ !
বলতে পারেনা কথা
বোঝে সব ঠিক,
তুমি চলে যাবে চেয়ে
আছে অনিমিখ !
যাও যাও গায়ে হাত
দিওনাক ওর,
হয়েছে হয়েছে ঢের
যত্ন আদর !
বাজে কথা কয়ে কেন
মিথ্যে ভোলাও ?
সরো সরো কাজ আছে
হাত ছেড়ে দাও।

আয় খোকা, তোরে নিয়ে
দুরে সরে যাই,
শুয়ে শুয়ে ছড়া গান
গল্প শোনাই,
হোস্‌নেক তুই ওর
মত নিষ্ঠুর,
বউমা যা বলে, দিস্‌
সায় মঞ্জুর।
একি ! একি ! জামা জুতো
খুলচো হঠাৎ ?
যাবে না ? দাসীরে দয়া
হোল কি নেহাত্‌ ?
মেঘ সরে গিয়ে ঐ
ওঠে বুঝি চাঁদ ;
পালাবে আবার ; খোকা
বাঁধ্‌ ওরে বাঁধ্‌ !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম-বিচার

মহাভারতের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সমর্থনের জন্য আজ একটি উকিল নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে (আদর্শ-বিপর্য্যয়, ভারতী, শ্রাবণ)—তাই কি ব্যাসদেব বা কৃষ্ণের মতই উকিল?—সে এই দীন লেখকের মত একজন উকিল। কল্পনায় বেশ একটু humour আছে—ভারতীর পাঠক-পাঠিকা মাত্রকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই যুধিষ্ঠির চরিত্রটী কোন্ দিক হইতে কি ভাবে বিচার করা উচিত, জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে আমি তাহারই একটু আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র। কিরূপে ইহার কদর্থ করা যাইতে পারে, চাটুজ্যে-মশা'য়ের কথাগুলিতে তাহার একটা ধারণা হইয়াছে, তাই এই প্রসঙ্গে আমাকে আরও দুই-একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতে হইল। আশা করি, মহাভারতের একটি প্রধান নায়কের চরিত্র-সমালোচনার প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে না।

ভারতীর পাঠক-পাঠিকাদিগের মহাভারতের সহিত পরিচয়-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ও তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদীর সত্যানুসন্ধিৎসার প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি যতই সৎসাহসের বড়াই করুন না কেন--তাঁহার নিজের ছিদ্রান্বেষণের প্রবৃত্তিটাই যেন তাঁহার বিদ্রূপাত্মক-ভাষার মধ্য দিয়া ক্রমাগত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে চাটুজ্যে-ম'শায়ের চার্জ্জগুলি এই :—(১) তিনি নিশ্চেষ্ট, অদৃষ্টবাদী ও সুযোগপন্থী; (২) তিনি ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব এমন কি জড়পদার্থবৎ; (৩) তিনি ঈর্ষা-বিদ্বেষপরায়ণ ও স্বার্থান্ধ। পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তিনি যাহাই বলুন না কেন—এই চার্জ্জগুলি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মনোভাব গোপন করেন নাই। যাহা হউক, আমরা এখন একটী একটী করিয়া এই চার্জ্জগুলির বিচার করিয়া দেখিব।

তিনি সুযোগপন্থী কিরূপে তাহা চাটুজ্যে মশায় না বুঝাইয়া বলায় "begging of the question" দোষ ঘটিয়াছে। যুধিষ্ঠির নিজ-সত্যানুসারে বনবাসে কাল যাপন করিয়া, নিজরাজ্য-উদ্ধারের যাহা ন্যায়সঙ্গত চেষ্টা, তাহাই করিয়াছিলেন; উদ্যোগ-পর্ব্বটা মন দিয়া পড়িয়া দেখিলে এ-বিষয়ে ভ্রম থাকিতে পারেনা। তিনি তো কৈ আওরঙ্গজেবের মুরাদকে প্রতারিত করিবার মত কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানি না—বা Hamlet-এর মত ক্রমাগত To be or not to be বলিয়া কল্পনা করিয়াও ত চলেন নাই! অবশ্য তিনি সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়াও কখনও কার্য্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। আর যদি তিনি সুযোগের অপেক্ষাই করিতেন, তবে সভা-পর্ব্বেই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিতেন—কারণ তখনও তিনি রাজা এবং দুর্য্যোধন অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন, কিম্বা অন্যত্র চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের হাত হইতে দুর্য্যোধনকে মুক্ত না করিয়া সেই অবসরেই রাজ্যটা দখল করিতে পারিতেন। আর সুযোগপন্থীর ত সুযোগকালীন একটা কার্য্যতৎপরতা থাকা চাই, তাঁহার সহিত

নিশ্চেষ্টতার কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে? তবে যুধিষ্ঠির অদৃষ্টবাদী কিঞ্চিৎ ছিলেন, একথা অস্বীকার করিলে অসত্য কথা বলা হইবে। উপনিষদের জ্ঞানবাদ যখন ভক্তিবাদের রসে সরসতা প্রাপ্ত হইয়া মানবমাত্রেরই মনে ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধের একটা যন্ত্রী-যন্ত্র ভাবের ধারণার সৃজন করিয়া দিয়াছে, তখন দৈব বা অদৃষ্ট মানা স্বাভাবিক। মিল্টনও তাঁহার Paradise Lostএ স্বাধীন ইচ্ছা (free will) ও দৈব (destiny) লইয়া একটু গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। ভীষ্ম, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, সঞ্জয়—সকলেরই মুখে আমরা অদৃষ্টেরই অধিকতর প্রাবল্যের কথাই শুনিতে পাই। এ যুগে Napoleonও অদৃষ্টবাদী ছিলেন। নিশ্চেষ্টতা অদৃষ্টবাদিতার অপরিহার্য্য বিশেষণ হইতে পারে না।

তারপর, যুধিষ্ঠির ভীরু ইত্যাদি। সভাপর্ব্বেই যুধিষ্ঠিরের প্রতি চাটুজ্জ্যে-মশায়ের রাগটা ভীম সেনের ক্রোধকেও বুঝি ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাই সেখানে মহাভারত-কার "যেন অচেতন প্রায় হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন" বলিয়া অচেতন-প্রায় হওয়ার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন—চাটুজ্জ্যে-মশায় সেখানে "যেন" কথাটী উঠাইয়া দিয়া তাঁহার মনের মত তাৎপর্য্য ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিবেন, যুধিষ্ঠির তখনও দ্রৌপদীকে "রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপবর্ত্তিনী" হইতে বলিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। দ্রৌপদীও বলিতেছেন, "ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মে অবস্থিত আছেন, আমি ভর্ত্তার গুণগান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরমাণুমাত্র দোষস্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না" (সভাপর্ব্ব, ৬৩ তম অধ্যায়) এবং যুধিষ্ঠির যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অর্জ্জুন—এমন কি "ক্রোধস্বভাব ও অসহনশীল" ভীমসেনও স্বীকার করিয়াছেন (সভাপর্ব্ব, ৬৪ তম অধ্যায়)। দ্রৌপদীকে পণে রাখার অধিকার বিষয়ে বিদুরই সর্ব্বপ্রথমে তর্ক উঠাইয়াছিলেন (সভাপর্ব্ব, ৬৬ তম অধ্যায়)। বিরাট-পর্ব্বে পঞ্চাশ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিতেছেন, "যদি অসদুপায় দ্বারা রাজ্যভোগের অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে পাশাক্রীড়া-সময়েই তাহারা বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইত, পরন্তু ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়-ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই।" এস্থলে দ্রৌপদী ও ভীষ্মের কথাটা গ্রাহ্য করিতে চাটুজ্জ্যে-মশায়ের ক্ষতি কি? যুদ্ধে শল্যকে নিহত করাতেও যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বীরত্ব সম্বন্ধে চাটুজ্জ্যে-মশায় কোন প্রশংসা-পত্র দিতে নারাজ। তিনি সমসাময়িক সহোদর আত্মীয়-পরিজনের উক্তির উপরেই বেশী নির্ভর করিতে চান। সহোদর অর্জ্জুন, যিনি ভীম অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরকে একটু বেশী চিনিতেন, বলিতেছেন, "ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ, শৌর্য্য ও ধীশক্তি বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্য, সংগ্রামে ইনি যেমন অস্ত্র সকলে অভিজ্ঞ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকী মধ্যে তেমন আর কোন পুরুষই জানেনা ও কস্মিনকালে জানিবে না…পাণ্ডবদিগের মধ্যে ইনি অতিরথ, মহাবিকল্প, দীর্ঘদর্শী, অতিমাত্র তেজস্বী—বলবান, ধৃতিমান, কার্য্যদক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়—(বিরাটপর্ব্ব, ৮৬ অধ্যায়), তাঁহার আত্মীয়-পরিজন মধ্যে ভীষ্মের মতে যুধিষ্ঠির "কৌরবগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধৃতি, দম,

ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ, বল...ইহাঁতে প্রতিনিয়ত বিরাজমান" ইত্যাদি (শান্তিপর্ব্ব ৫৫শ অধ্যায়), ধৃতরাষ্ট্রের মতে তিনি "ধৈর্য্যশীল, সত্যনিষ্ঠ, বিজয়াসক্ত, অক্ষয় ধনুর্দ্ধর, দান্ত ও দুর্দ্ধর্ষণীয়" (দ্রোণপর্ব্ব)। বিদুরের মতে "যুধিষ্ঠিরের কোপ প্রবৃদ্ধ হইলে আকাশে বক্রভাবে পতিত ধূমকেতুর ন্যায় এই সমস্ত লোকের ধ্বংস উৎপাদন করিতে পারে" এবং তিনি "প্রতিভা দ্বারা ধর্ম্মাত্মা—"(উদ্যোগপর্ব্ব) এই সব উক্তি হইতে কি মনে হয়? তিনি সমসাময়িক কাহারও চক্ষে ভীরু ছিলেন না। আধুনিক সঙ্করকুচি-দিগের কাছেই তাঁহার বীরত্ব ভীরুতা বলিয়াবোধ হয়। যুদ্ধে জয়-পরাজয় দেখিয়া যদি বীরত্বের পরিমাপ করিতে হইত, তাহা হইলে বীর খুঁজিতে গিয়া রোঁয়া বাছিতে কম্বল উজাড় হইত, ভগবান বিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক হিণ্ডেনবার্গ পর্য্যন্ত কে যে যুদ্ধে পরাজিত হন নাই—তাহা ত জানি না। শল্য, কৃতায়ুধ প্রভৃতি বীরগণের নাশ করার কথা ছাড়িয়া দিলেও,দ্বৈরথ সংগ্রামে যুধিষ্ঠির দ্রোণকে নিবারিত করিয়াছিলেন (দ্রোণপর্ব্ব); পরাজিত হইলেও একাধিকবার কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন ভীমের বধ্য বলিয়াই কেবল ভীমের কথায় তাঁহার হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন (কর্ণপর্ব্ব), ঘটোৎকচ বধের পর নিজেই কর্ণকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। এগুলা নিশ্চেষ্ট বীরত্বের নিদর্শন কি না, তাহা তিনি চাটুজ্যে-মশায় একটা সচেষ্ট বীরের নিদর্শন দিলে ভাল বুঝিতে পারা যাইত।

ইহার উপর যুধিষ্ঠিরের শারীরিক বল হইতে প্রকৃষ্টতর একটা অন্যপ্রকারের তেজ ছিল বলিয়া মহাভারত-কার উল্লেখ করিয়াছেন—যাহার জন্য তিনি বনবাস-কালে নয়ন আবৃত করিয়াছিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র যাহার ভয় করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে মহাবাহু ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়াই দুর্য্যোধন সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, অধিক কি দৃষ্টিপাত-মাত্রে সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ (দ্রোণপর্ব্ব ৯ম অধ্যায়)। যক্ষের কোপের কাছে ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব যখন নিষ্ফল, তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাদের ত্রাতা, আবার ভীম যখন অজগর-রূপী নহুষের পাল্লায় পড়িয়া শারীরিক পরাক্রমের ব্যর্থতায় হাহাকার করিয়াছিলেন, তখন ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অর্ব্বাচীন পুত্র যেমন পিতার দ্বারা রক্ষিত হয় তাঁহারাও ধর্ম্মরাজের দ্বারা সেইরূপে রক্ষিত। চাটুজ্যে মশায়ও যুধিষ্ঠিরের দর্প দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দর্পটা যে দীনবন্ধুবাবুর বক্রেশ্বরের ন্যায় নিরপরাধ কদলী বৃক্ষের উপর দিয়াই ব্যয়িত হয় নাই, তাহাও দেখাইলাম। এ-হেন যুধিষ্ঠির কাপুরুষ ও তাঁহার ক্ষমা অশক্তের ক্ষমা! যে ভীত ত্রস্ত বিরাট-রাজাকে তিনি সুশর্ম্মার হাত হইতে নিজে যুদ্ধ করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, তাঁহাকে না হয় অক্ষপ্রহারের প্রতি-প্রহার করিতে পারিতেন না,—কিন্তু ভীম যখন জয়দ্রথের মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত, তখন তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিতেও কি অশক্ত? না, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের হাত হইতে দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়া দিয়া শক্তিহীনতারই পরিচয় দিয়াছিলেন? তিনি কি কুপিত নয়নে একবার চাহিয়াও অনিষ্ট করিতে শক্তিহীন ছিলেন?

এই যুধিষ্ঠিরের ঈর্ষা-বিদ্বেষও নাকি

খুবই ছিল! যখন কর্ণ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া বিশ্রাম লইবার জন্য শিবিরে আগমন করেন ও কর্ণের অমানুষিক পরাক্রম-দর্শনে রণজয় সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন অসময়ে অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া কর্ণবধ হইয়াছে বোধে আলিঙ্গন করিতে গিয়া যখন শুনিলেন, তিনি ভীমকে সঙ্কটময় যুদ্ধে একাকী রাখিয়া শিবিরে আসিয়াছেন, তখন অত্যধিক উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ণ-ভয়ে ভীত বোধে কটুবাক্য বলিয়াছিলেন—তখন তিনি কাহার হিংসা করিতেছেন? অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে? না, কর্ণের বিরুদ্ধে? তাঁহার বিরুদ্ধে শস্ত্রধারী হইয়া তাঁহাকে কি উপায়ে হনন করা যাইবে চিন্তা করা যদি হিংসা বা বিদ্বেষ হয়, তবে ত যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়াই যত দোষ করিয়াছেন! আর যে স্থলে দ্রৌপদী ভীম বা অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কটূক্তি করিয়াছেন, সে স্থলে তাহারা পরে লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন কেন? তাঁহারা ত বীরধর্ম্মী, সত্য বলিতে কুণ্ঠা কেন? আর সে সমস্ত সত্য হইলেও তাঁহার প্রতি তাঁহার বীর ও সত্যপরায়ণ ভ্রাতাদের যেরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে, তাহার সহিত জ্যেষ্ঠের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে এবং সাধারণ লোকের বা শত্রুদেরও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় কিরূপে? আর অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্ততার সময় আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হওয়ার উদাহরণ জগতের ইতিহাসে যুধিষ্ঠিরই একমাত্র নহে।

দুর্য্যোধন যখন বিশ্রাম লইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে হ্রদশায়ী হইয়া পাণ্ডবদিগের চক্ষে ধূলি দিয়াছেন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছেন, তখন যুধিষ্ঠির সন্ধান লইয়া তাহার নিকট গিয়া কি করিলেন?—ভীমসেন যেমন তাড়াইয়া জয়দ্রথের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা করিলেন না—তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "তুমি গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর, তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজা হও বা পরাজিত ও নিহত হইয়া শয়ন কর, বিধাতা তোমার নিমিত্ত এই পর-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব মহারাজ, তুমি যথার্থরূপে রাজা হও।" তখন দুর্য্যোধন একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, "অদ্যাপি তোমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, এই শূন্যপ্রায় পৃথিবী তোমারই হউক, তুমি নিরীশ্বরা বসুন্ধরা ভোগ কর" (শল্যপর্ব্ব, ৩১ অধ্যায়)। ইহাই নাকি দুর্য্যোধনের ক্ষমা চাওয়া, আর তখন ক্ষত্রবীর যুধিষ্ঠির যীশুখৃষ্টের মত কোল পাতিয়া দেন নাই,—এখানে চাটুজ্জ্যে-মশায় চটিয়া গিয়া কিরূপ রস-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সমালোচকেরা বিচার করিবেন। যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিলেন, "যদিও তুমি দান করিতে সমর্থ হও, তোমার প্রদত্ত অবনী শাসন করিতে আমি কামনা করি না—প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, তোমাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য লইব। আর তুমি অনীশ্বর হইয়া কি প্রকারে পৃথিবী দানে ইচ্ছা করিতেছ—অভিযুক্ত হইয়া কোন্ রাজা মেদিনী দান করিতে পারে?" আরও দু-একটা পূর্ব্ব-আচরণের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়া দিলেন,

তিনি সর্ব্বথা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেই অভ্যস্ত। এই কথাগুলাই নাকি "বেচারী দুর্য্যোধনকে মরণের মুখে ছুটে যাবার জন্যে বিষিয়ে তুলেছিল" যুধিষ্ঠিরের প্রতি দারুণ হিংসাও ইতিপূর্ব্বেই দুর্য্যোধনকে "বিষিয়ে তুলেছিল" বলিয়া জানি, সে দোষটাও কি যুধিষ্ঠিরের? আর যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে বীর, যাহা তোমার অভিলষিত তাহাই তোমাকে দিতেছি—তুমি আমাদের একজনকে হত করিয়া রাজা হও" ইহাতেও কি বেচারী দুর্য্যোধনের প্রাণটা "বিষিয়ে উঠেছিল?" কিন্তু বেচারী যুধিষ্ঠিরের ত এত করিয়াও ক্লীবত্বের কলঙ্ক ঘুচিল না! আচ্ছা, বিচিত্রবীর্য্য যেমন ভীষ্মের সাহায্যে বিবাহ করিয়াছিল এবং দুর্য্যোধনও যেরূপ কর্ণের সাহায্যে কন্যা হরণ করিয়াছিল, তেমনি যুধিষ্ঠিরও ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে কি একটা বিবাহ পর্য্যন্তও করিতে পারিতেন না—তাহা হইলেও ত চাটুজ্জ্যে-মশায়কে আর ক্লীবত্বের প্রমাণ খুঁজিতে কষ্ট পাইতে হইত না।

যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে আর-একটা চার্জ্জ আছে, সেটা একটু গুরুতর, বোধ হয় চাটুয্যে-মশায়ই সেটা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটা দ্রৌপদীর প্রণয় লইয়া অর্জ্জুনের সহিত প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা (rivalry),—বোধ হয় কতকটা জগৎসিংহ-ওসমানি ভাব এবং স্বর্গারোহণ পর্ব্বে দ্রৌপদীর পতনের কারণ নির্দ্দেশ-স্থলে সেটা নাকি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চ-স্বামীর পত্নী হইয়া একের প্রতি অনুরাগ যে কিরূপ দোষাবহ, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দ্রৌপদী" সমালোচনায় এটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সংস্কার—সেটা বিপক্ষেই হউক বা স্বপক্ষেই হউক—নিরপেক্ষ বিচারের পরিপন্থী। সেদিন Archer সাহেব ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় বর্ব্বরতা ছাড়া বিশেষ আর কিছু দেখিতে পান নাই। চাটুজ্জ্যে মশা'য়ও গালাগালির যুধিষ্ঠিরটীকেই সত্য করিয়া দেখিয়াছেন, আড়ম্বর করিয়া মহাভারত খুলিয়াছেন, কিন্তু চক্ষুর উপরকার রঙিন্ কাঁচখানা খুলিতে পারেন নাই। তাই, ক্রোধান্ধ ও আচ্ছন্ন বুদ্ধির ভিতর যুধিষ্ঠিরের যে বিকৃত চিত্রটী প্রতিফলিত হইয়াছে, ও সেই বিকৃত চিত্রের যে কটূক্তি-পূর্ণ বর্ণনা, প্রধানতঃ তাহা হইতেই মালমসলা লইয়া তাঁর সংস্কারের যুধিষ্ঠিরকে তিনি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ক্রোধের উক্তিতে নিরপেক্ষ বিচার ও যথার্থ বাক্য অন্বেষণ করা কতটা মনোবিজ্ঞান-সম্মত, তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই যখন যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তিনি কাপুরুষ, নিশ্চেষ্ট, জড় পদার্থ! আর যখন কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের শোণিত-যজ্ঞের বীভৎস দৃশ্যে তাঁহার প্রাণবান হৃদয়ের তারে নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের একটা প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে—তখন সেটা একটা ভণ্ডামি বা ন্যাকামি বোধ হইয়াছে দেখিয়া গল্পের দাদামহাশয়ের নাতি-নাতনীর দল সমগ্র মহাভারত পাঠ করিয়া কেবল পিতামহকে মারিয়া রাজ্য লওয়া ও দ্রৌপদীর পঞ্চ-পতিত্ব-টুকুই শিখিয়াছিল—তাহাই মনে পড়িল। কবি এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়াই—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা

লিখ"-টা লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়!

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। মহাভারতের ঘটনা-পরম্পরা এই পাণ্ডবদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে; আর পাণ্ডবদিগের কার্য্যকলাপ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াই সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব আর সমস্ত পাণ্ডবদিগকে যে আচ্ছন্ন করিয়া আছে—তাহা সমুদয় মহাভারত পাঠ করিলেই অনুভব করা যায়। যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া পাণ্ডব—কানু-ছাড়া গান। ভীমের শারীরিক পরাক্রম ও অর্জ্জুনের তেজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজ্ঞান দ্বারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে—ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব স্বীকার করেন। (বিরাটপর্ব্ব) বাস্তবিক পঞ্চপাণ্ডব যেন একটা Organised personality ,মহাভারত-কারও এটা প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই, বরং স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, "যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাদ্রুম, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রী-সুতদ্বয় পুষ্প-ফল, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ইহার মূল। (মহাভারত; আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায়)। শ্রীকৃষ্ণ এই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন (উদ্‌যোগপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়)। এই যুধিষ্ঠিরকে পরিস্ফুট করিবার জন্য "মন্যুময় দুর্য্যোধনের" অবতারণা। এখন মহাভারত-কারের ধর্ম্মরাজের মূর্ত্তি গড়িবার অভিপ্রায়টা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে চাটুজ্জ্যে-মশায়ের মতানুসারে তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। যিনি ভীমার্জ্জুনের মত ধার্ম্মিক ও ক্ষত্রিয়-বীর ভীষ্মের মত ব্রহ্মচারী বীর, সুভদ্রা-দ্রৌপদীর মত বীরাঙ্গনার পরিকল্পনায় অক্ষম ছিলেন না—তিনি কেবল ধর্ম্মরাজ গড়িতে গিয়াই অকৃতকার্য্য হইলেন—অর্থাৎ কাব্যশিল্পে তাঁহার অধিকার থাকা সত্ত্বেও যে এই অক্ষমতা তাহা তাঁহার যথেষ্ট ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব-হেতু নিশ্চয়ই। মহাভারত-কারকে ধর্ম্মানভিজ্ঞ বলিলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে বটে—কিন্তু সত্য কথা কতটা কতদূর বলা হয়—তাহার বিচার পাঠক-পাঠিকাদের উপরই থাকিল। অথচ চাটুজ্জ্যে-মশায়ের যুক্তি-মত অন্য সিদ্ধান্ত হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত কথা, চাটুজ্জ্যে মশায় যুধিষ্ঠিরকে কাব্য-সৌন্দর্য্যের দিক হইতে দেখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা করেন নাই—বা পারেন নাই। কাব্য-সমালোচনার গোড়ার কথা হইল, Sympathy অর্থাৎ প্রাণ দিয়া প্রাণের অনুভূতি—এবং ইহার মূলে চাই বিদ্বেষ-বিহীন হৃদয়ের উদার প্রসারতা। তাই ইংরাজ সমালোচক Raleigh এক স্থানে বলিয়াছেন, সেক্ষপীয়রের সমকক্ষ (peer) না হইলে সম্পূর্ণভাবে সেক্ষপীয়র বুঝা যায় না। কর্ম্মসমষ্টির অন্তরালে যে রসময় মূর্ত্তিটী অম্লান সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে তাঁহার অখণ্ড ঐক্যের (integral unity) দিক হইতে ভাব দিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে হইবে, সরস প্রাণের অনুরঞ্জনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই সমস্ত কার্য্য কেবল বিচারের বিষয়ীভূত করিয়া দেখিতে গেলে সেই "কপি খুঁজিতে গিয়া কপির পাতা খোঁজা" হইবে। যে সহস্রদল ঢলঢল সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার প্রত্যেক দলটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্কেল-কম্পাসের মাপে ফেলিলে দেখা যায়, ছোট-বড়। সে সত্যানুরাগ ও অবিচলিত নিষ্ঠা

দৈনিন্দন কার্য্য-কলাপকে সুসঙ্গতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠির-জীবনে নিয়মচক্রে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই প্রাণ-স্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যুধিষ্ঠির-চরিত্র বিচার করিতে যাওয়ায়—চাটুজ্জ্যে-মশায় পাইয়াছেন ভাটপাড়ার শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্রাহ্মণের শুষ্ক আচার। বিচারের মধ্য দিয়া বস্তুর প্রাণের সন্ধান করিতে যাওয়াটাই ভুল। আমি যুধিষ্ঠিরকে মানুষ ধর্ম্মরাজ বলিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু যে কবির কল্পনায় এই মূর্ত্তি প্রতিভাত, তাহা যে আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত, সেটা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আধ্যাত্মিকতাটা হিন্দুদের "safety valve" বলিয়া একটী তুড়ি মারিলেই কি সেটা ধোঁয়ার মত উড়িয়া যাইবে? আধ্যাত্মিক সত্যটাও যে সত্য—সকলে না মানিলেও। আর কবির প্রেক্ষণার দিক হইতে না দেখিলে তাঁহার সৃষ্টির রস গ্রহণই হইবে না—আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

এই যুধিষ্ঠিরের শান্তরসাস্পদ মূর্ত্তিটি সত্য ক্ষমা ধৃতি তিতিক্ষা মূর্ত্তিতে সংহতবীর্য্যের অলৌকিক ঔজ্জ্বল্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইহা ত্রিভুবন শাসনের উপযুক্ত রাজলক্ষণ-বিশিষ্ট—ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য তাঁহার অধিকারে, সমগ্র রাজবৃন্দ তাঁহার কাছে কর-দাতা, তাঁহাতে ক্ষমতার চাপল্য নাই। টেনিসনের আর্থারও কতকটা যেন এইভাবের; তিনিও শৌর্য্যসম্পন্ন রাজা,—তাঁহার r und table এর নেতা। এখানে ল্যান্সিলটের শস্ত্রবীর্য্যটা (Knighthood) অর্জ্জুনের প্রতাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শারীরিক বলের প্রকাশ যুধিষ্ঠির ও আর্থার উভয়ের মধ্যেই আধ্যাত্মিক শৌর্য্যে আত্মগোপন করিয়াছে।

শারীরিক ক্ষমতা যখন অন্যকে আঘাত করা অপেক্ষা আঘাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়—তখনই ইহা মহান, এই সত্যটাই প্রাণের কথা। রামায়ণের রাম হইতে বুদ্ধ চৈতন্য পর্য্যন্ত সকলেরই জীবনে এই সত্য প্রকট হইয়াছে। যুদ্ধটা যুধিষ্ঠিরের চক্ষে অপ্রিয় কর্ত্তব্য। বাঙ্গলার তত্ত্বদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "ঘরে বাইরে" নামক উপন্যাসে নিখিলেশের শান্ত সমাহিত সহিষ্ণু চরিত্রের সহিত সন্দীপের উদ্দাম রণোন্মুখ মত্ততার বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই বাণীই পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং আধুনিক ভারতে এই তিতিক্ষার ধর্ম্মটাকেই চিনিবার চেষ্টা হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের আত্মাকে Oliver Lodge কিংবা Conan Donyleএর হাতে সঁপিয়া চাটুজ্জ্যে মশায় hewers of wood and drawers of waterএর পদ হইতে প্রমোশন পাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞাত নহি। সন্দীপের মত একটা দল আছে, তাহাদের নিকট জবরদস্তিই পুরস্কার—এমন-কি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিটাই দুর্ব্বলতা। ইহার মধ্যে কিন্তু বিলাতী সুরার উগ্র গন্ধটুকু সময়ে সময়ে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কালের নিকষ পাথরে এই আদর্শ দৃষ্টির তারতম্যানুসারে চিরকালই উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল ঠেকিবে, কিন্তু পরীক্ষা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, সাহসটা বিবেক-বুদ্ধির সংস্পর্শ-শূন্য হইলে—যে পথেই লইয়া যাক্—সেটাও উন্নতির পথ নহে। *

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়

* অতঃপর এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আর-কোন কথা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইবে না। ভাঃ সঃ।

কলঙ্কের আলো

মারা গেছেন মুন্সী সাহেব, শুনবে কে কি পেলে?
জমিদারীর আধেক পেলে বাঁদীর ছোট ছেলে।
হরেক রকম নূতন গুজব উঠছে চারিপাশে,
বাঁদীর কাঁচা বয়স শুনে মুখ টিপে কেউ হাসে।
কেউ বা বলে বৃথায় করো মিঞার অপযশ
দেখছি মোরা আঙুর চেয়ে আখরোটেতে রস।
সুপ্ত প্রেমের গুপ্ত লীলা সব পেয়েছে টের,
শেষ বয়সে মক্কা যাওয়ার রহস্যও ঢের।
কালকে হবে উইল খোলা ঢাকবে কতক্ষণ,
হাজি কেমন সত্য বলেন শুনবে জগজ্জন।

এটর্ণি তাঁর খুললো উইল গোপন চিঠিখান
বললে সবাই গুপ্ত ও থাক্ বজায় থাকুক মান।
কেউ বা বলে, পড়ুন পড়ুন, ওটা পড়াই চাই—
শোনার আগেই শুনেছি সব, নূতন কিছুই নাই।
লিখে গেছেন,—আজও আমার স্মরণ আছে বেশ
খুন করিয়া ভাইপো যেদিন হলেন নিরুদ্দেশ—
নিত্য ঘরে পুলিস ঘোরে হুলিয়া ঘর-ঘর,
কোথাও তাহার চিহ্ন নাহি, উধাও অতঃপর।
এড়াতে হায় নিত্য নূতন হাস্য-উপহাস,
গ্রাম ছাড়িয়া করতে এলাম কলকাতাতে বাস।

তখন থেকে এই বাঁদী মোর দশ বছরের মেয়ে,
রইলো ঘরে আনন্দেতে আমার স্নেহ পেয়ে।
কার্য্যে তাহার নিষ্ঠা অতুল, সব জিনিষে খোঁজ,
সময় পেলেই পড়তো কোরাণ ভক্তিভরে রোজ।
চক্ষু ভরি উঠতো তাহার জম জমেরি জল,
বুকের পরে পড়তো ঝরে মুক্তা সুবিমল।

বয়স যখন উনিশ কুড়ি হাইদী অকস্মাৎ
করলে সাদী, মোসাফির এক কারিগরের সাথ।
প্রাণেশ তাহার সুরূপ যুবা, রাজা না হক, রাজ,
সম্মুখে ওই মসজিদেতে করতো কারু কাজ।

একটী দিবস হাইদী হঠাৎ আমার কাছে আসি
দাঁড়ালো হায় কাতরভাবে নয়ন জলে ভাসি;
বললে, হুজুর কাহিল স্বামী দেখতে তোমায় চায়,
হেকিম দেছে জবাব, বেশী সময় নাহি, হায়!
বিষম ব্যাকুল দেখেই তারে গললো হৃদি স্নেহে
তাহার সাথেই সেই পোষাকে গেলাম তাহার গৃহে।
শীর্ণ দেহ, উজল আঁখি করুণ স্বরে রাজ
বললে, জনাব, চাই যে ক্ষমা, বিদায় মাগি আজ।
আমিই তোমার অযোগ্য সেই পুত্র, খুনি হীন,
পাপী কসুর মাপ চাহিছে, চরণ-ধুলা দিন্।
লহন তাহার মাথার টুপি ভিক্ষা সে যে চায়
পাপীর টুপি পায় যেন ঠাঁই, কাবার আঙিনায়।

মুদলো আঁখি, মুচ্ছা গিয়ে পড়ল বাঁদী ভূমে
আমার কোলে উঠলো শিশু, নিলাম মুখে চুমে।
বাঁদীর ছেলে নয়রে, এ মোর ভগবানের দান,
আমার ভ্রাতার স্মৃতির স্মৃতি, স্নেহের অভিজ্ঞান।
পিতৃহীনের পুত্র এ যে শুষ্ক তরুর ফুল,
আধেক তালুক রইলো তাহার,—কে তার সমতুল?

পাঠের শেষে এটর্ণি কন্ ধন্য বিরাট বুক!
চুপটী করে নিন্দুকেরা রইলো অধোমুখ।
চোখ্ তুলে চা আত্মীয়েরা, বুক ভরে আজ কাঁদ,
কলঙ্ক নয়, দেখ্ সুমুখে রমজানেরি চাঁদ!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মারিয়ানা

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেলিওর গৃহ

হেরমিয়া, কয়েকজন ভৃত্য, মালভোলিও।

হেরমিয়া। ফুলগুলি যে ভাবে বলেছি সেইভাবে সাজিয়ে রেখো। তারপর, বাজিয়েদের আস্‌তে বলা হয়েছে কি?

জনৈক ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ, মা ঠাকরুণ! তারা খাওয়ার সময়েই এসে উপস্থিত হবে।

হেরমিয়া। ঘুলঘুলি সব বন্ধ, বড় অন্ধকার হয়েছে—আলো আস্‌তে দাও, দেখো আবার রোদ্দুর যেন না পড়ে। বেশী ফুল আর বিছানার উপর ছড়াতে হবে না। রান্নাটা ভাল রকম হয়েছে ত! আমাদের প্রতিবেশিনী জেরগোলী-গৃহিণী আস্‌ছেন কি?···বাছা আমার বেরিয়ে গেল কখন?

মালভোলিও। বেরিয়ে যেতে হলে আগে ঘরে ফেরা দরকার। রাত্তিরটা তিনি বাইরে-বাইরেই কাটিয়েছেন।

হেরমিয়া। কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। কাল রাত্রে আমরা দুজনে' এক সঙ্গে খেয়েছি, তারপর সে আমায় সঙ্গে করে বাড়ীতে ফেরে। আচ্ছা, সকালে যে ছবিখানা কিনেছি, সেটা তার ঘরে টাঙ্গানো হয়েছে?

মালভোলিও। আজ যদি তার বাপ বেঁচে থাকৃত, তা হলে সে আর এ-রকমটি হতো না। লোকে দেখে বল্‌বেই বা কি, আমাদের ঠাকরুণটির বয়েস এখনও আঠারো বছর পেরোয় নি, আর তিনি তাঁর আদুরে ননী-গোপালটির জন্যে হাঁ করে পথ-পানে চেয়ে রয়েছেন!

হেরমিয়া। আজ তার মা চেয়ে আছে তাই সে এ-রকমটিই হয়েছে, মালভোলিও। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, তার স্বভাব-চরিত্রের ওপর পাহারাদারী কর্‌বার ভার তোমায় কে দিয়েছে? মনে রেখো একটা কথা, কেলিও যেন চোখের সাম্‌নে কখন কোন অলক্ষুণে মুখ না দেখ্‌তে পায়। ভাগাড়ের কুকুর হাড়ের লোভানি পেলে তা চিবুবার জন্যে যেমন করে মুখ বুঁজে গর্‌-গর্‌ করতে থাকে, তেমনি ধরণের তোমারও গরগরানি যেন কখনো তার কানের কাছে না পৌঁছোয়। তা হলে, বলে দিচ্ছি, তোমাদের কেউ আর এক রাত্রিও এখানে আশ্রয় পাবে না।

মালভোলিও। আমি কিছুর জন্যেই গর্‌-গর্‌ করিনে। আমার চেহারাও অলক্ষুণে নয়। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, মনিবটি আমার কখন বেরিয়ে গেছেন; উত্তরে আমি বল্‌লেম, তিনি ফেরেনই নে। যে দিন থেকে তাঁর মাথায় লভ্‌ ঢুকেছে, সেদিন থেকে হপ্তায় চারটিবারও তাঁর দেখা পাওয়া যায় না।

হেরমিয়া। বেশ, তা এই বইগুলো ধুলোমাখা কেন? ও জিনিষ-পত্তরগুলোই বা এলোমেলোভাবে রয়েছে কেন? কিছু দরকার হ'লে আমরাই বা ক'রে মিলে নিতে হয় কেন? নিজের কাজ অর্দ্ধেক করে ফেলে রেখেছেন, আর পাঁচজনকে তা সেরে নিতে হচ্ছে, তোমারই ত সাজে পরের কথায় সর্দ্দারি করা! যাও, চুপ করো।

(কেলিওর প্রবেশ)

এই যে বাছা আমার, এসো, এসো! আজকে তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে, বল ত?

(ভৃত্যদের প্রস্থান)

কেলিও। তোমার যা, তাই, মা।

(উপবেশন)

হেরমিয়া। তা বেশ, কিন্তু ইচ্ছের বেলায় এক ঘরে, অনিচ্ছের বেলায় নয়, এরকম ভাগাভাগি যে অন্যায়, কেলিও। আমার কাছ থেকে তোমার গোপন কর্‌বার কিছু থাকে, তা নয় থাক্‌ল,—কিন্তু তোমার বুক যাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে, যাতে ক'রে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তুমি উদাসী হয়ে পড়্‌ছ, এমনতর জিনিষ ত গোপন করবার নয়।

কেলিও। গোপন করবার আমার কিছু নেই! যদি কিছু থাক্‌তো, তবে ভগবানকে বল্‌তেম তাতে এমন ধরণের শক্তি দিতে, যেন আমায় একটা পাথরের মূর্ত্তি করে সে ফেল্‌তে পার্‌তো।

হেরমিয়া। তুমি যখন দশ বার বছরটির ছিলে, তখন তোমার সব কষ্ট, তোমার ছোটখাট বেদনা আমারই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। আমারই এই চোখের একটি কঠোর বা কোমল দৃষ্টির উপর নির্ভর করে ফুটে উঠ্‌তো তোমারও ও চোখে কান্না কি হাসি। তোমার ছোট্ট দেহটুকু কি একটা সূক্ষ্ম তার ধরে তোমার মায়ের হৃদয়খানি আঁকড়ে ছিল! আর এখন, বাছা রে আমার, আমি ত শুধু একজন স্থবিরা আত্মীয়মাত্র—তোমার দুঃখে শান্তি দেবার শক্তি আমার নেই; কিন্তু তাই বলে তার ভাগও আমি কিছু নিতে পারি নে, তা তুমি মনে করো না।

কেলিও। মা, তোমারও ত এককালে রূপ ছিল। এই যে শুভ্র কেশ-দাম তোমার গরিমাময় ললাটের ওপর ছেয়ে পড়েছে, এই যে দীর্ঘ বিলম্বিত বস্ত্রখানি তোমায় ঢেকে রেখেছে, সে সবের ভিতর দিয়ে এখনও যে চোখে লাগে সম্রাজ্ঞীর গতি-ভঙ্গী, কোন্ এক দেবীর সুঠাম অঙ্গের গঠন। মা গো! তুমিও ত ভালবাসা পেয়েছিলে! তোমার ঈষৎ-উন্মুক্ত গবাক্ষের নীচে বীণা মৃদুমন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল—এমনি সব কোলাহল-মুখরিত প্রমোদ-উদ্যানে, এমন সব চঞ্চল উৎসবের ক্ষেত্রে তুমিও দেখিয়ে বেড়িয়েছ তোমার নিশ্চিন্ত গর্ব্বিত যৌবন। নিজে কিন্তু তুমি কখনো ভালবাস নি; আমার পিতার একজন আত্মীয় তোমার প্রেমে প্রাণ দিয়েছে।

হেরমিয়া। কি সব কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ তুমি আমায়?

কেলিও। আহা! সে বেদনা যদি বুকে ধরে কম করতে পার, যদি তাতে চোখের জল তোমায় ফেল্‌তে না হয়, তবে ঘটনাটি আমায় বল ত, মা গো, সব খুলে বল ত দেখি।

হেরমিয়া। সেই প্রথম। তার আগে তোমার পিতা আমায় কখনো চোখে দেখেন নি। তিনি আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; তাই যুবক অর্শিনি যে আমায় বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিল তা মঞ্জুর করিয়ে নেবার ভার তিনি গ্রহণ করলেন। পদ-মর্য্যাদা অনুসারে তাঁকে আমার পিতামহ আদর-

অভ্যর্থনা করলেন, আর মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুজনে দুজনার অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। অর্শিনি যোগ্য পাত্রই ছিল, তবুও তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করলেম। তোমার পিতা তার হয়ে যে-ভাবে বক্তৃতা করলেন, তাতে দু-মাস ধরে অনবরত চেষ্টায় যে ভালবাসাটুকু আমার হৃদয়ে অর্শিনি জাগিয়ে তুলেছিল, তা সব পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু আমার উপর টান তার যে কত গভীর ছিল তখন, তা বুঝতে পারি নি—আমার উত্তর পেয়ে সে তোমার পিতার কোলের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।' এর পরে সে দূর বিদেশে চলে যায় এবং বহুকাল অনুপস্থিত থাকে, আর সে-অবস্থায় অনেক টাকা-কড়িও করে। তাতে মনে হয় তার শোকও ক্রমে মুছে আসে। তোমার পিতা তখন ফিরে আর এক ভাব ধরলেন—অর্শিনির জন্যে যে জিনিষ চেয়ে তিনি পান নি, নিজের জন্যে তাই চেয়ে বসলেন। তাঁর উপর আমার সত্যকার ভালবাসা ছিল, আর আমার আত্মীয়-স্বজনের মনে এমন শ্রদ্ধা তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইতস্ততঃ করবার উপায়ও আমার আর থাকল না। সেই দিনই বিবাহের পাকা কথা হল আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে গেল। এই সময়ে অর্শিনি ফিরে এল। সে তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলে আর মুখের উপর বললে যে তিনি বিশ্বাসঘাতক, নিজে পাবার জন্যেই অপরকে প্রত্যাখান করিয়েছেন। তাঁর শেষ কথা এই, "আমার মৃত্যুই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে"। এ কথায় ভয় পেয়ে তোমার পিতা আমার পিতার কাছে এলেন, অর্শিনির ভুল দেখিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে সাক্ষী মানলেন—হায়! তার সময় হ'ল না, লোকে গিয়ে দেখলে, অভাগা যুবক তার ঘরের মধ্যে ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে রয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লোদিও'র বাগান

ক্লোদিও এবং তিবিয়ার প্রবেশ।

ক্লোদিও। তুই ঠিক বলেছিস্—স্ত্রী আমার পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। বেশী কি বল্‌ব, সে জাগ্রত সতীত্ব!

তিবিয়া। সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করেন?

ক্লোদিও। তুই-ই বল্‌না, তার খড়খড়ির তলায় কেউ যদি বসে গান গায়, তবে কি সে তা বন্ধ করতে পারে? আর এই গানের দরুণ তার মনটাতেও ভিতরে ভিতরে যদি কিছু চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, তবে সে জন্য তার স্বভাবটাই দায়ী। আর এক কথা, তার মায়ের মনটাও আজ নেড়ে চেড়ে একটু দেখ্‌লেম, কিন্তু তিনিও সরাসরি আমারই মতে মত দিয়ে ফেললেন।

তিবিয়া। কি বিষয়ে?

ক্লোদিও। এই যে—লোকে তার খড়খড়ির তলায় গান গায়।

তিবিয়া। গান গাওয়া ত দোষের নয়, আমিও ত সময়ে-অসময়ে বসে বসে গুন্‌ গুন্‌ করি।

ক্লোদিও। কিন্তু ভাল ক'রে গাইতে পারা একটু শক্ত ব্যাপার।

তিবিয়া। শক্ত আপনার আমার কাছে,

আমাদের গলা নেই আর চর্চ্চাও কখন করি নি; কিন্তু দেখুন ত থিয়েটারের লোক-গুলোকে, কেমন খাসা ও কাজটা তারা সেরে ফেলে।

ক্লোদিও। জীবনটাই যে তারা কাটিয়ে দেয় ঐ তক্তার উপরে।

তিবিয়া। আচ্ছা, বছরে কত আয় হ'তে পারে, বলুন ত?

ক্লোদিও। কার? সহর-কোটালের?

তিবিয়া। না, এক-এক জন গাইয়ের।

ক্লোদিও। তা কে জানে! আমার পদের যে মূল্য, তার তিন ভাগের এক ভাগ পায় সহর-কোটাল, আর তার অর্দ্ধেক পেয়ে থাকেন সহকারীরা।

তিবিয়া। আমি যদি বড় আদালতের বড় হাকিম হতেম আর আমার স্ত্রী যদি নাগর করত, তবে তাদের আমি নিজেই দণ্ড দিতেম।

ক্লোদিও। কত বৎসর দ্বীপান্তর?

তিবিয়া। ফাঁসি। ফাঁসির হুকুম জোরে পড়্তে কি মজা!

ক্লোদিও। হাকিম নিজে তা পড়েন না, পেশ্‌কারে পড়ে।

তিবিয়া। আপনার আদালতের পেশ-কারের স্ত্রীটি খুব সুন্দরী।

ক্লোদিও। না, আমার আদালতের হাকিমের স্ত্রী সুন্দরী। কালই ত তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।

তিবিয়া। পেসকারের স্ত্রীটিও সুন্দরী। আজ সন্ধ্যাবেলায় যে গুণ্ডাটার আস্‌বার কথা আছে, সে পেশকারের স্ত্রীর জার।

ক্লোদিও। কোন্ গুণ্ডা?

তিবিয়া। আপনি যাকে চেয়ে পাঠিয়েছেন।

ক্লোদিও। তোকে বল্লেমই ত, এখন আর তার দরকার নেই।

তিবিয়া। কি বল্‌লেন?

ক্লোদিও। আমার স্ত্রীর কথা।

তিবিয়া। ঐ যে তিনি স্বয়ং!

(মারিয়ানার প্রবেশ)

মারিয়ানা। তুমি ত বেশ চরে বেড়াও, কিন্তু এদিকে আমার কি হয়, তার খোঁজ রাখ কি? তোমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ক্লোদিও। কে সে? নাম বল ত?

মারিয়ানা। অক্তাভ। তিনি তাঁর বন্ধু কেলিও'র পক্ষ হয়ে আমার কাছে প্রেম জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন। কে এ, কেলিও? তুমি চেনো কি? কিন্তু এর বন্দোবস্ত কর, যেন তিনি বা অক্তাভ কেউ আমার বাড়ীতে আর পা না দেন।

ক্লোদিও। কেলিওকে চিনি—আমাদের প্রতিবেশী হেরমিয়ার ছেলে। আচ্ছা, সে কথার উত্তর তুমি কি দিলে?

মারিয়ানা। আমি কি উত্তর দিলেম না দিলেম, তা নিয়ে কিছু দরকার নেই, যা বল্‌লেম, বুঝ্‌লে ত? তোমার চাকরকে ডেকে হুকুম দাও, যেন তারা ও লোকটি কি তার বন্ধুকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দেয়। এদের হাতে আমার অপমানের সম্ভাবনা আছে, তাই দূরে থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গল।

[প্রস্থান]

ক্লোদিও। কাণ্ডটা দেখে তুই কি বুঝলি, তিবিয়া? নিশ্চয়ই একটা ফন্দী কিছু এর ভিতরে আছে।

তিবিয়া। আপনি তাই মনে করেন?

ক্লোদিও। কি উত্তর দিয়েছিল মারিয়ানা তা বল্‌তে চাইলে না কেন? প্রস্তাব করাটা বেয়াদবী নিশ্চয়ই, কিন্তু উত্তরটাও ত জানার জিনিষ। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেলিওই ও-সব গান-বাজনার পাণ্ডা।

তিবিয়া। ও লোক দুটির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায়, ওদের কারুকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দেওয়া—

ক্লোদিও। সে আমি বুঝ্‌ব। কথাটা কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে একবার জানাতে হবে। আমার মনে হয় আমার স্ত্রীটি আমায় প্রতারণা করছে। এ-সব গল্প একেবারে মন-গড়া, উদ্দেশ্য আমায় দিশেহারা করে দেওয়া, আমার সব ধারণা গুলিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একটি রাস্তা

অক্তাভ ও চিয়ুতা'র প্রবেশ।

অক্তাভ। তুমি বলছ সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে সে?

চিয়ুতা। আহা, বেচারী ছেলে! ভালবাসা কি তার কমেছে? বরং আরও বেড়েছে। সে কিন্তু মনে কর্‌ছে তার দুঃখের কারণ ওটা নয়, আর একটা কি বস্তু। আমার ত মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার উপর আমার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তার অবিশ্বাস জন্মে গেছে।

অক্তাভ। না, কখ্‌খনো না। এই পণ করলেম, আমি কিছুতেই ছেড়ে-ছুড়ে দেব না। হ্যাঁ, আমি যেন দ্বিতীয় মারিয়ানা হয়ে উঠেছি। এক-গুঁয়ে হতে আনন্দ আছে বটে। কেলিও সফলকাম হবে, নয়ত আমার জিভা খসে পড়বে।

চিয়ুতা। কেলিও'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি চল্‌বেন?

অক্তাভ। হাঁ, আমার ইচ্ছা-অনুসারেই চল্‌ব, আমার ইচ্ছা তার ইচ্ছার বড় ভাই। কাজী ক্লোদিও বেটাকে জাহান্নামে পাঠাব; তার পা থেকে চুলটি অবধি প্রত্যেক অঙ্গ আমার দু'চক্ষের বিষ।

চিয়ুতা। আচ্ছা, আপনার উত্তর কেলিও'র কাছে আমি নিয়ে যাব, কিন্তু এর মধ্যে আমি আর নেই।

অক্তাভ। বন্ধুর শত্রুকে উৎসন্ন দিতে, কেবল নিজেকে কেন, বন্ধুকেও যদি উৎসন্ন যেতে হয়, তা পর্য্যন্ত আমি করে ফেল্‌তে পারি, এমন ধরণের লোক আমি।

(কেলিওর প্রবেশ)

অক্তাভ। সে কি, কেলিও, তুই নাকি হাল ছেড়ে দিয়েছিস?

কেলিও। কি করতে বলিস্‌ তবে?

অক্তাভ। আমার উপর তোর অবিশ্বাস? তোর হয়েছে কি? তুই যে বরফের মত সাদা মেরে গেছিস্‌? তোর মনে হচ্ছে কি, বল্‌ দেখি?

কেলিও। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো! তুমি যা ভাল বোঝো তাই কর। যাও, মারিয়ানার সঙ্গে দেখা কর গিয়ে। তাকে বলো, আমাকে প্রতারণা করার অর্থ আমাকে মেরে ফেলা, আমার জীবন নির্ভর কচ্ছে তারই একটা চাউনির উপর।

[প্রস্থান]

অক্তাভ। কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!

চিয়ুতা। চুপ করুন। সন্ধ্যা-আরতি বাজছে। বাগানের দুয়োরটা ঐ খুলল। মারিয়ানা বাইরে চলেছে—ঐ যে আস্তে আস্তে এদিকে এগিয়ে আসছে।

[চিয়ুতার প্রস্থান, মারিয়ানার প্রবেশ]

অক্তাভ। সুন্দরী মারিয়ানা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখন ঘুমুতে পার—কেলিও আর একজনকে তার হৃদয় দিয়েছে, তোমার জানলার তলে আর সে গান গাইবে না।

মারিয়ানা। কি পরিতাপ! কি দুর্ভাগ্য! তার মত মানুষের সঙ্গে আমার ভালবাসাবাসি হলো না! দেখুন ত, ঘটনাচক্রে সব আমার কেমন উল্টে-পাল্টে গেল। আমি যে তাঁকে ভালবাস্‌তে যাচ্ছিলেম।

অক্তাভ। সত্যি!

মারিয়ানা। সত্যি, এই বুকে হাত দিয়ে বল্‌ছি। আজ সন্ধ্যাবেলায় কি কাল সকালে, খুব দেরী হলে এই রবিবারেই আমি তাঁর হয়ে যেতেম। আপনার মত প্রতিনিধি যে পেয়েছে, সে কি আর না জিতে থাক্‌তে পারে? কিন্তু বল্‌তে হবে, আমার উপর আপনার বন্ধুর অনুরাগটা চীনা বা আরবীর মত কিছু হবে! কারণ দোভাষী ছাড়া একে অমনি বোঝা যায় না!

অক্তাভ। কর ঠাট্টা, ঠাট্টা কর, আর তোমাকে আমরা ভয় করি নে।

মারিয়ানা। অথবা ও ভালবাসাটি ছিল যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু, আর আপনি ধাই হয়ে তাকে বনের ধারে রেখে আসতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু সহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন।

অক্তাভ। না, ধাই তা করেনি; সে কেবল শিশুটিকে সেই দুধের খানিকটা খেতে দিয়েছিলেন—যা তোমার ধাই তোমাকে নিশ্চয়ই মুক্তহস্তে ঢেলে দিয়েছিল—তোমার মুখে এখনও তার এক ফোঁটা লেগে আছে, তোমার প্রতি কথার তা বেরিয়ে আসছে!

মারিয়ানা। এমন অত্যাশ্চর্য্য দুধটির নাম কি?

অক্তাভ। উদাসীনতা! তুমি ভালও বাস্‌তে জান না, ঘৃণাও করতে পার না। মারিয়ানা, তুমি যেন বাংলাদেশের গোলাপের মত, তাতে কাঁটাও নেই, গন্ধও নেই।

মারিয়ানা। চমৎকার বলেছেন। উপমাটা কি আগে থেকেই তৈরী করা ছিল? আপনি যদি আপনার বক্তৃতাগুলির পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে না ফেলেন, তবে অনুগ্রহ করে আমায় দেবেন, তোতা পাখীটিকে তা শেখাব।

অক্তাভ। ব্যথা লাগ্‌বার মত তোমায় আমি কি বল্লেম? গন্ধ না থাক্‌লে ফুল যে কিছু কম সুন্দর হয়, তা নয়; বরং তার উল্টোই—সব চেয়ে সুন্দর ফুলকেই বিধাতা গন্ধহীন করে গড়েছেন। আর তোমারও—নারী-শিরোমণি বলে—যে দিন প্রস্তর মূর্ত্তি গড়া হবে, সে দিন ভাস্কর্য্যের কি নিঁখুৎ আদর্শই না সৃষ্টি হবে, তখন বাকী থাক্‌বে কেবল কোন দেবমন্দিরে তোমাকে স্থাপনার জন্য একটি বেদী প্রতিষ্ঠা করা।

মারিয়ানা। মহাশয়, মেয়েদের অবস্থা দেখে আপনার কি কিছু দয়া হয় না? এই দেখুন না, আমারই কি রকম নিয়তি। নিয়তির লেখা, তাই কেলিও আমায় ভালবাস্‌লে অথবা ভাল-বাসে বলে মনে করলে, সেই কেলিও তার

বন্ধুদের বল্‌লে, সেই বন্ধুরা ব্যবস্থা দিলেন আমাকে তার উপপত্নী হ'তেই হবে, নতুবা আমার ফাঁসি। নেপ্‌ল্‌স্‌ সহরের যুবক-সম্প্রদায় অনুগ্রহ করে মহাশয়ের মত যোগ্য পুরুষকে তাদের প্রতিনিধিরূপে আমার কাছে পাঠালেন, আমার উপর এই পরওয়ানা জারী করতে,—উপরি-উক্ত কেলিও মহাশয়কে আজ থেকে আট দিনের মধ্যে ভালবেসে ফেল্‌তে হবে। আচ্ছা, কথাটা আপনই একটু ভেবে দেখুন দেখি। যদি আমি রাজী হই, তবে লোকে কি বল্‌বে? যে রমণী এমনধারা হুকুম ঠিক সময়-মত সর্ত্ত-মত হুবহু পালন করতে যায়, সে কি অতি হীন-প্রকৃতির নয়? লোকে কি তাকে দাঁতে কেটে ছিঁড়ে ফেল্‌বে না? চার আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে না? মাতালেরা তার নামে ছড়া বাঁধবে না? তার-পর সে যদি অঙ্গীকারই পায়, তবে তার মত রাক্ষসী দুনিয়ায় নাই, সে যে পাথরের মূর্ত্তির চেয়েও হৃদয়হীন। আর যে-লোক তার সঙ্গে কথা বলছে, হাতে উপাসনার বই দেখেও যে লোক রাস্তার মাঝখানে তাকে দাঁড় করাতে সাহসী হয়েছে, সে লোকটিরও কি অধিকার নাই তাকে বল্‌তে, "তুমি হচ্ছ বাংলার গোলাপ—কাঁটাও নেই, গন্ধও নেই"?

অক্তাভ। বোনটি আমার! বোনটি আমার! রাগ করো না।

মারিয়ানা। বলুন ত, দেবতা সাক্ষী করে যে প্রতিজ্ঞা করা আছে, তার উপর নিষ্ঠা বড়ই হাসির জিনিষ নয় কি? হাসির জিনিষ নয় কি একটি বালিকার শিক্ষাদীক্ষা, একটি প্রাণের মর্য্যাদাবোধ? সে বিশ্বাস করে নিয়েছে তার কিছু একটা মূল্য আছে, সে এই আশা পোষণ করছে যে, তার হৃদয়-কুসুম যদি শুকিয়েই ঝরে পড়ে, তবে আগে যেন সে দেখতে পায়, অশ্রুতে অশ্রুতে তা ভরে গিয়েছে, সূর্য্যের একটুখানি আলো পেয়ে ফুটে উঠেছে, কার একখানা কোমল হাতের স্পর্শে দুচারটি পাপড়ি মেলে দিয়েছে; কিন্তু এ সবই কি স্বপ্ন নয়—সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র নয়? এ বুদ্‌বুদের উচিত নয় কি, রাজপুত্তুর হয়ে যিনিই আসুন, তাঁর প্রথম দীর্ঘ নিশ্বাসটি পড়্‌তে পড়্‌তেই উড়ে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া?

অক্তাভ। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, কেলিওকেও ভুল বুঝেছ।

মারিয়ানা। মেয়েমানুষ মোটের উপর কি পদার্থ? এক মুহূর্ত্তের ওয়াস্তা—একটা ঠুন্‌কো পাত্র, তাতে আছে এক ফোঁটা শিশির, লোকে একটিবার তাকে মুখে তুলে ধরে আর দূর করে ফেলে দেয়। এ ত একটু আমোদ করা বই নয়। নারীর সম্মুখে যে পুরুষ চক্ষু নত করবে, মনে মনে বল্‌বে, "এই যে একটি জীবন-ভরা মূর্ত্তিমতী সুখ-শান্তি" আর পথ ছেড়ে দাঁড়াবে—যে পুরুষ এমন কাজ করবে সে কি কাঁচা শিক্ষানবীস মাত্র নয়?

(প্রস্থান)

অক্তাভ। তা না, তা না, তা রে রে না! কি অদ্ভুত মেয়ে! ওহে, কে আছ?

(একটি সরাইখানার দরজায় ঘা দিয়া)

এই যে, এই কোণ্‌টায় আমার জন্যে এক বোতল যা হয় কিছু নিয়ে এস।

ছোকরা। আপনার যেমন রুচি। লাক্রিমা ক্রিস্তি (খৃষ্টের অশ্রু) দেব কি?

অক্তাভ। আচ্ছা, তাতেই হবে। শোন, তুমি এই চার পাশের রাস্তা ক'টা একটু

ঘুরে এস ত, কেলিও ব'লে কোন ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পাও কি না—তাঁর গায়ে কালো লম্বা কোট, আর পরণে তার চেয়েও কালো পেন্ট্‌লন। তাঁকে বল্‌বে যে তাঁর একজন বন্ধু এখানে একলাটি বসে বসে লাক্রিমা ক্রিস্তি পান করছেন। তারপরে, তুমি একটু বড় বাজারে যাবে, গিয়ে একটি মেয়েকে নিয়ে আস্‌বে—নাম তার রোজা লিন্দ, রং লাল টকটকে, সব সময়ে জানালার ধারে বসে থাকে।

(ছোকরার প্রস্থান)

গলার নলীটাতে কি হ'ল বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। আমি যেন ঠিক শ্মশান-যাত্রার মত করুণ-রসাত্মক হয়ে পড়েছি।

(মদ্যপান করিতে করিতে)

এখানে রাতের খাওয়াটাও শেষ কর্‌লে হয়। বেলা দেখ্‌ছি গড়িয়ে এল। তা রে তা ক্! আরতিটা কি বদখৎ জিনিষ! ঘুম পাচ্ছে কি আমার? বোধ হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে খিল ধরেছে।

(ক্লোদিও ও তিবিয়া'র প্রবেশ)

তাত ক্লোদিও! বড় চমৎকার বিচারপতি আপনি। এমন অনর্গল যাচ্ছেন কোথায়?

ক্লোদিও। তার অর্থ, বৎস অক্তাভ?

অক্তাভ। তার অর্থ আপনি একজন হাকিম আর আপনার বাঁধুনী বড় সুন্দর।

ক্লোদিও। ভাষার না শরীরের?

অক্তাভ। ভাষার, ভাষার। আপনার পরচুলা বাগ্মিতায় ভরপুর, আর আপনার দুখানি ঠ্যাং যেন দুটি মনোহর বন্ধনী।

ক্লোদিও। তবে তোমায় বলে রাখি, বৎস অক্তাভ, আমার দরজার কড়া দেখে স্পষ্টই বোধ হয় যে তার কৃপায় তোমার আঙ্গুল গুলোতে ফোস্কা পড়ে গেছে।

অক্তাভ। কোন আইনে, বিজ্ঞ কাজি?

ক্লোদিপ। ঘন ঘন নাড়্‌তে গিয়ে, চালাক ভাইটি!

অক্তাভ। তা হাকিম-মশায়, স্বচ্ছন্দে তার ওপর নতুন রং ফেরাতে পার, আমার আঙুল ময়লা হবার কোন ভয় নেই।

ক্লোদিও। কোন্ আইনে, রসিক ভাইটি?

অক্তাভ। কখনও নাড়্‌ব না বলে তিতকুট কাজি!

ক্লোদিও। কিন্তু তাও তোমাকে কর্‌তে হল; যেহেতু আমার স্ত্রী চাকরদের হুকুম দিয়েছেন যে, আর একটিবার গেলে পরেই যেন তোমার মুখের উপর কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অক্তাভ। তোমার চশমা দেখছি কাণা, দয়াল কাজি! তুমি যে কার গুণ কার ঠিকানায় এসে গাইছ!

ক্লোদিও। আমার চশমা ঠিকই আছে, ওরে কথার ঝুড়ি! তুই আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রেম ভিক্ষা করিস্ নি?

অক্তাভ। কোন্ উপলক্ষে, সূক্ষ্মবুদ্ধি কাজি?

ক্লোদিও। তোমার বন্ধু কেলিও'র উপলক্ষে? ভায়া হে, দুঃখের বিষয়, আমি সব শুনেছি।

অক্তাভ। কোন্ কান দিয়ে, ধর্ম্মাধিপ ধুরন্ধর?

ক্লোদিও। আমার স্ত্রীর কান দিয়ে, সে আমায় সব খুলে বলেছে; বুঝেছ লম্পট-শিরোমণি!

অক্তাভ। একেবারেই সব? সে সুন্দর কানের ভিতর কিছুই থেকে যায় নি, বউ-পাগলা বুড়ো?

ক্লোদিও। হ্যাঁ, আছে, তোমার প্রাপ্য উত্তরটা, ভাঁটিখানার খুঁটি! আর তা বলবার ভার আছে আমার ওপর।

অক্তাভ। তা শোনবার ভার আমায় ওপর নেই, মূর্ত্তিমান জবানবন্দী।

ক্লোদিও। তাহ'লে আমার দরজার কাছে সলা পরামর্শ করতে যেও, সেই তোমাকে শুনিয়ে দেবে নেংটে জুয়ারী!

অক্তাভ। তাকে আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাই, ফাঁসির হুকুম! তার কাছে না গিয়ে ত আমি আর পারছি নে!

ক্লোদিও। তাই যেন পারিস্, মদের জালা। যা, তোর বহুৎ ধন-দৌলত হোক্।

অক্তাভ। সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকিস্, জেলখানার খিল! আমার ঘাড়ে কোনরকম আপদ বালাই চাপবার জো-টি নেই, থিয়েটারে শ্রোতার দল দেখেছিস ত, সেই রকম নির্ভাবনায় আমি এখন নাক ডাকাচ্ছি।

(ক্লোদিও ও তিবিয়ার প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

পক্ষপাত

চিঠি-লেখার লোক ত' তোমার
আমি ছাড়া অনেক আছে,
এবং তুমি প্রায়ই চিঠি
লিখে থাকো তাঁদের কাছে,
তোমার চিঠির জবাব তাঁরা
ফেরৎ ডাকে দেন্‌না ত কই,
আমার একটু দেরী হলেই
তবে এত রাগ কেন সই?
তাঁদের বেলায় হয় না কিছু
কাটাও ত' বেশ নিরুদ্বেগে,
আমার একটু দেরী হলেই
অমনি কেন ওঠ রেগে?
অমনি কেন অভিমানে
নয়নে জল ঝর-ঝর,
সাধাসাধি ক'রে ক'রে
আমি গরীব মর-মর!
এতখানি এক-চোখোমি
ভাল কি গো দেখায় এটা?
আমি না হয় সয়ে গেলাম
ধর্ম্মে কি গো সইবে সেটা!

"বনফুল"

মরণ-বাঁচনের কথা

তিন

বাঙ্গলার ভদ্রলোক

১

বাঙ্গলার ভদ্রলোক-সম্প্রদায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। কথাটা বড় সহজ নহে। সংখ্যায় অল্প হইলেও—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কৃতিত্বে—ইহারাই বাঙ্গালী-সমাজের মধ্যমণি; ভাবে-চিন্তায় ও কর্ম্মে ইহারাই অগ্রণী; সাহিত্যে ও শিল্প-কলায় ইহারাই নায়ক; ধর্ম্মের পোষণে ও রক্ষণে ইহারাই জাতির গৌরব। এক কথায় জীবদেহের যেমন মস্তিষ্ক,—আমাদের সমাজদেহে ভদ্রসম্প্রদায় তেমনই। এই মস্তিষ্কহীন হইলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। বাঙ্গালী-সমাজের আজ সেই আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার ভদ্র-সম্প্রদায় বেশ সুখে ছিল। বঙ্গমাতার স্নেহে-ঘেরা শ্যামল পল্লীতে ইহারা শান্তিতে জীবন কাটাইত। দালান-কোঠার তখন তত বাহুল্য ছিল না। কিন্তু পল্লীর বড় বড় খড়ের ঘরে ও আটচালাতেই লক্ষ্মীর প্রসাদে ইহারা বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিত। বড় বড় ধানের মরাই ও গোলা এই সকল গৃহস্থের আঙ্গিনার শোভা বাড়াইত। গোশালা দুগ্ধবতী গাভীতে পূর্ণ থাকিত। বাড়ীর পাশে মাছে-ভরা পুকুরে ও দীঘিতে কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল জলে মৃদু তরঙ্গ উঠিত। দোল-দুর্গোৎসব ইহারাই করিত। ক্রিয়াকাণ্ডে গ্রামের লোক ইহাদের বাড়ীতেই জমা হইত। অতিথি-অভ্যাগত আসিলে ইহারাই খাইতে দিত। অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য যে ইহাদের কিছু ছিল, তাহা নহে। মোটা ধুতি-চাদর, এক জোড়া খড়ম—বড়-জোর একজোড়া চটী,—ইহাই ছিল ইহাদের বেশভূষা। লুচি পুরী সন্দেশ-মিঠাই ইহারা কদাচিৎ চোখে দেখিত। কিন্তু মোটা চালের ভাত, নির্জ্জলা দুধ, বাগানের আম জাম কাঁঠাল খাইয়াই ইহারা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিত। ঘরে ঘরে তত ব্যারাম পীড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল না। গ্রামের যে কোন বৈদ্যের বড়ী ও পাঁচন খাইয়াই তাহাদের দেহ নীরোগ ও সুস্থ থাকিত। আজকালকার বাবুরা নাক সিঁটকাইয়া হয়ত ইহাদের বুনো অশিক্ষিত বলিবেন। কিন্তু যাত্রা-গান-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ইহারাই সঙ্গীত-কলার চর্চ্চা বজায় রাখিয়া ছিল। সেক্সপিয়ার-গেটে-ভিক্টর হুগো নাহোক, বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কবিকঙ্কণের কিছু কিছু খবর ইহারা রাখিত। ব্রাহ্মণেরা এখনকার মত জুতার দোকান করিয়া লক্ষপতি না হইলেও, টোলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও যজমানী করিয়া পরম তৃপ্তিতে থাকিতেন; খড়ের কুটীরে মাটীর দাওয়ায় বসিয়া বেদ-বেদান্ত স্মৃতি-পুরাণের গভীর তত্ত্ব ও আলোচনা লইয়া মাতিয়া থাকিতেন। মোকদ্দমা দলাদলি গ্রামে এত বেশী ছিল না। প্রতিবেশীর কলহে, ভ্রাতৃ-বিবাদে, জ্ঞাতি-শত্রুতায় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াই মুখে মুখে মিটমাট হইয়া যাইত। ষ্ট্যাম্প কিনিয়া আদালত পর্য্যন্ত ক্বচিৎ কেহ কখন দৌড়াইত। উকীল ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাদের ধারালো নখর লইয়া তখনও এত ভীষণ হইয়া উঠেন নাই। গ্রামের

তখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই ছিলেন মোড়ল ও মাতব্বর লোক! দশজন তাঁহাদের কথা মানিয়া চলিত।

২

কিন্তু বাঙ্গলার গ্রামে এ-সকলের চিহ্নও এখন দেখা যায় না। গ্রামের যাঁহারা গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত লোক, গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাইয়া তাঁহারা বাস করিতেছেন। যে সব ভদ্রপরিবার কায়ক্লেশে গ্রামে এখনও আছেন তাঁহাদের দেহ ম্যালেরিয়ায় অসাড়বৎ, অনাহারে অস্থিচর্ম্মসার। তাঁহাদের অনেকেই হয়ত অর্দ্ধাশনে থাকেন; রাতে উনানে হাঁড়ি চড়ে না। কিন্তু লোকের কাছে কোনমতে সে কথা লুকাইয়া মান রক্ষা করেন। তাঁহাদের জোতজমা যাহা ছিল, প্রায় সবই নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষীদের হস্তগত। বড় বড় আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ বড় দেখা যায় না; বাগবাগীচা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। যে-সব বাড়ী লোকজনে রাতদিন গমগম করিত, সেখানে ২।১ জন বিধবা ছাড়া হয়ত আর কেহ নাই। অনেক বাড়ীতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে কি না সন্দেহ। পুরাতন বনিয়াদী বংশ লুপ্তপ্রায়। যে বাড়ীর লোক-দের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে সংখ্যা-বাহুল্যে লোকে ভয় পাইত, সেখানে খুঁজিয়া-পাতিয়া এখন ২।৪ জন মানুষ পাওয়া কঠিন। পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা, মেয়েদের মধ্যে আবার অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা মধ্যবিত্ত পরিবারে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিবাহে ও ক্রিয়া-কর্ম্মে আগে পাঁচ-দশখানা পাল্কীসোয়ারী এ গ্রামে সে গ্রামে যাতায়াত করিত। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ছেলেমেয়ের আনাগোনায় একটা উৎসব লাগিয়া যাইত। আজ দশখানা গ্রাম খুঁজিলেও পাল্কী-সোয়ারী পাওয়া কঠিন। বোধ হয়, প্রয়োজনের অভাবে বেহারারা সব পাল্কী ছাড়িয়া লাঙ্গলের মুঠী ধরিয়াছে।

৩

কেন এমন হইল? বাঙ্গলার সেই শ্যামল পল্লী, সেই মাঠ, সেই ঘাট, আমবাগানের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীতীর, সবই ত আছে। বাঙ্গলার জমিও হঠাৎ অনুর্ব্বর হইয়া যায় নাই। তবে কেন এমন হইল? একথা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। কিন্তু সকল কথার বড় কথা—যে পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধাক্কায় আজ আমরা বেসামাল, তাহার সব-চেয়ে বড় ধাক্কাটা লাগিয়াছে ভদ্রসম্প্রদায়ের উপর। কেননা এরাই যে সমাজের অগ্রণী। পশ্চিম সভ্যতা যখন তাহার বিজয়-বাহিনী লইয়া এদেশে পদার্পণ করে, তখন এরাই সকলের আগে যাইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তার পর ঐ ডাইনী-সভ্যতা ছাউনী গাড়িয়া বসিয়া সুধার নামে যে বিষ পাত্র ভরিয়া পরিবেষণ করিয়াছে, তাহার বেশীর ভাগ এই ভদ্র-সম্প্রদায়ই উদরস্থ করিয়াছেন। তাই তাহার মাথার ঠিক নাই! বিলাতী নেশার উগ্র বীর্য্যে এখনও সে মাতাল।

৪

বিলাতী সভ্যতার বিলাস-বিষে জর্জ্জরিত বাঙ্গলায় ভদ্রসম্প্রদায় এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহারা আজকাল প্রায়ই সহরবাসী বাবু। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের আড়ম্বরটা ইহারা ভাল করিয়াই নকল করিয়াছেন।

সাহেবেরা এদেশে আসিয়া বড় বড় চাকরী ও ব্যবসা করিয়া বাদসাহী চালে চলে; অতএব ইঁহারাও সেইটা করিতে সুরু করিয়াছেন। বড় বড় দালান কোটা নহিলে ইঁহাদের মন উঠে না। গাড়ী ঘোড়া মোটর ট্রাম নহিলে ইঁহাদের চলে না। গণ্ডায় গণ্ডায় দাস দাসী না হইলে ইঁহাদের আরাম-বিলাস হয় না। আহারে বিহারে ইঁহারা আধাসাহেব, নিজেদের সরল জাতীয় পোষাক ইঁহাদের কাছে বড়ই বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়, তাই দেশী-বিলাতী মিশাইয়া ইঁহারা এক অদ্ভুত খিচুড়ী পোষাকের সৃষ্টি করিয়াছেন। শুনিতে পাই, সকল জাতিরই নিজস্ব পোষাক ও ভাষা আছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত বাবুদের ওই দুইটা জিনিষেরই অভাব। তাঁহাদের ভাষায় যেমন ইংরেজী বুকনী মিশিয়া তাহার মিষ্টত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে, পোষাকেও তেমনি ফিরিঙ্গিয়ানীর নকল সৌন্দর্য্য আমদানী করিতে গিয়া, উহা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। আর এই পোষাকের ঠাট বজায় রাখিতে এত ব্যয়-বাহুল্য হয় যে, অনেকেরই প্রাণ তাহাতে ওষ্ঠাগত। মেয়েদের মধ্যে পর্য্যন্ত এই বাবুয়ানার বিষ ঢুকিয়াছে। মোটা সাড়ীতে আর তাঁহাদের কুলায় না। জ্যাকেট ব্লাউজ পেটীকোট জুতা মোজা প্রভৃতি অনাবশ্যক আবর্জ্জনাগুলা তাঁহাদের পক্ষেও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যে মূর্ত্তিমতী কল্যাণীরা অন্নপূর্ণার মত মধ্যবিত্ত হিন্দুর গৃহ আলো করিয়া থাকিতেন, আজকাল তাঁহাদের বড় আর দেখা পাওয়া যায় না। যাঁহাদের দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রায়ই বিলাতি রোজ-লিলিরই নকল সংস্করণ! হীন সাহিত্যের আসরে নবীন যুবকেরা যে-সব গল্প ও উপন্যাস লিখিতেছেন, তাহাতে ইঁহাদেরই প্রভাব দেখি। সেখানে তরুণীরা কথায় কথায় মোটরে চড়েন, "বয়" বলিয়া ডাকেন ও চায়ের টেবিলে বসিয়া গানের সুর ভাঁজেন। যেন দেশে আর গরিব মানুষ নাই, আর তাদের মধ্যে তরুণী কিশোরীরা দেহ ও মনের সৌন্দর্য্যে একেবারেই বঞ্চিত, অথবা যৌবন-বসন্তের হিল্লোল দার্জ্জিলিং বা কলিকাতার অট্টালিকা ছাড়া আর কোথাও বহে না! ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয়, এ-সব দেশের তরুণ-তরুণীদের অতৃপ্ত বিলাস বাসনারই বিকার মাত্র।

বাপ-মায়েদের নিকট হইতে এই বিলাসিতার বিষ শিশুদের মধ্যে যাইয়া সংক্রামিত হইতেছে। কোন সহরের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলে, ছেলেমেয়েরা ফিরিঙ্গী কি বাঙ্গালী, তাহা বোঝা কঠিন; তাহাদের কোমল অঙ্গ নিকার-বোকার ফ্রক, হাফ-প্যাণ্ট প্রভৃতিতে এমনই কণ্টকাকীর্ণ! আবার আমাদের বিলাতী শিক্ষিত ডাক্তারদের পরামর্শে এই-সব সোনার চাঁদ ছেলেমেয়েদের নানারূপ "ফুড" ও "মিল্ক" প্রভৃতি খাওয়াইয়া গোড়া হইতেই ইহাদের জীবনী-শক্তি একেবারে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইতেছে। ছেলে-মেয়ের জন্ম হইলে আগে ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আনন্দ হইত। এখন পোষাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ-পত্র যোগাইবার চিন্তাতেই মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

৫

এই বিলাস-ব্যসন, সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের তাল সামলাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। তাই সহর-বাসী বাবুরা অর্থের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাঁস-ফাঁস করিয়া

মরিতেছেন। অথচ যে উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিলে দেশের কিছু ধনাগম হয়, সেদিকে ইঁহাদের দৃষ্টি নাই। সে সব পথে বিদেশী বণিক বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক—যেমন মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, ভুটীয়ারাই যাত্রী। আমাদের বাবুদের অবলম্বন ডেপুটীগিরি, মুন্সেফী, কেরাণীগিরি, ও মাষ্টারি প্রভৃতি ছোট-বড় চাকরী, অথবা ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, মোক্তারী প্রভৃতি আধা-চাকরী। এগুলা বিলাতী সভ্যতার ফলে প্রস্তুত বিদেশী রাজশক্তির আমদানী। এ সকলের মধ্যে অর্থ যে বড় বেশী আছে তা নয়। কর্ত্তাদের ঈপ্সিত বাবুয়ানা ইহাতে বড় চলে না, প্রায়ই ঋণ করিতে হয়। কিন্তু ক্ষমতা, পদ-গৌরব ও কল্পিত সম্মানের একটা মোহ আছে। অবশ্য ইঁহাদের ভগবান,—সাহেবই ইঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান। সাহেব উঠিতে বলিলে ইঁহারা উঠেন, বসিতে বলিলে বসেন। নিজেদের স্বাধীন মত, ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন জিনিষ ইঁহাদের নাই। ঠিক যেন কলের পুতুল! এই যে মনের অবস্থা, ইহাকেই মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বলা যায় খাঁটী দাসভাব বা slave-mentality। আভূমি-প্রণত হইয়া যে সেলাম করে সেই যে কেবল দাস, তা নয়। কিন্তু মনো-রাজ্যে যে বড় পঙ্গু, স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন জিনিষ যার নাই, নিজের জাতির হীনতার ভাব যার মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রভুর অনুগ্রহ লাভের জন্য যে সর্ব্বদা লালায়িত—সেই ত প্রকৃত পক্ষে দাস। আর ঠিক এই ভাবগুলি আমাদের চাকরীজীবি বাবুদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে মনের দাসত্ব, ইহাই সকল রকম দাসত্ব ও দুর্দ্দশার মূল।

৬

এর জন্য আমাদের আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অনেক পরিমাণে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শিক্ষাই মনোরাজ্যে আমাদের দাস করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের মন যদি সবল ও সুস্থ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় এমনটী ঘটিত না। কিন্তু বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় বোধ হয় আগে হইতেই আমাদের মন মুষড়িয়া গিয়াছিল; তাই এত সহজে বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের মনকে জয় করিতে পারিয়াছে। সর্ব্ব বিষয়ে যে আমরা হীন, এই শিক্ষা সেই ভাবটাই আমাদের মনে জাগাইয়া দিতেছে। নিজেদের সাহিত্য ও শিল্পকলার আদর আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালী জাতির যে একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সাধনা ছিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। মধ্যযুগের বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার বিবরণ আমরা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ধর্ম্মের ভাব-স্রোতে বাঙ্গলা দেশে যে অপূর্ব্ব সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন খবর আমরা রাখি না। এর চেয়ে চরম দুর্গতি আর কি হইতে পারে?

এ দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের দিকের যে জাঁকজমক, আড়ম্বর ও বিলাসিতা, তাহার প্রভাবটা প্রথম হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় আমাদের মনে বসিয়া যাইতেছে। পল্লী-গ্রামের যে-সব ভদ্র গৃহস্থের ছেলে বিশ্ব বিদ্যালয়ের বড় বড় ইন্দ্রপুরী তুল্য হোটেলে,

বিজলী আলো ও পাখার ঐশ্বর্য্য এবং আরামের মধ্যে বাস করে, গ্রামে ফিরিয়া তাহাদের পিতৃ-পিতামহের সেই সামান্য খড়ের ঘর কিন্তু কিম্ভূত-কিমাকার বলিয়াই বোধ হয়; আর সেখানকার আহার-বিহারের ব্যবস্থায়ও মনটা একেবারেই দমিয়া যায়। ফলে আরাম ও বিলাসের মশলা যোগাইবার জন্য, তাহাদের মন সহর ও চাকরীর দিকেই ছুটিতে থাকে।

সব-চেয়ে সর্ব্বনাশের কথা, এই শিক্ষা আমাদের জাতির ধর্ম্মভাবের হ্রাস করিয়া দিতেছে। পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষবাদ ও পরীক্ষা-মূলক শিক্ষাপ্রণালী বহির্জগতের কতকগুলি সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে মনটা এক-প্রকার সূক্ষ্ম অজ্ঞেয়বাদে ও সংশয়বাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। যে গভীর ভাগবত ভাব প্রাচীন হিন্দু সমাজের আত্মা, তাহা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। তাহার স্থানে ক্ষমতা-লিপ্সা ও অর্থোপার্জ্জনের বাসনাই আমাদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিতেছে। আজ যে আত্মম্ভরিতা স্বার্থপরতা, কপটতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, আমাদের সমাজের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, বিজাতীয় শিক্ষায় ধর্ম্মভাবের হ্রাসই তাহার মূল।

৭

এমনই করিয়া সকল দিকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা পরাজিত হইয়া বাঙ্গলার ভদ্র সম্প্রদায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছেন। সাজ-সজ্জা, বিলাস-ব্যসনের আড়ম্বর তাঁহাদের প্রয়োজনের অধিক হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহা মিটাইতে গলদঘর্ম্ম হইয়া অর্থের কাছে আত্মবিক্রয় করিতে হইতেছে। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ও মস্তিষ্ক-চর্চ্চায় তাঁহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নানারূপ নূতন নূতন রোগ আসিয়া অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিতেছে। এদিকে পুরাতন চাল-চলন ছাড়িয়া জোর করিয়া কতকগুলি বদ অভ্যাস করিতে গিয়া, জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠিলে যে অবস্থা হয়, তাঁহাদের তাহাই হইয়াছে। বাহিরের দিকে যেমন পরাধীনতা, মনোরাজ্যেও তেমনই তাঁহাদের শৃঙ্খল পড়িয়াছে। দাসভাব ও আত্ম-বিশ্বাসহীনতায় তাঁহাদের মন আচ্ছন্ন। জগতে যে তাঁহাদের জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাঁহারাও যে স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারেন, সে বিশ্বাস তাঁহাদের লোপ পাইয়াছে। নিজেদের অতীতের সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ, বর্ত্তমানের উপর সংশয়াপন্ন, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহল-হীন। ফলে বাঙ্গলার ভদ্র সম্প্রদায় অধঃপতিত। তাঁহাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; তাঁহাদের পরিণাম ঘোর অন্ধকারে অদৃশ্য।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

সঙ্কলন

আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক

সম্রাট আওরংজীবের রাজত্বকালে (১৬৫৭খৃঃ-১৭০৭ খৃঃ) ঠিক সেই সময়ে হিন্দুদের লেখা, দুইখানি ফার্সী ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থদুখানি বহুমূল্যবান। একখানির নাম নুস্‌খা-ই-দিল্‌কশা, অপরখানির নাম ফতুহাৎ-ই-আলমগিরি। প্রথম খানির লেখকের নাম ভীম সেন। ইনি জাতিতে সাক্‌সেনা শ্রেণীস্থ কায়স্থ; জন্মস্থান বুরহানপুর। দ্বিতীয় খানির রচয়িতা ঈশ্বরদাস। ঈশ্বরদাসের পুঁথির একটী মাত্র প্রতী (কপি) এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের ফার্সী হস্তলিখিত পুঁথির তালিকার অতিরিক্ত সংখ্যক ২৩,৮৮৪ পুঁথি এইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১টী করিয়া লাইন আছে; ৩২৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত। বইদুখানি ঐতিহাসিকের চক্ষে এইজন্য মহামূল্যবান যে, গ্রন্থকারদ্বয় সম্রাট দরবারের কোনও মোসাহেব ছিলেন না অথচ সেই সময়কার বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় থাকায় অনেক ঘটনার সঠিক সংবাদ পাইতেন।

ঈশ্বরদাস জাতিতে নাগর ব্রাহ্মণ, সুবা গুজরাটের পট্টন (অর্থাৎ বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দু রাজধানী আন্‌হিল্‌ওয়ারা পট্টন) নগরের অধিবাসী। এই নগর বর্ত্তমানে গায়কোয়ারের রাজত্বে। যৌবনকাল হইতে ৩০শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সেখ-উল্‌-ইস্‌লামের অধীনে চাকরী করিতেন। সেখ-উল্‌-ইস্‌লাম ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কাজী। সর্ব্বদা তিনি সম্রাট আওরংজীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ঈশ্বরদাসকেও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হইত। এইরূপে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের এবং তাদের অনুচরদিগের নিকট হইতে তিনি সঠিক খবর পাইতেন। আওরংজীবের রাজত্বের সরকারী ইতিহাস মাসির্‌-ই-আলমগীরি হইতে জানা যায় যে, সেখ-উল্‌-ইস্‌লাম তাঁহার পিতা আব্দুল ওহ্‌হাবএর মৃত্যুর পর পিতার সর্ব্বপ্রধান কাজীত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি ১৬৭৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাস হইতে ১৬৮৩ খৃঃ নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই সর্ব্বপ্রধান কাজীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি কাজীত্ব স্বইচ্ছায় ত্যাগ করেন, কারণ সম্রাট তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া স্বধর্ম্মী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান সুল্‌তানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোর্—আনের মতে মুসলমানের সহিত মুসলমানের যুদ্ধ করা পাপ। ১৬৮৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে সেখ্ মক্কায় হজ্ করিতে যান। এই সময় ঈশ্বরদাস সেখের কাজ ছাড়িয়া গুজরাটের শাসনকর্ত্তা সুজায়েত খাঁর (শাসন-কাল ১৬৮৪ খৃঃ ১৭০১ খৃঃ) অধীনে চাকরী লন। ঈশ্বরদাসের বয়স তখন ৩০শ বৎসর। সুতরাং তিনি ১৬৫৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ তিনি বই লেখা শেষ করেন; তখন তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর। খাফি খাঁর সুবিখ্যাত মুঘল রাজত্বের ইতিহাস ইহার চারি বৎসর পরে সমাপ্ত হয়।

সুজায়েৎ খাঁ ঈশ্বরদাসকে যোধপুর পরগণায় কতকগুলি মহলের আমীন ও শিক্‌দার নিযুক্ত করেন। ১৬৭৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর আওরংজীব এই যোধপুর পরগণা অধিকার করেন। এই কাজের জন্য ঈশ্বরদাসকে রাঠোরদের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট হইতে হইল; ফলে তাহাদের বন্ধুত্বও বেশ জমিয়া উঠিল। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ অবশেষে তিনি মন্‌সবদারের পদে উন্নীত হইবার সুযোগ পান।

আওরংজীবের চতুর্থ পুত্র মুহম্মদ আকবর ১৬৮১ খৃঃ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রথম তিনি মারাঠাদের আশ্রয় লন, অবশেষে পারস্যে পলায়ন করেন। পলায়নকালে শিশু পুত্র বুলন্দ আখ্‌তর ও কন্যা সফিয়ৎ-উন্‌-নিসাকে রাজপুতদের হস্তে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

রাঠোর দুর্গাদাস গোপনে ইহাদের মানুষ করিয়া তোলেন। দুর্গাদাস ছিলেন যশোবন্ত সিংহের পুত্র নাবালক অজিত সিংহের অভিভাবক ও রক্ষক। বংশের সম্মান রক্ষার জন্য আওরংজীব পৌত্র ও পৌত্রীর উদ্ধারে একান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। দুর্গাদাসও এই সময় মুঘলদের সহিত যুদ্ধে শ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয় পক্ষ যখন এই অবস্থায় তখন একটা মিটমাট সহজ হইল। ইহার বিবরণ দিতে গিয়া ঈশ্বরদাস বলিতেছেন :—

"দুর্গাদাসের কষ্টের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ১৬৯৮ খৃঃ দুর্গাদাস গ্রন্থকারকে লিখিয়া পাঠান যে,... সম্রাটের কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত শুজায়েৎ খাঁ যদি তাঁকে নিরাপদে যাইতে দেন এবং তাঁর বাড়ীঘর নষ্ট করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, তবে তিনি সফিয়ৎ-উন্-নিসাকে সম্রাট দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। দুর্গাদাসের এই প্রস্তাবে সম্রাট তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। সম্রাটের নিকট হইতে উত্তর আসামাত্র খাঁসাহেব ঈশ্বরদাসকে দুর্গাদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গাদাস এই সময় একটী দুরধিগম্য স্থানে বাস করিতেন। ঈশ্বরদাস অতিকষ্টে সেখানে উপস্থিত হইয়া দুর্গাদাসকে অনেক উপদেশ দিয়া বুঝাইলেন যাহাতে তাঁহার মতের আর কোনও পরিবর্ত্তন না হয়। তারপর গ্রন্থকার ফিরিয়া আসিয়া যানবাহনাদি সংগ্রহ করিয়া বেগমকে আনিতে গেলেন। বেগম দুর্গাদাসের ব্যবহারে অতিমাত্র প্রীত ছিলেন। তিনি আসিবার সময় দুর্গাদাসকে তাঁর সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া বেগম সম্রাটকে জানাইলেন যে, দুর্গাদাস তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন; এমন কি আজমীড় হইতে একজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। তিনি কোর্-আন পড়িয়া ফেলিয়াছেন, এমন কি মুখস্থ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সম্রাট ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুর্গাদাসের সমস্ত পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিলেন। এবং বেগমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুর্গাদাস কি পাইলে সন্তুষ্ট হয়?" বেগম বলিলেন, "ঈশ্বরদাস তাহা জানে।" শুজায়েৎ খাঁর বন্ধু কাজী আব্দুল্লার উপর তখনই সম্রাট আদেশ দেন যে, আমাকে বাদশাহ দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। পরদিন আমাকে সম্রাট সমীপে লইয়া যাওয়া হইল। আমি দুর্গাদাসের মাসোহারার ও মন্‌সবদারীর প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। সম্রাট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। এবং এই অধম ধূলিকণা (অর্থাৎ ঈশ্বরদাস) ও ২০০ শত অশ্বারোহীর পদ ও খিলাৎ পাইল। আমার উপর আরও হুকুম হইল যে, দুর্গাদাস ও বুলন্দ আখ্‌তরকে সম্রাটসমীপে উপস্থিত করিতে হইবে। তাহার পর আমি আহমদাবাদে ফিরিলে শুজায়েৎ খাঁও আমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

দুর্গাদাসের সহিত অনেকবার দেখা করিয়া খাঁ সাহেবের অভয় দানের প্রতিশ্রুতি দিলাম। দুর্গাদাস জায়গীর প্রাপ্তির পরোয়াণা পাইয়া এবং পরোয়াণা অনুযায়ী মহালের দখল পাইয়া প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলেন ও আহমদাবাদে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাহাজাদা অর্থাৎ বুলন্দ আখ্‌তর ও দুর্গাদাসকে সঙ্গে করিয়া সুরাটে উপস্থিত হইলাম। সম্রাট প্রেরিত কয়েকজন কর্ম্মচারী এখানে শাহাজাদার অপেক্ষা করিতেছিল। শাহাজাদাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে এবং সম্রাট দরবারের আদব কায়দা শিখাইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। কিন্তু শাহাজাদা জড়বুদ্ধি গণ্ডগ্রামবাসীর মত ব্যবহারে এ পর্য্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন। সম্রাট-প্রেরিত হকিমেরা ইহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না।

দুর্গাদাস যখন দেওয়ান-ই-আমের বারন্দায় উপস্থিত হইলেন, সম্রাট তাঁহাকে অস্ত্রহীন করিয়া দরবারে আনিতে আদেশ দিলেন, যেমন বন্দী বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে করা হয়। দুর্গাদাস ক্ষণমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব না করিয়া তরবারি খুলিয়া ফেলিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সম্রাট পুনরায় আদেশ দিলেন, আচ্ছা, অস্ত্র লইয়াই দুর্গাদাসকে আসিতে দেওয়া হৌক। শিবিরে প্রবেশ করিলে অর্থসচিব রুহুল্লার খাঁকে দুর্গাদাসকে সম্রাট-সকাশে উপস্থিত করিতে বলা

হইল। খাঁ সাহেব দুর্গাদাসের হাত রুমাল বাঁধিয়া সম্রাট সকাশে উপস্থিত করিলেন। তখন অপরাধীকে ঠিক যুদ্ধ-বন্দীর মত এইরূপ কৃত্রিম সাজে সম্রাটের কাছে ক্ষমা চাহিতে হইত। তৃতীয় এডোয়ার্ডের কাছেও পরাজিত ক্যালে (Calais) নগরের ফরাসী অধিবাসীবর্গের প্রতিনিধিদিগকে গলায় ফাঁস পরিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। মুঘল দরবারে ইহা কেবল ব্যাহ্যিক অভিনয় ছাড়া কিছুই ছিল না। এইরূপে সম্রাটকে মান্য দেখাইয়া সন্তুষ্ট করা হইত।

সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া দুর্গাদাসকে অস্ত্রে সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে ৩০০০ হাজার সৈন্যের মনসবদার পদে উন্নীত করিলেন। একখানা রত্নখচিত ছোরা, একটী সোনার পদক, মুক্তার মালা উপহার দেওয়া হইল ও খাজাঞ্চীখানার উপর নগদ একলক্ষ টাকা দিতে হুকুম হইল।

গ্রন্থকারও বাদ গেলেন না। তিনিও যথেষ্ট পুরস্কৃত হইলেন। তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া আরও ৫০শ জন অশ্বারোহীর নেতা করা হইল; এবং খিলাৎ ও মারবাড়ে আজমীড়ের পশ্চিমে জায়গীর দেওয়া হইল।

নিজ মন্ত্রণা-কৌশলের সাফল্যের জন্য ঈশ্বরদাস ২৫০ শত অশ্বারোহীর মনসবদারের পদ পাইলেন। ঈশ্বর-দাসের নিজের সম্বন্ধের এই বিবৃতি অপর এক ফার্সী ইতিহাস (মিরাট-ই আহমদী, ৩৫০-৩৫১ পৃঃ) সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বরদাস সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, তিনি ২১শে রবি-উল-আর্ব্বলে মুহম্মদ সাহের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে ১১৪৩ হিজরীতে (১৭৩১ খৃঃ) বইখানি শেষ করেন। তিনি এই লিখিয়া শেষ করেন যে, "নাগর-জাতীয় ঈশ্বরদাস কর্ত্তৃক তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এবং লালা-খুশ-হালের জ্ঞাতার্থ এই বইখানি লিখিত হইল।" এই লালা-খুশ হাল কে ?

দস্তুর-উল্-আলম্‌শাহানশাহী নামক একখানি ফার্সী গ্রন্থে লালাসাহেব বলিয়া এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লালাসাহেব ঈশ্বরদাসের পুত্র ব্রজরায়ের পুত্র। যদি লালাসাহেবই লালা-খুশ-হাল হন, তাহা হইলে মনে হয় যে, বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরদাস পৌত্রের অনুরোধে আওরংজীবের সমসাময়িক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই হস্তলিখিত পুঁথির সূচী এইরূপ :—

ঈশ্বর ও সম্রাটের বন্দনা।

গ্রন্থকারের নিজের চাকরীর খতিয়ান ও সমসাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা।

সাজাহানের অসুস্থতা ও শুজার প্রথম পরাজয়।

যশোবন্ত ও দারার পরাজয় ও সাজাহান বন্দী।

মুরাদ বন্দী এবং দারা ও শুজার পতন।

মীরজুমলাকে বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া ফরমান প্রদান।

শিবাজীর প্রথম কার্য্যাবলী।

আওরংজীবের মন্দির ধ্বংস ; মথুরার নিকট জাঠদের বিদ্রোহ; জাঞ্জিরার সিদ্দিদের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ; জয়সিংহের নিকট শিবাজীর পরাজয়; শিবাজীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ও পলায়ন।

দাক্ষিণাত্যের সুবেদার শাহাজাদা শাহআলমকে দিলির খাঁর অমান্য।

সালের দুর্গের নিকট শিবাজীর সহিত মুঘলদের যুদ্ধ।

সৎনামী জাতির বিদ্রোহ।

আফঘানীস্থানে সম্রাট-সৈন্যের ধ্বংস।

যশোবন্তসিংহের মৃত্যু; যশোবন্তের পুত্রকন্যার পলায়ন; জিজিয়া কর-স্থাপন; রাজপুতদের সহিত যুদ্ধ; আকবরের বিদ্রোহ

রাঠোরদের সহিত যুদ্ধের বিবরণ।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুবরাজ আজমের অভিযান, এবং কঙ্কণে শাহ আলমের প্রবেশ।

গোলকুণ্ডা অধিকার।

শিরোঞ্জে পাহাড়সিং গৌড়ের বিদ্রোহ।

বিজাপুর অধিকার।

শাহাজাদা আকবর ও শম্ভুজীর কার্য্যাবলী।

শাহাজাদা শাহ আলম বন্দী।

রামসিজ ও সালের অধিকার।

বুন্দেলখন্দে বিদ্রোহ।

দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ।

আকবরের পারস্যে পলায়ন।

দুর্জ্জনসিংহ হাড়ার বিদ্রোহ ও রাজপুতনায় গণ্ডগোল।

• ওাদুনী অধিকার।

ব্যাঙ্গালোর অধিকার।

আগ্রার নিকট রাজারাম জাঠের বিদ্রোহ।

গোয়ালিয়রের নিকট গোপাল সিংহ গৌড়ের বিদ্রোহ।

সনসানীতে চুড়ামন জাঠের বিদ্রোহ।

শান্তা ঘোরপাড়ী কর্ত্তৃক রুস্তম খাঁ বন্দী।

রূপা ভোঁসলা কর্ত্তৃক সিদ্দি আব্দুলকাদিরের শিবির লুট।

বিশ্বাসঘাতক সম্রাটের হকিম কর্ত্তৃক গাজী উদ্দীন খাঁ বাহাদুর ফিরোজজঙ্গের চক্ষু উৎপাটন। শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

শম্ভুজীর বন্দীত্ব ও মৃত্যুদণ্ড।

বহু মারঠাদুর্গ অধিকার।

শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারামের পলায়ন।

আগ্রার নিকটে আঘর খাঁর হত্যা।

দুর্গাদাসের পরাভব; ঈশ্বরদাসের সম্রাট সাক্ষাৎ ও পুরস্কার প্রাপ্তি।

মুঘলদরবারের অন্যান্য ইতিহাসের মত ইহা সম্রাটের আদেশে কিংবা তাঁহার মুখ চাহিয়া রচিত হয় নাই, অনেক ঘটনা গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য ঘটনার সত্য বিবরণ জানিবার তাঁর যথেষ্ট সুযোগ ছিল, জাতিতেও তিনি মুসলমান ছিলেন না, এই সব কারণে ইতিহাসখানি পক্ষপাতদুষ্ট হয় নাই ও কোথায়ও সত্যের অপলাপ করিতে হয় নাই। সত্য রক্ষাই ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার সত্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ঐতিহাসিকদের চক্ষে বইখানি মহামূল্যবান।

শ্রীযদুনাথ সরকার

প্রভাতী শীত-সংখ্যা, ১৩২৮

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

নারীর স্বাতন্ত্র্য বাস্তব হইয়া উঠিতে থাকিবে তখনই যখন সে পাইবে আর্থিক (economic) স্বাধীনতা। প্রথমে অবশ্য চাই ভিতরের স্বাধীনতা, মনের মুক্তি, গতানুগতিক সংস্কার হইতে অভ্যাস হইতে অব্যাহতি, চাই অন্তরের এবং অন্তরের অন্তরে স্ব'এর, ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন; এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা এবং শিক্ষারও বেশী দীক্ষা। কিন্তু ভিতরের জিনিষ রূপ লইতে পারে বাহিরেরই আশ্রয় অবলম্বনে; বাহিরের একটা প্রতিষ্ঠা না পাইলে, অন্তরের সত্য পাকা হয় না, প্রকাশের পথ পায় না। সুতরাং নারীর আত্মার ও মনের স্বাতন্ত্র্যকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাকে লাভ করিতে হইবে শরীর ও প্রাণধারণের স্বাতন্ত্র্য। এই কথাটা পাশ্চাত্যের এক জন স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী নারী বড় সুন্দর ও সরলভাবে বলিয়া ফেলিয়াছেন—How can you be courageous when you have not a penny and are incapable of earning one—হাতে যখন একটি পয়সা নাই, একটি পয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতাটি পর্য্যন্ত নাই, তখন তোমার জোর আসে কোথা হইতে? ফলতঃ ইউরোপে বা আমেরিকায় মেয়েরা সমাজে নিজেদের যতটুকু স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে, তার মূলে আছে তাহাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যেদিন Married Woman's Property Act পাশ হইল, সেইদিন হইতেই ইংলণ্ডে মেয়েদের সামাজিক জীবনে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আমাদের দেশের মেয়েরা অন্নবস্ত্রের জন্য পুরুষের যে কতখানি দাস তা বলাই বাহুল্য। বিবাহের

মন্ত্রের মধ্যেই মস্ত একটা আধ্যাত্মিকভাবে মণ্ডিত করিয়া—ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, পুরুষের ভার নারীর ভরণপোষণ আর নারীর ভার পুরুষের সেবা। স্বাধীন উপজীবিকার কথা দূরে থাকুক, দানস্বরূপ হউক আর উত্তরাধিকার স্বরূপেই হউক নারীর ধন-সম্পত্তি-গ্রহণে ও ভোগে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যত সব আঁটঘাট বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যটাই কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। স্ত্রীধন সম্বন্ধে কাত্যায়ন এই সাধারণ নিয়মটি করিয়া দিয়াছেন—

প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যাচৈব যদন্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ সাম্যং ভবেৎ তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতং॥

অর্থাৎ, স্ত্রী চেষ্টা করিয়া নিজে যা উপায় করুক অথবা অপরে তাহাকে যা দান করুক, সে সমস্তে স্বামীরও অধিকার আছে; তবে স্ত্রীর নিজস্ব ধন বলিতে যদি কিছু বুঝায় তবে তাহা হইতেছে ঐ শেষোক্ত দানের ধন। অবশ্য একথাটাও এখানে উল্লেখ না করিলে ব্যবস্থাকারদের প্রতি অন্যায় করা হইবে যে, তাঁহারা এমন স্ত্রীধনেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহার উপর স্ত্রীদের পূর্ণ ও যথেচ্ছ অধিকার আছে, তাহাতে পিতা পুত্র ভ্রাতা এমন কি স্বামীরও পর্য্যন্ত দান-বিক্রয়ের কোন সত্ত্ব নাই। কিন্তু তবুও ফাঁক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—এমন অজুহাত সব হাতে রাখা হইয়াছে যাহার বলে স্ত্রীর এই অধিকার বিনাক্লেশে বাতিল হইয়া যায়। সে যাহা হউক শাস্ত্রে যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ আমরা দেখি, স্ত্রীর নিজস্ব কিছু থাকা বা অর্জ্জন করা যেন পুরুষের কাছে একটা ভীষণ অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, স্ত্রীর যাহা সব তাহার উপর পুরুষের জন্মগত ভাগ্য-গত অধিকার আছে। গল্প শুনা যায়, ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতার হৈ-চৈ দেখিয়া শুনিয়া একটি গেঁয়োলোকে চটিয়া গিয়া টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—Do you mean to tell me that if my missus had a hundred pounds left her I couldn't spend it without asking her first, "তোমরা কি বল্‌তে চাও আমার বৌকে শ'খানেক গিনি যদি কেউ রেখে যায় তবে তাকে আগে জিজ্ঞেস না ক'রে সেটা আমি খরচ করতে পারিনে?" অনেক শিক্ষিত লোকেই যে এই গেঁয়ো লোকটির মতে—মুখে না হউক মনে মনে—মত দিবেন, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিয়া দিতে পারি।

আমাদের দেশে তথাকথিত ছোটলোকের ঘরের মেয়েদের যা কিছু বা স্বাধীন উপজীবিকার প্রয়াস ও অবকাশ আছে; কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের তাহা পর্য্যন্ত নাই। শুধু তাই নয়, ভদ্র ঘরের মেয়েদের পক্ষে রোজগার করা এক-রকম অপমান। অন্নহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকিব, তাও ভাল, কিন্তু নিজে উপার্জ্জন করা শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ। মৃত্যুকে বরং বরণ করিয়া লইব, কিন্তু পুরুষের ধর্ম্ম নিজের উপর লইব না। আপত্তি যে কেবল মেয়েদের দিক হইতেই তাহা নয়; সমাজের একটা সমবেত চাপ—মেয়েদের ইচ্ছা থাকিলেও, সে ইচ্ছাকে দাবিয়া চাপিয়া রাখে। আমরা একটি ঘটনা জানি, সেটি উল্লেখ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের কি রকম অবস্থা। একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-ঘরের নিতান্ত সহায়হীন দুটি মেয়ে আর কিছু উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে ঘরে বসিয়া বাঁশের চুপড়ি বানাইত আর একটি সহৃদয় ছেলেকে দিয়া সে সব বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিত; ইহাতে যাহা কিছু আয় হইত তাহাতেই কোনরকমে উভয়ের দিন চলিত। কিন্তু কথাটা যখন সমাজপতিদের কানে উঠিল, তখন তাঁহারা সকলে একেবারে মার-মার করিয়া আসিয়া পড়িলেন, "এ কি অনাচার! কি ঘোর কলিকাল! ব্রাহ্মণের মেয়ে হাড়ি-ডোমের কাজ করে!" তাঁহারা ছেলেটাকে শাসাইলেন, মেয়ে দুটিকেও ভয় দেখাইলেন—আবার এ কথাও বুক ফুলাইয়া বলিলেন, তাঁহারা থাকিতে ব্রাহ্মণ-কন্যার অভাব কিসের? কিন্তু তার পর অভাগা মেয়ে দুটির অনাহারে প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল—ভাগ্যগতিকে একটা উপায় হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা যে কোন অবস্থায় কোন রকম স্বাতন্ত্র্য পাইবার উপযুক্ত নয়, সনাতন ধর্ম্মের সে ব্যবস্থার এ একেবারে চূড়ান্ত প্রয়োগ।

কিন্তু তবুও কথাটা কেবল জীবন-ধারণের কথা নয়। এই একান্ত পরবশ্যতা, শুধু পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা, ইহাতে নারীর অন্তঃকরণ কতখানি দীন হইয়া থাকে, তাহার মন প্রাণ কতখানি অজ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া যায়, সেই কথাটির উপরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কথায় আছে, অভাবে স্বভাব নষ্ট। বাস্তবিক নারী যখন জানে অনুভব করে তাহার কিছুই নাই, আছে কেবল অভাব, আর সেই অভাব পুরণ করিয়া দিতেছে ও দিতে পারে কেবল পুরুষে, তখন তাহার স্বভাব তাহার নারীত্ব অনেকখানি সঙ্কুচিত অনেকখানি আপনা-হারা হইয়া যায়। স্বভাবের সত্য স্বরূপ সেখানে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি বিকৃত সংস্কার, কতকগুলি মিথ্যার ময়লা সেখানে জমিয়া যায়। কি রকমে, বলিতেছি।

আমাদের দেশ নাকি সীতা সাবিত্রীর দেশ। আমাদের সমাজের বিশেষত্ব এই যে, নারীর এমন অকুণ্ঠিত আত্মদান, এমন অটুট একনিষ্ঠা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; আমাদের নারীর নারীত্ব জগতে অতুলনীয়। বাহির হইতে যখন দেখি কথাটা যেন খুবই সত্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে, ব্যাপারটার মধ্যে এমন সব জিনিষ ধরা পড়ে যাহাতে আমাদের সে সহজ সরল বিশ্বাসকে অনেকখানিই টলাইয়া দিয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি আমাদিগের মেয়েদিগকে কতখানি ধরিয়া বাঁধিয়া সতী সাবিত্রী করিয়া তোলা হইয়াছে, উপায়ান্তর নাই দেখিয়াই তাহারা কতখানি তাহাদের প্রশংসিত পুণ্যধর্ম্মগুলি আপনার করিয়া লইয়াছে—they have made a virtue of necessity, আপনাকে চিনিবার জানিবার আগে হইতেই আমাদের মেয়েরা শুনিয়াছে, দেখিয়াছে, শিক্ষা পাইয়াছে যে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা ছাড়া তাহাদের অন্য গতি নাই; সমাজের আবহাওয়া, অতীতের অভ্যাস মেয়েদের প্রাণে অজানিতেই এই সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে পুরুষের গলগ্রহ তাহাকে হইতেই হইবে —এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। কেবল ভাবজগতে—মনে প্রাণে এই সংস্কারটি থাকিলেও বা কতক রক্ষা ছিল; কিন্তু বাস্তব ব্যবস্থাও এমন করা হইয়াছে যে, শরীরটিকেও ঐ সংস্কার-অনুযায়ী বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই, নিজের নিজত্বের সহিত যখন সে কিছুমাত্র পরিচয় স্থাপন করিতে পায় নাই তখনই আমাদের সমাজের মেয়েকে একটি জড়-পুঁটুরির মত পুরুষের সাথে উদ্বাহ-সূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হয়—পুরুষকে উদ্বাহু হইয়াই সে ভারটি বহন করিতে হয়। শিশুকাল হইতেই পরের উপর যে একান্ত নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে, হঠাৎ একদিন জ্ঞান হইলেও সে দেখে এই পর ছাড়া সে একেবারে নিরুপায়, দাঁড়াইবার তাহার স্থানও নাই সামর্থ্যও নাই: কাজেই এই জ্ঞানটিকেও চাপা দিয়া ফেলিতে চায়, ইহার চারিদিকে একটা ধর্ম্মের পুণ্যের জাল বুনিয়া ফেলে। "স্বামীর অভাবে আমার কি উপায় হইবে"—মেয়েদের এই চলিত কথাটির মধ্যে যথার্থ প্রাণের অর্থাৎ অন্তরাত্মার সহিত অন্তরাত্মার মিলের টান কতখানি আর কতখানিই বা নেহাৎ আধিভৌতিক অর্থাৎ আশ্রয়ের অন্নবস্ত্রের আশঙ্কা লুকাইয়া আছে, সে প্রশ্ন আমাদের আত্মাভিমানকে আঘাত দিতে পারে, কিন্তু সত্যকে ত বদলাইতে পারে না। শত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিলেও মানুষের বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার বৃত্তিকে, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রেরণাকে কেহ নাকচ করিয়া দিতে পারে না—এ একেবারে মানুষের গোড়ার বৃত্তি, গোড়ার প্রেরণা। সুতরাং যখন দেখি আমার এই বৃত্তি এই প্রেরণা আর এক জনকে ভর করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, তখন যে তাহাকে দ্বিগুণ জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব তাহা খুবই স্বাভাবিক। তবে মানুষ পশু নয়, তাই আমরা প্রাকৃত বৃত্তিকে প্রেরণাকে একটু ঢাকিয়া ঢুকিয়া সাজাইয়া রঙাইয়া ধরে, অথবা বড়-জোর বাস্তবিকই অন্য কতকগুলি উচ্চতর বৃত্তির সাথে মাখাইয়া মিশাইয়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের অস্তিত্ব যে থাকে না বা তাহাদের জোর কিছুমাত্র কমিয়া যায়, তাহা মনে করা বিষম ভুল. সেটা আত্ম-প্রবঞ্চনা। আমাদের সমাজে নারীত্বের আত্মদান একনিষ্ঠা প্রভৃতি বড় বড় কথার নীচে এইরকম অপ্রীতিকর গোপন

ইতিহাস' একটা ট্রাজেডিই আছে তাহা কেহ খোঁচাইয়া দেখিয়াছেন কি? আমাদের মেয়েরা পতিকে দেবতা মনে করিয়া ভক্তি করে কিন্তু সেই ভক্তির উৎস কতখানি যে ভয়—দেবতা হারাইলে পাছে দেবতার ভোগের প্রসাদ লইতে বঞ্চিত হই—এ কথাটা খুব রূঢ় শুনাইতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসুর ত তাই বলিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া চলেনা।

মেয়েরা যে গোড়াতেই পুরুষদের কাছে, যাহাকে বলে, ভাতে মরিয়া রহিয়াছে। এই গোড়ার বন্ধনটি মুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে নারীর স্বভাব স্বধর্ম্ম কি চায়, কি ভাবে চলে; পুরুষের সহিত তখন সে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে তাহার মধ্যে আর কিছু না থাকুক দাতার ও গ্রহীতার, মনিবের ও দাসের যে একটা অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ সেটির কোন ছায়া পড়িবে না—উভয়ের মধ্যে দুটি মুক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ সত্তার সত্য সম্বন্ধ দাঁড়াইবার সুযোগ হইবে। আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাতে নারীরও মঙ্গল পুরুষেরও মঙ্গল; সমাজেরও ব্যবস্থা একটা নূতনতর স্বাভাবিকতর সত্যতর রূপকে ফলাইয়া ধরিতে পারিবে। আধিভৌতিক হিসাবেও —বিশেষতঃ বর্ত্তমানের অন্নকষ্টের দিনে সকলের সুবিধা হইবে। আমাদের হিন্দুসমাজের অসহায় বালিকাদেরও আর যেন-তেন প্রকারে বলিদান দিতে হইবে না, পুরুষদেরও যে ভার ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে তাহার লাঘব হইবে—সমাজের যে অর্দ্ধেকভাগ এখন কেবল খরচই করিয়া আসিতেছে তাহারও জমার দিকে কিছু নজর দিলে গোটা সমাজ সমৃদ্ধতরই হইয়া উঠিবে। নারীর স্বাধীন উপজীবিকার বিরুদ্ধে একটা হেতু দেখান হয়, তাহার মাতৃত্বের ভার। এই হেতু একটা ছুতা মাত্র; কারণ, আমরা চোখের সম্মুখে নিত্যই দেখিতেছি নিম্নতর শ্রেণীর অশিক্ষিত ঘরের মেয়েরা এই মাতৃত্বের ভার সত্ত্বেও কত উপায়ে কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতেছে, আর আমাদের ভদ্র ঘরের মেয়েরা পরিশ্রম হিসাবে কি কিছু কম করিতে পারে? সে পরিশ্রমটার মধ্যে একটু কৌশল, একটু সাজান গোছান, একটু ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকিলেই যে তাহাকে উপজীবিকার উদ্দেশ্যে খাটান যায় না তাহা নয়; আর যাঁহারা গালগল্প করিয়া শুইয়া গড়াইয়া বা বাজে কাজে সময় কাটান, তাঁহাদের ত কোন অজুহাতই নাই। তারপর এই মাতৃত্বের ভার মেয়েদিগকে সারা জীবনের প্রতিদিন কিছু বহন করিতে হয় না—প্রয়োজন-মত অবসর ত লওয়াই যাইতে পারে, এই অবসর ছাড়াও আরও যে যথেষ্ট সময় পড়িয়া থাকে, সেটির সদ্ব্যবহার কয়জন করিতে চাহে বা পারে?

আমাদের দেশে মেয়েদের "ভোট" অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতিক অধিকার লইয়া একটা আন্দোলন সম্প্রতি বেশ উঠিয়াছে—বর্ত্তমান যুগের হাওয়া আমাদের সনাতন সমাজের বুকের উপর দিয়া যে চলিতে সুরু করিয়াছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক অধিকার তখনই সত্যকার হইয়া উঠে যখন তাহার পিছনে থাকে অর্থনীতিক অধিকার। তাই আমরা মনে করি পলিটিক্যাল স্বাধীনতা অপেক্ষা ইকনমিক স্বাধীনতাই মেয়েদের পক্ষে বেশী জীবন্ত জিনিষ, এই বস্তুটিই নারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের গোড়া ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী, তাহার একটা স্বাধীন মতামত ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, আর কোন স্বাধীন মতামত থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার বা তদনুসারে কার্য্য করাইবার পথ থাকে না—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দারিদ্রানাং মনোরথাঃ। রাষ্ট্রে অথবা আরও বড়ভাবে সমাজে মেয়েদের স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে হয়, রাষ্ট্রের সমাজের ব্যবস্থার উপর নারীরও হস্ত-চিহ্ন থাকা যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে আগে অর্থ সম্বন্ধে আত্মবশ হইতে হইবে। সমাজের এই আন্দোলন আমরা আগে দেখিতে চাই। তাহা হইলে বুঝিব নারী-রাষ্ট্রনীতিক অধিকারের আন্দোলনটাই কেবল যে খাঁটি হইয়া উঠিতেছে তা নয়, নারীর সমগ্র জীবনের স্বতন্ত্রতাও সত্যকার ভিত্তি পাইতেছে। পুরুষেরা এই আন্দোলনে কতখানি যোগ দেয় তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিব নারীর যথার্থ মুক্তির অধিকারের জন্য পুরুষের প্রাণের সায় কতখানি আছে।

তাই বলিয়া নারীর অর্থাধিকারকেই যে আমরা সর্ব্বেসর্ব্বা করিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না। আরম্ভেই আমরা বলিয়াছি গোড়ার কথা হইতেছে মনের মুক্তি, অন্তরাত্মার উদ্বোধন—শিক্ষা ও দীক্ষা। এই ভিতরের

জিনিষ ব্যতিরেকে বাহিরের সব আসবাবই বিফল। বর্ম্মায়, আমাদের দেশে, খাসিয়াদের মধ্যে নারীর অর্থাধিকার যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবুও তাহাদের সমাজ যে খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত ধরণের তাহা মনে হয় না; কারণ সেখানে অভাব এই গোড়ার জিনিষটির—তবুও নারীর স্বাতন্ত্র্য সমাজ-শৃঙ্খলার অন্তরায় যাঁহারা বলেন, তাঁদের দৃষ্টি আমরা ঐ সমাজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই—পুরুষের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছাড়া নারীর কর্ত্তৃত্ব যে সমাজ গাঁথিয়া তুলিতে পারে, সমাজকে একটা ভিন্ন রকম মূর্ত্তিই দিতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ ঐখানে পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

উপাসনা,—পৌষ, ১৩২৮।

রক্তের লেখা

নীরদ স্বপ্নেও ভাবেনি যে নীলফামারীতে তার মহকুমার বড় হাকিমীর প্রথম দিনেই এজলাসে মেজদার সঙ্গে এমন আকস্মিক দেখা হয়ে যেতে পারে। নীরদের কোর্টে একটা ডাকাতি মকদ্দমায় মেজদা এসেছিল আসামীর পক্ষ হয়ে বক্তৃতা করতে।

পুষ্পর বিয়ের পর ইংরেজ-সরকারের ডেপুটীরূপ অস্থাবর সম্পত্তি নীরদ ঝিনেদা, বন-গাঁ, কুষ্টে, নাটোর ক'রে কেবলি চ'লে বেড়িয়েছে আর বিলেত থেকে আইন পাস ক'রে এসে মেজদা কায়েমী পাট্টা নিয়ে হাইকোর্টে বসে গিয়েছিল। নবীন কৌঁসুলীদের ভেতর তার নাম আর পসার দুটোই বেশ জমকে উঠেছিল ব'লেই সে কলকাতায় একেবারে স্থাণুর মতন আটকে পড়েছিল। তাই দুজনে দেখা হবার মত "মধু-যামিনী" এর আগে আর আসে নি।

নীরদ প্রীতি-অভিনন্দন দিয়ে মেজদাকে সঙ্গে ক'রে তার বাংলোর নিয়ে গেল। তখন ঘরের ভেতর সন্ধ্যার আলো জ্ব'লে উঠেছে। বাংলোর বারান্দায় অরকিডগুলোর গায় গায় তুলে-দেওয়া লতা-মালঞ্চের নীচে চায়ের টেবিলের দুপাশে দুজনে মুখোমুখি হ'য়ে বস্‌লো। সাম্‌নে গোল ক'রে বেড়া দেওয়া বাগানের ভেতর রক্ত গোলাপটীর বুকের উপর প'ড়ে জ্যোৎস্না সন্ধ্যার চাঁদিনী চুমোর দাগ, ফুটন্ত ফুলের পাপড়িগুলির উপর চক্‌চক্ কচ্ছিল। বেয়ারা এসে চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের ওপর রেখে গেল। নীরদই আজ হোষ্ট—টি-পট থেকে এক পেয়ালা চা ঢেলে বিস্কুটের টিনটা মেজদার সাম্‌নে ঠেলে দিয়ে নীরদ বস্‌লো। তার মুখের উপরকার হাসির রঙ্‌খেলা হঠাৎ যেন চোখের জলের বৃষ্টি নেমে ধুয়ে গেল। সে ধরা-ধরা গলায় বল্‌লে—"মনে আছে মেজদা, তুমি একদিন আমায় চায়ের নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে গেছ্‌লে?"

মেজদা একটা কি টন্‌টনে ব্যথায় ধাঁ ক'রে দমে গিয়ে বল্‌লে—"মনে আছে নীরদ, কিন্তু কেন আর সে কথা ভাই?"

নীরদ এবার জোর ক'রে মুচ্‌কি হেসে

বল্লে,—"না, আর কেন সে কথা! কিন্তু আর কিছু মনে আছে মেজ-দা?"

মেজদা নীরদের মুখের পানে মুখ তুলে তাকাতে পারলে না, মাথা নীচু ক'রেই জবাব দিলে—"হ্যাঁ, পুষ্প এসে চা দিয়ে গেল। কিন্তু থাক্ সে কথা—"

"হ্যাঁ, থাক্ মেজদা,—সেদিনও এম্নি জ্যোৎস্না-রাতের সন্ধ্যা রুপোর ফটিক ভেঙে ছাদের উপর, কার্ণিসের ধারি ধ'রে খেলা কচ্ছিল। সেদিনও আমি ছিলাম একেবারে একা—আজও তাই।"

মেজদা বল্লে—"তোকে আমি প্রণাম করি নীরদ—আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এ ব্যথা ভুলে যা।"

সে আজ বছর এগারো আগেকার কথা। মেজদাদের বাড়ীর সাম্নের বাড়ীটীর জান্লার পাশটীতে বসে মোটা মোটা ইংরিজী বইএর পাতার উপর চোখ ঠিক্‌রে রেখে নীরদ তার পাশের পড়া তোয়ের কর্‌তো। ও বাড়ীতে পুষ্পরাণীর নানান্ আলাই-বালাই, রাজ্যের যত কাজ ত' ঐ ঘরখানার ভিতরেই। মেজদার পড়ার টেবিল এখনও এলোমেলো হয়ে থাকে; ঝেড়ে গুছিয়ে ঝর্‌ঝরে, তক্‌তকে করে দিতে হয়; ছবিগুলো ধুলোয় ধুলোয় ময়লা ধ'রে যায়, পুষ্প মুছে না দিলে আর কে তা দেবে! ম্যাটিং-করা ঘরের মেঝে ঝী-মাগি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার কর্‌তে পারে না—সে ভার তাই পুষির,—পুষ্পিটার। ড্রেসিং টেবিল একখানাই মোটে মেজদার ঘরে আছে—তার পাশে আরসি সাম্‌নে করে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে বেণী জড়িয়ে খোঁপা তার ঐ ঘরেই বাঁধ্‌তে হয়। রাস্তায় মিত্তিরদের বাড়ীর ফিটন গাড়ীর জুড়ী ঘোড়া টগবগিয়ে চলে যায়,—আধখানা খোলা জান্‌লার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে গিয়ে চকিতে তার চোখে পড়ে—ঐ জান্‌লার কাছে ফুটফুটে কে যেন! সুন্দর, তাজা মুখখানা! তার মুখের উপরকার সোনা-চম্‌কানো গোলাপ-ছোপের চেয়েও গোরা তাঁর রং। ডাগর চোখদুটী—চমৎকার। পুষ্ট, পেশল তনু, দীর্ঘ বিলোল হাতদুখানা চওড়া বুক—পরিপুষ্ট। একেবারে উদলো গায় ধ্যানীর মত মগ্ন মনোযোগে পাতার পর পাতা উল্টে বই পড়ে চলেছেন। তখন তো পুষ্প জান্‌তো না, উনি পথের কাঙাল। ও-বাড়ীর ছেলেটীকে পড়িয়ে ঐখানে থাকেন, ওরা দুবেলা দু-মুঠো ওঁকে খেতে দেয়। দেখে দেখে পুষ্পর হঠাৎ মনে হয়েছে —এই এত ক'রে মাথা কুটে পড়া ওঁর কার জন্যে?—ছি! কানের পাশ দিয়ে গালের উপরটা অবধি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌তেই জান্‌লা বন্ধ করে দিয়ে সে সরে যেতো।

কিন্তু পড়াই যে ছিল নীরদের সব! কেউ ছিল না বেচারীর আপন জন, আত্মীয়-বন্ধু। জলপানির টাকা দিয়ে কলেজের মাইনে কুলিয়ে গেছে। বই কিন্‌তে পারে নি, হাতে লিখে নিয়েছে। এম্নি ক'রেই 'ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স' সে পেয়েছিল, কিন্তু জলপানি তো পেলে না— এম, এ পড়া কি ক'রে চলে! অনেক করে এই বাড়ীতে ছেলে-পড়াবার কাজ জুটিয়ে নিয়ে সে এইখানে এল। সারাটী দিন-রাত পড়ারই তপস্যা কর্‌তো। সে পুষ্পর কোন কথা অত-শত কিছুই জান্‌তো না। তেমন কিছু এতদিন তার চোখেও পড়েনি।

হঠাৎ সেদিন পড়ার ফাঁকে দৃষ্টিটা তুলে ও-বাড়ীর উপরের ঘরখানার মধ্যে তাকাতেই নীরদ দেখলে,—ঝাঁক্-বাঁধা ভ্রমর-দলের মতন নিবিড় একরাশ কালো চুল কে পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে সিঁথির দু'পাশে আঁচড়ে বাহার ফুলিয়ে তুল্‌ছিল,—ঝুম্‌কো-লতার মত জড়িয়ে পাকিয়ে ওঠা ডগাগুলি তার রঙীন্ শাড়ীর ধারি ধ'রে মিহি ময়ূরকণ্ঠী কাজ-করা জরির পাড়টীর উপর গোছা বেঁধে রয়েছে! চোখ, মুখ, রঙ তার—সে আর বলা যায় না। নীরদ ভাব্‌লে—কার স্বপ্ন-লোকের আলোর ভুবনখানা, রূপ-ভঙ্গিমার ফাগ-পোরা কুঙ্কুমটার বুক-ফাটা লালে রাঙা ক'রে আশা-আবেশের মোহন-মঞ্জরী রক্ত ভেঙে ফুটিয়ে তুল্‌বে—কনক-বরণী এ কল্প-লতাটী! নব-যৌবনের সুর-সপ্তক, তনুখানির সাত-তারার তারে তারে কুলবধূর মন-ভোলানো মল্লিকা ফুলের রেণু-গন্ধে, পঞ্চবাণের মন্ত্র বুলিয়ে বাঁধা একখানা কুহক-গানের মৌন বাণী মুখর ক'রে জাগিয়ে তুলেছে—কার মরমের উপকূলে বর্ষাকালের শাসন-আল্‌গা বন্যা-স্রোত উদ্বেল ক'রে আন্‌বার জন্যে গো? কার জন্যে?—দূর! এও কি কথা? চকিতে এত বেশী পন্থই সে ভেবে ফেল্‌লে। কেন না, এর আগে নীরদ প্রণয় কি কিশোরী দুই-এরই দিকে একেবারে অমনোযোগী ছিল—মেয়েদের মুখের পানে চোখ তুলে সে ক্বচিৎ চেয়েছে।

তারপর দিন থেকেই তরুণ এখন কান পেতে শোনে, ও-বাড়ীর কার কণ্ঠে কেঁপে কেঁপে মধুর মধুর কথা আর সুরে কি রাগিণীটি লহরে নাচিয়ে-তোলা মূর্চ্ছনায় বেজে ওঠে! কার আঁচলের সে ঈষৎ অরুণিম আভায় যদি আর একটীবার চোখে পড়ে! ভঙ্গিম অঙ্গ দুলিয়ে চলে যাবার ছন্দে-লয়ে মন্দ তার পায়ের ধ্বনি যদি একবারটী কানে আসে! ঐ মেয়েটীর চুড়ির রুনুরুনি আর তার এলো চুলের গন্ধ ব'য়ে দখিণ হাওয়া দমকা এসে তার খোলা জান্‌লা দিয়ে ঘরে ঢুকে নীরদের তপ্ত গায় যদি বাতাস ক'রে যায়! কিন্তু কল্পনার কিছুই সত্যি হয়ে উঠ্‌তো না। বেচারী ব্যর্থ নিশীথ রাতে জেগে ব'সে বেহালাখানি বেঁধে নিয়ে সেই রাগিণীটা তেম্‌নি মিঠে ক'রে বাজায়। ও-বাড়ীর মেয়েটীর গলায় যা সকল গানে সকল-বাণী-হারা সুরের স্বপ্ন বুলিয়ে বেজে ওঠে। নীরদের যন্ত্রের তারে, তার আঙুলের যন্তের আঘাতে গায়িকার গলার সে কোমল নিখাদে কড়ি চড়ায় ঝঙ্কার দিয়ে চম্‌কে ওঠা গমকটী অবধি খাঁটি হ'য়ে ফুটে ওঠে। করুণ সে মিশ্র রাগিণীর কল-আলাপ, গভীর রাতের নীরব সুষুপ্তির মাঝখানে তার বাঁধন-হারা বুকে মৌন কাঁদন এমনি ভাবেই ব্যক্ত ক'রে তুল্‌তো। পুষ্পরাণীও কি আর এক-একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে শুন্‌তে শুন্‌তে চোখের জলের ঝরণা ঝরিয়ে বুকের আঁচল ভিজিয়ে ফেল্‌তো না!

এমনি ক'রে ক'দিন পরে পুষ্প একদিন বিকেল বেলা মেজদার টেবিলের উপর জল-খাবারের রেকাব আর চায়ের বাটিটা রেখে পাশের আধ-খোলা জান্‌লাটা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে দাঁড়ালো। মেজদা, একটু

অবাক হ'য়ে যেন বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"জান্‌লাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলে কেন?"

পুষ্প দুখানা ঠোঁটের উপর ঈষৎ হাসিটুকু চেপে নিয়ে বল্‌লে—"ও-বাড়ীর জানলা খুলে দিয়ে পাশে ব'সে একজন কে সারাদিনই পড়েন!"

মেজদা চম্‌কে গিয়েছে যেন—এম্‌নি ভাব দেখিয়ে বললে,—"সে কি কোনো দিনও তোর মুখের পানে চোখ তুলে কি ভুরু বেঁকিয়ে চেয়েছে?"

পুষ্প শুধু বল্‌লে—"না।"

মেজদা বেশ সোজা হয়ে উঠে ব'সে বল্‌লে—"হ্যাঁ, তা আমি জানি। তবে যদি তোদের কখনো চোখে চোখে প'ড়ে গিয়েও থাকে—সে হঠাৎ—ও তা mean করেনি! কেমন—না, তুই বল্‌তো সত্যি কথা?"

পুষ্প মুখখানা নীচু ক'রে উত্তর দিলে—"তাও শুধু এক দিন—একটীবার মোটে।"

গম্ভীর হয়ে গিয়ে মেজদা বল্‌লে,—"তুই জানিস্ নে—ও কি ছেলে! আমাদেরই সঙ্গে পড়ে, এবার ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট—ওই-ই হবে।"

"হবেন?" বল্‌তে আহ্লাদে পুষ্পর সারা অঙ্গে যেন একটা স্পন্দন সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। মেজদা তা লক্ষ্য করেও ভাবটা বুঝ্‌তে না দিয়ে বললে,"ফার্ষ্ট যদি ও না হয়—তা হ'লে বুঝ্‌বো, ভগবান নেই। অমন পরাণ-পণ-করা পড়ার সাধনা ব্যর্থ হতে পারে না। ওর যে কি কষ্ট, পুষ্প! দুবেলা পেট ভ'রে খেতেও পায় না। পরের বাড়ী—তারা কি আর তেমন যত্ন করে! জলখাবার দুটী মুড়ীমুড়কিও ওর জোটে না। নেহাৎ গরীব—পয়সা নেই যে খাবার কিন্‌বে!"

পুষ্প কেন যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, "আহা।"

মেজদা বলেই চল্‌লো—"কলেজ থেকে এসেই মুখটী গুঁজে পড়তে বসে—কত রাত পড়েই কাটিয়ে দেয়। কেন না এর-ওর বই চেয়ে নিয়ে, নয়ত হাতে লিখে যে ওর পড়া তোয়ের করতে হয়। চেয়ে-আনা বই সময়-মতন আবার ঠিক ফিরিয়ে দেয়! সখের ভিতর ওর আছে শুধু একটু বাজানোর খেয়াল। একজনকে একখানা note নকল করে দিয়ে দশটা টাকা পেয়েছিল, তাই দিয়ে সেদিন একখানা বেহালা কিনেছে। প'ড়ে প'ড়ে যখন বড় শ্রান্ত হয়, তখনই যন্ত্রটী নিয়ে বসে—বাজায়ও বেশ।"

পুষ্প জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি শুনেছ মেজদা, ওঁর বাজনা?"

"শুনেছি বই কি!"

পুষ্প একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ফেল্‌লে—"আমায় শোনাবে একদিন ওঁর বাজনা—মেজদা?"

—"আচ্ছা, বল্‌বো নীরদকে।"

পুষ্প এবার মেজদার ঘাড়টীর উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "মাঝে মাঝে কলেজের পর ওঁকে নিয়ে আসনা কেন, মেজদা? এখানে তো একটু চা খেয়ে যেতে পারেন।"

মেজদা বল্‌লে—"তাইত রে—এ কথাটা কিন্তু আমার একবারও মনে হয়নি! আচ্ছা, আমি কালকেই নীরদকে ডেকে আন্‌ব—কিন্তু—"বলে মেজদা হেসে ফেল্‌লে।

পুষ্প জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কিন্তু বলে হাস্‌ছো যে!"

"তুই বেরোবি তো তার সুমুখে?"

"বেরোবো।"

মেজদা হেসেই বল্লে—"রাখ্ তোর কথা! কোনো ফাঁকে যদি একবারটী দেখে ফেলে, সেই ভয়ে জান্‌লাটা অবধি খুলিস্‌নে—তুই আবার সাম্‌নে বেরোবি!"

"বেরোবো বল্লুম, তুমি দেখো—যদি তুমি মত দাও।"

মেজদা জান্‌তো, নীরদের স্বভাব স্ফটিক-শিলার মত। কলঙ্কের কাজল-আঁচড় সে চরিত্রের উপর একটা তিলও কালো করে তুলতে পারে না। তার মুখে অশ্লীল কথা একটী দিনও সে কখনো শোনে নি। কতদিন রাস্তায় একসঙ্গে বেরিয়ে গাড়ীর ভিতরকার কোনো তরুণীর চোখের কথা নিয়ে গল্প জম্‌কে তুলেছে—কিন্তু নীরদ একবারটী সে দিকে তাকিয়েও দেখেনি, কিম্বা তাদের কথায় যোগ দিয়ে কোন জবাবও করেনি। নীরদকে নিঃসন্দেহে, নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করতে পারে বলেই মেজদা বল্‌লে—"হ্যাঁ—আমি পুরোপুরি মত দিচ্ছি—বুঝলি! আর—"

দুষ্টুমির হাসি হেসে "ও-ও ত ব্রাহ্মণ, আমাদেরই স্বশ্রেণী।" বলে মেজদা কথা শেষ কর্‌লে।

"তোমার মুণ্ডু"—বলে পুষ্প পালিয়ে গিয়ে দোরের পাশ থেকে বল্‌লে—"কাল তবে ওঁকে ডেকে এনো মেজদা!"

চেঁচিয়ে উঠে মেজদা ডাক্‌লে, "এই শোন্, শোন্ পুষি—এরি মধ্যেই—ওঁকে—আলাপ না হতেই?—আচ্ছা,—ওঁকে কাল ডেকে আনবো—"

এবার পুষ্প ছুটে চলে গেল। যাবার সময় তার কচি হাতখানার কোমল মুঠোটী পাকিয়ে মেজদাকে একটী কিল দেখিয়ে গেল। মেজদা নিজের মনেই নিজে হেসে উঠে ভাবলে, লক্ষ্মী বোনটী আমার—নীরদও কি ছেলেটী খারাপ!

তার্‌পর দিন মেজদা নীরদকে নিয়ে এল। আজ প্রথম দু'জনে মুখোমুখি দেখা হলো, এত কাছাকাছি। নীরদ একবার মুখ তুলে পুষ্পর দিকে তাকাতেই লজ্জায় সে মুখখানা নামিয়ে নিলে—টেবিলের উপর চায়ের বাটিটি রাখ্‌বার সময় হাতখানা কেঁপে গিয়ে এক ঝলক চা "সসার"-খানার উপর চল্‌কে পড়্‌লো—বুকের ভিতরে একটা যেন কি কেমন করে শিউরে উঠ্‌ছিল—নীরদও আর মুখ তুল্‌লে না—তার মাথার ভিতর কি যেন ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল।

মেজদা বল্লে, "নীরদ, আমার বোন্ পুষ্প, আর পুষ্প—বাবু নীরদশঙ্কর বাগচী, বি, এ, আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড!"

পুষ্প ছোট্ট ক'রে বল্‌লে,—"নমস্কার!" তার হাত দুখানি আস্তে আস্তে উঠে কপালে গিয়ে ঠেক্‌লো। নীরদ তার চেয়েও ছোট ক'রে প্রতি-নমস্কার নিবেদন কর্‌লে। মেজদা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কেমন দেখ্‌ছিস্ নীরদ, বোনটীকে আমার?"

নীরদ বুঝি মনে মনে ঠিক তাই-ই ভাব্‌ছিল—চট ক'রে বলে ফেল্‌লে—

A violet under the mossy stone
Half-hidden from the eye!"

পুষ্প তখন মেজদার পিছনে আলমারীটার পাশে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা শুনে মুখ একেবারে নীচু ক'রে লজ্জায় একটু সরে দাঁড়ালো। মেজদা হো-হো করে হেসে উঠে বল্লে—"এমন ক'রে তুই পুষির সাম্নে আমার অপমান কর্লি—"under a mossy stone! আমি কালো বলেই কি mossy stone রে হতভাগা?"

পুষ্প মুচ্কে হেসে উত্তর দিলে, "কিন্তু খুব apt quotation"

"হাঁ, তা বই কি—তুমি একেবারে ফুটন্ত violet!"

মেজদা এই কথা বল্‌তেই "পান নিয়ে আসি" ব'লে পুষ্প বেরিয়ে গেল।

তারপর থেকে নীরদ বিকেল বেলা প্রায় রোজই এসে পুষ্পদের বাড়ী চা খায়। পুষ্পর মা তাকে "বাবা" বলে ডাকেন। রঙ-বোলানো গল্প, ভুল-ভোলানো গান, আর পুষ্পর ফুল-ফোটানো হাসিতে সন্ধ্যা অবধি বেশ কাটে। মেজদা তার নানান কারু চক্‌মকিয়ে চিকন ডোরে বাঁধা "অ্যালবাম" খুলে কত ঢংএর ছবি দুজনকে দেখায়;—কখনো বা নীরদের কাছে এলিজাবেথান পিরিয়ডের নাটকগুলির টুকটাক্ খুঁটিনাটী, যত রকমের সমালোচনা তার হ'তে পারে—মন দিয়ে শোনে, আর পুষ্প পাশে বসে নীরদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বলার ভঙ্গী, এত জানা-শোনা ভেবে মনে মনে মনটাকে হারিয়ে ফেলে। নীরদ বেহালার তারে সুর বাজায়, পুষ্প একমনে বসে শোনে—আবার নীরদের হাতের "কেদারা-খানি" পুষ্প এস্রাজে কেমনটী তুলেছে, মেজদা আর নীরদের কাছে তার পরীক্ষা দেয়। নীরদ যখন তার প্রশংসা ক'রে বলে ওঠে, "চমৎকার!" পুষ্পর তখনই কেন যেন "কোমল"টা পড়ে গিয়ে বাজনা ভুল হয়ে যায়—আর মেজদা অম্‌নি হেসে ওঠেন।

এম্‌নি ক'রে এত কাছাকাছি থেকে দুজনকারই দূর-থেকে হারিয়ে-যাওয়া আত্মা একান্ত মেশামিশি হয়ে যাবার জন্য দিন দিন আকুল হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু শুধু ইঙ্গিতে, আভাসে ছাড়া সে চঞ্চলতার নিগূঢ় নিবেদন কেউ-ই স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হতে দিলে না; তবু নীরদের নাম শুনেই পুষ্পর চোখের তারা একটা যে অপরূপ আলোক-লোকের পুলক-স্পর্শে চঞ্চল হয়ে চকিতে বিজলী-দেয়ালীর হীরক জ্বালার মত জ্বলে উঠতো—পুষ্পর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে, নীরদের মুখের ভিতর প্রশ্নটা কি-যেন কেমন জড়িয়ে আস্‌তো, মেঝদা তাই থেকে ঠিক-ই ধরে ফেলেছিল যে, তরুণ-তরুণীর অন্তরের কল্প-পটে একটা মোহন-স্বপ্নের যাদু-তুলি—গাঢ় একটা কাঁচা রঙ সবুজ ফলিয়ে বুলিয়ে গিয়েছে। এদের দুখানি হাতে ফুলের মালার বাঁধন দিয়ে অন্তরের তার দুটী একান্ত এক সুরে এবার বেঁধে দিতে হবে।

এই ভেবে এম, এ পরীক্ষা হ'য়ে গেলে মেজদা রাঁচিতে চলে গেল—সেখানে তার বড়দা বড় আপিসের বড় বাবু।

নীরদ গোটা-কতক টাকা যোগাড় করে নিয়ে পাহাড়ে চলে গেল চাকরির তদ্বির ক'র্‌তে, আর পুষ্প এদিকে যখন-তখনই মেঝদার পড়ার ঘরে বসে এস্রাজটীতে তার সেই "কেদারা" খানাই ঘুরে ঘুরে, ঝর ঝরে

তাল-বাহারের তালে দুলিয়ে হাতের গয়নার রনন-শিঞ্জন আর গলার সুর-গুঞ্জনের সঙ্গে ঝঙ্কৃত করে তুলে নীরদের মুখখানি মনে করে—তার হাসির স্মৃতি-রেখায়—নামটী প্রিয়ের, মর্ম্মের পাতায় তার, মাণিকের কিরণ দিয়ে লিখে নেয়।

প্রায় তিনমাস পরে এম,এ পরীক্ষার ফল বেরোলো যেদিন, মেজদা সেইদিন রাঁচি থেকে ফিরে এল। পুষ্প ছুটে এসে পায়ের ধুলো নিতেই মেজদা বল্লে, "পুষ্পি, নীরদ first হয়েছে—আর আজকের গেজেটেই বেরিয়েছে ইউনিভারসিটী নমিনেসনে সে ডেপুটী ম্যাজি-ষ্ট্রেট appointed হল—কিন্তু—"

এই চিন্তার ভিতর একটা কি ক্ষোভের কাতরতা ক্রন্দনের গুরু লাঞ্ছনায় গুঞ্জরিত যে হয়ে উঠ্‌ছিল! পুষ্পর ঠোঁটের উপর দিয়ে আধখানা ফুটে-ওঠা হাসিটুকু মেজদার ঐ কথার কান্না-ভেজা ব্যথার সুরে চট ক'রে কালো হয়ে গেল। সে কিছু না বলে মেজদার পানে তাকিয়েই রইল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা তার তখন কি-যেন এক অজানা আশঙ্কায় দপ দপ করছিল। মেজদার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল, টল্‌টল ক'রে এলো—সে অতি আস্তে আস্তে বল্‌লে,—"বড়দাকে অনেক ক'রে বুঝিয়েছিলাম পুষ্প, কিন্তু কিছু হলো না।"

পুষ্প নীরবে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে মেজদার বিছানার উপর নীরদ যেখানটায় এসে বস্‌তো, সেইখানে উপুড় হয়ে পড়ে বালিসে মুখ গুঁজে রইল। মেজদা তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে,—"কাঁদো পুষ্প, বিধাতা যে আমায় তোর বড়দা করেন নি—"বলে কান্না চাপ্‌তে না পেরে বেরিয়ে গেল।

সেইদিনই বড়দার তার এলো, মীর্-গঞ্জের ধনী জমিদার বগলা বাবুর এম, এ পড়া ছেলের সঙ্গে পুষ্পর বিয়ে, মাঘ মাসের চৌঠো তারিখে।

চৌঠো তারিখেই বৈকালে, সূর্য্য যখন ডুবে যাচ্ছিল, সেই সময় মেজদার লেখা এই প্রাণ-ভাঙা কাঁদাকাটীর শেষে নীরদ পুষ্পর হাতের দু-ছত্র লেখায় পড়লে :—

"সমাজের পাওনা নাকি প্রাণের দাবীর চেয়েও ঢের বেশী, তাই বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিলাম—তুমি আমার স্বগোত্র!"

সব-শেষের হরফ্‌ কটী পিংশে লালে লেখা।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চিরন্তনী

যে দিন প্রথম ঊষা সৃজনের মহাসিন্ধু-তীরে
আঁধারের তটরেখা বিদীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে
আপনার পরিপূর্ণ সুধাময় আলোক-উচ্ছ্বাসে
উদ্ভাসিয়া উঠেছিল,—মহাপ্রাণ অমৃত প্রকাশে
চেতনা বিতরি বিশ্বে ;
তোমায় আমায় সেইদিন—
স্তব্ধ, শান্ত, সুপ্রসন্ন ঊষার আলোকে, বাধাহীন
উন্মুক্ত আকাশতলে—নয়নে নয়নে পরিচয়।
চির-অন্বেষণ-ক্লান্ত পথশ্রান্ত পান্থ এ হৃদয়
প্রথম-আলোক-মুগ্ধ, দাঁড়াইল তোমার দুয়ারে
বহু যুগযুগান্তের আলোহীন সাধনার পারে
দোঁহাকার।
সেই তুমি, নহ তুমি নহ ক্ষণিকের ;
সৃষ্টির কল্পনা মাঝে তুমি আমি প্রথম বিশ্বের।

শ্রীজীবনময় রায়।

৮

আন্দ্রের দৈহিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ হওয়ায় এবং মিলিতোনার অবিশ্রান্ত সেবা-শুশ্রূষায় আন্দ্রের শরীর শীঘ্রই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। এখন আন্দ্রে কথা কহিতে পারে, একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা আবার অনুভব করিতে লাগিল। বড়ই মুস্কিল,—অবস্থাটা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

আন্দ্রে ঠিক্ অনুমান করিয়াছিল যে, তাহার অন্তর্ধানে ফেলিসিয়ানা, ডন্ জেরোনিমো এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন—এবং এই উদ্বেগ নিবারণের জন্য সে এখনো কোন চেষ্টা করিতেছে না বলিয়া, মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিল। তথাপি, সে যে একজন সুন্দরী তরুণীর কক্ষে রহিয়াছে, সেই তরুণীর জন্যই সে ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে, এই-সব কথা তাহার "নব্যাকে" বলিতে বড় একটা গা করিল না। এ কথা কবুল করা বড়ই শক্ত, অথচ কবুল না করাও অসম্ভব।

আন্দ্রে প্রথমে যখন এই কপাল-ঠোকা কাজে প্রবৃত্ত হয় তখন উহা এতদূর গড়াইবে বলিয়া মনে করে নাই। সে মনে করিয়াছিল একজন নগণ্য বালিকার সঙ্গে গোপনে প্রেম করা—এ-ত অতি তুচ্ছ লঘু ব্যাপার। কিন্তু মিলিতোনার সেবাপরতা, আত্মোৎসর্গ ও সাহস মিলিতোনাকে আর-এক পংক্তিতে স্থাপন করিয়াছে। যখন মিলিতোনা জানিতে পারিবে যে, আন্দ্রে পূর্ব্বেই আর এক রমণীর সহিত বাগ্‌বদ্ধ তখন সে কি বলিবে? ফেলিসিয়ানা রাগ করিবে; ইহা অপেক্ষা মিলিতোনা কষ্ট পাইবে এই কথাই আন্দ্রের মনে বেশী জাগিতেছিল। ফেলিসিয়ানার নিকট ইহা একটা অযোগ্য শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কাজ বই আর কিছুই নয়—কিন্তু মিলিতোনার পক্ষে ইহা দারুণ নৈরাশ্য। মহা বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মহত্ত্বের সহিত যদি এই প্রেমের কথা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ইহাই কি তাহার পুরস্কার হইবে? জুয়াঙ্কো আবার যদি আসিয়া মিলিতোনাকে আক্রমণ করে—তাহার উপর জোর-জবর্দ্দস্তি করে? তাহা হইলে আমায় কি তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে না?

আন্দ্রে মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি করিতে লাগিল; এবং এইরূপ চিন্তা করিবার সময়, মিলিতোনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। মিলিতোনা জানালার ধারে বসিয়া সূচিকর্ম্ম করিতেছিল। কষ্টের প্রথম মুহূর্ত্তগুলা কাটিয়া গেলেই, সে আবার তাহার নিত্য-নিয়মিত জীবিকা-নির্ব্বাহের শ্রমসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। একটি ঈষদুষ্ণ নির্ম্মল আলোক-কিরণ মাতার স্নেহ-আদরের ন্যায় তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই আলোক-কিরণের ঈষৎনীলাভ মৃদুকম্পন মিলিতোনার কেশ-বন্ধনের ফিতাগুলার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তাহার সেই প্রচুর কুন্তলরাশি মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে জড়ান ছিল। কর্ণমূলের উপর বিন্যস্ত একটি লালরঙের

গোলাপ, ঐ কৃষ্ণবর্ণকে আরো যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সবশুদ্ধ মিলিতোনাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহাতে আবার নীল আকাশের একটা কোণ, যাহার উপর টবে-রক্ষিত পত্রপুষ্পের রেখাবয়ব অঙ্কিত ছিল,—সেই নীল আকাশের কোণটি যেন তাহার সুন্দর মুখচিত্রের পশ্চাদ্‌ভূমিস্বরূপ হইয়াছিল। ঝিল্লি ও বারুই পাখী পালা করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছিল, টবের সুরভি পত্রপুষ্পের সৌরভে পরিসিক্ত হইয়া সুমন্দ গন্ধবহ ঘরের ভিতর একটা মৃদুমন্দ সুগন্ধ বহিয়া আনিতেছিল।

ঘরের ভিতরকার সাদা দেয়াল, জ্যাবড়া রংকরা কতকগুলি জন-প্রিয় খোদাই ছবিতে বিভূষিত। ঘর আলো করিয়া মিলিতোনা ঘরে থাকায় ঘরের একটা অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। ইহাই আন্দ্রেকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই অকলুষ দৈন্য, এই কুমারী-সুলভ নম্রতায় আন্দ্রের অন্তকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। নির্দ্দোষ ও গর্ব্বিত দারিদ্রের মধ্যে একটা কবিত্ব আছে। একজন সুন্দরী ললনার জন্য কত অল্প জিনিসই দরকার!

এই সাদাসিধা ঘরটির সহিত ফেলিসিয়ানার আড়ম্বর-বহুল কামরা ও খারাপ রুচির তুলনা করিয়া ফেলিসিনিয়ার কামরার দেয়াল-ঘড়ি, পর্দ্দাগুলা, ছোট ছোট মূর্ত্তি ও কাচের ছোট ছোট কুকুরগুলা আন্দ্রের নিকট আরো বেশী হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল।

এই সময় রাস্তায় একটা টিং-টিং টুং টাং শব্দ শোনা গেল।

মিলিতোনা হাতের শিল্পকাজটা টেবিলের উপর রাখিয়া সহর্ষে বলিল :—এই যে আমার প্রাতর্ভোজনের খাদ্য-সামগ্রী এল বুঝি। আমি নীচে নেমে যাই—আসবার পথে ওদের আট্‌কাতে হবে। আজ একটা বড় পাত্রে খাবারগুলা নিতে হবে—কেননা, আজ আমরা দুজন। আর ডাক্তারও তোমাকে কিছু খেতে বলে গেছেন।

আন্দ্রে একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল :—

—আমার মত অতিথির উদর পূরণ করা তোমার পক্ষে শক্ত হবে না।

—ও কি কথা! 'খেতে খেতেই খিদে হয়',—বিশেষতঃ যদি রুটিটা সাদা হয় আর দুধটা খাঁটি হয়; যে লোকটা আমাকে এ-সব জিনিসের যোগান দেয়, সে আমাকে কখ্‌খনো ঠকায় না।

এই কথাগুলি বলিয়া মিলিতোনা, একটা পুরাতন গীতের একটা চরণ গুনগুন স্বরে গাহিতে গাহিতে অন্তর্হিত হইল। কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরিয়া আসিল। গাল দুটি লাল হইয়াছে, আব্রো-খাব্রো সিঁড়ির ধাপ দিয়া আরোহণ করায় নিঃশ্বাস খুব জোরে পড়িতেছে—হাতের তেলোর উপর, সফেন দুগ্ধে পূর্ণ একটা বাসন ধরিয়া আছে।

—আশা করি, আপনাকে আমি অনেকক্ষণ একলা রেখে যাই নি মহাশয়। ৮০ টা ধাপ দিয়ে নামা—বিশেষতঃ ওঠা!

—তুমি পাখীর মত চটুল চট্‌পটে। এই কালো সিঁড়িটা দেখ্‌ছি এখানে স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াবে।

একটা হেঁয়ালি ভাবিয়া নিতান্ত সরলভাবে মিলিতোনা জিজ্ঞাসা করিল :—

—কেন?—ঠিক সেই সময় মিলিতোনা দুধের দুই ভাগ করিয়া সবেমাত্র রাখিয়া

দিয়াছে। আন্দ্রে তাহার একটি হাত আপন ঠোঁটের দিকে টানিয়া লইয়া উত্তর করিল :—

—কারণ ঐ সিঁড়ি দিয়ে একজন দেবী নেমে গিয়েছিলেন।

—প্রশংসা থাক্, এখন দুধটুকু আর এই রুটিটা খান দিকি মশায়, এর পর আর যখন কিছু পাবেন না, তখন আমাকে বোধ হয় স্বর্গের রাণী বলে ডাক্‌বেন।" এই কথা বলিয়া মিলিতোনা একটা শাম্‌লা রংঙের সুস্বাদু চ্যাপটা ও নিরেট পাঁউরুটির চতুর্থ অংশে একটা শাম্‌লা পেয়ালা অর্দ্ধেক ভরিয়া সেই রংঙের পিয়ালাটা আন্দ্রের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল! রুটিটা স্পেনীয় ধরনের,—খুব ধব্‌ধবে সাদা।

আহা! বড় রোগা হয়ে গেছ; তুমি যখন সামান্য লোকের পোষাক পরেছ, তখন তাদের মত তোমাকে আহারও করতে হবে। তাহলে তোমার ছদ্মবেশটা পুরাপুরি রকমই হবে।

এই বলিয়া মিলিতোনা পেয়ালার উপরি-ভাগে দুধের যে ফেণা উঠিয়াছিল তাহার উপর ফুঁ দিতে দিতে এক এক ঢোঁক্ দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। তাহার টুকটুকে ঠোঁটের উপর দুগ্ধের একটা সুন্দর সাদা রেখা পড়িয়া গেল।

মিলিতোনা বলিল :—

—ভাল কথা,—এখন ত তুমি কথা কইতে পারচ, এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি। তোমাকে প্রথমে যখন সেই ষাঁড়ের সার্কাসে দেখেছিলাম, তখন তোমার গায়ে একটা সুন্দর লম্বা কোর্ত্তা ছিল, তুমি সেই সময়ে প্যারিসের হাল-ফ্যাসানী পোষাক পরে ছিলে; কিন্তু যখন তোমাকে আমরা আমার বাড়ীর দরজার সম্মুখে দেখ্‌লাম, তখন তোমার গায়ে শ্রমজীবির পোষাক ছিল। কখন না-জানি তুমি এই রকম ছদ্মবেশ করলে? যদিও বহির্জগতের সঙ্গে আমার বেশী পরিচয় নেই, তবু আমার বিশ্বাস, তোমাকে যে পোষাকে প্রথমে দেখেছিলাম, সেই পোষাকটাই তোমার আসল পোষাক। তোমার হাতদুটি ছোট ছোট ও সাদা; এতেই প্রমাণ হচ্চে তোমায় কখনো খেটে খেতে হয় নি।

—মিলিতোনা, তুমি ঠিক বলেছ; তোমাকে আবার একবার আমি দেখ্‌ব,—আর তুমি কোন বিপদে না পড় এই মনে করেই পোষাক পরেছিলুম। আমি যে কাপড় সচরাচর পরি, সে কাপড় দেখলে শীঘ্রই এ অঞ্চলের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই এই কাপড় পরে আমি জনতার মধ্যে ছায়ার মত মিশে গিয়াছিলাম। ঈর্ষার দৃষ্টিতে না দেখ্‌লে আমাকে কেহই চিন্‌তে পারত না।

লজ্জায় মিলিতোনার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—মিলিতোনা আবার বলিল :—

—ঈর্ষার দৃষ্টি শুধু নয়, প্রেমের দৃষ্টিও বটে। তোমার ছদ্মবেশ আমাকে এক মিনিটের জন্যও ঠকাতে পারেনি। আমি মনে করেছিলাম, তোমাকে যে আমি সার্কাসে আমার সঙ্গে কথা কইতে বারণ করেছিলাম, তাতেই তুমি একেবারে থেমে যাবে। তখন আমি তাই চেয়েছিলাম বটে, কেননা যা পরে ঘটবে তা আগে থাক্‌তেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। কিন্তু তবু তুমি যে অতটা আমার কথার বাধ্য হবে সে জন্যও আমি দুঃখিত হয়েছিলাম।

—সেই ভয়ঙ্কর জুয়াঙ্কো সম্বন্ধে আমি যদি তোমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহলে বল্‌বে কি ?

মিলিতোনার নেত্র অবোধ সরলতার আলোকে আলোকিত—তাহার ললাট আন্তরিকতার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল—মিলিতোনা আন্দ্রের দিকে ফিরিয়া উত্তর করিল :—

—উঁচানো ছোরার মুখে, আমি কি তোমাকে বলিনি,—আমি তোমাকে ভাল বাসি ? ও-সবের উত্তর আমি কি তোমাকে আগেই দিইনি ?

জুয়াঙ্কোর সহিত মিলিতোনার গুপ্ত-প্রণয় সম্বন্ধে আন্দ্রের যাহা-কিছু সন্দেহ ছিল, সমস্তই বাষ্পের মত উবিয়া গেল।

—তাছাড়া, যদি তোমার শুন্‌তে ভাল লাগে, তাহা হলে দুই-চার কথায় আমার ও জুয়াঙ্কোর ইতিহাস তোমাকে আমি বল্‌ব। প্রথমে আমার নিজের কথা থেকে আরম্ভ করা যাক্। আমার পিতা, সামান্য একজন সৈনিক, ঘরোয়া-যুদ্ধের সময়, এক দলের পক্ষ নিয়ে, যুদ্ধে বীরের মতো নিহত হন। কোনও সঙ্কীর্ণ গিরি-কণ্ঠে এই যুদ্ধ না হয়ে, যদি একটা প্রসিদ্ধ বড় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধটা হত, তাহলে কবিরা নিশ্চয়ই তাঁর বীরত্ব কীর্ত্তন করত। আমার মা আমার পিতার বিয়োগে আর অধিক দিন বাঁচলেন না। ১৩ বৎসর বয়সে আমি অনাথা হলেম। তখন থেকে আল্‌দঞ্জা ছাড়া আমার আর কোন আত্মীয়া রইল না। তবে, আমার অভাব খুব কমই ছিল ;—জননী জন্মভূমি স্পেন যিনি সূর্য্য দিয়ে, আলো দিয়ে তাঁর সন্তানদের পোষণ করেন, তাঁর স্নেহপূর্ণ আকাশের তলে, আমি হাতের কাজ করে জীবিকানির্ব্বাহ করতে লাগলেম। আমার সব-চেয়ে বেশী অর্থব্যয় হত, প্রতি সোমবারে ষাঁড়ের লড়াই দেখ্‌তে যাওয়ার দরুণ ; আর, সচরাচর ভদ্র মহিলাদের মতো আমাদের ত আর পাঠাগার নেই, পিয়ানো নেই, থিয়েটার নেই, সন্ধ্যা-সম্মিলনী নেই ; আমাদের ভাল লাগে শুধু সাদাসিদা ধরণের তামাসা, জমকালো ধরণের তামাসা,—যেখানে মানুষের সাহস, প্রচণ্ড পাশব হিংস্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই তামাসার জায়গায়, জুয়াঙ্কো আমাকে দেখেছিল ; আর আমাকে দেখে, আমার উপর তার প্রচণ্ড-উগ্র, অন্ধকারময় একটা ভালবাসা পড়েছিল। তার পুরুষজনোচিত রূপলাবণ্য সত্ত্বেও, তার জাঁকালো ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ সত্ত্বেও, তার অতিমানবিক কীর্ত্তিকলাপ সত্ত্বেও, আমার মনে সে কখন কোন-কিছুর উদ্রেক করতে পারে নি···যা কিছু সে করত, তাতে আমার মর্ম্মস্পর্শ করা দূরে থাক্, তার উপর আমার বিরাগ আরও যেন বেড়ে যেত।

"তবু, সে আমাকে এতটা ভাল বাস্‌ত,—দেবতার মত পূজো করত যে, অনেক সময়, আমার মনে হ'ত, তার ভালবাসায় একটু সায় না দিলে, আমার অকৃতজ্ঞতা হবে। কিন্তু ভালবাসা ত আমাদের ইচ্ছা-ধীন নয় ! ভগবানের যখন মর্জ্জি হয় তখনই তিনি আমাদের কাছে ভালবাসা পাঠিয়ে দেন। জুয়াঙ্কো যখন দেখ্‌লে আমি তাকে ভাল বাসিনে, তখন তার মনে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঈর্ষার ভাব এসে পড়ল। সে

সর্ব্বদা আমাকে ঘিরে থাক্‌ত, আমার উপর সর্ব্বদা নজর রাখত, আমার উপর গোয়েন্দা-গিরি করত, এবং সর্ব্বত্র নিজের মন-গড়া প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বেড়াত। আমার চোখের উপর, আমার ঠোঁটের উপর, নিয়ত তার দৃষ্টি থাক্‌ত।

আমার একটা দৃষ্টিতে, একটা কথায়, সে ঝগড়া করবার একটা ওজর খুঁজে পেত। সে আমার চারিদিকে একটা বিজনতা গড়ে তুলেছিল এবং এমন একটা বিভীষিকার গণ্ডির মধ্যে আমাকে বন্ধ করে রেখেছিল, যে কেহ তা লঙ্ঘন করতে সাহস করত না।”

—আশা করি, ঐ গণ্ডিটা আমি চিরকালের মত ভেঙে দিয়েছি। কেননা, আমার মনে হয়, জুয়াঙ্কো এখন আর আস্‌বে না।

—অন্তত শীঘ্র আসবে না বটে; কারণ, যতদিন না তুমি সেরে ওঠো, সে পুলিসের হাত থেকে এড়াবার জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু সে যা হোক্‌ এখন বল দিকি তুমি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় সময় হয়েছে—হয় নি কি?

—আমার নাম হচ্চে, সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে। আমার এতটা ধন-ঐশ্বর্য্য আছে যে, জীবিকার জন্য আমার কোন কাজ করা আবশ্যক হয় না, কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।

মিলিতোনা একটু উদ্বেগ ও কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল :—

—“বেশ রূপবতী, বেশ বেশ-ভূষায় ভূষিতা, বেশ ধনশালিনী তোমার কি কোন ‘নব্যা’ নাই?”

মিথ্যা কথা বলিতে আন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাও শক্ত; তাই আন্দ্রে অস্পষ্টভাবে একটা উত্তর দিল।

মিলিতোনা আর কিছু বেশী জেদ করিল না। কিন্তু তার মুখ একটু বিবর্ণ হইল, একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল।

“আমাকে একটা কলম আর একতক্তা কাগজ আনিয়ে দিতে পার কি? আমার কতকগুলি বন্ধুকে আমি লিখ্‌তে চাই। আমি হঠাৎ অন্তর্ধান করায় তাঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলে’ আমি তাঁদের আশ্বস্ত করতে চাই।”

তরুণী খোঁজ করিয়া কিয়ৎকাল পরে তার ডেক্‌সের দেরাজ হইতে, এক তক্তা পুরাণো চিঠির কাগজ, একটা ট্যারা-বাঁক কলম, একটা দোয়াত—যাহাতে কালি শুকাইয়া একেবারে কাঁই হইয়া গিয়াছে—আনিয়া দিল।

কাদার মত কালিতে দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া একটু তরল করিয়া লইয়া, কাগজখানা কোলের উপর রাখিয়া ডন্‌-জেরোনিমোর নামে এই পত্রখানি লিখিল :—

“আমার অন্তর্ধানে উদ্বিগ্ন হবেন না; একটা দৈব দুর্ঘটনা—যার পরিণাম গুরুতর নহে—কিছুকালের জন্য আমাকে এই গৃহে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। ঐ দুর্ঘটনার পর আমাকে এই গৃহে উঠাইয়া আনা হয়। আশা করি, আর কিছু দিনের মধ্যেই, ফেলিসিয়ানার চরণ-তলে আমার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য যাইতে পারিব। ইতি

“সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে”

একটু চাণক্যনীতি-দুষ্ট এই চিঠিখানায় বাড়ীর কোন ঠিকানা ছিল না, ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া কোন কথাই বলা হয় নাই, ঘটনাদির উপর পরে আবশ্যকমত একটু রং-চং ফলাইবার অবকাশও রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আন্দ্রে মনে করিল, ইহাতে একটু সময়ও পাওয়া যাইবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর্গমন্থলা ও কোভাচুল্লার কৃপায় ডন্‌-জেরোনিমো আন্দ্রের সম্বন্ধে সমস্ত খবর যে পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, এ-কথা আন্দ্রে অবগত ছিল না।

আল্‌দঞ্জা মাসী চিঠিখানা লইয়া ডাকে দিতে গেল। আন্দ্রে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, মধুর কবিত্বের উচ্ছ্বাসের প্রবাহে আপনাকে অবাধে ভাসাইয়া দিল। মিলিতোনার অধিষ্ঠানে এই দরিদ্র কক্ষটি আন্দ্রের চক্ষে, অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

আন্দ্রে প্রকৃত প্রেমের সেই অপরিসীম আনন্দ, বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিতে লাগিল—যাহা কোন প্রথাবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না—যাহার ভিতর আত্মাভিমানের প্ররোচনা প্রবঞ্চনা, পরচিত্ত-বিজয়ের গর্ব্ব, কল্পনার অলীক জল্পনা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; সেই প্রেম যাহা যৌবন, সৌন্দর্য্য, ও নির্দ্দোষ সরল হৃদয় এই স্বর্গীয় ত্রয়ীর যথাযোগ্য সামঞ্জস্য হইতে জন্মলাভ করে।

মিলিতোনা আন্দ্রের প্রতি স্বীয় ভালবাসা আন্দ্রের নিকট একেবারেই খপ্ করিয়া প্রকাশ করায়, দুনিয়ার রমণীরা যেরূপ বিনাইয়া-বিনাইয়া মধুর কথায় ছয় মাস ধরিয়া স্বীয় প্রেম প্রণয়ীর নিকট ক্রমশঃ ব্যক্ত করে, এবং তজ্জনিত প্রেমের মধুর রস অল্পে অল্পে প্রণয়ী চাখিয়া চাখিয়া আস্বাদ করিতে পায়, এক্ষেত্রে আন্দ্রে সেই মধুর রসপানে বঞ্চিত হইল! কিন্তু মিলিতোনা যে দুনিয়ার রমণী নহে। সে তাহার হৃদয়ের ভাব একেবারেই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

ডন্‌-জেরোনিমো আন্দ্রের পত্র পাইয়া, ঐ পত্রখানা তাঁহার দুহিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং মহা উৎফুল্ল ভাবে বলিলেন :—

"এই লও ফেলিসিয়ানা, তোমার ভাবপতির কাছ থেকে পত্র এসেছে—"

৯

ফেলিসিয়ানার পিতা ফেলিসিয়ানার হাতে যে পত্রখানি দিলেন, ফেলিসিয়ানা তাহা নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিল। কাগজের কোথাও একটু চেক্‌নাই দেখিতে না পাইয়া বলিল :—

"চিঠিতে লেফাফা নাই, শুধু একটা গালার টিপ্ দিয়া বন্ধ করা! ভদ্র আচরণের খুবই বিরুদ্ধ! কিন্তু যেরূপ অবস্থায় পড়েছে তাতে একটু-আধটু ক্ষমা করা উচিত। বেচারা আন্দ্রে! কি? একটা ভালো গালার কাঠিও নেই? বড়ই দুর্ভাগ্য বল্‌তে হবে।" চিঠিটা পড়া হইয়া গেলে প্রাভোর একটি সম্ভ্রান্ত যুবককে কথায়-কথায় বলিলেন, "এ-রকম বিশ্রী কাগজ কেহ কখন মনে ধারণা করতেও পারে কি, Sir Edwards?"

আন্দ্রের অনুপস্থিতি-কালে এই ভদ্র যুবকটি ফেলিসিয়ানার গৃহে বেশ-একটু পশার জমাইয়া লইয়াছিল। দ্বীপ-গণ্ডী-বদ্ধ ইংরাজটি অবজ্ঞা-

সূচক চাপা হাসি হাসিয়া অতি কষ্টে স্পেনীয় ভাষায় বলিল :—

"অষ্ট্রেলিয়ার বুনো-লোকেরাও ওর চেয়ে ভাল কাগজ তৈরী করতে পারে! এটা শিল্পের নিতান্ত শৈশবাবস্থার নমুনা। লণ্ডনে এই কাগজে চর্ব্বির বাতিও কেউ মুড়বে না।"

ফেলিসিয়ানা বলিল : —

"Sir Edwards, আপনি ইংরেজী বলুন, আপনি ত জানেন, আমি ইংরেজী বুঝতে পারি।"

—"না, আপনার যে ভাষা সেই স্পেনীয় ভাষাটাই আমি ভাল করে শিখতে চাই।"

এই রসিকজন-সুলভ চাটুবচনে ফেলিসিয়ানার ঠোঁটে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। বস্তুত এই ইংরাজ যুবকের কথাবার্ত্তা ফেলিসিয়ানার বড় ভাল লাগে। বেশপারিপাট্য ও সুখসুবিধা সম্বন্ধে মিলিতোনার মনে যে-একটা উচ্চ-আদর্শ ছিল, আন্দ্রে অপেক্ষা ইংরাজ যুবকটি তাহা বেশী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। যুবকটি খুব শিষ্ট না হইলেও খুব সভ্যভব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কিছু ইনি পরিধান করিতেন তাহা খুব হাল-ফ্যাসানের ও খুব উৎকৃষ্ট। তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছদ উদ্ভাবকের নূতন উদ্ভাবনা অনুসারে প্রস্তুত করা এবং ঐ পরিচ্ছদের পেটেণ্ট করা কাপড়—জল ও আগুনের দুষ্প্রবেশ্য। তাঁহার কলম-কাটা ছুরি—একাধারে খুর, কাক্-ইস্ক্রু, চামচে, কাঁটা ও জলপানের গেলাস। তাঁহার টেবিল সাজাবার টুকি-টাকি জিনিষ — মোমবাতি, দোয়াৎ সিলমোহর, ও গালার বাটি প্রভৃতিতে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ছড়িকে চৌকি করা যায়, ছাতা করা যায়, তাঁবুর খোঁটা করা যায়, এবং আবশ্যক হইলে ডোঙাও করা যায়। শ্বেতদ্বীপের বিশ্বাস-ঘাতক সন্তানেরা, খোপ্-খোপ্-করা অসংখ্য বাক্সের মধ্যে পুরিয়া এইরূপ আরও অনেক নবোদ্‌ভাবিত জিনিস সুমেরু হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত বহন করে।

উহারা ঘোর সংসারী লোক; জীবন ধারণের জন্য উহাদের বিস্তর সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি দরকার হয়।

যদি ফেলিসিয়ানা লর্ড-যুবকটির প্রসাধনের টেবিলটা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে একেবারেই বশীভূত হইয়া পড়িত। তাহার যে-সব ভীতিজনক অদ্ভুত আকারের বাক্স ছিল, সেরূপ আকরের বাক্স, অস্ত্রচিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, পায়ের কড়া-ছেদক চিকিৎসকদের বাক্স সমস্ত একত্র করিলেও মেলেনা। আন্দ্রে বড়লোকের মত জীবন যাপনের বহুচেষ্টা সত্ত্বেও সেই উচ্চ আদর্শের কাছ দিয়াও যাইতে পারে নাই।

"বাবা, যদি আমরা আন্দ্রেকে দেখতে যাই তাহলে Sir Edwards আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন। তাহলে আমাদের দেখা করাটা ততটা সামাজিক বলে' মনে হবে না। কারণ, আমি তার বাগদত্তা হলেও একজন যুবা পুরুষকে দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ।"

কন্যার এই কথায় সামাজিক আব্রুরক্ষার একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়া, জেরোনিমো উত্তর করিলেন :—"তোর যদি মনে হয়, আন্দ্রেকে দেখতে যাওয়া তোর পক্ষে দস্তুরমত কাজ হবে না, তাহলে আমি বরং একলাই যাব, আর আন্দ্রের ঠিক্ খবরাখবর সমস্তই তোকে এসে বল্‌ব।"

ফেলিসিয়ানা আবার বলিল; "যাকে ভালবাসা যায় তার জন্য কিছু আত্মত্যাগ করা আবশ্যক।"

ফেলিসিয়ানা যতই সুশিক্ষিতা হোক না কেন, তবু ত সে নারী। আন্দ্রের উপর তেমন কিছু ভালবাসা না থাকিলেও, একজন শিল্পকারী রমণী যাকে সবাই সুন্দরী বলে—সেই রমণীর গৃহে আন্দ্রেকে দেখিতে যাইবে মনে করিয়া, তাহার চিত্ত খুবই বিচলিত হইয়াছিল। তাই সে আন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি তুলিল না। কোন নারীর হৃদয় যতই শুষ্ক হোক্ না, তাহার ভিতর এমন একটা তন্তু থাকে যাহা আত্মাভিমান ও ঈর্ষার স্পর্শে আবার স্পন্দিত হইয়া উঠে।

ফেলিসিয়ানা, কে জানে কেন খুব আড়ম্বরের সহিত জাঁকালো রকমের সাজগোজ করিল। এই সব সাজ-সজ্জার উদ্যোগ উদ্যম নিতান্ত অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অতটা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটা যুঝাযুঝি হইবে অনুমান করিয়া ফেলিসিয়ানা তাহার কাপড়ের আলমারা হইতে সেরা-সেরা কাপড় বাহির করিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আপনাকে বর্ম্মাবৃত ও সুসজ্জিত করিল। একজন সামান্য শিল্পজীবী রমণীর দ্বারা সে পরাভূত হইবে, একথা তাহার মনে হয় নাই—ফেলিসিয়ানা মনে করিয়াছিলেন, এইরূপ জাঁকালো সাজ-সজ্জা দেখিয়া আন্দ্রে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে। আন্দ্রের হৃদয়ও তাহার প্রতি আরও সহজেই আকৃষ্ট হইবে।

ফেলিসিয়ানার সাজ-সজ্জা দেখিলে দুনিয়ার দর্জ্জিনী ও পরিচারিকারা নিশ্চই বলিয়া উঠিত :—"আহা! আহা! ঠাকরুণ, আপনাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে।"

ফেলিসিয়ানা তাহার বড় আয়নায় একবার শেষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল এবং সন্তোষসূচক মৃদু মধুর হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল। পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রাদিতে পরিচ্ছদের যে হাল-ফেসিয়ানের ছবি থাকে, ফেলিসিয়ানার পরিচ্ছদ হুবহু তাহার অনুরূপ হইয়াছিল, তাহা হইতে একটুও তফাৎ হয় নাই।

Sir Edwardsও হাল-ফ্যাসানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ফেলিসিয়ানাকে স্বকীয় বাহু-অবলম্বন দিলেন।

এরূপ মানানসই যুগলকে রাস্তা দিয়া পাশাপাশি চলিতে কেহ কখন দেখে নাই। উভয়েই যেন উভয়ের জন্য গঠিত; উভয়ের সাজ-সজ্জায় উভয়েই বিস্ময়মুগ্ধ।

অবশেষে উহারা 'পোভায়ের' রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। যাইতে যাইতে ফেলিসিয়ানা, বাঁধানো পদ-পথের জঘন্য অবস্থা, রাস্তাদির সংকীর্ণতা, কোঠা-বাড়ীগুলার মুখ-গোম্‌সা ভাব, এই-সব বিষয় সম্বন্ধে অনুযোগ অভিযোগও না করিয়াছিল এরূপ নহে। ইংরেজ যুবকও এই সকল অনুযোগের ধুয়া গাহিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তাহার জন্মভূমির সান-দিয়া-বাঁধানো অথবা আলকাত্‌রা গঠিত প্রশস্ত পদ-পথের বড়াই করিতে ক্ষান্ত হইল না।

ফেলিসিয়ানা ঘৃণার ভাবে বলিল :—"কি! ছদ্মবেশী আহত আন্দ্রেকে এই বিশ্রী ভাঙাচোরা বাড়ীর সম্মুখে পাওয়া গিয়েছিল?

এই জঘন্য অঞ্চলে না জানি সে কি রকমে এসেছিল।"

লর্ড যুবকটি স্পেনীয়-ইংরেজী খিচুড়ী ভাষায় উত্তর করিলেন :—

"লোকের আচার-ব্যবহার তাত্ত্বিক ভাবে আলোচনা করবার জন্য, অথবা আমি যেমন লণ্ডনে করি,—ছোরা আঘাতের জোর পরীক্ষা করবার জন্য হয়ত এখানে এসে থাক্‌বেন।"

জেরোনিমো বলিলেন :—

"ব্যাপারটা কি, এখনি জান্‌তে পারা যাবে।"

কুলমান-গর্ব্বিতা ফেলিসিয়ানা যে বাড়িটাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং যাহার ভিতর এমন একটি নারী-রত্ন ছিল যাহা বড় বড় হোটেল খুঁজিলেও পাওয়া যায় না—সেই বাড়ীর গলি-পথের মধ্যে উহারা তিন জন ঢুকিয়া পড়িল।

এই গলি-পথ পার হইবার সময় ফেলিসিয়ানা অতি-সাবধানে নিজ কাপড়ের খুঁট হাতে করিয়া চলিয়াছিল।

সিঁড়ির কাছে আসিয়া ফেলিসিয়ানা ভয়ে শিউরিয়া উঠিল, কি করিয়া এই তৈল-সিক্ত রজ্জুর উপর তাহার হাতের অমল-ধবল নূতন দস্তানা স্থাপন করিবে! তাই সে আবার Sir Edwardsএর বাহু-অবলম্বন প্রার্থনা করিল।

একজন নিকট-বাসী অনাহূত কার্য্যোৎসাহী লোক আসিয়া রজ্জুটা তুলিয়া সিঁড়ির মুখ খুলিয়া দিল। এইবার বিপদ-সঙ্কুল আরোহণ সুরু হইল। "তোমরা কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে ডন-জেরোনিমো যখন বলিলেন—"আমরা শান্ত-শিষ্ট লোক" তখন দরজা খুলিয়া গেল। জুয়াঙ্কোর আক্রমণের পর হইতে বৃদ্ধা আলদঞ্জা সর্ব্বদাই সতর্কভাবে কাণ খাড়া করিয়া থাকিত। বৃদ্ধাই আগন্তুকদিগকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল,—ঐ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আন্দ্রেও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, আন্দ্রে প্রথমে Sir Edwardsকে দেখিতে পাইল—তিনিই অগ্ররক্ষী হইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর প্রবেশ করিলেন ডন-জেরোনিমো;—সর্ব্বশেষে সাজসজ্জায় অতিসজ্জিতা ফেলিসিয়ানা।

সব চেয়ে সেরা আতস্‌-বাজির মত জ্বলিয়া উঠিয়া চোখ ঝল্‌সাইয়া দিবেন মনে করিয়া ফেলিসিয়ানা সকলের শেষে দেখা দিলেন। তিনজন ক্রমে ক্রমে আসিলেন—হয়ত এই মনে করিয়া—পাছে ফেলিসিয়ানাকে হঠাৎ দেখিলে আন্দ্রের সুখের মাত্রা ছাপাইয়া ওঠে এবং দুর্ব্বল আন্দ্রে তাহা বরদাস্ত করিতে না পারে। ফেলিসিয়ানা প্রথমে প্রবেশ করিয়া যদি দেখিত, একজন যুবা পুরুষ ঘরে শুইয়া আছে, তাহা হইলে সেটা নিজ আব্রু-রক্ষার হিসাবে ঠিক্ হইত না।

ফেলিসিয়ানা যেরূপ মনে করিয়াছিল, সেরূপ নাটকীয় ধরণে খুব একটা চমক্ লাগাইতে পারিল না।

আন্দ্রের চোখ্ ঝল্‌সিয়া যায় নাই শুধু নহে, তাহার হৃদয় একটা বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। একজন সুসজ্জিতা তরুণী প্রাণান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তিন তলায় উঠিয়াছে, ইহা মনে করিয়াও আন্দ্রের নেত্র হইতে এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল না। বরং

তাহার মুখে একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল।

ধনুকের তীর ধনু হইতে ছুটিয়া তাক্-মাফিক লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে পারিল না,—একেবারেই ফস্‌কাইয়া গেল।

এই তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া মিলিতোনা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বৃদ্ধকে তরুণীরা যেরূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে সেই রূপ সমাদর করিয়া জেরোনিমোকে একটা চৌকিতে বসিতে বলিল এবং আর একটা চৌকি ফেলিসিয়ানাকে এগাইয়া দিবার জন্য আল্‌দঞ্জাকে ইসারা করিল।

পাছে ময়লা হয় যেন এই ভয়ে ফেলিসিয়ানা স্বীয় পরিচ্ছদের প্রান্তভাগটা একটু গুটাইয়া লইয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া একটা বেতের চৌকিতে বসিয়া পড়িল এবং রুমাল দিয়া আপনাকে বাতাস করিতে লাগিল।

"ওঃ! কি উঁচু! এখানে আস্‌তে আমার দম বেরিয়ে গিয়েছিল!"

—"ঠাকুরাণীর জামাটা বোধ হয় একটু আঁট্ হয়েছে—তাই।" নিতান্ত সরলভাবে মিলিতোনা এই কথা বলিল।

ফেলিসিয়ানা শীর্ণকায় হইলেও জামায় খুব আঁটসাট্ করিয়া ফিতা বাঁধিত। এইরূপ স্থলে রমণীরা বেশ জানে, কিরূপ গলার স্বরে উত্তর দিলে ঠিক্ হয়। তাই একটু মিঠে-কড়া স্বরে ফেলিসিয়ানা উত্তর করিল :—

"আমি কখনই আঁট্ করে জামা পরিনে।" নিশ্চয়ই—ব্যাপারটা একটু খারাপ দিকে গড়াইল।

ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিতা তরুণী, তুলনায় যেন একটু হীন হইয়া পড়িল, একটু খাটো হইয়া পড়িল।

মিলিতোনা একটা কালো স্পেনীয় ঢং-এর রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল; তাহার সুন্দর বাহুদ্বয় অনাবৃত ছিল। ইহার পাশাপাশি ফেলিসিয়ানার আড়ম্বরময় সাজসজ্জায় কুরুচি আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ফেলিসিয়ানাকে দেখিলে মনে হয়, রবিবারের বেশভূষায় সজ্জিতা যেন একজন সামান্য ইংরেজ-পরিচারিকা; আর মিলিতোনা যেন একজন ছদ্মবেশী রাজকন্যা।

ফেলিসিয়ানা মিলিতোনার নিকট হইতে অনিচ্ছাকৃত যে মুখ-থাব্‌ড়া পাইয়াছিল তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জেরোনিমো-দুহিতা, শ্রমজীবী ললনাকে আকুল করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে তাহার মুখের পানে খুব একটা অবজ্ঞা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু শ্রমজীবী কন্যার অনাকুল স্থির ও সলজ্জ দৃষ্টির সম্মুখে ফেলিসিয়ানারই নেত্রদ্বয় আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল।

মিলিতোনা মনে মনে ভাবিল, এই রমণীটি নাজানি কে! ইনি কি আন্দ্রের ভগিনী? না, তাহলে এঁর মুখে এইরকম উদ্ধতভাব থাকৃত না।

জেরোনিমো পালঙ্কের কাছে গিয়া একটু স্নেহের স্বরে বলিলেন :—

"ভাল, আন্দ্রে! তুমি ত বেশ বেমালুম পালিয়েছিলে, এখন আছ কেমন বল দিকি?"

আন্দ্রে উত্তর করিল, "শ্রীমতীর সেবাযত্নে একরকম ভালই আছি।"

ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের কথায় বাধা না দিয়া বলিল।

"উনি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার পুরস্কার স্বরূপ একটা কিছু জিনিস এঁকে

উপহার দেওয়া যাক্—একটা সোনার ঘড়ি, একটা আংটি কিংবা ওঁর পছন্দমত আর কোন অলঙ্কার।"

অতুল রূপলাবণ্য, ঐ রূপসী ললনাকে যে উচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা হইতে নামাইয়া আনাই উপরি-উক্ত বাক্যের গূঢ় উদ্দেশ্য।

মিলিতোনা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, এখন সহজ স্বাভাবিকভাবে একটা রাজকীয় গাম্ভীর্য্য ধারণ করিল, তাহার নেত্র হইতে রাজমহিমা-ব্যঞ্জক এমন একটা তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল যে, ফেলিসিয়ানা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

ফেলিসিয়ানা যে ইংরাজি জানিত তাহা ভুলিয়া গিয়া, Sir Edwards অর্দ্ধস্ফুটস্বরে এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না—"She is a very pretty girl" অর্থাৎ তরুণীটি বড়ই সুশ্রী।

শুষ্ক কণ্ঠে আন্দ্রে উত্তর করিল :—

"এরূপ সেবা-যত্ন মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না।"

জেরোনিমো আবার বলিলেন :—

—"তা নিশ্চয়। মূল্য দেবার কথা কে বল্‌ছে? এ শুধু একটা কৃতজ্ঞতার স্মৃতি। এই মাত্র।"

এই দরিদ্র গৃহের যে সব অভাব-ত্রুটি ছিল, তাহা এক নজরে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ফেলিসিয়ানা আবার বলিল :—

"আন্দ্রে, এখানে তোমায় থাক্‌তে কখনই ভাল লাগ্‌বে না।"

—"এখানে ওঁর খুবই অনুগ্রহ। কষ্ট হচ্চে বলে উনি কখনই আক্ষেপ প্রকাশ করেন নি।" এই কথা বলিয়া মিলিতোনা জান্‌লার ধারে প্রস্থান করিল। ফেলিসিয়ানাকে দুর্ব্বিনীত বাক্য প্রয়োগের পূর্ণ অবসর দিবার জন্যই মিলিতোনা তাহাকে মৌনভাবে যেন এই কথাগুলি বলিল :—

"তুমি আমার বাড়ীতে আছ, আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব না—তাড়িয়ে দিতে পারিও না। কিন্তু তোমার অপমান-সূচক বাক্যগুলা আর গৃহকর্ত্রীর ধৈর্য্য—এই দুয়ের মধ্যে ত একটা সীমা-রেখা আছে!"

মিলিতোনার সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া, ফেলিসিয়ানা একটু থতমত খাইয়া গেল। সে তাহার ছাতার হস্তিদন্তের প্রান্তভাগ দিয়া, স্বকীয় বুট্-জুতার অগ্রভাগের উপর পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিল।

তাহার পর একটা নিস্তব্ধতা আসিল।

ডন্-জেরোনিমো তাঁহার নস্যদানীর কোণ হইতে এক টিপ পীত নস্য উঠাইয়া লইয়া, সন্তোষের ভঙ্গীসহকারে স্বকীয় বয়স সমুচিত স্বকীয় নমস্য নাসিকায় সযত্নে গুঁজিয়া দিয়া সুখের সেকালের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

Sir Edwards কোনরূপ "ধরা-ছোঁয়া" না দিবার অভিপ্রায়ে, ফেলিসিয়ানার হতবুদ্ধি হইবার ভাবটা এমন হুবহু নকল করিয়াছিল, যেন এ ভাবটা তাহার বাস্তবিকই নিজের। আল্‌দঙ্গা মাসীর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে। ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে; ফেলিসিয়ানার জম্‌কালো সাজসজ্জা সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে। আসমানি নীল, পীত, গোলাপী, সবুজ এই সব মিশ্র রংএর ঘটা দেখিয়া বৃদ্ধার

তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। সে হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছে। এরূপ জমকালো পরিচ্ছদ সে ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখে নাই।

আর আন্দ্রের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আশ্রয়দানের জন্য যেন সে সদা-প্রস্তুত—তাহার সুদীর্ঘ প্রেমের দৃষ্টি মিলিতোনাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। মিলিতোনা তখন কক্ষের অপর প্রান্তে থাকিয়া সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল। আন্দ্রে ভাবিতেছিল, ফেলিসিয়ানা আসলে যে-রকম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ফেলিসিয়ানাকে বিবাহ করিবার কথা তাহার মাথায় কেন যে আসিয়াছিল—ইহাই আশ্চর্য্য। এই নারী-রত্ন বোর্ডিংইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও কাপড়ের দোকানদার—এই উভয়ের হাতে-গড়া জিনিস বই আর কিছুই নহে।

এদিকে মিলিতোনা মনে মনে ভাবিতেছিল :—

"এ ভারি অদ্ভুত! আমি যে কাউকেই কখনো বিষ-দৃষ্টিতে দেখিনি, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি আমার ঘরে যখনই প্রথম পদক্ষেপ করেছে তখন থেকেই—একজন অজ্ঞাত শত্রু কাছে এলে যে-রকম হয়—আমার বুকে সেই রকম একটা কাঁপুনি উপস্থিত হয়েছে। আমার কিসের ভয়? আমি বেশ জানি, আন্দ্রে একে ভালবাসে না। আন্দ্রের চোখ দেখেই আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি। স্ত্রীলোকটা দেখ্‌তে সুশ্রী নয়,—আর অতি নির্ব্বোধ। তা নৈলে কি, একজন গরিবের বাড়ীতে, একজন রোগীকে দেখ্‌তে এরকম সাজসজ্জা করে আসে? আস্‌মানী নীল রঙের গাউন, তার উপর সবুজ রঙের খাটো বহির্ব্বাস—রুচিবোধের কতটা অভাব! এইরকম ঢ্যাঙ্গা মেয়েমানুষকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনে··· এখানে কি করতে এসেছে? ওর নব্যকে (ভাবীপতি) ধর্‌তে এসেছে? এ নিশ্চয়ই কোন একজন বাগদত্তা রমণী। আন্দ্রে ত আমাকে একথা পূর্ব্বে বলেনি···যদি আন্দ্রে একে বিয়ে করে, তাহলে আমার বড় কষ্ট হবে! কিন্তু আন্দ্রে একে বিয়ে করবে না—তা অসম্ভব। এর চুল বিশ্রী কটা; ওর গালে এক-একটা লাল রঙের পোঁচ। আন্দ্রে আমাকে বলেছে, সে কালো চুল ছাড়া আর কোনো চুল ভাল বাসে না—আর সে গালের সমান রকম রং ভাল বাসে।"

পক্ষান্তরে, ফেলিসিয়ানা আবার এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছিল। কোন একটা খুঁৎ বাহির করিবার জন্য ফেলিসিয়ানা, মিলিতোনার রূপ-লাবণ্যের বিশ্লেষণ করিতেছিল। কোন খুঁৎ পাইল না বলিয়া তাহার বড় আপশোষ হইল। কবিদের ন্যায় রমণীরাও তাদের আসল মূল্য,- তাদের প্রকৃত শক্তি বেশ জানে, কিন্তু কখনো তাহা স্বীকার করেনা। মিলিতোনার বদ্ মেজাজটা আরও বৃদ্ধি পাইল, এবং বেশ-একটু কর্কশস্বরে বেচারা আন্দ্রেকে এই কথাগুলা বলিল :—

"যদি তোমায় ডাক্তার কথা কইতে বারণ করে' থাকে তা'হলে তোমার দুর্ঘটনা সমস্ত বিবরণ আমাদের কাছে খুলে বল; কারণ আমরা যা জানতে পেরেছি, তা একটু ঘোলাটে রকমের, তেমন স্পষ্ট নয়।"

ইংরেজ বলিল :—

—"হাঁ হাঁ—তোমার ঔপন্যাসিক ঘটনার বিবরণটা বল্‌তে চেষ্টা কর।"

জেরোনিমো পিতৃবৎ বাৎসল্যসহকারে, এই কথায় বাধা দিয়া বলিলেন :—

—"তোমরা ওকে কথা কওয়াতে চাচ্ছ, কিন্তু দেখ্ছনা এখনো কতটা দুর্ব্বল!"

—"ওতে উনি বেশি কিছু শ্রান্ত হবেন না, আর আবশ্যক হলে শ্রীমতী ওঁকে সাহায্য করবেন। শ্রীমতী ত সমস্ত ঘটনাই জানেন।"

এই-সব কথার পর, মিলিতোনা উহাদের নিকটে আসিল।

আন্দ্রে বলিল :—

"আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপ্লো যে, আমি শিল্পজীবীর ছদ্মবেশে, সহরের পুরাতন অঞ্চলটা একবার ঘুরে আসি, আর ইতর-সাধারণের শুঁড়িখানা ও নাট্য-শালায় সজীব ভাব খানা একটু উপভোগ করে আসি। কারণ, ফেলিসিয়ানা, তুমি ত জানোই, সভ্যতার উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাক্‌লেও আমি পুরানো স্পেনীয় আচার ব্যবহার ভালবাসি। তারপর এই রাস্তা দিয়ে যখন আস্‌ছিলেম, একজন গোম্‌শামুখো সেরিনেড-গায়কের সঙ্গে দেখা হল। সে একটা ছুতো করে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে; তার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল, সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ন্যায়-নিয়মানুসারে, আমাকে ছোরার আঘাতে সে আহত করলে। আমি সেই আঘাতে ধরাশায়ী হলেম। শ্রীমতী তাঁর বাড়ীর দরজার সাম্‌নে অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন।"

—"কিন্তু তুমি এ বেশ জেনো আন্দ্রে, এই ঘটনাটা খুব ঔপন্যাসিক ধরণের, এবং ওতে একটু কবিত্বের রং চড়ালে, দিব্যি একটা করুণরসাত্মক বিষয় হয়ে উঠ্‌বে। একজন সুন্দরীর গৃহ-গবাক্ষের নীচে দুই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘট্‌ল..." এই কথা বলিয়া, ফেলিসিয়ানা মিলিতোনার দিকে তাকাইয়া একটা দুষ্টামির কাষ্ঠ হাসি হাসিল..."ওরা পরস্পরের মাথায় "গিতার" ভাঙ্গে, তার পর মুখের উপর ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করে,—এই দৃশ্যটা যদি কাঠের উপর খুদে', উপন্যাসের গোড়ায় দেওয়া হয় তা হলে খুব চটক্‌দার হবে।"

মিলিতোনা গম্ভীরভাবে বলিল :—

—"দেখুন, আর দুই আঙুল নীচে হলেই, ছোরার ফলাটা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করত।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু যা চিরকাল হয়ে আস্‌ছে—এই সব ছোরা একটু পিছ্‌লে গিয়ে শুধু একটা সুন্দর আঁচড় কেটেই ক্ষান্ত হয়—"

তরুণী উত্তর করিল—"আর যাই হোক, আপনার দেখ্‌ছি এই আঘাত সম্বন্ধে বড় একটা দরদ নেই।"

—"আমার সম্মান রক্ষার জন্য ত এই আঘাতটা পাওয়া হয়নি; তাই তোমার এতে যতটা দরদ হবে আমার তা হবে না। তবু দেখ, আমি তোমার আহতকে দেখ্‌তে এসেছি। তুমি যদি ইচ্ছে কর, আমরা দুজনে পালা করে' আহতের শুশ্রূষা করব। সে বেশ হবে।"

মিলিতোনা উত্তর করিল—"এ পর্য্যন্ত আমি একলাই ওঁর শুশ্রূষা করেছি—এখনো করব।"

—"তোমার পাশে, আমাকে লোকে একটু উদাসীন বলে ঠাওরাতে পারে। কিন্তু একজন

পুরুষকে রাস্তার থেকে তুলে নিজের বাড়ীতে আনা—এমন কি, বুকে একটা সামান্য আঁচড় লাগার জন্যও আনা—আমার মতে শিষ্টাচার নয়।

—"লোকনিন্দার ভয়ে আপনি কি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ওঁকে রাস্তায় ফেলে আসতে পারতেন?

—"সবাই ত তোমার মত স্বাধীন নয়; তাদের ঘর-সংসার সাম্‌লাতে হয়; গেরস্তের মত থাক্‌তে হয়। যাদের একটু মানমর্য্যাদা আছে, তারা সহজে তা' হারাতে চায় না।"

মিলন-কামী জেরোনিমো বলিলেনঃ—

—"না না, ফেলিসিয়ানা, তুমি যে সব কথা বল্‌চ তাতে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখ্‌ছি; তুমি অনর্থক রাগ কর্‌চ। ও-সমস্তই আকস্মিক ঘটনা। এই দুর্ঘটনাটার পূর্ব্বে আন্দ্রে শ্রীমতীকে কখনো দেখেনি। মিছামিছি ওর উপর তুমি সন্দেহ করোনা।"

পিতার কথায় দৃকপাত না করিয়া ফেলিসিয়ানা গর্ব্বিতভাবে আবার বলিলঃ—

—"বাগ্‌দত্তা রমণী ত আর উপপত্নী নয়।"

এই শেষ অপমান-সূচক বাক্যে, মিলিতোনার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। একটা তরল জ্যোতিতে তার চোখ্‌ দুটি জ্বলিয়া উঠিল, বুক ফুলিয়া উঠিল; বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু মিলিতোনা সামলাইয়া লইল। সে কোন উত্তর করিল না, কেবল ফেলিসিয়ানার প্রতি একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

—"এসো বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। এস্থান আমাদের নয়। একজন পতিতার গৃহে আর আমি ক্ষণমাত্রও থাক্‌তে পারব না।"

আন্দ্রে মিলিতোনার হস্তধারণ করিয়া বলিলঃ—"ফেলিসিয়ানা, শুধু এই কারণেই যদি এখান থেকে তোমার চলে যেতে হয়—তাহলে একটু সবুর কর। ডনা ফেলিসিয়ানার নিকট আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী মিলিতোনার পরিচয় করে দিচ্চি। এখন বোধ হয় এখানে একটু বিলম্ব করলে কোন ক্ষতি হবে না। আমার দ্বারা তোমার কোন অসুবিধা হলে আমি অত্যন্ত দুখিত হব।"

"জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন:—"কি! আন্দ্রে তুমি বল্‌ছ কি? ১০ বৎসর থেকে তোমার সঙ্গে বিবাহ হবে বলে' ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে আছে! তুমি পাগল হলে না কি?"

আন্দ্রে বলিলঃ—"আমি বুঝেসুঝেই এই কথা বল্‌চি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারচি, আমি আপনার কন্যাকে কখনই সুখী করতে পারব না।"

আন্দ্রেই তাঁহার ভাবী জামাতা এই ধারণা জেরোনিমোর মনে বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি আবার বলিলেনঃ—

"ও কি-প্রলাপ বক্‌চ, কি-সব আজগুবি কথা বল্‌চ! তোমার বোধ হয় অসুখ করেছে—তোমার জ্বর হয়েছে। তাই খেয়াল দেখ্‌চ।"

জেরোনিমোর আস্তিন টেনে ইংরেজ-যুবক বলিলঃ—

—"মশায়! কোন চিন্তা নেই; জামাতার অভাব কি। আপনার কন্যা এমন রূপসী, এমন সুবেশী!"

জেরোনিমো আবার বলিলেনঃ—

—"ধন-ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে তোমাদের এমন মিল হয়েছিল…"

আন্দ্রে উত্তর করিলঃ—

"হৃদয়ের মিল অপেক্ষা ঐ মিলটাই বেশী হয়েছিল। আমার মনে হয় না, ডনা—ফেলিসিয়ানা আমাকে না পেলে বেশী-কিছু কষ্ট অনুভব করলেন!

ফেলিসিয়ানা উত্তর করিলঃ—

—"তুমি খুব বিনয়ী; আমার কষ্ট হবে না, তাই এখন মনে কর। আর কিছু না হোক্, তাহলে অনুতাপের হাত থেকে এড়াতে পারবে। বিদায়, ঘরকন্না পেতে সুখী হও। শ্রীমতী, তোমাকে নমস্কার। এসো বাবা; Sir Edward আমাকে তোমার বাহু-অবলম্বন দেও"।

ইংরেজ যুবক এক বাহুর দ্বারা ফেলিসিয়ানার কটিদেশ বেশ শোভনভাবে বেষ্টন করিল এবং উভয়ে বুক ফুলাইয়া সগর্ব্বে বাহির হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডের দ্বীপ-গণ্ডীবদ্ধ দ্বৈপিক যুবকটির মুখ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। যে সকল আশা এতদিন ডানা মেলিতে পারে নাই এই ঘটনায় সেই সব আশা তাহার চিত্ত-গগনে আসিয়া উদিত হইল। যাহার প্রেমানলে যুবকটির হৃদয় ভিতরে-ভিতরে জ্বলিতেছিল, সেই ফেলিসিয়ানা এখন মুক্ত! সে মনে-মনে ভাবিল, দীর্ঘকাল হইতে যে বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! স্পেনের রমণীকে বিবাহ করা—আর! সে ত আমার জীবনের স্বপ্ন! আর এমন-এক স্পেনীয় ললনা, যার চিত্ত আবেগময়, যার হৃদয় প্রেমানলে প্রজ্জ্বলিত, আর যে,—আমার মনের মতন চা তৈরী করতে পারে…Lord Byronএর মতের সঙ্গে আমার খুব মেলে, উত্তর-য়ুরোপের পাণ্ডুমুখী সুন্দরীরা পিছনে পড়ে থাক্, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমি একজন ভারত কিংবা ইতালী কিংবা স্পেনের ললনাকে বিবাহ করব—স্পেন-দেশের ছোট ছোট মহাকাব্যের জন্য, ও স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য, স্পেনের রমণীই আমার সব-চেয়ে পছন্দ। আমি অনেক স্পেনের রমণী দেখেছি যাদের হৃদয় প্রচণ্ড আবেগে পূর্ণ, কিন্তু তারা আমার প্রণালী অনুসারে চা তৈরী করতে পারে না। তারা নিয়মের এমন ব্যতিক্রম করে যা দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। তা ছাড়া ফেলিসিয়ানা কেমন সুশিক্ষিত! লণ্ডনে নৃত্যোৎসবে, নিমন্ত্রণ-মজলিসে ফেলিসিয়ানা খুবই চটক্ লাগাতে পারবে। কেউ বিশ্বাস করবেনা, ফেলিসিয়ানা মাদ্রিডের রমণী। আঃ! আমি কত সুখী হব! কলিকাতায় কিংবা উত্তমাশা অন্তরীপে—যেখানে আমার একটা প্রমোদ-কুটীর আছে—সেইখানে গিয়ে আমরা দুজনে গ্রীষ্ম যাপন করব! কি আনন্দ!"

ফেলিসিয়ানকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার সময়, Sir Edwards জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

এদিকে ফেলিসিয়ানাও এইরূপ নানাপ্রকার সুখের কল্পনায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল; যে ঘটনাটা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহাতে অবশ্য ফেলিসিয়ানা বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছে। আন্দ্রে তাহার হাত-ছাড়া হওয়ায় তাহার যে বেশী-কিছু দুঃখ হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু আন্দ্রে প্রকাশ্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাহার আত্মাভিমানে একটু খোঁচা

লাগিয়াছিল। যে পুরুষকে কোন রমণী ভালবাসে না, সেই পুরুষ যদি রমণীকে পরিত্যাগ করে তাহলে ভালবাসা না থাকা সত্ত্বেও সেই রমণীর কথনই তাহা ভাল লাগে না। তাছাড়া যখন হইতে Sir Edwardsএর সহিত পরিচয় হইয়াছে, ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের বন্ধনটাকে আর তেমন অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে না।

ফেলিসিয়ানা, Sir Edwardsএ স্বীয় আদর্শ মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইয়া, বুঝিতে পারিল, সে কখনো আন্দ্রেকে ভাল বাসে নাই!

যেরূপ ইংরেজ তার স্বপ্নের জিনিস ছিল, Sir Edwards ঠিক্ সেইরূপ ইংরেজ! চাঁচা-পোঁচা গোঁপদাড়ি কামানো, সিন্দুরের মত মুখের রং, চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে, বুরুজ করা চিরুণী-দিয়ে-আঁচড়ানো, পালিশ-করা চুল, ধব্‌ধবে সাদা 'নেক্‌-টাই', ইংরেজী বর্ষাতী ও "ম্যাকিন্‌টশ'! সভ্যতার চরম অভিব্যক্তি!

তাছাড়া ইংরেজ যুবকটি সংকেত-স্থানে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে কেমন সময় নিষ্ঠ,গণিতের কথা অঙ্কের মত কেমন ঠিক্‌ঠাক নির্ভুল। খুব ভাল-সময়-রাখা ক্রনমেটর ঘড়ীকেও তার কাছে হার মানিতে হয়! আমার ইংরেজি রূপার বাসন-কোসন হবে, আমার ওয়েজ-উডের চীনে-বাসন হবে, সমস্ত ঘরময় কার্পেট বিছানো থাকবে, পোড়ার মাথা চাকর বাকর থাকবে, হাইড পার্কে বেড়াতে যাব, আমার স্বামী চৌঘুড়ী হাঁকাবেন—আর আমি তাঁর পাশে বসে যাব। সায়াহ্নে রাণীর থিয়েটারে যাব, জাঁকালো আসনে বসে ইটালিয়ান সঙ্গীত শুনব। আমাদের প্রাসাদের সবুজ ছাঁটা-ঘাসের জমিতে পোষা হরিণরা খেলা করবে; আরও হয়ত খেলা করবে কতকগুলি সাদা সাদা গোলাপী রং-এর শিশু। খাঁটি King Charles-জাতীয় কুকুরের পাশে, গাড়ির সম্মুখ দিকে শিশুরা বস্‌লে কেমন মানাবে!"

উপরি-উক্ত যুগলটি—যারা উভয়ের মনের মত গঠিত—উহাদের এখন পথ ধরিয়া চলিতে দেও; এখন এস, পোভার রাস্তায় গিয়া মিলিতোনা ও আন্দ্রে কি করিতেছে দেখা যাক্।

ফেলিসিয়ানা, ডন জেরোনিমো, ও Sir Edwards চলিয়া যাইবার পর মিলিতোনা, আন্দ্রের স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু এ অশ্রুপাত আনন্দের অশ্রুপাত; সেই অশ্রুবিন্দুগুলি মুক্তার ন্যায় পেলব গালদুটি দিয়া গড়াইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া আসিল; অস্তকালের লাল মেঘে আকাশ রঞ্জিত হইল। গিতারের গুঞ্জন, নর্ত্তকীদের নূপুর শিঞ্জিনী খঞ্জনীর এবং কাষ্ঠ-করতালের তালধ্বনি দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল। সাবাস, সাবাস! বাহবা, বাহবা! রাস্তার সব কোণ ও চৌমাথা হইতে স্পেনদেশীয় নৃত্যসংযুক্ত সুললিত গানের সুর-ধারা দম্‌কায় দম্‌কায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল এবং এই সব আনন্দধ্বনি প্রেমিক-যুগলের নিকট বিবাহ-গীতির পূর্ব্বাভাস বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। রাত্রি সমাগত হইল। মিলিতোনা আন্দ্রের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া আনন্দে বিভোর হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের আরতি

(ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে)

জয়্ জয়্ ভারত্ ! জয়্ জয়্ মাতা !
ঋদ্ধির নিধান ! সিদ্ধির দাতা
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তির গাথা ! জয় ! জয় !

দুর্দ্দম তোমার শৌর্য্যের বরে
পর্ব্বত দাঁড়ায় গর্ব্বের ভরে
সূর্য্যের গমন রোধ্‌বার তরে ! জয় ! জয় !

উদ্দাম সাগর মন্থন করো !
আস্তের 'বরুণ-ছত্তর' ধরো !
সিংহল শ্রীভোজ লাখ্ দ্বীপ ভরো ! জয় ! জয় !

পাণ্ডব-রাঘব-মৌর্য্যের প্রস্থ !
ক্ষত্রের স্বরগ ! বৈশ্যের বস্থ !
পায় তোর লুটায় হিংসার পশু ! জয় ! জয় !

ডঙ্কায় তোমার ডিণ্ডিম ওঠে
কাশগড় খোটান কাম্বোজ লোটে
ঝাণ্ডায় তোমার গৈরিক ফোটে ! জয় ! জয় !

গান্ধার, ইরাণ, মিস্ত্রাম্, মিতান্,
পুত্রের তোমার কীর্ত্তির নিধান ;
চীন, শ্যাম, জাপান, শিষ্যের বিতান ! জয় ! জয় !

পুণ্যের অমল দর্পণ তুমি !
বিশ্বের হৃদয়-তর্পণ তুমি !
কর্ম্মের ফলের অর্পণ-ভূমি ! জয় ! জয় !

শক্তির গরুড় ! ভক্তির চাতক !
আত্মার গভীর শান্তির সাধক !
নৈরাশ-হরণ উজ্জ্বল পাবক ! জয় ! জয় !

জয় জয় ভারত ! বিশ্বের স্তুতা !
পৃথ্বীর তিলক ! তীর্থস্তুতা !
মন্দার-মুকুল ! নন্দন্-চ্যুতা ! জয় ! জয় !

ঋক্ সাম তোমার কুণ্ডল কানে !
দিগ্‌গজ তোমার কিঙ্কর মানে !
মেঘ-দূত তোমায় মঞ্জীর দানে ! জয় ! জয় !

ছয় ছয় ঋতুর পল্লব-গাঁথা
ফুলময় তোমার কিঙ্খাব পাতা ;
লাখ্ লাখ্ যুগের শিল্পীর মাতা ! জয় ! জয় !

মন্দির-গোপুর-চৈত্যের-বীথি !
পর্ব্বত-পটের গৌরব স্মৃতি !
বল্মীক-শয়ান উল্লাস-গীতি ! জয় ! জয় !

রথ তোর নকল গ্রীকগণ করে
সুশ্রুত সুদূর বোগ্‌দাদ ভরে
দর্শন জ্ঞানের নির্ঝর ঝরে ! জয় ! জয় !

অঙ্গন তোমার চম্পক-ঢাকা,
অঙ্গের পরশ চন্দন-মাখা,
চৌরস ললাট চন্দ্রক আঁকা ! জয় ! জয় !

ব্রহ্মার আদিম ওঙ্কার তুমি !
মুক্তির বীণার ঝঙ্কার তুমি !
হিন্দোল-বিলাস গঙ্গার তুমি ! জয় ! জয় !

বিক্রম-প্রতাপ-বাপ্পার দেবী !
বুদ্ধের বোধন ! জয় নির্লেপী !
বিশ্বের প্রেমেই ওই পদ সেবি ; জয় ! জয় !

জয় জয় ভারত ! যজ্ঞের মাতা !
আত্মার আপন অন্নের দাতা !
উষ্ণীষ তোমার ধুস্তুর-গাঁথা ! জয় ! জয় !

বিশ্বের নাথে বল্লভ বরি'
নিষ্ঠুর ফণী-কঙ্কণ পরি'
গৌরীর গায়ে গৈরিক, মরি ! জয় ! জয় !

চিত্তের গভীর নৈমিষ মাঝে
তন্ময় শোনো 'ওম্' 'ওম্' বাজে
নিত্যের নিদেশ উজ্জ্বল রাজে! জয়! জয়!

আত্মার অমল দীপ্তির খনি!
পৃথ্বীর মাঝে অদ্বয় গণি;
কৌটায় তোমার কৌস্তুভ মণি! জয়! জয়!

পদ্মের মেলায় লক্ষ্মীর ছবি!
কাব্যের কবির তুই বান্ধবী!
নিষ্কাম যাগের নির্ম্মল হবি! জয়! জয়!

আত্মের শুক্ল অর্দ্ধেক ধরার!
মৃত্যুর ডেরায় মুক্তির করার!
চিন্ময়!···অতীত্ তন্দ্রার ত্বরার! জয়! জয়!

নির্ম্মল তোমার নির্ভয় আঁখি,
কল্যাণ করে মৈত্রীর রাখী,
সংসার-নীড়ে স্বর্গের পাখী! জয়! জয়!

অর্হৎ-শ্রমণ-তীর্থঙ্করে
গৌরব তোমার কীর্ত্তন করে,
সৌরভ তোমার অম্বর ভরে, জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! বুদ্ধের মাতা!
নিষ্ঠার নিধান! শুদ্ধির দাতা!
অক্ষয় তোমার শান্তির গাথা! জয়! জয়!

দর্পীর দুলাল ধৃষ্টের আগে
অক্ষোভ তোমার অক্রোধ জাগে!
বিশ্বের হিয়ায় বিস্ময় লাগে! জয়! জয়!

নিত্যের প্রেমে দুষ্কর করো
সত্যাগ্রহে লাঞ্ছন বরো
হেমহার ফেলি' শৃঙ্খল পরো! জয়! জয়!

তপ তোর অটুট তাণ্ডব-নাচে!
দুর্ব্বোধ দাঁড়াস্ শত্রুর কাছে!
পায়-পায় ফিরিস্ মৃত্যুর পাছে! জয়! জয়!

মৃত্যুর পারের নিত্যের লাগি
ক্লেশ তুই সহিস যুগ যুগ জাগি—
যুগ যুগ অসীম দুঃখের ভাগী! জয়! জয়!

বুদ্ধের ধারায় যুদ্ধের ধারা
চেষ্টায় তোমার হয় ফের হারা!
গঙ্গায় গ্লানি-পঙ্কের পারা, জয়! জয়!

ক্ষুদ্রের পরম দুর্ভোগ তুমি
ধূর্ত্তের চরম দুর্য্যোগ তুমি
সত্যের কৃপাণ নির্ম্মোঘ তুমি! জয়! জয়!

অম্লান তোমার আত্মার বাণী!
অক্ষয় তোমার আশ্বাস, জানি,
বিশ্বাস-কিরীট বিশ্বের রাণী! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! আত্মার দাতা!
আক্‌বর-অশোক-ভীষ্মের মাতা!
অক্ষয় তোমার কল্যাণ-গাথা! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! সংশয়-ত্রাতা!
চিত্তের অমোঘ শক্তির দাতা!
ত্রিশ ক্রোর ব্রতী পুত্রের মাতা! জয়! জয়!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আঁধি

১

নিখিল কলের পুতুলের মত বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছিল; মনটা বাহিরে অবাধ মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলার মাঝখানে সতর্ক গতিতে লুকাইয়া ফিরিতেছিল। গাছের ডালে পাখীর কলরব, পথে মাঝে মাঝে অজানা পথিকের কণ্ঠ হইতে দুই-চারিটা কথার টুক্‌রা ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে—তাহাতে মুক্তির সে কি হাওয়াই না বহিয়া চলিয়াছে! সকলের উপর সোনার দুই-চোখের আকুল অধীর সেই দৃষ্টিটুকু! নিজের চারিধারে নিয়মের এই যে বাঁধন—সেগুলা নিখিলের দেহে-মনে আজ এমন চাপিয়া ধরিতেছিল! অথচ সে বাঁধন কাটিবার কোনই উপায় নাই! হায়রে, ইহার চেয়ে সে যদি ঐ সব পথের লোকদেরই একজন হইত! তাহার ছোট মন এক অসহ্য পীড়ার ভারে যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল! এমন সময় মার ডাক আসিয়া পৌঁছিল। লেখা ছাড়িয়া নিখিল মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—যাও, মা কি বলছেন, শুনে এসো!

এসো! যে-বাঁধন মুহূর্ত্তের জন্য একটু আল্‌গা হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আবার কে যেন অলক্ষ্যে চাপিয়া আঁটিয়া ধরিল। মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন,—যাও, শুনে এসো নিখিল, মা কি বলছেন।

নিখিল উঠিয়া দম-দেওয়া পুতুলের মতই মন্থর গতিতে অন্দরের দিকে চলিল।

মার ঘরের কাছে আসিয়া সে শুনিল, মা ঘরে কার সঙ্গে কথা কহিতেছে! নিখিল ডাকিল,—মা।

ভিতর হইতে সুষমা বলিল,—এদিকে এসো নিখিল।

নিখিল ঘরে ঢুকিল। সেখানে গিয়া সোনাকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক অজানা আশঙ্কায় সারা অঙ্গ তাহার ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সোনা এখানে? সর্ব্বনাশ! বাবা যদি দেখিয়া ফেলে! নিজের জন্য ভয় ততখানি নয়, যত ভয় এই বেচারী সোনার জন্য! সে ত নিখিলের বাবাকে জানে না—এখনি একটা কঠিন রূঢ় কথার ঘায় বেচারীর ঠোঁটের ঐ অম্লান শুভ্র হাসিটুকু কোথায় যে উবিয়া যাইবে!

নিখিলকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সুষমা বলিল,—এ মেয়েটি কে, বল তো নিখিল?

ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি টানিয়া নিখিল বলিল,—সোনা।

সুষমা বলিল,—বেশ মেয়েটি, না? তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছিল—তা তুমি এখন পড়ছ কিনা, তাই আমার কাছে এসেছে। তোমার পড়া হলে এর সঙ্গে খেলা করবে—কেমন?

সোনার সঙ্গে খেলা করিবে সে,—এই বাড়ীর মধ্যে! সর্ব্বনাশ! বাবা তাহা হইলে দুইজনের কাহাকেও কি আর আস্ত রাখিবে? সে বলিল,—না মা, আমি এখন খেলতে পারব না। আমায় হাতের লেখা লিখতে হবে, তার পর অঙ্ক কষা আছে, পড়া

আছে। তারপর আবার চারটের পর বাঁশবাজি হবে—

সোনার ডাগর চোখছুটি নিখিলের এ-কথায় নিবু-নিবু দীপের মত ম্লান হইয়া গেল, চোখ ছলছলিয়া উঠিল! নিখিল তাহা লক্ষ্য করিল। বেচারী, বেচারী সোনা! আহা! এ কি সোনার বাবা যে তাহাকে দেখিয়া একেবারে খেলার ছুটি দিয়া দিবে?

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, ও এখন থাকুক ত—তারপর বাঁশবাজি দেখে বাড়ী যাবে'খন। আমি ততক্ষণ সোনার সঙ্গে গল্প করি, ওর চুল বেঁধে দি—বলিয়া সুষমা সোনার ঝুঁটি-বাঁধা চুলগুলা খুলিতে লাগিল।

সোনা কাঠের পুতুলের মত স্থিরভাবে নিখিলকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—আর নিখিল উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কখন্ সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া পিতার পায়ের শব্দ কি কণ্ঠের বজ্র-ধ্বনি জাগিয়া ওঠে! তার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

সুষমা তখন সোনাকে কৌচের উপর নিজের পাশে বসাইয়া তাহার ছোট কোঁকড়ানো চুলগুলা বিনাইতে সুরু করিল দেখিয়া নিখিল বলিল,—মা, সোনার কাঁচের পুতুল নেই মা,—শুধু মাটীর পুতুল। ওকে ছুটো কাঁচের পুতুল দিয়ো, মা।

সোনা এ কথায় খুসী হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল,—তোমার মা ভাই আমায় পুতুল দিয়েছেন ত। এই দেখ, বেশ পুতুল—না? আমি ভাই এটিকে তুলে রেখে দেব, এ নিয়ে খেলা করবো না। যদি ভেঙ্গে যায়! এ-রকম খোকা-পুতুল আমি কখনো দেখিনি। পুঁটি খেঁদি ওরাও কেউ দেখেনি। বলে, আমরা গরীব মানুষ—এ-সব পুতুলের যে অনেক দাম, পাব কোথা? বাবা বলেচে ভাই, এবার কলকাতায় যাবে যখন, তখন আমার জন্যে ভালো একটি কাঁচের পুতুল কিনে আনবে। কাঁচের পুতুলের কেমন নীল-নীল চোখ—না? এক-নিশ্বাসে এতগুলা কথা সে বলিয়া গেল; বলিয়া সুষমার দেওয়া পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া আদর করিতে লাগিল।

নিখিল বলিল,—দিয়ো মা, সোনাকে আর ছুটো কাঁচের পুতুল দিয়ো। কি হবে? আমি ত পুতুল নিয়ে খেলি না—শুধু আল্‌মারিতেই তোলা থাকে। তার চেয়ে—এই অবধি বলিয়া নিখিল হঠাৎ থামিয়া গেল। কথা আর তাহার শেষ হইল না—ওদিকে সেই মুহূর্ত্তে পিছনে পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল,—কি হচ্ছে তোমাদের?

ভয়ে নিখিলের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। তার সব কথা এইবার প্রকাশ হইয়া যাইবে! বাহিরে কাহারো বাড়ী যাওয়ায় পিতার নিষেধ, কাহারো সঙ্গে কথা কওয়া বা মেলা-মেশা করা ত দূরের কথা! আর এই সোনা কি না—নিখিল ভয়ে নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিবার বা নড়িবার শক্তিটুকুও তাহার একেবারে যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এ মেয়েটি কে?

সুষমা বলিল,—এইখানকারই একজনদের মেয়ে—আমাদের বাড়ী-ঘর দেখতে এসেছে।

—তার মানে?

সুষমা বুঝিল, স্বামীকে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি খুবই বিরক্ত হইবেন,—আর সে বিরক্তির যা-কিছু ঝাঁজ গিয়া পড়িবে

বেচারা নিখিলের উপর। স্বামীর দিকে লক্ষ্য করিয়া সুষমা দেখিল, স্বামীর মুখে-চোখে ঈষৎ অপ্রসন্নতারও ছায়া পড়িয়াছে। অথচ কথাটা একেবারে লুকাইয়া রাখা চলে না! সুষমা তখন ব্যাপারটাকে যতখানি সম্ভব হাল্‌কা করিয়া লইয়া বলিল,—সেদিন বৃষ্টির সময় নিখিলকে যারা এগিয়ে দিতে এসেছিল,—এটি তাদেরই মেয়ে।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হুঁ, নিখিলের বন্ধু তাহলে! কথাটা বলিয়া অভয়াশঙ্কর জোরে খানিক হাসিলেন, হাসিয়া একবার সোনার পানে চাহিয়া পরক্ষণেই নিখিলের পানে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

পিতার সে হাসির শব্দে নিখিলের মন শীতার্ত্তের মতই হি-হি করিয়া উঠিল। তার পর নিজেকে সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই পিতার স্বর কাণে বাজিল—হাতের লেখা সব হয়েছে, নিখিল?

নিখিল ভয়ে-ভয়ে মুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিয়া বলিল,—না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যাও, লেখা শেষ কর' গে। তারপর আমি আজ পড়াও নেব। বিদ্যে কেমন অগ্রসর হচ্ছে, দেখতে চাই। যাও—

ঝড়ের মুখে কুটার মতই নিখিল সরিয়া গেল।

নিখিল চলিয়া গেলে অভয়াশঙ্কর সোনাকে বলিলেন, কার সঙ্গে তুমি এসেচ এখানে?

সোনা মানুষের এমন রুদ্র কঠোর মূর্ত্তি তাহার জীবনে কখনো দেখে নাই। যেটুকু এখানে এখন দেখিল, তাহাতে ভয়ে সে যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিল। সভয়ে সে একটু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—বাবার সঙ্গে। এবং কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার দুই চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় তোমার বাবা?

—নীচেয়।

সুষমা বলিল,—তুমি যাও। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর বাপের কাছে।

দাসীকে ডাকিয়া সোনাকে তাহার সঙ্গে নীচে পাঠাইয়া সুষমা স্বামীর পানে চাহিল, স্বামীর দুই চোখে কি সে বিরক্তির কঠিন দৃষ্টি! সে নিজেকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অপমানিত বোধ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা।

সুষমা থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কি?

—একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বল।

—তুমি বসো দেখি। একটু স্থির হয়ে সে কথা শুনতে হবে।

৮

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার রুক্ষ মেজাজ বলে তুমি অনুযোগ কর, না? কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছিল?

সুষমা বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্‌টা ঠিক হচ্ছিল না?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তুমি জানো, নিখিলের সঙ্গে বাইরের কোন ছেলে-মেয়ের মেলা-মেশা আমি পছন্দ করি না—এ জেনেও তুমি এ-সবের প্রশ্রয় দিচ্ছ!

সুষমা বাণ-বিদ্ধের মত ব্যথিতা হইয়া বলিল,—এই ছোট্ট সরল নির্দ্দোষ মেয়েটি কি আগ্রহ নিয়ে যে নিখিলকে একবার দেখতে

এসেছে,—তার বাড়ী-ঘর, তার মা-বাপ কেমন, দেখতে! তার এ সরল আনন্দটুকু ভেঙ্গে চুরমার করে দেব, এমন কড়া জান্ আমার নয়!

—কড়া জানের কথা হচ্ছে না, সুষমা। একটা নিয়ম মেনে যদি চলতে হয় ত তার জন্যে সময়-সময় কঠিন ত হতেই হবে। আর ছেলের সম্বন্ধেই যখন এই নিয়ম, তখন তা রক্ষা করা আমাদের তুজনেরই উচিত নয় কি?

সুষমা বলিল,—এইখানে আমাদের সাম্‌নে ও যদি নিখিলের পানে তু'দণ্ড তাকিয়েই দেখে, কি তার সঙ্গে তুটো কথাই কয়,তাতে কোনদিক থেকেই নিখিলের কোন ক্ষতি হতে পারে না। তোমারো মান-হানি তাতে ঘটতে পারে না!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই ত তুমি সব বড়-বড় কথা এনে ফেল্‌চ! এগুলো রাগের কথা, সুষমা। তুমি স্থির হয়ে সব বোঝ, বুঝে কথা বল।

সুষমা বলিল,—রাগ! আমি রাগ করব! কার উপর রাগ করব, শুনি? তাও আবার নিখিলের বিষয় নিয়ে—! যার উপর আমার কোন অধিকার নেই!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এ কথা বল্‌চ কেন আবার? আমি ত নিখিলকে তোমার হাতেই সঁপে দিয়েছি, সুষমা।

সুষমা একটু বিরক্তির সুরে বলিল,—মুখে দিয়েছ, স্বীকার করি, অন্তরের সঙ্গে দিতে পারতে যদি, তাহলে এ গোয়েন্দাগিরিটুকুও ছাড়তে!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—রাগ-অভিমান না করে স্থির হয়ে শোনো দেখি, বোঝো সব। ছেলেকে আমি কি-ভাবে মানুষ করতে চাই, তুমি জানো, সে বিষয়ে তোমার সাহায্যও চেয়েছি আমি। তাতে সাহায্য না করে তার উল্টো পথে চলা কি বিশ্বাস-ভঙ্গ নয়?

—বিশ্বাস! সুষমা বলিল,—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বিশ্বাস করো না আর আমায়! আমি কি কিছু বুঝি না, ভাবো? তুমি বাহিরে কোনমতে একটা ঠাট বজায় রাখবার জন্যে নিখিলের ভার আমার হাতে দিয়েছ বটে, কিন্তু স্পষ্টই বলছি ও মুখের ভারের কাজ নয়। মনে-মনে প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমার দারুণ সন্দেহ! —পাছে কি করে ফেলি!...এ না করে যখন সেই আমায় ওর মার আসনই দিয়েছ, তখন অন্তরের সঙ্গেই ওর ভার আমার হাতে ছেড়ে দাও দেখি! তা যদি না পারো ত এ লোক-দেখানে ভার দেওয়ায় কোন ফল হবে না! ছেলেটা মানুষ, ও মাটীর পুতুল নয়—সত্যি!... এই যে ছেলেটা মুখ চুণ করে চলে গেল,আমিই ওকে পাঁচ মিনিটের জন্যে এখানে ডাকিয়ে এনেছিলুম, তাই ও এসেছিল—তুমি যে চোরের মত তাকে এই তাড়িয়ে দিলে, এতে সে ভাবলে কি? যেন কত-বড় অপরাধই না সে করেছিল! এটাতে কি ও ভাববে না যে ওর মা একটা মাটীর পুতুল মাত্র, তার কথার এখানে কোন দাম নেই? তার কথা শুনে কোন কাজ করতে গেলে আর-একদিক থেকে বিষম তাড়া খেতে হবে? তার মার কথার যা, একটা দাসী-বাঁদীর কথারও সেই দাম?

ক্ষোভে উত্তেজনায় সুষমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল, চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সুষমা স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল,—আর এই মেয়েটি—কি অপরাধ করেছে সে? বেচারা কি ভাবলে!···সাধে বলি, এ বাড়ীতে একটা দাসী-বাঁদীরও যে অধিকার আছে, আমার তাও নেই। আমায় পাঠিয়ে দাও, সত্যিই কোথাও পাঠিয়ে দাও। এ-বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ায় প্রাণে যেন আমার গুমটু ধরে উঠেছে, বাহিরের ফাঁকা হাওয়ায় দু'দিন ঘুরে একটু দম নিয়ে আসি। সত্যি বল্‌ছি, আমার বাইরেটা তুমি এমন চক্‌চকে করে সাজিয়ে রেখেছ যে লোকে দেখলে আমার সৌভাগ্যে হয়তো হিংসা করবে,—কিন্তু ভিতরটা কি রকম যে পুড়িয়ে ছাই করে দেছ!—সুষমা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

অভয়াশঙ্কর তবুও নিরুত্তর রহিলেন, এ-কথার কোন জবাব দিলেন না।

সুষমা তখন সে ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৯

উৎসবের জন্য রঙীন্ ফুলে-পাতায় সজ্জিত মণ্ডপ অকস্মাৎ ঝড়ে ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে সকলের প্রাণ যেমন করুণ হাহাকারে ভরিয়া ওঠে, পিতার সেই আকস্মিক আবির্ভাবে ও তিরস্কারে নিখিলের মনের মধ্যে আনন্দের যে উৎসব-মণ্ডপটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেটিও তেমনি ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া সেখানে আর্ত্তনাদের হাহাকার জমিয়া উঠিল। সোনা কি মনে করিল? তাহার পিতাকে এতটুকু সম্ভ্রমের আসন স্নেহের আসন পাতিয়া সোনার সামনে আর কখনো সে তাঁহাকে বসাইতে ত পারিবেই না—সোনার মন তাহার উপরও না জানি ইহাতে কতখানি তিক্ত হইয়া উঠিল। বেচারী সোনা! সদরে সে নিজেও তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিল না! কেন কহিল না, সোনা কি তাহা বুঝিবে? মার কাছে একটু আদর পাইয়া স্নেহ পাইয়া ব্যথা-হত মনটাকে সে যখন সুস্থ করিয়া লইতেছে, ঠিক সেই সময়—

নিখিলের বুকের মধ্যটা দারুণ ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—ও কি নিখিল, লেখা যে লাইনের উপর চলে যাচ্ছে। মন দিয়ে লিখ্‌চ না, বুঝি?

নিখিল লক্ষ্য করিয়া দেখে, সত্যই ত, লেখা লাইনের উপর উঠিয়া গিয়াছে। সে আবার লেখার দিকে মন দিল।

নিঝুম দুপুরে বাহিরে গাছের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু করুণ গান ধরিয়াছিল—খোলা জান্‌লা দিয়া তপ্ত হাওয়ার ঝলক্ ঘরে আসিয়া ঢুকিতেছিল। নিখিল একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—বাঙলা হাতের লেখা বই দেখে লিখব কি, মাষ্টার মশায়?

—লেখো।

নিখিল তখন কথামালা খুলিয়া শৃগাল ও দ্রাক্ষাকুঞ্জের গল্পটি খাতায় তাহার হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে ভাবনার রাশি আসিয়া তাহার ছোট মনটিকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল। সোনা এখন কি করিতেছে? চলিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়! তাহাদের বাড়ীতে গেলে সোনার মা-বাপ তাহাকে কত আদর,

কত যত্ন করে, এখানে সোনা সে আদর-যত্ন না পাক্—একটা মিষ্ট কথাও বাবা তাহার সঙ্গে কহিল না! ইহার পর সোনাদের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি বলিয়া? তবু দেখা করিতেই হইবে। সোনাদের সে বুঝাইবে, বাবার আচরণের সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না, কোন যোগ নাই-ও! সোনাকে সে ভালবাসে, সত্যই ভালবাসে, খুব,—খুব ভালবাসে। সোনার সঙ্গে মিশিয়া নিজের বাড়ীতে সে যে তাহাকে লইয়া খেলা করিতে বা তাহার সঙ্গে দুই দণ্ড কথা কহিতে পারে নাই, গল্প করিতে পারে নাই—ইহার জন্য তাহার নিজের মনে যে কত দুঃখ হইয়াছে! যেমন করিয়া হোক, বাড়ীর এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবেই—সোনাদের বাড়ীতে আজই সে যাইবে, স্থির করিল। এখানে বাঁশবাজি হইবে—হোক—সে তা দেখিতে চায় না। আজ বৈকালে সে সোনাদের বাড়ীতে যাইবেই—ইহার জন্য তিরস্কার প্রহার সহিতে হয় যদি ত সে তা' সহিবে—সারা রাত্রি আবার যদি অন্ধকার ঘরে বন্দী থাকিতে হয় ত তাহাতেও সে কাতর নয়! কেন এমন করিয়া বাবা কুকুর-বিড়ালের মত সোনাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিল? এদেশে এই একটিমাত্র মেয়ে—যে তাহাকে দেখিলে সুখী হয়, তাহার এই একটি মাত্র বন্ধু—না, তাহার প্রতি এ আচরণের শোধ যেমন করিয়া হোক, সে লইবেই! নিখিলের মনে একটা বিদ্রোহের ঝড় উঠিল—এ শাসন, এ বাঁধন আর সহ্য হয় না—ইহা সে কাটিয়া ফেলিবে।

অমনি তাহার মনে পড়িল—মার কথা। বেচারী মা—তাহার সুখের জন্য মার কি প্রাণপণ আগ্রহ! সে আগ্রহে পিতার কি এ নিষ্ঠুর বাধা দেওয়া! মার কাছেও দুই দণ্ড বসিয়া সে গল্প করিতে পায় না। কেন? সে কি মার কেহ নয়? এমনি নানা উদ্ভট চিন্তা আজ প্রথম তাহার ছোট মনটির মধ্যে কোথা হইতে ভিড় করিয়া আসিয়া সশস্ত্র সৈন্যের মত রুখিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—কাটো এ বাঁধন—বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর! তাহাদের চীৎকারে নিখিলের সমস্ত মন একেবারে তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

পথে এক বৃদ্ধ ভিখারী ছোট একটি ছেলেকে লইয়া গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। সে গাহিতেছিল,—

বেলা যে তোর ফুরিয়ে এলো,
কি করিস্ ভাই বসে?
ঘরের কোণ ছেড়ে আয়, আয় চলে আয়—
বাইরে পুলক রসে!

স্তব্ধ নিঝুম দুপুরের বেলা। গোপীযন্ত্রের মিঠা-করুণ বাজনায় গানের এই ছত্রগুলা নিখিলের তপ্ত প্রাণে যেন অমৃত ছিটাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিকে এই ঘরের কোণ ঘেরিয়া কে যেন লোহার গারদ তুলিয়া ধরিয়াছে, আর সেই গারদের বাহিরে গানের প্রত্যেক কথাগুলা আনন্দের নিশান তুলিয়া সুরের ধারায় সাগ্রহে তাহাকে ডাকিতেছে, আয় রে, ও-ঘরের কোণ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আয়!

কি সুন্দর গান! বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় সত্যই ত, ও কি সুখ! ঐ ছেলেটি

—বাঃ, এই স্তব্ধ দুপুরে পথে-পথে কি আনন্দেই না ও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কোথা হইতে আসিতেছে, কত পথ বহিয়া কত-দূরে যাইবে—চারিধার শ্যামল ঘন গাছের-পাতার ছায়ায় ঘেরা, কত-কত কলরব-মুখরিত পল্লীর ঘাট-বাট অতিক্রম করিয়া নব-নব রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই যে ও চলিবে! এ যাওয়ার যেখানে বিরাম হইবে, না জানি, সেখানে কি স্নেহ-নির্ঝর-তলে উহার পথ চলার সকল শ্রান্তি ঘুচিয়া যাইবে! ঘরের মধ্যে তাহার মত বন্দী হইয়া উহাকে থাকিতে হয় না! কি করিলে বড় লোকের এই কঠিন পাষাণ-ভবনের দ্বার ঠেলিয়া দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেও অমনি অবাধ মুক্ত পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে! ভাবিতে ভাবিতে নৈরাশ্যের দীর্ঘ কালো ছায়া মেঘাক্রান্ত আকাশের মতই তাহার মনে নিবিড় ঘন হইয়া জমিয়া উঠিল। ঘরে-বাহিরে এ কি বিরাট অন্ধকার গো! শাসনের এ কি কঠিন চাপ, নিশ্বাস যে বন্ধ হইয়া আসে, মা!

বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিখিল বাহিরের দিকে তাকাইল। দূর হইতে ভিখারীর গোপীযন্ত্রের সুরে গাওয়া গানের কলি তখনো বাতাসে ভাসিয়া আসিতে-ছিল। নিজের মনে ভিখারী গাহিয়াই চলিয়াছে—

এই যে পাখী ডাকছে গাছে,
আকাশ আলোয় ভরে আছে,—
এই গানে আর আলোর সুরে
সকল বাঁধন খসে!

নিখিলের বন্ধন-ব্যথাতুর চিত্ত প্রাণপণে ফুকারিয়া উঠিল—আলো, আলো, ওগো আলো! ঐ আলো-হাওয়ায় আমিও যেতে চাই গো, আমায় নিয়ে চল গো!

বাঙ্‌লা হাতের লেখা শেষ করিয়া নিখিল ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কি নিখিল?

নিখিল বলিল,—একদিন দুপুরবেলায় বাবাকে বলে আমায় ছুটি দেওয়াবেন, মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কেন নিখিল?

নিখিল বলিল,—দুপুরবেলায় একদিন আমি পথে-পথে ঘুরে চারিধার দেখে বেড়াব, এ দেশের কোথায় কি আছে।

নিখিলের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—দেখে কি হবে?

নিখিল কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—বাইরের আলো-হাওয়া কেমন লাগে, দেখব।

বৃদ্ধ ভিখারীর গান মাষ্টার মহাশয়েরও কানে গিয়াছিল। তিনি বলিলেন,—তাতে দেখবার মত কিছু এমন নেই, নিখিল।

দুই চক্ষে কাকুতি ভরিয়া নিখিল বলিল,—তবু একবার দেখব, মাষ্টার মশায়।

নিখিলের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

সমবেদনায় মাষ্টার মহাশয়ের মনও ভরিয়া উঠিল। বালকের বুকে-পিঠে নিয়মের নিগড় এমনি জড়ানো যে বেচারী একটু বাহির হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে চায়—মাষ্টার মহাশয় এ ইচ্ছার মর্ম্ম বুঝিলেন। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা, ওঁকে বলে ছুটি দেওয়াব। এখন লেখা হয়ে গেল ত—এবার অঙ্ক কষ।

আবার সেই নিয়মের বাঁধন! একটার পর আর-একটা—কত দড়ি-দড়া দিয়াই মনটাকে বাঁধিয়া দিয়াছে রে!

নিখিল শুষ্ক বিরস মনে শ্লেট পাড়িয়া বসিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—নাও, অঙ্ক নাও—বারো হাজার সাতশো তিপ্পান্নোকে ন'হাজার চারশো আট দিয়ে গুণ কর। আজ পাঁচটা গুণ কষবে. ব্যস্—তারপর পদ্যপাঠ পড়বে, তাহলেই ছুটি। বুঝলে?

শেষের কথাটা নিখিলের কানেও গেল না। সে শ্লেটে আঁক পাড়িয়া বসিল—তারপর আঙুলে সংখ্যা গণিয়া শ্লেটে ছাঁদ্ পাতিতে লাগিল।

১০

সেদিন বৈকালে নিখিলের আর বাহিরে যাওয়া হইল না। বাঁশবাজি দেখিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় ভুলাইয়া তাহাকে চোখে-চোখে রাখিলেন। নিখিল পুতুলের চিত্র-করা দুই চোখ লইয়া বাঁশবাজি দেখিল—একটা বংশ-দণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ছায়ার মত কতকগুলা মানুষের অঙ্গ-ভঙ্গী চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া গেল, মনের দ্বারে একটিও ঘা দিতে পারিল না।

তারপর দুই-চারিদিন মাষ্টার মহাশয় নিখিলকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আসিলেন। পথের ধারে-ধারে কত ঝোপ-ঝাড়, ভাঙ্গা মন্দির, পানা-পড়া ডোবা-পুকুর—মাঝে মাঝে কোন ঝোপ হইতে তীব্র কটু গন্ধ আসিতেছে—নিখিলের চোখে মায়াপুরীর মত এগুলা নিঃশব্দ রেখাপাত করিয়া গেল। বেড়াইয়া আসিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কেমন লাগল, নিখিল?

নিখিল বলিল,—ভালো।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কাল আরো দূরে যাব, নিখিল।

নিখিল বলিল,—দুপুরবেলায় ছুটি দিইয়ে দিলেন না, মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—দুপুর বেলায় যে রোদ্দুর, নিখিল।

নিখিল বলিল,—কিছু হবে না রোদ্দুরে, মাষ্টার মশায়। আপনার যাবার দরকার নেই। আমি একলাই শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াব।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আচ্ছা, এই রবিবারে ছুটি দেওয়াব'খন।

তারপর একদিন বৈকালে বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে নিখিল বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখে, সুষমা বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। সে বলিল,—মা, তুমি চুপ করে বসে আছ কেন মা?

সুষমা বলিল,—শরীরটা ভালো নেই, বাবা। তুমি বেড়াতে যাওনি, নিখিল?

নিখিল সুষমার কোলের কাছে বসিয়া বলিল,—বাবা বাড়ীতে নেই, মা, তাই একটু তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে হলো!

সুষমা সস্নেহে তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া কহিল—না, একটু বেড়িয়ে এসো, সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ আছ, একটু বাহিরে ঘুরে এসোগে—নাহলে শরীর ভাল থাকবে না।

নিখিল মার মুখের পানে চাহিল, কি একটা কথা বলিবার জন্য মন অধীর হইয়া উঠিল—কিন্তু মুখে তাহা ফুটিল না। সুষমা বুঝিল, নিখিল কি একটা কথা বলি-বলি করিতেছে, অথচ তাহা বলিতে পারিতেছে না।

সুষমা বলিল,—আমায় কোন কথা বলবে কি, নিখিল?

—মা—নিখিলের কাতর কণ্ঠে আর স্বর বাহির হইল না।

সুষমা বলিল,—কি বলবে, বল না, বাবা। আমাকে ভয় কি?

নিখিল বলিল,—সোনাকে কি বাবা সেদিন বকেছিল মা?

—না। বক্‌বেন কেন? বকেন নি ত।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। মিছে কথা কেন বলবো আমি, বাবা? সোনাকে তিনি বকেন্ নি।

নিখিলের বুকের উপর হইতে মস্ত একখানা ভারী পাথর যেন সরিয়া গেল। এ-কয়দিন বেড়াইতে বাহির হইয়া মন তাহার প্রতিক্ষণে সোনাদের বাড়ীর দিকে ছুটিতে চাহিয়াছে, শুধু চক্ষু-লজ্জায় সে যাইতে পারে নাই! আজ বুকের উপর হইতে পাথরখানা সরিয়া গেলে তাহার ইচ্ছা হইল, হাওয়ার গতিতে সে যদি সোনাদের বাড়ীতে যাইতে পারিত! পরক্ষণেই সুষমার মলিন মুখ চোখে পড়িতেই ভাবিল,—না, আজ থাক্। মার অসুখ করিয়াছে, মাকে ছাড়িয়া আজ আর দূরে যাইবে না।

সুষমা বলিল,—যাও বাবা, তুমি বেড়িয়ে এসোগে।

নিখিল বলিল—না মা, আজ আর আমি কোথাও যাব না। তোমার অসুখ করেছে, বল্‌লে যে। আজ আমি বরং বাগানেই খেলা করিগে—তাহলেই হবে, সেখানেও ত খোলা হাওয়া আছে, মা।

সুষমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিখিলের পানে চাহিয়া রহিল। সোনা ছেলে, চাঁদ ছেলে! তাহার উপর কি মায়া, কত মমতা! সস্নেহে নিখিলের মুখচুম্বন করিয়া হাসিয়া সে বলিল,—আমার এমন কিছু অসুখ নয় রে। তা বেশ, তুমি বাগানেই নয় বেড়াও গে যাও।

নিখিল চলিয়া গেল। সুষমা তাহার পথের পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া বসিয়া রহিল, পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এই ভাঙ্গা-জোড়া, জোড়া-ভাঙ্গা—এ ঠিক এমনিভাবেই সমানে চলিবে—কোন দিনই ইহার বিরাম হইবে না! এই যৌবনে নারী-হৃদয়ের যা-কিছু বাসনা-কামনা, সব ত্যাগ করিয়া জীবনের বসন্ত-কালটুকুকে দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অন্তরে-অন্তরে যে সন্ন্যাসের সাধনা সে করিতেছে, তপঃ-ক্লিষ্ট চিত্ত এ-সাধনার পুরস্কার ত আর কিছু চায় না—সে চায়, শুধু এই নিখিলকে প্রাণে-মনে সর্ব্বময়ভাবে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিতে! হায়রে, পৃথিবীর হিংস্র প্রবৃত্তি কোথা হইতে ইহাতে বাদ সাধিয়া তপস্বিনীর এ-তপেরও বিঘ্ন করিতেছে! তবুও সে এবার একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, হিংসার রক্তটুকুকে সমূলে শুধু এই ভালবাসার শুভ্র ধারায় ধুইয়া মুছিয়া দিতে পারে কি না! কাহারো বিরুদ্ধে সে আর কোনদিন কোন অনুযোগ তুলিবে না। বেদনার ঝড় তাহারই উপর দিয়া বহিয়া যাক্—তাহার একান্ত স্নেহের তলে-আসীন এই বেচারা মাতৃ-হীন বালকের গায়ে শুধু স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশ লাগুক, এ ঝড় তাহার গায়ে না পড়ুক!

নিখিল বাগানে গিয়া গাছের ফাঁকে-ফাঁকে বাগানের পথে ছোট একটা বাঁখারির ঘায় লোহার চাকা ঠেঙ্গাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মার কাছেই

সে এ খেলা শিখিয়াছে। মা কেমন—শুধু বাবাকেই না ভয়! খানিকক্ষণ খেলা করিবার পর বাগানের বেড়ার ওধারে একটা পরিচিত স্বর ভাসিয়া উঠিল,—ও ভাই রাজপুত্ত্ুর—!

এ কি স্বপ্ন! নিখিল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—না, স্বপ্ন ত নয়—ঐ যে সোনা—বাগানের বেড়ার বাহিরে রাঙ্‌চিত্রের ঝোপের ধারে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছে। নিখিল একবার চারিধারে চাহিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল, অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—সোনা?

—হ্যাঁ ভাই, আমি। বাবার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি—মাতু পিসীর বাড়ী। বাগানে চাকা গড়ানোর শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখছিলুম—অমনি তোমায় দেখতে পেলুম, ভাই।

—ভিতরে এসো না ভাই সোনা। এখন ত আমায় পড়তে হবে না, খেলা করবো'খন।

সোনা মুখ ভারী করিয়া বলিল,—না ভাই, যে তোমার বাবা, ভাই—আমার ভারী ভয় করে।

নিখিলের মনে দুম্ করিয়া কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। পিতার স্বপক্ষে বলিবার কথা একটাও নাই সত্য, তবু বাহিরের লোকের মুখে এ কথা আজ নূতন শুনিয়া প্রাণ তাহার ব্যথিত হইয়া উঠিল। নিখিল বলিল,—বাবা ত এখন বাড়ী নেই, শুধু মা আছে।

সোনা বলিল,—রাণী-মা খুব ভালো—কিন্তু তোমার বাবাকে ভারী ভয় করে ভাই। আমি ভিতরে যাব না। তুমি একদিন আমাদের বাড়ী যেয়ো না ভাই। আর ত তুমি যাও না আদবে! আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি, মা রোজ বলে, আসবে রে, আসবে, কিন্তু তবু ত তুমি আসো না—!

নিখিল বুঝিল, এতদিন না যাওয়া ভালো হয় নাই। সে ত যাইবে বলিয়া রোজই ভাবিয়াছে; কিন্তু কেন যায় নাই, সোনা ত তা' বোঝে না। অথচ তাহাকে এ কথা খুলিয়া বলাও চলে না! সে বলিল,—যাব ভাই সোনা, কালই আমি যাব। কেমন?

—আমি তাহলে যাই ভাই। ঐ বাবা এসেছে। আবার নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে হবে ত। মাতু পিসির ছেলে হয়েছে, আজ আটকড়ায়ে। কেমন ছোট্ট চুবড়ি পাব, আর কত মুড়কি, বাতাসা, সব দেবে। তোমার জন্যেও একটা চুবড়ি চেয়ে নিয়ে আমি রেখে দেব'খন—কেমন? তুমি কাল গিয়ে খাবে, ভাই। যেয়ো ভাই। যাবে ত?

নিখিল বলিল,—যাব।

সোনা বেড়ার ধার হইতে সরিয়া গেলে নিখিলও ঢিপি হইতে আবার বাগানে নামিল—নামিতেই তাহার চোখে পড়িল, ঝোপের ধারে লাল-টকটকে একটি সদ্য-ফোটা গোলাপ। তাড়াতাড়ি ফুলটা ছিঁড়িয়া সে আবার বেড়ার সেই ভাঙ্গা ফাঁকটার কাছে আসিয়া দেখিল,—সোনা ঐ যে সে ঐ গলির পথে পুকুরের পাড় ধরিয়া তার বাপের সঙ্গে চলিয়াছে! নিখিল ডাকিল,—সোনা, সোনা—

সোনা যাইতে যাইতে পিছন-পানে ফিরিয়া তাকাইতেছিল। নিখিলের ডাক শুনিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। নিখিল আবার ডাকিল,—সোনা—

সোনা অমনি ছুটিয়া আবার বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিখিল বলিল,—একটি জিনিষ নেবে, সোনা? একটি গোলাপ-ফুল? কেমন রাঙা আর কেমন গন্ধ, দেখো—বলিয়া ফুলটি সে সোনার হাতে তুলিয়া দিল।

সোনা ফুলের ঘ্রাণ লইয়া উল্লাসে হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—বেশ ফুল, ভাই—বাঃ! এবং পরক্ষণেই সে পিতার দিকে ছুটিল, ডাকিল—বাবা, ও বাবা, এই দেখ বাবা, রাজপুত্তুর আমায় কেমন ফুল দিয়েছে, দেখ,—রাঙা গোলাপফুল।

সারা পথে আনন্দে হাসি ছিটাইয়া সোনা চলিয়া গেল। তাহার সে হাসির সুর অনেকক্ষণ ধরিয়াই নিখিলের মনের মধ্যে প্রাণের মধ্যে এক অপরূপ ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিতে লাগিল। নিখিল সে সুরে মুগ্ধ স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল,—যখন সে আসিয়া আবার বাগানের পথে নামিল, তখন বড় বড় ঝাউগাছের পাতা বহিয়া সন্ধ্যার ঘন ছায়া বাগানে নামিতেছে। নিখিলের খেলা আর ভাল লাগিল না। সে ধীরপদে বাড়ী চলিল, মার কাছে। মার অসুখ—মা একলা আছে, এখন কেমন আছে, কে জানে? যদি অসুখ বাড়িয়া থাকে? তার উপর সোনার খবরটাও মাকে একবার দিতে হইবে! সেদিনকার পিতার আচরণের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত সে করিয়াছে ত!

১১

পরের দিন সোনাদের বাড়ী নিখিলের আর যাওয়া হইল না। অভয়াশঙ্কর নদীতে নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া সুষমা ও নিখিলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অপরাহ্নের সূর্য্য-কিরণ নদীর জলে বিচিত্র বর্ণের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। নদীর তীরে গ্রামের মেয়েরা কাপড় কাচিতে, জল লইতে আসিয়াছে। কেহ বা জল লইয়া গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে,—তৃণে-ছাওয়া সবুজের মধ্যে চলা-পথের সাদা রেখা, তরুণীর কালো কেশে সিঁথির মতই—জলের কোলের একটু উপর হইতে জাগিয়া আছে—সেই পথে জলের রেখা আঁকিয়া গ্রাম-নারীরা গৃহে চলিয়াছে। পাড়ে উচ্চ গাছপালার উপর রৌদ্র-কিরণ যেন ফাগের ঝালর ঝুলাইয়া দিয়াছে—সুন্দর দৃশ্য! অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কেমন লাগছে, নিখিল?

উদাসীনভাবেই নিখিল বলিল,—ভালো।

এ নূতন বিচিত্র সৌন্দর্য্য কিন্তু নিখিলের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। সোনাকে সে কথা দিয়াছিল, আজ তাহাদের বাড়ী যাইবে—বেচারী তাহার পথ চাহিয়া আছে—! কথা দিয়াও সে-কথা সে রাখিতে পারিল না, এ কি কম দুঃখ! সে গোলাপফুলটা এখনো সোনা রাখিয়া দিয়াছে কি? ফুল লইয়া সে কি করিল? সোনার মা সে ফুল দেখিয়া কি বলিল? এ-সব জানিবার আগ্রহও যে তাহার প্রাণে খুবই! তাই এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে তাহার প্রাণ ভিজিল না।

ফিরিবার সময় চারিধার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। অভয়াশঙ্কর বাহিরে বসিয়াছিলেন; পান্সীর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া মার কাছে বসিয়া নিখিল বলিল,—একটা গল্প বলো না মা—। তোমার আজ আর অসুখ করেনি?

হাসিয়া সুষমা বলিল,—না। অসুখ করবে কেন?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমরা ভিতরে ঢুকে রইলে কেন? বাইরে এসো না।

সুষমা বলিল,—চুপ করে বসে থাকা যায় না বাবু। তার চেয়ে নিখিল গল্প শুনতে চাচ্ছে—

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তা এইখানে এসেই গল্প বল না, আমিও একটু শুনি।

সুষমা বলিল,—চলো নিখিল।

নিখিল মার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সুষমা এ নিষেধ বুঝিল, বুঝিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—কোন ভয় নেই. নিখিল,—এসো। তার পর আরো মৃদুকণ্ঠে বলিল,—নৌকোয় বেড়ানো ভাল লাগল না, নিখিল?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, না। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—আজ মা, সোনাদের বাড়ীতে আমি যাব বলেছিলুম না? সেই যে তোমায় বলেছিসুম।

—কাল যেয়ো'খন! এখন এসো, বাইরে এসো। কোন ভয় নেই, আমি গল্প বলব, বসে শুনবে।

নিখিলকে লইয়া সুষমা বাহিরে আসিয়া অভয়াশঙ্করের কাছে বসিল। বাহিরে তখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—সুষমা এক রাজা-রাণীর গল্প সুরু করিল। পাড়ে গাছের ঝোপে-ঝাড়ে আঁধারের মেলা, নদীর জলে দাঁড়ের তালে মৃদু সঙ্গীত-রব, চারিধারে মৃদু জ্যোৎস্নার আলো—আর এমনি সময়ে নৌকার উপর সুষমার কোন্ সেই অজানা দেশের রাজা-রাণীর গল্প—! নিখিলের কল্পনা-রঙীন্ চোখের সাম্‌নে এক বিচিত্র স্বপ্নপুরী ফুটিয়া উঠিল।

নৌকা হইতে নামিয়া নিখিল দেখে, ঘাটে দামু ও নন্দ হারিকেন লণ্ঠন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অভয়াশঙ্কর সুষমাকে কহিলেন—এই নৌকোখানি কিনব ভাবচি, সুষমা! বেশ বেড়ানো যাবে তাহলে, না?

সুষমা ছোট্ট জবাব দিল, বলিল,—বেশ হবে।

তারপর আরো পাঁচ-সাতদিন এম্‌নি নৌকা করিয়া বেড়ানো চলিল। নিখিল হাঁফাইয়া ভাবিল,—এ কি হইল! এ যে পাহারা আরো কড়া করিয়া দিল! বাড়ীতে এতটুকু স্বাধীনতা ছিল না বটে, তবু বৈকালে নিজের স্বাধীন খেয়াল-মত যেখানে-সেখানে সে বেড়াইতে পারিত ত! এখন সে-বেড়ানো-টুকুতেও পিতার শাসনদণ্ডের ইঙ্গিত আসিয়া দেখা দিল! তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। পাল্কীতে বেড়ানো,—সে ত বেশ লাগে। কিন্তু এমন ভয়ে-ভয়ে গম্ভীরভাবে—এ কি বেড়ানো! নিখিল ভাবিল, কি করিয়া এ বাঁধন কাটা যায়?

হঠাৎ ভগবান সুযোগ করিয়া দিলেন। সেদিন অভয়াশঙ্কর সুষমাকে কহিলেন,—আমার রোজ-রোজ বেড়ানো পোষাবে না, তোমরা দুজনে যেয়ো। বরং একটা চাকরকে সেই সঙ্গে নিয়ো, লণ্ঠন নিয়ে যাবে। ঘাট থেকে আসবার সময় অন্ধকারে কোন অসুবিধা হবে না তাহলে।

একদিন, দুইদিন—মার সঙ্গে পাল্কীতে বেড়াইয়া তৃতীয় দিনে অস্থির হইয়া নিখিল, মাকে বলিল—মা, আজ সোনাদের বাড়ীতে যাব আমি, পাল্কীতে যাব না।

সুষমা বলিল,—উনি যদি জানতে পারেন?

নিখিল বলিল,—না মা, বাবা জানবে না।

তুমি এক কাজ করো। তুমি নৌকোয় যেয়ো, আর আমি সোনাদের বাড়ী ঘুরে ঘাটে আসব। দামুকে বারণ করে দেব, দামু বাবাকে বলবে না তাহলে। তুমিও যেন বলো না—

সুষমা এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল—এতখানি ছলনার কথা অনেক ভাবিয়াই নিখিলের মনে উদয় হইয়াছে! সে ভাবিল, হায়রে, কত দুঃখে যে আজ এই মিথ্যা ছলনার আশ্রয় সে গ্রহণ করিয়াছে! সোনাদের বাড়ী যাওয়ায় অপরাধই বা আর কি! তবে নিখিল যদি সতর্ক হইতেই চায় ত বেশ তাই হোক।

সুষমা বলিল—বেশ, তাই হবে'খন। দামু নয় তোমার সঙ্গে যাক্। আমি নৌকোয় থাকব,—কিন্তু তুমি দেরী করো না, নিখিল। রাত হয়ে গেলে উনি বক্‌বেন, তা যেন ভুলে যেয়ো না।

নিখিলের সর্ব্বশরীর আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সে বলিল,—আচ্ছা মা। কিন্তু দামু না মা, নন্দকে আমার সঙ্গে দিয়ো। নন্দ ওদের বাড়ীও চেনে। একদিন সে গেছল আমার সঙ্গে।

সুষমা বলিল,—তাই যাক্।

১২

সেদিন বৈকালে সুষমাও গিয়া নৌকায় উঠিল, আর নিখিল ওদিকে নন্দকে লইয়া সোনাদের বাড়ী গেল। এই পথ আজ এত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে—পাও যেন আর চলিতে চায় না!

হাঁটিয়া হাঁটিয়া অনেকখানি পথ আসিল,—ঐ যে, এবার বাড়ী দেখা যায়! বড়-বড় তালগাছগুলার পিছনে ঐ যে, সোনাদের বাড়ী। আঃ! নিখিল আরামের নিশ্বাস ফেলিল। রাজ্যের আরাম তার এ বিশ্বে ঐ বাড়ীর মধ্যটিতেই আছে! দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নিখিলের গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। এমন স্তব্ধ! কাহারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না যে!

নিখিল ভাবিল, মন্দ নয়। বাহির হইতে সে কাহাকেও ডাকিবে না—একেবারে দম্‌ক হাওয়ার মতই অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিবে, সকলকে একেবারে চম্‌কাইয়া দিবে। সে ভারী মজা হইবে।

নন্দকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া নিখিল গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এ কি, উঠানে কেহ নাই ত! সোনা কি তবে আজও নিমন্ত্রণে গিয়াছে না কি!...

না, ঐ যে ঘরে কে রহিয়াছে? সোনার মা!

নিখিল ছুটিয়া হুড়মুড় করিয়া একেবারে গিয়া ঘরের সামনে দাঁড়াইল। এ কি, সোনার মার এ কি মলিন বেশ! চুলগুলা রুক্ষ, আলু-থালু—মুখে-চোখে কালির বিশ্রী দাগ! এ যে তাহাকে চেনা যায় না!

রুদ্ধ নিশ্বাসে নিখিল বলিল—সোনা? সোনা কোথায়?

সোনার মা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—এসেছ বাবা! সে যে রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর করে কেঁদে চলে গেল! দু'দিন আগে যদি আস্‌তে বাবা, তাহলে মা আমার চোখের দেখাও দেখে যেত!

নিখিলের সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল।

অধীর আগ্রহে সে বলিল—সোনা ? কোথায় গেছে সোনা ?

সোনার মা কাঁদিয়া বলিল— জন্মের মত সে আমাদের ছেড়ে গেছে রে বাবা ! আর আসবে না ধন, সে আর আসবে না !

এ কি কথা ! জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছে- -আর আসিবে না ? এ কথার মানে কি? কোথায় গেছে সে ? কেন আসিবে না ? রাগ করিয়া গিয়াছে, বুঝি ? নিখিল নিজে গিয়া যদি ডাকিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া আনিতে চায়, তবু সে আসিবে না ? যত রাগ করিয়াই যাক্, নিখিলের কথায় সে না আসিয়া কোথাও কখনো থাকিতে পারিবে না !

নিখিল রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল,— কোথায় গেছে সে, বল না আমায় ?

সোনার মা দুই বাহুর নিবিড় বাঁধনে টানিয়া নিখিলকে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,— পাঁচদিন আগে মার আমার জ্বর হয়—কি কাল জ্বরই যে হলো ! জ্বলে পুড়ে গেল মা আমার— যাতনায় খালি ছট্‌ফট্ করেছে, আর মুখে শুধু এক কথা,—রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর ! ওমা, আমার রাজপুত্তুর এলো না কেন ? তোমার দেওয়া গোলাপফুলটি বুকে করে সর্ব্বক্ষণ কেবলি কেঁদেছে। তাকে বাঁচাতে পারলুম না, বাবা, বাঁচাতে পারলুম না। কি কাল রোগেই যে ধরেছিল ! স্বপ্নেও ভাবিনি, মা আমার চলে যাবে ! কালও যদি বিকেলে একবার আসতে বাবা ! রাত দশটা বাজল, মারও আমার সব খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল !

নিখিল অবাক হইয়া গেল। সোনা নাই ! বাঁচিয়া নাই ? মরিয়া গিয়াছে ? স্বর্গে গিয়াছে ! স্বর্গে গেলে মানুষ তো আর ফিরিয়া আসে না ! কিন্তু এত-ছোট, সে স্বর্গে গেল কেন ?

অসহ্য যাতনায় বুক তার ফাটিয়া গেল, দুই চোখ বহিয়া জলের ধারা নামিল। কাঁদিতে কাঁদিতে নিখিল বলিল,—কেন সোনা মরে গেল ? না, না, তুমি তাকে ডেকে দাও—আমি তার সঙ্গে খেলা কর্‌তে এসেছি যে !

সোনার মার হাতের বাঁধন ছিঁড়িয়া, বুক হইতে নামিয়া হাত-পা ছুড়িয়া পাগলের মত সে চীৎকার করিতে লাগিল,—সোনা, সোনা, আমি যে তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেচি ভাই। ওগো, দাওনা গো, তাকে ডেকে—এবার থেকে আমি রোজ-রোজ এসে তার সঙ্গে খেলা করবো ! সত্যি বল্‌চি গো। বাবা মেরে বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলেও আমি শুনবো না,—ওগো, দাও, তাকে ডেকে দাও—নাহলে আমি কেঁদে অনর্থ করবো, বাড়ী-ঘর সব ভেঙ্গে চুরমার করে ফেল্‌বো।

নিখিল হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্না শুনিয়া নন্দ ভিতরে আসিল, আসিয়া চোখে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখে কথাও ফুটিল না। সে থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুঁয়ে পড়িয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণের মতই নিখিল ছট্‌ফট করিতে লাগিল। সোনার মা তখন নিজের শোক ভুলিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া বুঝাইতে বসিল,—ছি বাবা ! শোনো বাবা, লক্ষীটি, অমন করে কি !

ছি, শোনো তোমার জন্যে সে একটী ছোট চুবড়ি ভরে মুড়কি-বাতাসা রেখেছিল—রোগে পড়ে কেবলি বলেছে, মা, রাজপুত্তুর এসে এই চুবড়ি করে মুড়কি-বাতাসা খাবে, বলেছে!—চুপ কর বাবা, কেঁদোনা। ছি-লক্ষ্মী মাণিক ছেলে, চুপ কর।

এ কথায় বালকের প্রাণ কি প্রবোধ মানে! সে উঠিয়া বসিল, বসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল! সোনা, সোনা, সোনা! নাই গো, সে নাই! হাজার ডাকিলেও সে আর নিখিলের সঙ্গে খেলিতে আসিবে না।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া নিখিল অবশেষে বলিল,—কৈ আমার জন্যে যে চুবড়ি করে সে মুড়কি-বাতাসা এনেছিল, দাও, ওগো সেটি দাও আমাকে।

সোনার মা সেল্‌ফ্ হইতে চুবড়ি পাড়িয়া দিল। নিখিল হাতে লইয়া দেখে, চুব্‌ড়িতে পাঁচখানি বাতাসা—পিঁপড়ায় দুই-একটা কুরিয়া খাইয়া ফোঁপরা করিয়া রাখিয়াছে। নিখিল বলিল,—এগুলো আমি নেব।

নিখিল একখানি বাতাসা মুখে পুরিয়া চুবড়ি হাতে লইয়া বলিল—আমি যাই, আবার কাল আসবো।

সোনার মা বলিল,—এসো বাবা, তাই এসো! তোমায় বুকে করে এ-জ্বালা তবু ভুলতে চেষ্টা করবো।

নিখিল বলিল,—আসবো মা।

মা! নিখিল মা বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিল!

আবেগে নিখিলকে বুকে করিয়া সোনার মা বলিল,—কি বল্‌লে বাবা?—মা! আবার বলো, আর একবার ডাকো আমায় মা বলে! আমার সোনা তোমার গলায় আবার আমায় ডাকবে। ডাকো, আর-একবার মা বলো—আমার শোক-তাপ জুড়িয়ে যাক!

নিখিল দুই হাতে সোনার মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, গাঢ় কম্পিত স্বরে ডাকিল—মা, মা—

—গোপাল আমার, বাছা আমার—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সোনার মা আঁচলে চোখের জল মুছিল—মুছিয়া নিখিলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল,—দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো, বাবা, আমার মাথার চুল যত, এমনি পরমায়ু হোক্! এর বাড়া আশীর্ব্বাদ সন্তান-হারা মা আর কি করবে?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

বাঙলা ভাষার বর্ণ

ভারতীর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে প্রস্তাব' পাঠ করিলাম। লেখক গৌর-চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন, 'সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই বিপদ।' আমাদের বক্তব্য, লেখক এই বিপদ ডাকিয়া না আনিলেই পারিতেন। তিনি এই বিধান দ্বারা ভাষার কোন একটা অভাব পূরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ; আর তাঁহার, 'মূনের' ব্যবস্থা মোটেই

তৃপ্তিকর হইবে না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বর্ণগুলিকে বাদ দিয়া তিনি যে উদ্ভটতার সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে বাংলা ভাষায় গোলমাল ভিন্ন উন্নতির কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। তিনি বাংলা ভাষার উন্নতি-কল্পে এই প্রস্তাব জন-সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

'সুন্দর-কুৎসিত তো মনের কাছে' লেখক মহাশয় এই উক্তির দ্বারা বিদ্রোহীর মাথায় শান্তি-জল ছিটাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু আমরা বলি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক কি? লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, 'বিদেশী শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাল।' বিদেশী শিক্ষার্থীর জন্য আমাদের ভাষাটাকে বিকৃত করিয়া কোন লাভ নাই। ইহাতে আমাদের অসুবিধা মোটেই কমিবে না—বরং আমাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে।

লেখক 'সংস্কার-বদ্ধ মনের' উপর আঁখিপাত করিয়াছেন, কিন্তু সংস্কারের বাঁধন হইতে কোন জাতি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে কিনা, জানি না। যদি লেখক মহাশয় কিছু নূতন সত্য দিতে পারিতেন, তবে সংস্কার-বদ্ধ মনকে ফিরাইতে পারা যাইত। কিন্তু তিনি নূতন কিছুই দেন নাই অথচ গোলমাল বাড়াইয়াছেন অনেক। জিনিষটার ভিতরে কিছু লোভনীয় না থাকিলে লোকে কেমন করিয়া সেইটার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিবে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কল্পনা-শক্তির আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু লিপিবদ্ধ করিবার আগে তাঁহার চিন্তা করা উচিত ছিল যে এই প্রস্তাব পেশ করিয়া তিনি ভাষার কি উন্নতি সাধন করিবেন। স্বরবর্ণগুলি বর্ত্তমান থাকাতে আমাদের অসুবিধাটা কি, লেখক মহাশয় তাহা দেখাইয়া দিলে ভাল করিতেন। 'বর্ণের বোঝা' কমাইয়া ভাষার ভিতর হঠাৎ অশান্তি আনিতে আমরা চাহি না। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া কিছু যদি নূতনের সন্ধান পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আদি কথা

সম্মুখেতে সীমহীন স্তব্ধ ধরাখানি,
তারি মাঝে বাণীহারা শুধু দুটি প্রাণী।
সীমাহীন প্রকৃতির নির্জ্জন নিলয়ে,
আদি নর-নারী শুধু কাঁপিছে বিস্ময়ে।

পরিপূর্ণ যৌবনের শতদল-দলে
নগ্না নারী দাঁড়াইয়া মৌন কুতূহলে।
কুতূহলী চিত্তখানি দুটি চক্ষে রাখি,
পুরুষ দাঁড়ায়ে স্থির নির্নিমেষ আঁখি!

দুটি মুগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্ম-কোষ টুটি
গান সে উঠিতে চাহে প্রাণ-সম ফুটি।
নিষ্ফল আবেগ শুধু গভীর হতাশা—
কোথা ভাষা—কোথা হায়, প্রকাশের ভাষা!

সহসা কণ্ঠের মাঝে একি গো বিস্ময়,
মানব মনের বাঞ্ছা তারি হ'ল জয়!
প্রথম উঠিল গাহি আদি নারী-নর,
জগতের আদি কথা "সুন্দর, সুন্দর"!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সমালোচনা

অযোধ্যার বেগম । নাটক। শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য দেড় টাকা।

"অযোধ্যার বেগম" এ দেশের একাধিক সহস্র রজনীর একটী রাত—তাহার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের একখানি পাতা। "অযোধ্যার বেগম"—নাটকখানির নাম কিন্তু ইহার গৌণ লক্ষ্য—বাংলার শেষ নবাব অতি-লোভী মীর কাশেম আলি খাঁর করুণ পরিণাম। ইতিহাসে কেবল বহিরঙ্গের বিকাশ, নাটকে অন্তরঙ্গের প্রকাশ। তরঙ্গে যেমন নদীর কূল ভাঙ্গে গড়ে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তেমনি ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটে। দৈব ও পুরুষকার মিলিয়া এই অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার সৃষ্টি করে এবং সেই বাহ্যসংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বিষম সমস্যায় পড়িয়া মানবের অন্তস্তলে ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের প্রধান চিত্র, এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে (Action & Nemesis) যে সম্বন্ধ আত্মগোপন করিয়া থাকে, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন নাট্যকবি সেই ছবি পরিস্ফুট করেন, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের পুষ্টি এবং রসের সৃষ্টি হয়।

নবাবী আমলের শেষভাগের বাংলা যেন শাক্ত-ভক্ত-গৃহে নবমী পূজার রুধির-কর্দ্দমাক্ত প্রাঙ্গন। দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষার বেদীতে মীরজাফর সিরাজকে বলি দিলেন। এই বলির পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন—মীর কাশেম। কিন্তু যাহাদের কুচক্রে এই দুষ্ক্রিয়া সাধিত হইল, তাহারাই আবার ষড়যন্ত্র করিয়া মীরজাফরের শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইয়া মীর কাশেমকে দিল। শ্বশুরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাশেম কিন্তু পাপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য অধিকাদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। ষড়যন্ত্র-কারীর দল আবার নবাব বদল করিবার জন্য অনর্থ বাধাইল। কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা দিয়া রক্তস্রোত বন্যার মত বহিয়া গেল। সারা বাংলার মাটী রাঙা হইয়া উঠিল। নবাব এ দৃশ্যের উপর চক্ষু মুদিলেন। কিন্তু মুদিলে কি হইবে? চোখ বুজিলেও যে দেখা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে নবাব সে দৃশ্য দেখিতেছেন—"বাঙ্গলার মাটী রাঙ্গা হয়েছে, পলাশীর প্রাঙ্গন রাঙ্গা হয়েছে, নবাবী তখ্‌ত্‌ রক্তের উপর ভাসছে।" [৫ অ—৭দৃ] মীর কাশেম অযোধ্যাভিমুখে পলাইয়া গেলেন। সেখানে দিল্লীর অস্তমিত সাম্রাজ্যের উজীর, অব্যবস্থিত-চিত্ত সুজার সঙ্গে সৌহৃদ্য-সূত্রে তাঁহার স্বার্থের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বনবাসী নবাব স্ত্রী-পুত্রসহ সুজার আশ্রিত হইলেন। এত হইয়া গেল, তবু সংযমে অনভ্যস্ত নবাবের দুর্দ্দমনীয় লোভপরতন্ত্র চিত্ত বুঝিল না যে, তাঁহার সিংহাসন-শীকার শেষ হইয়া গেছে। তিনি নিজেই এমন দৃঢ়পণ দুর্ভাগ্যব্যাধের শীকার হইয়াছেন, এবং সেই অলক্ষ্য শত্রুই তাঁহাকে সমধর্ম্মী আর-এক কাম-কাঞ্চন-শীকারীর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়াছে। মীর কাশেম সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। সিংহাসন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা চির-বিলুপ্ত হইল। অবশেষে জীবন সঙ্কট। প্রাণরক্ষা করিলেন রোহিলা-বীর ফয়জুল্লা।

নবাব সিংহাসন, স্ত্রী-পুত্র, সর্ব্বস্ব হারা। আঘাতের পর আঘাতে তাঁহার হৃদয় চূর্ণ। কোন আঘাতেই যা মরে না, সে আশাও আর নাই। কেবল দুরাশামাত্র সম্বল করিয়া মীরকাশেম রোহিলা গেলেন। কিন্তু অভাগা যেখানে যায়, স্বয়ং লক্ষ্মী সেখানে লক্ষ্মীছাড়া হন। হতভাগ্য মীরকাশেমকে আশ্রয় দিবার জন্য রুষ্ট গ্রহের ন্যায় সুজা চোখ রাঙ্গাইলেন। রোহিলা-রাজ্য তখন শান্তিময়, প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থিত। বিশেষ অযোধ্যারাজ্যের সঙ্গে রোহিলাদিগের একটা কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধও আছে। তাই রোহিলা-মন্ত্রণা-কক্ষে প্রবীণ ওমরাহ নিয়ামৎ ফয়জুল্লাকে তিরস্কার করিলেন—"তুমি বালকোচিত কাজ করেছ, রাজ-নীতিজ্ঞের মত কাজ করনি।" [২অ—১দৃ] বাস্তবিক রাজনীতি দিয়া ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাটী স্বতন্ত্র। যাহাতে সমষ্টির অনিষ্ট, তাহাতে ব্যষ্টির ধর্ম্ম

উপেক্ষণীয়। মহাকবি সেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকে এ সত্য বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ হাফেজ রাষ্ট্রের ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন—"কিন্তু রাজনীতির অপেক্ষাও আর একটা মহত্তর নীতি আছে—"[২অ—১দৃ] সেই মহত্তর নীতি অনুসারে হতভাগ্য মীর কাশেমকে আশ্রয় দিয়া রোহিলারাজ্য সমূলে ধ্বংস হইল।

কিন্তু অন্যায় করিয়া কেহ ত পার পায় না। সতীত্বাপহারী, সতীর অবমাননাকারী, পরধন-লুব্ধ, মিত্র, অতিথি ও আশ্রিতদ্রোহী সুজারও পাপের ফসল পাকিয়াছে, আহরণের দিন সন্নিকট। দণ্ড-বিধাত্রীরূপে জিঘাংসার বিষাক্ত ছুরি ধরিয়া আততায়ী নারী শোণিত-তৃষাতুরা সিংহীর ন্যায় শীকার অন্বেষণে তাঁহার পিছনে ফিরিতেছে। ধর্ম্মপ্রাণা, চিরহিতৈষিণী সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত সুজা আজ যে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়াছেন, সে জালে ধরা পড়িয়াছেন আপনি। তাঁহার শরীর-রক্ষার্থ চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরীর প্রাচীর। কিন্তু, হায়, ধর্ম্মের শর যে সপ্ততাল ভেদ করে! আততায়ী ছায়া তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিবার পূর্ব্বে গর্ব্বোল্লাসে বলিল, "আগুনের মধ্যে থাক, মনে করেছ গায়ে আঁচ লাগ্‌বে না? সাপ নিয়ে খেলা কর, মনে করেছ সে নির্ব্বিষ? তাও কি কখনো হয়?" [৩অ—৫দৃ] শ্রীরামচন্দ্রের চোরাবাণের ন্যায় ধর্ম্মের দণ্ড যে কখন কার উপর অলক্ষ্যে পতিত হয়, কেহ বলিতে পারে না। তাই সুজা অন্তিম সময়ে বলিতেছেন—"কবে কোথায় অজ্ঞাতে কি পাপ করেছিলেম—প্রায়শ্চিত্ত হ'ল তার কতদিন পরে!" [৪অ—৫দৃ] আবার আশ্চর্য্য এই, ভোগ যখন তৃপ্তির সীমা অতিক্রম করিয়া তিক্ত হইয়াছে, সুজা যখন রমণী-হৃদয়ের সুশীতল প্রেমাশ্রয় খুঁজিতেছেন, তাঁহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে বিধাতার বজ্রাঘাত!

এই ছায়া-চরিত্র ঐতিহাসিক নহে, নাট্যকারের সৃষ্টি। শীকারে গিয়া তৃষার্ত্ত সুজা হাত ধরিয়াছিলেন, তাহাতেই কুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে। তারপর—তারপর ছায়া ইহার নাম নয়—নাম দুলালী। কিন্তু —"হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে নাম অনেক দিন ডুবে গেছে—এখন তার ছায়া, প্রেতিনী।" [৪অ—২দৃ] খোর্দ্দমহলে সুজার বাঁদীদিগের নিকট ছায়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে—"হাত ধল্লে—বল্লে জাত গেল। গায়ে ফোস্কা হয় নি, তবু লোকে বল্লে দগদগে ঘা। বাপ তাড়িয়ে দিলে, মা চোখ মুছলে, দেশের লোক মুখ ফেরালে। যে হাত ধল্লে, তাকে কিন্তু কেউ কিছু বল্লে না। আমার জাতও গেল, ভাতও গেল।" [১অ—২দৃ]

"কিন্তু তাকে কেউ কিছু বল্লে না"—পুরুষের পাপে কেবল নারীই নিপীড়িত হয়। সকল দেশের সকল সমাজেরই বিচার এইরূপ—তখনও, এখনও। বিলাতের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হল্ কেন্ সমাজের এই অন্যায় আচরণের ভিত্তির উপর তাঁহার শেষ উপন্যাস (Master of Man) রচনা করিয়াছেন।

নাটকের মর্ম্ম আরম্ভেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। ডাকিনীত্রয়ের মন্ত্রণায় ম্যাক্‌বেথের সূচনা। প্রতিহিংসা-প্রয়াসী প্রেতাত্মার আবির্ভাবে হ্যাম্‌লেটের আরম্ভ। শকুন্তলার সূচনা—শীকারে—যে প্রেম-মৃগয়া নাটকের আখ্যান-বস্তু, তাহারাই পূর্ব্বাভাস। 'অযোধ্যার বেগম' নাটকের আরম্ভ—মৃগয়ায়। সমগ্র নাটকখানি একটী মৃগয়ার ক্ষেত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য—ব্যাধ, রিপুচালিত মানব—মৃগ। অতি লোভের উৎকট প্রয়াসে, হতাশে, হুতাশে, বিশ্বাস-ভঙ্গের বিজয় হর্ষে, রোষের নিস্ফল দন্তঘর্ষে, জিঘাংসার পৈশাচিক উল্লাসে শোকের হৃদিভেদী উচ্ছ্বাসে এই দৃশ্যকাব্যের আকাশ আচ্ছন্ন, বাতাস ভারাক্রান্ত। ইহার তলে কালীঢালা, উপরে মেঘমালা, মাঝে মাঝে বাতুলতার বিদ্যুচ্চমক, সর্ব্বোপরি বিধাতার উদ্যত বজ্র।

এই ঝঞ্ঝা-সংক্ষুব্ধ সাগরে আলোকাগারের (Light-house) স্থির জ্যোতির ন্যায় অযোধ্যার বউ বেগমের উজ্জ্বল মূর্ত্তি বিপন্ন পোতকে যেন নিরাপদ বন্দর প্রদর্শন করে। প্রথম অবির্ভাবেই ইনি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—"বাল্যকালের স্মৃতি, যৌবনের অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিখিয়েছে—সম্রাট বা নবাব-মহিষীরা সুখ-দুঃখের অতীত, এদের সুখও নেই দুঃখও নেই। * * * নিজের বলে এদের কোন জিনিষ নেই।

স্বামী নিজের নয়, ছেলে নিজের নয়, আত্মীয়-স্বজন নিজের নয়, সত্য কথা বলে—এমন সখী কেউ নেই, সিংহাসন চিরস্থায়ী নয়!—এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবার একটী জিনিষ আছে বোন্, সে ধর্ম।" [১অ—৩দৃ] এই ভিত্তির উপর এই চরিত্রের স্থিতি। সে রমণী সুজার ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত স্বেচ্ছাচারী স্বামীকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন—"এ নিমিত্ত যদি আমাকে তোমার বিরাগভাজন হতে হয়, সে বিরাগ আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতই মাথা পেতে নেব, তবু আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্যপথ থেকে কখনও বিচলিত হব না"—[৩অ—৫দৃ]—সে চরিত্রের ক্ষয় নাই, পুষ্টি নাই, আছে কেবল বিকাশ। তাহারই পূর্ণতা আমরা দেখিতে পাই, সুজার মৃত্যুকক্ষে। সপত্নী-পুত্রকে সিংহাসন দিবার জন্য স্বামীকে ব্যর্থ অনুরোধ করিয়া বেগম স্বীয় পুত্রকে বলিলেন—"পুত্র, অনন্ত-পথ-যাত্রী তোমার ঐ পিতার সম্মুখে আমি তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাচ্ছি। * * * তুমি এ সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ কর।" [৪অ—৫দৃ] লোক-কল্যাণময়ী এই নারী-চরিত্রে কোথাও আবিলতা বা চাঞ্চল্য নাই। পর্ব্বতবক্ষে শরাঘাত করিলে বাণ যেমন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে, এই মহিমময়ী নারীকে তেমনি কোন আঘাতই লাগে না। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ইনি যেমন গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা, পুত্র কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও আশ্রয়-বিহীনা বেগম পথের ধূলায়ও তেমনি আত্ম-মহিমায় অবস্থিতা—ইঁহার পদযুগল অহিফেন-রুধিরাক্ত ধরণীর উপর, কিন্তু ধর্ম্মের অক্ষয় মুকুট-মণ্ডিত ইঁহার মস্তক খোদার চরণপ্রান্তে লীন!

এই নাটকে আমরা দেখিতে পাই যে, পাপ আপনার অন্তর্দ্দাহে আপনি দগ্ধ হয়, পুণ্যের দুর্লভ পুরস্কার চিত্ত-প্রসাদ। আর দেখিতে পাই, আশা নিরাশা সকল অবস্থার বিপর্য্যয়ে ভালবাসার গতি অব্যাহত। কিন্তু তাহার মিলন-ভূমি মৃত্যুর উর্দ্ধক্ষেত্র শ্মশানে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

পাখীর কথা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক; তবে পাখীর কথা তাঁহার খুব ভাল লাগে বলিয়া তিনি এ সম্বন্ধে যে বহু গ্রন্থ পাঠ ও বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতেই পাখীর সম্বন্ধে নানা কথা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পাখীদের আদি-পুরুষের আলোচনা হইতে সুরু করিয়া তাহাদের Specialisation, পালকের কারণ, গঠন, শ্রেণী-বিভাগ—নখর, চঞ্চু, বেশভূষা প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপারের বিশেষত্ব ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি—এত জ্ঞাতব্য কথা এমন সরসভাবে এই গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে বইখানি উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর পাখী, তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনের কথা, ডিম, ছানার কথা—কোন কথাই লেখক বাদ দেন্ নাই। রচনার গুণে বইখানি ছেলে-বুড়া সকলেরই চমৎকার লাগিবে। নানা গুণের মধ্যে একটি ত্রুটি চোখে পড়িল, বইখানিতে ছবি নাই। নানারকমের পাখীর কয়েকখানা ছবি দিলে বইখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এ ত্রুটিটুকু সংশোধিত হইবে।

ব্যক্তি ও সমাজ। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বি, এ প্রণীত। বিশ্বকুটীর, চন্দননগর। কলিকাতা সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক আমাদের বর্ত্তমান সমাজের কয়েকটি সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। এই কয়টি সন্দর্ভ এ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে,—(১) ব্যক্তি—স্বামী ও স্ত্রী। (২) সমাজ ও ব্যক্তি। (৩) যুগধর্ম্ম। (৪) ভারত সমাজের প্রকৃতি। (৫) বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রকৃতি। (৬) যুগধর্ম্মের অনুষ্ঠান। (৭) কর্ত্তব্য ও তাহার স্তরভেদ। (৮) আচার। (৯) স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র। (১০) সহধর্ম্মিণীর আদর্শ। সন্দর্ভগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে কাজের কথা প্রচুর আছে। 'আচার' সন্দর্ভে ঘরোয়া নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া লেখক

বুঝাইয়াছেন,—সমাজ দাঁড়াইয়া নাই, আচারও অপরিবর্তিত নাই—এই পরিবর্ত্তনই সমাজের জীবনের সূচনা করে। এই পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করিতে যাওয়া আর নিজেকে অন্ধ বলিয়া প্রচার করা একই কথা। সহধর্ম্মিণীর আদর্শ—সন্দর্ভে লেখক একটা কথা ঠিকই বলিয়াছেন, আজকাল কনে-বৌয়ের দিন গিয়াছে। 'স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র' লেখক যেটুকু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেটুকু সঙ্কীর্ণ বলিয়া আমাদের মনে হয়—সে ক্ষেত্র আমরা আরো বাড়াইয়া দিতে চাই। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সমাজহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তার বহু খোরাক যোগাইবে।

স্মৃতি-মন্দির। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। বিউটী প্রেস ও দেবকীনন্দন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। কুলি-পল্লীর চিত্রটুকুই ইহার যা' একমাত্র বৈচিত্র্য—তাছাড়া প্লট একটা আজগুবি অসম্ভব রকমের সামান্য চিঠির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে ভিত্তিটুকু নেহাৎ ভঙ্গুর—তাহার উপর চরিত্র গড়া বা ঘটনা-সৃষ্টি চলে না। উপন্যাসের রাজ্যে Psychologyর প্লাবন আসিয়াছে—এখন এ-সব আজগুবি প্লট লইয়া মামুলি ছাঁদে বিনাইয়া-বিনাইয়া মরা আদর্শ-রচনা চলিবে না, জীবন্ত গোটা মানুষ চাই।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ৪।এ মোহনলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এ বইখানির পরিচয় লইতে গেলে ভূমিকাটুকু ভালো করিয়া পড়া দরকার—সেটুকু এই গ্রন্থের Key—'ব্যাখ্যা পুস্তক'। লর্ড কার্জ্জনের ভারত-শাসনের শেষে বাঙ্‌লায় বিপ্লব-বাদের যে উত্তেজনা-স্রোত বহিয়াছিল; তাহাই আধার-বিশেষে ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিণত হইয়া বিপ্লব-কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল—সেইসময় মানিকতলার বাগানে বোমার ব্যাপার লইয়া দেশের যে কয়টি সন্তান আদালতের বিচারে 'দ্বীপান্তরিত' হইয়া ছিলেন, সেদিনের ইতিহাস বাঙলার এক স্মরণীয় পৃষ্ঠা,—সখ করিয়া কেহ আপনার কাঁচা মাথা লুটাইয়া দিতে যায় নাই—! সেই অতীত দিনের ইতিহাসটুকু দেশে ফিরিয়া গ্রন্থকার এই নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখকের রচনা এমন সরস, হাত এতই মিঠা যে আমরা এ গ্রন্থখানি একাসনে বসিয়া এক-নিশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিয়াছি। রচনার কোথাও এতটুকু অত্যুক্তি বা উগ্র উচ্ছ্বাস নাই, কোনরূপ বাগাড়ম্বর নাই, আপনাকে বড় করিয়া ধরিবার দুশ্চেষ্টাও কোথাও নাই—রচনা যেমন সরল, বর্ণনার ভঙ্গীও তেমনি সতেজ, মর্ম্মস্পর্শী ও মনোজ্ঞ। বাঙালীর স্বরাজ-লাভের ইতিহাসে, বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই নির্ব্বাসিতের কাহিনী অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিবে। বইখানির ছাপা-কাগজ চমৎকার—সবই ভালো, তবে একটু সংক্ষিপ্ত, এই যা' দুঃখ।

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ রাজকর্ম্মে ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেশন জজ ছিলেন; কিন্তু ইহাই তাঁহার পরিচয় নয়। তিনি ধর্ম্মে ও জ্ঞানে একজন বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। এই ক্ষুদ্র জীবন-বৃত্তান্তে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বটুকু লেখক সহজ ভাষায় উপাদেয় ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্রও সংগৃহীত হইয়াছে।

ভাগ্যলেখা বা লালা গোলকচাঁদ। (প্রথম খণ্ড) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু (ভিখারী নিরানন্দ) প্রণীত ও প্রকাশিত। এমারেল্ড ও ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত নাটকের উপন্যাসাকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রিণ্টার্স, দি ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড ৪০, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মূল্য প্রতিখণ্ড আট আনা।

কৃষ্ণ কথা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ প্রণীত। কলিকাতা, মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত।

এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ময়মনসিংহ, লিপি প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীকেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে কার্পাসের চাষের কথা মোটামুটি বর্ণনা করিয়া, কার্পাসের চাষে কোন্ দিকে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, কোথায় বাধা-বিঘ্নের আশঙ্কা—এই সব কথার আলোচনা করিয়া লেখক চরকার উপযোগিতা ও প্রচলন সম্বন্ধে সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বরাজ ও খলিফৎ। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। গোবর্দ্ধন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। বহু বৎসরের ঘটনা-পরম্পরায় দেশের এখন যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়া লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমগ্র ভারতবাসীকে মানুষ হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ দুর্দ্দিনে মানুষ হইতে হইলে কুলি-মজুর চাষা প্রভৃতি দেশবাসীকে লইয়া হিন্দু-মুসলমানকে একতায় বদ্ধ হইতে হইবে, হিন্দু মুসলমানকে পরস্পরের সহিত মিলিবার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—এবং স্বরাজ লাভ লক্ষ্য করিয়া মহাত্মার উপদেশ-মত আমাদের সকলকে চলিতে হইবে।

লেনিন। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ঘোষ মেশিন প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বোলশেভিক্ নেতা লেনিনের জীবন-কথা, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব এবং কার্য্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সারা বিশ্বেই মানুষ মাত্রেরই আজ মানুষ হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা চলিয়াছে। সমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার হীনতা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ-সাধন, —বিশেষতঃ দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচন ও যথেচ্ছাচারী প্রভুত্বের মূলচ্ছেদ—ইহাই হইল মনুষ্যত্ব-লাভের পথে সাধনার মন্ত্র। লেখক একটি পরিচ্ছেদে মহাত্মা গান্ধি ও লেনিনের মতের তুলনা করিয়াছেন—সেটুকু বিশেষ করিয়া অনুশীলন-যোগ্য।

প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এ গ্রন্থে ফাগুন লেগেছে বনে বনে, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাসলীলা, নারায়ণের ডিগবাজি, উন্নতি কিসে, আধ্যাত্মিকতা বনাম কর্ম্ম এই কয়টি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত।

পাল্টা কথা। যুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা। এখানিও সন্দর্ভ-সংগ্রহ; ইহাতে এই কয়টি সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে,—আধ্যাত্মিক হুক্কাহুয়া, ইংরেজীর বদহজম, সমাজের টোপাপানা, ভিতরের গোলামি, আমাদের স্বদেশ, বাঙালী, ব্যবসাদারী, ও গোলামখানার শিক্ষা। প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতার ছাপ আছে—তবে সেগুলি একটু সংক্ষিপ্ত। লেখকের দেশের কথা ভাবিবার মন আছে, শক্তি আছে; এবং তাঁহার কথা শুনিবার যোগ্য।

উল্টো কথা। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য, আর্টের সমজদারী, আর্ট ও জীবন, হাল্‌কা সাহিত্য, মরণ-লীলা, কাব্যে একটি নূতন সুর, বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী, সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন, বাঙালীর আর্য্যামি, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের স্থান, ভারতের সাধারণ ভাষা এবং বিশ্বের দরবারে ভারত—এই বারোটি সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। এই বইখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য, আর্টের সমজদারি আর্ট ও জীবন, বাঙালীর আর্য্যামি এবং বিশ্বের দরবারে ভারত—এই কয়টি প্রবন্ধ-পাঠে লেখকের চিন্তাশীলতার যেমন পরিচয় পাইয়াছি, তেমনি বুঝিয়াছি, লেখক সাহিত্য ও আর্টের একজন বিচক্ষণ সমজদার। বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের ছবি ফোটেনা বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ করিয়াছেন, সে আক্ষেপের

সন্দর্ভে লেখক খুব একটি খাঁটি কথা বলিয়াছেন,—আর্টের সমজদারি শেখার বিষয়। কাব্য বুঝিতে হইলে মনকে শিখাইতে হইবে, গান শুনিতে হইলে কানকে তৈয়ারী করিতে হইবে। চিত্র বুঝিতে হইলে চোখকে ঠিক ঠিক দেখাইতে হইবে,—তবে সমজদারি সম্পূর্ণ হইবে। শুধু কতকগুলি পোষা ধারণায় মনকে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সন্দর্ভগুলির রচনায় লেখকের ভঙ্গীটুকুও বেশ উপভোগ্য। বাজে আগাছার কথার ভারে বক্তব্য কোথাও ভারী বোঝা হয় নাই—বলিবার কথাটুকু বেশ সরল সহজ ও হৃদয়গ্রাহীভাবেই তিনি বলিয়া গিয়াছেন—এইটুকুই এ সন্দর্ভ-গ্রন্থখানির মনোরম বিশেষত্ব।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

নবীনের নিবেদন

(প্রবীণের প্রতি)

প্রবীণ তুমি প্রণম্য গো, বয়স তোমার অনেক বড়,
ভাল-মন্দ অভিজ্ঞতা অনেক তোমার আছে জড়,
অনেক বৃষ্টি, অনেক তুফান, তোমার পরে গেছে ব'য়ে
অনেক বিসদৃশ ব্যাপার চোখে তোমার গেছে সয়ে।
দেখেছ গো অনেক তুমি, শুনেছ গো অনেক-আরও,
এই পৃথিবীর প্রাচীন কথা অনেক তুমি বল্‌তে পারো।
এই পৃথিবীর বর্ষা-শরৎ সবই যদি আছে জানা
তবে কেন চোখ রাঙিয়ে করতে আমোদের মানা ?
তুমি যখন নবীন ছিলে (সত্য যুগের সকাল বেলা !)
মলয় এসে ফুলের বনে করত নাকি এমনি খেলা ?
শরৎ-কালে এমনি শশী উঠ্‌ত নাকি তোমার নভে ?
পাহাড়-কেটে নির্ঝরিণী ছুট্‌ত নাকি ছন্দ রবে ?
চিরকালই তুমি কি গো বৃদ্ধ ছিলে এমনি ধারা ?
এমনি নীরস, এমনি কঠিন, এমনি বিরসতায় ভরা !
কমল ফুলের কোমল শোভা কক্‌খনো কি তোমার মনে,
কোন মুখের স্মৃতির ছবি জাগায় নি কি সঙ্গোপনে ?
বাজ্‌লে পরে দূরের বাঁশী জ্যোৎস্নাময়ী গহন রাতে
মনের বাঁশী ব্যাকুল হ'য়ে বাজ্‌ত নাকি তাহার সাথে ?
আস্‌লে পরে গগন ছেয়ে সজল কালো ভরা ভাদর,
হৃদয় তোমার চাইত নাকি গোপন কারও সোহাগ-আদর ?
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-রাধা
চিরকাল কি তোমার কাছে আধ্যাত্মিক-সুরেই বাঁধা ?
এ-সব কথা ভেবে দেখো ওগো প্রবীণ পূজনীয়,
তার পরেতে পারো যদি উপদেশের পড়া দিয়ো !

"বনফুল"

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



কর্ণ প্রতি কহে কুন্তী গদ-গদ বচন।
সূর্য্য-বরে তুমি বৎস, আমার নন্দন॥ —মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৮ [দ্বাদশ সংখ্যা

আবেস্তা সাহিত্য

অতঃপর ইঁহাদিগের দেবতা ও অপদেবতার কথা। জরথুস্ত্র অতি প্রাচীনকালেই দেখিয়াছিলেন যে আবহমান কাল হইতেই মানব প্রকৃতিতে দুইটী তত্ত্ব লীলাবিকাশ করিয়া আসিতেছে—একটী 'কু' ও অপরটী 'সু'। কোনও একটী কাজ করিতে গেলেই মানব-মনে এই দুই তত্ত্বে বিবাদ বাধিয়া যায়। 'কু' যদি বলে—'কর', 'সু' বলে—'না, না; বিপদ আছে।' অবশেষে এই উভয়ের বিবাদে যে জয়ী হয়, তাহারই আদেশানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। তবে 'সু'র পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে অবশেষে কুফল অবশ্যম্ভাবী। এই 'কু' ও 'সু'-র দ্বৈতবাদ লইয়াই জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্ম। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মে মানব-মনের প্রকৃতির অনুরূপ স্বর্গরাজ্যের অলৌকিক অধিবাসিগণেরও প্রকৃতি। আধ্যাত্মিক জগতেও এই 'সু' ও 'কু'। এখানেও আমাদের দেবতা ও অপদেবতার অনুরূপ 'বোহু মইন্যু' ও 'অংগ্র মইন্যু' গণের প্রতিষ্ঠা। 'বোহু' শব্দের অর্থ 'সু', এবং 'অংগ্র' শব্দের অর্থ 'কু'। 'অংগ্র মৈন্যু'গণ 'বোহু-মৈন্যু'গণের শত্রু। সুতরাং অধ্যাত্ম-জগতেও দ্বিবিধ জাতির সত্তা। 'বোহু মৈন্যু' গণের শ্রেষ্ঠ 'অহুরো মজ্‌দা' এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে 'কু'র প্রভাবে 'সু' পরাভূত হইলেও পরিণামে 'সু'র জয় ও 'কু'র পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই সৃষ্টিকর্তা অহুরো মজ্‌দা উপাস্য। কিন্তু 'অংগ্র মৈন্যু' ও 'দএব' নামে বিদিত তাঁহার অনুচর-বর্গ ভীতির কারণ হইলেও উপাস্য নহেন।—অহুরো মজ্‌দার সভায় ছয়জন অমাত্য, ইঁহাদিগকে 'অমেষ স্পেন্ত' অর্থাৎ সদাচারী অমরবৃন্দ বলা হয়। সুতরাং পরলোকের প্রধান নিয়ন্তা অহুরো মজ্‌দার সভা নিম্নরূপঃ—

অহুরো মজ্‌দা

(১) বোহুমনো
(২) অষ বহিশ্‌ত
(৩) খ্‌ষথ্রো বৈর্যো
(৪) স্পেন্তা আরমইতী
(৫) হউর্‌বতা
(৬) অমেরেতা
[(৭) শ্রওষা]

(১) 'বোহুমনো' শব্দের অর্থ 'ভাল মন'। বিবেক, সৎপ্রবৃত্তি বা ধর্ম্মবুদ্ধির মূর্ত্তি-কল্পনা বা personificationএ হইয়াছে বোহুমনো। পরে 'করুণা' বা 'পরোপকার প্রবৃত্তি'ই ইহার ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। অবশেষে পশুর প্রতি করুণা ইহার ধর্ম্ম হওয়ায় ইনি পশুপালনের দেবতা হইয়াছেন। আধুনিক ভাষায় ইনি 'বহমন'।

(২) 'অষ বহিষ্‌ত' শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ সত্য' বা 'অতি মঙ্গল-ময় তত্ত্ব'। সংস্কৃত 'ঋত', ইংরাজী 'right' ও আবেস্তার 'অষ' এক। বহিষ্‌ত শব্দ বোহু (মঙ্গল, 'সু') শব্দের উত্তর ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। ইনি পবিত্রতা বা মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। 'আগ্ন' যখন জরথুষ্‌ত্রীয়গণের পবিত্রতার চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইলেন, তখন হইতে ইনি অগ্নিদেব। ইনি অহুরো মজ্‌দার প্রধান মন্ত্রী এবং স্বর্গরাজ্যের তালা-চাবি ইহার জিম্বায়।

(৩) 'খ্‌ষথ্র বৈর্য' শব্দে 'শ্রেষ্ঠ রাজত্ব' বুঝায়। 'খ্‌ষথ্র' (সং ক্ষত্র) শব্দে রাজত্ব। বৈর্য = বর্য্য,বরণীয়, শ্রেষ্ঠ। ইহার অন্যনাম 'বোহু খ্‌ষথ্র' আধুনিক নাম 'শহরিয়র'। ইনি অহুরো মজ্‌দার সুশাসনের প্রতিমূর্ত্তি। 'কু'র বিনাশের জন্যই এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। অবশেষে খ্‌ষথ্রো বৈর্যো ধাতুজগতের (minerals) অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জরথুষ্‌ত্রীয়গণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ জাতির মধ্যে কোনও অনৈক্য বা বৈষম্য নাই। ইহাদের সমাজে পুরুষের যতখানি অধিকার, স্ত্রীলোকেরও তাহাই। সুতরাং অহুরোমজ্‌দার পরিষদে তিনজন পুংদেবতা থাকিলে তিনজন স্ত্রী দেবতাও আবশ্যক। নতুবা ভোটের কম-বেশ হইবে যে! তাই অমেষ-স্পেন্ত গণের প্রথম তিনজন পুরুষ ও শেষের তিনজন স্ত্রীদেবতা।*

(৪) 'স্পেন্ত আরমৈতী' (আধুনিক স্পেন্দার্মদ) শব্দে শান্তি বা সুশৃঙ্খলা বুঝায়। ইনি পৃথিবী ও স্ত্রীজাতির অধিষ্ঠাত্রীদেবী। ইনি আমাদের লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধারে।

(৫) হৌর্বতাৎ (আধুনিক খুর্দাদ) সম্পূর্ণতা বা Salvation এর বাচক। ইনি জলদেবী, স্বাস্থ্য-বিধাত্রী। আমাদের সর্ব্বমঙ্গলা-স্থানীয়া।

(৬) 'অমেরেতাৎ' (আধুনিক অমের্দাদ) অমরতা বা immortalityর বাচক। প্রথমে দীর্ঘজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী থাকিয়া অবশেষে বৃক্ষদেবতা হইয়াছেন। বোধ হয় উদ্ভিদের রোগনাশক শক্তিই ইহার কারণ। শেষোক্ত এই উভয় দেবীর নাম প্রায়ই একত্র ব্যবহৃত হয়। ইহারা উভয়ে স্বাস্থ্য-সলিল ও আয়ু-বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী।

জরথুষ্‌ত্রীয় ধর্ম্মে 'শ্রওষা' (শুশ্রূষা বা সেবা) অমেষ স্পেন্তগণের মধ্যে না হইলেও অর্বাচীন যুগে ইহার আসন অতি উচ্চে, এবং ছয়জন অমেষ-স্পেন্তের নামের সহিত ইহার নাম জুড়িয়া সাত সংখ্যা পূর্ণ করা হয়। ইহার কার্য্য সর্ব্বত্র চৌকি দেওয়া। ইনি পাপ-পুণ্যের প্রত্যক্ষদর্শী এবং মৃত্যুর পর ইহার সাক্ষ্যেই পরলোকগত আত্মার পাপ-পুণ্যের বিচারকালে ইনি অমেষ স্পেন্তগণের সহিত বিচারাসনে উপবিষ্ট হন। আধুনিক ভাষায় ইনি অহুরো

* মূলতঃ প্রথম তিনটী নাম নপুংসক-লিঙ্গ ছিল পরে পুংলিঙ্গ হইয়াছে।

মজ্‌দার Police Commissioner. পার্সীদিগের মৃত্যুর পর তিনদিন যাবৎ এই শ্রওষার গান (যশ্ন ৪৭) গীত হয়।

'কু'-রাজ্যের অধীশ্বর 'দ্রুজ্‌' বা 'অংগ্রো মৈন্যু'। অহুরোমজ্‌দার ন্যায় ইঁহারও সপ্ত অমাত্য—১। অকমনো, ২। ইন্দ্র, ৩। শৌর্ব, ৪। তরো-মৈতী, ৫। তৌরু, ৬। জৈরিচা, ৭। অএস্মা।

'অকমনো' বোহুমনো'র প্রতিদ্বন্দ্বী। অকমনো = কুমন। তরোমৈতী = ঔদ্ধত্য। অএস্মা = ক্রোধ। সয়তানের এই সকল অমাত্য অহুরোমজ্‌দার অমাত্যগণের শত্রু স্থানীয়।

আবেস্তা সাহিত্য ও জরথুব্‌ত্রীয় ধর্ম্মপদ্ধতি হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে আমাদের ঋগ্বেদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ও আবেস্তা-ধর্ম্মিগণের মধ্যে এককালে ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া ভয়ঙ্কর বিবাদ বাধিয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের অসুর তাঁহাদের 'অহুর' অর্থাৎ দেবতা, এবং আমাদের দেব তাঁহাদের 'দএব' অর্থাৎ অপদেবতা হইয়াছেন। দেব শব্দ যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেবতা-বাচী ছিল তাহা লাটিন, গ্রীক ও অন্যান্য ভাষার সাক্ষ্য হইতেই বুঝা যায়, যেমন ইংরাজী deity, কিন্তু অসুর শব্দের 'দৈত্য' অর্থ প্রাচীন নহে। অসু শব্দের অর্থ প্রাণ, জীবন, বল। অস্ত্যর্থ র-কারের যোগে অসুর শব্দের অর্থ 'বলবান্‌' হইতে পারে। দৈত্যগণের অদ্ভুত বল বা প্রভূত পরাক্রম বলিয়া পরে 'অসুর' দৈত্যবাচক হইতে পারে। কিন্তু আমাদের 'সুর' শব্দটীর সত্তা কোথায় ? অসুর শব্দের অকারকে নঞর্থক কল্পনা করিয়া পরে তাহার লোপে সুর শব্দ যখন গড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তখন ইরাণ ও ভারতে বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। আমাদের আরও অনেক দেব-দেবী ইরাণীয়গণের নিকট দানব দানবী হইয়াছেন। সুতরাং এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদকারী কলহের কারণ ধর্ম্ম-চিন্তায় মতভেদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে অন্য কোনও কারণ যে ছিল না তাহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে ?

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ইঁহারাও সোমপায়ী ও হওম-উপাসক। আমাদিগের ন্যায় ইঁহাদিগেরও ত্রিবিধ দ্বিজ ও এক শূদ্র ভেদে চারি বর্ণ—আথ্‌ব (অগ্নি-উপাসক, পুরোহিত), 'রথএব্‌ত্রা' রথী বা ক্ষত্র-ধর্ম্মী ও বাশ্‌ত্র্য (বা কৃষিজীবী) এই তিন বর্ণ দ্বিজ। এবং হুইতয়্‌ বা কারিগর চতুর্থ বর্ণ। আমাদের ন্যায় ইঁহাদেরও ধরিত্রী হপ্তো-কর্ষরী বা সপ্তদ্বীপা। ইঁহাদের এই সাত কর্ষরের অবস্থানেও অনেক ভাবিবার উপাদান আছে। ইঁহাদের পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ কর্ষর (বা দেশ) 'খ্‌ব্‌নিরথ'। এইটীই হপ্তথ বা সপ্তম কর্ষর। ইহারই মধ্যে হরবরেজৈতি বা মেরু পর্ব্বত। আবার এইখানেই 'ঐর্য্যনো বএজো' বা 'প্রস্তোকস্‌' অবস্থিত। পূর্ব্বে 'সবহী' বা পূর্ব্ব দেশ। পশ্চিমে 'অরেজহী' বা পশ্চিম দেশ। এই উভয় দেশের নাম একত্র করিয়া দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়। 'সবহী'র অর্থ আলোর দেশ, আর অরেজহীর অর্থ 'আঁধারের দেশ'। পূর্ব্বদিকে আলোকের উৎপত্তি বটে, কিন্তু পশ্চিমে অন্ধকারের উৎপত্তি ত বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ পিতৃ-পিতামহের বাস ছিল বলিয়াই পূর্ব্বদেশ 'আলোর দেশ'। দক্ষিণে 'ফ্রাদৎফ্‌সু' অর্থাৎ 'পশু (গরু) যেখানে পাওয়া যায় এমন দেশ,' এবং'বীদৎফ্‌সু' অর্থাৎ 'যে দেশে পশু আছে'। উত্তরে 'বৌরুবরেষ্‌তি' ও 'বৌরু-

জরেথ্‌তি' অর্থাৎ যেদেশে পর্ব্বত আছে। অন্য কথায় ইঁহাদের পূর্ব্বে আলোক, পশ্চিমে অন্ধকার, দক্ষিণে পশু ও উত্তরে পর্ব্বত ছিল। ইহার কি কোনও রূপক অর্থ বা metaphorical meaning নাই? আমাদের দক্ষিণের লঙ্কাদ্বীপ যেমন রাক্ষস-রাজ দশাননের রাজত্ব, ইঁহাদের উত্তর-পশ্চিমের 'মাজনা' দেশও সেইরূপ রাক্ষসদিগের রাজত্ব। আমাদের ন্যায় ইঁহারাও কৃষিকর্ম্ম ও গোসেবায় অনুরক্ত। ইঁহাদের গোদেবতা 'গেউষ্‌ উর্বান্‌'। বৈবস্বত যম ও বৈবস্বতী যমী যেমন আমাদের আদি মানব—মানবী, 'যিমো বিবংহৎ' সেইরূপ ইঁহাদেরও আদিপুরুষ।

আবার সব-চেয়ে বেশী সাম্য ভাষায়। সংস্কৃত ও আবেস্তা ভাষা অভিন্ন বলিলেই হয়। আবেস্তার বর্ণমালায় ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ল ও স নাই। ঋ, ৯, ঐ, ঔ নাই। অবশিষ্ট সংস্কৃত বর্ণমালা আবেস্তায় আছে। বর্ণ বিনিময় প্রণালী নিম্নরূপ।

অ, ই, উ, বা আ, ঈ, ঊ, সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষায় অভিন্ন; তবে কথনও কখনও হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘতা ও দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতা হয়।

সং—তনু; তনু—দারু—বাহু—
আং—তনু—দাউরু—বাজু
দ্বারম্‌—অথর্বা—সম—বিশ্ব—শ্রুত
দ্বরেম্‌—আথ্রবন্‌—হম—বীশ্‌প—শ্রুত
সং অনীক—যুক্ত—উপরি—
আং অইনিক—যুখ্‌ত—উপইরি
ইষু—ইষ্টি—মিত্র—পুত্র—প্রীত
ইষু—ইষ্‌তি—মিথ্র—পুথ্র—ফ্রীত

সংস্কৃত ঋকার স্থানে আবেস্তায় 'এরে', 'অরে'; এবং ঋ বা ইর, উর, স্থানে র, অরে, এরে, অইর্‌, অউর্‌, হয়।

সং—কৃণোতি—মৃত্যু—সকৃৎ—
আং—কেরেনোইতি—মেরেথ্যু—হকেরেৎ—
অনৃতৈঃ—বৃক্ষম্‌—ঋষ্টি (বর্শা)
অনরেতাইষ্‌—বরেষেম্‌—অরশ্‌তি
সং—হিরণ্যস্য—গিরিঃ—দীর্ঘম্‌—
আং—জরন্যেহে—গইরিষ্‌—দরেঘেম্‌—
রজতম্‌—ঋতুম্‌—কৃত—মৃত।
এরেজতেম্‌—রতূম্‌—কেরেত—মেরেত।

সংস্কৃত এ—ও — ঐ — ঔ
আবেস্তা অএ, ওই—অও, এউ—আই—আউ

সং—এতৎ—বেদ—
আং—অএতৎ—বএদ (জানে)—
প্রেষয়তি—বেথ—শেরে
ফ্রএ ষ্যো ইতি—বোইষ্‌ত (জান)—শোইরে (তাহারা শয়ন করে)
সং—যে—কে—তে—
আং—যোই (যাহারা)—কোই—তোই—
মে—দেব—দেবী—ওজঃ—প্রোক্তঃ
মোই—দএব (দৈত্য)—দএবী (দানবী)—অওজো—ফ্রওখ্‌তো
সং ক্রতোঃ (ষষ্ঠী ১ব)—মন্যোঃ—
আং খ্রতেউষ্‌ (জ্ঞানের)—মইন্যেউষ্‌—
মন্ত্রৈঃ—গোঃ (১মা ১ব)—সোম—
মন্থ্রাইয়্‌—গাউষ্‌ (গরু)—হওম

সং ক চ ত প—আবেস্তা ক চ ত প।

সং কতরঃ—তাপয়তি—পতন্তি—
আঃ কতরো—তাপয়েইতি—পতেন্তি—
চরতি—পশ্চ (পশ্চাৎ, বৈদিক)
চরইতি—পশ্চ॥—

সংস্কৃত খ থ ফ—আবেস্তা খ থ ফ

সং খরম্ (গর্দ্দভ)—সখা—গাথা—
আং খরেম্—হখা—গাথা—
শফাসঃ (খুর)—প্র—তর্পিত
শফাওঙ্হো—ফ্র—থ্রংফেধ
সং ক, ত, প—আং, খ, থ, ফ।
সং ক্রতুঃ—ক্ষত্রম্—সত্যঃ—
আঃ খ্রতুষ্—খ্ষথ্রেম্—হইথ্যো—
প্র—প্রোক্তঃ
ফ্রা—ফ্রওখ্তো
সং গ, দ, ব, জ—আং গ, দ, ব, জ; সং গ, দ, ব—আং ঘ, ধ, ভ; সং ঘ, ধ, ভ,—আং ঘ, ধ, ভ।
সং গাম্ (গো, ২য়া ১ব)—দূরাৎ—গ্রীবা—
আং গাঁম্—দূরাৎ—গ্রীবা—
বর্হিষ্ঠ—জ্যা—জঙ্ঘাম্—ধারয়ৎ
বরেজিশ্তো—জ্যাও—জঙ্গেম্
(leg ২য়া ১ব)—দারয়ৎ
সং ভ্রাতা—ভুমিস্—দীর্ঘম্ (২য়া ১ব)—
আং ব্রাতা—বূমীম্—দরেঘেম্, (দরেগেম্, প্রাচীন)
বিদ্বান্—মেঘম্—গর্ভম্ (২য়া ১ব) অভি
—বিধ্বাও—মএঘেম্—
গরেভেম্—অইভি
সং র, ল—আং র? আবেস্তায় ল নাই।
সং রথম্ (২য়া ১ব)—শ্রীল (বৈং শ্রীর)
আং রথেম্—শ্রীর—
কল্পতে—ক্লিপ্ত (ক্লৃপ্ত)—নরম্ (২য়া ১ব)
খ্রপইতী (প্রাচীন) কেরেপ্ত—নরেম্
সং শ ষ স হ—আং শ ষ শ হ; সং স—হ।
সং শফাঃ (খুর, বৈ, শফাসঃ)—শাস্তি
আং—শফাওঙ্হো—শাশ্তি (লট্ তি)—
ইষবঃ—বস্তে—আস্তে—সপ্ত—সোম
ইষবো—বশ্তে—আশ্তে—হপ্ত—হওম

এ পর্য্যন্ত কোনও বিশৃঙ্খলা নাই; বর্ণ বিনিময় দ্বারা সংস্কৃত শব্দকে আবেস্তার ভাষায় পরিণত করা অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু ভাষায় বর্ণমালার ব্যবহার-প্রণালী এত সরল নহে। কুম্ভকার তাহার চক্রের উপর তরল মৃৎপিণ্ড রাখিয়া তাহার কোনও একস্থানে দাগ দিলে সে দাগ যেমন চক্রাকারে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে বর্ণমালার ব্যবহারও কতকটা সেই প্রকার। এখানে বর্ণমালা স্থির ভাবে থাকে না; সর্ব্বদা চঞ্চল বা dynamic conditionএ থাকে। সুতরাং একস্থানে পরিবর্ত্তন ঘটিলেই তাহার প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ঈষৎ-তরল মৃৎ-পিণ্ড চালিত হইলে যেমন চালনা শক্তির প্রভাবে তাহার সর্ব্বত্রই আকারের পরিবর্ত্তন হয়, ভাষায় বর্ণমালার অবস্থানও কতকটা সেইরূপ। সুতরাং সংস্কৃত ভাষাকে আবেস্তার ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইলেও আমাদিগকে আবেস্তার ভাষার dynamic condition লক্ষ্য করিতে হইবে। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দের এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা সংক্ষেপে আবেস্তার ভাষার এই dynamic condition লক্ষ্য করিব।

(১) পদান্ত ম কারের পূর্ব্ববর্ত্তী ই উ দীর্ঘ হয়। পইতীম্, পিতূম্, তায়ূম্, মইধীম্ (মধ্যম্)।

(২) এক-মাত্র-স্বর-বিশিষ্ট শব্দ দীর্ঘ-স্বরান্ত। জী (সং হি), নী, নূ, ফ্রা (সং প্র)।

(৩) বহু-অক্ষর-বিশিষ্ট (Poly-

syllabic) শব্দের অন্ত্য স্বর (দীর্ঘ ও ব্যতীত) হ্রস্ব। আফ্রিতি (বৈং আ-প্রীতী, তয়া ১ব,-আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক), দংহ্যু (দস্যু,- দুইটী দেশ, দস্যু শব্দ দেশ বাচক); দ্ব এরেজু (দ্বা ঋজূ-দুইটী অঙ্গুলি)।

(৪) প্রাচীন আবেস্তার ভাষা বা গাথা ভাষার অন্ত্যস্বরমাত্রই দীর্ঘ। অহুরা (হে অসুর), কুথ্রা (কুত্র) অহী (অসি), উতা (উত), যএষু (যেষু)।

(৫) ন, ম, বকারের পূর্ব্বে অ স্থানে এ হয়। বিন্দেন্ (অবিন্দন, তাহারা পাইল), উপমেম্ বা উপেমেম্ (উপমম্, সর্ব্বোৎকৃষ্ট), এবিষ্‌তী (প্রাচীন) (অবিত্তি, অজ্ঞাতসারে) সেবিষ্‌ত (সবিষ্ঠ), বরেন্তো (ভরন্তঃ), ইত্যাদি। সংস্কৃতেও ন, ম ও জ কারের প্রভাবে অকারের দীর্ঘতা হইত। বৃক্ষাণাম্, গচ্ছামঃ, গচ্ছাবঃ।

(৬) ঔষ্ঠ্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণও ঔষ্ঠ্যতা প্রাপ্ত হয়। দামোহু (ধামসু, সৃষ্ট জীবসমূহে), বোহু (বসু),

(৭) তালব্য বর্ণের পরবর্ত্তী বর্ণও তালব্যতা প্রাপ্ত হয়। যিম্ (যম্), বাচিম্ (বাচম্), বজিন (ভাজন), যেশ্নে (যজ্ঞে), যেহ্যা (যস্য, প্রাং)।

(৮) সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তায়ও স্বর ও অর্দ্ধস্বরের গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ও সন্ধি হয়।

(৯) ন ও ম কারের পূর্ব্বে অ বা আ স্থানে অাঁ হয়।

(১০) হ স্থানে জ বা জ. (z) এবং জ স্থানেও জ. (z) হয়। জ.স্তারম্ (হন্তারম্) হজ.ঙ্‌র (সহস্র), জ.ত (zata, জাত), জ.ইস্তি (হস্তি), অরেজ.ইতি (অর্হতি), জ.শ্‌ত (zasta হস্ত)।

(১১) শ্ব স্থানে শ্‌প হয়। অশ্‌পো (অশ্বঃ, পার্সী আস্‌প্), শ্‌পা (শ্বা, কুকুর)।

(১২) ছ স্থানে শ হয়। জশইতি (গচ্ছতি), যশইতি (যচ্ছতি), ইশইতি (ইচ্ছতি)।

(১৩) স্বরবর্ণের পূর্ব্বে পদাদি স স্থানে হ হয়। হপ্ত (সপ্ত), হওমো (সোমঃ), হুখ্‌তেম্ (সূক্তম্)।

(১৪) অ আ এ ও ওই অাঁ এবং অএ-চ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী 'অস্' স্থানে 'অঙ্‌হ' হয়। বঙ্‌হনেম্ (বসনম্), নেমঙ্‌হা (নমস্যা), বঙ্‌হেউব্ (বসোঃ ৬ষ্ঠী ১ব), অবঙ্‌হো (অবসঃ,-সাহায্যের, রক্ষার) রাওঙ্‌হঙ্‌হোই (রাসসে-তুমি দিতে পার), উষঙ্‌হাঁম্ (উষসাম্), অবঙ্‌হচ (অবসে চ)। একটী ব্যতিক্রম—দহাকো (অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধ নরাকৃতি রাক্ষসের নাম)।

(১৫) ঐরূপ স্থলে 'আস্' স্থানে 'আওঙ্‌হ' হয়। আওঙ্‌হ (আস-ছিল), থ্রাওঙ্‌হয়েইতে (ত্রাসয়তে), নাওঙ্‌হাব্য (নাসাভ্যাম্), মাওঙ্‌হেম্ (মাসম্-চন্দ্রকে), আওঙ্‌হাঁম্ (আসাম্)।

(১৬) ই ঈ উ ঊ পরে থাকিলে (১৪), (১৫) সূত্রের স স্থানে হ হয়। অহি (অসি), পাহি (পাসি)।

(১৭) ক্ষ স্থানে খ্‌ষ বা ষ হয়। উখ্‌ষানেম্ (উক্ষানম্, ষাঁড় ২য়া ১ব), বখ্‌ষ্যা (বক্ষ্যামি, বলিব), মোষু (মক্ষু L-at mox,- শীঘ্র), দষিণ (দক্ষিণ)। এইরূপ সং 'ক্ষ' স্থানে প্রাকৃতে 'খ' বা 'ছ' হয়। 'ক্ষণ' স্থানে

খণ (মুহূর্ত্ত) ও ছণ (উৎসব); বৃক্ষ-রুক্খ, বচ্ছ ; দক্ষিণ-দক্খিণ দচ্ছিণ দহিণ।

(১৮) দ্বিগুণিত ব্যঞ্জন (এক বর্ণ দুইবার) আবেস্তায় নাই। দুষিতি (দুষ্‌ষিতি স্থানে-দুরবস্থা ক্ষিতি) উষহ্ব (উষহ্‌হ্ব উষঃস্থ-অ), বুনেম্ (বুধ্নম্ ভিত্তি)।

(১৯) দন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী দন্ত্য ব্যঞ্জন স্থানে শ্ হয়। চিশ্‌তি (চিৎতি, জ্ঞান) রওশ্‌ত (রুধ্ + ত, রূঢ় = উৎপন্ন) চকারের পূর্ব্বেও হয়। যশ্চ (যৎ + চি, যচ্চ রএব শ্চিথ্র (রএবন্ত্ + চিথ্র, ধনবান্ পরিবার, ভাল গৃহস্থ)।

(২০) ঋত বা র্ত্ত স্থানে কখনও কখনও ষ হয়। অষেম্ (ঋতম্), পেষনাও (পৃতনাঃ, বাষারেম্ (ভর্ত্তারম্), অষবনেম্ (ঋতবন্তম্, সত্যবাদী, পবিত্রাত্মা)।

(২১) অ কারের পূর্ব্বে গ, ব্যঞ্জনদ্বয়ের মধ্যে দ, শকারের পর য, ম ও র কারের মধ্যে হ লুপ্ত হয়।

(২২) ষ কারের পূর্ব্বে কখনও কখনও খ্ আগম্ হয়।

(২৩) পদান্তে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বর্ণসমূহ থাকিতে পারে।—স্বরবর্ণ, ৎ, ন, ম, ষ, শ্ ; যুক্তবর্ণ খ্‌ষ্, ক্ষ্, ষ্ৎ, শ্ৎ।

(২৪) ষ, ত, ন, ম, য, র, ব, ভ বর্ণের পূর্ব্বে অল্প-প্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হয়। পুথ্র (পুত্র), খ্‌ষথ্র (ক্ষত্র), উখ্‌ত (উক্ত), থ্‌বাঁম্ থ্‌বাঁম্ (ত্বাম্), মঘ্ন (মগ্ন = নগ্ন), জয়্যাম্ (আমি যাইতে পারিতাম, গগম্)। শব্দের প্রথমাংশে ক, চ্ব, জ্ব, থাকিলে হয় না। প্ত, শ্‌ত, ষ্‌ত, বা জ্‌দ—এই কয়টী যুক্তবর্ণ অপরিবর্ত্তিত থাকে।

(২৫) ন বা ম পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী দন্ত্য ব্যঞ্জন বা উষ্ম বর্ণ অঘোষ-বর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ম এ জ্ + মন্—মএশ্‌মন্ (মূত্র √-মিহ্), অ এধ্ + ম— অএশ্‌ম (ইন্ধন), উরুধ্ + ম্য-উরুথ্‌ম (বুদ্ধিমান্ রুহ-মন্) তচ্-ম—তথ্‌ম (শক্ত, √-তষ্ট্) তপ্—নু-তফ্‌নু (তাপ, জ্বর)।

আবেস্তার ভাষার উচ্চারণ-প্রণালী অতি বিচিত্র। যদি স্বাভাবিক কারণে এই প্রকার উচ্চারণ-প্রণালী উদ্ভুত হইয়া থাকে তবে বলিতে হয় যে তাঁহাদের জিহ্বা ক্ষুদ্র ছিল। জিহ্বার দীর্ঘতা থাকিলে স্পর্শ বর্ণের উচ্চারণে কেবলমাত্র জিহ্বামূলের সঙ্ঘর্ষণ দ্বারা শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কি আরাম পাইতেন? 'খ্‌ষ্‌তুম্', 'খ্‌ষ্‌মই', 'যশ্নাওঙ্‌হো, বীহ্বাওঙ্‌হো 'রওচয়েইতি' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ কি প্রকারে সরল হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। স্বরের পাশে স্বর তিন চারিটী বসিবে, আবার দুরুচ্চার্য্য ব্যঞ্জনও দুই তিনটী একত্র হইয়া পদের আদি স্থান অধিকার করিবে। খ থ ফ ঘ ধ ভ spirant বা উষ্মবর্ণ হইলে তাঁহাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়; অথচ ছ ঝ বা ল তাঁহারা উচ্চারণ করিতে পারেন না। টবর্গ-টা একেবারেই আপদ দূর হইয়া রহিয়াছে। অথচ জ. (z) ঝ. (zh) 'খ্‌ষ্' তাঁহাদের সরল উচ্চারণ। এই ত গেল বর্ণমালার কথা। আবার বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, স্থিতি পরিবৃত্তি স্বর-ভক্তি প্রভৃতিরও উদাহরণ ভাষায় ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। স্বরভক্তির একটু ছড়াছড়ি। আমাদের ঋক্ প্রাতিশাখ্য দুরুচ্চার্য্য ব্যঞ্জন দ্বয়ের উচ্চারণের সুগমতার জন্য অনুমোদন করিলেন যে অর্দ্ধমাত্রা বা চতুর্থমাত্রা স্বর

ব্যঞ্জন-দ্বয়ের মধ্যে উচ্চারণ করা চলিবে, তাহাতে মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ হইবে না। অথর্ব প্রাতিশাখ্য ইহারও অর্দ্ধেক পরিমাণ স্বর অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আবেস্তার ভাষায় স্বরের পার্শ্বে স্বর স্বরভক্তি রূপে শোভা পায়। ছন্দের জন্য অক্ষর বা মাত্রার পরিমাপ কালে কিন্তু ইহাদের কাহারও স্বাধীন সত্তা থাকে না। পূর্ব্ববর্ত্তী তালব্যবর্ণ ও পরবর্ত্তী ওষ্ঠ্য বর্ণের প্রভাবে ই বা উ বর্ণের আগম সাধারণতঃ হইয়া থাকে। র বা ঋ বর্ণের সরলতার জন্য এ (হ্রস্ব) আসিয়া পূর্ব্বে বসে। সংস্কৃতের ন্যায় যুক্তবর্ণের সরলতার জন্যও স্বরভক্তির ব্যবহার হয়।

শব্দরূপ সংস্কৃতেরই অনুরূপ। লিঙ্গ, বচন কারক, সংস্কৃতের ন্যায়। বিভক্তি সমূহ নিম্নরূপ :—

একবচন :—প্রথমা। বিভক্তি-স্ (ষ্); কিন্তু প্রায়ই ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অকারান্ত শব্দ ওকারন্ত হয়। অন্য শব্দে বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না। ক্লীবলিঙ্গে ম্ (সর্ব্বনামে 'ৎ') হয়। অশ্ পে, রথএব্ তাও, গইরিষ্, বীষ্, (বিট্), যশ্নশ্চ, অশ্ পশ্চ, ইমৎ অএতৎ, কৎ, যৎ, চিৎ, বশ্ ত্রেম্।

দ্বিতীয়া। বিভক্তি ম্; পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যশ্নেম্, দএনাম্, গইরীম্, মইন্যুম্, বীশেম্ (বিশম্)। ক্লীব সর্ব্বনামে-'ৎ',-তৎ।

তৃতীয়া। বিভক্তি আ; বীশা (বিশা; যশ্ ন (-বৈঃ যজ্ঞা); গইরি-রী (বৈঃ গিরা); থ্‌া (বৈ, ত্বা, ত্বয়া), তা (তেন), অন (অনেন); আয়, অয় (বৈঃ অয়া, অনয়া)। সংস্কৃতের 'এন' বা-'না' প্রত্যয় আবেস্তায় নাই। পণ্ডিতগণ বলেন সংস্কৃতের এই ন্-যুক্ত প্রত্যয় মৌলিক নহে। ন্‌কারান্ত শব্দের অনুকরণ-জাত।

চতুর্থী। বিভক্তি 'এ' বা 'আই' (সং 'এ' বা 'ঐ'। চ-যোগে 'অ এ চ' হয়। যশ্নাই, দ এ ন য়াই, অ ষ ও ন্যাই, ম ই ন্যবে, তন্বয়ে, বীশে, বেরেজইতে, ফেদ্রোই (পিতরে ওই = এ), বচঙ্ হে, যহ্ মাই (যস্মৈ), অইঙহাই (অস্যৈ)।

তৃতীয়ার আ (বা অ) এবং চতুর্থীর এ বিভক্তি পরে থাকিলে উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ স্থানে স্থানে 'য়্' আগম হয়।

পঞ্চমী। বিভক্তি 'ৎ'। সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দেই এই 'ৎ' বিভক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আবেস্তায় সর্ব্বত্র। গরোইৎ (গিরেঃ), মইন্যওৎ (মন্যোঃ), বীশৎ (বিশঃ), ব চঙ্ হৎ (বচসঃ), অইঙ্ হাৎ (অস্যাঃ), অবইঙ্ হাৎ (অমুষ্যাঃ)।

ষষ্ঠী। বিভক্তি 'ও' (অশ্চ'), 'ষ্', 'এউষ্' 'অহে,' 'হে'। যশ্নহে, গরোইষ্ (গিরেঃ; ওই এ), মইন্যেউষ্, তন্বো, বীশো, দাথ্রো (দাতুঃ, ধাতুঃ), বীদুষো (বিদুষঃ) অহে (অস্য), অ ইঙ্ হাও (অস্যাঃ)।

সপ্তমী। বিভক্তি ই। উকারান্ত, অন্ ভাগান্ত ও অন্যান্য কতিপয় শব্দে সপ্তমী বিভক্তিতে কোনও প্রত্যয় নাই। অতিরিক্ত অকারের যোগে কখনও 'অয়' ও 'অব' হয়।

অহুর (অসুরে), দ এ নে (ধোনয়াম্), গরো (গিরৌ), গর (গিরৌ), বঙ্ হাউ (বসৌ), বীশি (বিশি-), অইপ্য (অপ্সু, আবেস্তায় 'অপ্' শব্দ একবচন), বচহি (বচসি), যহ্ মি (যস্মিন্), অইঙ্ হে (অস্যাম্)।

সম্বোধন। প্রায়শঃ কর্ত্তৃকারকের ন্যায়। অনেকস্থলে কোনও বিভক্তি নাই। দ্বিবচন, বহুবচনেও কর্ত্তৃকারকের অনুরূপ।

দ্বিবচন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, সম্বোধন।'অ' বা অন্ত্যস্বর দীর্ঘতা। বীর (বৈং বীরা), উর্বইরে (উর্বরে বৃক্ষদ্বয়), মইন্যু, মইন্যূ (মন্যূ)।

তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী। 'ব্য' 'ব্যা' সং ভ্যাম্। বীরএইব্য, পশুব্য, বাজুবে (বাহুভ্যাম্) আব্যা (আভ্যাম্)।

ষষ্ঠী। —'আও' 'আওশ্চ'। বীর-রাও, মইনিবাও।

সপ্তমী। 'ও'। উবোয়ো, (উভয়োঃ), অঙহো (অসোঃ)।

অধিকাংশ স্থলেই দ্বিবচনের পদ পাওয়া যায় না।

বহুবচন। প্রথমা। আ, ও, আওঙহো (বৈং আসঃ, দেবাসঃ)। যস্নে ওঙহো (যজ্ঞাসঃ) যস্ন, দএনাও (ধেনাঃ) গরয়ো (গিরয়ঃ) অষওনীষ্ বৈং দেবীঃ তন্‌বো (তন্বঃ) বেরেজন্তো (বৃহন্তঃ), বীদ্বাওঙহো বিদ্বাংসঃ।

ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনে কোনও বিভক্তিই নাই। সর্ব্বনামে পুং-নপুংসক লিঙ্গে 'এ' হয়। ইবে, অবো যোই (ওই = এ), তে; অএতে। স্ত্রীলিঙ্গে 'আও'; ইমাও অবাও।

দ্বিতীয়া। প্রায় সংস্কৃতের অনুরূপ। কেবল নকারান্ত প্রত্যয়ের অভাব। যস্না (যজ্ঞান্), দএনাও (ধেনাঃ), গইরীষ্ (গিরীন্) দাতারো (দাতৄন্), ইমা (ইমান্),

তৃতীয়া। বিষ্ বীষ্। অকারান্ত শব্দে 'আইষ্'। যস্নাইষ্ (যজ্ঞৈঃ), দএনাবীষ, হিজুবীষ (জিহ্বাভিঃ), বাজিবীষ্ (বিড্‌ভিঃ) দামেবিষ্ (ধামভিঃ) বচেবিষ্, অএইবিষ্ (এ ভিঃ), আবীষ্ (আভিঃ)।

চতুর্থী, পঞ্চমী। 'ব্যো', অ। যস্নএইব্যো, দএনাব্যো, গইরিব্যো, মইন্যুব্যো, বীজিব্যো যএইব্যো, তএইব্যো, যাব্যো (যাভ্যঃ), অএইব্যো, আব্যো।

ষষ্ঠী। আঁম্। স্বরান্ত শব্দে নাঁম্। যস্ননাঁম্, উর্বরনাঁম্ গইরিনাঁম্, বীশাঁম্ বচঙহাঁম্, বীথুষাঁম্ (বিদুষাম্), অএষাঁম্ আওঙহাঁম্।

সপ্তমী। হু, সু। কথনও কথনও একটী অতিরিক্ত অ-কারের যোগ হয়। বীরএষু উর্বাহু, গাথাহ্ব, বঙহুষু, বঙহুহ্ব, তনুষু, বীরত বচহু, বচহ্ব, অএষু, অএম্ব, আহু, আহ্ব।

বহুবচনে কারকবিভক্তির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বিরল। ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। সময়ে সময়ে তৃতীয়ার বহুবচন দ্বারা সকলবিভক্তির বহুবচনের কার্য্য-নির্ব্বাহ হয়। অন্ ভাগান্ত শব্দ সমূহের ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন অঁ (অন্) প্রত্যয়ান্ত রূপ দিয়া সময়ে সময়ে সকল বিভক্তির কাজ চলে। ঈষ্, উষ্ প্রত্যয়ান্ত (স্ত্রীং বহু) পদ সময়ে সময়ে সাধারণ বহুবচনের পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ার ও সপ্তমীর বহুবচনে অনেক ক্লীবলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ হয়। সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তার কারকের অধিকার সীমাবদ্ধ নহে। এক কারকের স্থানে অন্য কারকের ব্যবহার খুব চলে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অনেক সময় স্বরান্ত (প্রধানতঃ অকারান্ত) শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

ক্রিয়াপদের ব্যবহার

সম্ভাব্যঞ্জক, (Indicative) অনুজ্ঞাব্যঞ্জক (Imperative) সম্ভাবনাব্যঞ্জক, Subjunctive

ও ইচ্ছাব্যঞ্জক (Optative) রীতিভেদে সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তার ভাষায়ও ধাতুরূপের চারি পর্য্যায়। সত্তা ও অনুজ্ঞার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় আছে। কিন্তু সম্ভাবনা ও ইচ্ছা প্রকাশের জন্য ধাতুর উত্তর একটী অতিরিক্ত অকার বা যকারের যোগ হয়; তার পর প্রত্যয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই চারি পর্য্যায় ক্রমে ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয় প্রাথমিক প্রত্যয়ঃ—

পরস্মৈপদ

		প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ—	
এক	সং	তি	সি	মি	
	আং	তি	হি	মি	এক
দ্বি	স	তস্	থস্	বস্	
	আ	তো,	থো—	বহি	দ্বি
বহু	স	ন্তি	থ	মসি (বৈ)	
	আ	ন্তি	থ	মহি	বহু

আত্মনে পদ

এক	স	তে	সে	এ	
	আ	তে	ষে, ঙ্হে	এ	এক
দ্বি	স	আতে	আথে	বহে	দ্বি
	আ	আথে	——	——	
বহু	স	ন্তে	ধ্বে	মহে	
	আ	ন্তে	থে	মইদে	বহু

অপ্রাথমিক প্রত্যয়।

পরস্মৈপদ

এক	স	ৎ	স্ (ষ্)	ম্	
	আ	ৎ	স্ (ষ্)	ম্	এক
দ্বি	স	তাম্	তম্	ব	
	আ	তেম্	——	ব	দ্বি
বহু	স ন্	ত	ম		বহু
	আন্	ত	ম		

আত্মনেপদ

		প্রথম	মধ্যম	উত্তম	
এক	সং	ত	স	ই, অ	এক
	আং	ত	ঙ্হ (ষ)	ই, অ	
দ্বি	সং	আতাম্	আথাম্	বহি	দ্বি
	আং	আতেম্	—	—	
বহু	সং	ন্ত	ধ্বম্	মহি	বহু
	আং	ন্ত	ধ্বেম্	মইদী, মইদে	

অনুজ্ঞা, পরস্মৈপদ

		প্রথম	মধ্যম	উত্তম	
এক	সং	তু	ধি হি	×	এক
	আং	তু	ধি	×	
		×	×	×	দ্বি
বহু	সং	ন্তু	ত	×	বহু
	আং		ত, না		

অনুজ্ঞা, আত্মনেপদ

এক	সং	তাম্	স্ব (ষ্ব)	×
	আং	তাঁম্	ঙ্হ (ষ)	
দ্বি		×	×	×
বহু	সং	ন্তাম্	ধ্বম্	×
	আং	ন্তাঁম্	ধ্বেম্	

পরোক্ষা, পরস্মৈপদ

অ	থ	অ
অতরে	—	—
অরে, অরেষ্, অ		ম

পরোক্ষা, আত্মনেপদ

এ	—	এ
অইতে	—	—
—	—	—

সম্ভাবনা-ব্যঞ্জক রীতি (Subjunctive mood)

পরস্মৈপদ

অইতি অহি, আহি, আই আনি, অ এক
অং ও, আও
অতো — আব দ্বি
অতেম্
এন্তি অথ আম্ বহু

আত্মনেপদ

এন্
অতে, অত অঙ্হে আনে, আই এক
— — — দ্বি
এন্তে, অইরে — আমইদে বহু

ইচ্ছাব্যঞ্জক রীতি (Optative mood)

পরস্মৈপদ

এক, ওইৎ, যাৎ ওইষ্ যাও —, যাম্
বহু, অয়েন্, যান্ যারে যারেষ্ অএত, যাত
[অএম, যাম

আত্মনেপদ

এক অএত, ঈত অএষ,ঈষ অয়,য
বহু অয়ন্ত,— ওই ধ্বেম,— ওই মইদী, ওই
[মইধি, ইমইদী

সংস্কৃতের স্থায় আবেস্তায়ও ধাতু সমূহ দশ-গণে বিভক্ত। (১) ভ্বাদিগণে ধাতুস্বরের গুণ হয় ও অকার আগম হয়, ববইতি। (২) অদাদিগণে ধাতুমাত্রের উত্তর প্রত্যয় যোগ হয়, জইন্তি। (৩) জুহোত্যাদিগণে ধাতু অভ্যস্ত হয়। দদাইতি। (৪) দিবাদিগণে যকারাগম হয়। নশ্যেইতি (নশ্যতি) (৫) স্বাদিগণে নু আগমম। কেরেনওইতি (কৃণোতি)। (৬) তুদাদিগণে অকারাগম। ক্রুজইতি। (৭) রুধাদিগণে নকারাগম। ইরিনখতি। (৭) তনাদিগণে উকারাগম। তনওইতি। (৯) ক্র্যাদিগণে না আগম। গেরেভ্নাইতি। (১০) চুরাদিগণে ও কারণজ (Causative) ক্রিয়াতে 'অয়' আগম হয়। রওচয়ে ইহি। গণের মিল থাকিলেও অনেক সময় এক গণীয় ধাতুর রূপ অন্য গণীয় ধাতুর ন্যায় হয়।

আবেস্তার ছন্দঃসমূহও অনেকটা সংস্কৃতের ন্যায়। প্রভেদ এই যে আবেস্তার ছন্দে সংস্কৃতের ন্যায় মাত্রা লইয়া মারামারি নাই। লঘু-গুরু নাই। আছে কেবল অক্ষর বা syllable গণনা। এই অক্ষর গণনায় স্বরভক্তি বিহিত (anaptyctic) স্বর সমূহ বাদ পড়ে। আবার বেদের ন্যায় অনেক সময় 'য' ও 'ব' কে ভাঙ্গিয়া 'ইয়' 'উব' করিয়া লইতে হয়। সেটার বোধ হয় আর একটা কারণ লিখন প্রণালীর জটিলতা। আবেস্তার লিখন প্রণালীতে পদমধ্যে 'য' লিখিলেই 'ইয়' এবং 'ব' লিখিলেই 'উব' হয়। লিপির দিক দিয়া বিচার করিলে 'য' বা 'ব' লিখিতে দুইটী 'ই' বা দুইটী 'উ' পাশাপাশি বসাইতে হয়। তিনটী এক প্রকারের লিপি আবেস্তার লিখন প্রণালীতে একত্র স্থান পায় না। আবেস্তার অধিকাংশ ছন্দই সংস্কৃত 'অনুষ্টুভ্' ছন্দের ন্যায় অষ্টাক্ষর পাদের চারি পাদে সমাপ্ত। উদাহরণঃ—"যি-ম-হে-খ্য-থে্-অউ-র্ব-হে! নোইৎ-অত্ত-তেম্-আওঙ্-হ-নোইৎ-গরে-মেম্॥" কিন্তু আবেস্তার ছন্দ বলিলে ইহার প্রাচীন গাথার পাঁচ প্রকার ছন্দকে বুঝায়। (১) অহুনবইতি ছন্দঃ (যশ্ন ২৮-৩৪)। ইহার প্রতি শ্লোকে তিন পাদ; প্রতিপাদে যোড়শ অক্ষর, সপ্তম অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"অ-হ্যা-যা-শা-নে-মঙ্-হা। উশ-তা-ন-জশ্-তো-র-ফ্রেদ্র-হি-য়া॥" এই এক

পাদ। অহুনবইতির সাত স্থক্ত বা হাস্। (১) অহ্যা যাশা, (২) থ্ম্বইব্যা, (৩) অৎতা বথ্ষ্যা, (৪) তাবে উর্বাতা, (৫) থ্‌এতুমইতি, (৬) যথা-আইয্-ইশা, এবং (৭) যাস্কাওথ্া। স্থক্তের প্রথমাংশ লইয়া নামকরণ হইয়াছে। (২) উষ্তবইতি ছন্দ (যশ্ন ৪৩-৪৬)। ইহার প্রতি শ্লোকে পাঁচ পাদ; প্রতিপাদে একাদশ অক্ষর; চতুর্থ অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"আৎ-হেব্যা-বঙ্হেউষ্। ব-হ্যো-না-অই-বা-জম্ যাৎ॥" এই এক পাদ। ইহার চারি স্থক্ত বা হাস্। (১) উষ্তবইতি, (২) তৎস্মা পেরেশা, (৩) অৎক্রবথ্ষ্যা, (৪) কামনেমোই জাঁম্। (৩) স্পেন্তামইন্যুষ্ ছন্দঃ (যশ্ন ৪৭-৫০)। ইহার প্রতি শ্লোকে চারি পাদ; প্রতিপাদে উষ্তব-ইতির ন্যায় একাদশ অক্ষর; চতুর্থ অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"খ্য-থ্া-খ্বেন্-তাম্। মা-নে-দ্বষে-খ্য-থ্া-খ্বেন্-তা॥" এই এক পাদ। ইহার চারি স্থক্ত। (১) স্পেন্তামইন্যুষ্, (২) যে জিদা, (৩) অৎমায়ব, (৪) কৎমোই উর্বা। (৪) বোহুখ্ষথ্র ছন্দ (যশ্ন ৫১) ইহার প্রতি শ্লোকে তিন পাদ, প্রতিপাদে চতুর্দ্দশ অক্ষর; সপ্তম অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ-দাই-দী-মোই-যে-গাঁম্-ত-যো। অ-প-শ্চা-উ-র্ব-রাও-শ্চা॥" এই এক পাদ। (৫) বহিস্তো-ইষ্তি ছন্দ (যশ্ন ৫৩)। ইহার প্রতি শ্লোকে চারি পাদ বা পঙ্ক্তি। প্রথম দুইপাদের প্রতিপাদে দ্বাদশ অক্ষর; শেষের দুইপাদে ঊনবিংশতি অক্ষর। সপ্তম ও চতুর্দ্দশ অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"শা থ্ নীব জ্য ম্না ব্যো। কই নি বিয়ো ত্রাও মী॥ থ্ম্বই বি যা চা ব দে ম্যো। মে ঙ্কা ঈ মাঁজ দজ্দু [বে] ম্॥ বএ দো দু[বে] ম্ দএ না বীষ্। অ বি যশ্ তা অ হু ম্ [অঙ্ ঘু বাঁম]॥ বঙ্হেউষ্ ম নঙ্ ঘো॥ অ শা বে অ স্তো অই নীম্। বী বেঙ্ ঘ তু তৎ জী হোই। হু যে নেম্ অঙ্ ঘৎ॥" এই এক শ্লোক।

ইরাণ ও ভারতের আধুনিক অধিবাসি-গণের পূর্ব্বপুরুষগণ সে এক কালে একজাতি ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এইকালেই তাঁহাদের সভ্যতা, ইতিহাস, ভাষা ও ধর্ম্মপ্রণালী অভিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন করিতেন এবং ইঁহাদের নাম ছিল 'আর্য্য' জাতি। 'আর্য্য' শব্দের মূল অর্থ 'কৃষিজীবী'। গ্রীক 'অরোত্রেন্' লাটিন 'অরত্রম্', আইরিশ 'অরথর্', প্রাচীন নর্মান 'অর্ধম্' প্রভৃতি 'হল' বা 'লাঙ্গল' বাচক শব্দে কৃষি কর্ম্মের বাচক 'অর্' বা 'ঋ' ধাতু বিদ্যমান। আমাদের 'অরিত্র' দ্বারা নদী বা সমুদ্রে 'হল চালনা' রূপ রূপক অর্থ প্রকাশ পায়। গো জাতি আর্য্যগণের অতি মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। গোপালন গৃহস্থধর্ম্ম এবং গো শব্দ রক্ষা ও মঙ্গলের বাচক ছিল। 'গোপাল' বা 'গোপ' বা 'গোপা' আমাদের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু দেবতার নাম। হলায়ুধ বলভদ্র তাঁহার অগ্রজতুল্য সহায়। ইরাণীয়গণের নিকট গোজাতির আত্মা (গেউষ্ উর্বন্, সং গোঃ আত্ম) রক্ষা ও মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের 'মাষষ্ঠী' বা সর্ব্বমঙ্গলার ন্যায় গৃহস্থমাত্রেরই পূজা ও ভক্তির অধিকারিণী। জিনিস পত্রের মূল্য বা দান উপঢৌকনাদির পরিমাণ দশগো, শত গো প্রভৃতি ভাষায় গো শব্দের দ্বারা অভিহিত হইত। অতি প্রাচীনকালে কৃষিকর্ম্ম সম্ভবতঃ রমণীগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং পুরুষগণ

পরিশ্রম সাধ্য মৃগয়া কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাই দুহিতা গোদোহন করিতেন। প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে উপনয়ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং তাঁহারা 'দ্বিজ' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেন। আধুনিক ভারতীয় পার্সীগণ উপনয়ন সংস্কারকে 'নবজোত' (=নবজন্ম) বলেন। ইরাণীয়গণের উপনয়নের কাল সাত হইতে পনর বৎসরের মধ্যে। আমাদের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ইঁহারা এক প্রকার পশমী সূতার ফিতা মেখলা রূপে ধারণ করেন। ৭২ টী সূতা তিন ভাগে ফিতার আকারে বুনিয়া ইঁহারা উপনয়ন সংস্কারের দিন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কটিদেশে ধারণ করেন। এই ফিতার নাম 'কুস্তি'। আবেস্তার যজ্ঞোপবীত—মেখলার নাম 'অইব্যা ওঙ্‌হ' (সং অভিযাস, বা মেখলা)। আর্য্যগণ একত্র বসবাস কালে অসুর মিত্র, বরুণ, বৃত্রঘ্ন, অপাংনপাৎ প্রভৃতি বহু দেব দেবীর উপাসনা করিতেন। বৃত্রহা (বেরেথ্রঘ্ন) অহি (অঝি) নামক একজন প্রবল দৈত্যকে সংহার করিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণ করিয়াছিলেন। বিদ্যুদ্দেবতা অপাংনপাৎ (জলের নাতি) উভয় জাতিরই উপাস্য ছিলেন। অগ্নির উপাসনা উভয়জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই অগ্নি উৎপাদনের জন্য (অরণী ঘর্ষণ দ্বারা) একজাতীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারাই (ইরাণী আথ্রবন্‌, ভারতীয় অথর্বন্‌) যজ্ঞ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে পেশ্‌কার স্থানীয় ছিলেন। ইঁহারা সোম (আবেস্তার 'হওম') রস পান করিতেন এবং সোমাধিষ্ঠিত দেবতার অর্চনা করিতেন। সৎপ্রবৃত্তির ও সৎসাহসের হেতুভূত সোমরস ইঁহারা দেবতাদিগকে উপহার দিতেন। বিবস্বৎপুত্র যম (যিমো বীবঙ্‌হতো পুথ্রো) আদি মানব ছিলেন, এবং বহু বর্ষ ধরিয়া অতি সুখে জীবন যাপন করিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। প্রেতরাজ্যে প্রথম গিয়াছেন বলিয়া তিনিই সে রাজ্যের অধীশ্বর। অতি প্রাচীনকাল হইতে মানবের সহচর কুকুর যমেরও ভৃত্য। ইরাণীয় গণের নিকট কুকুরের অতি সমাদর; গো অপেক্ষাও ইহাদের অধিক প্রিয় শ্‌পা (শ্বা)। পৃথিবী আর্য্যগণের নিকট অতি পবিত্র দেবতা ছিলেন এবং রক্ষা বাচক গো শব্দের দ্বারা ইনিও অভিহিত হইতেন। ইরাণীয়গণ পৃথিবীকে এত পবিত্র মনে করেন যে মৃত নরদেহ অপবিত্র বলিয়া তাহা মাটিতে রাখেন না, কুকুর ও শকুনকে 'বলি' রূপে প্রদান করেন।

আর্য্যগণের ধর্ম্মমতের মূল সূত্র ছিল সৎকর্ম্ম ও সৎচিন্তা। বেদ ও আবেস্তা এই সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্মের উপদেশ দেন। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর ঋত (আং অষ) নামক এক অপরিবর্ত্তনীয় শক্তির অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন। দেবগণও এই ঋত-শক্তির প্রভাবের অধীন ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা 'মন্ত্র' বা 'শব্দ-সমষ্টির' অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। এই মন্ত্র-বলে কেবল যে ভূত পিশাচ বা দৈত্যগণকে বশীভূত করা যাইত, তাহা নহে। দেবগণও মন্ত্রবলের বশীভূত ছিলেন। ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বিষয়ে আর্য্যগণ একটু বেশীমাত্রায় চিন্তা করিতেন। ধর্ম্মমত ও দর্শনচর্চ্চায় তাঁহাদের ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই

চিন্তাপ্রবণতা হইতেই ভারতীয় ও ইরাণীয়-গণের মধ্যে মহান্ প্রভেদ সঙ্ঘটিত হয়। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মিগণ বলিলেন, "পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত জগৎ; সুতরাং সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়; পরমেশ্বর পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা হইতে মানবাত্মা জীবাত্মা সমুদ্ভূত। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নিত্য বা সত্য; তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ মিথ্যা বা মায়া। সুতরাং সেই পরমাত্মায় বিলীন হইতে পারিলেই জীবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। যতদিন না সেই মিলন হয়, ততদিন কেবল কর্ম্মভোগও কষ্ট। সুতরাং এ জগৎ বা ইহ জন্ম মায়া মাত্র, সমস্তই অনিত্য কেবলমাত্র দুঃখহেতু। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইলেও তাঁহার বিচ্ছেদে মানব জীবন। সুতরাং এজগৎটা কিছু-না।" ইরাণীয়গণের মতের মিল হইল না। জরথুষ্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মতে ইহ জীবন 'কিছু-না' নহে, জীবনে সুখ ও আনন্দ আছে; সেই আনন্দ উপভোগ্য। ফলে দুইটী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল, বিবাদ চলিতে লাগিল, অবশেষে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে 'দেব' শব্দ দেবতাগণের বাচক, ইরাণীয়গণ সেই 'দএব' শব্দে ব্রাহ্মণ্যদিগের উপাস্য দেবতা অর্থাৎ দৈত্য অর্থ দিলেন। আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মিগণ যে 'অসুর' শব্দ তাঁহাদের দেবতা-দিগের বিশেষণরূপে অসীম শক্তির নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন (অসু+র), সেই অসুর তাঁহাদের দেবকুলের শত্রু হইলেন। সেই অবধি হিন্দুদিগের দেব-অসুর ও ইরাণীরদিগের অহুর-দএব স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইলেন। হিন্দুদিগের দেবতা প্রেমের দেবতা, ইরাণীয়দিগের দেবতা ভয় ও ভক্তির পাত্র। জরথুষ্ত্র তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরের অসীম পরাক্রমে মুগ্ধ হইয়া দৈনন্দিন শুভকর্ম্মের জন্য তাঁহার সাহায্য কামনা করিলেন এবং হিন্দু দিগের মায়ার দেবতা 'দএব'গণ অহুরের শত্রু বংশ বলিয়া বিদিত হইলেন। ফলে স্বর্গরাজ্যে 'সু'ও 'কু'র অধীশ্বর দুই জাতি হইল—অহুর ও দএব। হিন্দুদিগের অসংখ্য দেবদেবী বিধর্ম্মীর দেবতা বা অপদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইন্দ্র ও নাওঙ্হইথ্য (নাসত্য) অপদেবতারূপে পরিগণিত হইলেন। এবং ঋগ্বেদেও যে বরুণদেব অসীম শক্তি ও জ্ঞানের আধার এবং 'অসুর' বিশেষণে অভিহিত, তিনিই মরুদেব জরথুষ্ত্রের জ্ঞানের দেবতা বা অহুর মজ্দাও (অসুর মেধাঃ) নামে বিদিত হইলেন। কিন্তু অহুর মজ্দা 'সু'র অধীশ্বর হইলেও 'দএব'গণের শক্তি-নিরপেক্ষ নহেন।—তিনি অনবরতঃ 'কু'র অধীশ্বর অঙ্গ্রো মইন্যু (অহ্রিমন বা অর্য্যমা) ও তাঁহার কুমন্ত্রীদিগের সহিত চিরযুদ্ধে ব্যাপৃত। কিন্তু জরথুষ্ত্রের প্রবল বিশ্বাস এই যে অবশেষে 'সু'র অধীশ্বর 'অহুর'গণের জয় এবং 'কু'র অধীশ্বর 'দএব'-গণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এবং যখন তাহা হইবে, তখন চিরযুদ্ধের অবসানে চিরশান্তি আসিয়া স্বর্গ-মর্ত্তের প্রভেদ দূর করিয়া দিবে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শেষ চিঠি

রাণীর চিঠি ফিরে এসেছে। কত জায়গা ঘুরেছে এ চিঠি! প্রত্যেক জায়গায় প্রায় ব্যর্থতার চিহ্ন এর বুকে একেবারে তারিখ এবং সময় শুদ্ধ আঁকা রয়েছে! চিঠির এক কোণে এক পিয়নের হাতের পেন্সিলে লেখা আঁকা-বাঁকা অক্ষর—অনেকখানি তার মুছে গিয়েছে বোধ হয় লিখেছিল, চিঠির মালিককে পাওয়া গেল না। চিঠির বুকে পিঠে অনেকগুলো গোল-গোল ছাপ, তার মধ্যে একটা সবার চেয়ে স্বতন্ত্র চৌকো ছাপ নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে! তার ভিতরে খুব মোটা হরফে লেখা—ডি, এল্‌, ও। সেটা ডেড্‌ লেটার অফিসের মোহর। চিঠির খামের মুখ খোলা—এবং সেখানা একখানা বড় ব্রাউন রঙের খামে মোড়া। তার ওপরে রাণীর নাম লেখা। কিন্তু রাণী এখন যে ঠিকানায়, সেখানে এ চিঠিকে পৌঁছুতে হ'লে যে কোন্‌ 'পোষ্ট অফিসে'র সাহায্য নিতে হবে, মানুষ এখনও তা বলতে পারে নি।

আজ এই চিঠি দেখে শুধুই মনে হচ্ছে—মানুষ কি পাগলামী করে, যখন সে একজনের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে—'ওকে না হলে আমার চলবে না। ওকে না হলে আমি বাঁচব না। কারণ এক ওকেই আমি ভালবাসি, আর ভালবাস্‌ব আজীবন!'—যেন পৃথিবীর যা-কিছু বরণীয় সব দিয়ে ভগবান-শুধু ঐ একটিমাত্র মানুষকেই সাজিয়ে দিয়েছেন!...

ভালবাসি! আমিও ঠিক ওই কথাটাই অনেক বার রাণীর কানের কাছে গুঞ্জন করেছিলাম! আর পাঁচজন পাগলের মত আমিও একদিন ভেবেছিলাম, এক রাণীকে ছাড়া আর-কাকেও ও-কথাটা আর কোন দিন বল্‌তে পারব না! কিন্তু আমার সে চিন্তা যে কতখানি অসত্য, তার জ্বলন্ত জীবন্ত প্রমাণ আমার চোখের সামনে, আমারই বিছানায়! রাণী আমার চলে গিয়েছে, কিন্তু তার স্থান শূন্য থাকেনি! ঠিক রাণী যেমন করে যেখানে শুয়ে থাকত, ঠিক তেমনি করেই সেখানে মীনুও আজ ঘুমিয়ে আছে—আমি মীনুকে ভারি ভালবাসি!

রাণীর চিঠি এই ভয়ানক মিছে কথাটাই আমাকে বারে-বারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে! প্রায় ছ'বছর আগে হয়ত এই টেবিলে বসেই রাণী এই কটা কথা লিখেছে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে চিঠির কাগজকে তার ব্যথার সাক্ষী রেখে তার চোখের জল ঝরে পড়েছে। আর আজ তিন বছর পরে তার অশরীরি কান্না আমার কানের কাছে গুমরে গুমরে উঠছে—আমার চোখ দিয়ে তাই আজ জল ঝরে পড়ছে! বেচারী রাণী! কি মিছে কথাগুলোই তাকে বলেছি—আর তাই বিশ্বাস করে তার বুক এই শেষ চিঠি লেখবার দিনেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

প্রায় তিন বছর আগে সে এই চিঠি লিখেছে! তার চিঠির প্রতি পংক্তি তার বুকের দীর্ঘশ্বাসের ব্যথা বয়ে নিয়ে ফিরছে! সে লিখচে :—তোমাকে এই তিন মাস দেখিনি! তুমি কি বুঝতে পাচ্ছনা, কি অনন্ত বলেই মনে হ'চ্ছে আমার কাছে এই তিন মাস সময়! তোমাকে একটিবারও অন্ততঃ দেখতে আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে—একটিবার শুধু এসো গো, শুধু একটিবার তুমি এসো!

লিখতে লিখতে যে সে কেঁদেছে, তার ইতিহাস চিঠির পাতার অমর হয়ে রয়েছে।

এ চিঠি যখন সম্বলপুরে আমার ঠিকানায় গিয়েছে,তখন আমি রামনগরের ডাকবাঙলায়—আর রামনগরের ছাপ যেদিন এর বুকে আঁকা হয়েছে, সেদিন আমি কল্‌কাতায়—রাণীকে হারিয়ে কেমন করে বাঁচা সম্ভব, সেই সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত!

তারপর এ চিঠি তিন বছর ধরে ডেড লেটার অফিসের কোন্ অজানা কোণে লুকিয়েছিল! আর এই তিন বছরে আমার জীবনে রাণীর স্থান পূর্ণ হয়ে গিয়েছে! রাণীর চিঠি কিন্তু তার বুকের অশ্রু-মাখা বার্ত্তা ভোলেনি! সে আমার সন্ধান না পেয়ে-পেয়ে যখন ব্যর্থ হ'য়ে আবার রাণীর কাছে ফিরে চলেছে, তখনই তার কাজ পূর্ণ হয়েছে! তার দীর্ঘ দিনের যাত্রা আজ সার্থক হয়েছে!

রাণী ডেকেছিলো—শুধু একটিবার এসো! সে ডাক আমার কাছে পৌঁছয় নি! আমি তার সেই একটিবার দেখবার সাধ পূর্ণ কর্ত্তে পারিনি! তার চিঠির বুকে ঝরা জল তার অপূর্ণ সাধের সমস্ত তীব্রতা নিয়ে আমার বুকে আঘাত কচ্ছে!

রাণী যেমন করে আমাকে চেয়েছিলো—অমনি আকুলভাবে আমি কি তাকে চাইতে পেরেছি? তার কাছে যে কথা বলে ছিলাম—তোমাকে ছাড়া এ পৃথিবীতে কাউকে আর চাই না,—সে কথা কি আমার মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যায় নি? রাণীকে যে-কথা যেমন ভাবে বলেছিলাম, মীনুকেও আবার সেই সব কথাই বলেছি, তেমনি করেই!

আজ মীনুও ঘুমিয়েছে—রাণীও ঘুমিয়েছে! এখন মীনুকেও দেখতে পাচ্ছি—আর রাণীর সেই অশ্রুসজল চোখ দুটোও আজ মনে পড়ছে! এখন মনে হচ্ছে—আমি দুজনকেই ফাঁকি দিয়েছি! দু'জনের কাউকেই আমি সত্যি কথা বলিনি!

শ্রীসোমনাথ সাহা।

হুরী

আমরা হুরী রূপের নূরী,
স্বর্গপুরীর ফুলঝুরি;
হাওয়ায় উড়ি ভুবন ঘুরি
কর্‌ছি যে গো মন্ চুরি।
ফুলের পাখায় ঘুমিয়ে থাকি,
নদীর সুরে সুর ধরি;
মোদের লীলা-নৃত্যে ওঠে
বনের বীথি মর্ম্মরি।
চাঁদের হৃদয় মন্থি আনি
জ্যোছনা-সুধা অঞ্চলে,—
বসাই মাঠে মণির মেলা,
রূপের ভেলা দি জলে।

'ঘুমপাড়ানী'র গান গেয়ে যে
ধরার চোখে ঘুম আনি,
শোকের কাজল মুছিয়ে দিয়ে
হাসির রেখা দিই টানি।
স্বপন্-কাঠির পরশ দিয়ে
সবার ব্যথা নিই হরে,
আমরা রহি দ্বারের দ্বারী
চৌকি দিতে রাত্ ভরে।

* * *

আমরা হুরী রূপের নূরী,
স্বর্গপুরীর ফুলঝুরি;
হাওয়ায় উড়ি ভুবন ঘুরি
কর্‌ছি যে গো মন্ চুরি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

(৮)

পূর্ব্বে আমি একস্থানে বলেছি, জগৎ ধর্ম্মের রাজ্য। এর মানে অবশ্য এমন নয় যে, জগতে কোন রকম অধর্ম্ম নাই বা অধর্ম্মের দ্বারা ধন-সম্পত্তি প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয় না। মানুষকে ভগবান যখন হাতের পুতুল করে' না গড়ে স্বাধীনতার মর্য্যাদা দিয়ে মানুষ করে' গড়েছেন, তখন তাকে অন্যায় করবার প্রচুর অবকাশও সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন; চোখ বুজে যাওয়ার মতো একটীমাত্র সোজা পথ গড়ে রেখে দেননি। আর ধন-মান-প্রভুত্ব ইত্যাদি লাভ হয় তাদের নিজের নিয়ম-অনুসারেই, ধর্ম্মের নিয়মে নয়। সুতরাং সে নিয়ম ধর্ম্মানুগত হোক্ বা না হোক্ এবং যারা সেই নিয়ম মেনে চলে তারা ভাল লোক হোক্ বা মন্দ লোকই হোক্, ফলের তারতম্য হওয়ার কারণ নাই। ইস্পাত যদি ভাল হয়, সিঁদ-কাঠি গড়তে গেলেই যে তা ভোঁতা হয়ে যাবে এবং চোরাই খাঁটি-সোনা যে চোরের হাতের স্পর্শে পিতলে পরিণত হবে, প্রকৃতির এমন কোন নিয়ম নাই। অর্জ্জনের বেলায় যে নিয়ম, রক্ষার বেলায়ও ঠিক তাই। যে সেই নিয়ম মেনে চলবে সেই ও-সব জিনিষ রক্ষা করতে পারবে। মহাপাপী বলেই যে কারো হাত হতে তা গলে পড়ে যাবে, এমন কথা নাই।

কথা উঠতে পারে, জ্ঞানীরা যে চিরকাল বলে আসছেন—"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।" অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাততঃ মঙ্গল দেখা যায়, আপাততঃ শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়, এ কথাটা কি মিথ্যা? না, নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়, একেবারে নিছক এবং খাঁটী সত্য। কিন্তু ওরূপ সমূলে যে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটে—তা ধর্ম্মের কোনও বিশেষ নিয়মের অলৌকিক প্রভাবে নয়, পূর্ব্বে যে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লেখ করেছি, তারই উল্লঙ্ঘনের ফলে। অধর্ম্মের দ্বারা ফল লাভ ক'রে সে অধর্ম্মকে এম্‌নি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে যে, আর কাউকে বিশ্বাস করা বা আর কারো সুখ-দুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় ধনসম্পত্তি রক্ষার উপযোগী নিয়ম তার দ্বারা পালিত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাহোক্ এ একটা অবান্তর কথা। আসল কথাটা এই—যা কিছু আছে, যা-কিছু হচ্ছে, সকলেরই ভিতর দিয়ে একটা বিপুল তাৎপর্য্য মণিহারের সুতোর মতো বিরাজ কচ্ছে। যা-কিছু এই বিপুল বিরাট তাৎপর্য্যের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নিতে পারে, তাই সার্থক হয় এবং টিঁকে থাকে। বাকী সব ঝরে-পড়া মুকুলের মতো ব্যর্থতার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিশ্বের অন্তরের ঐক্য-সূত্র—এই বিপুল তাৎপর্য্য, এই বিরাট এক—ইহাই ধর্ম্ম, যা নিখিলকে ধারণ ক'রে রেখেছে। উপনিষদ যে বলেছেন, "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" অর্থাৎ সংসারে যা-কিছু চলছে, তার সমস্তই ঈশ্বরের

দ্বারা আচ্ছন্ন—এ-কথার তাৎপর্য্যও ঠিক ঐই—জগতে যা-কিছু চলছে তার সকলই কেবলমাত্র ঘটনা। তা চরম সত্য নয়। তাদের চরম সত্য ব'লে ভুল করলেই সৃষ্টির আসল তাৎপর্য্যের হিসাবে ব্যর্থ হতে হবে, ভিতরের সেই সনাতন সূত্র হতে খসে পড়তে হবে; অর্থাৎ ধর্ম্ম আর তাকে ধারণ করবেন না।

এই ধর্ম্ম কথাটার মতো নটখটে ভেজালে কথা মানুষের ভাষায় আর দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। এই কথাটার চার ধারে নানামতের কুয়াশা, নানা বাদ-প্রতিবাদ গালাগালি মারামারি, এমন-কি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত চিরদিন ধরে পুঞ্জীকৃত হয়ে উঠেছে এবং আজও উঠছে। এটা খুবই লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই—তাই ব'লে তো আর অস্বীকার করার যো নাই। আর এমনটা যে ঘটছে তার কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে।

সংসারে জাতিবাচক শব্দের অপ্রতুল নাই। সভ্যতার পরিণতি ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ শব্দের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জগতে 'জাতি' বলে কোনও কিছুর সত্যিকার অস্তিত্ব নাই। ওটা আমাদের কল্পনা মাত্র। জ্ঞানের কারবারটা ভালরূপ চালাবার জন্য ও-জিনিষটার আমরা প্রয়োজন-মত সৃষ্টি করে থাকি। যার সত্যিকার অস্তিত্ব আছে, সে হচ্ছে ব্যক্তি বা Individual। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার উপলব্ধি, অনুভূতি ও চেতনার সীমানা দ্বারা অপর ব্যক্তি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজনের উপলব্ধির মধ্যে অপরের প্রবেশের ছোট বা বড় কোনরূপ পথই নাই। সে সম্বন্ধে যা-কিছু জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে তা পরোক্ষ ভাবে শোনা কথায়। কিন্তু নিজের উপলব্ধিটাকে ঠিক-মতো অপরের নিকট প্রকাশ করা একটা বিশেষ কঠিন কাজ, একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বললেই হয়। সংসারের যত রকম গোলযোগের মূল ঐখানে। আপন আপন মানসিক প্রকৃতি, শিক্ষা ও সংস্কার-অনুসারে মানুষ বিশ্বের এক-একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক দিয়ে ফেলে। সেইটাকেই সে সব-চেয়ে বড় মনে করে। কাজেই তার ধর্ম্মের ধারণা সেই অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম প্রধানতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসকের নিকট হাইজিনের নিয়ম পালনই প্রধান ধর্ম্ম। ন্যাসনালিষ্ট যেন-তেন-প্রকারেন নিজের দেশটাকে সকল রকমে বড় ক'রে তোলাই ধর্ম্ম মনে করেন। যাতে গার্হস্থ্য জীবনের কাজ সুশৃঙ্খল রূপে চলে, গৃহজীবীর ধর্ম্মের ধারণা সেই ছাঁচে গড়া। অথচ বিপদ এই, সকলেই এক ধর্ম্ম কথা দিয়ে আপন আপন অনুভূতি ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করে' থাকে।

কিন্তু দ্বন্দ্ব-গোলযোগ তো আর শাশ্বত জিনিষ হতে পারে না। একটা সামঞ্জস্য ও মিলন কোন স্থানে আছেই। সেটা কি? পূর্ব্বে যে "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" মহাবাক্যের উল্লেখ করেছি,—ঐ মন্ত্রের সাধনার মধ্যে সকল গোলযোগের মিল আছে। যে মহা এক সমস্ত খণ্ডকে সমস্ত বিচিত্রকে ধারণ ক'রে রেখেছেন তিনিই ওদের সত্য ক'রে তুলেছেন। এক পরম অব্যক্ত অগণ্য ব্যক্তি রূপে আপনাকে অজস্র বিকাশ করতে করতে চলেছেন। পূর্ব্বে যে

বলেছি, ব্যক্তি সত্য, সে কথাটা আংশিক ভাবে সত্য। পূর্ণ সত্য এই যে অব্যক্ত ব্যক্তিরূপে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন, অরূপ রূপের মধ্যে আপনাকে বিকাশ করছেন। ঐ একের দিক দিয়ে, অব্যক্ত অরূপের দিক দিয়ে দেখলে অভেদ্য স্বাতন্ত্র্যের মাঝখানে একটা মিলনের পথ খুলে যায়।

গীতায় ভগবান বলেছেন,

ভূমিরাপো অনলো বায়ু মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কারং ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেমিতয়ন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিস্বমেপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি এই আটরূপে বিভক্ত। হে মহাবাহো, ইহা কিন্তু অপরা বা নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চেতনাময়ী আমার একটী প্রকৃতি অবগত হও—সে প্রকৃতি এই জগতকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে বা রক্ষা করিতেছে। আমি যে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেম এই দুটী শ্লোকে তা সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে ঐশী প্রকৃতির যে আটরূপ বিভাগের কথা বলা হয়েছে অনেকে ঐগুলিকেই চরম মনে করেন এবং ঐকান্তিক ভাবে ঐগুলির অন্তর্নিহিত নিয়মের অনুশীলন দ্বারা শক্তিলাভ করাকেই চরম সার্থকতা মনে করেন। পশ্চিমের লোকেরা ঐ-পথের একাগ্র সাধনা দ্বারা বললাভ ক'রে আজ জগতে জয়ী হয়েছে অর্থাৎ আপনাদিগকে জয়ী মনে করছে এবং আমরাও মূঢ়তা বশতঃ তাদের জয়ী মনে ক'রে ঈর্ষার বিষে জ্বলে পুড়ে মরছি। কিন্তু সে জয় ভগবানের পরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে, তাঁর অপরা প্রকৃতির উপরই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে জয়ের মুখোস খুলে গিয়ে তার যথার্থ মূর্ত্তি প্রকাশ হতে যে খুব বেশী বিলম্ব হবে, এমন মনে হয় না। জড় শক্তির সাহায্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে জড়শক্তির সাধনাকে যাঁরা জীবনের মুখ্য ব্রত ক'রে তোলেন, পরিণামে তাঁদের জড়ত্বপ্রাপ্তি একেবারে সুনিশ্চিত। গীতায় ভগবান যে বলেছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনো পি মাম্।
দেবার্চ্চনাকারীগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃগণের অর্চ্চানাকারীগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ভূতপূজাকারীগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন—আমার ভক্তেরা আমাকেই পান। এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ভাল ক'রে ভেবে দেখতে সকলকেই অনুরোধ করি।

এখানে অবান্তর ভাবে একটা কথার একটু আলোচনা করা উচিত মনে করছি। জড়বিজ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে জড়শক্তির সাহায্যে জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করবো কি না? নিশ্চয়ই করবো। কারণ জড়ের শক্তিও একটা সত্য জিনিষ। সুতরাং সম্পূর্ণ সত্যকে লাভ করতে হলে জড়কে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলে চলবে না। আর ইচ্ছে করলেই যে তা করতে পারবো, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ জড়ের শক্তিও ব্রহ্মের শক্তি; গীতার ভাষায় ভগবানের অপরা প্রকৃতি। পরা ও অপরা ভগবানের এই উভয় প্রকৃতিকে সম্যক জানলে তবেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যথার্থ হবে। তা ভিন্ন হওয়ার উপায় নাই। আসল কথা, জড়বিজ্ঞানকে

তার যথার্থ সীমার মধ্যে আটক ক'রে রাখা নিয়ে, অর্থাৎ জড়শক্তি বা ভগবানের অপরা প্রকৃতিকে তাঁর পরা প্রকৃতির অনুগত ও অধীন করে দেখলেই যথার্থ ভাবে দেখা হবে। আত্মোপলব্ধিই মানুষের চরম সার্থকতা। সব সময়ে মনে এই লক্ষ্যটা জেগে থাকলেই জড়ের অনুশীলন কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। যাঁরা এই বিষয়ের আরো পরিষ্কার ধারণা করতে চান, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধটী পড়লে বিশেষ সাহায্য পাবেন। ঐ প্রবন্ধের চারদিকে যে বাগ্বিতণ্ডার ধূলো উড়েছে—তা-সত্ত্বেও এ কথা বলতে সাহস করতে পারি।

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাটা করলেম সে কতকটা জমি তৈয়ার করার মত। এখন আসল বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক্।

গীতা বলেছেন, ভগবানের পরাপ্রকৃতি বিশ্বকে ধারণ ক'রে রেখেছে। উহাই ধর্ম্ম। অন্য ভাষায় ওকেই জগতের আধ্যাত্মিক সংস্থান বা moral ও spiritual order বলতে পারা যায়।

আপাত দৃষ্টিতে ভৌতিক শক্তির ক্ষমতা যতই বেশী বোধ হোক্, আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে তাকে মাথা নীচু করতেই হবে। চিরকালই সেইরূপ ক'রে এসেছে। বিশ্বের যা আধ্যাত্মিক সংস্থান—যা ধর্ম্ম, তার বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় তাকে ধারণ ক'রে রাখার কিছুই থাকে না। সে যে শূন্যের উপর দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে মরছে সে কথা বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—"The dumb fury of the down trodden finds its awful support from the universal law of moral balance. ... ... Politicians calculate upon the number of mailed hands that are kept on the sword-hilts; they do not possess the third eye to see the great invisible hand of the helpless and waits its time. The strong form their league by a combination of Powers, driving the weak to form their own league alone with their God."

আরামবাগীশেরা ও তথাস্তুবাদীরা বলবেন, তবে আর ভাবনা কি! আমরা যাই করিনে কেন, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইংরেজ যদি বিশ্বের সনাতন ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন ক'রে থাকে, ধর্ম্মের অমোঘ শক্তি নিজের গরজেই তার প্রতিবিধান করবেন। ধর্ম্মকে লঙ্ঘনজনিত গতির বেগেই ইংরেজের দম্ভ ধূলিসাৎ হবে! দুর্গতির চরম দুর্গতি এইরূপ ধর্ম্ম বা দৈবের উপর বরাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকার মনোভাব। আর এজন্য যদি বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করার অভ্যাসটাও থাকত, তাহলেও আশা করতে পারা যেত, এককালে এর প্রতিকার হবে। কিন্তু সেরূপ হওয়া দূরে থাক্, এই ঘোর তামসিক ঔদাসীন্যকে আধ্যাত্মিকতা মনে ক'রে, ত্বয়া হৃষিকেশ ইত্যাদির ঘুম-পাড়ানোর মন্ত্র আওড়ে মনটাকে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে রাখবার চেষ্টাই অহরহ হয়ে থাকে। সুতরাং এ জিনিষটার একটু আলোচনা করা দরকার।

ধর্ম্মের অমোঘ বিধি লঙ্ঘন ক'রে কেউ

পার পেতে পারেনা, এ কথা ধ্রুব সত্য। ইংরেজ যদি ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন ক'রে থাকেন তাঁকে সে ঋণ কড়াক্রান্তিতে শোধ করতে হবে! কিন্তু এই কর্জ্জ-আদায়ের জন্য যে শ্রীসুদর্শন চক্র মাঝে মাঝে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করে থাকেন, এরূপ বিশ্বাস রূঢ় কুসংস্কার মাত্র। তার প্রয়োজনও নাই। যে ধর্ম্মচক্র জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে,তার আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিচার অহরহ চলেছে। যে শক্তি ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন করে চলেছে, সেই শক্তিই আপনার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করে যাচ্ছে। খুব ধীরে নিঃশব্দে এ কাজ চলেছে বলে মানুষ মনে করচে যে কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার শক্তিটা জমতে জমতে মাত্রা পূর্ণ হলে যে দিন পায়ের নীচেকার মাটী টলমল করে কেঁপে ওঠে, তখনই তার চমক লাগে। কোনও রকমে আপনাকে বাঁধবার ব্যর্থ চেষ্টায়—সে তখন ছুটোছুটি করে মরে।

মানুষের মধ্যে দিয়েই ধর্ম্মের অমোঘ বিধান পূর্ণ হয়। মানুষই বিধাতার হাতের অস্ত্র। আমাদের বহুযুগব্যাপী জাতীয় পাপের শাস্তির বোঝা ইংরেজ-রূপে আমাদের ঘাড়ে চেপে খাজনা আদায় করতে এসেছে। তার পাওনার শেষ পাই পয়সা পর্য্যন্ত আমাদের শোধ করে দিতে হবে। প্রকৃতির আইনে তামাদির সুবিধাটাও নাই। আবার ইংরেজ যদি ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন করে থাকেন, তবে তাঁকেও সে ধর্ম্মের দেনা মায়-সুদ শোধ করে দিতে হবে। আমরাই হবো সে ব্যাপারে বিধাতার হাতের অস্ত্র। হবো বলাটা ঠিক হলোনা, গোড়া হতেই হয়ে আছি। আর অস্ত্র কথাটা শুনে চমকে ওঠার কারণ নাই। Salvation Army যে হিসাবে army, এটাও সেই হিসাবে অস্ত্র।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার, ধর্ম্ম-সঙ্গত ব্যবহার। অর্থাৎ আত্মার ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এক, এই ভাবটা সব সময়ে মনে জেগে থাকলে যেরূপ ব্যবহার স্বভাবতই হয়ে থাকে, সেইরূপ ব্যবহার। মানুষকে আপনার উপকরণ সামগ্রীর মতো করে দেখলে এই সনাতন ধর্ম্মের হানি হয়। তখন ধর্ম্মের অমোঘ বিধির নিকট তার মার পাওনা হতে থাকে! ইংরেজকে সেই মার আমাদের হাত দিয়েই অর্থাৎ আমাদের সংস্রবের মধ্যে দিয়েই পেতে হবে। আমরা ভয়ে লোভে বা ঔদাস্য-বশতঃ ইংরেজের সকল রকম অবিচার ও অন্যায় যদি নির্ব্বিচারে সহ্য করি, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক হিসাবে মৃত্যু বা জড়ত্ব প্রাপ্তি হতে বেশী বিলম্ব হবে না, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু এটাও তেমনি নিশ্চিত যে, ইংরেজকেও আমাদের সঙ্গে সেই আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে সহমরণে যেতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতের মাধ্যাকর্ষণের টান এড়িয়ে যাবেন, এমন ক্ষমতা ইংরেজেরও নাই! এই গেল এক রকমের মার।

আর একরকমের মার হলো দাবানলের মার। মানুষ যদি পলে পলে আপনাকে অবিচার-পীড়িত বলে মনে করে, অথচ তার প্রতিকার করার উপায় খুঁজে না পায়, মনের সঞ্চিত আক্রোশ মুখ ফুটে খুলে বলার সাহস

অবকাশ ক্ষমতাও না থাকে, তাহলে সেই রুদ্ধ আক্রোশ হতে যে বিষাক্ত বাষ্প জমে ওঠে, একদিন তা ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতরূপে আপনাকে প্রকাশ করবেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে Dumb fury of the down-trodden বলেছেন, এই দাবানল তারই প্রকাশের একটা রূপ। যে জাতির সামাজিক সংস্কার খুব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে এরূপ আকস্মিক উৎপাত যে সহজ হয় না, একথা খুব ঠিক। কিন্তু তাই বলে যে হবেই না, এমন কোন কথা নাই। বিশেষতঃ সমস্ত পৃথিবীর হাওয়াতে যেমন আগুনের ঝল্‌কা খেলে বেড়াচ্ছে, তাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার কোনই উপায় নাই। অগ্রপশ্চাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটবেই।

এই দাবানলের মার বড় ভীষণ মার। এর লেলিহান অগ্নিশিখায় দুই পক্ষেরই যুগযুগান্ত-সঞ্চিত কলুষ যে নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়ে যাবে, একথা ধ্রুব সত্য, কিন্তু পাপের সঙ্গে সঙ্গে পাপীর তিরোধান হয়ে যাওয়াটাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। জগতের ইতিহাসে একথা অনেকবার প্রমাণ হয়ে গেছে। সুতরাং এই দাবানলের দাহ হ'তে দেশটাকে বাঁচাতেই হবে। আর অসহযোগ আন্দোলন তারই বিধি-বদ্ধ চেষ্টা মাত্র।

কাজেই ইংরেজ ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন করলে ধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য নিয়মেই শাস্তি পাবে, এ বিশ্বাসে সান্ত্বনার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই লিখেছি, ইংরেজ আমাদের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত পাপের শাস্তির বিগ্রহরূপী। এই গেল প্রথম দফা। ইংরেজ আমাদের সম্বন্ধে যদি কোন অধর্ম্ম করে থাকে, তার দায়িত্বও উভয় পক্ষের প্রায় তুল্য-মূল্য। আমরা অন্যায়ের বোঝা এখন অনায়াসে বহন করলেই সে বোঝা এমন বেড়ে চলে যাওয়ার অবসর পায়। সুতরাং এ পাপ হতে আমরাও মুক্ত নই। এই হলো আমাদের দ্বিতীয় দফার পাপ। সুতরাং ভুভার-হরণের জন্য যখন বিষ্ণুর আবির্ভাব হবে, তখন তাঁর সুদর্শন চক্রের কাছে হ্যাটকোট ও ধুতি-চাদরের তারতম্য যে বড় বেশী হবে, এমন মনে হয় না!

আর যদি মনে করাই যায়, ইংরেজের পাপের শাস্তি ইংরেজ একাই ভোগ করবে, আমরা যেমন আছি ঠিক তেমনিটিই থেকে যাব, তাতেই বা কি? আমরা যেমন আছি ঠিক যদি তেমনি থেকে যাই, তাহলে ইংরাজের বিপুল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও আমাদের বিন্দুমাত্র লাভ নাই। হয়তো অ-লাভই আছে। যতক্ষণ বাবাটা বেঁচে থাকবে ততক্ষণ গুরুমশাই মরে কোনই লাভ নাই। পরেকার গুরুর ঠেঙ্গার বহর আরো বেশী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! সুতরাং ঐ বাবার অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থার যা জনক, তার মৃত্যুর ব্যবস্থাটা করাই পাকা কাজ। মানুষের উপর বরাতের তো কথাই নাই, স্বয়ং বিধাতার উপর বরাত দিলেও সে কাজ চলবে না। আপনার হাতেই তুলে নিতে হবে।

কাজটীও বড় সোজা নয়। হাজার বছর ধরে যে মিথ্যা ও মোহের নাগপাশ-বন্ধন আমাদের জীবনের চারধারে লক্ষ ফেরে

জড়িয়ে গেছে, তার পাকগুলি একটী একটী করে খুলে ফেলে মনের মুক্তির ব্যবস্থা। মনের মুক্তি লাভ হলে বাইরের স্বাধীনতা লাভটা বড় বেশী কথা নয়। তাছাড়া মুক্তিটা কেবল এক পক্ষের নয়। ইংরেজের মুক্তির ব্যবস্থাও আমাদেরই করতে হবে। ইংরেজের মুক্তিটা আমাদের মুক্তিরই উল্‌টো পিঠ। ইংরেজের মুক্তির ভাবটাও আমাদেরই তুলে নিতে হবে—এ কথাটা শুনতে প্রলাপের মতো লাগতে পারে, কিন্তু কথাটা বড়ই সত্য।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। যা-কিছু সত্য সম্বন্ধ উপলব্ধির পথে বাধা দেয়, তাই মানুষের পক্ষে বিষম বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজের এম্পায়ার মানুষের সঙ্গে এই সত্য সম্বন্ধ-উপলব্ধির পক্ষে একটা বিষম অন্তরায়। এই জন্য অনেক চিন্তাশীল ইংরেজ এই সাম্রাজ্যকে ইংরেজের পক্ষে শনি-স্বরূপ জ্ঞান করেন। চরিত্রের যে-সব মহৎ গুণের জন্য ইরেজ চিরদিন মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে, এই সাম্রাজ্যের হ্যাপায় পড়ে তা সে একে একে খোয়াতে বসেছে। এরূপ যদি চলতে থাকে, তাহলে ইরেজের চরিত্রের চরম অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকা ইংরেজের একটা ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়েছে আপনার পায়ের শিকলি কেটে। কিন্তু সব-চেয়ে বড় ফাঁড়াটাই এখন বাকী আছে। উপনিবেশগুলির সংস্পর্শে ইংরেজের নৈতিক অবনতির তেমন আশঙ্কা নাই। তারাও যে ঐ ঝাড়ের বাঁশ! সেখানে জুলুম-জবরদস্তি বা বকধার্ম্মিকত্ব—এ দুটোর কোনটাই তেমন চলে না। দরকার হলে তারা খোলাখুলি জানাতে পারে, "তোমভি মিলিটারী, হামভি মিলিটারী"। আয়ার্লাণ্ডের সহিত সংস্রবটাও তেমন মারাত্মক নয়। হাজার হোক্ ওদের গায়ের চামড়াও শাদা! তাছাড়া ও বিষটা বহুশতাব্দী ধরে অভ্যাস হয়ে গেছে। আর তারা যেরূপ মরিয়া হয়ে উঠেছে—তাদের পায়ের শিকল ছিঁড়ল ব'লে। সুতরাং আসল সমস্যা ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষ—বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষকে নিয়ে।

এই ভারতবর্ষের সংস্রবই ইংরেজের চরিত্রের পক্ষে বিষম সাংঘাতিক বিষের মত কাজ করছে। দেশটা যেমন বড়, লোক-সংখ্যাও তেমনি অগণ্য। কাজেই নানা উপায়ে এখানে যতগুলি ইংরেজকে পালন করতে পারা যায়, এমন আর কোন স্থানে নয়। কিন্তু এখানকার মানুষগুলির চিত্ত বহুযুগের অধীনতার ফলে আলো ও হাওয়ার স্পর্শ হতে বঞ্চিত হয়ে মহাবিষের আকর হয়ে উঠেছে। তার উপর এরা আবার একান্ত নিরীহ এবং এদের সহ্য করার শক্তিও অসীম। সুদিনে সাত্ত্বিকতার যোগে যে-সব গুণ আত্মার বল-লাভের সহায় ছিল, এখন তামসিকতার প্রভাবে সেইগুলিই ভীরুতা, কাপুরুষতা ও নীচতায় পরিণত হয়েছে। কাজেই এখানে যথেচ্ছাচারের অবকাশ একরূপ অসীম। এই কোটি কোটি অধঃপতিত মানুষের চরিত্রের কেন্দ্র হতে দাস-ভাবের যে জমাট বাষ্প শ্বসিত হচ্ছে, বিজেতার পক্ষেও তার সংস্পর্শ বড় নিদারুণ। আরো বিপদ এই, এখানকার লোকগুলো একেবারে বর্ব্বর নয়। এদের মধ্যেরই কাউকে বা

পৃথিবীর লোক আধ্যাত্মিকতায় গুরু ব'লে মানছে, কাউকে বা বিজ্ঞানের রাজ্যে রাজপদে অভিষেক করার আয়োজন করছে। কাজে কাজেই খোলাখুলি সোজাসুজি প্রভু-দাসের সম্বন্ধটা স্বীকার করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সমস্ত আকাশটা ছল-কপট-মিথ্যাচরণের বাষ্পে একেবারে ভরে উঠেছে। এর মাত্রা এতদূর বেড়ে গেছে যে, আমার সময় সময় সন্দেহ হয়, অন্যদেশের মুক্ত আলো-হাওয়ার জীব একজন এসে বেশী ক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে কিনা! খুব সম্ভব, এখানকার লোকেরা (দুইপক্ষই) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কল্যাণে মাছের মতো নিশ্বাস লওয়ার কোন কৌশল আয়ত্ত করেছে।

মিথ্যার বাষ্পটা সমস্ত দেশের উপর কেমন চেপে আছে, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। দৃষ্টান্তটি খুঁজে বের করতে হয়নি, উপস্থিত-মতো আপনি হাতের নাগালে জুটে পড়েছে। ইংলণ্ডের রাজপুত্র পৈতৃক জমিদারীতে শীকার খেলতে বা বেড়াতে আসবেন, এ বেশ ভাল কথা। উৎসাহ-প্রবণ যুবজনের চিত্তে ওরূপ সখ হয়েই থাকে। সুতরাং এখানকার নায়েব-মশায় শীকার ও আগমনী-খরচা বাবদ মাথট বসিয়ে যদি উৎসব সম্পন্ন করতেন, তাতে কারো কিছু বলার থাকত না। কিম্বা সরকার বাহাদুর যদি এমন হুকুম জারি করতেন যে, রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে যে ব্যক্তি উৎসব করবে না, সে আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হবে, তাহলেও বোঝার কিছু গোল হতোনা। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশে যেখানে কেবল আইনের সম্পর্ক, সেখানে হৃদয়-বৃত্তির লীলা দেখার জন্য তাঁরা লোলুপ হয়ে উঠলেন। লোকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে উৎসবে মেতে উঠেছে; এই ছবিটার মাধুর্য্য তাঁদের কাছে বড়ই মিঠে বোধ হলো। কিন্তু রাজভক্তি যদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, তাহলে? তাহলেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে উৎসব করতে হবে—সেই রাত্রে দুধ-চিঁড়ে-ভোজী লোকটির মতো—দুধ না জুটলেও যার গঙ্গাজল দিয়েও দুধ চিঁড়ের ফলারে ব্যাঘাত হতোনা—কারণ সেটা যে তার অভ্যাস! কিন্তু কোনও হতভাগ্যের যদি দুধ জিনিষটার উপর সত্যি-কার দরদ থাকে এবং জল-চিঁড়ের ফলার করতে মন রাজী না হয়? তার পর? তার পরে আর কি—নটে গাছটি মুড়োলো। কিন্তু এটা আমি রাজপুত্রের রূপকথার ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি। আসল কথা, তারপরে যে কি, সে কথা কেউ ঠিক জানে না। নটে-গাছটী মুড়ানোর কোন আদেশ বা ইঙ্গিত সরকার করেছেন, এ কথা বললে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু কিছুই ঠিক জানেনা ব'লে ঐ "তারপরে" সম্বন্ধে লোক নানারূপ কল্পনা ক'রে ভয় পেয়ে বসে। কিন্তু লোকে তো অন্ধকারে তুলসীগাছকেও ভূত ভেবে ভয় পেতে পারে! সেতো নিশ্চয়ই মিথ্যা ভয়। *

* রাজপুত্রের আগমনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারের কোনওরূপ সংস্রব নাই—লর্ড-রেডিং একথা বশেষ করে বলেছেন, আশা করি পাঠকদের সেটা অবিদিত নাই। লেখক।

ইংরেজের পক্ষে ইংলণ্ডের রাজার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক মনোভাব। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের যেটুকু ঐ সিংহাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাতে হিন্দু-মুসলমানের গৌরব বা সান্ত্বনা অনুভব করার তো কিছুই নাই! রামচন্দ্র, অশোক বা আকবরের বংশধরদের নামে এখানকার লোকের হৃদয় ভেদ ক'রে যে ভক্তি ও প্রীতির ধারা আপনা হতেই উৎসারিত হতে পারতো, নর্ম্মান উইলিয়মের বংশধরের চারিদিকে কলের সাহায্যে সেই উৎসবের লীলা দেখার জন্য সরকারের এত মাথাব্যথা কেন, এটা কিছুতেই বুঝতে পারিনে। এদেশের সঙ্গে ইংরেজের যে সত্য সম্বন্ধ—তাতে ইংরেজ দুটি জিনিষ অনায়াসে দাবী করতে পারেন—রাজ-ভয় ও রাজ-কর। তার চেয়ে বেশী কিছু দাবী করে বসলেই প্রকৃতি বেচারাকে নাহক বিপদগ্রস্ত করে তোলা হয়। বেচারা মেয়ে মানুষ, অতিথিকে বিমুখ করতে স্বভাবতই কুণ্ঠিতা। কাজেই রাজভয় জিনিষটাকে কোন মতে রাজভক্তি বানিয়ে তাড়াতাড়ি হাজির ক'রে দেয়। কিন্তু সে চীজ যে কি অপূর্ব্ব, তা যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন, এবং দেখেন নি এমন লোকও তো দেখিনে। আমায় আশ্চর্য্য লাগে, ইংরেজের মতো খাঁটী রাজ-ভক্তি-রস-গ্রাহীর মুখে সেই ভেজাল মাল রোচে কি করে? *

যাই হোক যেটুকু লিখলেম তাহ'তেই পাঠকেরা অনায়াসে বুঝতে পারবেন, ভারতবর্ষের সংস্পর্শে এসে অপ্রতিহত ক্ষমতা-পরিচালনের অবকাশ পেয়ে ইংরেজের চরিত্র কিরূপ শোচনীয় অধঃপতনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। অনেক ভাল ভাল ইংরেজ যাঁদের Little Englander বলত, এই নিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছেন এবং এখনও কেউ কেউ করছেন। কিন্তু আক্ষেপ করা মিছে। ক্ষমতার মোহ বড় বিষম মোহ, তার উপর যদি অর্থলাভের অজস্র সুবিধা থাকে, তাহলে তো কথাই নাই। সুতরাং ইচ্ছে ক'রে এই মোহের বন্ধন নিজের হাতে কাটা ইংরেজের সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু ইংরেজের মতো একটা অত-বড় জাতের অধঃপতন সমস্ত মনুষ্য-সমাজের পক্ষেই একটা গুরুতর বিপদ। কাজেই ওদের রক্ষা করার ভারটাও আমাদেরই তুলে নিতে হবে। ভগবান আমাদের উপরই সেই ভার দিয়েছেন। স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে হবে না—কেবল এইটুকু সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে, আমাদের মুক্তির চেষ্টা কেবলমাত্র আমাদের জন্যই নয়। † ধর্ম্মই সকলকে রক্ষা করেন। আমরা আমাদের ধর্ম্মকে রক্ষা করতে পারলে ইংরেজের ধর্ম্মও রক্ষা পাবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

---

* রসজ্ঞ পাঠককে খুলে বলার প্রয়োজন নাই, উপরে যা বলেছি, সে কেবল মেকি জিনিষ সম্বন্ধে। খাঁটি রাজভক্তি আমি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকি। সকল প্রকার অকপট প্রীতির ন্যায় ওর দ্বারাও চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ হয়ে থাকে। লেখক।

† আর এই ভাবটা মনে সব সময়ে জাগিয়ে রাখতে পারলে বিদ্বেষের একেবারে মূলোৎপাটন হয়ে যাবে। লেখক।

পারিজাত

স্বপন দেখিছে ঘুমাইয়া মনু
দশ বছরের ছেলে,
সহসা সেখানে ছোটপরী এক
আসিল পাখ্ না মেলে'।
চাঁপার মতন বরণ তাহার,
সোনার মতন পাখা,
দৃষ্টিতে হয় জোছনা বৃষ্টি,
বুকে রামধনু আঁকা।
মনুর খেলার সঙ্গিনী টুনু
ভালবাসে তারে কত,
স্নিগ্ধ পরীর মুখখানি ঠিক
দেখিতে তাহার মত!
হাসি বলে, "মনু কোথা পেলে টুনু
এমন সোনার পাখা?
হস্তে তোমার ওকি ফুল ভাই?
তুমি লবে বুঝি একা!"
পরী রেগে বলে, "টুনু বল কারে
আমি যে প্রণয়-পরী—
পারিজাত যদি থাকে দরকার
এসো, ওঠো ত্বরা করি।"

বাহির হইয়া চলেছে দুজনে
সুদূর আকাশ-পানে,
কোন্ দিকে হায় নিয়ে যাবে তারে
পরীই বুঝি না জানে!
উড়িয়া উড়িয়া অবশেষে তারা
আসিল নূতন দেশে,
কত বিচিত্র মোহন চিত্র
দেখিল সেখানে এসে।

দেখিল সেখানে ভাঙা হরধনু
শ্রীরাম-সীতার স্মৃতি,
দ্রুপদ রাজার মৎস্য-চক্র,
সব্যসাচির প্রীতি।
চিন্তা দেবীর বরণ-মালা
সাবিত্রীর সে শাঁখা,
দময়ন্তীর কনক মরাল
কমল-পরাগ মাখা—
ভ্রমেন সেথায় পদ্মিনী দেবী
জহর-ব্রতের পরে,
সঙ্গিনী সব মানস সরসে
ফুটে আছে থরে থরে।
মনু বলে ডাকি "পৃথিবী হইতে
এসেছি আমরা দুটী,
শুধু গুটি দুই পারিজাত দাও
ভরে দুজনার মুঠি।"
অশরীরী বাণী বলে, "হেথা মেলে
ঝরে-পড়া পারিজাত,
ধরার বাতাসে খসিয়া পড়িবে
কেমন ঠেকিবে হাত!"

আবার দুজনে ভাসিয়া চলেছে
আলোক-তুফান দিয়া,
রূপের বন্যা কাটাইয়া উঠে,
তপোবনে এক গিয়া!
খণ্ড-চাঁদের শুভ্র আলোকে
ঢেকেছে সে দেশখানা,
বেত্রহস্তে দাঁড়ায়ে নন্দী
প্রবেশ সেখানে মানা।

মদন সেথায় যোগ ভাঙ্গিবারে
এসেছিল পুরাকালে,
ভস্ম হইল বিরূপাক্ষের
ললাট-বহ্নিজালে।
দাঁড়াইয়া মনু নন্দীর কাছে—
বলে, "এনু ধরা হতে,"
আমরা দুটীতে অনেক কষ্টে
দুটী পারিজাত লতে।"
নন্দী বলিল, "ফোটা পারিজাত
এখানে মেলেনা বাছা,
এখানে যা আছে অস্ফুট তাহারা
এখনো নেহাৎ কাঁচা।"

তারপর দোঁহে পেলে পথে যেতে
শিখণ্ডী মৎ গিরি,
গৌরী যেখানে শিবকে পেলেন
তপশ্চর্য্যা করি।
পঞ্চতপের যোগের আসনে
নোয়াইল দোঁহে শির,
মাথায় দিলেক বাপীর সলিল
সতী-নয়নের নীর।
ক্লান্ত পক্ষ উড়িতে উড়িতে
অবশেষে দুইজনে,
পঁহুছিল আসি চির-অভিরাম
সেই নন্দন বনে।
হাত ধরি দোঁহে স্ফটিক বেদীতে
দাঁড়াইল তরুমূলে,
অপ্সরীগণ পায়ে ঢেলে দিল
দুধে-আলতায় গুলে।
ইন্দ্র বলেন, "পারিজাত লবে
কি আছে এমন বল?
পুষ্প-সায়কে হারাতে পারিলে
তবে সে ফলিবে ফল।"
মনু বলে রাগি, "খড়্গ হানিব
ঐরাবতের শিরে,
বজ্র তোমার ব্যর্থ করিয়া
পারিজাত লব ছিঁড়ে।"
ইন্দ্র বলেন চুমা দিয়া মুখে,
"বট তুমি বট বীর,
দিব পারিজাত, তিষ্ঠ ক্ষণেক
হও তুমি হও স্থির।
পারিজাত হেথা ফোটেনাক জেনো
আসে তা ধরণী হতে,
ইচ্ছা করিলে বাগানে তোমার
এই পারিজাত পেতে।"

বালক মনুর বিক্রম দেখি
দেবদেবীগণ হাসে,
নৃত্য থামায়ে স্নিগ্ধ-নয়না
উর্ব্বশী কাছে আসে।
বরুণ বলেন, "আমার তটিনী
দোঁহারে শোনাবে গান"
পবন বলেন, "আমার অনিল
পরিমল দেবে দান।"
চন্দ্র বলেন, "দেব সুধা-ধারা
কুসুম-শয়ন মিঠে",
রবি বলে, "আমি ফোটাবো কমল
তোমাদের কোলে-পিঠে।"
ব্রহ্মা বলেন, "সৃজন করিব
ও বুকে নূতন ধরা",
বিষ্ণু বলেন, "পুণ্য-পীযূষ
দিব যে কুম্ভভরা।"

সকলে মিলিয়া আশীষ করিয়া
পারিজাত দিল করে,
জাগি দেখে মন্নু সে আছে শুইয়া
তাহারি আপন ঘরে।
কোথা পরীরাণী মিলাইয়া গেল
ইন্দ্রধনুর সনে!
স্বপ্নকে তবু সত্য বলিয়া
লাগিছে মন্নুর মনে।

প্রভাতে এসেছে খেলাইতে টুন্নু
মন্নু বলে তারে রাগি
"কালিকার সেই পারিজাত তুমি
নিয়ে গেলে কার লাগি।"
টুন্নু কোনো কথা বুঝিতে পারেনা—
মন্নু বলে, "দাও ফুল—"

টুন্নু যত হাসে মন্নু রাগে তত
অকারণ করে ভুল।
ঠাকুমা তাহার হেসে লুটালুটি
ক'ন্, "হয়ে যাক্ জানা
কাহার লাগিয়া হানা দিয়ে এই
পারিজাত হ'ল আনা।"

আটটী বরষ কাটিয়া গিয়াছে
মন্নু টুন্নু বধু-বর,
নন্দনবন নামিয়া এসেছে
নবীন ধরণী পর,
সুমুখে তাদের পারিজাত ফোটে
একি রে দারুণ ব্যথা,—
তুলিতে গেলেই ম্লান হয়ে যায়
মিলাইয়া যায় কোথা!*

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দাম্পত্য-সম্বন্ধের আদর্শ বিচার

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি আদর্শ অত্যন্ত ফাঁকা ও মিথ্যা হইলেও সে সম্বন্ধে যখন এত বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে আপততঃ যেটী মনে আসিতেছে সেটার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সেটী হইতেছে অন্ধের সহিত স্বামীর বিবাহ দেওয়াই আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখানো। অন্ধের সহিত স্বামীর বিবাহ দেওয়ায় যে উভয়েরই ধর্ম্মহান, তাহার উপর যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া হয় তাহারও ধর্ম্মহানি, এ সকল প্রত্যক্ষ নৈতিক সত্য ঐ সকল সতী-মহিমা-কীর্ত্তন-কারীদের মনেও স্থান পায় না! বাস্তবিক, আত্মত্যাগ জিনিষটাই বড় বিপজ্জনক। আমরা এ সংসারে আত্মত্যাগের জন্য আসি নাই, আত্মার পরিপূর্ণতাতেই আমাদের জীবনের প্রধানতম সার্থকতা। সেই উচ্চতম পরিপূর্ণতার জন্য যেখানে আত্মত্যাগ আবশ্যক, সেইখানেই কেবল তাহা সমর্থন-যোগ্য। সে আত্মত্যাগ প্রকৃতপক্ষে ত্যাগও নয়। তাহা বৃহত্তর আত্মার পরিপূর্ণতা ও রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থবিসর্জ্জন মাত্র। যীশু আত্মত্যাগ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাকে জীবন দিতে হইয়াছিল। "আত্ম" বলিলেই তাহা হীন স্বার্থপরতা বুঝায় না, যথার্থ আত্মার সহিত যাহার সম্বন্ধ তাহা সস্তা পরার্থ-পরতার চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ। শাস্ত্র ও দেশাচারের যন্ত্রচালিত অনুবর্ত্তনে আমাদের

---

* "ব্লু-বার্ড" অবলম্বনে

দেশে যে মোহান্ধ সংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে স্বামীর শ্রেয়কেই স্ত্রীর শ্রেয় বলিয়া ধরিয়া লওয়াতেই, নৈতিক আদর্শের এতটা বিকৃতি ঘটিয়াছে। স্বামীকে পাঁচটা সুখাদ্য ভোজ্য দিয়া স্ত্রী যেমন তৃপ্তি লাভ করেন, একটী বালিকা বা যুবতী দিয়াও তিনি তেমনি আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা যে কতটা নিম্নস্তরের মনের পরিচয় তাহা তাঁহাদের বুঝানো অসম্ভব। কারণ প্রত্যক্ষ সত্য না দেখিলে কেহ তাহা দেখাইতে পারে না। যাহা হউক, সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাক্।

প্রথমতঃ রসনাতৃপ্তির সহিত অন্যটীর তুলনা হইতে পারে না, অপর প্রবৃত্তির চরিতার্থতা আমাদের সমস্ত চরিত্র, মনের সহিত সম্বন্ধ। তাহাকে যতই উন্নত করিতে পারা যায়, ততই আমাদের চরিত্রের বিকাশ হইতে থাকে, অন্যথা আমাদের পশুর অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলে। এই-খানেই ত পশু ও মানুষে প্রধান প্রভেদ। মানুষের যত উন্নত হইবার সম্ভাবনা আছে, পশুর তাহা নাই—এদিকে আবার মানুষ যত মন্দ হইতে পারে, পশুও তত পারে না। কারণ তাহাদের ইচ্ছাশক্তি ও ন্যায়-অন্যায়-বোধ নাই, তাহারা প্রকৃতি-চালিত হইয়া তাহারই অভিপ্রায়-মত জীবন যাপন করে মাত্র। বাস্তবিক, মানুষের স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটীর মধ্যে প্রকৃত যে কত নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা সম্প্রতি-মাত্র মানুষ ঠিক-মত বুঝিবার চেষ্টা পাইতেছে। বলিলে সকলেই খড়্গহস্ত হইবেন জানি, কিন্তু শাস্ত্রকারদেরও এ বিষয়ে তেমন উচ্চ ধারণা ছিল না। মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি তখন এতটা বিকাশ লাভ করে নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণার বিষয় তো বলিতে যাওয়াই বৃথা। আর এক পক্ষকে বুঝিতে ও জানিতে না পারিলে অপর পক্ষের সহিত তাহার সম্বন্ধের ব্যবস্থাও কখনই ঠিক হইতে পারে না। মনুষ্য-প্রকৃতির সাধারণ আদর্শও তখন এতটা উচ্চ ও বিস্তৃত হইতে পারে নাই। তাঁহাদের সময়ে হয়ত তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য লোকের শ্রদ্ধাও লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সে সময়ের লোকেরা তাহাতে উপকৃতও হইয়াছিল। পরে দেশের অবনতির সহিত আর কেহ তাঁহাদের অপেক্ষা উন্নততর ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে না পারায় ও বংশ-পরম্পরায় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার সংস্কারটী সংক্রমিত হইয়া লোকে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবার সাহসও হারাইয়া ফেলিল। তাহার পরিবর্ত্তে একপ্রকার আতঙ্ক-মিশ্রিত অন্ধ ভক্তি তাঁহাদের উপদেশ ও ব্যবস্থাগুলিকে আঁকড়াইয়া রহিল! নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে তাহার একটী নূতন ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছু করিতে কাহারও সাহস থাকিল না।

এক্ষেত্রে কথা উঠিতে পারে যে, উপনিষদের মধ্যে যে "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি" ইত্যাদি ভাবের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় এবং কাব্যাদিতে স্থানে স্থানে যে পবিত্র, একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের চিত্র দেখিতে পাই, তাহা তবে কেমন করিয়া আসিল? এ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়, আমাদের দেশে একসময়ে মনীষীবৃন্দের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তবিকই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত সাধারণ মনুষ্য ও সমাজের কোন যোগ

না থাকায় তাহা সত্য পৃথিবীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই। তাই দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে পত্নীর সহিত আলোচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু এ সঙ্গে দুই পত্নীর উপস্থিতির অসামঞ্জস্য ধরিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের আলোচনা গুরুশিষ্য-সংবাদ হইয়াছে, কিন্তু দুই আত্মার প্রেমের মিলনে যে একটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ ও সত্যদর্শন জীবনের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইতে পারে নাই। এ সত্যদর্শনের জন্য তাঁহার পত্নীদ্বয়ের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি শিষ্যদের সঙ্গেও ঠিক এইরূপেই আলোচনা করিতে পারিতেন, এবং পত্নীদ্বয়ও পত্নী না হইয়া শিষ্যা হইলে কোনই ক্ষতি হইত না। তবু এই সময়েই সত্যদর্শন বিশুদ্ধতম থাকায় স্ত্রী-পুরুষের ব্যক্তিত্বেরও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা-লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বকালের শাস্ত্রাদির মধ্যে অনেক জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকিলেও কেবল তাহার সুদেই যদি আমাদের চালাইতে হয়, তাহা হইলে আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিতে পারে না। এখন জীবন-যাত্রা সকল দিকেই অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং কেবল পুরাণ-পুঁজিতে আর চলিতে পারে না, মূলধনও বাড়াইতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে অনেকদূরে আসিতে হইয়াছে। এইস্থলে বলা আবশ্যক, কাব্যাদিতেও যে আমরা দুইচারিটি আদর্শ প্রেমের ছবি দেখিতে পাই, তাহা শাশ্বত মানব-মনের আদর্শ,—হঠাৎ সকল বাধা-সংস্কার ভেদ করিয়া দেখা দেওয়ার দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাহা সেই সময়কার সংহত মানব-সমাজের চিত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তাহাদের ঔৎকর্ষও দশজন তেমনটি বুঝিয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে ঐগুলি সনাতন মানবকে অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়াই হয়ত তাহাদের মহিমাই পরে লোকের উপর ধীরে ধীরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

বাস্তবিক, সর্ব্বপেক্ষা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যেই যে গলদ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ নারীর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণাই এ পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে পরিস্ফুট হয় নাই। মানুষের সত্যপ্রকৃতির সংস্কারবশে সময়ে সময়ে তাহার মধ্যে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের বিকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যেন কেমন আকস্মিক ঘটনার মত! সমাজ, আইন ইত্যাদি সংহত মানব-মনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেন তাহা হইয়াছে। ভালবাসার আর্ট অনুশীলন করিবার ক্ষেত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষা কিছুই এপর্য্যন্ত মানুষ পায় নাই!

এইবার আমাদের পূর্ব্ব কথায় ফেরা যাউক। এতক্ষণ দম্পতীর দুইজনের চরিত্রের আদর্শের দিকে দেখিতে গেলে অন্যাকে স্বামী-দান যে কতটা বিকৃতবুদ্ধির পরিচায়ক, তাহারই একটু আভাস দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তাহা স্বামীর এবং আপনার উচ্চতম ও সত্যতম আদর্শ-লাভের একান্ত পরিপন্থী। তার পর মানুষের ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা ও অধিকার স্বীকার করিলে ইহা কি বলিয়া দিতে হইবে যে, তোমার স্বামীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য একটী পূর্ণ পবিত্র কুমারী-জীবনকে বলি দেওয়ায় তোমার কোনই অধিকার থাকিতে পারে না? ভোজ্যদ্রব্যের সহিত সমশ্রেণীতে ফেলিয়া তাহাকে কি-চক্ষে দেখা হয় তাহাও

কি আঙুল দিয়া দেখাইতে হইবে? তাঁহার পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র মাত্র করিয়া দিলেও তাহার বিশেষ সম্মানিত পদবী লাভ হইতে পারে না! "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কথাটী স্ত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ গৌরবজনক নহে। বাস্তবিক, পুত্রকে অন্ধভাবে বড় করিয়া দেখার দিন ত গিয়াছে, পিণ্ডদান না করিলে চতুর্দ্দশপুরুষ নরকস্থ হইবেন, অর্থাৎ আমরা মরিয়াও অনির্দ্দিষ্ট ও একান্ত অসহায়ভাবে পুত্রের দেওয়া খাওয়ার অনুপযুক্ত কতকগুলি খাদ্যের অপেক্ষায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকিব, ইহা বিশ্বাস করানো ও তাহা লইয়া কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিতে যাওয়া, হাস্যকর মনে হয়। তবে পুত্রের দ্বারা পিতৃ-ঋণ-শোধের যে কথা আছে, তাহার অন্য অর্থ করা যাইতে পারে। সে পিতৃঋণের সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের ঋণও জড়িত এবং তাহা সন্তান মাত্রের দ্বারাই শোধ হইতে পারে। কিন্তু এখনকার দিনে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ সামাজিক জীব, জীব হিসাবে তাহার কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকিলেও আপনার উচ্চতম বিকাশের পরিপন্থী কোন কর্ত্তব্যই তাহার থাকিতে পারে না। এইস্থলে একটী কথা মনে পড়িল—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বীরাজ নামক পুস্তকের একস্থানে পৃথ্বীরাজ-পত্নীরা যখন তাঁহাকে যুদ্ধ-জয়ের পর বরণ করিতেছেন, তখন প্রথমা মহিষী না আসায় তাঁহাকে সংযুক্তা ডাকিয়া আনিবার সময় বলিতেছেন;—

"যদি, দিদি রূপমোহে থাকে অন্যে
আসক্তি তাঁহার,
কি ক্ষোভ তোমার তাহে? যজ্ঞে, ব্রতে,
পুণ্যকর্ম্মে জ্যেষ্ঠা তুমি, তব অধিকার।
হোক না অপর কেহ, ক্রীড়ায়, কৌতুকে,
রঙ্গে ভূপতির ভোগের সঙ্গিনী;
কিন্তু দিদি! ধর্ম্মে, কর্ম্মে
তোমারই প্রথম স্থান।" ইত্যাদি।

এই অংশটী অনেক স্থলে উদ্ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে। যদি ইহা কেবল তখনকার সময়ের নৈতিক অবস্থা বলিয়াই ধরা হইত, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু ইহা একটী বিশেষ গৌরব ও প্রশংসাজনক উক্তি বলিয়াই সর্ব্বত্র দেখানো হইতেছে এবং এই ভাবের কথা অনেকস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়! ইহাতেই সাধারণতঃ সহধর্ম্মিণীত্বের অধিকার ও গর্ব্ব ভুলিয়া স্ত্রী স্বামীকে ভোগের বা সন্তানের জন্য আরও বিবাহ করিতে পরামর্শ দিয়া বা তাহাতে সম্মত হইয়া থাকেন। আমাদের সমাজের পুরুষদের এ কৌশলটী মন্দ নয়। কিন্তু বাস্তবিকই ধর্ম্মের নামের চাকচিক্য থাকিলেই কি সত্য অমনি মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে? ধর্ম্মের অর্থ কি? যাহা শাশ্বত মানব-মনের উচ্চতর ধর্ম্মের বিরোধী, তাহাকে জোর করিয়া ধর্ম্ম নামে অমনি অভিহিত করিলেই হইল! স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক উভয়বিধ মিলনের পূর্ণতাই বিবাহের ধর্ম্ম। ইহা যতটা উচ্চভাবে বিকাশলাভ করিতে পারিবে ততই তাহার সার্থকতা। সন্তান লাভ (পুত্রমাত্র নহে) ইহার একটী বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তার পর শারীরিক সম্বন্ধ একান্ত বর্জ্জন করিয়া বা মধ্যবর্ত্তী অন্যের দ্বারা কলুষিত করিয়া ইহার মধ্যে অন্যের সংস্পর্শ ঘটিলে যে ইহার পবিত্রতা নষ্ট হইল, ইহাও কি আবার বলিয়া বুঝাইতে হইবে? সংস্কারে অন্ধ না হইলে স্বামী একবার আপনার অন্তরের

দিকে চাহিলেই বুঝিবেন, তাঁহার ঐ "পুত্রার্থে" অথবা স্ত্রী বা মাতার অনুরোধ ও তাঁহাদের সেবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিবার প্রকৃত কারণটী কি? এই সকল "ধর্ম্ম" ও "কর্ত্তব্য" ভেদ করিয়া গোপনে তাঁহার মনটী উল্লসিত হইয়া উঠে কেন, তাহার খোঁজ লইতে গিয়া কোনদিন তিনি দেখিয়াছেন কি—সে উল্লাসটী সম্ভবতঃ নিছক "ধর্ম্ম" নহে? কারণ তাহার দুর্গন্ধ চাপা দেওয়া কঠিন। তার পর আর একটী বিশুদ্ধ বালিকা-জীবনের কথা যে কাহারও একবার মনেও পড়ে না, এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। সে ত তথাকথিত সহধর্ম্মিণীত্বেরও দাবী করিতে পারে না, তবে তাহার স্থান কোথায়, জানিতে পারি কি? তবে তাহাকে খাদ্যদ্রব্যের সহিতই ত সমান করিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—বড় জোর সে না হয় পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র মাত্র!

বাস্তবিক আধ্যাত্মিকতা যেখানে সগৌরবে ঘোষিত হয়, মোহান্ধতা সেইখানেই দৃঢ়ভাবে রাজত্ব করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে দুর্নীতিগুলি সকলে দূর করিতে না পারিলেও ভাল লোকে সেগুলি মন্দ বলিয়াই জানেন। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা বলিবার যো নাই। তাহারো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া "ধর্ম্ম" নামে চালাইতেই হইবে। দুঃখের বিষয়, ইহাতে সব দিক দিয়া বাঁধা পড়িয়াছে প্রধানতঃ মেয়েরাই।

বঙ্গনারী।

পথের সুর

ডাকে দূর গহন দীর্ঘ পথ,
দ্বারে দাঁড়িয়ে ওই যাত্রা-রথ,—
যত মিথ্যে-সুখ, মিথ্যে-দুখ
চক্রে তাব গুঁড়িয়ে দে।
হেথা কাউকে তোর নেইক ভয়,
পথে ছাখ্ নতুন সূর্য্যোদয়,
সবে ধরবি হাত, চলবি সাথ,
জয়-নিশান উড়িয়ে রে।
হাসে সাম্‌নে তোর গৌরী মা,
মরি, নেইক তাঁর শ্রীর সীমা,
ঝরে মার স্নেহের দূর্ব্বা-ধান,
লুটিয়ে শির, কুড়িয়ে নে।
তোরা করবি লাভ দৈব বর
যার স্পর্শে নর হয় অমর,
ওরে মৃত্যুজিৎ পুত্র তুই
শান্তিজল ছড়িয়ে দে!

এক শ্রেষ্ঠ সাম— সত্য-ধন
ধ্রুব মন্ত্রবীজ কর্ গ্রহণ,
জানি ফল্‌বে তোর তীর্থফল
মুক্তি-স্নান গৌরবে।
জাগে যুগ্-যুগের মাঙ্গলিক
মহা দীক্ষাগীত দিগ্ বিদিক্,
পাবি দৈবতের যজ্ঞভাগ
আত্ম-ধূপ-সৌরভে।
নিতি দিচ্ছে ডাক হিম-গিরির
ওই শুক্ল-কেশ তুঙ্গ-শির;
গাহে নীল গভীর সিন্ধুনীর—
"কর্ বরণ সৎ শ্রেয়ঃ।
ওরে মন-কমল কর্ অমল
হোক্ যোগ-জীবন পূর্ণ বল,
আজি অর্পি চল্, কর্ম্মফল
তুই নিখিল-মৈত্রেয়!"

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্তাভ। (একাকী) ওটা কেলিও না, ঐ যে আসছে ওদিক দিয়ে? কেলিও! কেলিও! মর্, লোকটা চলেছে কোথা?

(কেলিওর প্রবেশ)

জান কি, বন্ধু, তোমার রাজকন্তে কি মজার খেলাটাই খেলছেন আমাদের নিয়ে। তিনি তাঁর স্বামীকে সব বলে দিয়েছেন।

কেলিও। জান্লি কি করে?

অক্তাভ। সে আর ভুল হবার যোটি নেই, এই আমি ক্লোদিওর কাছ থেকে সবে আসছি। কথা এই, মারিয়ানাকে যদি আর ত্যক্ত-বিরক্ত করতে মানস করি, তবে আমাদের মাথার ওপর তার দরজায় হুড়্কো পড়্বে।

কেলিও। মারিয়ানার সঙ্গে তোর ত একটু আগে দেখা হয়েছিল, সে কি বললে?

অক্তাভ। যা বল্লে তার মধ্যে এ সুসংবাদটির ইঙ্গিত কিছু ছিল বলে টের পাই নি, তবে তাতে ভাল কথাও বড় ছিল না! শোন্ কেলিও, তুই এ মেয়েটাকে ছেড়ে দে। কে আছ? আর এক-গেলাস!

কেলিও। কার জন্যে?

অক্তাভ। তোরই জন্যে। দেখ্, মারিয়ানা একটা ভণ্ডতপস্বিনী। সকাল বেলায় সে কি যে বল্লে তার কিছু যদি বুঝে থাকি! আমি যেন একেবারে বোকা বনে গেলেম, একটা কথারও জবাব দিতে পারলেম না। দূর হোক্, ওদিকে আর মন দিস্ নে। কেমন, রাজী ত? ও বেটিকে যদি আর কখনো একটা কথাও বলি, তবে যেন আমার মুণ্ডপাত হয়। বুক বেঁধে দাঁড়া, কেলিও, ওদিকে আর মন দিস্ নে।

কেলিও। আমি তবে যাই।

অক্তাভ। কোথা যাস্?

কেলিও। রাত্তির বেলা সহরে আমার একটু কাজ আছে।

অক্তাভ। তোর চেহারা দেখে মালুম হয়, তুই যেন গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিস্। কেলিও, তুই ভাবছিস্ কি? পৃথিবীতে আরও কত মারিয়ানা আছে। আয়, আমার সঙ্গে খেয়ে দেয়ে একটু ফুর্ত্তি কর্, ও মারিয়ানা-টাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দি।

কেলিও। না, এখন যাই; আমি থাকৃতে পাচ্ছিনে, কাল দেখা হবে ভাই।

(প্রস্থান)

অক্তাভ। কেলিও! কেলিও! শোন্ দেখি। একটা মারিয়ানাকেই খুঁজে এনে দিচ্ছি—সে বড় শান্ত হবে, বড় শিষ্ট হবে, বিশেষতঃ কোন পূজা-অর্চ্চনার ধার ধার্বে না। আঃ! আপদ ঘণ্টাগুলো! প্রাণটা টেনে-হিঁচড়ে না বের ক'রে থামবে না, দেখ্ছি!

(ছোকরার প্রবেশ)

ছোক্রা। মশাই! সে লাল টুকটুকে মেয়েটি জানলার ধারে নেই; আপনার নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করতে পার্বে না।

অক্তাভ। চুলোয় যাক্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড!

তবে কি লেখা আছে, আজকে একাই আমায় ভোজন নির্ব্বাহ কর্তে হবে? রাত তো দেখি যেন ঘোড়ায় ছুটে আসছে। এখন করি কি ছাই? বেশ! বেশ! আমার এতেই চলে যাবে।

(মদ্যপান)

আমার দুঃখগুলোকে এই মদের মধ্যে—তা না হয়, অন্ততঃ এই মদ্যটাকে আমার দুঃখগুলোর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারি। আঃ! না হোক, উপাসনা ত শেষ হ'ল। ঐ যে মারিয়ানা ফিরছে।

(মারিয়ানার প্রবেশ)

মারিয়ানা। আপনি এখানে? এর মধ্যেই বসে গেছেন। কি একা একা মাতাল হওয়াটা বড় সুবিধা লাগে না, না?

অক্তাভ। জগৎশুদ্ধ সবাই আমায় পরিত্যাগ করেছে। তাই সেখানে জোড়া জোড়া দেখবার চেষ্টায় আছি, তা হলে অন্ততঃ আমিই আমার সাথী হতে পারবো।

মারিয়ানা। সে কি? আপনার এ দারুণ নির্জ্জনতা দূর করবার জন্যে ? একজন বন্ধুও নেই, একটি মেয়ে-মানুষও নেই?

অক্তাভ। তবে মনের কথা বল্‌ব কি? রোজালিন্দ বলে একটি মেয়েকে ডেকে পাঠালেম—সে মাঝে মাঝে আমার কাছে থাকে। কিন্তু সেও নাকি আজ সম্ভ্রান্ত মহিলা হয়ে সহরে নিমন্ত্রণে বেরিয়েছে।

মারিয়ানা। বড়ই দুঃখের কথা, আপনার প্রাণটা ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে নিশ্চয়ই।

অক্তাভ। তা আর বলবার নয়—এই প্রকাণ্ড ভরা-গেলাসের মধ্যে সে ফাঁকটাকে যে ধরাতে এত চেষ্টা করছি তাও পারছি নে। তারপর আবার তোমার ঐ শব্দ আমার মাথার খুলি চৌচির করে দিয়ে বিকেলের খাওয়ার দফা পর্য্যন্ত শেষ করেছে।

মারিয়ানা। আচ্ছা, বলুন ত, আপনি যে মদ খচ্ছেন তিনি কি ধান্যেশ্বরী?

অক্তাভ। তামাসা ক'রো না; ইনি স্বয়ং খৃষ্টের অশ্রু।

মারিয়ানা। আশ্চর্য্যের কথা, আপনি ধান্যেশ্বরী খান না। একবার খেয়েই দেখুন না!

অক্তাভ। কেন তা খেতে বল্‌ছ তুমি, শুনি?

মারিয়ানা। একবার আস্বাদ করবেন শুধু। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি দুটোর কোন পার্থক্য নেই।

অক্তাভ। হ্যাঁ, এই সূর্য্যে আর প্রদীপে যেমন।

মারিয়ানা। না, দুটো ঠিক একই জিনিষ বলছি আমি।

অক্তাভ। কি যে কথা! আমাকে নিয়ে মজা করছ?

মারিয়ানা। আপনি তবে অনেকখানি পার্থক্য দেখ্‌ছেন?

অক্তাভ। নিশ্চয়ই।

মারিয়ানা। আমার বিশ্বাস ছিল, মদ আর মেয়েমানুষ বুঝি একই ধরণের। মেয়েমানুষও কি এই শুভ্র বোতলটির মত ছিপি-আঁটা একটা বহুমূল্য পাত্র নয়? যেমন গুণ ও শক্তি, সেই অনুসারে তারও ভিতরে নাই কি একটা পাশবিক অথবা দিব্য মাদকতা? সে জাতের মধ্যেও নাই কি ছোটলোকের মদ আর যে মদ হচ্ছে খৃষ্টের

অশ্রু ? কি নীচ ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আপনাদের, আপনারা আবার কোন্ মুখে তাদের উপদেশ দিতে যান ? ছোট লোকে যে মদ খায় আপনারা সে মদ খাবেন না, অথচ ছোট লোকে যে মেয়ে মানুষ চায়, আপনারাও চান সেই মেয়েমানুষ। এই যে সোনালী পাত্রের মধ্যে রয়েছে একটা উদার কবিত্বময় তেজ, এই যে অলৌকিক রসধারা আতপ-তাপিত ভিসুভিয়স তার ধাতুস্রাবের উষ্ণতা দিয়ে তৈরী করেছে, তার বশে নাকি আপনারা সব শক্তি হারিয়ে টল্‌তে টল্‌তে সামান্যা গণিকার কোলে গিয়ে পড়্‌বেন ; কিন্তু সামান্য দরের মদ খেতে আপনাদের লজ্জা হয়, গলা উল্‌টে আসে। জিভ্! আপনাদের বড় সৌখীন, কিন্তু প্রাণটা এত শস্তায় মস্‌গুল্ হয়ে যায়। আসি তবে মশাই। প্রার্থনা করি, রোজালিন্দ আজ রাত্রেই ঘরে ফিরবে।

অক্তাভ। অনুগ্রহ করে দুটিমাত্র কথা শুনে যাও, মারিয়ানা—আমার উত্তরটা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। আচ্ছা, বল দেখি, এই যে বোতলটি রয়েছে, এর অনুগ্রহ পেতে কতটা সাধ্য-সাধনা কর্‌তে হয় ? তুমি বল্‌ছ, এ একটা দিব্য তেজে ভরপুর ; চাষার সঙ্গে রাজার যে সাদৃশ্য এর সঙ্গে ছোটলোকের মদের ঠিক সেই সাদৃশ্য। বেশ, তবুও এই দেখ তাকিয়ে, একে নিয়ে যা খুসী কর্‌তে পার, কিছু আপত্তি করবে না! আমার ত বিশ্বাস, এ কোন দীক্ষা পায় নি, এর কোন ধর্ম্মজ্ঞান নেই। দেখ ত কেমন শান্তশিষ্ট মেয়েটি এ ! এক কথাতেই সে তার আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেছে, গায়ে ধুলো-বালি-মাখা অবস্থাতেই সে ছুটে পালিয়েছে, নিজেকে বলি দিয়ে আমায় কিছুক্ষণের জন্য নির্ভাবনা কর্‌তে। একটুও তার দেরী হল না, সুগন্ধ নাসারঞ্জি সতীমুকুট তার ধুলোয় গড়িয়ে পড়্‌ল—না, কথাটা আর ঢাক্‌তে পাল্লেম না, প্রথম চুম্বনের তপ্ত আবেগে সে তার সবখানি নিয়ে আমার অধরের ভিতরে গলে যাবার উপক্রম করেছিল।

মারিয়ানা। আপনি মনে কর্‌বেন কি, ও জিনিষটার দর আরও বেশী কিছু ? কিন্তু বাস্তবিকই, আপনি যদি ওর এমন সত্যিকার প্রণয়ী হন, আর ওটি তৈরী করবার ব্যবস্থাপত্রখানা আপনার যদি হারিয়ে যায়, তবে আপনি কি তার একটিমাত্র ফোঁটার জন্যে আগ্নেয় গিরির মুখে অবধি ছুটে চলেন না ?

অক্তাভ। ওর দর যা তাই, বেশীও নয়, কমও নয় ? ও জিনিষটি জানে, খেতে সে বড় ভাল, আর সে তৈরীই হয়েছে খাবার জন্যে। বিধাতা তার উৎপত্তি স্থান একটা দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরে কি একটা পুকুরের তলে লুকিয়ে রাখেন নি, তিনি তাকে আমাদের পথের ধারে ধারে সোনালী রঙের স্তবকে লুকিয়ে রেখেছেন ; সেখানে থেকেই সে তার প্রেমের ব্যবসা চালাচ্ছে—পথিকের হাতখানা একটু ছুঁইয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে, তার নিটোল গালটি সূর্য্যের আলোকে ধরে দেখাচ্ছে, চারদিকে তার সন্ধ্যা-সকালে মৌমাছি আর ভোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুণ গুণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃষ্ণায় [illegible]সন্ন পথিক তার সবুজ ডালপালার তলে শুয়ে বিশ্রাম করতে পারে ; সে ত কখনও পথিককে নিরাশ করে রাখে নি, যে মধুর

অশ্রুবিন্দুতে তার বুকখানা ভরা তা ত কখনও দিতে সে অস্বীকার করে নি! হায়! মারিয়ানা, সৌন্দর্য্য বিধাতার বড় ভীষণ দান! যে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞতার বড়াই করে, আসলে সে কৃপণমাত্র। নিষ্ঠুর যে সৌন্দর্য্য তার চেয়ে দুর্ব্বল যে সৌন্দর্য্য তারই ওপর ভগবানের করুণা। আসি তবে বোন; কেলিও যেন তোমায় ভুলতে পারে।

[অক্তাভ সরাইখানায় আর মারিয়ানা নিজ-ভবনে চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভিন্ন একটি রাস্তা

কেলিও, চিয়ুতা

চিয়ুতা। দেখুন, অক্তাভকে বিশ্বাস করবেন না। সে না বলেছিল মারিয়ানা তাকে বাসায় ঢুকতে দেয় না!

কেলিও। হাঁ, ঠিকই ত। তাকে বিশ্বাস করবো না কেন?

চিয়ুতা। এই একটু আগে, পথে যেতে যেতে, একটা সরাইখানার মধ্যে পর্দ্দার আড়ালে তাকে মারিয়ানার সঙ্গে বসে কথা বলতে দেখেছি।

কেলিও। তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? সে হয়ত মারিয়ানার গতি-বিধির ওপর নজর রেখে ছিল আর সুবিধা পেয়ে আমার সম্বন্ধে কিছু বলাবলি করছিল।

চিয়ুতা। আমার কথার অর্থ, তারা খুব বন্ধুভাবে আলাপ করছিল, যেন দুজনার মধ্যে খুব মাখামাখি আছে।

কেলিও। ঠিক বলছ, চিয়ুতা? তা হ'লে আমার মত সুখী কে আর? সে বোধ হয় প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার হয়ে বলছিল।

চিয়ুতা। ভগবান আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

(প্রস্থান)

কেলিও। হায়, আমার কেন যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগে জন্ম হ'ল না। তাহ'লে মারিয়ানার নাম আমার পতাকায় এঁকে নিতেম, আমার রক্তে সে পতাকা রঞ্জিত করে দিতেম! আহা! লড়বার জন্যে যদি এক-জন প্রতিদ্বন্দ্বী পেতেম, একটা সেনা-বাহিনী যদি যুদ্ধে আহ্বান করতে পারতেম; আমার জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে যদি তার কিছু উপকার করতে পারতেম! আমি কথা বলতে জানি নে, আমি জানি কাজ করতে। আমার জিভ্ আমার হৃদয়ের অনুগত নয়। মূক যেমন করে কারাগারে প্রাণত্যাগ করে, তেমনি হয়ত আমারও জীবন যাবে, কিন্তু প্রাণের কথা কখনো বুঝিয়ে বলা হবে না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লোদিওর বাড়ী

ক্লোদিও, মারিয়ানা

ক্লোদিও। তুমি মনে কর কি আমি একটা কেলে হাঁড়ি, পৃথিবীতে আছি কেবল যত কাকগুলোকে ভয় দেখানোর জন্যে?

মারিয়ানা। এমন সরস ভাবটা তোমার মনে এলো কি হেতু?

ক্লোদিও। তুমি মনে কর কি, একজন হাকিম কোন্ কথার কি মূল্য তা জানে না,

সরল মন ভিখারীর মত লোকে তাকে যা তা বিশ্বাস করাতে পারে।

মারিয়ানা। আজ আবার কার সঙ্গে লাগলো তোমার ?

ক্লোদিও। তুমি মনে কর কি, তোমার নিজের মুখে আমি বল্‌তে শুনি নি, যে সেই লোকটা কি তার বন্ধু যদি আমার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়, তবে যেন তাকে ঢুক্‌তে না দেওয়া হয় ? আর তোমার বিশ্বাস, তুমি তার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে পর্দ্দার আড়ালে বসে মুখ ছুটিয়ে আলাপ করবে, আর আমি সে জিনিষটাকে বেশ ভাল বলে মনে করবো ?

মারিয়ানা। তুমি আমাকে পর্দ্দার আড়ালে বসে থাক্‌তে দেখছ ?

ক্লোদিও। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এই যে চোখ-দুটো দেখছো এই দিয়েই, একটা শুঁড়িখানার পর্দ্দার মধ্যে; একজন হাকিমের স্ত্রীর পক্ষে আলাপ-সালাপ করবার জন্যে শুঁড়িখানার পর্দ্দার আড়াল খুব প্রশস্ত যায়গা নয়, নিজে যখন লজ্জা-সরম ত্যাগ করে বাইরে বাইরে চরে বেড়াচ্ছ, তখন ঘরের দরজা এঁটে বন্ধ করে রাখবে কোন্ প্রয়োজনে ?

মারিয়ানা। তোমারই আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলা কবে থেকে আমার বারণ হয়েছে ?

ক্লোদিও। যবে থেকে আমার আত্মীয়েরা তোমার প্রণয়ী হয়ে উঠেছেন।

মারিয়ানা। অক্তাভ! আমার প্রণয়ী! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? জীবনে সে কারও সঙ্গে ভাল-বাসাবাসি করতে যায় নি।

ক্লোদিও। তার স্বভাব-চরিত্র অতি খারাপ, সে কেবল শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে।

মারিয়ানা। ঠিক এই কারণেই সে—তোমার মিষ্ট ভাষায়—"আমার প্রণয়ী" কখনো হতে পারে না। কিন্তু আমার খুসী আমি শুঁড়িখানার মধ্যে পর্দ্দার আড়ালে বসে বসে অক্তাভের সঙ্গে আলাপ করবো।

ক্লোদিও। বাড়াবাড়ি করে, শেষটা একটা বিশ্রী কাণ্ড-কারখানা করে ফেলতে আমায় বাধ্য করো না। কি কর্‌ছ ভেবে দেখ।

মারিয়ানা। কি কাণ্ড-কারখানা ? আমার জান্‌তে বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, কি তুমি কর্‌বে।

ক্লোদিও। তার সঙ্গে তোমার দেখা-শুনা বন্ধ করবো। একটা কথাও তার সঙ্গে বলাবলি কর্‌তে পাবে না, তা আমার বাড়ীতে হোক্, কি আর কোন বাড়ীতেই হোক্, কিম্বা মাঠে-ঘাটেই হোক।

মারিয়ানা। অ্যাঁ, তাই নাকি, সত্যি! এটা একটা নতুন কিছু বটে! দেখ, অক্তাভ তোমারও যেমন আত্মীয়, আমারও তেমনি আত্মীয়; আমার যখন খুসী তখন তার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করবো, তা মাঠে-ঘাটেই হোক আর যেখানেই হোক্—সে যদি এ বাড়ীতে আসতে চায়, তবে এ বাড়ীতেই।

ক্লোদিও। তুমি যে এই শেষ-কথাটা মুখ ফুটে বল্‌লে, তা বেশ করে মনে রেখো। এর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি আমার ইচ্ছায় চল্‌ছ না।

মারিয়ানা। আমার নিজের ইচ্ছায় ত চল্‌ছি, তাই ভাল। যে ব্যবস্থা তোমার খুসী হয় ক'রো। ভয় দেখাও কি ?

ক্লোদিও। মারিয়ানা, তর্ক এখন থাক্। শুঁড়িখানায় পা দেওয়াটা যে সুবিধা নয় তা বুঝে নিও, নইলে আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে হলেও কি যে করে ফেল্‌বো, ঠিক নেই কিন্তু।

(প্রস্থান)

মারিয়ানা (একাকী)

কে আছ ?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

এই রাস্তা দিয়ে বরাবর ঐ সরাইখানায় যাও, গিয়ে দেখ্‌বে একটা টেবিলের পাশে একজন ভদ্রলোকের ছেলে বসে আছেন; তাঁকে বল্‌বে তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে, একটু কষ্ট করে যেন এই বাগানটার ভিতরে তিনি আসেন।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

হ্যাঁ, নতুন কিছু বটে! আমায় ভাবে কি? দোষটা হ'ল কোথায়? এ পোষাকটা আজ কি পরেছি? কি বিশ্রী! ও কথার অর্থ?—কি যে করে ফেলবে! কেন, কি করবে? মা'র সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাতেই কি হতো? সে যা বল্‌বে মা ত তাতেই সায় দেবে। ইচ্ছে হচ্ছে, কারো সঙ্গে হাতাহাতি করি! ঠেঙিয়ে দি লোকগুলোকে।

(চেয়ারগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া)

আমি বাস্তবিকই দেখছি একবারে নির্ব্বোধ! ঐ যে অক্তাভ আস্‌ছে! ওর সঙ্গে যদি তার এখন একবার দেখা হ'তো!- উঃ, এই তবে সুরু হ'লো নাকি, লোকে ত আগেই বলেছিল।—আর আমিও ত জান্‌তেম, ওর অপেক্ষাতেই বসে ছিলেম! সবুর! সবুর! আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর্‌বে—কি প্রায়শ্চিত্ত শুনি? দেখি, কি বল্‌তে চায়?

(অক্তাভের প্রবেশ)

বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অক্তাভ। বসি কোথা? চেয়ারগুলো যে আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎ হয়ে আছে। কি হয়েছিল এখানে?

মারিয়ানা। কিছুই না।

অক্তাভ। কিন্তু বোন, চোখ ত তোমার বলছে অন্য কথা!

মারিয়ানা। আপনার বন্ধু কেলিও সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমি আবার ভেবে দেখলুম। আচ্ছা, বলুন ত তিনি নিজে এসে সব খুলে বলেন না কেন?

অক্তাভ। কারণ খুবই সোজা—সে চিঠি লিখেছিল, তা তুমি ছিঁড়ে ফেলেছ; লোক পাঠিয়েছিল, তুমি জবাব দাও নি; তোমার জানলার নীচে এসে ধন্না দিলে, তুমি ফিরেও তাকালে না। তারপর কি করে, গেল চুলোর দুয়োরে—কিন্তু চুলোয় যেতে হলেও এতখানি দরকার হয় না।

মারিয়ানা। অর্থাৎ তিনি আপনার শরণাপন্ন হলেন।

অক্তাভ। হ্যাঁ, তাই।

মারিয়ানা। বেশ, বলুন তবে তার কথা!

অক্তাভ। সত্যি?

মারিয়ানা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি! এই যে আমি শুন্‌ছি।

অক্তাভ। তুমি তামাসা করছ।

মারিয়ানা। কেমনতর উকিল আপনি?

বলে যান না, আমি তামাসাই করি বা যাই করি আপনার তাতে কি ?

অক্তাভ। তুমি একবার এদিক আর একবার ওদিক দেখ্ছ কি ? তোমার যে রাগ হয়েছে !

মারিয়ানা। আমার একজন প্রণয়ী চাই, অক্তাভ প্রণয়ী না হোক, অন্ততঃ সাথী একজন। আপনি আমায় কি পরামর্শ দেন ? আপনার পছন্দেই আমার হবে—কেলিও হোক আর যেই হোক, কিছু আস্‌বে যাবে না ; কাল থেকে না, আজ এই রাত্তির থেকেই চাই ; যারই মর্জি হবে আমার জানলার ধারে এসে গান করবে, সেই আমার ঘরের দরজা খোলা পাবে। ধরুন, এই আমার ওড়না—যার খুসী সেই যেন আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে দেয়।

অক্তাভ। মারিয়ানা, যে কারণেই হোক্, এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি তোমার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ডাকলেই যদি, আমার কথা শুন্‌তে রাজি হলে যদি, তবে কৃপা করে আর একটি মুহূর্ত্ত এই ভাবে থাক, আমাকে বল্‌তে দাও—

(জানু পাতিয়া উপবেশন)

মারিয়ানা। কি বল্‌তে চান আপনি ?

অক্তাভ। পৃথিবীতে কেউ যদি তোমাকে বোঝবার যোগ্য হয়ে থাকে, তোমার জন্যে বাঁচ্‌বার, তোমার জন্যে মরবার যোগ্য হয়ে থাকে, তবে সে মানুষ হচ্ছে কেলিও। আমার মূল্য বেশী কিছু নয়, কোন দিন ছিলও না ; আমি বিনয় করে বল্‌ছিনে, এটা সত্যি কথাই—প্রেমের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করছি বটে কিন্তু সে দিব্য বৃত্তিটির ব্যাখ্যা করা আমার মত অক্ষম হতভাগার সাজে না। হায়, মারিয়ান ! যদি জান্‌তে, দেবতার মত কোন্ বেদীর ওপর স্থাপিত হয়ে তুমি পূজিত হচ্ছ ! এমন সুন্দর এমন তরুণ এমন নির্ম্মল তুমি, তোমাকে কি না একটা নিরিন্দ্রিয় নির্দ্দয় স্থবিরের কাছে ধরে দেওয়া হয়েছে ! তুমি যদি জানতে, কোন্ আনন্দের উৎস, কি একটা অফুরন্ত সুখের আকর নিভৃতে রয়েছে তোমার মধ্যে—আর তার মধ্যে ! যৌবনের এই নবীন উষার মধ্যে, জীবনের এই স্বর্গীয় শিশির-কণাটির মধ্যে, দুটি যুগল হৃদয়ের এই প্রথম মিলনের মধ্যে-তার কষ্টের কথা বল্‌ব না, তোমার অকরুণ ব্যবহার সত্ত্বেও, সে তার মধুর বিধুর বিরহ নিয়ে পড়ে আছে, তা নিয়েই কেন অনুযোগ না করে শেষে জীবন বিসর্জ্জন দেবে ; সত্যি মারিয়ান, এতেই তার প্রাণ যাবে। আর তোমায় বল্‌ব কি ? আমার কথায় যে শক্তি নেই, সে শক্তি তাকে দিতে আমি কোন্ রসায়ন তৈরী করব ? প্রেমের ভাষা আমি জানিনে। দেখ, তোমার প্রাণের ভিতরে তাকিয়ে—তার ভাষা সেই বল্‌বে ! তোমার হৃদয় গলাতে পারে, এমন শক্তি কোথাও আছে কি ? তুমি ত ভগবানকে ডাক্‌তে জান, বল ত এমন মন্ত্র আছে কি, যা আমার বুক-জোড়া কথা প্রকাশ করে ধরতে পারে ?

মারিয়ানা। আপনি উঠে দাঁড়ান। কেউ যদি এসে পড়ে এখানে, সে কি আপনার কথা শুনে ভাববে না যে, আপনি নিজের জন্যই ভিক্ষা চাচ্ছেন ?

অক্তাভ। মারিয়ান ! মারিয়ান ! দোহাই

তোমার, আর তামাসা করো না। এই বোধ হয় প্রথম তোমার হৃদয়ে বিজলীর আলো খেলে গেল! দাও, তাকে আস্‌তে দাও হৃদয়ের দুয়োর আর বন্ধ করো না। এই করুণার খেয়ালটি এই দিব্য মুহূর্ত্তটি চলে গেল বলে! তুমি কেলিওর নাম মুখে নিয়েছ, তার কথা ভেবেছ পর্য্যন্ত, বল্‌ছ। আহা! এ যদি খেলাও হয়, তবুও তা আর নষ্ট করো না, একজন মানুষের সুখ-শান্তি এর ওপর নির্ভর করেছে!

মারিয়ানা। আপনি বল্‌তে চান, তামাসা পর্য্যন্ত করবার অধিকার আমার নেই?

অক্তাভ। না, তুমি ঠিক বল্‌ছ। বন্ধুত্বের টানে কত কি যে ভুল করছি তা আমি জানি। আমি জানি, জানি কি, প্রাণে প্রাণে তা অনুভব করছি। ঠিকই ত, আমার মুখে ও-সব কথা ঠাট্টার মত শুনবে বৈ কি! আমার কথার আন্তরিকতা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হচ্ছে—আমি যে লোকের বিশ্বাস জন্মাতে পারিনা, সে দুঃখ আজ এই মুহূর্ত্তে যেমন অনুভব করছি আর বোধ হয় তেমন করি নি।

মারিয়ানা। তা কেন হবে? দেখলেনই ত, আমি আপনার কথা শুনছি। কেলিওকে আমার পছন্দ নয়, তাকে আমি চাই নে। আর কারো কথা বলুন, আপনার যাকে ইচ্ছে হয়। আপনার বন্ধুদের মধ্যে থেকে আমার উপযুক্ত একজন সাথী পছন্দ করে দিন; আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন? দেখুন, আমি আপনারই কথা অনুসারে চল্‌ছি।

অক্তাভ। হায় নারী, শতবার তুমি নারী! কেলিওকে তোমার পছন্দ নয়, কিন্তু আর একটা যে হোক্ সে হোক্ তাকেই তোমার পছন্দ! যে মানুষ তোমায় একটি মাস ধরে ভাল বেসে আস্‌ছে, যে তোমার পায়ে পায়ে চল্‌ছে, যে তোমার মুখের একটি কথায় হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দেবে, সে হ'ল তোমার অপছন্দ! সে তরুণ, সুপুরুষ, ধনী, সব বিষয়েই তোমার উপযুক্ত; কিন্তু তাকে তোমার অপছন্দ, আর যে কেউ একটা হোক্ তাকেই তোমার পছন্দ!

মারিয়ানা। আপনাকে যা বল্‌লেম, তাই করবেন, নয়ত আমার সাথে আর দেখা করতে আসবেন না।

(প্রস্থান)

অক্তাভ। তোমার ওড়নাখানা বড় সুন্দর, মারিয়ানা, আর তোমার ঐ অভিমানের টুক্‌রোটুকু শুভমিলনেরই একটি বাঁধন। কথাটা ত বুঝতেই পাচ্ছি—ওটুকু দেমাক আমারও বোধ হয় আছে। এখন দরকার সামান্য একটু জুয়াচুরী—তাতে কেলিওরই হবে লাভ।

চতুর্থ দৃশ্য

কেলিওর বাড়ী

কেলিও, একজন ভৃত্য

কেলিও। নীচে দাঁড়িয়ে আছে, বলছ? উপরে আসতে বল। যাও, শীগ্‌গির নিয়ে এস।

(অক্তাভের প্রবেশ)

কি ভাই, খবর কি?

অক্তাভ। এই ছেঁড়া কাপড়টা বাঁধ্ তোর ডান হাতে। নে তোর বাঁশ, তোর তলোয়ার—তুই মারিয়ানার প্রণয়ী।

কেলিও। দোহাই তোর, আমায় নিয়ে আর খেলিস্ নে।

অক্তাভ। বড় সুন্দর রাত। দিনান্তে চাঁদ উঠতে যাচ্ছে। মারিয়ান একলা, তার দরজা আধ-খোলা। তোর বড় ভাগ্যি, কেলিও।

কেলিও। সত্যি?—সত্যি? অক্তাভ, তুই আমার প্রাণ—নয়ত তোর দয়া নেই।

অক্তাভ। তুই এখনও রওনা হ'স নি? তোকে বলছি কি, সব ঠিক-ঠাক। জানলার তলে একখানা গান শুধু। মুখটা একটু ঢেকে নিস্, বৌ-পাগলার চণ্ড চরেরা আবার না চিনে ফেলে। তুই ভয় করিস্ নে, তবেই লোকে ভয় করবে। ম'রিয়ান যদি বাধাও দেয় তবে দেখিয়ে দিবি, ও-সবের সময় চলে গেছে।

কেলিও। ওঃ, ভগবান! আমার যে বুক কাঁপছে।

অক্তাভ। আরে, আমারও ত—আমার আধপেটা খাওয়া হয়েছে শুধু। পুরস্কার-স্বরূপ যাওয়ার সময় বলে যাস, যেন আমার জন্যে এখানে খাবার এনে দেওয়া হয়।

(উপবেশন)

চুরুট আছে? কাল সকালে এখানে আবার দেখা হবে। ওঠ, ভাই ওঠ! রওনা হও! ফিরে এসেই কোলকুলি করিস্ এখন। ওঠ্, ওঠ্, রাত হয়ে যাচ্ছে।

(কেলিও'র প্রস্থান)

অক্তাভ। (একাকী) হে ভগবান! স্বর্গের খাতায় আজকের রাত্রিটা ধর্ম্মতঃ আমারই নামে তুমি জমা করে নিও। স্বর্গ বলে সত্য সত্যই কিছু আছে কি? বাস্তবিক, মেয়েটি বেশ সুন্দর, তার রূপটুকুও তাকে মানিয়েছিল ভাল। কিন্তু কেন এ রূপ? তা কে জানে! আমি যে নম্বর ডেকেছি, ঠিক সেই নম্বরটাই কি করে কাগজে উঠলো, তা জেনে আর লাভ কি? লোকের কাছ থেকে মেয়ে মানুষ ভাগিয়ে নিয়ে আসা ত আমার নিত্য-নৈমিত্তিক খেলা। সে মেয়ে-মানুষ যদি মারিয়ানই হয়, তাতে আর আমার কি এল গেল? কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে ভোজন; কেলিও ত উপোস করেই আছে। মারিয়ান, আমি যদি তোকে ভালবাসতেম, তুই আমায় কি না ঘৃণা করতিস্, আমায় দেখে কি ক'সেই না দরজায় খিল্ দিতিস্, আমার তুলনায় তোর ও হতচ্ছাড়া স্বামীটাও তোর কাছে কি না পরম সুপুরুষ বলে মনে হ'তো! কিন্তু কেন এ-রকম হয়? এই চুরুটের ধোঁয়া বাঁ-দিকে না গিয়ে, ডান দিকে কেন যায়, সব জিনিষেরই কারণ ঐ রকমই। পাগল! এক-শ বার পাগল। বেঁধে রাখতে হয় তাকে, যে নিজের আশার কথাগুলোই কেবল ভাবে, নিজের পক্ষের যুক্তিগুলোই কেবল দেখে। কিন্তু ভগবান যে একটা দাঁড়িপাল্লা ধরে আছেন; সে দাঁড়িপাল্লায় ভুলটি হবার যো নেই। তবে তার বাটখারাগুলো সবই ফাঁপা, কোনটার মধ্যে আছে একটা টাকা, কোনটার মধ্যে বা বিরহের দীর্ঘশ্বাস, এটার মধ্যে আছে মাথার বেদনা, ওটার মধ্যে সুসময় কি দুঃসময়—মানুষের সব কাজই পাল্লায় উঠ্ছে নামছে ঐ ভগবানের খাম-খেয়াল অনুসারে।

জনৈক ভৃত্য (প্রবেশ করিয়া)

মশায়, আপনার নামে এই একখানা

চিঠি আছে; খুব জরুরী, তাই আপনার এখানে নিয়ে এসেছে। চিঠি যিনি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আপনি যেখানেই থাকুন না, আজ রাতেই ওটা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

অক্তাভ। আচ্ছা, দেখি ত।

(পড়িতে পড়িতে) "আজ রাতে আস্‌বেন না। আমার স্বামী বাড়ীটাকে গুণ্ডা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আপনাকে যদি তারা পায়, তবে আর রক্ষা নেই।

—মারিয়ান"

অক্তাভ। হায় রে কপাল! আমি করেছি কি? আমার জামা! আমার টুপিটা! হে ভগবান! আর একটুখানি সময় দাও। এস, তুমি—তোমরা যে যেখানে আছ, এস, চল সকলে আমার সঙ্গে! তোমা-দের মনিবের জীবন-সংশয়।

(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ক্লোদিও'র বাগান—রাত্রিকাল

ক্লোদিও, দুইজন গুণ্ডা, তিবিয়া

ক্লোদিও। প্রথমে ঢুক্‌তে দিও, তারপর যেই এই ঝোঁপটার কাছে আস্‌বে অমনি পড়্‌বে গিয়ে।

তিবিয়া। যদি ঐ দিকটা দিয়ে ঢোকে?

ক্লোদিও। তবে দেয়ালের কোণটায় দাঁড়িয়ে থাক।

একজন গুণ্ডা। যে আজ্ঞে।

তিবিয়া। ঐ যে আসছে। দেখুন, দেখুন, ছায়াটা তার কি প্রকাণ্ড! লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া।

ক্লোদিও। চল, আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই—সময় হ'লেই লাগাবো।

(কেলিও'র প্রবেশ)

কেলিও। (ঘুলঘুলিতে ঘা মারিয়া) মারিয়ানা! মারিয়ানা! আছ কি?

মারিয়ানা। (জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) পালাও, অক্তাভ। আমার চিঠি তবে তুমি পাও নি?

কেলিও। হা ভগবান! কা'র নাম শুন্‌লেম?

মারিয়ানা। বাড়ীটা গুণ্ডায় ঘিরেছে। আমার স্বামী সন্ধ্যাবেলা তোমাকে এখানে ঢুক্‌তে দেখেছে, আমাদের কথাবার্ত্তাও শুনেছে। আর যদি এক মিনিট দাঁড়াও, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

কেলিও। এ কি স্বপ্ন? আমিই কেলিও।

মারিয়ানা। অক্তাভ! অক্তাভ! দোহাই তোমার, আর দাঁড়িয়ে থেকো না! এখনও বোধ হয় পালিয়ে বাঁচ্‌তে পার। কাল, দুপুর বেলা, গীর্জ্জায় এস, আমিও থাক্‌ব।

(ঘুলঘুলি বন্ধ হইল)

কেলিও। মৃত্যু! তুমি যখন এসেছ, তখন আমাকে উদ্ধার কর। অক্তাভ! বিশ্বাসঘাতক অক্তাভ! এর প্রায়শ্চিত্ত তোর যেন করতে হয়। তুই জানতিস্, আমার কপালে এখানে কি আছে—নিজে না এসে আমায় পাঠিয়েছিস্! আচ্ছা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। মৃত্যু! এই তোমার জন্যে কোল পেতে দিয়েছি—এতদিনে আমার দুঃখের শেষ।

(প্রস্থান। বাগানের ভিতরে চাপা কণ্ঠস্বর, আর দূরে-দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল)

অক্তাভ। (বাহিরে) খোলো, না হয় দরজা ভাঙ্গলেম।

ক্লোদিও। (দরজা খুলিয়া, বগলের নীচে তলোয়ার-খানা রাখিয়া) কি চাও তুমি ?

অক্তাভ। কেলিও কোথায় ?

ক্লোদিও। এ বাড়ীতে তার শোওয়ার যে অভ্যাস আছে, তা ত আমার মনে হয় না।

অক্তাভ। তুমি যদি তাকে খুন করে থাক, ক্লোদিও, তবে সাবধান! এই হাতে তোমার ঘাড়টি আমি মটকে দেব।

ক্লোদিও। তুমি পাগল, না তোমায় ভূতে পেয়েছে ?

অক্তাভ। তুমিই পাগল, তোমাকেই ভূতে পেয়েছে; নইলে এ সময়ে তলোয়ার বগলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

ক্লোদিও। যদি চাও, বাগানটা খুঁজে দেখ, আমি ত কাউকে ঢুক্‌তে দেখিনি। আর যদিই বা কেউ ঢোকবার চেষ্টা করে থাকে, তবে তাকে দরজা না খুলে দেবার অধিকার বোধ হয় আমার আছে।

অক্তাভ। (তার লোকদের প্রতি) এস, খোঁজ চার দিকে।

ক্লোদিও। (তিবিয়াকে জনান্তিকে) যেমন বলেছি, তেমনি ত সব হয়েছে ?

তিবিয়া। আজ্ঞে, নিশ্চিন্ত হোন্—যত খুসি খুঁজতে পারে। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সমাধি-স্থান

(একটি সমাধির পাশে অক্তাভ ও মারিয়ানা)

অক্তাভ। পৃথিবীতে আমিই শুধু তাকে চিনেছিলেম। এই যে শ্বেত শুভ্র মর্ম্মরের পাথরখানি, একটা দীর্ঘ কালো পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা—এই তার আসল ছবি। এই ভাবেই একটা স্নিগ্ধ বিষাদের ছায়া তার কোমল প্রেমিক হৃদয়ের অনুপম গুণরাশি ঢেকে রেখেছিল। এই মূক জীবনখানির যত রহস্য, তা কেবল আমারই কাছে কিছু গোপন ছিল না। কত দীর্ঘ রজনী আমরা দুজনে এক সঙ্গে কাটিয়েছি, ঊষর মরুভূমির মাঝে শ্যামল ক্ষেত্রের মত সে সব যেন জেগে আছে; সমস্ত জীবনে যে কয়েক বিন্দু শীতল শিশিরকণা আমার প্রাণে পড়েছিল, তা ঢেলেছে সেই ক'টি রাত। কেলিওই ছিল আমার জীবন, কেলিওর সঙ্গে তা স্বর্গে চলে গেছে! আর এক যুগের মানুষ সে; ভোগ কাকে বলে সে জান্‌তো, তবুও সে একলা থাক্‌তেই চাইত; কল্পনা যে কি ভূল করায়, তা সে জান্‌তো, তবুও বাস্তব ছেড়ে কল্পনার দিকেই ছিল তার আকর্ষণ। যে রমণী তাকে ভাল-বাস্‌তে পার্‌তো, সে বড় সুখী হ'ত!

মারিয়ানা। তোমাকে যে রমণী ভালবাসবে, অক্তাভ, সেও কি সুখী হবে না ?

অক্তাভ। আমি ভালবাস্‌তে জানি নে, তা জান্‌তো কেলিও। যে ভস্মটুকু এই সমাধির ভিতর রয়েছে, পৃথিবীতে এক তাকেই আমি ভালবাস্‌তেম, এক তাকেই ভালবাস্‌বো। সেই শুধু জান্‌তো নিজের প্রাণে যে আনন্দের উৎস রয়েছে তা কি করে নিঃশেষে আর একটি প্রাণের মধ্যে ঢেলে দিতে হয়। অপার নিষ্ঠার ক্ষমতা এক তারই ছিল; যে রমণীকে সে ভালবাস্‌তো, তার জন্যে সমস্ত জীবন সেই কেবল উৎসর্গ করে দিতে পারতো, সেই

রমণীর জন্যে তেমনি সহজেই সে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারতো। আমি ত লম্পটমাত্র, আমার হৃদয় নেই, নারীর মর্য্যাদা আমি বুঝি নে! আমি দিতে পারি যে রকম ভালবাসা, আমি ফিরেও পাই তেমনি ভালবাসা—স্বপ্নের মত একটা ক্ষণিক নেশা। সে যে সব গুপ্ত রহস্য জান্‌তো, আমি তা জানিনে। আমার হাসি নটীর মুখোসের মত। হৃদয় আমার স্থবির। ইন্দ্রিয় আমার অবসাদগ্রস্ত—ভোগ আর তারা চায় না। কিন্তু, কি কাপুরুষ আমি, তার মৃত্যুর প্রতিশোধ এ পর্য্যন্ত নেওয়া হ'ল না।

মারিয়ানা। নাই হ'ল—তোমার জীবনকেও আবার বিপন্ন করবে কেন? তারপর ক্লোদিও ত তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধের বয়স তার পার হয়ে গেছে, আর তুমিও তার কিছু করতে পারবে না—সহরে তার অপ্রতিহত প্রভাব।

অক্তাভ। কেলিও কিন্তু আমার মৃত্যুর শোধ নিত,—সে যেমন করে আমার জন্যে মরেছে, আমি যদি তেমনি করে তার জন্যে মর্‌তেম। না, এ আমারই সমাধি! আমাকে তার এই হিম-শীতল পাথরের নীচে শুইয়ে রেখেছে; আমার জন্যেই তারা তলোয়ারে শাণ দিয়েছিল, আমাকেই তারা খুন করেছে। বিদায়, আমার যৌবনের আমোদ, খোসখেয়াল, পাগলামী—বিদায়, ভিসুভিয়সের কোলে আমার সে মুক্ত উল্লসিত জীবন! বিদায়, কলমুখরিত উৎসব-মধুর-সন্ধ্যা সম্মিলন, সোনালী জানলাতলে প্রেম-গান! বিদায়, নেপ্‌লস সহর! বিদায় নেপ্‌লস্ সহরের রমণীকুল, মশালের আলোতে সঙের মিছিল, বনের ছায়াতলে পান-ভোজন! বিদায়, ভালবাসা! বিদায় বন্ধুত্ব! পৃথিবীতে আমার স্থান শূন্য হ'ল।

মারিয়ানা। কিন্তু আমার হৃদয়ে ত নয়, অক্তাভ। কেন বল্‌ছ তুমি, বিদায় ভালবাসা?

অক্তাভ। আমি তোমাকে ভালবাসি না, মারিয়ান—ভালবাস্‌তো কেলিও।

সমাপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

আলোচনা

"বাঙ্গালী হিন্দুনারীর মর্য্যাদা"

পৌষ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত মহাশয় "বাঙ্গালী হিন্দুনারীর মর্য্যাদা" শীর্ষক প্রবন্ধে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা-রক্ষা-কল্পে লেখনী ধারণ করিয়া মর্য্যাদা-হানির কতকগুলি কারণ জন্মাইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

লেখক মহোদয় নারীজাতির শারীরিক বলবৃদ্ধি কল্পে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পুরুষজাতির শারীরিক শক্তি বিকাশ করিবার যেমন সহজ উপায় আছে, স্ত্রীজাতির শারীরিক বল-বৃদ্ধির সেরূপ কোন উপায় নাই কি? লেখক যদি কোন হিন্দু-পরিবারভুক্ত হন, কিংবা যদি তিনি কখনও কোন হিন্দুপরিবারের সংস্পর্শে যাইয়া থাকেন, তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, হিন্দু-রমণীগণের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার ও মানসিক

প্রফুল্লতা সম্পাদন করিবার স্বাভাবিক সহজ উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে! হিন্দুরমণীগণ নদীর ঘাট, পুকুরের ঘাট হইতে জলপূর্ণ কলসী বহন করিয়া গৃহে আনয়ন করেন, কূপ হইতে জল তোলেন, বাটনা বাটেন; এ-সব কার্য্যে ডাম্বেল ভাঁজার ন্যায়ই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হইয়া থাকে। অবরোধপ্রথার ফলে যে নারী-জাতির মানসিক বৃত্তি বিকাশ পায় না লেখিক মহোদয় তৎপ্রতিও কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ তাঁহাদের মহিলাদিগকে সর্ব্বদা বাহিরে যাইয়া যথেষ্ট বিচরণ করিতে না দিলেও সময় সময় তাহাদিগকে দূরবর্ত্তী তীর্থপর্য্যটনে লইয়া যান। প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুর তীর্থ সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী। এমন কি, এজন্য শত শত মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। এই তীর্থভ্রমণের সুযোগ হইতে নারীজাতি বঞ্চিতা হন নাই। এতদ্ব্যতীত দেশে রথযাত্রা ও রাসপূর্ণিমা প্রভৃতির সময় অনেক স্থলে মেলা হয়, তাহাতেও হিন্দুললনাগণ যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে নারীজাতির পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বহুদর্শিতা ও মানসিক উন্নতি লাভ হয়। হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও ললনাগণ কেবল অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকেন না, স্নানার্থ বা জল আনয়নার্থ নদী বা পুকুরে যাইতে, নিমন্ত্রণাদিতে একবাড়ী হইতে অন্যবাড়ী যাইতে যতটুকু মুক্ত বায়ু সেবন করিতে পান, তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এতদুপরি প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী গৃহস্থ-ভবনেই উপযুক্ত মুক্ত বায়ু ও আলোক গমনাগমনের ব্যবস্থাও থাকে। যে গৃহে এরূপ ব্যবস্থা না থাকে তাহা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই সমান অনিষ্টকর। আমাদের দেশে সদাসর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিলেও এবং বলবৃদ্ধিকল্পে ডন, কুস্তি প্রভৃতি অভ্যাস করিলেও এখনও স্ত্রীজাতির শারীরিক শক্তির তুলনায় পুরুষ তেমন উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে পারেন নাই। যৌথপরিবারে রন্ধনশালায় রন্ধন কার্য্য অন্নব্যঞ্জনাদি পরিপূর্ণ—বড় ডেক্ গামলা অনেক ক্ষীণকায়া রমণীও অনায়াসে উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং নদী বা পুকুর ঘাট হইতে বড় বড় জলপূর্ণ কলসী কটিতে বহন করিয়া আনেন। ইহা পরীক্ষিত সত্য ঘটনা। অনেক স্থূলাকার পুরুষ এইরূপ জলপূর্ণ কলসী উত্তোলন করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন তাহাও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

লেখক-মহাশয় বর্ত্তমান বিবাহ-বিধিতে নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন! স্বীকার করি আমাদের সমাজে নরনারীর যে বয়সে বিবাহ হইত তাহা উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু আজকাল আর তেমন বাল্য-বিবাহের আধিক্য নাই। এখন স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের ফলেই—হিন্দুসমাজে কন্যার বিবাহ কোন পিতামাতাই ইচ্ছা থাকিলেও তেমন অল্পবয়সে দিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা অনেকটা ইচ্ছা করিয়াই ১৪।১৫ বৎসর বয়সে মেয়ের বিবাহ দিয়া থাকেন। নানা কারণে ১৪।১৫ বৎসরের বেশী বয়সে মেয়েকে অবিবাহিত রাখা আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে অসম্ভব।

লেখক-মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নারীর ব্যক্তিত্বে সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগে তখন, যখন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাহার বিনামতে তাহাকে জুড়িয়া দেওয়া হয়।" পুরুষের পক্ষেও কি তাহাই নহে? সব পুরুষই কি নিজ-ইচ্ছামত পাত্রী বাছিয়া লইয়া বিবাহ করেন? পুরুষ যখন হাজার হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া কন্যার বাপকে সর্ব্বস্বান্ত করেন, তখন তাহার ব্যক্তিত্বটাই বা যায় কোথায়? লেখক-মহাশয় কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি যুগপৎ নারীর ব্যক্তিত্ব ও নিজের ব্যক্তিত্বে আঘাত করিয়া পাণিগ্রহণ কার্য্য শেষ করেন নাই? নারীর নারীত্ব রক্ষা হইবে সেইদিন, যেদিন পুরুষ তাহার পুরুষত্ব ষোলআনা বুঝিতে পারিবেন, অর্থাৎ বিনাপণে বিবাহ করিবার সৎসাহসে প্রণোদিত হইবেন। লেখক রমণীদিগকে নিজ ইচ্ছামত বর মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিতে চান! বেশ ভাল কথা! কিন্তু যে দেশে পিতামাতা নিতান্ত অপছন্দ পাত্রকেও কন্যা সম্প্রদান করিতে সর্ব্বস্বান্ত হন, সে দেশে যদি নারীগণ ইচ্ছামত বর পাইতে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেন, তবে তাহার 'মেও' ধরিবে

কে? পুরুষ এখন নারীজাতির নিকট আত্মবিক্রীত টাকার বিনিময়ে—সুতরাং Slave-mentality বা দাস-মনোভাব এখন পুরুষেরই অস্থি-মজ্জাগত। পুরুষ আগে তাহার এই দাস-মনোভাব দূর করুক, তারপর যেন নারীর নারীত্ব রক্ষায় যত্নশীল হয়।

লেখক-মহাশয়ের মতে "যৌথ পরিবারে বাস নারীর মর্য্যাদারক্ষার আর এক মস্ত অন্তরায়।" এটা একটী সর্ব্বনেশে কথা। মানুষ দশজনের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া, দশের সেবায়, দশের সন্তোষ বিধানে জীবন যাপন করিবার জন্যই—ভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন:—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

সেইজন্যই মানব সমাজবদ্ধ ও পরিবার-বদ্ধ জীব। ইংরেজের অনুকরণে স্ত্রী লইয়া পৃথক বাস করিবার প্রস্তাব শুধু অভিনব নহে, আকস্মিক ও অদ্ভুত বটে। লেখক এখানে যৌথপরিবারের বুড়াবুড়ী, অর্থাৎ বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকেও আক্রমণ করিয়াছেন। যাহারা আজ বুড়াবুড়ী দু'দিন আগে তাঁহারাই যুবক যুবতী ছিলেন—তাঁহাদের দেহে শক্তি ছিল, হৃদয়ে বল ছিল। আজ যে তাঁহারা স্বভাবতঃই সেবাশুশ্রূষা ও দয়ার পাত্র। দুর্ব্বলের সেবা কি পাপ? যদি পাপই না হইবে তবে আমরা নারীজাতির স্বাভাবিক কোমলবৃত্তি, যাহা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই দুর্ব্বলের পরিত্রাণে অগ্রসর হইতে চায়—তাহা রোধ করিবার ব্যবস্থা করিব কেন? দশজনকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া, শিশু-সন্তানদিগকে আদর-যত্নে লালন পালন করিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া হাস্য-কোলাহল মুখরিত যৌথ-পরিবার বাস করা ভাল, না পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায়—একাকী এক বাটীতে পৃথক বাস করাই ভাল? দশজনের মন যোগাইয়া চলাটা কি খুব দোষাবহ? কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষকেও কি অনেক সময়ই—উপর-ওয়ালার মন যোগাইয়া চলিতে হয় না? মন যোগাইয়া চলা অনেকটা বাধ্যতার নামান্তর মাত্র। বাধ্যতা দোষ নহে, গুণ; এ গুণ অর্জ্জন করা হৃদয়বান লোকের কাজ, হৃদয়হীন লোকের কাজ নহে।

উপসংহারে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "স্বামী বদমায়েস কিংবা কুরোগগ্রস্ত হইলেও যে নাক-চোখ বুজিয়া তাহার সঙ্গে টিঁকিয়া থাকিতে হইবে—তাহা এখন আর কেহ বিশ্বাস করে না এবং অকর্ত্তব্য মনে করে।" এইখানেই আমরা লেখকের উদ্দাম কল্পনার চরম পরিণতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই! রোগ সকল সময়েই মানবের স্বকৃত দোষের জন্য নহে। অনেক সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের অনেক কুরোগ জন্মিয়া থাকে। এইরূপ রোগ নারীরও হয়, পুরুষেরও হয়। নারী যদি কুরোগগ্রস্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত পত্যন্তর গ্রহণে সুবিধা পায়, তবে পুরুষই বা কুরোগগ্রস্ত পত্নীকে পরিত্যাগ না করিবে কেন? এইরূপে তাহা হইলে সংসার বিড়ম্বনাস্থল হইয়া পড়ে; স্বামী-স্ত্রী যে পরস্পর সুখদুঃখের সমভাগী, তাহা মিথ্যা হইয়া পড়ে, সেবাবৃত্তি লোপ পায় এবং ভালবাসা একটা কথার কথা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

এরূপ করিলে ত ভালবাসা বা দাম্পত্য প্রেম একটা ঠুনকো জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ আশার দাস। রোগাক্রান্ত স্বামী নিরাময় হইবেন কিংবা চরিত্রহীন স্বামী পুনরায় সচ্চরিত্র হইবেন, এই আশায় নারী শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর সাহচর্য্য ত্যাগ করেন না। বর্ত্তমানে যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কামনা করেন, তাহাদের উচিত স্ত্রীজাতিকে নৈতিক ও কার্য্য-করী শিক্ষা প্রদান করা এবং সমাজ হইতে কুৎসিত পণপ্রথা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ষিতা রমণী যাহাতে সমাজে স্থান পায় তাহার ব্যবস্থা করাও প্রত্যেক মনুষ্যেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই কয়েকটী বিষয়ের অব্যবস্থাই নারীজাতির উন্নতি ও ঐহিক সুখের প্রবল অন্তরায়; এই সকল বিষয়ে যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সাধারণের অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহাই করা প্রত্যেক সুধীব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

শ্রীবেণীমাধব দত্ত বিদ্যাবিনোদ।

মিলিতোনা

১০

আমাদের বন্ধু জুয়াঙ্কো একটু আমাদের নজরের আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে এখন খুঁজিয়া বাহির করা যাক্; কেননা সে মিলিতোনার ঘর হইতে এরূপ ক্রোধান্ধ হইয়া বাহির হইয়াছিল যে তাহার সেই ক্রোধ কতকটা উন্মাদের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। বিড়বিড় করিয়া অভিসম্পাৎ করিতে করিতে, পাগলের মত মুখভঙ্গী করিতে করিতে, অজ্ঞাতসারে সে মাঠ-ময়দান পার হইয়া একেবারে হিযেবরোর বন্দরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

মাদ্রিড্ নগরের আশপাশগুলা শুষ্ক ও উজাড়; রাস্তার দুধারের ইতস্ততঃ-নিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলার দেয়ালে মেটে রং; এবং সেই সব অস্বাস্থ্যকর শ্রম-শিল্পের কাজ চলিতেছে, যে সকল শ্রম-শিল্পকে বড় বড় নগরগুলা আপন বক্ষ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। এখানে কদাচিৎ কোথাও উদ্ভিজ্জের নিদর্শন দেখা যায়। শুষ্ক নদী-নালা মাটির উপর দিয়া ভীষণ খাদ কাটিয়া গিয়াছে; পাহাড়ের গায়েও হরিৎ দৃশ্য একটুও নাই। চারিদিকে একটা বিষাদের ভাব বিরাজমান।

দুই এক ঘণ্টা পথ হাঁটিয়া, চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত অসাধারণ বলিষ্ঠ জুয়োঙ্কো একটা গর্ত্তের উপরকার মাটির উপর উপুড় হইয়া,—কুনুইয়ের উপর ভর দিয়া, থুৎনি ও গাল দুই হাতে ধরিয়া সম্পূর্ণ অবসন্ন ও নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল।

জুয়াঙ্কো দেখিল,—তাহার নিকট দিয়া গরুর গাড়ি সারি সারি চলিয়াছে—রাস্তার ধারে একটা শয়ান শরীর দেখিয়া গরুরা ভড়কাইয়া একপাশে সরিয়া যাওয়ায়, গাড়োয়ানেরা তাহাদের পৃষ্ঠে অঙ্কুশের খোঁচা দিতেছে। খড়ের বোঝাই লইয়া গাধারা চলিয়াছে। দস্যুর মতো চেহারা কৃষকেরা, ঘোটক পৃষ্ঠে গর্ব্বিতভাবে উপবিষ্ট হইয়া জঙ্ঘা ও জিনে বাঁধা বন্দুকের উপর হাত রাখিয়া চলিয়াছে। কর্কশ-চেহারা চাষাণী একটা মর্কটকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রাম্য লোকেরা ১০।১২ ক্রোশ দূর হইতে ২।৩টি কাঁচা আপেল ও এক গুচ্ছ লঙ্কা লইয়া যাইতেছে।

জুয়াঙ্কো তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। তাহার নেত্র হইতে বিগলিত এই প্রথম অশ্রুবিন্দু সামান্য বৃষ্টি-বিন্দু রূপে ধরণী পান করিল। তাহার বিশাল বক্ষদেশ, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীর উঠিয়া পড়িতেছিল। এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সে আর কখন হয় নাই। তাহার মনে হইল, ধরণীর যেন অন্তিম দশা উপস্থিত। সে সৃষ্টি ও জীবনের কোন উদ্দেশ্যই দেখিতে পাইল না। এখন-হইতে সে কি করিবে?

যাহা হৃদয় স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজি হইতে ছিল না, সেই মারাত্মক সত্যটা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য জুয়াঙ্কো বারম্বার এই কথা আবৃত্তি করিতেছিল!—"সে আমাকে ভাল বাসে না, সে আর একজনকে ভাল বাসে। ইহা কি সম্ভব? ইহা কি,

বিশ্বাসযোগ্য ? সে কী গর্ব্বিত, কী নিষ্ঠুর, সে একজন অপরিচিত লোকের প্রতি হঠাৎ আসক্ত হইয়া পড়িল, আর আমি যে এই দুই বৎসর তাহারই জন্য জীবন ধারণ করিতেছি, ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতেছি, আমার জন্য কি তার মুখ হইতে একটিও মমতার কথা শুনিতে পাইলাম না, তাহার মুখে একটু অনুগ্রহের হাসি দেখিতে পাইলাম না! এই জন্য আমি কত দুঃখ করিয়াছি ; কিন্তু আজ যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, ইহার কাছে সে দুঃখও স্বর্গ. আমাকে যদি সে ভাল না বাসে, সে যেন আর কাহাকেও না ভালবাসে।

"আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারতেম ; কিন্তু সে আমাকে চলে যেতে বল্লে, আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না বল্লে ; আমি তাকে রাহুর মত আচ্ছন্ন করে' রেখেছি, সে আমার উৎপীড়ন আর সহ্য করতে পারে না। যাই হোক, আমি যখন চলে এলেম তখন সে একলা ছিল। প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, বাসনার মদে মত্ত হয়ে, সারারাত আমি তার গবাক্ষের নীচে ঘুরে বেড়িয়েছি ; আমি জানতেম, তার সেই ছোট্ট কুমারী-সুলভ পালঙ্কের নিষ্কলঙ্ক শয্যায় সে বিশ্রাম করচে ; তার পর্দ্দার ও-ধারে দুটো ছায়া দেখ্‌ব বলে আমার কখনো ভয় হয় নি। হতভাগ্য আমি—আমার মত এই তিক্ত-মধুর রস ইতিপূর্ব্বে আর কেহই আস্বাদ করে নি। এই অমূল্য নিধি আমার হয়নি সত্য, কিন্তু আর কেহ তার চাবিও পায়নি!

"আর এখন—এখন আমার সব শেষ হয়ে গেছে ; আর কোন আশা নেই! যখন সে আর কাহাকে ভাল বাসে নি, তখন সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ; কিন্তু এখন, আর একজনের উপর তার ভালবাসা পড়ায় আমার প্রতি তার বিরাগ না-জানি আরও কত বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্ব্বে যারা-যারা ওর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের আমি কেমন সহজে সরিয়ে দিয়েছিলেম—আমার কৃপনের ধন রক্ষা করবার জন্য আমি কেমন চারদিকে পাহারা দিতেম—। বেচারা 'লিনে', বেচারা 'লুকা' বিশেষ কিছুই করে নি, অথচ তাদের আমি কতই পীড়ন করেছি! আর, যে বাস্তবিক ভয়ানক লোক, যাকে এই দণ্ডেই হত্যা করা উচিত, তাকে কি না আমি অনায়াসে ছেড়ে দিলেম!

ধিক্ এই হাত, আমার এই অদক্ষ অনিপুণ হাত,—তোর কর্ত্তব্য তুই করতে পারলি নে—এখন তার শাস্তি ভোগ কর্।"

এই কথাগুলা বলিয়া জুয়াঙ্কো নিজের ডান হাতে এমন এক কামড় দিল যে, রক্ত ঠিকরিয়া বাহির হইবার মত হইল।

"যখন ও ভাল হয়ে উঠ্‌বে তখন আর একবার ওকে রাগিয়ে দিতে হবে, তখন আর কিছুই আমি বাকি রাখ্‌ব না। কিন্তু আমি যদি ওকে হত্যা করি, তাহলে মিলিতোনা আমার আর মুখ দর্শন করবে না। যে দিক্ থেকেই দেখা যায়, মিলিতোনা আমার হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। একথা ভাবলে পাগল হয়ে যেতে হয় ; আর কোন উপায় নেই। যদি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হয়ে সে কোন স্বাভাবিক কারণে মরে,—যেমন, গৃহদাহ, বাড়ী চাপা-পড়া, ভূমিকম্প, পেলেগ—তাহলে… … …কিন্তু সে সুখ আমার ভাগ্যে

নেই। যখন আমি ভাবি, ঐ মোহিনীর হৃদয়-খানি, তার অনিন্দ্য সুন্দর দেহ, তার সেই সুন্দর চোখ, তার সেই স্বর্গীয় মধুর হাসি, তার সুগোল ও সুনম্য গ্রীবা, তার পাতলা ছিপছিপে গঠন, শিশুর মত তার পা-দুখানি—এই সমস্ত আমার হবে না—তখন; তখন... সে লোকটা যখন ওর হাত ধরে, সে তো তার হাত সরিয়ে নেয় না; যখন সে তার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকে, তখন সে ত ঘৃণার সহিত মুখ ফেরায় না। আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে এইরকম শাস্তি দেওয়া হচ্চে। স্পেনের কত সুন্দরী আমার ভালবাসা পাবার জন্য লালায়িত। আমি যখন রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করি, তখন কত সুন্দরীর হৃদয় আবেগে স্পন্দন করে ওঠে; কত ধবধবে সাদা হাত বন্ধুতার সঙ্কেত করে" আমাকে অভিবাদন করে। আমার সাহস ও আমার খুবসুরৎ চেহারায় মুগ্ধ হয়ে কত আমীরওম্‌রার বেগমেরা তাদের হাত-পাখা, তাদের রুমাল, তাদের চুলের ফুল আমার উপর নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু সে সব আমি অবজ্ঞা করেছি। তাদের আদর-যত্নে আমি ভ্রুক্ষেপ করি নি। এত ভালবাসার মধ্যে আমি কিনা বেচে বেচে একটা বিদ্বেষকে বরণ করলেম। দুর্জ্জয় দুর্ব্বিপাক! কাল নিয়তি! দুষ্ট বিধাতা! আমি "আমাদের দেবী"র সম্মুখে মোমবাতি জ্বালাই নি, তাই বোধ হয় আমার এই শাস্তি। হা ভগবান! হা ভগবান! এখন করি কি? এই পৃথিবীতে আমি কখনই আর শান্তিতে থাকতে পারব না। দমিঙ্গেও মিলিতোনাকে ভাল বাস্‌ত, ষাঁড়ের শিংএর আঘাতে সে মারা গেছে—মরে' সে সুখী হয়েছে। আমার যথাসাধ্য আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেম। আর মিলিতোনা কিনা বলে,—আমি তার বিপদের সময় আমি তাকে পরিত্যাগ করেছিলেম! এই জন্য সে আমাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না—শুধু তা নয়—আমাকে সে হতশ্রদ্ধা করে। একথা মনে হলে, রাগে উন্মাদ হয়ে যেতে হয়।"

এই কথা বলিয়া এক লাফে সে উঠিয়া পড়িল এবং মাঠ-ময়দানের মধ্য দিয়া আবার চলিতে লাগিল।

বুদ্ধি লুপ্ত-প্রায় চোখ কোটরস্থ, মুষ্টি সঙ্কুচিত—এইরূপ ভাবে জুয়াঙ্কো সমস্ত দিন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে খেয়াল দেখিতে লাগিল, যেন আন্দ্রে ও মিলিতোনা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, মদালস দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া আছে; সেই সব অবস্থায় রহিয়াছে যাহা দেখিয়া কোন ঈর্ষান্ধ প্রেমিক কখনই সহ্য করিতে পারে না! এই-সব দৃশ্য এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠিল, এরূপ বাস্তব বলিয়া মনে হইল যে, আন্দ্রের বুকে যেন সে ছুরি বসাইবে এই ভাবে কতবার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন তার আঘাত শুধু শূন্যের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তার চমক ভাঙ্গিল।

তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বস্তু-সমূহের আকার পরস্পর মিশিয়া যাইতে যাইল; তাহার কপালের রগ্‌ টানিয়া ধরিল। একটা লোহার চাকা যেন তাহার মাথায় চাপ দিতেছে; তাহার চোখ যেন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে; এবং তাহার মুখ বহিয়া ঘাম

ঝরিতে থাকা সত্ত্বেও, জুন মাসের প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ সত্ত্বেও তাহার শীত করিতে লাগিল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,—যার গাড়ী একটা বড় পাথরে ঠেকিয়া উল্টাইয়া পড়িয়াছিল—সেই গাড়োয়ান জুয়াঙ্কোর নিকট আসিয়া তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া তাহাকে বলিল :—

"ওহে, মিঞাসাহেব তোমার গায়ে খুব জোর আছে বলে মনে হয়, এই গাড়িটা ওঠাতে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে কি? আমার বেচারী গরুগুলো আর পারচে না।" জুয়াঙ্কো নিকটে আসিল এবং কোন কথা না বলিয়া গাড়ীটা উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তখন তাহার হাত কাঁপিতেছিল, পা টলমল্ করিতেছিল, তাহার অজেয় পেশীগুলা আর তাহার ডাকে সাড়া দিল না। সে গাড়ীটা একটু উঠাইয়াছিল, কিন্তু শ্রমে অবসন্ন হওয়ায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাত ছাড়িয়া দিল—গাড়ীটা আবার পড়িয়া গেল।

জুয়াঙ্কোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাড়োয়ান বিস্মিত হইয়া বলিল ;—"আমি মনে করছিলুম মিঞাসহেব, তোমার মুঠোর জোর এর চেয়ে অনেক বেশী।"

জুয়াঙ্কোর বাহুতে আর বল ছিল না। জুয়াঙ্কো পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

তথাপি গাড়োয়ানের কথায় তাহার আত্মসম্ভ্রমে একটু আঘাত লাগিল; এবং "গ্ল্যাডিয়েটার" বলিয়া তাহার পেশীর দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাহার যে অহঙ্কার ছিল, সেই অহঙ্কারে উত্তেজিত হইয়া, প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তাহার দেহের অবশিষ্ট সমস্ত বল একত্র করিয়া, গাড়িতে এমন এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, যে সেই ধাক্কাতে গাড়ীটা আবার অন্য দিকে উল্টাইয়া পড়িবার যোত্র হইল।

গাড়োয়ান বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিল :—

"বাহ্বা! সাবাস! হার্কুলিস্ অতবড় পালোয়ান, সেও এমন কাজ করতে পারত না।"

কিন্তু জুয়াঙ্কো কোন উত্তর করিল না। রাস্তার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া গেল।

গাড়োয়ান ভীত হইয়া বলিল :—"শরীরের কোন রক্তের শিরা ছিঁড়ে যায় নি ত! যাই হোক, আমার সাহায্য করতে গিয়েই যখন এর এই দুর্ঘটনা হয়েছে, তখন আমিই ওকে আমার গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কোন পান্থশালায় রেখে আসি।"

জুয়াঙ্কোর মূর্চ্ছা অল্পক্ষণই ছিল। তার "সল্ট" শুঁকিতেও হয় নাই—সুরা পান করিতেও হয় নাই—গাড়োয়ানের কাছে ও-সব জিনিস ত সাধারণতঃ থাকেই না। বৃষভমল্ল ত আর সুকুমার-দেহ ললনা নহে।

গাড়োয়ান তার বহির্বস্ত্রে জুয়াঙ্কোকে ঢাকিয়া রাখিল। জুয়াঙ্কোর জ্বর হইয়াছিল, তাহার লৌহবৎ শরীরে এতদিন যাহা সে কখন অনুভব করে নাই সেই রোগের অনুভূতি এই তাহার প্রথম হইল!

একটা পান্থশালায় আসিয়া, সে একটা শয্যা চাহিয়া লইল, এবং সেই শয্যায় শুইয়া জড়পিণ্ডের মত নিশ্চল হইয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল, এবং তাহার শারীরিক

যন্ত্রণা হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইল। ১২ ঘণ্টা দীর্ঘনিদ্রার ফলে জুয়াঙ্কো অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। যখন উঠিল তখন আর জ্বর নাই, মাথা-ব্যথা নাই—আছে কেবল দুর্ব্বলতা। চলিবার সময় পা টলে, চোখে আলো সহ্য হয় না, একটু আওয়াজেই মাথা ঘুরিয়া যায়; তার বোধ হইতে লাগিল, যেন তার অন্তঃকরণটা, তার অন্তরাত্মাটা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে; তার ভিতর যেন একটা মস্ত ভাংচুর হইয়া গিয়াছে; যেখানে প্রেম গজাইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে একটা গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে—সে গহ্বর আর কিছুতেই পূরণ হইবার নহে।

সে এই পান্থশালায় একদিন মাত্র ছিল। একটু ভাল হইয়াই সে একটা ঘোড়া যোগাড় করিল, এবং সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মাড্রিড-অভিমুখে যাত্রা করিল। চলিতে চলিতে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল;—মনে করিল, ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগ করিয়া ক্ষতটা আরও বিষাক্ত করিয়া তুলিবে, আরও বাড়াইয়া তুলিবে; অথবা আপনার বুকে ছুরী বসাইয়া দিবে। এইরূপে শরীরকে নির্য্যাতন করিয়া মনের যন্ত্রণা ভুলিতে চেষ্টা করিবে।

জুয়াঙ্কো যে সময়ে তাহার দুঃখ-কষ্ট লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সেই সময় পুলিসের টিকৃটিকিরা চারিদিকে তাহার খোঁজ করিতেছিল। কেন না, সাধারণের মধ্যে সকলেই বলাবলি করিতেছিল যে, জুয়াঙ্কোই সাল্‌সেডোর মহামান্য আন্দ্রে-মহাশয়কে ছোরা মারিয়াছে। কিন্তু আন্দ্রে তাহার নামে কোন অভিযোগ আনে নাই!

জুয়াঙ্কো যাহাকে ভালোবাসিত, আন্দ্রে তাহাকে পাইয়াছে—ইহাই আন্দ্রের পক্ষে যথেষ্ট। টিকৃটিকিরা যে জুয়াঙ্কোর পিছুপিছু ফিরিতেছে তাহাও আন্দ্রে জানিত না।

অর্গমসুল্লা ও কোভাচুল্লা অপরাধীকে গেরেফতার করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। এবং খুব সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিতেছে। একজন গোয়েন্দা উহাদিগকে বলিয়াছিল যে, জুয়াঙ্কোকে ষাঁড়ের আড্ডায় প্রবেশ করিতে সে দেখিয়াছে। তাই, সেইদিকে উহারা চলিল।

যাইতে যাইতে আর্গমসুল্লা, তার জুড়িদারকে বলিল:—

"দেখ ভাই কোভাচুল্লো, একটু বিবেচনা করে' চোলো; তোমার বীরত্ব একটু কমিয়ে এনো, তুমি ত জানো সেই পালোয়ানটার হাত কেমন সাফাই। তুমি পুলিসের মধ্যে সব-চেয়ে একজন বড় লোক,—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুর মত লোকে তোমার গায়ে আঁচড় কাটিবে—সেটা ত ভাল হবে না। তাই একটু গা বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ভায়া।"

কোভাচুল্লো উত্তর করিল:—

"সে বিষয়ে আমি খুবই চেষ্টা করব—তোমার বন্ধুকে তা আর বল্‌তে হবে না। নিতান্ত দরকার না হলে, আমি সাহস দেখাব না। ভদ্রতায় যতদূর হয়, প্রথমে তাই করতে হবে।"

জুয়াঙ্কো বাস্তবিকই সার্কাশ-ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। যে সময় সে অঙ্গনটা পার হইতেছিল, সেই সময় আর্গামসুল্লা ও কোভাচুল্লো, একদল পাহারা-ওয়ালা সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোভাচুল্লো আদর্শ কায়দা-দুরস্ত-বাক্য প্রয়োগ করিয়া, খুব ভদ্রতার সহিত জুয়াস্কোকে জানাইল যে, উহাকে এখন জেলখানায় যাইতে হইবে।

জুয়াস্কো অবজ্ঞা সহকারে কাঁধ ঝাঁকাইয়া চলিতে লাগিল। থামিল না।

পুলিস কর্ম্মচারীর সংকেতে, দুইজন পাহারা-ওয়ালা বৃষ-মল্লের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; কিন্তু বৃষমল্ল আস্তিনের ধূলা-কণার ন্যায় উহাদিগকে এক ঝাঁকুনিতে ঝাড়িয়া ফেলিল।

তখন সমস্ত পাহারাওয়ালার দল জুয়াস্কোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জুয়াস্কো উহাদের চারিটাকে ধরাশায়ী করিল, চারিটাকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিল। কিন্তু সংখ্যার বল বেশী হওয়ায়, জুয়াস্কো একা আর পারিয়া উঠিল না। জুয়াস্কোর মুখ লাল হইয়া উঠিল; আস্তে আস্তে কৌশল করিয়া বৃষভদের ঘরের নিকট আসিল এবং হাতের এক ঝাঁকানি দিয়া, বৃষভ-গৃহের দরজা খুলিয়া ফেলিল। এবং ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সেইখানে রহিল।

আক্রমণকারীরা জোর করিয়া সেখান হইতে উহাকে বাহির করিবার জন্য দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল। দরজটা ভাঙ্গিয়া গেল। জুয়াস্কো তাড়া করায়, একটা ষাঁড় একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া, মাথা নিচু করিয়া পাহারওয়ালাদিগের নিকট ছুটিয়া আসিল।

ভীতি-বিহ্বল পাহারাওয়ালারা বেড়ার নীচে দিয়া লাফ দিয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইল। উহাদের মধ্যে একজনের, শিং-এর গুতায় মোজা ছিড়িয়া গিয়াছিল। আর বেশী কিছু হয় নাই।

আর্গসুল্লা ও কোভাচুল্লা বলিল,—"নিয়ম-অনুসারে এখন দেখছি দুর্গ-অবরোধের ব্যাপার উপস্থিত।"

—আর একবার আক্রমণ করে দেখা যাক্।"

এইবার, দুইটা ষাঁড় একসঙ্গে বাহির হইয়া আক্রমণকারীদিগের অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ভীতি-সুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত উহারা ইতস্তত সরিয়া পড়িল। তখন হিংস্র জন্তু দুইটা আর কোন শত্রুকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া, পরস্পরের উপর গুতাগুতি আরম্ভ করিল, পরস্পরকে উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুব সাবধানে দরজার কপাটটা ধরিয়া কোভাচুল্লো জুয়াস্কোকে বলিল :—

"ভায়া, আরও ৫টা ষাঁড় এখনো ছেড়ে দিতে পার। তোমার যুদ্ধের সরঞ্জাম যা আছে আমরা তা জানি। তা ফুরিয়ে গেলে তোমাকে ধরা দিতেই হবে,' বিনা-সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তুমি এখন আপনা হতে বের হয়ে এসে সুড়সুড় করে' আমাদের সঙ্গে জেলখানায় চল। তোমার হাতে হাতকড়িও লাগাব না, পায়ে বেড়ীও দেব না। আর তুমিও আমাদের কাজে যে বাধা দিয়েছ সে কথাও কর্ত্তৃপক্ষকে জানাব না। কেননা, তা জানালে তোমার বেশী শাস্তি হবে। আমি যা বল্‌চি,—ভাল কথা নয় কি?"

জুয়াস্কো এখন মুক্তির জন্য তেমন লালায়িত ছিল না—তাই উহা লইয়া আর

বেশী বিবাদ করিল না, আর্গমসুল্লা ও কোভাচুল্লোর হাতে সে আত্মসমর্পণ করিল। উহারা-জুয়াঙ্কোকে সসম্মানে সহরের জেলখানায় লইয়া গেল।

যখন দরজার তালার চাবি লাগাইবার কেঁচ্‌কেঁচানি শব্দ থামিয়া গেল, তখন জুয়াঙ্কো তাহার খাটিয়ায় লম্বা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল :—যদি তাকে আমি খুন করতেম! যে দিন তার বাড়ীতে আন্দ্রেকে দেখেছিলেম সেই দিন্‌ই তাকে খুন করা উচিত ছিল। তাহলে পূরাপূরি শোধ তোলা হত; তার সামনে তার প্রেয়সীর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে, তার নিশ্চয়ই ভয়ানক যন্ত্রণা হত; কিন্তু সে দুর্ব্বল, রোগশয্যায় আবদ্ধ, সে কখনই আত্মরক্ষা করতে পারত না; সুতরাং তাকে আমি মার্‌তেম না। ও-রকম অপরাধ আমি কখনো করতেম না। মিলিতোনাকে খুন করে' আমি পাহাড় পর্ব্বতে পালিয়ে যেতেম কিংবা পুলিসের পাছে আত্মসমর্পণ করে' শাস্তি বুক পেতে নিতেম। এখন, না এদিক্, না ও দিক্।

আমায় বাঁচতে হলে, তার মরা দরকার; আর, তার বাঁচতে হলে, আমার মরা দরকার। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

সে সময় আমার হাতে ছোরাটা ছিল, তার এক ঘা দিলেই সব শেষ হয়ে যেত; কিন্তু তার চোখে এমন একটা আলো জ্বলছিল, তাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমার বল, ইচ্ছাশক্তি, সাহস সমস্ত যেন একেবারে লোপ পেয়ে গেল। সেই আমি—যে পূর্ব্বে সিংহের খাঁচায় সিংহের দিকে তাকিয়ে, সিংহের চোখের পাতা নামিয়ে আন্‌তো হিংস্র ব্রুনো ষাঁড়দের কুকুরের মত মাটিতে পেড়ে ফেল্‌তো, সেই আমার কিনা এই দুর্দ্দশা!

"কিন্তু কি! আমি তার অমন সুন্দর বক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে ফেল্‌ব? আমার ছোরায় ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলাটা তার হৃদয়কে অনুভব করাব? আর তার সেই ধব্‌ধবে সাদা রংএর উপর দিয়ে তার সুন্দর সিন্দুরবর্ণের রক্ত গড়িয়ে পড়বে—আর আমি তা' স্বচক্ষে দেখ্‌ব? না, না, এরূপ বর্ব্বরতা আমি কখনই করব না, বরং সেই কাফ্রি যেমন তার প্রেয়সীকে বালিস্ দিয়ে চেপে মেরেছিল—আমি একটা থিয়েটারে দেখেছিলুম,—সেই রকম করাও বরং ভাল। কিন্তু সে ত আমাকে প্রতারণা করেনি, আমার কাছে মিথ্যে শপথও করেনি, সে শুধু মর্ম্মান্তিক উদাসীন ভাবে আমার সম্মুখে বসে থাকৃত—সে ত একই কথা; আমি তাকে এত বেশী ভাল বাসি যে, তার উপর আমার মৃত্যুর অধিকার আছে!"

জেলখানায় জুয়াঙ্কোর মনে এই ধরণের নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে আন্দ্রে বেশ একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। সে শয্যা হইতে উঠিয়াছিল, এবং মিলিতোনার বাহুর উপর ভর দিয়া, ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, জানালার কাছে গিয়া হাওয়া খাইত। শীঘ্রই সে এতটা বল লাভ করিল যে নীচে নামিয়া আসিতে পারিল; এবং আসন্ন বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য, রাস্তা দিয়া চলিয়া নিজ গৃহে উপনীত হইল।

এদিকে Sir Edwardsএর বিবাহ বিষো-

ষিত হইল। Sir Edwards ফেলিসিয়ানার পাণিপ্রার্থী হইয়া দস্তুরমত ডন জেরোনিমোর অনুমতি চাহিয়াছিলেন—ডন্ জেরোনিমোও আগ্রহের সহিত উহার অনুমোদন করেন। Sir Edwards দান-সামগ্রীর সংগ্রহে এখন ব্যাপৃত। তিনি লণ্ডন হইতে সুরুচি-সঙ্গত সুশোভন বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা আনাইলেন—লাহোরে তাঁহার শালের দুটো কারখানা ছিল; সেখান হইতেও খাঁটি কাশ্মীরী শাল আনাইলেন। ফেলিসিয়ানার অন্তরাত্মা এক্ষণে অসীম আনন্দ-সাগরে সাঁতার দিতে লাগিল।

এদিকে মিলিতোনাও যার পর নাই সুখী হইলেও, তাহার একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তাহার মনে হইল, সে যে শ্রেণীর লোক, সম্ভ্রান্ত-বংশীয় আন্দ্রেকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না। সে তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু সে যাহাই মনে করুক, আসলে, বোর্ডিংস্কুলের কোন শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়িয়া ঈশ্বরের সৃষ্টি এই, নারী-রত্নটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই; শিক্ষা সহজ-সংস্কারের স্থান অধিকার করে নাই। মিলিতোনার হৃদয়ে অকৃত্রিম সুন্দরের ভাব, মঙ্গলের ভাব, কলা-সৌন্দর্য্যের বোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বোধ, কবিত্ব-বোধ, পুরামাত্রায় ছিল; কিন্তু উহা ভাবমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল। তার সুন্দর হস্ত পিয়ানোর হস্তিদন্ত-পর্দ্দায় কখনও আঘাত করে নাই। বিশুদ্ধ মধুর-কণ্ঠে গান গাহিতে পারিলেও সে কখনো সঙ্গীতের স্বরলিপি পাঠ করিতে পারিত না তাহার সাহিত্যিক জ্ঞানের সীমা কতকগুলা গল্প-উপন্যাসেই বদ্ধ ছিল। লিখিতে সেযে বানান ভুল করিত না, সে শুধু স্পেণীয় ভাষার সরল বানান-পদ্ধতির কৃপায়। সে মনে মনে ভাবিল :—

আমার ইচ্ছা নয়,—আন্দ্রে আমার জন্য লজ্জা পায়। আমি লেখা-পড়া শিখ্‌ব, বই পড়ব; আমি আপনাকে তাঁর যোগ্য করে তুল্‌ব। আমার যে একটু রূপ আছে তা আমার বিশ্বাস হয়; আন্দ্রের চোখের দৃষ্টিতেই আমি তা বুঝ্‌তে পারি। আর কাপড়-চোপড়ের কথা যদি বল;—আমার কাপড়-চোপড় অনেক আছে,—আর সেই কাপড়-চোপড় আমি বড় ঘরের মেয়েদের মত পর্‌তে জানি। গুটিপোকার যতদিন না পাখা বেরোয়, গুটিপোকা যতদিন না প্রজাপতি হয়ে ওঠে, ততদিন আমরা কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বাস করব। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে! আকাশটা এখন বেশ নীল, তাই আমার ভয় হচ্ছে; আর, জুয়াঙ্কো,—তার হ'ল কি? সে আবার কোনো পাগ্‌লামির কাজ করবে না ত?" মিলিতোনার এই কথাটা অজ্ঞাতসারে মুখদিয়া বাহির হইয়াছিল। আলদন্‌জা-মাসী ইহা শুনিতে পাইয়া উত্তর করিল :—

"তার কোন ভয় নেই। জুয়াঙ্কো এখন জেল-খানায়। আন্দ্রেকে হত্যা করেছে বলে' তার নামে নালিশ রুজু হয়েছে। জুয়াঙ্কো যে রকম গোঁয়ার বলে প্রসিদ্ধ, মোকদ্দমাটা তার বিরুদ্ধে যেতেও পারে।"

—"আহা এখন জুয়াঙ্কোর জন্যে আমার দুঃখ হয়। আন্দ্রে যদি আমায় ভাল না বাস্‌ত, তাহলে আমার খুবই কষ্ট হত!"

জুয়াঙ্কোর মোকদ্দমার অবস্থাটা একটু

খারাপ দিকেই গেছে। সেদিনকার নৈশ যুদ্ধটা আদালতে, ওঁৎ-পাতিয়া খুন করা অথবা নরহত্যার চেষ্টা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। লোকটা যে মরে নাই,—তার কারণ জুয়াঙ্কোর হত্যা করিবার যে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে। এইরূপ ভাবে বিচার করায়, ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে, আন্দ্রে আদালতে এই ব্যাপারে যেরূপ কৈফিয়ৎ দিল তাহাতে গুপ্ত হত্যার স্থলে, শেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বলিয়াই সাব্যস্ত হইল। তা ছাড়া আঘাতটা গুরুতর হয় নাই, আন্দ্রে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে; আর এই বিবাদে, গোড়ায় আন্দ্রেরই দোষ ছিল; আন্দ্রের সৌভাগ্য যে ইহার পরিণামটা একটু আঁচড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে। আর বেশী দূর গোড়ায় নাই। গুপ্তহত্যার অভিযোগে, হত্যাকারী যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত, সেই ব্যক্তি যদি সুস্থ-সবল থাকে এবং সে নিজে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইকথা বলে, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমা কখনো বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। সুতরাং জুয়াঙ্কো কিয়ৎকাল পরেই খালাস পাইল। তবে জুয়াঙ্কোর এই দুঃখ, যে তার পরম শত্রু যাহার নিকট হইতে সে কোন উপকার পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহারই কথায় কিনা সে মুক্তি লাভ করিল!

জেলখানা হইতে বাহির হইয়া, মুখ অন্ধকার করিয়া সে এই কথা বলিল:—

"এখন আমি এই উপকারে আবার অবদ্ধ হয়ে পড়লেম; এ কি দুর্দৈব! আমি এখন যদি তার কোন অনিষ্ট করি তাহলে আমার মত নরাধম কাপুরুষ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এর চেয়ে যদি আমার নির্বাসন দণ্ড হ'ত তাহলে আমি খুসী হতেম। তাহলে ১০ বৎসর পরে আবার ফিরে এসে আমি তার উপর শোধ তুল্তে পারতেম।"

আজ হইতে জুয়াঙ্কো অন্তর্হিত হইল। কেহ কেহ বলিল, একটী কালো ঘোড়ায় চড়িয়া, আন্দোলুসির দিকে যাইতে তাহাকে দেখিয়াছে। ফলকথা, তাহাকে আর মাদ্রিদে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

মিলিতোনা আরামে নিশ্বাস ফেলিল। কেননা সে বিলক্ষণ জানিত, জুয়াঙ্কো এখানে থাকিলে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইবেনা।

দুই বিবাহের অনুষ্ঠান একই সময়ে এবং একই গির্জায় সম্পন্ন হইল। মিলিতোনা ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহার বিবাহের পরিচ্ছদ সে আপন হাতেই তৈয়ারী করিবে।

তাহার হাতে অতি সুন্দর পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। দেখিলে মনে হয় যেন "লিলি"ফুলের পত্রে গঠিত।

ফেলিসিয়ানার খুব জমকালো সাজ-সজ্জা; তাহা তৈয়ারি করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

গির্জা হইতে বাহির হইয়া, ফেলিসিয়ানা সম্বন্ধে সবাই বলিতে লাগিল:—"কি সুন্দর পরিচ্ছদ!"; এবং মিলিতোনা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, 'আহা কি সুন্দর মুখখানি!'

১১

একটা প্রাচীন মঠের নিকট একটা ছোট পাহাড়ের ঢালু-অংশের উপর একটা সাদা ধব্ধবে বাড়ী। চারি ধারে সবুজ গাছপালা। সবুজের মধ্য হইতে এই বাড়ীটা একটা বৃহৎ রৌপ্যখণ্ডের মত দীপ্তি পাইতেছে। উদ্যান-

প্রাচীরের মাথার উপর দিয়া দ্রাক্ষালতা ও অন্যান্য লতা উদ্দামভাবে উঠিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়া রাস্তায় কিয়দংশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফটকের গরাদের ভিতর দিয়া, একপ্রকার চক্‌-মিলানো স্তম্ভ-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহা নানা বর্ণের প্রস্তরে বিভূষিত; এবং তাহার পর, ভিতরকার একটা অঙ্গন; উহা স্পষ্টই মুর-জাতীয় বাস্তুশিল্পের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

গোটা-পাথরের ছিপ্‌ছিপে সাদা মার্ব্বেল-স্তম্ভ। থামের মাথ্‌লাগুলায় ফুলকাটা আরবী অক্ষর খোদিত,—এখানো উহার সোনার গিল্‌টি কোথাও কোথাও ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। এই সকল স্তম্ভ-সংযুক্ত খিলান, ঢাকা-বারাণ্ডার আকারে অঙ্গনকে বেষ্টন করিয়া আছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটা চৌবাচ্চা; চৌবাচ্চার ধারে ধারে ফুলগাছের টব; একটা ফোয়ারার সূক্ষ্ম জল ধারা টবের চিক্‌চিকে গাছগুলার উপর মুক্তা ছড়াইতেছে, এবং যূঁথী ও গোলাপের কানে কানে অস্ফুট মধুরস্বরে যেন প্রেমের গুপ্তকথা কহিতেছে। অঙ্গন-কুট্টিমের উপর একটা জাজিম বিছানো রহিয়াছে, ইহাই যেন বাহিরের বৈঠকখানা। এইখানে একটি স্বচ্ছ ছায়া ও সুরম্য শৈত্য বিরাজ করিতেছে। দেয়ালের গায়ে একটা গিতার-যন্ত্র আট্‌কানো রহিয়াছে এবং একটা পালঙ্কের উপর সবুজ-ফিতায় ভূষিত একটা বড় "ষ্ট্র-হ্যাট্‌" রহিয়াছে। যতই স্থুলদর্শী হউকনা এই রাস্তা দিয়া চলিবার সময় সকলেই এই স্থানটি দেখিয়া এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না—"এইখানে কতকগুলি সুখী লোক বাস করে"। সুখসৌভাগ্যই গৃহগুলিকে আলোকিত করে এবং এমন একটা শ্রী ফুটাইয়া তোলে যাহা অন্য গৃহে অতীব বিরল। গৃহবাসী মানব-আত্মায় প্রকৃতি অনুসারে, গৃহের দেয়ালগুলা হাসিতেও পারে, কাঁদিতেও পারে, আমোদ দিতেও পারে, বিরক্তি উৎপাদন করিতেও পারে। এই গৃহখানি নিশ্চয়ই তরুণ প্রেমিক-যুগল কিংবা নব-দম্পতীর দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ফাটক বন্ধ নহে; এস-না, ফাটকের দরজা ঠেলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। অঙ্গনের শেষ-প্রান্তে আর একটা দরজা, এ দরজাটাও খোলা; এই দ্বার দিয়া একটা উদ্যানে উপনীত হওয়া যায়। এই উদ্যান না ফরাসী, না ইংরাজী ধরণের, এ ধরণের উদ্যান কেবল গ্রেনাডা-অঞ্চলেই দেখা যায়;—মেদী, কমলালেবু, ডালিম, লতা-গোলাপ, চামেলী, বাদাম প্রভৃতি গাছের যেন অরণ্য বিশেষ; মাঝে মাঝে ঝাউগাছ নীল আকাশে নীরবে মাথা তুলিয়াছে; ঠিক্‌ যেন আনন্দের মধ্যে কতকগুলা বিষাদের চিন্তা।

এখানে আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই—দারুচিনী গাছের একটা বীথিকা প্রসারিত, উহার ধারে দুইটি পৃষ্ঠসমন্বিত মার্ব্বেলের বেঞ্চি; এবং ধবল-প্রস্তর নির্ম্মিত লহরের মধ্য দিয়া দুইটি জল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই বীথি-পথের শেষ প্রান্তে অসূর্য্যম্পশ্য নিবিড় নিকুঞ্জ; তাহার মধ্য হইতে একটা অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-ভূষিত তাম্বু-আকারের একটি মুক্ত-দ্বার মণ্ডপ-গৃহ সমুত্থিত; সেখান হইতে সুদূর-প্রসারিত প্রান্তর, বনভূমি, গিরি-নদীর রমণীয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই সময় সূর্য্য অস্তগত হইল এবং নীহার-মণ্ডিত গিরি-চূড়াগুলিকে এক অপূর্ব্ব গোলাপী

রঙে রঞ্জিত করিল। সেরূপ গোলাপী রঙের আভা আর কোথাও দেখা যায় না—বুঝি-বা স্বর্গে অথবা একমাত্র গ্রেনাডাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠিক্ এই সময় একটি যুবক ও একটি তরুণী বাতায়ন-বারাণ্ডায় পাশাপাশি বসিয়া এই গম্ভীর মহান্ দৃশ্যের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, তরুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন যে সুন্দর মুখখানি দৃষ্টিগোচর হইল, পাঠকগণ বোধ হয় অনুমান করিতে পারিতেছেন, সে কাহার মুখ। ইনিই এক্ষণে শ্রীযুক্ত আন্দ্রের গৃহিণী, ভূতপূর্ব্ব মিলিতোনা। আর এই যুবকটি যে আন্দ্রে তাহাও বোধ করি আর পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র, আন্দ্রে পত্নীকে লইয়া গ্রেনাডায় আসিয়াছে। সে তাহার এক খুড়ার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে এই বাড়ীটি পাইয়াছিল। ফেলিসিয়ানা Edwards-এর সহিত লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে। উভয় দম্পতী আপন আপন সহজ রুচির অনুসরণ করিয়াছে। প্রথমটি মুক্ত আলোক ও কবিতার প্রয়াসী; দ্বিতীয়টি সভ্যতা ও কুয়াসার ভক্ত।

মিলিতোনা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, আন্দ্রের সহিত বিবাহে তাহার সামাজিক মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইলেও বিবাহের পরেই সে লোক-সমাজে বাহির হইবে না—এই জন্য যে, পাছে তাহার অজ্ঞতায় আন্দ্রে লজ্জা পায়। তাই, তাহার অবস্থা-উপযোগী যোগ্যতা, অর্জ্জন করিবার জন্য সে এক্ষণে এই বিজন নিবাসের আশ্রয় লইয়াছে।

এইখানে আসিয়া মিলিতোনার শরীর ও মন দুই-ই বেশ একটু উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহার রূপ-লাবণ্য এমনিই ত অসাধারণ ছিল—এখন আবার আদর-যত্নে উহার লালিত্য ও মাধুর্য্য যেন আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার সুখী অন্তঃকরণ বিকশিত হইয়া মুক্ত-ভাবে চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতেছে। যে রমণীকে আন্দ্রে ভাল বাসিত সেই রমণীর অভ্যন্তরে যেন আর এক উন্নততর রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া আন্দ্রে অত্যন্ত সুখী হইল।

বাঞ্ছিত বস্তু হস্তগত হইলে অনেক সময় পূর্ব্বের মোহ ছুটিয়া যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। প্রতিদিন মিলিতোনার নব নব গুণ, নব নব সৌন্দর্য্য আন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আন্দ্রে মনেমনে নিজ সাহসের তারিফ্ করিল; লোক-নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া সে যে এমন নারীরত্ন লাভ করিতে পারিয়াছে, ইহা সে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিল।

আন্দ্রে ও মিলিতোনার সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। কেবল মিলিতোনা কখন কখন বেচারা জুয়াঙ্কোর কথা ভাবিত; জুয়াঙ্কোর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় না। মিলিতোনা চাহিত না যে তাহার সুখে আর কাহারও নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। এবং হতভাগ্য জুয়াঙ্কো কি দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা মনে করিয়া, আনন্দের মধ্যেও মিলিতোনার চিত্তে একটু বিষাদের ছায়া পড়িত। মিলিতোনা এই চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে এই কথা বলিত, "জুয়াঙ্কো নিশ্চয় আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে;

কোন এক অজ্ঞাত দুর—দুর দেশে চলিয়া গিয়া থাকিবে।"

বাস্তবিকই কি জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল? ইহা সন্দেহস্থল। জুয়াঙ্কো যতটা দুরে গিয়াছে বলিয়া তরুণী মনে করিয়াছিল, আসলে জুয়াঙ্কো ততদুরে যায় নাই। কেননা, যে মুহূর্ত্তে মিলিতোনা এইরূপ ভাবিতেছিল, সেই সময় মিলিতোনা, উচ্চ পাহাড়ের পার্শ্বস্থ প্রাচীরের চূড়ার দিকে যদি তাকাইয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত তরুপল্লবের মধ্য দিয়া বাঘের মত দুইটা জলন্ত চোখ একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আন্দ্রে মিলিতোনাকে বলিল,—"জেরালিফের" দিকে তুমি কি বেড়াতে যাবে? সেখানে গোলাপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আর সেখানে ঝাউ গাছের উপর, ওক্-গাছের উপর ময়ূরদের মৃদু মৃদু কেকারব শোনা যায়।" মিলিতোনা উত্তর করিল—

"এখনও খুব গরম। তাছাড়া এখনো আমি বেড়াবার কাপড়-চোপড় পরি নি—"

"সেকি! তোমার এই সাদা পরিচ্ছদে, তোমার এই গলার ব্রেস্‌লেটে, তোমার এই কানের ফুলে তোমাকে বেশ দেখাচ্চে। কেবল, এই পরিচ্ছদের উপর একটা ম্যান্‌টিলা-ওড়না ফেলে দেও, তাহলেই হবে। প্রিয়ে, তুমি যখন এই বেশে "অ্যাল্‌হাম্ব্রা" প্রাসাদের ভিতর দিয়ে যাবে, তখন মুর-রাজারা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য কবর থেকে উঠে পড়বে।"

মিলিতোনা মৃদু হাসিয়া, তার ওড়নার ভাঁজগুলা গুছাইয়া লইল, স্পেনীয় মহিলাদের যাহা নিত্য সঙ্গী সেই হাত-পাখাটি লইল, এবং তাহার পর এই দম্পতী 'জেরালিফের' অভিমুখে চলিতে লাগিল। ইহা একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত,—এই পাহাড়টি আবার আর একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সহিত গিরিসঙ্কটের দ্বারা সংযুক্ত—যাহার মাথায় অ্যালহাম্ব্রার লাল মিনার্-স্তম্ভ সমূহ মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দৃশ্যটি ছবির মত অতি সুন্দর। এইখানে একটি পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; তাহার ধারে ধারে উদ্দাম উদ্ভিজ্জ পথটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই পথে শাখা পল্লবের নীচে দিয়া নব দম্পতী শিশুর মত আনন্দে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। একস্থানে একটা বটগাছের নিবিড় শাখাপল্লবে পথটি রাত্রির ন্যায় অন্ধকার—এই বটগাছের গুঁড়ির পিছনে ও কী দেখা যায়? ওটা কি চোখের ভুল? মনে হয় যেন একটা বন্দুকের কুঁদো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আর বন্দুকটা যেন নীচের দিকে বাগানো রহিয়াছে!

একটা লোক ঝোপ্‌ঝাপের মধ্যে মধ্যে বাঘের মত মাটির দিকে মুখ করিয়া গুঁড়ি মারিয়া শুইয়া আছে;—যেন এক লম্ফে কোন শিকারের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িবে বলিয়া তাগ্‌বাগ্ করিতেছে। এ লোক আর কেহ নহে—এ হচ্চে জুয়াঙ্কো। জুয়াঙ্কো দুই মাস হইতে গ্রেনাডার গুহা-গহ্বরে লুকাইয়া বাস করিতেছে। এই দুই মাসে সে দশ বৎসরের মত বুড়াইয়া গিয়াছে। এখন মুখের রং কালো, গালে গর্ত্ত পড়িয়াছে, চোখদুটা আগুনের মত জ্বলিতেছে।

যে ব্যক্তি দিবা-রাত একই চিন্তায়—সর্ব্বগ্রাসী একমাত্র চিন্তায় নিমগ্ন, তাহারই অনুরূপ এই সকল লক্ষণ, দেখা যাইতেছে।

সেই চিন্তাটি কি?—না, মিলিতোনাকে খুন করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে বিশবার সে তাহার মৎলব হাসিল করিতে পারিত;—কেননা, সে অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞেয় ভাবে, গোপনে মিলিতোনার চারিদিকে শিকারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইত—কিন্তু কার্য্যকালে শেষ-মুহূর্ত্তে তাহার সাহসে কুলাইত না; হাত যেন অসাড় হইয়া পড়িত।

এইবার সে এইখানকার ঝোঁপঝাপের ভিতর ওঁৎ পাতিয়া লুকাইয়াছিল; কেননা সে লক্ষ্য করিয়াছিল, আন্দ্রে ও মিলিতোনা প্রতিদিনই একই সময়ে এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে। জুয়াঙ্কো এইবার শপথ করিল, তাহার ভীষণ সংকল্প সিদ্ধ করিয়া চিরকালের মত সব শেষ করিয়া দিবে।

তাই সে বন্দুকে গুলি ভরিয়া, বন্দুকটা তাহার পাশে রাখিয়া দিয়াছিল; দূরে পদশব্দ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া মনে করিল, এইবার বুঝি চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে।

"সে আমার আত্মাকে হত্যা করেছে, আমি তার শরীরকে হত্যা করব!"

বনপথের শেষপ্রান্তে একটা সুস্পষ্ট হাসির আওয়াজ শুনা গেল!

জুয়াঙ্কো শিহরিয়া উঠিল, জুয়াঙ্কোর মুখ নীল হইয়া গেল। তাহার পর সে বন্দুকের ঘোড়া উঠাইল।

মিলিতোনা তাহার স্বামীকে বলিল,—"আমার মনে হয়, আমরা এই পথ ধরে একটা ভূ-স্বর্গে এসে পড়েছি—কী ফুলের বাহার, কী সুগন্ধ, পাখীর কী মধুর গান, কী কিরণচ্ছটা!"

এইকথা বলিতে বলিতে মিলিতোনা সেই কালস্বরূপ বটবৃক্ষের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

"এস্থানটি কী সুন্দর, কেমন বেশ ঠাণ্ডা। আমার শরীর হাল্কা মনে হচ্ছে—আমি এখন বড়ই সুখী"—এই সময়ে সেই অদৃশ্য বন্দুকের মুখটা ঠিক্ মিলিতোনার মাথার দিকে ফেরানো ছিল।

বন্দুকের টিপ্-কলের উপর আঙ্গুল রাখিয়া জুয়াঙ্কো গুণ গুণ স্বরে বলিল:—

"এইবার—আর দুর্ব্বলতা নয়। এইমাত্র শুনিলাম, সে বলিল:—"আমি এখন খুব সুখী—এমন সুযোগ আর পাব না। মরুক এইবার তবে—"

মিলিতোনার এইবার বুঝি সব শেষ হইল;—পত্রপল্লবে প্রচ্ছন্ন বন্দুকের মুখটা প্রায় মিলিতোনার কর্ণ স্পর্শ করিল। আর এক মুহূর্ত্ত—তাহার পরেই মিলিতোনার মস্তক উড়িয়া যাইবে এমন যে সৌন্দর্য্যরাশি তাহা, কেবল কতকটা রক্ত-মাংস-অস্থিতে পর্য্যবসিত হইবে।

কিন্তু পুতুলটি ভাঙ্গিবার সময়, জুয়াঙ্কোর হৃদয় আর্দ্র হইল; তাহার চোখের উপর দিয়া যেন একখণ্ড মেঘ চলিয়া গেল। তাহার ইতস্তত ভাবটা ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইল। আন্দ্রে-পত্নী জানিত না, তাহার কী বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই সে সম্পূর্ণ প্রশান্তচিত্তে "জেনেরালিফের ভ্রমণ শেষ করিল।

ঝোঁপ্‌ঝাপের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে করিতে জুয়াঙ্কো বলিল,—"আমি নিশ্চয়ই একজন কাপুরুষ। আমার যত সাহস শুধু

ষাঁড়দের সহিত যুদ্ধে, শুধু পুরুষের সহিত যুদ্ধে”।

কিয়ৎকাল পরে, একটা খুব গুজব রটিল যে, আমেরিকা হইতে একজন বৃষভ-মল্ল আসিয়াছে—তার দক্ষতা ও সাহস নাকি অসাধারণ, তার মত ‘গোঁয়ার্ত্তুমি’ কাজ কেহ কখনো দেখে নাই। সান্তা মারিয়ার বন্দর-নগরে এক্ষণে তাহার যুদ্ধক্রীড়া দেখানো হইতেছে।

আন্দ্রে সেই সময় তাহার পত্নীর সহিত, একজন বন্ধুকে বিদায় দিতে ‘ক্যাডিক্সে’ গিয়াছিল। সেইখানে উক্ত নবাগত মল্লবীরের খ্যাতি শুনিয়া তাহার মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য স্বভাবতই তাহার ঔৎসুক্য হইল।

‘ক্যাডিক্স’ হইতে ‘পুয়ের্ত্তো’য় যাইবার এক বাষ্পীয় জাহাজ ধরিয়া উহারা দু’জনে ‘পুয়ের্ত্তো’ নগরে আসিয়া উপনীত হইল। মিলিতোনার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইলেও, মিলিতোনা ফরাসী কিংবা ইংরাজি ধরণের পরিচ্ছদ পরিত না—তখনও তাহার স্পেনীয় পোষাক ও স্পেনীয় রীতি নীতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

‘পুয়ের্ত্তোর’ অধিবাসীরা উজ্জ্বল বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া নগর-অঙ্গনে, পান্থ-শালায় মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রমণীরা ওড়নার উপরেও একটা লাল শাল পরিয়াছে, তাহার ঘেরের মধ্য দিয়া উহাদের পাণ্ডুবর্ণ মুখগুলি সুন্দর দেখাইতেছে।

সহরের প্রধান ব্যক্তিরা একপ্রকার দো-ফেঁকড়া ছড়ির উপর ভর দিয়া কেহ বা গদাই-নস্করি চালে চলিয়াছে, কেহ বা উহাদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্বরবর্ণে গঠিত অস্থিহীন প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মল্লক্রীড়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইল; লোকেরা তাড়াতাড়ি গিয়া ব্যগ্রভাবে রঙ্গালয়ের স্থান অধিকার করিল।

রঙ্গশালায় প্রবেশ করিয়া আন্দ্রে ও মিলিতোনা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ‘বক্স’-আসনে গিয়া বসিল। মল্লক্রীড়া সুরু হইল।

বিখ্যাত বৃষ-মল্ল কালো রঙের পোষাক পরিয়াছে। তাহার জামা কালো-জেট্ পাথর ও রেশমী অলঙ্কারে বিভূষিত; তাহার ভীষণ কঠোর চেহারার সহিত এই পোষাক বেশ খাপ খাইয়াছে। একটা হল্‌দে কোমর-বন্ধ তাহার শীর্ণ পঞ্জরকে ঘিরিয়া আছে; তাহার এই দেহ-কাঠামে পেশী ও অস্থি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তাহার শ্যামল মুখের দুই তিন জায়গায় নখের আঁচড়ের মত বলি-রেখা পড়িয়াছে; মনে হয় বয়সের দরুণ নহে; পরন্তু মনের কষ্টে। যদিও মুখে যৌবনের লক্ষণ দেখা যায় না, তথাপি উহার উপর পরিপক্ক বয়সের ছাপ পড়িয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

এই মুখ, এই দেহ-গঠন আন্দ্রের নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু ঠিক্ স্মরণ করিতে পারিল না।

মিলিতোনা এক মুহূর্ত্তও ইতস্তত করে নাই। পূর্ব্বের সহিত সাদৃশ্য খুব কম হইলেও মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে তখনই চিনিয়া ফেলিল! এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মিলিতোনা ভীত হইল। মিলিতোনা বুঝিল মনের কতটা আবেগ, জুয়াঙ্কোর মত লোহার দেহকে চূর্ণ করিতে পারে।

মিলিতোনা তাড়াতাড়ি হাত-পাখাটা খুলিয়া আপনার মুখ ঢাকিল এবং পিছনে গিয়া আন্দ্রেকে বলিল :—"ও জুয়াঙ্কো।"

কিন্তু পিছনে যাইবার পূর্ব্বেই, জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং হস্তের ইঙ্গিতে এক প্রকার অভিবাদন করিয়াছিল। আন্দ্রে বলিল :—

"এ জুয়াঙ্কোই বটে! বেচারা ভয়ানক বদ্‌লে গেছে; দশ বছরের মত বুড়িয়ে গেছে। একজন নূতন মল্ল এসেছে বলে' যার কথা লোকে এত বলাবলি করছিল, এখন সে হয়ে দাঁড়াল কিনা জুয়াঙ্কো! আবার দেখ্‌ছি জুয়াঙ্কো তার পুরাণো ব্যবসা ধরেছে।"

মিলিতোনা তার স্বামীকে বলিল :—

—"এসো ভাই আমরা এখানে থেকে চলে যাই। জানি না কেন—আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে; আমার মনে হচ্চে, কি যেন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটবে।"

আন্দ্রে উত্তর করিল :—

—আর কী ঘটতে পারে;—ঘোড়সওয়ার রক্ষীরা ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে পারে, ষাঁড় গুঁতিয়ে ঘোড়ার পেট চিরে দিতে পারে। এর বেশী আর কি হবে?

—আমার ভয় হচ্চে প্যাছে জুয়াঙ্কো একটা কিছু বড়াবাড়ি করে—ক্রোধান্ধ হয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড করে।

—তার সেই ছোরার আঘাতের কথাই দেখছি তোমার সর্ব্বদাই মনে হয়—তার ভয় নেই। তা কখনই হবে না। এতদিনে সে নিশ্চয়ই তার মনকে শান্ত করতে পেরেছে।

জুয়াঙ্কো রঙ্গাঙ্গনে অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিল। ষাঁড়ের লেজ ধরিয়া ষাঁড়কে ঘুরপাক খাওয়াইতে লাগিল। দুই সিং-এর মাঝে পা রাখিয়া, তারপর একলাফে নীচে নামিয়া পড়িল। ষাঁড়ের গা হইতে সাজসজ্জা ছিনাইয়া লইতে লাগিল, ষাঁড়ের ঠিক্ সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল; এরূপ দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে লাগিল যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মল্লকে কেহ কখন করিতে দেখে নাই।

লোকেরা উন্মত্তভাবে বাহবা দিতে লাগিল—বলিল, এরূপ অদ্ভুতকাণ্ড এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।

বৃষ-মল্লদের অশ্ববৃন্দ, দৃষ্টান্তে সহসা উত্তেজিত হওয়ায়, মনে হইল যেন তাহারা আর বিপদের আশঙ্কা করিতেছে না। বল্লমধারী রক্ষীগণ অঙ্গনের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছে। জুয়াঙ্কো সমস্তক্ষণ সকলকেই সাহায্য করিতেছে; হিংস্র পশুটার মনোযোগ অন্যদিক হইতে ফিরাইয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। জুয়াঙ্কোর একবার পা পিছলাইয়া যাওয়ার পর ষাড়টা তাড়া করিয়া আসিল; জুয়াঙ্কো যদি একটু পিছু হাঁটিয়া না যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিং দিয়া গুঁতাইয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিত।

জুয়াঙ্কো ষাঁড়দিগকে যে সব ছোরার আঘাত করিতেছিল, তাহা উচ্চ হইতে নীচে ও ষাড়ের কাঁধের মাঝখানে; আঘাতের ঘায়ে ষাঁড়গুলা বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িতেছে।

আন্দ্রে বলিল :—

"জুয়াঙ্কো দেখছি 'মন্তে', 'অর্চ্চনা' 'লাঠি' প্রভৃতি বিখ্যাত বৃষমল্লদেরও হারিয়েছে।

মিলিতোনাও "বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিলনা। আন্দ্রে ভূতলে পায়ের আঘাত করিতে লাগিল। আনন্দ-উচ্ছ্বাস চূড়ান্ত-সীমায়

উঠিল ; জুয়াঙ্কোর প্রত্যেক চলা-ফেরায় উন্মত্ত প্রশংসাধ্বনি চারিদিক হইতে উত্থিত হইল।

এইবার আর একটা ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—এটা সংখ্যায় ষষ্ঠ।

এই সময় একটা অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। জুয়াঙ্কো ষাঁড়টাকে বেশ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া, কয়েকবার সুদক্ষভাবে ছোরা চালাইয়া, শেষে অসি গ্রহণ করিল ; লোকে মনে করিল, এইবার জুয়াঙ্কো ষাঁড়ের গলায় অসি বিদ্ধ করিবে ; কিন্তু জুয়াঙ্কো তাহা না করিয়া অসিটা এত জোরে উপর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিল যে উহা ঘুরিতে ঘুরিতে জুয়াঙ্কোর বিশ কদম দূরে পড়িয়া মাটিতে গাড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দিক হইতে সবাই বলিয়া উঠিল :—"জুয়াঙ্কো করবে কি? এ তো সাহস নয়, তাহা পাগ্‌লামি! এই নূতন কৌশলটা না জানি কি? শেষে নাকের উপর একটা টোকা মেরে ষাঁড়টাকে মারবে নাকি, ?…"

যেখানে মিলিতোনা বসিয়াছিল, জুয়াঙ্কো সেই দিক্‌পানে একটা করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; সেই দৃষ্টিতে তাহার সমস্ত প্রেম ও হৃদয়ের সমস্ত যাতনা কেন্দ্রীভূত ছিল ; তাহার পর সে ষাঁড়ের সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পশুটা মাথা নোয়াইল। তাহার সমগ্র শিং জুয়াঙ্কোর বক্ষদেশে প্রবেশ করিল, এবং আমূল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শিং-দুইটা বাহির হইয়া আসিল।

দশ সহস্র কণ্ঠ হইতে আতঙ্কের চীৎকার ঊর্দ্ধদিকে সমুত্থিত হইল।

মিলিতোনা, মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া, চৌকীর উপর উল্টাইয়া প'ড়ল। এই চরম মুহূর্ত্তে মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে ভাল বাসিয়াছিল।

সমাপ্ত

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধ্রুব সত্য

দিল্‌-ভাঙ্গান নীল শাড়ী যার
পাগল-করা ডাগর আঁখি
মোটেই আমার নয় সে প্রিয়
আছে তা' কার জান্‌তে বাকী!
কোঁকড়া কালো চুল্‌ বুনে যে
বেণীর ছলে দোলায় ফাঁসি
তার সনে মোর একটি দিনো
হয় না ভাল'বাসাবাসি।
ফুলধনুর গুণ দিয়ে সে
গড়্‌বে রুলি—পর্‌বে হাতে,
হতেই কভু পারেনাক'
প্রণয় আমার তাহার সাথে।

অচিন্‌ প্রাণের সব-নেওয়া পায়
পদ্মরাগের আল্‌পনাকে
বলে যেজন আল্‌তা-রেখা
চাইনা আমি—চাইনা তাকে।
করেছিত' গদ্যে-পদ্যে
অনেক মিথ্যে বিশ্বে প্রচার,
সরল ভাষায় সহজ সত্য
কর্‌বোনা ভয় কইতে এবার—
তা' ব'লে যে এমন্‌টি ঠিক্‌
কেউ না যেন তাহার কাণে
ঘুণাক্ষরে এ সব তুলে
সর্ব্বনাশটি ডেকে আনে!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ব্রিটিশ-শাসনের একযুগ

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

এখন দেখা যাক্, রাজার বিরুদ্ধে ইংরাজ-কোম্পানীর সত্য কি অভিযোগ ছিল? হেষ্টিংস যখন বারাণসী যাইবেন স্থির করিলেন, তখন কৌন্সিলের একটী সভা ডাকিলেন। সভাটী বড় সুন্দর! আর তাঁহারা ব্যবস্থাও করিলেন ততোধিক সুন্দর। কৌন্সিলের সভ্য তখন মোটে দুইজন—হেষ্টিংস স্বয়ং এবং হুইলার সাহেব। আবার যদি দুইজনে কখনও মতভেদ হয়, তাহা হইলে সভাপতির একটী অতিরিক্ত ভোট ছিল। অতএব ইহা কেবল নামমাত্র লোক-দেখানো কৌন্সিলের সভা ছিল। সেই হেষ্টিংস-হুইলার সভা গভীর গবেষণা করিয়া ১৭৮১ সালের ২১ শে মে স্থির করিলেন যে, হেষ্টিংস বারাণসী গিয়া চৈৎসিংহ-সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা স্থির করিবেন এবং ভবিষ্যতে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য হেষ্টিংসের ক্ষমতাও নির্দ্ধারিত করা হইল। ফরেষ্টের State Papers গ্রন্থের তৃতীয়-খণ্ডে ৭৭৫ পৃষ্ঠায় কৌন্সিলের ৩রা জুলাই-এর কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। সেই সভায় স্থির হইল যে, হুইলার সাহেব হেষ্টিংসের অনুপস্থিতিকালে লাটসাহেবের এবং কৌন্সিলের সমস্ত অধিকার ভোগ করিবেন এবং হেষ্টিংস্ বারাণসী-রাজের সহিত তাঁহার সন্ধি-সর্ত্ত-অনুসারে যাহা উত্তম ব্যবস্থা হয়, তাহা করিবার পূরা অধিকার পাইলেন। ইহাতে কিন্তু ইহাই বুঝা যায় যে, হেষ্টিংস রাজা চৈৎসিংহের সহিত আপোষে একটা ন্যায্য ব্যবস্থাই করিবেন।

হেষ্টিংস ১৪ই অগষ্ট বারাণসী পৌঁছিলেন। আর রাজাকে একটী চিঠি লিখিলেন; তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সব লিপিবদ্ধ হইল:—

(১) রাজা ১৭৮০ সালের অতিরিক্ত কর যথাসময়ে দেন নাই। তাহাতে ইংরাজের মালব-যাত্রী সৈন্যের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হইয়াছিল।—এই অভিযোগটী যেন কথামালার মেষ-শাবকের বিরুদ্ধে ব্যাঘ্রের অভিযোগের মত শুনায়!

(২) রাজা ১০০০ পদাতিক দেন নাই।

(৩) রাজা ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।

(৪) রাজা রাজত্ব চালাইতে পারেন নাই—কারণ কাশীতে প্রত্যহ খুন ও ডাকাতি হয়।

রাজা তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর দিলেন। তাহাতে অভিযোগগুলির জবাব ছিল;

(১) রাজা লিখিলেন যে তিনি ১,৭০,০০০ হাজার টাকা রেসিডেণ্টকে যথাসময়ে দিয়াছিলেন এবং বক্রী টাকার জন্য সময় চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সে কথার কোন উত্তর পান নাই। রাজার কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করা উচিত—"টাকা মালব-যাত্রী সৈন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার ত আমার উপর ছিল না। যদি দেরী হইয়া

থাকে, তাহার জন্য আমি দায়ী নই। যদি টাকা দেওয়া ছাড়া তাহা পাঠানোর ভারও আমার উপর থাকিত, তাহা হইলে অত দেরী হইত না।”

(২) দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে রাজা লিখিলেন যে, তিনি ৫০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়া মার্কহাম সাহেবকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন উত্তর পান নাই।

(৩) রাজা উত্তর দিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আবদুল্লা বেগ ভিন্ন আর কেহ কলিকাতায় যায় নাই। আর আবদুল্লা হেষ্টিংসের নিকটই গিয়াছিল।

(৪) রাজা লিখিলেন যে, ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অপরাধীকে শাস্তিও দিয়াছেন।

হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক ফরেষ্ট সাহেব চৈৎসিংহের পত্র সম্বন্ধে এক-কথায় রায় দিয়াছেন—“The answer was false in all its parts.” অর্থাৎ উত্তরের প্রত্যেক কথাটি মিথ্যা। ঐতিহাসিক যে এরূপ নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচার কিরূপে করিলেন, তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না! হেষ্টিংস ত পত্র পাইয়াই অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। কলিকাতার বোর্ডকে অর্থাৎ তাঁহার সহযোগী হুইলারকে জানাইলেন যে, রাজার চিঠিখানি—“not only unsatisfactory in substance but offensive in style” অর্থাৎ শুধু যে ভিতরের কথায় অসন্তোষজনক তাহা নয়, আবার লেখার ভঙ্গীতেও অপমানকর।

হেষ্টিংস আর মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে পারিলেন না। রেসিডেণ্টকে আদেশ দিলেন যেন রাজা চৈৎসিংকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৭৮১ সালের ১৬ই অগষ্ট প্রাতঃকালে রেসিডেণ্ট রাজাকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং দ্বারে ইংরাজ সৈন্য প্রহরী রাখা হইল। রেসিডেণ্ট গবর্ণর-জেনারেলকে লিখিলেন—“রাজা স্থিরভাবে বন্দী হইলেন এবং আমাকে বারবার আশ্বাস দিলেন যে, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তিনি তাহা প্রাণপণে পালন করিবেন। তিনি আশা করেন যে আপনি তাঁহাকে একটা বৃত্তি দিবেন। কিন্তু আপনি যদি চান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জমিদারী, তাঁহার দুর্গসমূহ, এমন কি তাঁহার ধনসম্পত্তি প্রাণ পর্য্যন্ত আপনার পদতলে দিতে ইচ্ছুক।” এইরূপ স্বাধীনতা-অভিলাষী বিদ্রোহী রাজার শাস্তির জন্য হেষ্টিংস্ অস্থির হইয়াছিলেন!

এইস্থানে আমাদের ধীরভাবে বিচার করা উচিত, এই ব্যাপারে কাহার কতটা দোষ? কারণ চৈৎসিংহের বন্দী হইবার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহার জন্য হেষ্টিংসকে বা রাজাকে দোষী করা চলে না। রাজাকে তাঁহার প্রজাবর্গের সম্মুখে নিজের প্রাসাদে বন্দী করা যে নিতান্ত নিষ্ঠুর এবং অবিবেচকের কাজ হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! কোম্পানীর আইনতঃ এবং তাহাদের নিজেদের পাট্টা সনদ অনুসারে অতিরিক্ত কর আদায় করিবার কোন অধিকার ছিল না। তারপর সেই করের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ধার্য্য হইয়াছিল এবং অযথা বলপ্রয়োগ দ্বারা সেটা আদায় করা হইয়াছিল। রাজাকে বন্দী করার জন্য হেষ্টিংসকে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ভোগ

করিতে হইয়াছিল। এমন-কি তাঁহার প্রভু ডাইরেক্টর সভা অতি তীব্র ভাষায় এই কাজটার প্রতিবাদ করেন—"improper, unpolitic and unwarrantable"—অন্যায়,অযৌক্তিক এবং সমর্থন করিবার অযোগ্য !

রাজার বিরুদ্ধে সত্য কি অভিযোগ ছিল ? ১৭৭৩ সালে হেষ্টিংস্ রাজার সপক্ষে অনেক লিখিয়াছিলেন। রাজার সম্বন্ধে স্বয়ং লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ইংরাজের একজন নিশ্চিত মিত্র—" a sure ally." ১৭৭৭ সালের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্য রাজা হেষ্টিংসের বিরাগভাজন হইলেন ? একটি ঘটনার সন্ধান ঐতিহাসিকেরা পাইয়াছেন যে, রাজা ১৭৭৭ সালে জেনারেল ক্লেভারিংএর নিকট কলিকাতায় একটী লোক পাঠাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ গবর্ণর-জেনারেলের পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ডাইরেক্টরগণ ক্লেভারিংকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। সেই সংবাদ এ দেশে পৌঁছিতে রাজা তাঁহার কর্ত্তব্য মনে করিয়া যথারীতি নূতন লাটকে সম্মান জ্ঞাপন করিবার জন্য একটী লোক পাঠান। হেষ্টিংস্ কিন্তু সত্য পদত্যাগ করেন নাই। তিনি পরে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করেন এবং ক্লেভারিংএর নিয়োগ শুধু কাগজ-পত্রেই ছিল, কাজে কিছুই হয় নাই। কিন্তু হতভাগ্য রাজার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তিনি হেষ্টিংসের চক্ষুশূল হইলেন। হেষ্টিংস্ নিজেই একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"In June 1777, he had deputed a man named Sumboonath, with an express commission to my opponent and the man had proceeded so far as Moorshedabed, when, hearing of the change of affairs he stopped and the Raja recalled him." ১৭৭৭ সালের জুন মাসে রাজা শম্ভুনাথ নামে এক ব্যক্তিকে একটী বিশেষ বার্ত্তা দিয়া আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই লোকটী মুর্শিদাবাদ অবধি আসিয়াছিল, সেইখানে সে ঘটনা-পরিবর্ত্তনের সংবাদ পায় এবং রাজা তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন।"

এই সামান্য ঘটনা হইতেই রাজা ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এই সংবাদের সৃষ্টি ! হেষ্টিংস্ কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে সত্য কথা গোপন করিয়া একটী অন্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন—"I will suppose for a moment, that I have erred, that I have acted with an unwarranted rigour towards Cheyt Sing, and even with injustice. Let my motive be consulted: I left Calcutta impressed with the belief, that extraordinary means, and those exerted with a strong hand, were necessary to preserve the Companys' interests from sinking under the accumulated weight which oppressed them. I saw a political necessity for curbing the over-grown power of a great member of their dominions, and to make it contribute to the relief of their pressing

exigencies. If I erred, my error was prompted by an excess of zeal for their interests, operating with too strong a bias on my judgment."

ইহার ভাবার্থ এই—যদি ধরিয়া লওয়াই যায় যে আমি চৈৎসিংহের সম্বন্ধে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা হইলেও আমার অভিপ্রায় কি, দেখুন। আমি দেখিলাম যে আমাদের রাজত্ব রক্ষা করিতে হইলে রাজার অতি-বাড় নষ্ট করিতে হইবে এবং সেই অবসরে আমি আমাদের শূন্য ভাণ্ডারও পূরণ করিবার সুযোগ দেখিলাম। আমার যদি ভুল হইয়া থাকে ত সে ভুলের কারণ, কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমার বিশেষ প্রচেষ্টা।

এই কয়টী কথায় সত্য কতকটা প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু হেষ্টিংস প্রকৃত অভিপ্রায়টী ব্যক্ত করেন নাই। সত্য বটে কোম্পানীর তখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবই যদি মনোগত অভিপ্রায়, তাহা হইলে চৈৎসিংহের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া যে ২৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল, তাহা হেষ্টিংস্ কোম্পানীর তহবিলে আনিলেন না কেন? ইংরাজ সৈন্যদিগকে উপহার দিলেন কেন? তখন কি করিয়া কোম্পানীর এমন স্বচ্ছল অবস্থা হইল যে অতটা টাকা কোম্পানী দান-খয়রাৎ করিলেন? প্রকৃত কথা তাহা নয়। আর যে অতি-বাড়ের কথা, তাহাও অমূলক। বিরুদ্ধাচারী সামন্ত রাজ এত বলশালী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার আপন প্রাসাদে বন্দী করিতে ইংরাজকে কোন ক্লেশই পাইতে হয় নাই! এবং পরে তথা-কথিত বিদ্রোহ দমন করিতে অল্প-সংখ্যক ইংরাজ সৈন্যের সপ্তাহ কয়েক সময় লাগিয়াছিল।

প্রকৃত কথাটী হইতেছে, হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। হেষ্টিংস একবার সে কথাটা বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন—"So long as I conceived Cheyt Sing's misconduct and contumacy to have me, rather than the Company, for its object, I looked upon a considerable fine as sufficient."

অর্থাৎ যতদিন আমি ভাবিয়াছিলাম যে চৈৎসিংহের বিরুদ্ধাচরণ আমাকেই লক্ষ্য করিয়া—কোম্পানীকে নয়—ততদিন আমি স্থির করিয়াছিলাম যে একটা বেশী-রকম জরিমানা করিলেই ঠিক্ হইয়া যাইবে। বার্ক এই কথাটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভিতরের কথা অনেকটা এখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্রোহী সামন্তের শাস্তি হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল না, নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশের বশেই তিনি ঐ কাজ করিয়াছিলেন। শম্ভুনাথ যে রাজার পক্ষে তাঁহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লেভারিংকে অভিনন্দন করিতে কলিকাতায় আসিতেছিল, হেষ্টিংস এ কথা কখনও ভুলিতে পারেন নাই; এবং সেইজন্য রাজার সর্ব্বনাশও হইল। সৌভাগ্যের বিষয়, আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা সত্যকে বেশী বিকৃত করিতেছেন না। ওআইট টিল্‌বি বা ভিন্সেন্ট স্মিথ্ এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, হেষ্টিংস্ "picked a quarrel with the Raja"—রাজার সহিত ঝগড়া বাধাইয়াছিলেন; "এবং রাজার এত ভীষণ শাস্তির কারণও হইতেছে—"his personal resent-

ment against the Raja"—"তাঁহার রাজার উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ।" কিন্তু স্মিথ্ তবুও লিখিয়াছেন—"p obably" অর্থাৎ সম্ভবতঃ। ইংরাজ ঐতিহাসিক কি না—খুব ধীর, সংযতভাবে তাই এইরূপ কথা লিখেন! প্রকৃত কথাই কিন্তু এই। তবু স্মিথ বা টিল্‌বি ফরেষ্ট বা ট্রটারের চেয়ে অনেক ভাল! আমাদের এই শোচনীয় ঘটনার আলোচনায় এইটুকুই যা' সুখ।

শেষ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

তুর্কীজাতি

তুর্কী দেশের জন-সাধারণ সোলতানকে আদিকাল হইতে খোদার ছায়া (জিল্লুল্লাহ) বলিয়া মনে করেন। সম্রাট ইচ্ছা করিলে রাজ্য ও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারিতেন, সে জন্য কেহ কোন কথা তুলিত না। মুফ্‌তী নামক জ্ঞানগুরু ধর্ম্ম-পণ্ডিতের কথা সোলতান সব সময়ে মানিয়া চলিতেন।

যে সমাজ শিক্ষিত, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ সেখানেই যথেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সেকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং প্রাচ্যের রাজন্যবর্গকে যথেচ্ছাচারী বলিয়া ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যে মাঝে মাঝে নিন্দা করিয়াছেন—তাহা না করিলেও হইত।

কোর-আন হাদীস ও রাজার প্রজা-পালনের সুবুদ্ধি শাসন-যন্ত্রের মেরুদণ্ড ছিল। তুর্কী ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাজা যেখানে স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে সুসভ্য বীর, মৃত্যু-ভয়-বিরহিত তুর্কীরা উত্তেজিত হইয়া রাজাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন। রাজার যথেচ্ছাচারকে কাপুরুষের ন্যায় মানিয়া লইয়া তুর্কী জাতি সব সময় নিজেদের দাবী ও মর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই।

তুর্কী জাতির মধ্যে কোন আভিজাত্য ছিল না। সকল তুর্কী ভদ্রলোক। নীচতম ব্যক্তিও স্বীয় শক্তি, বুদ্ধি ও দক্ষতার গুণে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিতেন—অতি বড় সুসভ্য জাত ছাড়া মানুষের মূল্য এমন করিয়া আর কে স্বীকার করিবে?

জগতের কোন সিংহাসনে একাদিক্রমে চার শতাব্দী ধরিয়া তুর্কীদের প্রথম সম্রাট ওছমানের বংশধরগণ ছাড়া আর কেহ রাজত্ব করেন নাই। সোলতানের অধীনস্থ শাসন-কর্ত্তারা পরবর্ত্তীকালে অনেক সময় বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীন বলিয়া নিজদিগকে ঘোষণা করিলেও তাঁহারা কখনও ওছমান-বংশীয় রাজাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন নাই, কিংবা কনষ্টান্‌টিনোপোলের সিংহাসনে কোন নূতন রাজবংশ-স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই।

তুর্কীরা বলেন—প্রধানতঃ চার শ্রেণীর লোক দ্বারা শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে...যথা, প্রথম—উজীর, দ্বিতীয়—কাদিয়াস্‌কর (বিচারক) তৃতীয়—দফ্‌তরদার (কোষাধ্যক্ষ) চতুর্থ—কেরাণী। এ ছাড়া শাসন-কার্য্য পরিচালনার জন্য সৈন্য-শ্রেণী ও আমলা-শ্রেণীর প্রয়োজন হয়।

সম্রাট দ্বিতীয় মোহম্মদের চার জন উজীর ছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন সর্ব্বপ্রধান, সৈন্য ও কেরাণী বিভাগ তাঁহারই অধীনে থাকিত।

রাজ-দরবারের নাম ছিল দিভান। সম্রাটের অনুপস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। বিচারক বা আইন বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তারা এবং বাকী তিন মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর দক্ষিণ পার্শ্বে আসন লইতেন। কোষাধ্যক্ষ ও কেরাণীরা তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিত। সকল বিভাগের সংবাদ যাহাদের নিকট থাকিত (তেস্‌কেরাদিস্‌), তাঁহারা প্রধান উজীরের সম্মুখে বসিতেন।

আগা শব্দের অর্থ যিনি শাসন করেন—সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা এবং সিভিল বিভাগের অনেকেও এই উপাধিটি ধারণ করিতেন। যায়গীরদারদিগকে "বে" অথবা "বেলার বে" বলা হইত। যুদ্ধকালে ইঁহারা অশ্বারোহী সৈন্য-রূপে সম্রাটকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন। তুর্কীদের সম্বন্ধে "পাশা" শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। 'পাশা' শব্দের আদি অর্থ সম্রাটের পা। ইহা একটী সম্মানজনক উপাধি—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, সেনাপতি এবং কখনও কখনও সাহিত্যিক-দিগকে এই উপাধি দেওয়া হইত।

সম্রাটকে বাদশা বলা হইত। তুর্কী সম্রাটেরা কোন খৃষ্টান নরপতিকে এই গৌরব-জনক আখ্যায় আখ্যাত করিতে অপমান বোধ করিতেন।

প্রয়োজন হইলে বাদশা তাঁহার রাজত্ব হইতে এক লক্ষ অশ্বারোহী, পদাতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক পাইতেন। ইহা ছাড়া স্থায়ী পদাতিক সৈন্য-সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র ছিল। তৎকালে জগতের মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য ও সমর-কৌশলে ইহাদের মত আর কেহই ছিল না। তাহারা ইতিহাসে জানীসারিজ (Janis-saris) নামে অভিহিত।

জানীসারিজ সৈন্যদল পরাজিত জাতির কিশোর-বয়স্ক বালকদিগের ভিতর হইতে সংগৃহীত হইত। ইহারা শেষকালে স্বেচ্ছায় এস্‌লাম বা রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিত। ইহাদের সংগ্রহের জন্য বিশেষ কোন বল-প্রয়োগ প্রয়োজন হইত না। ইউরোপের খৃষ্টানেরা আপন আপন সন্তান-দিগকে জানীসারিজ সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

সৈন্য-চালনা-পদ্ধতি, আশ্চর্য্য সমর-কৌশল, রসদ-সংগ্রহ, অস্ত্র-শস্ত্রের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে তুর্কীরা যতখানি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারিতেন, তৎকালে ইউরোপীয় কোন জাতিই সেরূপ পারিত না। এবং এই কারণেই তাহারা তুর্কী জাতির সম্মুখে টিঁকিতে পারে নাই—পদে পদে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে।

তুর্কীরা কোন দেশ জয় করিলে প্রধানতঃ তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন। প্রথম ভাগের আয় বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও জন-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। দ্বিতীয় ভাগ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তৃতীয় ভাগের আয়—রাজকোষে যাইত। এই ভাগ হইতে কিছু সম্পত্তি প্রয়োজন-মত সম্রাট লইতেন, রাজমাতাকেও কিছু দেওয়া হইত। প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরাও অংশ লাভ করিতেন।

সমর-কুশল সৈনিক পুরুষকে তিন শত হইতে পাঁচ শত একর পর্য্যন্ত জমি লাখেরাজ (তিমার) দেওয়া হইত। এই পুরস্কার লাভ করিয়া সত্বাধিকারী বাদশাকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিত। লাখেরাজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে সম্রাটের অনুমতিক্রমে তাহা সাধারণতঃ যায়গীরদারেরা (বে) পাইতেন। "বে" উপাধিটি প্রথমে সম্রাট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রদান করিতেন, শেষে উহা বংশানুক্রমিক হইয়া পড়ে।

ইউরোপে অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী জমীদার-শ্রেণী রাজার প্রতি বিদ্রোহাচরণ ও সাধারণ মানুষের উপর বিলক্ষণ প্রভুত্ব করিবার নিষ্ঠুর প্রয়াস পাইয়াছে। তুর্কী দেশের জায়গীরদার শ্রেণী কখনও এরূপ করেন নাই। ইঁহারা জাতির সমবেত স্বার্থ-রক্ষার জন্য সম্রাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের যুগে তুর্কী-জমিদারেরা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনও তাঁহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন

নাই কিংবা সাধারণ মানুষের কাছে নিজ নিজ দলকে উচ্চশ্রেণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা করেন নাই। তুর্কী জাতির মধ্যে বংশ-গৌরব মোটেই ছিল না, প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী এবং পথের মজুর—সবারই আসন একজায়গায়। ভদ্র-শ্রেণী ও ইতর-শ্রেণী বলিয়া তুর্কী জাতির মধ্যে কোন কিছু ছিল না। বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে অধিকতর সুখ-সুবিধা ভোগ করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হইত না। সম্রাট ইচ্ছা করিলে এবং উপযুক্ত জ্ঞান করিলে পথের মজুরকে উচ্চাসনে বসাইতে পারিতেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না—এজন্য কেহ নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারিত না।

প্রত্যেক গ্রামে স্বায়ত্ত শাসন (Local self Government) ছিল। শাসনের ছোট ছোট কাজ গ্রামবাসীরাই নিষ্পন্ন করিতেন। সকলে মিলিয়া একজন "প্রধান" নিযুক্ত করিতেন। তিনি চাঁদা আদায় করিতেন। সংগৃহীত অর্থের হিসাব-পত্র তিনিই রাখিতেন, তিনি ছোট ছোট গ্রাম্য মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন এবং সম্রাটের কাছে কোন রাজকর্ম্মচারীর অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা প্রয়োজন হইলে ইনিই করিতেন। তুর্কী জাতির গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা অতি উৎকৃষ্ট। গ্রীক, আরমিনিয়া এবং খৃষ্টান বুলগারেরা তুর্কীদের অনুকরণে নিজেদের দেশে এই প্রকার স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথার প্রচলন করেন।

দ্বিতীয় মোহাম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ এ বিষয়ে অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন—তিনি বুঝিয়া ছিলেন, কোন জাতিকে জগতে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে বাহুবল ছাড়া জ্ঞান-বল সংগ্রহ করা আবশ্যক। মোহাম্মদ নিজে পণ্ডিত ছিলেন, বিজ্ঞানে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি দেশের লোককে জ্ঞান, আলোচনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ বিচারক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। জীবনে যাহাতে তাঁহাদের আর্থিক অনটন-বশতঃ নৈতিক অধঃপতন না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। প্রতি গ্রামে এক একটা পাঠশালা (মকতব) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্র স্কুল-কলেজ খোলা হইয়াছিল। এই সমস্ত কলেজের সাহায্যের জন্য রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। কলেজে ছেলেদিগকে দশটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত—(১) ব্যাকরণ (২) বাক্য-বিন্যাস-প্রকরণ (৩) তর্কশাস্ত্র (৪) মনোবিজ্ঞান (৫) ভাষাতত্ত্ব (৬) শব্দালঙ্কার প্রকরণ (৭) জ্যামিতি এবং (৮) খগোল বিজ্ঞান বা জ্যোতিষ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড ও প্যারিসে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইত। এই কয় বিষয়ে আধিপত্য জন্মিলে ছাত্রদিগকে "দানেশ-মন্দ" উপাধি দেওয়া হইত। 'দানেশমন্দ' শব্দের অর্থ বুদ্ধিমান। দানেশমন্দ কোন সাধারণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইতে পারিতেন মাত্র। আলেম হইতে হইলে তাঁহাকে আরও অনেকগুলি পরীক্ষা দিতে হইত এবং তাঁহাকে আইন জ্ঞান লাভ করিতে হইত। উলামা শ্রেণীর সম্মান খুব বেশী ছিল। তাঁহারা বিপুল সম্মান, বহু অর্থ এবং সম্রাটের নিকট হইতে নানাপ্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। উলামা শ্রেণী হইতে অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেন। রাজধানী ও মফস্বলের বিচারক (কাজী), প্রধান প্রধান নগরের বিচারক (মোল্লা) ইস্তাম্বুলে-এফান্দি (ইস্তাম্বুল (Constantinople) সহরের জজ, প্রধান পরিদর্শক) এবং মুফতীও এই উলামা শ্রেণী হইতে সংগ্রহ করা হইত। উলামা শ্রেণীকে এস্‌লাম ধর্ম্মের পরিচালক মনে করা ভুল। ইমাম, শেখ, ও প্রচারক ধর্ম্মকার্য্য করিতেন—তাঁহারা উলামা শ্রেণীর একটা সামান্য অংশ মাত্র। তুর্কী জাতির শাসন-ব্যাপারে ধর্ম্ম-কার্য্যরত ইমাম ও শেখদের প্রভাব নাই বলিলেও চলে।

তুর্কীদের মধ্যে অধ্যাপক ও শিক্ষিতদিগের অত্যন্ত সম্মান ছিল—ইউরোপের অন্য কোথাও অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা সাধারণের নিকট হইতে এত সম্মান পাইতেন না।

কোর-আন খৃষ্টান ও ইহুদীদিগকে ধ্বংস করিতে নিষেধ করিয়াছে। নত মাথাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করিবে না, ইহাই তুর্কীজাতির যুদ্ধনীতি। জনৈক মুফতীকে

একবার তুর্কীরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—যদি এগার জন মুসলমান একজন বাদশার অবিশ্বাসী প্রজাকে হত্যা করে, তাহা হইলে কি হয়? মুফ্‌তী আইনের কথায় উত্তর দিয়াছিলেন, একশতজন মুসলমানও যদি এরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইবে।

বিজিত জাতির (রায়া) ধন-সম্পত্তি ও শরীরের উপর কেহ অত্যাচার করিতে পারিত না। তাহারা নির্ব্বিবাদে নিজেদের ধর্ম্মপালন করিতে পারিত।

তুর্কী জাতির অধীনস্থ খৃষ্টান প্রজাদিগকে কর দিতে হইত। তাহারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না। জেতা মুসলমানদের নিকট তাহারা সম্মানে ছোট, ইহা তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইত। *

তাহাদিগকে তুর্কী পোষাক পরিতে দেওয়া হইত না। খৃষ্টানদের অধীনে জুদের (Jew) যেরূপ দুরবস্থা ও অসম্মান হইত, তাহার তুলনায় খৃষ্টানেরা মুসলমান জাতির অধীনে সুখে ছিল। শেষকালে খৃষ্টানদের উপর বহু অত্যাচার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা তুর্কী শাসন ব্যবস্থার দোষে হয় নাই। খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ তুর্কী জাতির একটা দোষের কথা বলেন—বিজিত খৃষ্টানদের নিকট হইতে তাঁহারা খাজনা-স্বরূপ কিশোরবয়স্ক বালক সংগ্রহ করিতেন।

সেকালে অন্যান্য দেশের মত তুর্কী পরিবারে দাস-প্রথার প্রচলন ছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় দাসদের জীবন তত শোচনীয় ছিল না। দাসদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে তুর্কী আইনে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। আইন অপেক্ষা তুর্কীদের স্নেহ-মমতা দাসদের জীবনকে অধিক নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছিল। ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কোর-আনে আদেশ আছে। কোর-আন আরও বলে, যে দাসকে মুক্তি দেয়, সে নিজেকে নরকের আগুন হইতে মুক্ত রাখে। দাস মুক্তি লাভ করিলে, এবং সে যদি অবিশ্বাসী না হয় তাহা হইলে তাহার গুণানুযায়ী তাহাকে উচ্চাসনে বসাইতে কেহ আপত্তি তুলিত না। তুর্কী শাসনের বহু রাজকর্ম্মচারী এই দাস-শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। গুণ ও শক্তি যেখানে তুর্কীরা পাইয়াছেন, সেইখানেই উপযুক্ত সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করেন নাই।

খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক সময় উপযুক্ত ব্যক্তির গুণের আদর হইত না, এজন্য বহু খৃষ্টান স্বেচ্ছায় তুরস্কে আসিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। বাদশাহ কিম্বা তুর্কী জাতি খৃষ্টান বা ছোট লোক বলিয়া কখনও তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন না। মুসলমান হইলে আর কথা নাই—সমস্ত ভেদ সমস্ত স্বাতন্ত্র্য তখন নষ্ট হইয়া যাইত। বাদশাহ সোলেমান এবং দ্বিতীয় সেলিমের সময়—দশ মন্ত্রীর মধ্যে আটজনই ছিলেন প্রথমে খৃষ্টান। অন্যান্য বহু কর্ম্মচারী প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন। ইঁহারা কখনও কোনও কাজে অবিশ্বাসের পরিচয় দেন নাই—ইঁহাদের কেহ কেহ খৃষ্টান জাতির পরম শত্রু ছিলেন, খৃষ্টান জাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করিতেন না এবং প্রয়োজন হইলে অতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিতেন।

তুর্কী জাতির নিজেদের বল-বীর্য্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে অসামান্য বিশ্বাস ছিল। সর্ব্বত্র তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। অধীনস্থ খৃষ্টান প্রজারা বিনা ওজরে ও বিনা আপত্তিতে তাহাদিগকে সম্মান করিতেন। তুর্কীদের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান খুব প্রখর ছিল। তাঁহারা সাধু এবং সত্যপরায়ণ ছিলেন—বিচার-বুদ্ধি তাঁহাদের খুব প্রবল ছিল। তাঁহাদের প্রাণে অত্যন্ত দয়া এ কথা তুর্কী জাতির পরম শত্রুও স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা কুস্তনতুনিয়ায় (Constantinople) কিছু কাল বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও এ কথায় সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ঐতিহাসিক ক্রিসি বলেন, মুসলমান ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের বিধি-ব্যবস্থা তুর্কীদিগকে এত ভদ্রলোক করিয়াছে, যিনি সত্য মুসলমান তাঁহাকে সংযমী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দয়ালু, সত্যপরায়ণ ও দানশীল হইতে হইবে। সাধারণ তুর্কীর চরিত্রে যে গুণরাশি পরিলক্ষিত হয়, তাহা অন্যান্য মুসলমান জাতির মধ্যে দুর্লভ। ক্ষমতাপ্রাপ্ত তুর্কী

* "They were to obey regulation all tending to mark their inferior position."

কখনও কখনও দুরাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতা পাইলে অনেক মানুষেরই চরিত্রে কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সমস্ত খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুর্কী জাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাঁহারাই বেশী করিয়া অমানুষতার পরিচয় দিয়াছেন।

যুদ্ধকালে তুর্কীর সিংহ-বিক্রম, শত্রুর প্রতি তাহার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া তাহাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উহা সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নহে। সামাজিক জীবনে তুর্কীরা অত্যন্ত শান্ত, বিনয়ী এবং দয়ার্দ্র হৃদয়। ধর্ম্মবিশ্বাস ও জাতির সত্যের জন্য তুর্কী প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করে—বীর-জীবনের ইহা অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত শত্রুকুল তুর্কীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে—সম্রাটের আহ্বানে জীবনের সকল আনন্দ হারাম জানিয়া তুর্কী অনবরত যুদ্ধ করিয়াছে—ইহা কি কম প্রশংসার কথা? লড়াই-এর নামে তুর্কী মোটেই ভীত নয়—যুদ্ধের নামে তুর্কীর শিরা-ধমনী নাচিয়া ওঠে। সমস্ত দেশে একটা মহা উল্লাসের প্রবাহ ছুটে। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুর্কী অধীর উন্মত্ত হইয়া উঠে। কোর-আনে লেখা আছে—"বিনা কারণে মানুষ হত্যা করা খোদা ভাল বাসেন না, মানুষকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাকে হত্যা করিবার তুমি কে? এ কথাও কোর-আনে লেখা আছে—শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরজ। শত্রু-দমনে মুসলমানকে দেহ-মন ধন-সম্পত্তি উৎসর্গ করিতে হইবে। কাপুরুষের মত যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, সে খোদার শত্রু, খোদার জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় সে স্বর্গবাসী হয়। এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস তুর্কীর হৃদয়ে ও বাহুতে অজেয় শক্তি দিয়াছিল। তুর্কীর পক্ষে নারী এবং বালক-বালিকাকে হত্যা করা নিষেধ। নিষ্ঠুরতা এবং সন্ধিশর্ত্ত ভঙ্গ করা তুর্কীর পক্ষে পাপ। শত্রুর নিকট কোন প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবে। তুর্কী এস্লামের পক্ষে ক্ষতিজনক কোনও প্রকার সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইবে না। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া এরূপ কোন সন্ধি করিলে তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবেই।

মোহাম্মদ ফুৎফর রহমন।

সাধনা, কার্ত্তিক ১৩২৮।

প্রত্যাবর্ত্তন

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জলদ

সুপারিশের জোরে বি-এ পাশ করিয়াই জলদ ডেপুটি হইয়া চট্টগ্রামে আসিল। সঙ্গে স্ত্রী ও মা আসিবেন বলিয়া * স্থির ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিল না। জলদের মেজ বোন উষাঙ্গিনীর ছেলের অন্ন-প্রাশনের আর সতেরো দিন দেরী। সে প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে পাঁচ-ছয়খানি চিঠিতে মা ও ভাজেদের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে—খোকার ভাতে সকলকে যাইতে হইবে। বড়মানুষ কুটুম! তাহাতে আবার অত্যন্ত অমায়িক। বাড়ীর ছেলে-বুড়া সকলেই মাটীর মানুষ। প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। ঘটাঘটিও খুব হইতেছে। যাত্রা, থিয়েটার, রামকমলের কথকতা, বায়োস্কোপ, আরও কত-কি আয়োজন হইবে! তালিকা পাইয়া ছেলেমেয়ে ও বধূদের দলে উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। কর্ত্তা-গৃহিণী বুড়া বয়সে সখ মানায় না ভাবিয়া যেন

অনিচ্ছাতেও বাধ্য হইয়া ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছায় ও কুটুম্বের আগ্রহে সম্মতি দিলেন। কেবল খুসী হইল না জলদের স্ত্রী সুনীতি। স্বামীকে ছাড়িয়া তাহাকে থাকিতে হইল ত বটেই, তা ছাড়া উপস্থিত সুযোগ হারাইলে আবার যে কবে সুযোগ মিলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বড় সংসারে অসুখ-বিসুখ, তাছাড়া নিত্যই কত অন্তরায় লাগিয়া আছে! সকল দিকে সুযোগ ঘটিলে তবে ত বাহির হওয়া যাইবে। এই প্রথম সে বাসায় যাইবে। শাশুড়ী সঙ্গে গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া না আসিলে চলিবে না। বড় খোকা আবার ঠাকুমার খুবই ন্যাওটা। তাঁহাকে ছাড়িয়া এক রাত্রিও সে কোথাও থাকিতে পারে না। সঙ্গে সুনীতির যাওয়া ঘটিল না বলিয়া জলদও ক্ষুণ্ণ হইল। তবু সে স্ত্রীকে উৎসাহ দিয়া কহিল,—"মাসখানেক দেরী হবে, তার আর কি করা যাবে? এক রকম করে কেটে যাবে। তোমার কি বল— কেমন মজা করে নিমন্ত্রণ খাবে, থিয়েটার, নাচ-তামাসা দেখবে, আমি বেচারাই কড়িকাঠ গুণে দিন কাটাব। চিঠিতে একটু-আধ্‌টু আমাকেও ভাগ দিও, যদি ভুলে না যাও। শুনেও তবু পেট ভরানো যাবে। খোস-খবরের ঝুটাও ভাল।"

সুনীতি উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ করিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"ছাই আমোদ! আমার যদি একটুও ভাল লাগ্‌বে। তুমি হাস্‌চ! তোমার আমোদ হয়েছে খুব, আমার যাওয়া হলোনা বলে, না? বেশ, যাও, তুমি একলাই যাও! আমি ত যেতে চাইব না আর-কখনও, ফিরে এসেও না। থাকোগে না তুমি এক্‌লা গিয়ে! কে চায় তোমার কাছে থাক্‌তে?"

ষোল বছরের ছেলে জলদের সহিত যখন দশ বছরের মেয়ে সুনীতির বিবাহ হয়, তখন অনেকেই পুতুল-খেলার সহিত এ বিবাহের উপমা দিয়াছিল। অবশ্য বিশ বছর আগে হইলে এ কথা উঠিতও না। বরং ইহার ব্যতিক্রমে লোকে নিন্দাই করিত। কিন্তু এখন মেয়েদের দশ বছরে বিবাহের কল্পনাও বড় কেহ করেন না। ছেলেদেরও উপার্জ্জন-ক্ষম হইবার আশায় অনেকে অপেক্ষা করেন।

জলদের বাপ-মার একটি ছোট মেয়ে আনিয়া পুতুল-খেলার সখ খুব না থাকিলেও ছোট মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ও তাহার ভালবাসা পাইয়া ইচ্ছানুরূপ তাহাকে গড়িয়া লইবার সাধটাই হইয়াছিল বেশী। বয়স্কা বধূ আনিয়া কৃতী পুত্রের সংসার গড়িয়া দেওয়া চলিতে পারে, তাহাকে লইয়া পাঁচজনের সংসারে মিলাইয়া পরিবারবর্গের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী করিয়া গড়িয়া তোলা বড় কঠিন। মাটি নরম থাকিলে গড়ার সুবিধা যতটা হয়, কঠিন হইয়া গেলে তেমন আর হয়না। সুনীতি মেয়েটিও বড় নমনীয়। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে মা-বাপের মতই ভালবাসিয়া একান্ত মনে তাঁহাদেরই হইয়া গেল। দেওর-ননদ অনেকগুলি; শাশুড়ী ইহাদের আদর-যত্নের ভার সুনীতির হাতেই ছাড়িয়া দিলেন। কোন জিনিষটি দিতে হইলে—"তুমি পছন্দ করে ওদের দাও", এই কথাই বলিতেন। কাজেই নিজের জন্য ভালটি রাখিয়া মন্দটি অপরকে

দেওয়া চলিবে না। ইহাতে পরার্থপরতায় মন আপনিই টলে। সমবয়সীদের সঙ্গে সময়-সময় ঝগড়া-বিদ্রোহ ঘটিলেও ভাল-বাসারও অভাব ছিল না। স্বামীকে বন্ধু-রূপে পাইয়া তাহার ক্ষুদ্র মন আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। বছর না ফিরিতেই তাহারা পরস্পরকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া ফেলিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলদ কলিকাতায় গেল কলেজে পড়িতে। একটা শনিবার বাদ দিয়া সে বাড়ী আসিবার হুকুম পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে সে স্ত্রীকে তিন-চারিখানি করিয়া চিঠি লিখিত, এবং যথা-কালে সে সব চিঠির জবাবও পাইত। লেখিকা সম্বন্ধে জলদের মনে কোন সংশয় না থাকায় হাতের লেখা সুনীতির হইলেও, রচনাটা ভগ্নী শৈলাঙ্গিনীর, বা শ্যালিকা তরলিকার, সে বিচারের প্রয়োজন তাহার হইত না। জলদ তাহার বিবাহিত বন্ধুদের অনুকরণে চিঠির ভিতর নানা গ্রন্থ হইতে গান ও কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইত—এগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের রচনা হইতেই সে সংগ্রহ করিত। কিন্তু চিঠিতে সে কথার স্বীকার-উক্তি না থাকায় সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া স্বামীর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির কথা ভাবিত। ক্রমে বয়সের সহিত সে নিজে বসিয়া চিঠি লিখিতে ও কোটেশন করিতে গুরুর বিদ্যাকেও ছাপাইয়া উঠিল।

অতি-সুখেই তাহাদের জীবনের দিনগুলি জল-স্রোতের মত অনায়াসে বহিয়া যাইতে ছিল। সুনীতির মনে হইত, তাহার অত শিব-পূজা সার্থক হইয়াছে। এমন স্নেহময় প্রেমময় উদার উন্নত-হৃদয় স্বামী কয়জন নারীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! বড় খোকার জন্মের পর এ সুখ ষোল কলায় পূর্ণ হইল। তরুণ দম্পতী পিতা-মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে যেন আরও নিবিড় বেষ্টনে বদ্ধ বলিয়া মনে করিল। খোকার হাসিটি কাহার মত? জলদ বলিত, ঠিক সুনীতির। সুনীতি তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিত। সে বড় হইলে কাহার মত দেখিতে হইবে? জলদ বলিত, সে ঠিক্ মার মত হইবে। সুনীতি আপত্তি তুলিত, তবে ত রূপ ধরিবে না! না, ও তোমার মত হইবে। স্বামীর সহিত তর্কে হারিলে সুনীতি শাশুড়ীকে মধ্যস্থ মানিত। মা পাগলী মেয়ের মন বুঝিয়া তাহার ইচ্ছানুরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। জলদ কৃত্রিম কোপে মাকে শাসাইয়া বলিত, "তুমি একচোখো, তাই বৌয়ের হয়ে বল্‌চ। বেশ, বেশ, ঐ তোমার সব, আমি কেউ নই।" মা হাসিতেন। এমনি আনন্দ ও উৎসাহের মধ্য দিয়া শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইয়া এবার সে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল।

বিদেশে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন জলদের একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিলেও শীঘ্রই সে ভাব কাটিয়া গেল। নিজে সে আনন্দ-ময়—কাজেই কোথাও তাহার সঙ্গীর অভাব ঘটিত না। এখানেও অনেকের সহিত আলাপ হইল। বৈকালে কোনদিন বা উকিল তারিণীবাবুর বাসায়, কোনদিন বা ডেপুটি মহেন্দ্রবাবুর বাসায় ছোট-খাট সভা বসিত। অনেক পদস্থ কর্ম্মচারী একত্র মিলিয়া তাস-পাশা গল্প-গুজবে তামাক টানিয়া সন্ধ্যা কাটাইয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিত। বাড়ী হইতে অনেকেরই চাকর লণ্ঠন লইয়া আসিয়া

বাবুর প্রতীক্ষায় চাকর বা সহিসদের আড্ডায় বসিয়া বাবুদের কাজেরই ছোটখাট অনুকরণ করিত। জলদও প্রথম প্রথম সে সভায় যোগ দিত। মহেন্দ্রবাবু জলদকে একটু বিশেষ স্নেহ করিতেন। জলদ তাঁহার বড় ছেলে অমূল্যর সহপাঠী-বন্ধু। জলদ এখানে আসিয়াছে শুনিয়া অমূল্য খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বাপকে লিখিয়াছিল, তাহার বন্ধুর যেন সেখানে যথোচিত আদর-যত্ন হয়। অমূল্য আইন পড়িতেছিল। মধ্যে কি একটা ছুটি-উপলক্ষে সে বাড়ী আসিল। জলদ এবার মহেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা ছাড়াইয়া দোতলায় উঠিল। অমূল্যর মা ও মেজ বোন কিরণবালাও ক্রমে তাহার সম্মুখে বাহির হইতে ও কথা কহিতে সুরু করিলেন। অমূল্যর ছুটি ফুরাইলেও জলদের আর সেখান হইতে ছুটি মিলিল না। তাহার সরল মিশুক স্বভাব, সদানন্দ ভাব, গল্প করিবার ক্ষমতা—এই সব গুণে ছেলেমেয়েদের দলে তাহার খাতির ও আদরের অন্ত ছিল না। মহেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত সাদাসিধা মানুষ। ছেলের বন্ধুকে তাঁহারা ছেলের মতই যত্ন করিতেন। বিদেশে এমন অযাচিত পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-লাভে জলদের আত্মীয়-বিচ্ছেদ-ক্ষুব্ধ চিত্ত পরম পরিতোষ লাভ করিল। কিরণবালা অমূল্যর মেজ বোন্, ম্যাট্রিক্ দিয়া স্কুল ছাড়িয়াছে। এইবার বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। মহেন্দ্রবাবুর মনে যতখানি ত্বরা আসিয়াছিল, বাহিরে তাহার ছুই আনাও প্রকাশ পাইত না, তাই এ পর্য্যন্ত পাত্র খুঁজিবার সময় হয় নাই। কিরণ সুন্দরী, সুভাষিণী, লোক-রঞ্জিনী। জলদের সহিত তাহার অল্পদিনেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়া গেল। উষাঙ্গিনীর ছেলের ভাতের পরও সুনীতির বাসায় আসা ঘটিল না। তাহার সন্তান-সম্ভাবনা বুঝিয়া শাশুড়ী আপত্তি তুলিলেন—একেবারে ছেলে কোলে লইয়া তখন যাইবে। জলদ তাই শূন্য গৃহের নিরানন্দ-ময়তা ভুলিবার উপায় মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই আবিষ্কার করিয়া কিরণ ও তাহাদের ভাই-বোনের সঙ্গেই সময় কাটাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুনীতির দুঃখ

বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন সেখানকার শৃঙ্খলা ও পরিপাট্য বিধানে শাশুড়ী-ননদের সহিত নিযুক্ত থাকার দরুণ সুনীতি তেমন করিয়া স্বামীর প্রতি মনো-যোগিনী হইবার অবকাশ পায় নাই। কাছে বসিয়া মা খাওয়ান, শৈল ও সে রান্নাঘরে ঠাকুরের কাজে সাহায্য করে, অথবা ঠাকুরকে বসাইয়া রাখিয়া তাহারা ননদ-ভাজেই কাড়াকাড়ি করিয়া এটা-ওটা রাঁধে। শাশুড়ীর আদেশ-মত স্বামীর পাতে নিজের হাতেই সব পরিবেষণ করিয়া দিয়া আসে। ছোট বেলায় বৌ হইয়া আসায় শাশুড়ীকে সে তেমন লজ্জা করিতে পারিত না, ঘোমটা তাহার ললাট ছাড়াইত না, কথাও দুই-চারিখানা দূরের ঘর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত। বড় হইয়া শৈল বা উষা যদি নির্লজ্জতার তর্ক তুলিত, তাহা হইলে সে হাসিয়া বলিত, "ওটুকু ঘোমটা যে দি, সে শুধু গুরুজনের মান্য রাখার জন্যে। মাকে লজ্জা করতে সত্যি বলচি ভাই আমার ভারী লজ্জা করে।"

শাশুড়ীও মেয়েদের শাসনে বধূর অত্যন্ত লজ্জার অভিনয় দেখিলে হাসিয়া বলিতেন, "যাকে যা সাজে না, তাকে তা ধরে করাস্ কেন বাপু! ও, আমার পাগলী মা, ওকে কলা-বৌ দেখতে আমারও ভাল লাগে না বাপু!"

বাড়ীর সে এখন একটি বৌ,—তাই তাহার আদরও ছিল সবার কাছে। স্বামীও অতিরিক্ত আদর দিয়াছেন, সহসা আজ হাত গুটাইতে চাহিতেছেন দেখিয়া যেন তাই একটু বিস্ময়ের সহিত সে চাহিয়া দেখিল, দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইল।

সকালে কাছারি যাইবার পূর্ব্বে সে খোকাকে দিয়া জলদকে ডাকাইয়া আনাইয়া কোন্ ছবিখানি কোন দেওয়ালে টাঙ্গাইলে কেমন মানাইবে, টিপয়টি খাটের মাথার দিকে অথবা পায়ের দিকে রাখিবে, এই সকল বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করিয়া লইত। জলদও হৃষ্টচিত্তে ইহাতে যোগ দিত, হুকুম তামিল করিত; ছোট খোকার দোল্‌নার দড়ি ধরিয়া একটু টানিয়া দিত, বড় খোকার দুষ্টামির প্রতি মনোযোগী হইত,—এমনি করিয়া গোলেমালে সময় কাটাইয়া বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া জল খাইয়াই সে বেড়াইতে বাহির হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পর যখন ফিরিত, তখন তাহার মনের অবস্থা বেশ প্রফুল্লই থাকিত। সুনীতিরও তাই স্বামীর মনের পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে বিলম্ব হইয়াছিল। প্রথম যেদিন এ পরিবর্ত্তন তাহার চোখে পড়িল—সেদিন জল খাইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে জলদ কহিল, "কি ছাই পাণ যে সাজ, হয় তেত, নয় চূণ। কিরণের সাজা পাণ খেয়ে এসে এ পাণ আর মুখে দিতে ইচ্ছা করে না।"

সুনীতি হাসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "সে কিরণটি কে? কাছারির পাণ-উলী বুঝি?"

"দূর! আমায় কি তেম্‌নি অব্রাহ্মণ পেলে নাকি যে পাণ-উলীর পাণ খাব? কিরণ মহেন্দ্রবাবু ডেপুটির মেয়ে। তার কথা তোমায় বলাই হয়নি, বুঝি—? যেয়ো বরং একদিন তাদের বাড়ী—পাণ সাজতে শিখে এস গিয়ে।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "অ্যাঁ! আহা—সে যখন পাণ দিয়ে প্রাণ ভুলিয়ে নিচ্ছে, তখন যেতে হবে বৈ কি।" মানুষ কি এত সহজে সত্ত্ব ছাড়ে! স্বামীর পানে চাহিয়া যেন খুব একটা রসিকতা করিয়াছে, এমনি ভাবে সুনীতি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

জলদ তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া যেন একটু ব্যস্ত-ভাবেই ছড়ি লইয়া উঠিয়া পড়িল। সেদিন তাহার মনে কোন্ ভাবান্তর না হইলেও দুই-এক দিনের মধ্যেই সুনীতির মনে হইল, তাহার সে স্বামী আর ঠিক্ তেমনিটিই নাই। শৈল ও গৃহিণী একদিন দুপুর বেলায় তারিণীবাবু উকিলের বাড়ী বেড়াইতে গেলেন। সুনীতি বাড়ীতে রহিল, জলদ আসিলে জল-খাবার দিবে। খাবার তৈয়ারীর ভারও সেদিন তাহার উপর রহিল। মা চলিয়া গেলেও ছেলের খাওয়ার যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহা অভ্যাসের জন্য শাশুড়ীর মনে পরীক্ষার ইচ্ছাও ইহাতে নিহিত ছিল। সুনীতি এ ব্যবস্থা সানন্দেই গ্রহণ করিল। অন্যদিন সে শুইয়া, বই পড়িয়া, শৈলর সহিত মিছামিছি কলহ করিয়া, তাহার ছেলে-মেয়েদের কখনো কাঁদাইয়া

কখনো কোলে লইয়া দুপুর বেলাটা কাটাইয়া দিত। কিছু দিন হইতে এ-সবেও সে আর মন দিতে পারিতেছিল না। আজ শৈলর ছেলে-মেয়ে ও বড় খোকা বাড়ী না থাকায় বাড়ী যেন নিস্তব্ধ হইয়া আছে। দিনটাও খুব দীর্ঘ মনে হইতেছিল। সুনীতির মনের শূন্যতা যেন ইহাতে বাড়িয়া তাহাকে আরও পীড়িত করিতেছিল। সে সকাল সকাল রান্নাঘরে খাবার তৈয়ার করিতে গেল। নিজের গুণপনা দেখাইয়া শাশুড়ী ও স্বামীকে খুসী করিয়া দিবে, এই ইচ্ছাই হইয়াছিল। সেদিন শনিবার। জলদও অন্য দিনের চেয়ে অবশ্য কিছু সকালে আসিবে, তাই ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। আজ সে স্বামীকে একা ঘরে পাইবে। আজ আর তাহাকে সে ছাড়িয়া দিবে না।

জলদ বাড়ী আসিলে সে কড়া নামাইয়া উঠিয়া আসিল; পাখা লইয়া কহিল, "আজ তুমি আমার চার্জ্জে—তা জানো?"

জলদ পোষাক খুলিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া কহিল, "তনু, তপ্‌সী, বড় খোকা কারো সাড়া পাওয়া যাচ্চে না যে! কোথায় তারা?"

"মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। ঠাকুরঝিও গেছে। আমিই শুধু রইনু বাকী।"

জলদ কহিল, "তুমিও গেলে না কেন?"

"আর তুমি এসে একলা থাকতে, শূন্য ঘরে? খাবার-টাবার দিত কে?"

জলদ কহিল, "সে ঠাকুর করতো। আমার জন্যে বসে থাক্‌বার কোন দরকারই ছিল না। আমি ত আবার এখুনি বেরুব।"

সুনীতি স্বামীর ডান হাতখানা নিজ করতলে চাপিয়া কহিল, "আমি যদি যেতে না দি?"

জলদ কহিল, "তা হলে যাব না।" কথাটা শুনিতে যেমন মিষ্ট, বক্তার মুখের উদাসীন ভাবের সহিত তাহা তেমন মধুর শুনাইল না। সুনীতির চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল। স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিয়া "খাবার আনি" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মন যখন অভিমানে ভরিয়া থাকে, তখন একটুতেই সে ব্যথা পায়।

সেদিন কিরণের পাণের সুখ্যাতি শুনিবার পর কিরণের সম্বন্ধে অনেক কথাই তাহার জানা হইয়া গিয়াছে। সে কেমন দেখিতে, কেমন মিষ্ট স্বভাব, কত ছেলে-মানুষি ধরণ, গল্প করিবার কেমন সুন্দর পদ্ধতি, কত বিষয় তাহার জানা, দেশের প্রতি কেমন জ্বলন্ত অনুরাগ, দেশ-বাসীর দুঃখে কি গভীর সহানুভূতি তাহার প্রতি কথায় ফুটিয়া ওঠে, ইংরাজী লেখা-পড়া জানা থাকায় তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া কত আনন্দ পাওয়া যায় ইত্যাদি অনেক কথাই সে শুনিয়াছে। এবং প্রতি রাত্রেই সে দিনের বৈকালের বন্ধু সম্মিলনের সকল কথাই তাহাকে শুনিতে হয়। শুনায় কোন লাভ আছে কি না, বক্তার মনে সে প্রশ্ন আদৌ না উঠায় জলদ আপনার মনেই বলিয়া যায়, উৎসাহ না পাইয়া কোন এক সময় হঠাৎ থামিয়া সে অনুভব করে, সুনীতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

*

স্বামীকে খাবারের থালা ধরিয়া দিয়া সুনীতি রান্নাঘরে গিয়াছিল, ফিরিয়া ঘোর বিস্ময়ের সহিত কহিল, "এ কি হল? উঠে

পড়্‌লে যে! আমি সরপুরিয়া কখানা উথ্‌ড়ে নিচ্ছিলুম,—বলে গেলুম, না এলে উঠোনা—"

জলদ গামছায় হাত মুছিয়া কহিল, "ভাঁড়ার যখন তোমার ক্ষুদ্র. তখন বিপুল দ্রব্য-সম্ভার ঢোকাতে চাইলেই বা ঢুক্‌বে কেন তা? কম-জম করে করলে আর আপশোষ কর্ত্তে হোত না।"

সুনীতি রাগিয়াছিল, স্বামীর রসিকতায় রাগিয়াই কহিল, "ভাঁড়ার ছোট কি বড়, সে খবর ভাঁড়ারের চেয়ে ভাঁড়ারীরই জানা আছে বেশী। সত্যি, তুমি দুখানা সরপুরিয়া খেতে পারতে না ওর উপর? তাও সিঙ্গেড়া কখানা ফেলে রেখেচ দেখ্‌চি। ক্ষিদের অভাব নয়, অভাব তোমার সময়ের। কিন্তু যাও দেখি তুমি, কেমন আজ বেড়াতে যাবে!" বলিয়া সে হাতের খাবার স্বামীর পাতের কাছে নামাইয়া রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জলদের আজ সত্যই একটু তাড়া ছিল। ক্ষিতি, যতী, বুলু, বিনু, কিরণ সকলে মিলিয়া আজ তাহাকে তাহাদের সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। অমূল্য কলিকাতায় গিয়াছে। মহেন্দ্রবাবুও অল্পদিনের জন্য জলপাইগুড়িতে বদলি হইয়াছেন—বাড়ীতে অভিভাবকের অভাব, তাই ইহাদের দেখিতে যাইবার সখ আর মিটিতেছিল না। সেদিন যতীর মাথায় জলদ বাবুর কথা উদয় হওয়ায় সে তাঁহার ও মার মত লইয়া দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এতক্ষণে তাহারা হয়ত প্রস্তুত হইয়া পথ চাহিয়া বসিয়া আছে! জলদের বিলম্বে কিরণ না জানি কতই ব্যাকুল হইতেছে। এ সময় সুনীতি এমন অন্যায় জেদ ধরিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। তবু স্বভাবসিদ্ধ হাসি-মুখেই সে বলিল, "সব যদি জানো, তবে রাগই বা কর কেন? দাও দেখি এখন শালখানা। আজ হয়ত ফিরতে একটু রাতও হতে পারে।"

সুষমা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জলদ কহিল, "যেতে দাও, চটপট। দেরী করে অনর্থক কষ্ট দিয়ে কি লাভ?"

"যাও।" বলিয়া সুনীতি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। জলদ ডাকিয়া কহিল, "শালখানা দিলে না? ওগো শুনছ, দিয়ে যাও। পরে রাগ করো অখন।"

পাশের ঘর হইতে সুনীতি কহিল, "যারা এত দিন দিত, তাদের বল। আমার এখন সময় নেই।"

কথাটা যে সত্য নয় এবং অভিমানের, জলদ তাহা বুঝিল। কিন্তু এ লইয়া সাধা-সাধি করিবার সময় তাহার ছিল না, সে সখও নাই। সুনীতির সব ভাল কিন্তু বড় উল্টা বুদ্ধি! মানুষ কিসে যে কি করে, তার যদি এতটুকু অর্থ থাকে! রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় কিরণকে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাওরাইয়াছে! ছি, এ-সব কি! এমন অন্যায় চিন্তা মনে আসিতে দেওয়াও ত উচিত নয়! সুনীতির সন্দেহে সে ব্যথিত হইলেও এমন লজ্জাকর ভ্রম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা যে তাহার উচিত ছিল, সে কথা কিন্তু মনে হইল না। তুমি যদি পছন্দ না কর, নাই বা গেলাম সেখানে—কেন অনর্থক দুঃখ পাও! এমনই কোন সান্ত্বনার কথা বলিলে যেখানে সব অশান্তি মিটিয়া যাইতে পারিত, সেখানে সে কেবল সুনীতির এ-সব চিন্তা অন্যায় বলিয়াই নিজের

দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিল। নিজের দিকে কোন তর্কই রাখিল না। সুনীতির অপছন্দ করা ছাড়া সে যদি এখন মাথা খুঁড়িয়া রক্ত-গঙ্গা বহায়, তবুও যে কিরণের দেখা পাইবার লোভ সে ছাড়িতে পারিবে না—সে কথা তাহার মনেও হইল না।

সুনীতি কিন্তু ইহার ঠিক উল্টা পথ ধরিয়াই চলিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকার তাহার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! স্বামীর প্রেম নিশ্চয়ই সে হারাইয়াছে। সেখানে তাহার জন্য আর কোন সান্ত্বনাই বর্ত্তমান নাই। এখন স্বামীর কোন বিশেষ স্নেহ-প্রকাশে বা আদরে সে আর আনন্দ ত পায়ই না, বরং মনে করে, এ সব কৃত্রিম! সব ভুয়া! ঘুষ! ইহার অর্থ নাই, আছে শুধু শব্দ! প্রাণ নাই, আছে দেহ! কি এ দুর্ভাগ্যের ভোগ! মৃত প্রেমের শ্মশানে দাঁড়াইয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন হৃদয়ের অভিনয় করিতেছে! ঘৃণায় ধিক্কারে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়—কিন্তু হায়, চিরদিনের সংসার ভীরুতা ও সহিষ্ণুতার মুখোষ পরিয়া বলে,—ছি! কিসের প্রমাণে, কোন্ দলিলের বলে স্বামীকে তুমি এমন অপবাদ দিতে সাহস কর? তাই মুখে হাসি মাখিয়া বুকে বিছা পুষিয়া তাহাকে সংসারের কাছে যথা-পূর্ব্বভাবেই চলিতে হইতেছিল। রাত্রে স্বামী যেদিন তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিতেন, মনে মনে সে বিরক্ত হইত, এখনই ও বাড়ীর কত কথাই তাহাকে শুনিতে হইবে। ঘুমাইয়া পড়িলে অভিমানে মন ভরিয়া উঠিত,—এখন আর আধ ঘণ্টাও জাগিয়া থাকিতে পারেন না! এখন সে এমনই অনাবশ্যক হইয়াছে! নিঃশব্দে মশারি ফেলিয়া সে শুইয়া পড়িত। সে রাত্রে চোখের জলে কেন যে বালিশ ও অঞ্চল ভিজিত, তাহার কোন সদুত্তর সে দিতে পারিত না; জাগিয়াই রাত কাটিয়া যাইত। প্রভাতে স্বামীর আনন্দোৎফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া মনে হইত, সারা রাত্রি ধরিয়া সে বুঝি প্রকাণ্ড একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যেই ডুবিয়া ছিল। দিনের আলোয় পাখীর গানে ছেলেদের বিচিত্র কোলাহলে ভাব-রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, বুঝি, কোথাও কিছু অঘটন ঘটে নাই! কিন্তু বৈকালে স্বামী বাহির হইয়া গেলেই তাহার মনে হইত, পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত সবটাই ফাঁকি। ইহার কোথাও কিছু সত্য নাই। এবং সেই সঙ্গে তাহার বাঁচিয়া থাকাটা একান্তই লজ্জাস্কর! জলদও এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া মনের সহিত লুকাচুরি খেলিতে-ছিল। সে ভাবিত, তাহার বন্ধুদের কথা— সে যখন স্ত্রীর কাছে অকপটে সবই জানাইয়াছে, তখন স্ত্রীর পক্ষ হইতে তাহাকে দোষ দিবার কিছুই নাই! আর কিরণ যখন তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছে, তখন তাহার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে সে বাধ্য। স্ত্রীর মন রাখিবার জন্য তাহাকে ব্যথা দেওয়া তাহারও কিছু কর্ত্তব্য নয়। দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মাথায় রাখিবার জিনিষ— তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিবার নয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষের ক্রিয়া

জলদ ও কিরণবালার দিনগুলি এক রঙীন নেশার মধ্য দিয়া বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল।

এই নেশার ঝোঁকে তাহারা যে পরস্পরের কতখানি কাছে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহার খবর লইতে দুই পক্ষেই কোন সন্দেহ উঠে নাই। বাহিরের লোক, যাহারা এ নেশার কাজল চোখে পরে নাই, তাহারা কি-ভাবে যে তাহাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিতেছে, সে সংশয়ও তাহাদের মনে জাগে নাই। মহেন্দ্রবাবু বদ্‌লি হইয়া জলপাইগুড়িতে গিয়াছেন। ক্ষিতি ও যতী এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। তাই বাসা রাখিয়া তিনি সুধু একজন চাকর ও ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এখানকার বাসার জন্য আর একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া লইবার কথা ছিল, কিন্তু বাড়ীর লোকের অনাগ্রহে প্রায় তিন মাসেও তাহার খোঁজ হয় নাই। ক্ষিতি বলিত, বেশ খাইতেছি। কি হইবে মিথ্যা লোক খুঁজিয়া? যতী মুখে স্পষ্ট কিছু বলে না, কাজেও কিছু করে না। অমূল্যর পরীক্ষা আসন্ন, তাই সে এ-সব চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। জলদ অমূল্যর উদ্দেশে নিয়মিতই তাহাদের বাটী আসিত, এবং অধিকাংশ দিনই তাহার অভাবে কিরণের হাতের তৈয়ারী চা খাইয়া, তাহার সহিত গল্প করিয়া সন্ধ্যার অনেক পরে যে দিন যখন মনে পড়িত, সেদিন তখনই বাহির হইয়া যাইত। বিদায়-কালে কিরণ প্রত্যহই বলিত, "কাল্ আসবেন ত?" জলদ হাসিয়া বলিত, "ইচ্ছা ত রইল। দেখি।" অবশ্য ইচ্ছা-পালনে তাহাকে কোন দিনই বীতস্পৃহ দেখা যাইত না। ঠিক্ সময়েই সে হাজির হইত। কিরণ উপন্যাসের ভক্ত। সে জলদের কাছে একদিন বাংলা বই কিছু আছে কি না খবর লইয়াছিল। জলদের বাংলা উপন্যাসের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায় এ পর্য্যন্ত সে তাহার সংবাদ রাখাও প্রয়োজন মনে করে নাই। পরদিন জানাইব বলিয়া বাড়ী আসিয়া সে সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাংলা নবেল-টবেল আছে কিছু? দাও ত দু-একখানা—পড়ে দেখা যাবে।" কিরণ চাহিয়াছে বলিলে সোজা হইত, কিন্তু তাহা সে বলিল না; বলিল, নিজে পড়িবে।

সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাংলা নবেল পড়বে?"

জলদ হাসিয়া কহিল, "দোষ কি! অমন অবাক্ হয়ে গেলে যে! অন্যায় হবে কি কিছু, পড়িই যদি?"

সুনীতি মুখ ফিরাইয়া উদাসীনভাবে কহিল, "খুঁজে দেখব।"

জলদের মনে হইল, অন্যায় কিছু আছে বটে! মনে পড়িল, বছর দুই আগে একদিন কি একখানা বাংলা উপন্যাস লইয়া সুনীতি জলদকে পড়িবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু জলদ স্বভাব-বশে সে অনুরোধ রাখিয়া উঠিতে পারে নাই। পড়িবে বলিয়া বইখানি সে লইয়া ছিল সত্য, কিন্তু তার পর সেখানি যে কেমন করিয়া হস্তচ্যুত হইয়া কর্পূরের মত উবিয়া গেল, সে কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। মাস দুই পরে একদিন জেরায় সে বইখানি পড়েই নাই, উপরন্তু হারাইয়াছে—এ কথা স্বীকার করিলে সুনীতি ঘোর অভিমানে বলিয়াছিল, জন্মেও সে আর কখনো কোন বই তাহাকে পড়িতে বলিবে না। জলদও তাহাকে কাছে টানিয়া আদরে-সোহাগে আচ্ছন্ন করিয়া বলিয়াছিল, ভালই হইল, কাজ নাই তাহার বই পড়িয়া!

সে বইয়ের চেয়ে বৌকেই অধিক ভালবাসে। অকৃত্রিম কবিত্ব যখন তাহার করতল-গত, তখন কৃত্রিমতার প্রয়োজনই বা কি! আজ এই মুহূর্ত্তে সেই কথাটি তুজনেরই মনে পড়িয়া গেল। জলদ একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, "ওঃ, পুরোনো রাগ! শোধ নাও, শোধ নাও—ছেড়ে কথা কইবে কেন?" সে মুখের তেমন হাসিতে রাগ করিয়া থাকা স্নীতির সাধ্য নয়! তাই অনেক সময় রাগ করিতে গিয়াও তাহার রাগ করা হয় না—অসাক্ষাতে স্বামীর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি-তর্ক গুলাকে শানাইয়া সে যথাকালে প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখে, কার্য্যকালে তাহার একটাও খাটাইতে পারে না। স্বামীর সদা-প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া মনের তাপ কখন্ জুড়াইয়া যায়। মনে হয়, এমন মুখ যাহার, সে কি কখনো কোন ক্রটি করিতে পারে? আর পারেও যদি, তবে সে কথা কি কখনো বলা যায়? ছি! ঘূর্ণ্যমান রথচক্রে নিষ্পেষিত ধূলিকণা উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইলে আবার ধূলিকেই সে আশ্রয় করিতে চায়, তার ত আর অন্য আশ্রয় নাই।

ইহার পর স্ত্রীর সাহায্য না লইয়া সে পুস্তকের দোকানের শরণ লইল। এবং মধ্যে মধ্যে কাছারির ঠিকানায় বই আনাইয়া নিজের অফিস-বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া যথাকালে কিরণবালার কর-কমলে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। যেখানে গোপনতা, সেখানেই পাপ। তবে কি জলদের মনে পাপ প্রবেশ করিয়াছে? সে যদি বইগুলি নিজের বাসার ঠিকানায় আনাইয়া স্ত্রীকে জানাইয়া কিরণবালাকে পড়িতে দিত, তবে কোন সংশয়ের কথাই উঠিত্ না। কিন্তু স্নীতির সেদিনকার সেই মুখ ও চোখের সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টি তাহার মনকে বাঁকা পথেই চলিতে উপদেশ দিল। মনে হইল, বুড়া বয়সে সন্দেহে পড়িয়া বৃথা নিজে তুঃখ পাইবে, অন্যকেও দিবে! সে তাহার সন্দেহ লইয়াই থাক্। আমি ত সত্যই কোন অপরাধ করি নাই! মেয়েদের মন ভারী সংকীর্ণ! তারা কাকের মত কেবল আবর্জ্জনাই খুঁজিয়া বেড়ায়। জলদের মনে হইল, কিরণ এ শ্রেণীর বাহিরে। সে ত কই কথা-প্রসঙ্গেও কখনো কোন ক্রটি আবিষ্কার করে না। অবশ্য স্নীতি সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনাও বিশেষ কিছু হয় না। তা হইলেও দোষ খুঁজিব ভাবিলে দোষ পাইবার পক্ষে আর বাধা কি?

সেদিন কিরণের খুড়িমার ব্রত-উদ্‌যাপনের নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া স্নীতি জলদকে শুনাইয়া অনায়াসে বলিল, "কিরণ এত বড় ধেড়ে মেয়ে,—তা ওর বিয়ে দেয় না কেন?" জলদ হাসিয়া বলিয়া ছিল, "অমন মেয়ে ত যাকে-তাকে প্রাণ ধরে দিতে পারে না। যখন ওর উপযুক্ত বর পাবে, তখন নিশ্চয়ই দেবে।" তাহাতে স্নীতি উত্তর দিয়াছিল, "যে রকম পুরুষ-ঘেঁষা মেয়ে, নিজেই বর বেছে নেবে, বাপ-মাকে কষ্ট পেতে হবে না।" শুনিলে একবার হিংসার কথা! জলদ এ-কথা অবশ্য সহ্য করিতে পারে নাই। সে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "যার যেমন মন, সবাইকে সে তেমনি দেখে।" স্নীতি ইহার কোন জবাব দেয় নাই।

কিন্তু সেদিন হইতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছিল।

জলদ আর ইচ্ছা করিয়া কিরণের কথা স্ত্রীর কাছে নিজ হইতে কিছু তুলিত না। সেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। তবু দুইজনে একত্র হইলেই সেই এক-জনের কথাই দুইজনেরই মনে পড়িত। সুনীতি ভাবিত, স্বামী এখন কিরণের ধ্যানেই মগ্ন রহিয়াছেন। জলদ ভাবিত, সুনীতি যদি কিরণের মত উদার-চিত্ত হইতে পারিত! জলদ কিরণকে একটু স্নেহ করে, তাই সে ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্গ লইল না? বন্ধুত্ব করিল না? করিলে বুঝিত, সে ভাল বাসিবার মত মেয়ে কি না! এতদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে বিচ্ছেদের হাওয়া বহিতে সুরু করিলেও বাহিরে একটা স্বচ্ছতা ছিল। ইহার পর দুজনের মাঝখানে একটা অন্তরালের ব্যবধান রচিত হইল। জলদের মনে হইল, সুনীতি অকারণে অন্যায় তাহাকে সন্দেহ করে। কিরণের সহিত একটু গল্প করা, বা তাদের বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া—ইহাতে তাহার ক্রোধের কারণ কিছুই থাকিতে পারে না। মনকে এত ক্ষুদ্র করা বড় অন্যায়। সুনীতি দেখিতেছিল, স্বামী বাহিরে তাহার প্রতি পুনরায় ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার অন্তরে তাহার স্থান ক্রমেই যেন সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মানুষ দুনৌকায় পা দিয়া চলিতে পারে না—এক দিকে ঝোঁক্ দিতে গেলে তৌল দাঁড়ির অন্য দিকটা হাল্কা হইয়া উঠিয়া পড়ে। সে নিপুণ দৃষ্টিতে সমস্ত মন দিয়া ইহারই গতি-লক্ষ্যে চাহিয়া থাকে, ফাঁকটা আগেই তাহার চোখে ধরা পড়ে। স্বামীগত-প্রাণা সুনীতির যে স্বামীর চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই নাই! স্বামীর পরিপূর্ণ ভাল-বাসাই সে পাইয়াছিল। তাই স্বামীর স্বচ্ছ মনটিও সে দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইত। সেখানে গোপনতার এতটুকু আবরণও কোনদিন কোথাও ছিল না ত! কিন্তু এখন যে তাহা ঘটিয়াছে, সর্ব্বান্তঃকরণে সে তাহা অনুভব করিতেছিল। তাই এক নিবিড় ঔদাসীন্যে সংসারের প্রতি মনও ক্রমে বিরস হইয়া উঠিতেছিল।

সুনীতির আর কিছুই ভালো লাগে না। সংসারের কাজ-কর্ম্মে সে মন নাই। বেশ-ভূষা সে ছাড়িয়া দিয়াছে। স্বামীর সেবা করে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের সে আনন্দ-উন্মাদনা আর নাই। সে যেন অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়াই করিয়া থাকে। ছেলে দুটিকে বুকে চাপিতে চোখে অনেক সময় ব্যথার অশ্রুই ঝরিয়া পড়ে!

শাশুড়ীরও ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল। সুনীতি মনে করিল, সেও যদি এই সঙ্গে বিদায় চায়, তবে কেহই তাহাকে আর ব্যাকুল হইয়া বাধা দিবে না। হয়ত,—হয়ত উনি ইহাতে খুসীই হইবেন! পূর্ব্বে এমন সুযোগ লইয়া মিছামিছি বাপের বাড়ী যাইবার ছুতা করিয়া কতদিন সে স্বামীর নিকট ব্যাকুল মিনতি আদায় করিয়াছে। কিন্তু আজ ত আর সেদিন নাই! এখন যে মিথ্যা করিয়াও সে কথা বলিতে সাহস হয় না! কি জানি, আবেদন যদি প্রার্থনামাত্রেই মঞ্জুর হইয়া যায়! স্ত্রীর প্রতি অনুরাগই না হয় পুরাতন হইয়া যায়। কত-শত রূপসী বিদ্যাধরীদের স্বামী যে সেওড়া-গাছের প্রেতিনীর মোহে মুগ্ধ হন্! কিন্তু ছেলেরা—অমন যে কুসুম-কোমল শিশু, উহাদের জন্যও ত আর কৈ তেমন ব্যগ্র

হন্ না! কাছারি হইতে আসিয়া উহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। পাছে সেখানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, এই ভয়! অভিমানিনীর মান-ভঞ্জনেই ত তবে আনন্দের কালটুকু কাটিয়া যাইবে। আশ্চর্য্য হইয়া সুনীতি ভাবে, মানুষের মন এমনভাবে কেমন করিয়াই বা বদ্‌লাইয়া যায়? যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাহার শক্তি কেন এমন দুর্জ্জয়? ছেলেরা ত তাহারই, তবে উহাদের ভালবাসাও আর ভাল লাগে না? ছোট খোকাটাই হইয়াছে জন্ম-দুঃখী! ও ত বাপের আদর কখনই তেমন করিয়া পাইল না। আর উহার আবির্ভাবেই তাহার মায়ের দুঃখের স্চনা। এমন করিয়া দীর্ঘকালের জন্য স্বামীকে ছাড়িয়া না থাকিলে হয়ত সে মায়াবিনীর মোহিনী-মায়ায় স্বামীও এমন করিয়া বাঁধা পড়িতেন না। বাঁধন শক্ত হইয়া গেলে আর কি তা কখনো ছেঁড়া যায়? শুধু উহারই জন্য তাহার এবারকার নারী-জন্মটাই বৃথা হইয়া গেল! কখনো ভাবে, কিরণের বিবাহ হইলে সে যদি উঁহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেই উঁহার চোখের নেশা কাটিয়া যাইবে—সে দিকেই বা আর কিসের আশা! মন ছাড়িয়া ত আর সে চলিয়া যাইবে না। আর ভূতুড়ে বাড়ীতে বাস করার যে আনন্দ, সে ত সে এখনই প্রতিপলে উপভোগ করিতেছে! এ জন্য সে গেল বা রহিল তাহাতে আর আসিয়া গেল কি? তবে এইটুকু ভাল যে, লোকে কিছু বলিতে পাইবে না। উনি যাই করুন, তবু উঁহার বিরুদ্ধে যে কেহ কিছু বলে, এও ত আর সহা যায় না, অথচ এই কথাটিই যে আজকাল লোকের মুখে-মুখে। সেদিন মুন্‌সেফ বাবুর মেয়ে অমলা মুখের উপর স্বচ্ছন্দেই বলিয়া বসিল, "সিঁদুর-কৌটার সুশীর মত সতীনকে স্বামী দিয়ে তাদের সাজাতে যাবি না কি, লো বকুরাণী?" পোড়া কপাল তাহার! সে যাইবে আবার সতীনের ঘর সাজাইতে! ভাগ্যে সে সময় শাশুড়ী আসিয়া পড়িলেন, নহিলে কে জানে কি কটু উত্তরই সে দিয়া বসিত! এ-সব কথা তবে বাহিরেও উঠিয়াছে? এ কথা স্বামীকে বলা তাহার অবশ্য উচিতও—কিন্তু সুনীতির মনের দুর্ব্বলতা বলিল, বলিতে গিয়া সে যদি ঘুমন্ত বাঘকে চেতাইয়া তোলে! জলদ যদি এটা নিজের স্বপক্ষেই ধরিয়া লয়—আজকালকার অনেকগুলি ছোট-বড় উপন্যাসে-গল্পেও সে এমনি সব ভালবাসার, দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ পড়িয়াছে। উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষের মতামত এখানে নায়ক-নায়িকারা মান্য করে না। বিবাহ হইয়া গেলে কিছুদিন মন কষাকষির পর ঘরের ছেলে আবার ঘরেরটির হইয়াই ফিরিয়া আসে। তাহার আদরের বধূই সংসারের পাটরাণী হইয়া বসে। সতীন ভাণ্ডারণী হইয়া চাকর-দাসীর সর্দ্দারী করে, এবং স্বামী ও সতীনের মনোরঞ্জনার্থ নিজের গায়ের গহনা খুলিয়া সতীনকে পরায়, সতীনের সহিত গলাগলি ভাব করিয়া সংসারের সুখ-শান্তি বজায় রাখে। মা গো! এ-সব লেখাও কি আবার কখনও লিখিতে আছে! ঐ সব গল্প পড়িয়াই না ছেলেদের মনে অমনি সব নূতন প্রেমের সখ জন্মায়! তারপর ঠেলা যেখানে গিয়া পৌছায়, সে-ই বোঝে। ঠাকুর-ঝি ঠিক্‌ই বলিয়াছে, লেখকরা সব পুরুষ কি না,

তাই তাহাদের মনের ইচ্ছা কলমের মুখে প্রকাশ পায়! সতীনের জ্বালা সহিতে হইলে আর অমন উদারতার হাওয়া বহিত না! সুনীতির মনে পড়িল, নারীর লেখায় দু-একখানি এই জাতীয় উপন্যাস সে যেন পড়িয়াছে। গোড়ায় সতীনকে দিয়া বাঁদী-গিরি যথেষ্ট করাইয়া লইলেও লেখিকা তাহার শেষ দিকটায় রক্ষার চেষ্টাও করিয়াছেন। সুনীতির মনে হইল, সে যদি লিখিতে পারিত, তবে বিবাহিতের এই সব অন্যায় অনুরাগের বিরুদ্ধে খুব একটা তীব্র প্রবন্ধ লিখিত। কিন্তু ভগবান তাহাকে সে শক্তি দেন নাই! মন-প্রাণ সব দিয়া সুধু সে ভালবাসিতেই শিখিয়াছে। আঘাতের প্রতিকার-চেষ্টার সাধ্যও তাহার ছিল না—সে এমনি অক্ষম, এমনি নিরুপায়!

স্বামীর প্রতি অভিমানের বিরাগে সে অনেক সময় কাজে-কর্ম্মে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। তবু হতাশার দীর্ঘশ্বাস কখন্ বাহির হইয়া আসিত, তাহা সে নিজেই জানিতে পারিত না। এক-এক সময় কিরণের উপর বড় রাগ হইত। পরের জিনিষে এ কি অন্যায় তাহার লোভ! যাহাকে দুই দিন পরে অন্যের হইতে হইবে, সে যে এক দিনের অদর্শন সহিতে পারে না, এও ত কম মুস্কিল নয়! বন্ধু কি চাকুরি ছাড়িয়া তাহার চোখের তৃষ্ণা মিটাইতে সঙ্গে যাইতে পারিবেন? যতটুকু রয়-সয়, ততটুকুই থাক্ না কেন—! সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার শক্তি যাহার নাই, তাহার কাছে নাই বা রহিল এতখানি দাবী!

প্রথম প্রথম জলদ যখন প্রতিদিনের সান্ধ্য ইতিহাস সুনীতির কাছে বর্ণনা করিত, তখন তাহাদের কোন্ দিন কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সে খবর হইতে কিরণ কি রকম চুল বাঁধিয়াছিল, কি রঙের সাড়ী কোন্ ধাঁচে পরিয়াছিল, কি কথা কেমন সুরে বলিয়াছিল, এ-সকল খবরই সে পাইত। এ-তরফ হইতে উৎসাহের অভাবে অথবা দু-একটা খোঁচা খাইয়া অর্দ্ধ-চৈতন্য-লাভে সে এখন স্ত্রীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য এ সকল মনোমত ঘটনার বিশ্লেষণ বড় করিত না। স্ত্রীও শুনিবার জন্য মুখে কোন উৎসাহ দেখাইত না। তাই অন্য কথা ভুলিয়া যাওয়ায় আপাততঃ তাহাদের কথা বলাই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

মানুষের স্বভাব, যতক্ষণ সে কোন বস্তু পায়, ততক্ষণ তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করে, কিন্তু পাওয়া বন্ধ হইলেই পাইবার ইচ্ছা জন্মায়। সুনীতি যখন স্বামীর মুখে কিরণের প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবর পাইত, তখন ঈর্ষায় জ্বলিয়া ভাবিত, উনি যেমন বিশ্ব-ভুবনে শ্যাম-রূপ দেখিতেছেন, মনে করেন, আমিও ওঁর কিরণের কথা শুনিবার জন্য তেমনই পাগল হইয়াছি—! কিন্তু এখন সে সব কথার আলোচনা বন্ধ হওয়ায় তাহার পত্নীত্বে আঘাত লাগিত। সে মনে করিত, স্বামী আমায় এমনি হীন-চিত্ত মনে করেন যে, সাহস করিয়া তার কথা আর বলিতেও পারেন না! পাছে আমি হিংসা করি, এই ভয়ে! কেন, সে কি আমার সতীন? আমার অধিকারে ত কেহ হাত দিতে পারিবে না। করুন্ না উঁহারা ছেলেখেলা!

মন কিন্তু এ যুক্তি-তর্ক মানিয়া বশে চলিতে চাহিত না। দুজনের মনের উপর আর এক জনের আড়াল যতই নীরবতার মধ্য দিয়া চাপিয়া বসিতেছিল, সুনীতির তত মনে হইতে ছিল, সে যেন স্বামীর মনের সাড়াও সেই পরি-

মাণে ক্রমে হারাইয়া ফেলিতেছে। প্রেমহীন স্বামীর সহিত দাম্পত্য জীবন বহন করা তাহার যেন কঠিন দায়িত্ব বলিয়াই ক্রমে মনে হইতেছিল। অথচ ক্ষুধিত ব্যক্তি নিজে খাইতে না পাইলেও যেমন ভোক্তার পাশে বসিয়াও আনন্দ লাভ করে, তেমনি এক অতৃপ্ত সুখের মধ্যে থাকিয়াও সে স্বামীর সান্নিধ্য ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া যাইতেও পারিতেছিল না। (ক্রমশঃ)

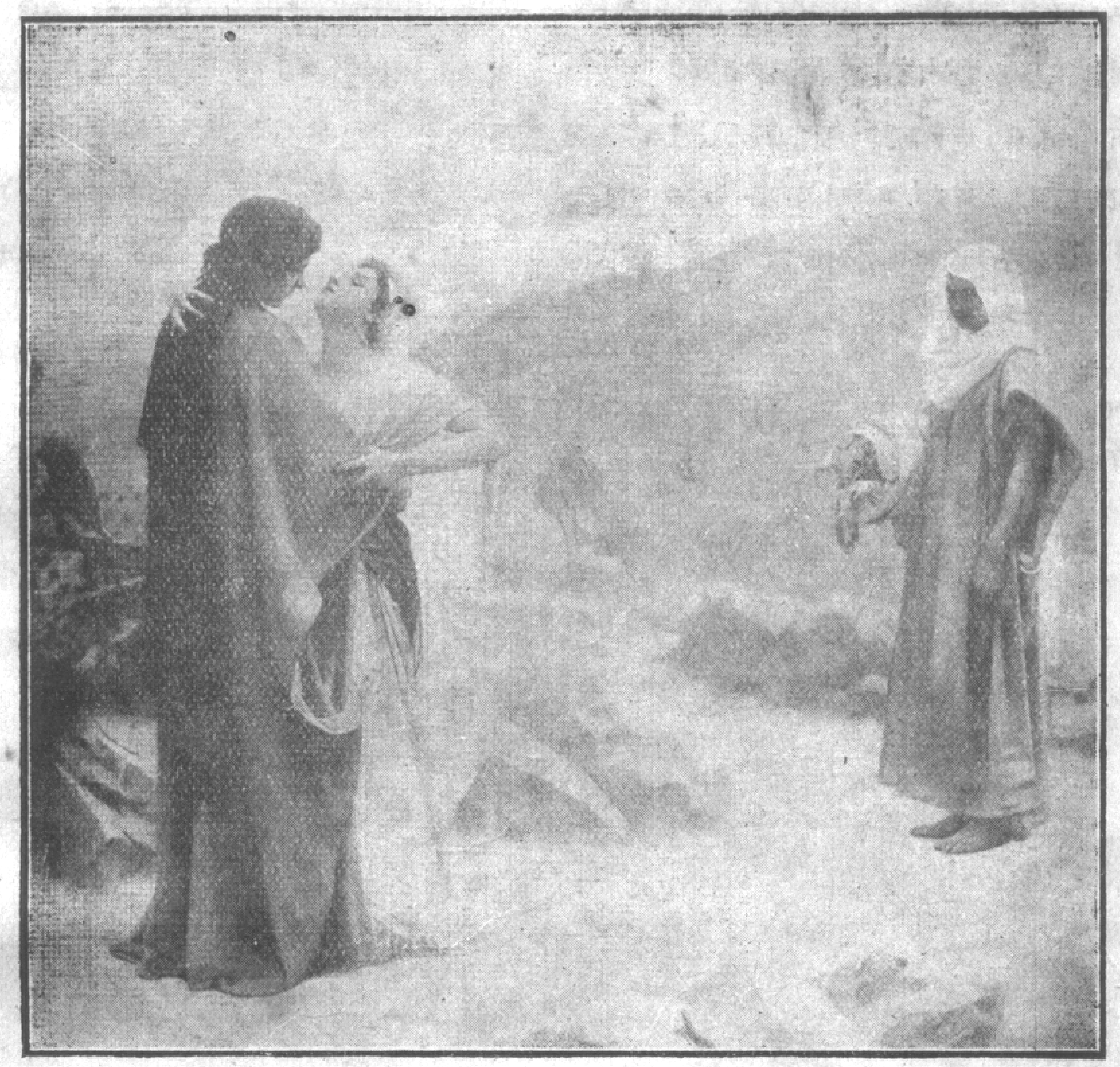
শ্রীইন্দিরা দেবী।

চিত্রশিল্পী ক্যাল্‌ডেরণ

ফিলিপ্‌ এইচ্‌ ক্যাল্‌ডেরণ একজন নামজাদা বিলাতী চিত্রকর। ইঁহার লেখা ছবি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। স্পেনদেশের বিখ্যাত নাট্যকার পেড্রো ক্যালডেরণের বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার ছবিগুলিতেও সেই সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষের অনেক গুণ তাই লক্ষ্য করা যায়। প্রাণময়তা, উদ্দীপনা, রঙের খেলা, এবং লেখার মধ্যে নানা ভঙ্গীতে চমক লাগাইবার চেষ্টা—এই রূপ কয়েকটি লক্ষণ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। যাহাকে নব্য (রোমান্টিক)-নাট্য-কলা বলে, সেই জাতীয় প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী-শক্তি দুই শিল্পীরই প্রচুর আছে। ইতিহাসের ঘটনা হইতে আপনার মনের মত রূপ ও রং ফলাইয়া তোলার ক্ষমতা ক্যালডেরণের রচনায় বেশ দেখা যায়। এমন বিষয় নাই, যাহাতে তিনি হাত দেন নাই। বাইবেল-বর্ণিত ঘটনা, সার্ব্বজনীন হৃদয়-কথা, ধর্ম্মজীবনের চিত্র, ঐতিহাসিক তথ্য ও ঐতিহাসিক কল্পনা, গ্রাম্যজীবন—প্রভৃতি নানা বিষয়-চিত্র



নাক্সস-দ্বীপে আরিআড্‌নী



রুথ ও নাওমি

(subject pictures) এই চিত্রকরের তুলিকায় অভিনব ভঙ্গিতে ফুটিয়াছে। এবারকার 'ভারতী'তে তাহারই কয়েকখানি প্রকাশিত হইল।

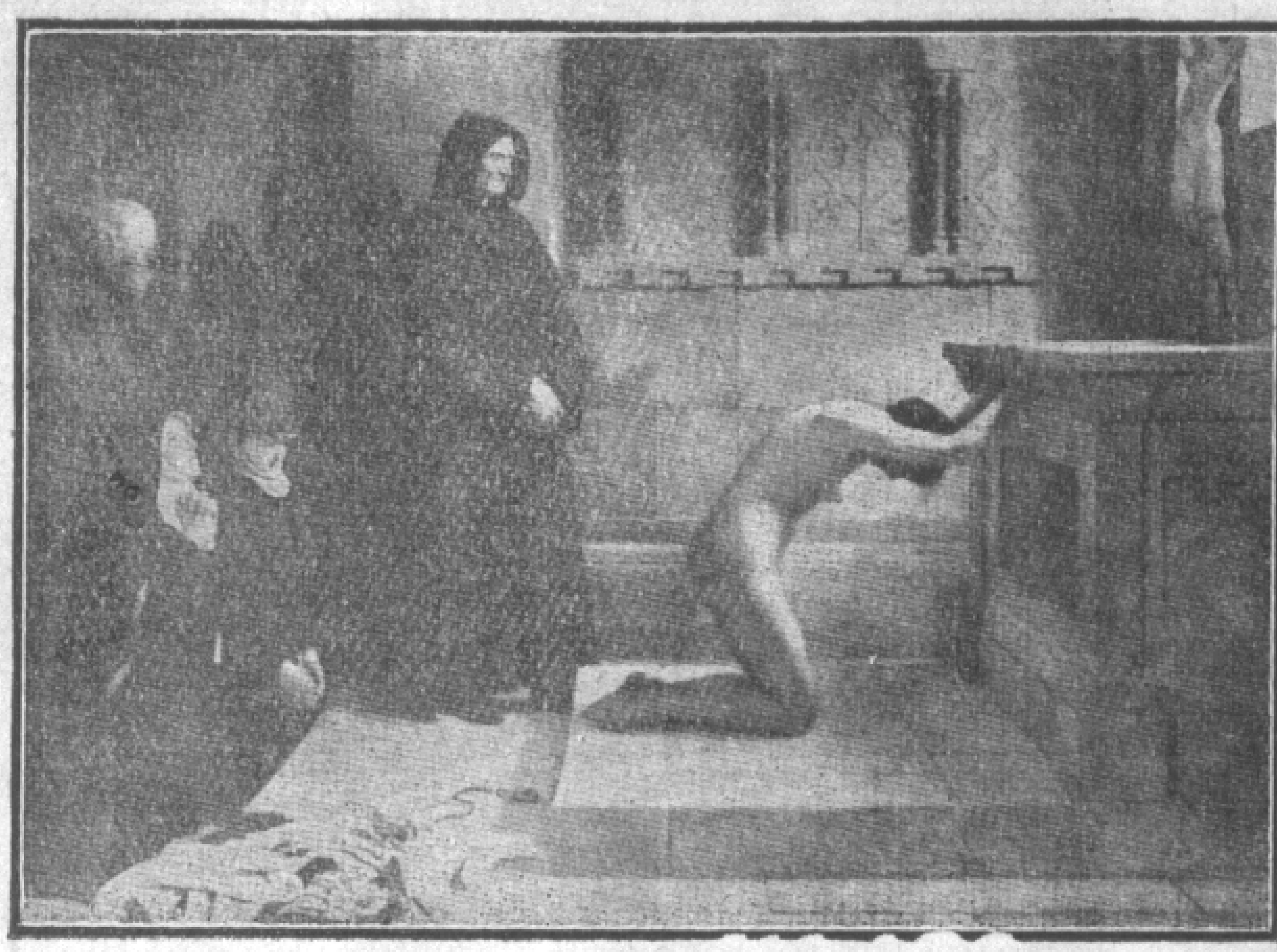
'নাক্সস-দ্বীপে আরিআড্‌নী'—এই চিত্রটির বিষয় পৌরাণিক; কিন্তু বিশেষ কোনো পৌরাণিকত্ব (বেশভূষা ছাড়া) ইহাতে নাই। শিল্পীর স্বাধীন কল্পনাই ইহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। আরিআড্‌নী রাজকন্যা; বিখ্যাত রাজবীর থিসিউস্‌কে ভালবাসিয়া তাঁহাকে রাক্ষসের মুখ হইতে রক্ষা করেন! ঐ রাক্ষসকে বধ করার পর থিসিউস্ প্রতিজ্ঞা-মত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নাক্সস-দ্বীপে এত ভালবাসার প্রতিদানে, তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান—তখন আরিআড্‌নী অন্তঃসত্ত্বা। কাহারো মতে আরিআড্‌নী তার পরেও বহুদিন জীবিত ছিলেন! কেহ বলেন, তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। কাহিনী এইটুকু, ছবিতে আরও কম। নির্জ্জন সাগর-কূলে একটি রমণী উন্মাদিনীর মত জলে নামিতেছে। চিত্রকরের উদ্দেশ্য—ওই রং ও রূপ, আর ওই পটভূমিকার সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্য। পৌরাণিক নামটি দেওয়া হইয়াছে—বিষয়টিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য।



রুথ

'রুথ' এবং "রুথ ও নাওমি"—দুইখানিই বাইবেল-চিত্র; বিষয়ও প্রায় এক। 'রুথ' ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি আদর্শ বধূ-চরিত্র। সে বিধবা, তাহার বাপের বাড়ী দূরে। স্বামীর মৃত্যুর পর সে পুত্র-শোকাতুরা সহায়হীনা শাশুড়ীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। পরের ক্ষেতে কৃষাণীর কাজ করিয়া সে নিজের ও বৃদ্ধা শাশুড়ীর জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল। একখানিতে "রুথ" যেন বেলাবসানে মনিবের ক্ষেতের কাজ সারিয়া যবের শীষগুলির মধ্যে বসিয়া আছে। তাহার সুন্দর কার্য্যক্ষম দেহের

শ্রী, মাথার বসন, মুখের গভীর উদাস অথচ স্নেহ-স্নুকোমল ভাব—চিত্রটির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। শূন্য আকাশতলে গোধূলির-আলোয় নারী-সৌন্দর্য্যের একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকটিত করাই যেন শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য : অপর চিত্রখানি সর্ব্বজন-প্রশংসিত ; এ-খানি লিভারপুল সহরের



সর্ব্ব-সমর্পণ



প্রোভেন্স্ দেশের গোলাপ

'ওয়াকার আর্ট-গ্যালারী'তে রক্ষিত আছে। 'রুথ' সিরিয়া দেশেরমেয়ে ; ওই-দেশীয় নারীর রূপ এই ছবিখানিতে বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটী শান্ত সংযত অবসাদ-সূচক মাধুরী—যাহা 'যিশু-জননী'র চিত্রগুলিতে প্রায় দেখা যায়—রুথের মুখভঙ্গিমায় সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। অনুর্ব্বর মরুপথ, নিকটে পাহাড়, চারিদিকে পাথর ছড়ানো—চিত্র ভূমিকার এক পার্শ্বে ফণীমনসা-জাতীয় ক্যাকৃটস্ গাছের ঝোপ। 'রুথ' যেন বিদায় হইবে না—পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া শাশুড়ীর গলা ধরিয়া অনুনয় করিতেছে। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য যে আসিয়াছে সে একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে। 'রুথ' বলিতেছে—আমাকে তোমায় ফেলিয়া যাইতে অনুরোধ করিও না, সঙ্গে ফিরিতে দাও। তুমি যেখানে যাইবে, আমি সেইখানে যাইব ; তুমি যেখানে থাকিবে আমি সেইখানে থাকিব, তোমার গোত্রই আমার গোত্র, তোমার ভগবানই আমার ভগবান।

'সর্ব্বসমর্পণ' নামক চিত্রটি আর একখানি



বাসন্তী

বিখ্যাত চিত্র। এখানি "ন্যাশন্যাল গ্যালারী অব্ ব্রিটিশ আর্ট"-গৃহে স্থান পাইয়াছে। মধ্যযুগের ধর্ম্মেতিহাসের একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই ছবিখানি অঙ্কিত হইয়াছে। পূতশীলা এলিজাবেথ্ খ্রীষ্টীয় 'দিব্যাবদানমালা' বা 'ভক্তমালে'র একটি প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্র। সে কালের ধর্ম্ম-সাধনের একটি কঠিন দৃশ্য এই ছবিতে দেখানো হইয়াছে। আজন্ম তাপসী এলিজাবেথ সর্ব্বসমর্পণ করিয়া, সর্ব্বস্ব—এমন কি লজ্জা-বসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন। মন্দির-মধ্যে, ইষ্টদেবতার বেদী স্পর্শ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণ লুটাইয়া দিয়া, নারীর শেষ নিজস্ব লজ্জাটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া এই আত্মোৎসর্গ করার

চিত্রটী যেমন হৃদয়দ্রবকর, তেমনি পবিত্র। মন্দিরের পুরোহিত ও মঠধারিণীরা এই পুণ্যা-বদান সার্থক হউক বলিয়া একমনে প্রার্থনা করিতেছেন।

'প্রোভেন্স-দেশের গোলাপ'—এক ধরণের নারী-সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য আঁকা হইয়াছে। আমাদের দেশে ইরাণী-সুন্দরী বলিতে যে রূপের কথা মনে হয়, য়ুরোপে দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রোভেন্স্ দেশের সৌন্দর্য্যও সেইরূপ ভোগ-কল্পনার সামগ্রী। চিত্রখানি সুন্দর কি না, যিনি দেখিবেন তিনিই বলিবেন। এরূপ সৌন্দর্য্যের বিচার-কালে এই কথাটাই মনে রাখিতে হইবে যে, সৌন্দর্য্য দর্শকের চোখে বাস করে আর কোথাও নয়। প্রোভেন্স-দেশ প্রাচীন কবিদিগের গান, সুরা, গোলাপ ও সুন্দরী রমণীর জন্য প্রসিদ্ধ।

'বাসন্তী'—চিত্রখানির পরিচয় আবশ্যক হইবে না। বসন্তকে কবি ও চিত্রকরেরা কত রূপে কল্পনা করিয়াছেন—এখানি তাহারই নিদর্শন।

শ্রীমধুব্রত।

আঁধি

১৩

সোনাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাথরের মত ভারী মন লইয়া নিখিল যখন ঘাটে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারা পথ নন্দর সঙ্গে নিখিল একটা কথাও বলে নাই,—নন্দও বৈকালে সোনাদের বাড়ী গিয়া ব্যাপার দেখিয়া এমনি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল যে তাহারো একটা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সমস্ত ব্যাপারখানা হেঁয়ালির মতই তাহার মনে হইতেছিল। সেই আর একদিন সে আসিয়াছিল ত, সেদিন ঐ কুঁড়েয় কি আমোদ আর উল্লাসের সাড়াই না পড়িতে দেখিয়াছিল, আর আজ? ছায়াবাজির মতই একটা ছোট প্রাণী কোথায় মিলাইয়া গেল, আর তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল এখানকার যা-কিছু আমোদ-উল্লাস, হাসি-গান, আর আলো-সুর! সে বেচারা কাহারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও করে নাই, তবু তাহার মন এমনি এক অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া গিয়াছিল যে সারা পথ সে ঐ নিখিলের গুম-হওয়া চলন্ত মূর্ত্তির পিছনে ষ্টীমারের পিছনে বাঁধা দাঁড়ি-মাঝি-হীন ছোট নৌকার মতই ভাসিয়া আসিতেছিল! নিখিলের এমন স্তব্ধ-গম্ভীর মূর্ত্তি সে জীবনে কখনো দেখে নাই! বাড়ীতে বাপের শাসন যতই থাক্, তা বলিয়া এমন! দেখিয়া শুনিয়া নন্দও তাই গুম্ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে বলিয়া সুষমা একটু ব্যাকুল হইয়া নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোধূলির ম্লান আলোয় আশে-পাশে ঘন-বিন্যস্ত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সুদূর পথে দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল—কোথায় নিখিল? কাহারো চিহ্ন নাই! কেন পাঠাইলাম তাহাকে? রাত হইয়া গেলে বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এই ভাবনাই সুষমার বেশী হইয়াছিল। নন্দর উপর রাগ ধরিতেছিল। কেমন লোক

সে? মনিবকে কি জানে না? মনিবের হুকুম কি সে শোনে নাই? সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে থাকা হইবেই না—তা সে মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক, কি প্রলয়ের মেঘ দিক্-দিগন্ত আঁধারে ছাইয়া ফেলুক! এ ত মাথার উপর নির্ম্মল মেঘহীন আকাশ—গাছের আড়ালে ছোট-এক-টুকরা চাঁদও ঐ দেখা দিয়াছে!

এমনি ভাবনায় ভয়ে রাগে সুষমার মন যখন বিষম দোল খাইতেছিল, তখন নন্দর সঙ্গে ধীরে ধীরে নিখিল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুষমা বলিল,—এত দেরী করেছ! নন্দ, তুই কি লোক, বল্ দিকি! বাবু রাগ করবে তা হুঁসও নেই! নে, লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে চ।

লণ্ঠনটা পথেই বসানো ছিল। সেটা নন্দ হাতে তুলিয়া লইল। সুষমা তখন নিখিলের পানে চাহিয়া বলিল,—চল নিখিল,-বাড়ী চল—জোরে জোরে—এই অবধি বলিয়াই নিখিলের শুষ্ক শোকার্ত্ত মুখের উপর নজর পড়িতেই সুষমা শিহরিয়া উঠিল। এ কি শ্রী তাহার! বিস্ফারিত দুই চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল পুরিয়া সুষমা নিখিলকে একরকম বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে নিখিল? অসুখ করছে না কি? না, গা ত ভালো।

মেঘ-গম্ভীর আকাশ যেমন এক দমকা হাওয়ার বেগে ফাটিয়া বৃষ্টির ধারায় চরাচর ভাসাইয়া দেয়, সুষমার এই স্নেহের হাওয়া লাগিয়া নিখিলের রুদ্ধ শোক মুহূর্ত্তে তেমনি অশ্রুর সহস্র ধারায় ফাটিয়া ঝরিয়া পড়িল। শোকের বেগ সামলাইতে না পারিয়া দুই হাতে সুষমাকে জড়াইয়া নিখিল তাহার বুকে মুখ গুঁজিল। সুষমা তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল,—কাঁদচো কেন নিখিল? কি হয়েছে? বল।

করুণ শোক প্রচণ্ড কান্নার ঢেউ তুলিয়া নিখিলের মনের মধ্যে গর্জ্জন করিয়া ছুটিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। বারবার প্রশ্ন করিয়া জবাব না পাইয়া সুষমা নন্দর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে রে, নন্দ? নিখিল পড়ে-টড়ে গেছল না কি কোথাও? দুর্ভাবনায় সুষমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

নন্দ বলিল,—যাদের বাড়ী গেছলুম, তাদের বাড়ীর সেই মেয়েটি মারা গেছে, মা।

এঁ্যা—! সুষমাকে যেন কে আকাশে তুলিয়া হঠাৎ তখনি দুই হাতে ছুড়িয়া এক কঠিন পাহাড়ের গায়ে ফেলিয়া দিল। সেই মেয়েটি—সোনা? সে নাই?

নিখিল সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের মত তাহার বুকে মাথা কুটিতে লাগিল। সুষমা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—শোনো নিখিল, শোনো—

—না, না—ওমা, সোনা? কোথায় গেল সোনা? বলিয়া পাগলের মতই পথে দুই পা ঠুকিয়া সে বিষম কান্না জুড়িয়া দিল।

কোনমতে তাহাকে ভুলাইতে না পারিয়া সুষমা বলিল,—কেঁদো না। শোনো নিখিল, ছি, রাস্তায় এমন করে কাঁদে কি! রাত হয়ে যাচ্ছে, চল, বাড়ী চল। জানো ত, নাহলে উনি বক্‌বেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে জড়িতস্বরেই নিখিল বলিল,—বকুক বাবা! আর আমি ভয় করি না। আমি বাড়ীতে থাক্‌তেও চাই না, থাক্‌ব না আর। বাড়ী থেকে আমি পালিয়ে যাব। সোনা

যেখানে গেছে, সেইখানে যাব। চাই না আমি, চাই না তোমাদের বাড়ী যেতে।

শিহরিয়া সুষমা তাহার মাথায়-মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—ছি বাবা, ও সব কথা কি বল্‌তে আছে? মাণিক আমার, ছি—চুপ কর, বাড়ী চল।

—না মা, বাড়ীতে আমি যাব না। নিখিল হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুষমার প্রাণেও এ সংবাদ কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল—সেই হাসির মত ছোট্ট সুন্দর মেয়েটি—মা-বাপের বাছা! আহা! জোর করিয়া সে কাঁটার বেদনা চাপা দিয়া সুষমা বলিল,—যাবে না বাড়ী? আমার কথা শুনবে না তাহলে? বেশ, আমিও তাহলে কাঁদি—কেমন? সুষমার কণ্ঠের স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

সেটুকু নিখিলের লক্ষ্য এড়াইল না। সে সুষমার পানে চাহিল। চাহিতেই লণ্ঠনের আলোয় দেখিল, সুষমার চোখ যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সে ডাকিল,—মা, অ মা—

—কেন?

—সোনা কোথায় গেল?

সুষমা গাঢ়স্বরে বলিল,—স্বর্গে গেছে, বাবা, ভগবানের কাছে। তার জন্যে কি কাঁদে!

নিখিল বলিল,—বড় হলেই ত মানুষ ভগবানের কাছে যায়,—সোনা ত ছেলে মানুষ!

সুষমা অতিকষ্টে নিশ্বাস চাপিয়া বলিল,—যারা ভালো হয়, লক্ষ্মী হয়, ভগবান তাদের ভালবাসেন কি না, ভাল বেসে তাই নিজের কাছে নিয়ে যান্‌।

নিখিল একটু স্থির থাকিয়া বলিল,—আমি যদি খুব লক্ষ্মী হই? ভালো হই—?

বালাই! ষাট! সুষমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল,—রাত হয়ে যাচ্ছে নিখিল—আর এ পথে থাকে না। চারধারে ঝোপ-ঝাপ, সাপ-খোপ বেরোয় যদি? লক্ষ্মী বাবা আমার, বাড়ী এসো।

নিখিল স্থির হইয়া মার হাত ধরিয়া বাড়ীর পথে চলিল,—নন্দ আগে আগে লণ্ঠন দেখাইয়া যাইতেছিল।

খানিকটা পথ আসিয়া নিখিল বলিল,—তুমি বল্‌লে না মা?

—কি কথা বাবা?

—যা আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—কি কথা?

—আমি যদি লক্ষ্মী হই, ভালো হই, তাহলে ভগবান আমাকেও ত তাঁর নিজের কাছে সোনার কাছে নিয়ে যাবেন?

আবার ঐ কথা! সুষমা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া নিখিলের মুখে চুম্বন করিয়া বলিল,—ছি বাবা, ও কথা বলতে নেই। মা-বাপ বেঁচে থাকলে ভগবান ছেলেমেয়েদের নিয়ে যান্‌ না—মা-বাপের মনে কষ্ট হবে যে তাহলে!

নিখিল বলিল,—সোনারও ত বাবা আছে, মা আছে,—সোনাকে তবে নিয়ে গেলেন কেন?

সুষমা বলিল,—সোনার বাবা সোনার মা হয়ত কোন পাপ করেছিল, সোনার মনে হয়ত সেজন্য দুঃখ হয়েছিল—

একটু উৎফুল্ল স্বরে নিখিল অমনি বলিয়া উঠিল,—আমার বাবা যখন তোমায় বকে, আমায় বকে,—তখন আমারো ত খুব দুঃখ হয় মা, আমিও কাঁদি ত—তাহলে ভগবান আমাকে কেন তাঁর কাছে নিয়ে যান না?

—আবার ঐ কথা নিখিল? ছি! আমি ভারী রাগ করব এবার। চুপ করে তাড়াতাড়ি এখন বাড়ী চল। রাত হয়ে যাচ্ছে, তা দেখচ কি!

নিখিল একেবারে দুম্‌ড়াইয়া গিয়া মিনতির সুরে বলিল,—না মা, রাগ করো না মা—আর আমি কখ্‌খনো ও কথা বলব না। তোমার কষ্ট হয় ওকথা শুনলে?

—হয় না?

—তবে আর বলবো না মা।

১৪

বাড়ী আসিয়া রাত্রে নিখিল বাঁধা নিয়মে বই খুলিয়া বসিল, কিন্তু একটা লাইনও পড়িতে পারিল না। বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা যেন ক্রমাগতই ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, এত বড় পৃথিবীখানা হঠাৎ যেন চুপ্‌সিয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, আর তাহার মধ্যে যত লোকজন ছিল, সকলের বুকে-বুকে মুখে-মুখে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া থ্যাবড়াইয়া তাল-গোল পাকাইয়া সব বিশ্রী একাকার হইয়া গিয়াছে! গাছে গাছে পাখীগুলার কণ্ঠও সেই সঙ্গে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, হাওয়া বন্ধ, আলোও যেন চিরদিনের জন্যে নিবিয়া গিয়াছে, আর সুযোগ পাইয়া চারিধারে রাশি রাশি অন্ধকার অমনি জমাট বাঁধিয়া ক্রমেই যেন একটা দৈত্যের আকার ধরিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে! অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া কোনমতে সেই কালো দৈত্যটার হাতের ফাঁক দিয়া গলিয়া ছুটিয়া সে এখন পলাইতে চায়—কোথায় আলো, ওগো কোথায় হাওয়া! চোখের কোণে জলও ঠেলিয়া-ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা দুই চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেদিনকার সেই দৃশ্য—নিঝুম দুপুরে রৌদ্র-ছায়ায় ঘেরা পথের উপর সোনা আসিয়া তাহাদের বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়াছে! সঙ্গে তাহার বাপ বনমালা। সোনার করুণ চোখের অধীর দৃষ্টি এই প্রকাণ্ড বাড়ীময় নিখিলকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—আর নিখিল? সে যেন ছাদের এক কোণে ঘুলঘুলিটার ফাঁক দিয়া নীরব নত নেত্রে সোনাকে লক্ষ্য করিতেছে! দেখিতে দেখিতে সোনার দৃষ্টি যেন হাওয়ার মত ছাদের উপর ভাসিয়া উঠিল, আর নিখিলও ভয়ে-ভয়ে ঘুলঘুলির ধার ছাড়িয়া সারা ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, সোনার দৃষ্টির হাওয়াও অমনি ছোট একটা ঘুর্ণি বাতাসের মত তাহার পিছনে-পিছনে ছোটা সুরু করিয়া দিল।

হঠাৎ মাষ্টার মশায় বলিলেন,—তুমি আজ মোটে পড়ছ না নিখিল। পড়ায় তোমার আজ মন নেই, দেখ্‌চি।

নিখিল বলিল,—ঘুম পাচ্ছে, মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার মহাশয় লক্ষ্য করিলেন, নিখিলকে আজ বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে। কিন্তু কি করিবেন তিনি? তাঁহার উপর হুকুম আছে, এটা নিখিলের পড়ার সময়,—পড়ার নিয়ম ঠিক থাকা চাই! কোনমতেই তাহার ব্যতিক্রম না হয়!

অথচ নিখিলের শরীর-মন আজ একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ কাতর হইল। আহা, বেচারী! কিন্তু ছুটি

দিলে কর্তা যদি রাগ করিয়া নিখিলের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া বসেন! একটু ভাবিয়া মাষ্টার মশায় বলিলেন,—একটু পড়ো, তাহলেই ছুটি দেব। চেঁচিয়ে পড় দেখি—তাহলে ঘুমও ছেড়ে যাবে।

নিখিল বলিল,—চেঁচিয়ে পড়তে পারছি না, মাষ্টার মশায়।

নিখিলের চোখে এমন অসহ্য কাতরতা ফুটিয়া উঠিল যে মাষ্টার মহাশয় তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এমন শীর্ণ মুখ, শ্রান্ত দৃষ্টি! নিখিলের মুখ যেন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে!

মাষ্টার মশায় তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—কি অসুখ করছে নিখিল? আমায় বল দিকি।

নিখিল মাষ্টার মহাশয়ের বুকে মাথা রাখিয়া একেবারে প্রশ্ন তুলিল,—মানুষ মরে যায় কেন মাষ্টার মশায়? মরে তারা কোথায় যায়?

নিখিলের মুখে হঠাৎ এত বড় অভিনব প্রশ্ন শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। এ কথা কেন? এ কথার মানে? মাষ্টার মশায় চুপ করিয়া নিখিলকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কোন জবাব দিলেন না।

নিখিল বলিল,—বলুন না মাষ্টার মশায়,—মানুষ কেন মরে যায়? আর মরে তারা যায় কোথায়?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—তা কি মানুষে বলতে পারে নিখিল?

নিখিল বলিল,—মা বলে, ভগবান যাকে ভালবাসেন, সেই মরে যায়—তা কি সত্যি? ভগবান তাহলে মা-বাপের মনে দুঃখ দিয়ে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নিজের কাছে নিয়ে যান্ কেন? ছেলে-মেয়েদের ত কষ্ট হয়, মা-বাপকে ছেড়ে তাঁর কাছে যেতে? সেখানে মা-বাপের জন্যে তাদের মন কেমন করবে ত?

অত বড় কঠিন প্রশ্নের এমন সহজ সমাধান শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় অবাক হইলেন। বা, সুন্দর জবাব ত! মাষ্টার মহাশয় মুখে কোন কথা বলিলেন না,—শুধু অবাক হইয়া রহিলেন। যে-নিখিল খুব-প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া তাঁহার কাছে একরকম চুপ করিয়াই থাকে, সেই নিখিলের কণ্ঠ সহসা আজ এমন মুখর হইল যে! আবার তার উপর মুখে তাহার একেবারে মরণ-বাঁচনের এমন কথাই বা ফুটিল কেন!

নিখিল আবার প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, ভগবান ত স্বর্গে থাকেন? তা স্বর্গ কোথায়, মাষ্টার মশায়? মা বলছিল, ঐ আকাশের উপর! তাই কি? তাহলে মানুষ ওখানে যাবে কি করে? তা যদি হত তাহলে এই যে এরোপ্লেন হয়েছে, এতে চড়েই ত মানুষ স্বর্গে যেত—মরে আর সেখানে যেতে হত না!

এইটুকু বলিয়া নিখিল থামিল, তারপর আবার বলিল,—তা নয়। না? আকাশের উপর স্বর্গ নয়, থাকতেও পারে না। আকাশটা ত কিছুই নয়—আপনি বলেন, ও ফাঁকা—সেদিন বলছিলেন না, আকাশ শূন্য? এ্যাঁ? আমি সব বুঝি, মাষ্টার মশায়, স্বর্গ হচ্ছে সেই পৃথিবীর শেষে—অনেক দূরে—যেখানে পৃথিবী একদম শেষ হয়ে গেছে, তারপরই মস্ত পাঁচিলে ঘেরা স্বর্গ—না? সেখানে ঢোকবার শুধু একটি

ফটক আছে—না? শুধু যুধিষ্ঠির পৃথিবী পার হয়ে পাহাড় ঘুরে স্বর্গে গেছলেন, জ্যান্ত মানুষ আর কেউ অত কষ্ট করে স্বর্গে যেতে পারে নি! ভীম, অর্জ্জুন—এঁরাও পারেননি—না?

মাষ্টার মহাশয় আজ এই তরুণ ছাত্রটির কল্পনার উৎস এমন ভাবে খুলিতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তেমনি মুগ্ধও হইতেছিলেন। বাঃ—কল্পনায় নিখিল এ যে চমৎকার স্বর্গ গড়িয়া তুলিয়াছে!

একটু থামিয়া নিখিল আবার বলিল,—আমি একদিন যাব মাষ্টার মশায়। দূরে, খুব দূরে হেঁটে হেঁটে সমস্ত পাহাড়-পর্ব্বত বয়ে, নদী পার হয়ে সাগর পার হয়ে হেঁটে হেঁটে পৃথিবীর ওপারে সেই স্বর্গে আমি যাব। গিয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করব, কেন তিনি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে যান্? তাদের যদি ভালই বাসেন, তাহলে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যান্ না কেন? কেমন হয় তাহলে—! যারা চলে যায়, তাদেরও—এখানে যারা পড়ে থাকে, তাদের জন্তে মন কেমন করে না! আর সব-ছেলে-মেয়েদের যদি স্বর্গেই নিয়ে যাবেন, তাহলে পৃথিবীতে মা-বাপের কাছে তাদের পাঠান্ কেন?

মাষ্টার মহাশয় ছাত্রের এ মুখরতায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,—কিন্তু এ কথা কেন নিখিল, হঠাৎ, আজ—?

নিখিলের কল্পনার ফানুস মাষ্টার-মহাশয়ের এ কথায় সহসা ঘা খাইয়া ছিঁড়িয়া নীল আকাশের সান্নিধ্য ছাড়িয়া একেবারে পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়িল। অমনি সোনার শোক জীবন্ত হইয়া বুকে ফুটিল। নিখিল বলিল,—সোনা বলে একটি ছোট মেয়ে ছিল না—ঐ বনমালীদের? সে মরে গেছে। মরে স্বর্গে ভগবানের কাছেই গেছে ত সে? কিন্তু তার মা-বাবা এখানে দুঃখ পেয়ে যে কাঁদ্চে, ভগবান তা দেখছেন না কেন? দেখে তাদের সোনাকে তাদের কাছেই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন না কেন? বইয়ে লেখা আছে, ভগবান কারুণিক—কারুণিক মানে দয়ালু ত? তা এই বুঝি তাঁর দয়া!

নিখিল চিরদিনই মুখ-চোরা। কিন্তু এ কি! আজ তাহাকে সহসা এতখানি মুখর হইতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—সেই বনমালী? সেই সেবার এক জল-ঝড়ের রাত্রে যাদের বাড়ী তুমি বসেছিলে, তারপর তার সঙ্গে ফিরছিলে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হল—সেই না, বনমালী?

নিখিল বলিল,—হ্যাঁ।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—তার মেয়েটি মারা গেছে?

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আহা!

মাষ্টার মহাশয়ের এই সমবেদনার আহা শুনিয়া নিখিল বলিল,—সেই ত সোনা। খুব ভালো মেয়ে ছিল। আমাদের বাড়ী একদিন এসেছিল সে মাষ্টার মশায়—একদিন দুপুর বেলায়—আমি তখন আপনার কাছে বসে পড়ছিলুম।

মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন, সেই সমবয়সী-মেয়েটির বিয়োগ-বেদনা নিখিলের প্রাণে খুবই বাজিয়াছে; বুঝিয়া তাহার পানে শুধু চাহিয়াই রহিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

নিখিল বলিল,—তবু আমি লুকিয়ে একবার বাইরে গেছলুম, তাকে বলতে যে আমি এখন পড়্‌চি, বাড়ী যাও। বাবা দেখতে পেলে তাকে বকে যদি? তার পর একটু থামিয়া বলিল,—তাই হলোও। সে মার কাছে গেছল,—মা আমাকে সেই ডেকে পাঠালে না? সেই যে একদিন বিন্দে ডাকতে এলো, আপনি বললেন, যাও নিখিল, শুনে এসো। তার পর যেই উপরে গেছি, অমনি বাবা এল, —এসে আমায় এমন ধমক দিলে সোনার সাম্‌নে—নিখিলের দুই চোখে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাষ্টার মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস বুকে চাপিয়া নিখিলের পানে কেমন বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিলেন। বড় লোকের ছেলে আইনের গণ্ডীতে বাঁধা নিখিল,—তাহার প্রাণে গরিবের জন্য এমন মমতা!

কান্না-মাখা স্বরে নিখিল বলিল,—সোনা আমায় বল্‌ত রাজপুত্তুর—মাকে বল্‌ত রাণী-মা। তার রাণী-মাকে সেদিন সে দেখতে এসেছিল।

নিখিলের মুখে আর কথা বাহির হইল না। দুই চোখ দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া শুধু জলের ফোঁটা খোলা বইয়ের পৃষ্ঠায় অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—যাও নিখিল, আজ আর পড়তে হবে না। আজ তোমার ছুটী।

নিখিল সজল চোখে মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিয়া বলিল,—না। বাবা বকবে।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—ভয় নেই, বকবেন না। বকেন যদি ত বলো, মাষ্টার মশায় ছুটী দিয়েছেন—তারপর যা বলবার, আমি বলবো।

কৃতজ্ঞতায় নিখিলের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে শুধু ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

মাষ্টার মহাশয় সস্নেহে নিখিলের পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন,—তুমি শোও গে নিখিল, আজ আর পড়তে হবে না।

নিখিলও তাই চাহিতেছিল। কোনমতে লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া আড়ালে বিছানায় গিয়া যদি একবার সে ঢুকিতে পায়! তাহা হইলে এই রুদ্ধ বেদনাকে সে একবার প্রাণ খুলিয়া উজাড় করিয়া দেয়! সেই যে তাহার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া মলিন মুখে সোনা সেদিন ফিরিয়া গিয়াছে—তারপর বাগানে ফুল লইয়া গেলেও সোনার সেদিনকার সেই মলিন মুখের স্মৃতি ছুরির ফলার মতই আজ নিখিলের বুকে বিঁধিতেছিল। সমস্ত বুক ছিঁড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই ছুটী পাইয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

১৫

নিখিল চলিয়া গেলে মাষ্টার মহাশয় অনেক-ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিখিলের কথা মনের মধ্যে একটা দোল দিয়াছিল। মনে হইতেছিল, মাহিনা খাইয়া শুধু ইহার পড়াই বলিয়া দিয়াছি,—কোনদিন মনের পানেও চাহিয়া দেখি নাই ত! এই ছোট শিশু—পড়ার ভারে, নিয়মের চাপে বুক-পিঠ টন্‌ টন্‌ করিয়াছে, মনটা পিষিয়া ধুলা হইবার মত হইয়াছে, তবু ক্রমাগত তাহার মনে কামারের হাতুড়ি ঠুকিয়াছি,—পড়, পড়! ঘুমে চোখ তাহার আচ্ছন্ন

হইয়া গিয়াছে, অসুখে মাথা দপ দপ করিয়াছে, তবুও রেহাই দিই নাই—চোখে জল দেওয়াইয়া কটু-মটু করিয়া বইয়ের পানে দৃষ্টিটাকে উপড়াইয়া বাহির করিয়া আনিয়া সজোরে শুধু হাতুড়ি চালাইয়াছি,—পড়, পড়! নিখিলও অমনি পড়িয়া গিয়াছে। উস্কখুস্ক বেশ, মলিন মূর্ত্তি—তবুও মাহিনা-ভোগী মাষ্টারের প্রাণে এতটুকু মমতা জাগে নাই! কেন—? না, এই পঞ্চাশ টাকার মাহিনা ও খোর-পোষের সব বাঁধন পাছে কাটিয়া যায়! তীব্র অনুশোচনায় আজ এই প্রথম মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ ভরিয়া গেল। এ কি মাষ্টার,—না, কসাইয়ের কাজ? ছি!

মাষ্টার মহাশয় ভাবিলেন, এই বাপ! বাপেরই বা এ কেমন প্রাণ! স্নেহের শীতল ছায়া, মিষ্ট কথার স্নিগ্ধ ঝারি—কোনদিন তাঁহার চোখেও পড়ে নাই! কেবলি শাসন, পেষণ, শাসনের তীব্র হুঙ্কার! ছেলেটা চারি দিকের এই কঠিন পাষাণের চাপ সহিয়াও বাঁচিয়া আছে কেমন করিয়া, আশ্চর্য্য! সাধে কি নিখিল সেদিন বলিয়াছিল,—মাষ্টার মশায়, একদিন দুপুর বেলায় আমায় ছুটী দেবেন, আমি চারিধার ঘুরে দেখে আসব!

ঠিক! শাসনের চাপ আর নিয়মের বাঁধনে প্রাণ তাহার জর্জ্জর হইয়া গিয়াছে—সে তাই চায় প্রকৃতির উদার বুকে একটু বেড়াইয়া শ্যামল তৃণ-দল, সবুজ শষ্প আর মুক্ত হাওয়ার পরশ লাগাইয়া প্রাণটাকে একবার চান্‌কাইয়া সরস করিয়া লইতে! বেশ, তাই হোক্! কালই সে-ছুটি তাহাকে দিতে হইবে। ইহাতে কর্ত্তার মেজাজ যদি বারুদের আগুন ছিটায় ত তিনিই তাহার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিবেন, নিখিলের গায়ে তাহার এতটুকু আঁচও লাগিতে দিবেন না।

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, প্রতিক্ষণেই কর্ত্তার জুতার শব্দ প্রতীক্ষা করিয়া! প্রত্যহই যে তিনি আসেন তা নয়, তবু আজ সেই দুই পায়ের শব্দই তিনি প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তা ছাড়া আবার কি জানি, ওধারে যদি ইতিমধ্যে সেই পরিচিত রূঢ় কণ্ঠে ভৎর্সনার তীব্র হুঙ্কার জাগিয়া ওঠে!

কিন্তু ভগবান রক্ষা করিলেন। সে শব্দ, সে হুঙ্কার জাগিল না! মাষ্টার মহাশয় আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া নিখিল প্রতিদিন-কার মত মার সঙ্গে দেখা করিল না, মুখ-হাত ধুইয়া খাবার খাইয়া একেবারে বাহিরে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে চলিয়া গেল; এবং রুটিন-মাফিক পড়ার বই খুলিয়া বসিল।

ফাল্গুন মাস। বাহিরে বেশ মিঠা দখিণা বাতাস বহিতেছিল এবং গাছের ডালে নানা পাখীর আনন্দ-কলরব সুরের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিল। বই খুলিয়া বসিলেও নিখিলের মন বাহিরে ফাল্গুনের সে উৎসব-কোলাহলে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আজো পড়তে ভাল লাগচে না, নিখিল? না? নিখিল কিছু না বলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—একটু পড়, তারপর দুপুর বেলা তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব'খন। নিখিলের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মুক্তির হাওয়া প্রাণে যেন স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া দিল। পরক্ষণেই সে হাওয়ায় একটু আগুনের

আঁচও দেখা দিল। নিখিল বলিল,—বাবা বকবে না?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—তাঁকে বলেই যাব—বুঝলে?

আঃ! কৃতজ্ঞতায় নিখিলের মন ভরিয়া গেল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিখিল বলিল,—আচ্ছা। এখন বেশ করে পড়ে নি তবে।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—হ্যাঁ, পড়। রোজ-রোজ পড়াশোনা করতে হলে মাঝে মাঝে ছুটি চাই বৈ কি। তা আজ তোমায় সে ছুটি দেব।

নিখিল বলিল,—আজ তাহলে নিশ্চয় ছুটি পাব? বাবা বারণ করবে না?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—না। আজ নিশ্চয় ছুটি পাবে।

—আমি তাহলে পড়ি মাষ্টার মশায়। খুব মন দিয়ে পড়ব, দেখবেন।

মাষ্টার মহাশয় ভারী খুসী হইলেন, পড়ায় নিখিলের আজ এই অত্যন্ত মনোযোগ দেখিয়া। ছুটির একটু আভাবেই মন যখন এমন হাল্কা হইয়া গেল, তখন ছুটি মিলিলে মনের কোণে আর এতটুকু ভার থাকিবে না! তার ফল কি সামান্য! এতদিন এ কথাটা যদি তিনি ভাবিয়া দেখিতেন! কি করিয়া দেখিবেন? তাঁহার চোখ ঐ মাহিনার টাকার পিছনে নিয়মের আগড়ে বাঁধা ছিল যে। ছি—ধিক্ এমন টাকায়! মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া বিবেক খোয়াইয়া এমন চাকরিতেও ধিক্!

নিখিল তখন ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেছিল—আকারের পর উ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়—যথা, মহা ছিল উপকার, মহোপ-কার; ছায়া ছিল উপবিষ্ট, ছায়োপবিষ্ট।

১৩

১৬

দশটার সময় আহার সারিয়া নিখিল আসিয়া সুষমাকে ডাকিল—মা।

সুষমা তখন কি-একটা তরকারী কুটিয়া দিতেছিল, বলিল,—কেন নিখিল? ডাকচ?

নিখিল বলিল,—একটা কথা বলব মা?

—বল।

নিখিল সুষমার গলা জড়াইয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল,—আজ দুপুর বেলা আমার ছুটি। মাষ্টার মশায় ছুটি দিয়েছেন, পড়তে হবে না।

নিখিলের কালিকার সেই শোকার্ত্ত গুমট ভাব দেখিয়া সুষমা বিষম চিন্তিত হইয়াছিল। রাত্রে তাহাকে কত পীড়াপীড়ি করিয়াও এক বাটি দুধ ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারে নাই; আজ সকালেও সে সুষমার সঙ্গে দেখা করে নাই। এজন্য সুষমার মন খুবই অস্থির হইয়াছিল। পরে আজ স্নান করতে আসিয়া অবধি তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সুষমা একটু সুস্থির হইতে পারিয়াছিল। সকাল হইতে কোন কাজে যে-মন লাগাইতে পারে নাই, সে-মন একটু একটু করিয়া সাফ্ হইতেছিল—এখন নিখিলের এই স্বচ্ছ সরল উল্লাসে সে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল,—বেশ, এখন কি করবে?

নিখিল বলিল,—মাষ্টার মশায় আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছেন।

সুষমা বলিল,—বেড়িয়ে এসে আমায় গল্প বলো—কেমন?

নিখিল বলিল,—হ্যাঁ মা, বলবো।

নিখিল লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

সুষমা কাজ ফেলিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

বাহিরে গিয়া নিখিল মাষ্টার মহাশয়কে তাড়া দিতে লাগিল,—চান্‌ করুন না মাষ্টার মশায়। কখন যাবেন?

মন তাহার আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে পাখীর কলরব ও হাওয়ার ঝরণা মায়ার প্রলোভন তুলিয়া তাহাকে কেবলি ডাকিতেছিল, আয় রে, শীঘ্র বাহিরে চলিয়া আয়! মাষ্টার মহাশয় স্নান করিতে গেলেন—নিখিল একা ঘরের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। গাছে ফুলের কাছে কাছে দুইটা প্রজাপতি ঘুরিয়া ফিরিতেছিল,—লালে-নীলে কালোয়-সাদায় রাঙানো তাদের বিচিত্র পাখা! নিখিল প্রজাপতি ধরিতে তাহাদের পিছনে ছুটিল। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে পুকুর-পাড় ঘুরিয়া, মন্দির ছাড়াইয়া সে একটু দূরে গিয়া পড়িল। প্রজাপতিও শেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে প্রজাপতি খুঁজিতেছে, এমন সময় কানে গেল, এক পাখীর ডাক। একটা ঘুঘু কোন্‌ গাছে পাতার আড়ালে বসিয়া করুণ তান ধরিয়াছিল, ঘু-ঘু-ঘু! সে ডাকে প্রাণ কেমন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইল! মুগ্ধ নিখিল প্রজাপতি ছাড়িয়া তখন ঘুঘুর খোঁজে চলিল। আমের বোউলে গাছের ডালপালায় আকুল মদির গন্ধ ছুটিয়াছে,—মত্ত মৌমাছিরা অলস গুঞ্জনে সারা বন মুখর করিয়া তুলিয়াছে—নিখিলের মন সে গন্ধে সে গুঞ্জনে মাতাল হইয়া উঠিল। বাড়ী ভুলিয়া ঘর ভুলিয়া শাসন ভুলিয়া সে তখন বনে-বনে পাগল হাওয়ার মতই ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। এমনি ঘুরিতে ঘুরিতে সে এক সময় বাগান-মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। আঘাটায় দুই-চারিটী নারী স্নান করিতেছিল, তাহাদের একটি কালো ছেলে জলে সাঁতার দিতেছিল—নিখিল তীরে দাঁড়াইয়া সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল। ছেলেটা স্নান সারিয়া ক্রমে তীরে উঠিল এবং গা মুছিতে মুছিতে বনের পথ ধরিয়া গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিখিলও তখন নদীর ধার দিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। নদীর এপারেই ক্রমে বনের শেষে খোলা মাঠ আসিয়া দেখা দিল। মাঠে একটা রাখাল-ছেলে বড় অশথ গাছের তলে ছায়ায় মোটা গুঁড়িতে ঠেশ দিয়া বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছিল। নিখিল সে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে বসিল। রাখাল-ছেলে বাঁশী রাখিয়া কথা কহিল। তাহার সঙ্গে নিখিলের তখন কত কথা হইল—কোথায় ঘর, কে আছে? সে কত কথা! রাখাল-ছেলে আবার বাঁশীতে তান তুলিল। নিখিল বাঁশীর সুরে মুগ্ধ মনে সব ভুলিয়া সেই খানেই বসিয়া গেল।

যখন রাখাল-ছেলের বাঁশী থামিল, সূর্য্য তখন মাঠের মাথার উপরকার সমস্ত আকাশটাকে লাল রঙে রাঙাইয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। রাখাল-বালককে বাঁশী রাখিয়া দল জড়ো করিতে দেখিয়া নিখিলের হুঁস হইল, তাইত, সে এ কি করিয়াছে! ছুটি, ছুটি—ছুটি ত মিলিয়াছিল, কিন্তু সে কি সর্ত্তে? আর মাষ্টার মহাশয়কে ফেলিয়া সে একা এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? সারা দিন ঘুরিয়া কোন্‌ পথে সে এ অজানা মাঠে আসিয়া পড়িল?

কি করিয়া কোন্ পথেই বা এখন বাড়ী ফিরিবে ?

রাখাল-বালক দল জড়ো করিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে মাঠ পার হইয়া ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। যতক্ষণ শুনা যায়, নিখিল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাঁশার সুর শুনিল। সুর ক্রমে দূর-সীমান্তে মিলাইয়া গেল। এত বড় খোলা মাঠে নিখিল এখন একা! ওদিকে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিতেছে,—আকাশের এক কোণে ম্লান চাঁদ আসিয়া দেখা দিয়াছে! নিখিলের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিলেও চলে না! এখনই রাত্রি হইবে। দূরে তাল গাছের ঘন কুঞ্জ দেখা যাইতেছিল, নিখিল সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল,—ঐ পথে যদি গ্রামের কোন সন্ধান মেলে !

১৭

ঠিক সন্ধ্যার সময় মাঠে দাঁড়াইয়া নিখিল যখন রাখাল-ছেলের দূর হইতে ভাসিয়া-আসা বাঁশীর সুরে পথ খুঁজিতেছিল, বাড়ীতে ওদিক তখন হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। বেচারা বনমালী কন্যার শোকে কাতর চিত্ত লইয়া জমিদার বাবুর মস্ত বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যদি একবার নিখিলের দেখা পায়! তাহাকে বুকে তুলিয়া, তাহার সঙ্গে দুইটা কথা কহিয়া প্রাণের বেদনা যদি একটু ঘুচাইতে পারে!

সারা বাড়ীতে তখন নিখিলের খোঁজ চলিয়াছিল। অভয়াশঙ্করের গর্জ্জনে মাষ্টার মহাশয় লোকজন লইয়া গ্রামময় নিখিলের খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সুষমা ঠাকুর-ঘরের দ্বারে মূর্চ্ছা দিয়া পড়িয়াছিল, আর অভয়া-শঙ্কর ব্যাকুল চিত্তে তপ্ত ঝাঁজ লইয়া ঘর-বাহির করিতেছিলেন—হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বনমালীকে দেখিলেন, দেখিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—কে তুমি ?

অত্যন্ত করুণ কুণ্ঠিত স্বরে বনমালী নিজের নাম বলিল।

এই সে লোকটা! অভয়াশঙ্কর বলিলেন—নিখিল তোদের বাড়ী গেছে ?

ভীত কুণ্ঠিত স্বরে বনমালী আবার বলিল—না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় গেল সে তবে? সারাদিন খোঁজ নেই, খপর নেই ?

বনমালী বলিল,—আজ তিনি আমার ওখানে যাননি ত। কাল গেছলেন বটে,—আসবার সময় বলে এসেছিলেন, আবার যাবেন। তা যাননি! কোথায় কার কাছেই বা যাবেন? আমার সে মেয়েটি ত নেই, মারা গেছে—অভয়াশঙ্করের তীক্ষ্ণ শ্রুতি এই কথাটার উপর থমকিয়া থামিয়া পড়িল। কাল গিয়া-ছিল? কাল? কেমন করিয়া গেল? কাল সে নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিল,—না ?

অভয়াশঙ্কর খোলসা বুঝিবার জন্য আবার প্রশ্ন করিলেন,—কাল গেছল নিখিল? কখন গেছল ?

বনমালী বলিল,—বিকেলে। আমি বাড়ী ছিলুম না, আমার পরিবার বললে। কাল ভোরে শ্মশান থেকে ফিরে বাড়ীতে আর টিঁকতে পারিনি, বেরিয়ে পড়েছিলুম। ঐ এক মেয়ে—আর ত নেই! এই অবধি বলিয়া এক-মুহূর্ত্ত থামিয়া বনমালী একটা নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া আবার বলিল,—রাত দশটার পর বাড়ী ফিরে শুনলুম, উনি গেছলেন। ওঁকে দেখে আমার পরিবার একটু ঠাণ্ডা হয়েছে

তাই এসেছিলুম দেখতে, আর বলতে,—কাল যদি বেড়াতে বেড়াতে একবার—

বনমালীর কথায় বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—হবে না তা। আজ সে বাড়ী নেই। ফিরুক,—কাল থেকে ঘরের মধ্যে তাকে বন্ধ থাকতে হবে। কোথাও বেরুতে পাবে না—বেড়াতেও না! কথাটা বলিয়া শ্রোতার পানে তিলার্দ্ধকাল না চাহিয়াই অভয়াশঙ্কর বাড়ীর মধ্যে ফিরিলেন। বিরক্তির ঝাঁজে সমস্ত প্রাণ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—ইচ্ছা হইতেছিল, এ আগুনে সারা বিশ্ব-সংসারটাকে যদি জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিতে পারা যাইত।

উপরে উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া তিনি দোতলার খোলা ছাদে আসিলেন। ছাদের এক কোণে ঠাকুর-ঘর। ঠাকুর ঘরের দ্বারে সুষমা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল।

অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা—

সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এসেছে নিখিল? এইমাত্র আমি স্বপ্ন দেখ-ছিলুম, নিখিল বাড়ীর দোরে এসে—এই অবধি বলিয়াই সন্ধ্যার সেই ম্লান আলোতেই স্বামীর যে-মূর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে তাহার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তবে কি কোন দুঃসংবাদ... ?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কাল নিখিল তোমার সঙ্গে নৌকোতেই ছিল বরাবর?

সর্ব্বনাশ! এ কথা কেন? তবে কি সে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কেমন করিয়া হইল? নন্দ—? না, তা কখনই সম্ভব নয়! তবে?

তবে কি নিখিলই বাড়ী ফিরিয়া শাসন-যন্ত্রের চাপে সমস্ত কবুল করিয়া ফেলিয়াছে! সুষমা ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না, কাঁটা হইয়া রহিল। অভয়াশঙ্কর তীব্র স্বরে বলিলেন, বল।

সুষমা বলিল,—এবারটি মাপ কর তাকে। তার সে মিনতি যদি তুমি কানে শুনতে, সেই কাতর চোখ—

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—ঢের হয়েছে। আর মায়ায় কাজ নেই! আজ থেকে নিখিলের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রইল না আর। ছুটী, ছুটী, আজ থেকে তোমার ছুটী! বারবার এমনি করে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে তুমি? এতখানি প্রশ্রয় তাকে তুমি যদি না দিতে, তাহলে আজ তার এমন আস্পর্দ্ধা কখনো হতো না যে, সে সারা দুপুর এমনি পথে-ঘাটে টো-টো করে বেড়াতে পারে! রাত হয়ে এল, তবু তার চুলের টিকি দেখবার জো নেই!

সুষমা কাঠ হইয়া ঠাকুর ঘরের চৌকাঠের সামনেই বসিয়া রহিল। স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া একটি কথা কহিবারও তাহার সামর্থ্য হইল না।

অভয়াশঙ্কর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলি-লেন—কি জ্বালায় যে পড়েচি! চারিধারে সকলে মিলে যেন দারুণ ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, জীবনটাকে ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরিয়ে মারবে! তাও কি শুধু আমার জীবন? ছেলেটাও এ ঝড়ের মুখে চুবন খেয়ে মরছে! তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—বিমাতার কাছে স্নেহ প্রত্যাশা করা, হুঁঃ! অন্ধ মায়া পাওয়া যায়! সত্য স্নেহ? অসম্ভব! [illegible] মনে যখন দিবারাত্রি কাঁটা ফুটে আছে, সে ভাবচে, এই

ছেলে স্বামীর মনের দোরে মস্ত আগড় ! এ ভাবনা যে বিমাতার মন থেকে কখনো দূর হয় না. কাজেই—

এ কথায় সুষমা আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল,— কি ! কি বললে তুমি !

অভয়াশঙ্করের রসনায় বিষ ছুটিয়াছিল, সে বিষ সামলাইবার তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি বলিলেন,—তুমি কি জানো না, এই নিখিলকে এড়িয়ে তোমার পানে চাওয়া আমার পক্ষে কি রকম অসম্ভব ব্যাপার—?

বাধা দিয়া সুষমা বলিল,—এত নীচ আমায় ভাবো তুমি ! কোনদিন তোমার কাছে কোন-কিছুর প্রত্যাশী হয়ে ভিক্ষাপাত্র ধরেছি আমি ? কোন অভাব, কোন অনুযোগ জানিয়েছি কখনো—? তবে ? হায়রে, সে ভগবান জানেন, তুমি কি জানবে ?—তবু এই পাশেই ঠাকুর-ঘর—সেখানে নারায়ণ আছেন, আর আমায় তুমি ভালবাস না, অগ্রাহ্য কর,—জানি তবুও তুমি স্বামী. নারীর দেবতা, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে—এই দুই দেবতার সামনে বড় গলায় বলচি আমি, যদি কখনও নিখিলের অহিত চিন্তা করে থাকি, কোন দিন স্বপ্নেও যদি আমি তার হিংসা করে থাকি, তাহলে নারী আমি, নারীর জীবনে যা মস্ত-বড় অভিশাপ, তাই যেন বজ্র হয়ে আমার মাথায় পড়ে ! আমি যেন বিধবা হই ! শুধু বিধবা কেন ? জন্ম-জন্ম আমি যেন পথে-পথে এক মুঠো অন্নের জন্যে ভিক্ষে করে বেড়াই, আর সে ভিক্ষেও আমার না মেলে—!

সুষমার সমস্ত অন্তরখানা যেন আগুনে জ্বলিয়া-জ্বলিয়া ছাই হইতেছিল।

অভয়াশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া সরিয়া যাইতেছিলেন, সুষমা একটু থামিয়া দম লইয়া বলিল,—দাঁড়াও, শুনে যাও।

অভয়াশঙ্কর যন্ত্র-চালিতের মত ফিরিলেন। সুষমা বলিল,—নিখিল ফিরুক ! ভগবান করুন, তার যেন কোন অকল্যাণ না হয় ! তবে ফিরলে তাকে কিছু বলো না, এবারকারের মত মাপ করো। তার মনে যে বেদনা জন্মেছে, তাতে তোমার শাসন এখন এতটুকু সে সহ্য করতে পারবে না। তার মঙ্গল ভেবে, তার মুখ চেয়ে, কালকের জন্যে তাকে মাপ করো। আমি সত্যিই তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। রাক্ষসী আমি—আমার জন্যেই তার এই খোয়ার। ঠিক বলেচ, আমার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। আমিও রাখতে চাই না। শুধু দুদিন সবুর কর। আমি সরে যাচ্ছি,—দুদিন পরে আমি তোমার এ পুরী ছেড়ে চলেই যাব। বিশ্বাস না হয়,—এই ঠাকুর-ঘর, এই ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে শপথ করচি, আজ থেকে নিখিল মুক্ত, আমি তার মা নই, কেউ নই ! তার জীবনে দুঃস্বপ্নের মত, অভিশাপের মতই এসেছিলুম। কোন মায়ায় তাকে আর বাঁধবোনা, বাঁধবার নামও করবো না কোন দিন। যদি করি, তাহলে যেন আমায় এমন দুর্ভাগ্য এসে গ্রাস করে, যা ভাবতে মানুষ শিউরে ওঠে !

অভয়াশঙ্কর বজ্রাহতের মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুষমা তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—এবার বিশ্বাস হবে ?

অভয়াশঙ্কর উত্তরে কি বলিতে যাইতে ছিলেন, হঠাৎ এমন সময় বাহির-বাড়ীতে কলরব উঠিল,—দাদাবাবু এসেছেন। কোথায়

ছিলে দাদাবাবু? সারাদিন খুঁজে খুঁজে সকলে সারা হয়ে যাচ্ছি।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া যাইতেছিলেন, সুষমা তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল,—তোমার পায়ে পড়চি, ভিক্ষে দাও গো,—এই শেষ ভিক্ষে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কি?

—আজ ওকে কিছু বলো না, সব দোষ ওর ক্ষমা কর। কাল থেকে আর ত আমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই থাকবে না! বল, এ ভিক্ষে দেবে? ওকে বকবে না? শাসন করবে না?

অভয়াশঙ্কর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, —আচ্ছা।

সুষমা পা ছাড়িয়া ছাদেই বসিয়া পড়িল, অভয়াশঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

১৮

বাড়ীতে ঢুকিয়া নিখিল অনেকখানি রুদ্র শাসনই আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা হইল না দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া অভয়াশঙ্কর শুধু বলিলেন,—ছুটী ভোগ করেছ ত! এখন খেয়ে নাও গে—খেয়ে বাইরের ঘরে আসবে। আজ রাত্রে আমার কাছে বাইরে দোতলার বৈঠকখানায় শোবে। আজ থেকে সেখানেই শোওয়া। বাড়ীর ভিতরে তোমার আর থাকা হবে না।

এ-কথায় নিখিল বুঝিল, শাস্তির এ এক নূতন ধারা আজ খোলা হইয়াছে! শাসনের ঝাঁজটা যা-কিছু, তা মায়ের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে! সে স্থির হইয়া পিতার শাসন মাথা পাতিয়া লইল।

পরদিন সকালে মাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও সে দেখা করিল না। মার উপর একটু অভিমানও হইয়াছিল। বাবা এ দণ্ড দিয়াছে! তা দিক্,—তবু মা জোর করিয়া কেন তাহার উপর নিজের দখল খাটাইতে আসিল না? বেশ, মা যদি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে, তবে সেও বা আর না পারিবে কেন?

দুই-তিন দিন এমনি কাটিল। তিনদিনের দিন—বেলা তখন ন'টা। অভয়াশঙ্কর পড়ার ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কাল অমন করে পালিয়ে গেলে কেন, নিখিল? আমি ত সঙ্গে যাব বলেছিলুম—

নিখিলের দুই চোখের পিছনে জল একেবারে ঠেলিয়া আসিল। সবলে সে জল রুখিয়া সে বলিল,—অন্যায় হয়েছিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আমায় কতকগুলো বকুনি খেতে হল!

চোখের জল আর বাঁধ মানিল না। কাল, ঐ একটি দিন মাষ্টার মহাশয়ের যে করুণা যে মমতার পরিচয় সে পাইয়াছে, মনেই গাঁথা আছে—সে তাহা কখনো ভুলিবে না। সজল চোখে সে বলিল,—আমায় মাপ করুন, মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—মাপ চাইতে হবে না, বাবা। তোমার উপর কি আমি রাগ করতে পারি? কাল যে তোমায় ফিরে পাওয়া গেছে, আর ভালোয়-ভালোয় সব দিক যে কেটেছে, উনি যে মারধোর করেননি, কি ঘরে বন্ধ করে রাখেননি,—এই মস্ত ভাগ্যি!

নিখিল বলিল,—সে ঢের ভালো হত, মাষ্টার মশায়—এইটুকু বলিয়াই সে কাঁদিয়া

ফেলিল। সে বলিতে যাইতেছিল, ঘরের মধ্যে বন্দী থাকা বা দুই ঘা প্রহার,—সে ত শরীরের উপর খানিকটা আঘাত দিয়াই ক্ষান্ত হইত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে এই যে শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে, বাড়ীর মধ্যে যাইতে পাইবে না, মার সঙ্গে দেখা হইবে না—উঃ! নিখিলের মনের মধ্যে যাতনার ঝড় তীব্র বেগে ঠেলিয়া উঠিল। মনের যা-কিছু ভাবনা-চিন্তা সাধ-আশা সমস্ত ঐ বাগানের গাছপালার মতই মড়-মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে সব সাফ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া সে ঝড় তীব্র শ্বাসেই বহিয়া গেল।

তার পর ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে আর সহিবে না! এই শাসন, এই নিষ্ঠুর অত্যাচার—এ-সবের বাঁধন যেমন করিয়া পারে, সে কাটিবেই। কাল বাহিরে সারা দিন ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে—খোলা মাঠে, খোলা হাওয়ায় সামান্য একটা বাশের বাঁশীর সুরে কি সুখ উছলিয়া বেড়ায়! কাজ কি তাহার এ ঘর-দ্বারে, কাজ কি এ রাজ-ভোগে! গরুর পাল লইয়া ঐ রাখাল ছেলের মতই সে অবাধ মুক্ত স্বাধীন গতিতে বায়ু-হিল্লোলের মতই মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবে, গাছের ছায়ায় শুইয়া বাঁশী বাজাইবে!

তবে সে একা! দোসর ছিল সোনা! সোনার কথা অমনি মনে জাগিল। কেন সে চলিয়া গেল? স্বর্গে ভগবানের কাছে বসিয়া সে কি দেখিতে পাইতেছে না, নিখিলের এখানে কি কষ্ট! সে ভালো নয়, লক্ষ্মী নয়,—না হোক্, তবু সোনা ত ভগবানকে বলিতে পারে, ঐ নিখিলকে লইয়া এসো গো, আমি উহার খেলার সাথী, উহাকে ছাড়িয়া স্বর্গে আমি খেলিব কাহার সঙ্গে?

কলের পুতুলের মত পিতার ইঙ্গিতে স্নান-আহার সারিয়া নিখিল আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। মাষ্টার মহাশয় আহার করিতে গিয়াছিলেন। ঘরে সে একা,—বসিয়া সোনার কথাই ভাবিতেছিল। স্বর্গে সোনা এখন কি করিতেছে? তাহাকে দেখিতে পাইতেছে ত! কে জানে!

নন্দ ঘরে আসিল। ধোপা বাহিরে বসিয়া আছে, মাষ্টার মহাশয়ের ময়লা কাপড়-জামা ঘরে জড়ো করা ছিল—সেগুলা লইয়া গিয়া ধোপাকে দিবে।

নিখিল ধীরে ধীরে ডাকিল,—নন্দ।

নন্দ ফিরিয়া চাহিল; নিখিল বলিল,—মানুষ মরে গেলে কি হয় রে নন্দ?

নন্দ বলিল,—শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

নিখিল বলিল,—তার পর ত স্বর্গে যায়?

নন্দ বলিল,—তার মনটা স্বর্গে যায়, সে কি আর যায়? সে ঐ শ্মশানের আশে-পাশেই ঘুরে বেড়ায়! তবে স্বর্গেও যেতে পারে বটে—তখন তারা হাওয়ার মত থাকে কি না—হাওয়া! শ্মশানের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়! সোনাও তাহা হইলে—

নন্দ ময়লা কাপড়-চোপড় লইয়া চলিয়া গেল। নিখিল ভাবিল, শ্মশান! সেই ত শ্মশান! নন্দ সেদিন দেখাইয়া দিয়াছিল! বেশ হইয়াছে! সেই শ্মশানে গিয়াই সে থাকিবে! শ্মশানের হাওয়ায় তাহা হইলে সোনার সঙ্গে একদিন-না-একদিন নিশ্চয় দেখা হইবে!

হাতের লেখা লিখিতে লিখিতে, অঙ্ক কষিতে কষিতে ঐ এক চিন্তাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে আজ বাঁধন কাটিবে, বাঁধন কাটিবেই আজ। কি সুখ এই এত বড় বাড়ীর মধ্যে, এত লোক-জনের ভিড়ে? কিছু না! সেই জনহীন শ্মশান, খোলা মাঠ,—সুখ যা-কিছু তা সেই সব জায়গাতেই আছে!

বৈকালে জলখাবার খাইয়া একটু ফাঁক পাইতেই সে চোরের মত সন্তর্পণে অন্দরে উঠিল। মা? মা কৈ? সে ত আর বাড়ী ফিরিবে না, তাই শেষ একবার মার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে চায়!

সুষমা নিজের ঘরে জানলার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, নিখিল আসিয়া চোরের মত ঘরে ঢুকিল, অত্যন্ত মৃদু স্বরে ডাকিল, —মা।

সুষমা ফিরিয়া চাহিল—নিখিল! পিয়াসী মন অমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল, দুই বাহু নিখিলকে বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য অধীর উন্মত হইয়া উঠিল। সুষমা জোর করিয়া সে চাঞ্চল্য থামাইল। নিখিল আসিয়া সুষমার গলা জড়াইয়া একেবারে তাহার কোলে লুটাইয়া পড়িল,—তাহার মুখে-বুকে মুখ ঘষিয়া মাথা ঘষিয়া সুষমার গলা ধরিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিল, ডাকিল,—মা, ও মা, মাগো…

সুষমা শিহরিয়া উঠিল। শপথ! কত-বড় শপথ সে করিয়াছে!—ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অপলক নেত্রে নিখিলের পানে চাহিয়া পুতুলের মতই নিঃশব্দে সে বসিয়া রহিল,—দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। অধীর ওষ্ঠ উদ্যত চুম্বনকে যেন বেড়ি দিয়া আটকাইয়া রাখিল।

নিখিল ভাবিল, মাও তবে রাগ করিয়াছে, তবে আর এ ঘরে কার মুখ চাহিয়া থাকিবে সে? সে উঠিল, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সুষমাও অমনি ভূমির উপর লুটাইয়া আর্ত্ত ক্রন্দনে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

১৯

এই শ্মশান! জন মানবের চিহ্নও নাই, নিখিল আসিয়া যখন শ্মশানে ঢুকিল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। দূরে কাহারা হরি-ধ্বনি করিয়া চলিয়া যাইতেছে। একটা চুলী তখনো একেবারে নিবিয়া যায় নাই—আগুন তাহাতে গন্ গন্ করিতেছে—কয়েক কলসী জল পাইয়া একটা তীব্র ঝাঁজ তখনো চুলী হইতে উঠিয়া নিকটের বাতাসটাকে তপ্ত রাখিয়াছে! দুইটা কুকুর নিখিলকে দেখিয়া ল্যাজ গুটাইয়া সরিয়া গেল। এখানে-ওখানে পোড়া কাঠ, ভাঙ্গা কলসা—নিখিলের চোখে জায়গাটা কেমন অভিনব ঠেকিল। এইখানকার হাওয়ায় সোনা মিশিয়া আছে! হাওয়া হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে! এই যে হাওয়া গায়ে লাগিল, এ কি তবে সোনার পরশ? না—ঐ যে একটা আগুনের প্রকাণ্ড চুলী, কে জানে, আবার কাহাকে ভগবান তাঁহার স্বর্গে লইয়া গেলেন, এ হাওয়া তাহারই পরশ না?

পা টিপিয়া-টিপিয়া নিখিল অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল। শ্মশানের নীচেই নদী। নদীটা এখানে বাঁকিয়া গিয়াছে। কোথাও কাহারো সাড়া নাই—এমন স্তব্ধ, এমন শান্ত! নদীর তীরে, বহু দূরে ঐ না একজন কে, মানুষের মত! মানুষ? না, ও একটা গরু! জল খাইতে আসিয়াছে, বুঝি। আশে-পাশে বাব্‌লা গাছ। তাহাতে অজস্র হলুদ রঙের ফুল

ফুটিয়াছে—কি হাল্‌কা পাপড়ি, আর কি বাহার তাহার মঞ্জরীতে! বাঃ! বাব্‌লার পাতা দোলাইয়া বাতাস সির্‌-সির্‌ করিয়া বহিয়া গেল—হলুদ ফুলের চূর্ণরেণু নিখিলের গায়ে ঝরিয়া পড়িল। নিখিল চারিধারে চাহিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে একরকম নিঃশব্দেই সে চলিতে-ছিল—কি জানি, হাওয়ায় সোনার কণ্ঠ কখন্‌ ভাসিয়া ওঠে! জোরে চলিলে যদি সে শুনিতে না পায়! কিন্তু কৈ সোনা? সে ডাকিল,—সোনা। গা অমনি ছম্‌-ছম্‌ করিয়া উঠিল। ভয়ে স্বরও কেমন বাধিয়া গেল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আবার চারিধারে সে চাহিল,—আবার ডাকিল—সোনা! প্রতিধ্বনি জবাব দিল—আ—া—, আর নদীর জল ঘূর্ণী ঢেউ তুলিয়া গাহিল, ছল-ছল!

শ্মশান হইতে নদীতে নামিবার জন্য লোকের পায়ে-পায়ে ঘাসের উপর পথের একটি রেখা পড়িয়াছিল। নিখিল ধীরে ধীরে সেই রেখা-পথের পাশে ঘাসের উপর বসিল। নদীর জলে পোড়া কাঠের কয়লার গুঁড়া ভাসিতেছিল, কিনারায় দুই-একটা হাড় পড়িয়াছিল। দেখিয়া ভয়ে নিখিলের বুকটা একবার ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে ভাবিল, কিসের ভয়! সোনাকে আবার ভয় কি!

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত কাহার একটা পরিচিত ডাকের অপেক্ষায় নিখিল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—বসিয়া বসিয়া চোখ ক্রমে ভারী হইয়া উঠিল, কানের কাছে নদীর ঈষৎ মৃদু একঘেয়ে সুর বাজিয়া চলিয়াছিল, আর দূরে থাকিয়া থাকিয়া এক-একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছিল। নিখিল চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল, কখন্‌ সোনা আসিয়া পিঠে ছোট-একটা টোকা দিয়া ডাকে, রাজপুত্তুর!

কতক্ষণ এমন ভাবে কাটিয়াছিল, খেয়াল নাই—হঠাৎ এক সময়কার শীতল স্পর্শে নিখিল চমকিয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া সে দেখে, স্তব্ধ রাত্রি—আকাশে তারার ছড়াছড়ি, আর কোণে সেই এক-টুক্‌রা চাঁদ। কখন সে এই শ্যামল তৃণের শয্যায় গা ঢালিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—আর এ কি! একটা কুকুর আসিয়া তাহার ঘ্রাণ লইতেছে! ভয়ে তাহার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল—একটা চীৎকার করিয়া কুকুরটার দিকে কলের মত সে হাত উঠাইল। কুকুর ভয়ে পলাইয়া গেল।

বাড়ীর কথা নিখিলের মনেও পড়িল না, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই মনে হইল, ওধারে গাছের তলায় কাহারা যেন তাহারই পানে চাহিয়া কি বলাবলি করিতেছিল, তাহাকে উঠিতে দেখিয়া সরিয়া যাইতেছে। কারা ওরা? সে ডাকিল,—সোনা—। কোন সাড়া নাই! এবার আরো জোরে ডাকিল,—সোনা!

মনে হইল, কে যেন বহুদূর হইতে সাড়া দিল—যা—ই।

সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাগলের মত নিখিল তখন ছুটিল। কতদূর যাইবে? শ্মশানের বুকে সেই নিবন্ত চুলীর কাছে মোটা একটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল। মড়া পোড়াইবার জন্য কাহারা গাছ কাটিয়া এটাকে দরকার না হওয়ায় ফেলিয়া গিয়াছে, সেই গুঁড়িতে হুচট খাইয়া নিখিল পড়িয়া গেল—শ্রান্ত শরীর পড়িয়াই মূর্চ্ছিত হইল।

ওদিকে বাড়ীতে-আবার সেই ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মধ্যে রাত্রিটা যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, কেহ তাহা বুঝিতেও পারিল না—তবু নিখিলের কোন সন্ধানই নাই! অভয়াশঙ্করের রুদ্র মূর্ত্তি অজানা ভয়ে একেবারে পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, দাসী-চাকর যে যেখানে ছিল, সকলে সারা রাত্রি লণ্ঠন জ্বালিয়া,মশাল জ্বালিয়া সারা গ্রাম আর গ্রামের যত বন-বাদাড় ও পুকুর-পাড় ঘুরিয়া নিখিলকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছে! কালিকার মতই সুষমা আবার সেই ঠাকুর ঘরের দ্বারেই মাথা কুটিয়া ডাকিতেছে,—ঠাকুর, হে ঠাকুর,—

সকালে অভয়াশঙ্কর ক্লান্ত হইয়া বাহিরে ফটকের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, শুষ্ক মূর্ত্তি, চোখ দুটো সারারাত্রির দুশ্চিন্তায়-জাগরণে কোটরে গিয়া ঢুকিয়াছে—নিশ্বাস ফেলিয়া কেবলই ভাবিতেছেন, বুঝি, আমারি পাপের প্রায়শ্চিত্ত! মেয়ে-হারা বাপের দুঃখ বুঝি নাই—! আরও মনে হইতেছিল, বিশেষ করিয়া সুষমার কথা। তাহাকে কিছু দিই নাই, শুধু আদায়ই করিয়াছি। এ জগৎ যে দেনা-পাওনার উপরই চলিয়াছে! ফাঁকি দিয়া যা' আদায় করিয়াছি, এবার বুঝি তাহার দাম গণ্ডায়-গণ্ডায় শোধ হয়!

এমন সময় রাস্তার ওদিক হইতে নন্দ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ঐ না দাদাবাবু?

অভয়াশঙ্কর চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইয়া দেখেন, দূরে কয়জন লোক—ঐ যে তাহারা এদিকেই আসিতেছে বটে! এক জনের বুকের উপর একটি ছেলে না? ছেলেটি—? তাঁহারই নিখিল? হাঁ, নিখিলই!

পাগলের মত অভয়াশঙ্কর অমনি সেই দিকে ছুটিলেন—আলু-থালু বেশ—কেমন এক মূর্ত্তি! ঠিকই ত,—কিন্তু নিখিল উহার বুকে কেন? তবে কি নিখিল—? সে যে লীলার একটিমাত্র স্মৃতি—শেষ স্মৃতি! ভগবান! তাঁহার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় ভীষণ ঝাঁকানি দিল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

লোকগুলা কাছে আসিলে তিনি দেখেন, মাষ্টার মশায়, দামু আর সেই লোকটি—বনমালী। বনমালীর বুকে নিখিল। নিখিল মূর্চ্ছিত—না…? কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—আছে ত? এ্যাঁ—?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—হাঁ, ভয় নেই।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় পেলে?

এবার বনমালী কথা কহিল। সে বলিল—শ্মশানে।

—শ্মশানে! শিহরিয়া অভয়াশঙ্কর তাহার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—দাও, আমায় দাও, আমি কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার বড় কষ্ট হয়েছে, এতখানি পথ—

বনমালী বলিল,—কোন কষ্ট না, বাবু।

—না, না, দাও। বলিয়া নিখিলকে ঘাড়ে করিয়াই অভয়াশঙ্কর বাড়ী ঢুকিলেন,—একেবারে দোতলায় অন্দরের ঘরে আসিয়া তাহাকে খাটে শোয়াইয়া দিলেন। গা তাহার পুড়িয়া যাইতেছে! বেহুঁস জ্বর! দুই গাল আপেলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

বনমালী, মাষ্টার মহাশয়, সকলেই সঙ্গে আসিয়াছিল। মাষ্টার মশায় বলিলেন,—আমি এখনি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দি, ভালো

ডাক্তারকে। মোটরে করে তিনি এখনি চলে আসুন।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তাই দাও, এখনই দাও। আমার নিখিলকে সারিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও তোমরা। আমি লক্ষ টাকা দেব, আমার সব দেব। তার পর বনমালীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —শ্মশানে গেল কি করে, জানো কিছু?

বনমালী বলিল,—জানি না। তবে শেষ রাত্রে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হল। আমি স্বপন দেখছিলুম, আমার মরা মেয়ে সোনাকে। ঐ একটি মেয়ে—আর ত কেউ নেই আমার! স্বপন দেখছিলুম, যেন মা আমার চুলীর মধ্যে থেকে কেঁদে কেঁদে ডাকছে—বাবা গো বাঁচাও, বাবা গো গেলুম! স্বপ্নেই দেখলুম, চুলীর মধ্যে কাঠ পড়ে তাকে চেপে রেখেছে যেন—আর সে তার মধ্যে থেকে কেবলি ওঠবার চেষ্টা করছে, পারছে না! ঘুম ভেঙ্গে প্রথমটা দেখি ঘেমে নেয়ে-উঠেছি। বুঝলুম, স্বপ্ন! স্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিতে গেলুম। তাকে ত পুড়িয়ে ছাই করে এসেচি, তবে আবার—মন কিন্তু এমন অস্থির হয়ে রইল, যে কিছুতেই সোয়াস্তি পাইনে, নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আসছিল। শেষে থাকতে না পেরে ভোরের আলো ফোটবার আগেই নিঃশব্দে শ্মশানে বেরিয়ে পড়লুম। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা গাছের গুঁড়ির পাশে অজ্ঞান হয়ে ইনি পড়ে আছেন!

অভয়াশঙ্করের সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিল। তিনি বনমালীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—আমার নিখিল তোমারই! তুমি ওকে বাঁচাও, ওকে বাঁচাও। তুমি বাঁচাতে পারবে, তোমায় নিখিল ভালবাসে!

অভয়াশঙ্কর পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

২৫

প্রাণপণে চিকিৎসা ও সেবা চলিতে লাগিল। টাকায় যতখানি করা যায়, অভয়াশঙ্কর তাহা করিলেন; আর টাকার উপর যে জিনিষ, অগাধ টাকার বিনিময়েও যাহা পাওয়া যায় না, সেই সেবা ও শুশ্রূষার ভার লইল সুষমা। বুক দিয়া নিখিলকে সে ঘিরিয়া রাখিল, কোন অমঙ্গল না তাহাকে স্পর্শ করে, মৃত্যু যেন প্রবেশের কোন ফাঁক না পায়!

ডাক্তার বলিলেন,—মেনিঞ্জাইটিস্! রোগীর কথা কিছুই বলা যায় না। বাঁচিয়া উঠিলেও হয়ত জড় হইয়া থাকিবে, একেবারে বোবা-হাবা, পুতুলের মত!

পনেরো দিনের পর জ্বর নরম পড়িলেও নিখিল কথা কহিল না। চোখ মেলিয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া কেমন এক ভাবে শুধু চাহিয়া থাকে, দেখিলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া ওঠে, চোখ ফাটিয়া অতি-বড় পাষাণ যে, তাহারও চোখে জল ঝরিয়া পড়ে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এম্‌নি থাকে থাক্—তবু ত প্রাণে বেঁচে আছে!

ডাক্তার বলিলেন,—কথা যদি কখনো কয়, সে ভগবানের হাত। তবে সেরে উঠলে স্নেহ আর সহানুভূতির প্রচুর ধারায় ওর মনখানিকে যদি ভিজিয়ে ডুবিয়ে রাখতে পারেন সর্ব্বক্ষণ, এতটুকু শাসন নয়, এতটুকু বাঁধন নয়—একেবারে মুক্ত, স্বাধীন অবাধ গতি দিয়ে, তবেই যদি ফের ওকে মানুষ করতে পারবেন, নাহলে...।

—নাহলে কি?

—আপনার ঐ আলমারির মধ্যেকার কাঁচের পুতুলের মতই ও থাকবে, ঠিক অমনি। দাঁড় করিয়ে রাখেন, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসিয়ে দেন, বসবে, শুইয়ে দেন শোবে—বাড়ার ভাগ, নড়ে-চড়ে একটু বেড়াতে পারবে, তাও পক্ষাঘাত-গ্রস্ত পঙ্গুর মত!

সুষমা একদিন বলিল—ও কবে কথা কইবে ডাক্তারবাবু? আজ যে পঁচিশ দিন হয়ে গেল!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—পঁচিশ দিন?

সুষমা বলিল,—আমি যে একটি-একটি করে দিন গুনচি! আজও কি আশা দেবেন না?

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—মিছে আশা কি বলে দি' মা? তবে ভরসা এই, আপনার শুশ্রূষায় মরা মানুষও বেঁচে ওঠে! আমাদের পুঁজি কিছুই নেই—শুধু তার-আশায় থাকলে আমি বহুদিন সরে পড়তুম। কিন্তু তোমার ঐ সেবায় আমার মন এখনো নিরাশ হয়নি। তবু যে সম্পূর্ণ আশা দিতে এখনো পার্চ্ছি না মা।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যখনি ওর অসুখ হয়েছে, শক্তই হয়েছে—আর সে অসুখে কেবল আমার স্ত্রীই ওকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন!

ডাক্তার বলিলেন,—তাই ভরসা হচ্ছে, মা ওকে এবারও ফিরিয়ে আনবেন।

* * *

আজ চল্লিশ দিন। জ্বরটা কাল রাত্রি হইতে একেবারে ছাড়িয়াছে। আজ সকালেও জ্বর এখনো দেখা দেয় নাই। তারপর খানিকটা বেদানার রস কাল রাত্রে খাওয়ানো গিয়াছিল, আজও আধ পেয়ালা খাইয়াছে! ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—ভালোর দিকে ফিরচে বলেই মনে হচ্ছে। তোমার পুণ্যে আবার ওকে তাহলে পেলুম,মা—বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলে, অভয়াশঙ্কর আসিয়া সুষমার কাছে বসিলেন—সুষমার পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার এ কি চেহারা হইয়াছে! শীর্ণ একটি রেখার মতই ক্ষীণ দেহ,মলিন বিবর্ণ মুখ! এ কি সেই সুষমা—না, তার শীর্ণ একটু ছায়া? এ কয়দিন নিখিলকে লইয়া একাসনে বসিয়া যমের সঙ্গে কি প্রবল যুদ্ধটাই করিয়াছে!

যাক্, সে জয়ী হইয়াছে, আজ! আনন্দে অভয়াশঙ্করের চোখ ছলছলিয়া উঠিল। সুষমা তখন ভিজা তুলা বুলাইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে নিখিলের মুখ-চোখ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। সে কাজ হইয়া গেলে সে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিল।

অভয়াশঙ্কর তাহার একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন,—সুষমা।

সুষমার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, চোখ মেলিয়া সে বলিল,—কি?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তুমিই ওকে সারিয়ে তুলেচ। যদি ওকে ফিরে পাই, তাহলে তোমারই হাতে ওকে দান করব এবার, একেবারে নিঃস্বত্ব হয়ে—!

সুষমা সে কথার কোন জবাব দিল না—এত দুঃখেও মুখে একটু হাসি ফুটিল। দেখিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ওঃ—তা হবার নয়, সুষমা—না?

—কেন?

—সেই যে শপথ করেছিলে, ঠাকুর-ঘরের দোরে বসে—

সুষমা আবার হাসিল, হাসিয়া বলিল,—শপথ! সেই শপথের কথা বল্‌চ! সে ত মুখের কথা মাত্র গো! সে শপথ যখন করেছিলুম, ঠাকুর কি তখন শুধু সেই মুখের কথাটুকুই শুনেছিলেন? আমার প্রাণ তখন কি বলছিল, তা শোনেন্‌ নি? তা যদি না শুনে থাকেন, তাহলে তিনি ঠাকুর নন্‌; আর তাহলে তাঁকে মান্‌বোও না! সে শপথ যে কত-বড় মিথ্যা, ঠাকুর তা তখনই বোঝেন্‌ নি?

অভয়াশঙ্কর একটা মস্ত আশ্বাস পাইয়া বলিলেন,—তুমি তাহলে ওর সব ভার নেবে? বল! ওর সম্বন্ধে কোন কথায় আর আমি থাকব না।

সুষমা আবার হাসিল! অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বিশ্বাস হচ্ছে না? বলিয়া তিনি উঠিলেন, উঠিয়া ঘরের দেওয়ালে লীলার যে ছবি টাঙ্গানো ছিল, হাত দিয়া সেই ছবি ছুঁইয়া বলিলেন,—এই ছবি ছুঁয়ে—আর ঐ আমার মার আর বাবার ছবি ও দেওয়ালে—এই তিন ছবি সাম্‌নে রেখে বলচি,—নিখিলকে সারিয়ে তুমিই ওকে নাও। ওর সব ভার তোমায় দিলুম—যেমন ভাবে ওকে মানুষ করতে চাও, কর—আমি তাতে কোনদিন কোন কথা কব না, কোন বাধা দেব না! যদি দি—

সুষমা খাট হইতে নামিয়া ছুটিয়া স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল; হাত চাপিয়াই কহিল,—ছি, তুমি স্বামী, দেবতা, আমার কাছে শপথ করতে আছে কি! কে বললে, তোমায় বিশ্বাস করি না? তা যদি না করতুম, তাহলে এ বাড়ীতে একদণ্ডও কি তিষ্ঠুতে পারতুম! তুমি জানো না, এ জগতে আমার আর কে আছে?—শুধু তুমি আর নিখিল! তোমরাই আমার সব।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমায় চিনিনি আমি, সুষমা, তাই মিথ্যা কুৎসিত নীচ সন্দেহ নিয়ে নিজেও পুড়েচি, আর সেই আগুনের ঝড় তুলে তোমাকে পুড়িয়েচি, নিখিলকে পুড়িয়েচি! তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না ওদিকে হঠাৎ একটা ছোটস্বর দুইজনেরি কানে গেল—মা—

এ কি! এ কে ডাকে? নিখিল না?

ছুটিয়া দুইজনে খাটের পাশে আসিল। নিখিল কোনমতে আজ এই চল্লিশ দিনের দিন শ্রান্ত কাতর চোখদুটি আবার মেলিয়াছে। অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—নিখিল, বাবা—

সুষমা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল,—নিখিল।

নিখিলের চোখের পাতা কাঁপিতেছিল—ঠোঁট দুটিও কাঁপিতেছিল, প্রজাপতির হাল্‌কা পাখার মতই তুল্‌-তুল্‌ করিয়া। সুষমা আবার বলিল,—কি বলচ, বাবা—? বল।

নিখিল অতি-কষ্টে আবার ডাকিল,—মা—

নিখিল কথা কহিয়াছে! আবার সে কথা কহিয়াছে গো! ডাক্তার, ডাক্তার—

অভয়াশঙ্কর পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে গেলেন।

আবার যখন ঘরে ফিরিলেন, সঙ্গে ডাক্তার। দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন,—ভগবান ওকে ফিরিয়ে দিলেন, তাই আবার কথা কয়েছে! আর ভয় নেই! তবে যা বলেছি,—ভারী সাবধানে রাখতে হবে

ওকে—সব বন্ধন কেটে দিয়ে, অবাধ মুক্ত বাতাসের মত।

সুষমা নিখিলের মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। নিখিল হাতখানায় মুখ রাখিয়া সুষমার পানে চাহিয়া এবার বেশ স্পষ্ট কণ্ঠে ডাকিল,—মা—

—বাবা—বলিয়া সুষমা নিখিলের মুখে চুম্বন করিল।

ডাক্তার বলিলেন,—Thank God! He is saved.—ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

অভয়াশঙ্কর ধীরে ধীরে খাটের পাশে আসিয়া ডাকিলেন—নিখিল—

নিখিল বাপের পানে চাহিল। অভয়াশঙ্কর তাহার মুখে চুমু দিয়া বলিলেন,—আমার মাণিক ছেলে, ধন ছেলে! বাবা আমার—বাবলা আমার! তুমি সেরে ওঠো, আর কখনো বকুবো না তোমায়। এর ছেলে, এর কাছেই থাকবে তুমি! বলিয়া সুষমাকে দেখাইয়া দিলেন।

নিখিল আবার ডাকিল,—মা—

অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন, সুষমাও স্বামীর পানে চাহিল। দুইজনের কাহারো মুখে কথা নাই, শুধু চোখের কোণে মুক্তার মত বড় বড় জলের ফোঁটা।

শেষ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ছিন্নলিপি

একখানি ছেঁড়া চিঠির টুকরাগুলি পাঠাইলাম। আপনারা গুণী। যদি ইহাকে গুছাইয়া জোড়াইয়া কবিতা করিতে পারেন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শ্রীহরি চৈত্র

—বরেষু,

ভাল আছি

হাতে রোপা মালাগাছি

পাঠালেম।

সখাহে

মাথারে

আঁখিজল

পাবে কি হে চপল

এ লিপি?

পথ-ভোলা

মরালে,

একবার

স্মরালে।

অপরাধ

বলিয়ো—

পাঠালেম

এ আমার

সুখী হই

অধীনীরে

সখা মোর

এ দীনার

হে আমার

প্রিয়তম,

পরাণের

অমিয়।

কলিকাতা—২৫, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।